

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ মজুমদার

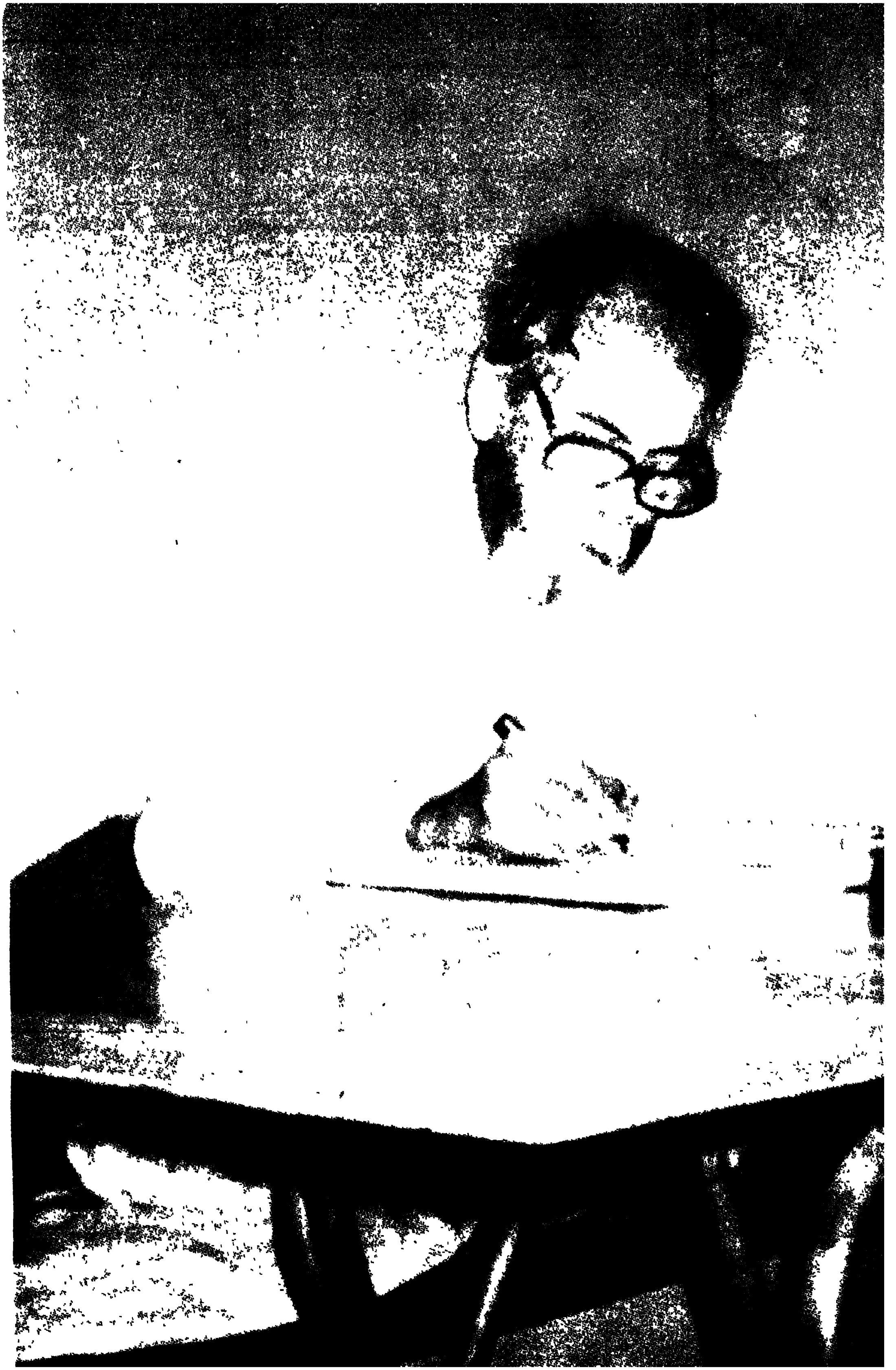
অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র

১ নিজের কথা গড় শ্রীখণ্ড প্রমীলার বিয়ে মধুছন্দার কয়েকদিন
নন্দবানী তাঁতি বউ সান্যালদের কাহিনী ইতিহাস
গারদ সুনীতি গড অন দি মাউন্ট সিনাই
রচনাপ্রসঙ্গ অংশে সংযোজিত উদ্বাস্তু

২ প্রথম পরিচ্ছেদ নয়নতারা রাজনগব দীপিতার ঘরে রাত্রি
কলঙ্ক দুলারহিনদের উপকথা অঘটনা শহিদ স্নাগ্নিকা মহাসত্ব

৩ কেন লিখি দুখিয়ার কুঠি নির্বাস সাদা মাকড়সা হনিড লার্ক গল্প
একটি বিপ্লবের মৃত্যু অনঘমিত্রা সুশোভনার কাহিনী রানী ইন্দুমতী
পদ্মিনী ভূকম্পন ভদ্রলোকের বাডি পলদহ রাঙাদি

৪ আমার সম্বন্ধে মধু সাধুখাঁ ফ্রাইডে আইল্যান্ড প্রাচীন একটি শিকাব
কাহিনী একটি মাঝারি মানুষেব গল্প ইনফবম্যাল ডিনার অহেতুক
দূরভাষিত অসমাপ্ত দি ক্যাসল ডাউন কিউল প্যাসেঞ্জারে বীতিমতো
গল্প বণিক লক্ষেশ্বব অ্যাভলনেব সবাই স্বর্গভ্রষ্ট একটি খামাবেব গল্প
বিপ্লব ভটওলা ওগো মুগ্ধা অনেক বেবুন বিয়োগ ববীন্দ্রোৎসব
সাহিত্যের ধারণা সাহিত্য ও স্বাধীন চিন্তার দায়িত্ব অনুমান করি
শরৎচন্দ্রের উপন্যাস



অমিয়ভূষণ
রচনাসমগ্র
৫

গ্রন্থনা

অপূর্বজ্যোতি মজুমদার   এণাক্ষী মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং।। কলকাতা ৭০০০৭৩

AMIYABHUSHAN RACHANASAMAGRA (Vol. V)
Collected Works of AMIYABHUSHAN MAJUMDAR
Published By Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 300 00

ISBN 978-81-295-0723-5

দাম · ৩০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্‌স্‌
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত রচনার সময় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১) থেকে শেষ রচনার প্রকাশকাল (আশ্বিন ১৩৫১। পর্যন্ত ছয় দশকের সমগ্র রচনা কালানুক্রমে বিন্যস্ত করতে থাকলে আমাদের কাছে যা স্পষ্ট হয় তা হল, যত কম তিনি লিখেছেন বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনার সংখ্যা তত কম নয়। দ্বিতীয় বিষয় এই যে ছয় দশকের প্রতিটি দশকই, অমিয়ভূষণের সৃজনশীলতার দিক থেকে, তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দশক, ১৩৫০ এর দশক ব্যতীত প্রায় প্রতিটি দশকে একাধিক উপন্যাস, এবং শেষ দশক ব্যতীত, দশ থেকে কুড়িটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়।

অধিকাংশ গল্প, নাটক, প্রবন্ধ বা উপন্যাস যে সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি তেমন জনপ্রিয়, সুলভ বা গণগ্রাহ্য ছিল না বলে এবং প্রকাশিত রচনার বেশির ভাগই অগ্রন্থিত থেকে যাওয়ায় মুষ্টিমেয় দৃঢ়নিশ্চয় পাঠক ছাড়া সেগুলি প্রায় অজানা থেকে গিয়েছে। এই অর্থে, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড মিলিয়ে, অমিয়ভূষণ-সাহিত্যের এক অপঠিত দুর্লভ সম্ভার পাঠকের সংগ্রহে পৌঁছে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আরও একটি নাটক আর একটি আত্মকথন বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হল। নাটকটি অমিয়ভূষণের শেষ প্রকাশিত নাটক। সম্ভবত ১৩৬০-এর দশকে প্রতিমা-বাসবদত্তা নামে একটি নাটক পারিবারিক পত্রিকা উত্তরায়ণে প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি ছিন্ন পৃষ্ঠা ছাড়া নাটকটি উদ্ধার করা যায়নি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনাটি একটি নাটক (দ্য গড অন মাউন্ট সিনাই, মন্দিরা ৭ম বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যা ১৩৫১)। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত বহু নাটকের খসড়া দেখা যাচ্ছে। অনুমান হয়, সেগুলি বর্জিত হয়েছিল। বলা ভালো, তিনি নাটক রচনায় আর আগ্রহী থাকছিলেন না। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : বুঝতে পেরেছিলাম নাটক লিখতে গেলে স্টেজ ক্রাফট, নটনটী, তাদের রিহার্সাল, তাদের সাজসজ্জা, এসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত। ...অন্য অনেক ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ। আমার যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী থাকত তবে তাদের মধ্যে নটনটী সৃষ্টি করে (নীতি যেখানে হয় হাতে ধরা) নাটক করতে পারলে হত। তা obviously সম্ভব ছিল না। সুতরাং নাটক লেখা হল না (উত্তরাধিকার : অমিয়ভূষণ সংযোজন সংখ্যা

রচনাপ্রসঙ্গে কোন কোন রচনার প্রাথমিক পরিকল্পনা বা খসড়া ছক গ্রন্থিত হল। সব লেখার খসড়া নেই। প্রাথমিক পরিকল্পনার সঙ্গে সমাপ্ত ও প্রকাশিত রচনার পার্থক্য থাকা সম্ভব। অমিয়ভূষণের ভাষায়, 'conception ও execution এক নয়'। সময়ান্তরে খসড়াপাঠের ক্ষেত্রেও যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা কোন গবেষকের আগ্রহের বিষয় হতে পারে।

আরেকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে অনেক ক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে রচনাসমগ্রের পাঠের কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, কারণ রচনাসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সংশোধিত-সংযোজিত পাঠ-ই গ্রহণ করা হচ্ছে। কোন একটি গল্প বা উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ ছাপা হয়ে আসার পরেই, অথবা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, পুনর্মুদ্রণের আগে কিংবা কেবলই নিজের ইচ্ছাসুখে, অমিয়ভূষণ পত্রিকার পাতায় সংশোধন করতেন। কখনও একটি শব্দ বদলে যেত। কখনও দু-তিনটি বাক্য, একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হত। বর্জিতও হত। সে-রকম সংশোধিত পাঠ পাঠককে উপহার দেওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল, এই বিবেচনায় অন্তর্ভুক্তির সময়ে সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছি আমরা।

অমিয়ভূষণের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনা সংগ্রহ করে রচনাসমগ্রের দ্রুত ও নিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রতিনিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অলোক রায়, অধ্যাপক অমলেন্দু দে, শ্রীসুনীলকুমার নন্দী, শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শও পেয়েছি তাঁদের কাছে। পুরনো লেখা খুঁজে দিয়ে আর দিশা নির্দেশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, শ্রীবিজয় নাগ, শ্রীসন্দীপ দত্ত, অধ্যাপক তপস্যা ঘোষ ও শ্রীচন্দন গোস্বামী। অমিয়ভূষণ-গবেষক স্নেহভাজন অনিন্দ্য সৌরভ সর্বদাই পাশে আছেন। চতুরঙ্গ সম্পাদক আবদুর রাউফ এক মুহূর্তের জন্যও নিরুৎসাহ বোধ করতে দেননি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ হাসিমুখে সয়েছেন পুরনো পত্রিকার জন্য আমাদের নিরন্তর ফরমাশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগাবিক শ্রীবিনোদবিহারী দাসের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সাময়িকপত্রের সংগ্রহ দেখা সহজ হয়েছে। আশাতীত সাহায্য পেয়েছি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েব মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীসত্যব্রত ঘোষালের কাছ থেকে।

নিউ ক্যালকাটা উপন্যাসের সম্পূর্ণ পাঠ সংগ্রহ করার দিশা দেখিয়েছেন শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। রোগশয্যা থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে তিনি ঘরোয়া পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবীরেন সিমলাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। ঘরোয়ার বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রণব রায় পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও পুরনো সংগ্রহ থেকে নিউ ক্যালকাটার কিস্তিগুলি উদ্ধার কবেছেন।

এঁদের, এবং আমাদের অন্য অনেক সুহৃদ, যাঁরা আড়ালেই থাকতে চেয়েছেন, তাঁদের সাহায্য ছাড়া রচনাসমগ্র প্রকাশ করা অসম্ভবই হত। আমরা কৃতজ্ঞ।

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

সূচি

নীল আকাশ

গান্ধিজীর নীলাকাশ সম্ভবতই আমার উপরও বিস্তৃত ছিল। সে সম্ভবত ১৯২৫-২৬, গান্ধিজী পাবনায় এসেছিলেন। কেন জানিনা সাবিত্রী দিদির উপরে ভার পড়েছিল অন্যান্যদেব সঙ্গে তাঁকে মালা দেয়ার। রাস্তার এপারে ওপাবে দুটো বাড়ি, কিন্তু দুয়ে মিলে এক স্কুল; এপারে বালক ওপারে বালিকারা। বালক আমি বালিকা দিদির হাত ধরে তখনকার দিনের এই অত্যন্ত গুরুভার কাজের দিকে নিতান্ত হালকা মন নিয়ে এগোতে লাগলুম। মাঝে মাঝে দেখছিলুম কেমন দেখায় দিদিকে। তখনকার দিনে আট-ন বছরে শাড়ি পরতো, সেটা নতুন নয়। নতুন, তার গায়ের বাসন্তী রঙের খদ্দরের ব্লাউজ, বাসন্তী পাড়ের মোটা শাড়ি। কী ভিড়! কী ভিড়! নেহাৎ দিদির ভাই বলে ঘেরের ভিতবে যেতে পেরেছিলুম। কিছুক্ষণ। তারপবই মনে হল, যে পিপাসা পেয়েছে তা মিটবার আগেই মবে যাবো। কিন্তু তখনই দেখলুম, যেমন বালকেরা মার খেতে খেতেও বড়দের অজান্তে বড়দের কাজকর্ম লক্ষ্য করে নেয়, অনেক ভারি ভারি মানুষে মিলে একজন খালিগায়ের মানুষকে নিয়ে আসছেন। গায়ের রং প্রায় গম রঙের, চোখে গোল চশমা, মস্ত বড় নাক, ছোট ধুতি। প্রথমেই দিদি। কী কাণ্ড। মালা কোথায়, এ কেমন মালা? কোথায় ফুল? সুতো, সুতোর লেছি, এত বড় যে দিদি সামলাতে পারছে না। অন্য অনেকে ফুলের মালা এনেছে বটে। তারা দিদির পিছনে। গান্ধিজী যেন থমকে গেলেন। হাসলেন। দিদির হাতের নাগাল পেতে মাথা নোয়ালেন, তা অনেকটাই নোয়াতে হল। গান্ধিজী অবাক হলেন সেই সুতোর লেছি গলায় পরে। তাবপব নিজের গলা থেকে মালা খুলে দিদিকে দিয়ে বললেন--পর, বহিন।

তাবপর আমরা পিছিয়ে গেলুম মাষ্টার মশাইদেব হেফাজতে। গান্ধিজী আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন। থৈ থৈ করছে মানুষের ভিড়। মেয়েরা আলুথালু ছুটছে তাঁর পা ছুঁতে।

কী কষ্টে যে বাড়িতে ফিরলুম।

এক সময়ে শুনেছিলুম বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করেছেন একটু অবাক হয়ে,—সাবিত্রী কি সুতো কাটে?

—কাটলেই হল কিনা, চরকা কোথায়? আর থাকলেই বা ওইটুকু মেয়েকে কে দিচ্ছে চরকা কাটতে? মা বললেন।

—তবে?

বাবা কোন দিনই খদ্দর পরতেন না. গান্ধিজী পাবনায় আসায় সেখানে কিছু খদ্দরের প্রচার হয়ে থাকবে। অতীতের বাড়িটার দিকে চেয়ে বাবার গায়ে সিল্কের গলাবন্ধ কোট দেখতে পাচ্ছি। গরদ রঙে নীলের চুল-চুল ষ্ট্রাইপ।

আর মাঝে মাঝে হঠাৎ একটু সুগন্ধ পাই, কর্পূর যেন। গান্ধিজীর দেয়া মালাটা ছোট ছিল, কর্পূর আর লবঙ্গের তৈরি এক রকমের কাঠি-হার!

তারপর গান্ধিজীর সঙ্গে একবারে যোগাযোগ নষ্ট হল। কারণ আমরা কোচবিহারে এলুম! সে এক মজার গল্প। একটা গোটা বুর্জুয়া পরিবার এক রাতে কি করে পেতিবুর্জুয়া হয়। বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়। কিংবা কথাটা হয়তো ফিউডাল থেকে পেতিবুর্জুয়া।

কোচবিহার তখন মজার দেশ ছিল। যতদুর মনে পড়ে কয়েক কপি দৈনিক বসুমতী আসতো,

আর ডাকে কয়েক কপি স্টেটস্‌ম্যান হয়তো, যুগান্তার, আন্দোবাজার ইত্যাদির ঢুকবার উপায় ছিল না। অবশ্য কাগজের অভাববোধও ছিল না। অন্তত আমাদের তো নয়ই, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবী ব্যাটবল (ক্রিকেট নয়) ফুটবল, বই, আর অঙ্কের তৈরি ছিল। পাঁচ হাজার বাসিন্দার এক শহর। কিংবা বলতে পারো শহর নয়, একটা পার্ক।

রবিবাবুর গান (তখন আমরা তাই বলতুম তাঁকে, এখনও অভ্যাসের দোষে গুরুদেব ইত্যাদি বলতে পারি না) ছিল। রবিবারে ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। অতুলপ্রসাদ আব দিজেন্দ্রলাল ছিলেন। কী আশ্চর্য, সেই বাসন্তী ব্লাউজ পরা আমার দিদির নাম পালটে মাধুরী হয়ে গেল।

কিন্তু একদিন দেখি খোপের ঘর থেকে খেলার গাড়ির মতো কী একটা বার হয়েছে। বিকেলে (বোধ হয় স্কুল একটু আগে ছুটি হয়েছিল) দেখলুম, দিদিমা বসে বসে সেই গাড়ির মতো জিনিসটার চাকা ঘোরাচ্ছেন। মুহূর্তে মনে হল এখানেই পৃথিবীর সব চাইতে বড় মজা। বইখাতা নিযে দিদিমার পাশে বসে পড়লুম।

সূচনার জন্য বললুম, কী এটা, কী করছেন?

দিদিমা বলেছিলেন, মন কাটছি।

দিদিমার কথার মানে পাওয়া কঠিন ছিল। যুক্ত অক্ষর প্রায় থাকতোই না তাঁর কথায় কিংবা লেখায়, কিন্তু মানে পাওয়া! মন, মোন, মণ, কী ওটা? দেখতুম, পুরনো দৈনিক বসুমতী ভিজিয়ে উড়ুন গানে (উদুখল) পিষে পেপিযাব ম্যাশে তৈবির চেষ্টা। এও তেমন। তুলো থেকে সুতো বার করার এই গাড়ি-খেলা পদ্ধতিটা বোধ হয মন কাটা।

কয়েক দিন পরে এক মজার কাণ্ড ঘটল। বোধ হয় তার নাম ভাদুড়ী। দিদিমার বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের বিবাম ছিল না। ভাদুড়ী নাকি গান করবে। হবে তাই, পড়া বন্ধ করার অনুমতি পাওয়া গেল। এদিক ওদিক দু একটা গান করেই ভাদুড়ী তার আসল গাম জুড়ল। 'ঘুর বে ঘুর, ঘুর রে আমাব সাদেব চোরকা ঘুর।' বেশ দাপটে গান চলছে। বলদর্পী তুপকামানের জুর টুটিয়ে ভাদুড়ীর আস্ফালন। হঠাৎ দেখি দিদিমা উঠে গেছেন।

পরদিন দিদিমা, শুনলুম, মাকে বলছেন, ওব বাড়ি ময়মনসিং হতে পাবে, আমার বাপের বাড়িও ফরিদপুর।

মা তিরস্কৃত হ'য়ে গম্ভীর হওয়াব চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে আঁচলে মুখ ঢেকে পালালেন। দিদিমা রান্না কবছিলেন সেদিকে ফিরলেন, কিন্তু হাসিব দমকে তাঁর পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছুদিনের জন্য আমাব ডাক নাম হ'লো বলদর্পী।

ভাদুড়ী আমাকে চরকা কাটার ব্যাপারটা বুঝিয়েছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু একালের ছাত্রদের মতো অত সহজে সব কিছু সহজ হতো না আমাদের কাছে। দিদিমার 'মন কাটার' মানে বুঝেছিলুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে, রবিবাবুকে 'গ্রেট সেন্টিনেল' বলে উল্লেখ করে, কেন তা বলা হল সে পরিচয় নিতে গিয়ে।

কিন্তু এই মন কাটার জন্য এক দিক ছিল। একখানা গায়ের চাদর (অসমান এবং অসুন্দর) তৈরি হয়েছিল দিদিমার এই মন কাটার ফলে। চাদরটা আমার কাছে নেই। কিন্তু দিদিমার লেখা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা আছে। মাঝে মাঝে চরকা কেটে সে রকম একখানা চাদরই হয়, মাঝে মাঝে উপন্যাস লিখলে এরকম একটা পাণ্ডুলিপিই হতে পারে। সখেদে প্রায় বিশ বছর পরে দিদিমাকে বলেছিলুম, কী লাভ হল? এত বেশি সংসাবে মন না দিলে 'নলিনী'র মতো উপন্যাস আরও দশটা হতে পারতো।

দিদিমা হাসলেন? চাপা পাতলা ঠোঁট ছিল তাঁর। বোঝা গেল না। চোখ দুটো স্নিগ্ধ হল। বললেন, লিখছো তো? যেন তাতেই হল, যেন আমার এক-আধখানা উপন্যাসের মধ্যে তাঁর 'নলিনী' এখনও

বেঁচে আছে, যেমন আমার মধ্যে তিনি।

এটা কি একটা ওয়ে অব্ লাইফ্; সেই মন-কাটা কখনও কখনও, একখানা উপন্যাস লিখে রাখা, পেপিয়ারম্যাশের গবেষণা করা? আর কিছুদিন পরেই এরই এক অন্যরূপ দেখেছিলুম। কিন্তু আগের কথা আগে।

তখনও স্কুল ছাড়িনি। তখনও আমাদের সেই পাঁচ হাজার জনসংখ্যার পার্ক-প্রতিম কোচবিহার শহরে পত্রিকা আসার অনুমতি দেয়া হয় নি। মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলুম। সেই আমাব প্রথম উপন্যাস লেখা এবং প্রথম এবং শেষ বিপ্লব। বন্ধু কালি অনেকগুলো হাতে-লেখা একসারসাইজ বুক দিচ্ছিল আর আমি তা থেকে নতুন একসারসাইজ বুকে নকল করেছিলুম, কিন্তু সে যেন নিজেরই লেখা, এমন ভাবে ব্রহ্মদেশ, গিরীশ মহাপাত্র, ভারতী, ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল।

মা টের পাচ্ছিলেন কিছু একটা ঘটেছে। ঘটছিলও বটে। আমাদের এক গোপন সভা বসেছিল। আর সেই সভায় একটা ব্রোশুর আসছিল। তাতে অনেক সিপিযা রঙের ফটো: বীর বালক টেগরা, এবং অন্যান্য অনেক হাফ-প্যান্ট-পরা মৃতদেহ, জালালাবাদ পাহাড়। প্রীতিলতা। বক্ত গরম হয়ে উঠছিল। মুখ চোখ ঝামরে গিয়ে থাকবে ঝলসানো পাতার মতো। মাস্টারদা, গণেশ, অনন্ত ইত্যাদির উত্তাপ তো কম নয়। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলুম ভারি মন নিয়ে, পবদিন সভায় কথা দিতে হবে, শপথ নিতে হবে। অন্যদিকে তখন সেই অবস্থা যখন মায়ের মনের নাভি থেকে আমার মন বিচ্ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণাভোগ করতে শুরু করেছে। অনেক রাত। লণ্ঠনের আলো কমিয়ে সেই আলোয় ব্রজেন আর সব্যসাচীর সম্মুখদ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠা নিয়ে লিখে চলেছি। মা এলেন।

কী হয়েছে? কই, কিছু না তো, বলে বই ঢাকতে গেলুম। কিন্তু তখনও মনদুটো পৃথক হয নি। বললুম, সভার কথা, টেগরার কথা, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতার কথা। তাদের দাবির কথা। বললুম, তোমাকে বলা ভাল হল না। মা অনেকক্ষণ শুনলেন। কাঁদলেন। চোখ মুছলেন। তাদের কথাই মনে হচ্ছিল তাঁর। একবাব প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ছবিগুলো পেলে কোথায়, কোথায় বা এমন বই ছাপা হল? তাবপর নিজেব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন—আমার কাছে গোপন করতে বলেছে? হাঁ। মা বললেন, যা গোপন করতে হয় তাই পাপ। যা প্রকাশ্যে বলে করা যায় না, তা অন্যায়। মহাত্মা গান্ধি কী বলেন তা খোঁজো। আগে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়লুম। পরদিন সকালে দেখলুম, পথের দাবির নকল, নতুন ও পুরনো সবই অন্তর্হিত। এখন অস্বীকার করাব উপায় নেই মনের উপর থেকে যেন পাথর সরে গিয়েছিল। ঠিক যেন সাজানো গল্প। এক সময়ে দিদিমা বললেন, জীবানন্দ, ভবানন্দর গল্প জানো? কই না। একটুখানি বললেন। ভারি মজা তো! হাতে পেলুম আলমারির চাবিটিকে। এতো দেখছি পথের দাবির চাইতেও—। আবিষ্কারের আনন্দে মশগুল হয়ে মাস দুতিন কেটে গেল।

তখন লেখকেব বক্তব্যের পিছনে লেখকের মনের দৈন্য খোঁজার উৎসাহ ছিল না। হঠাৎ একদিন মনে হল একেবারে শেষ পরিচ্ছেদ আবার পড়ে—তাইতো বটে, আগে পড়ো, তাই যেন বলছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নিজের কাজের, মনের সমর্থন পেলেম। আর তারপর হাতে এল অস্তু, এলার গল্প। আর তখন মনে হল আমার পথের দাবির কপি হারিয়ে যাওয়া সমর্থন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং স্পষ্ট অক্ষরে মহাত্মা গান্ধি।

কিন্তু আকাশে মেঘ দেখা দেবে—তাই স্বাভাবিক।

কী? পট্টভির পরাজয়, আমার পরাজয়। কী আশ্চর্য! গণতন্ত্র নয় কি? রাগে দুঃখে অভিমানে কোথায় তলিয়ে গেল মন। সুভাষের জয় জয় নয়? সেই অভিমানের কালে মনে হল, কাপুরুষ কাপুরুষ, সে জন্যই তোমার পথের দাবি হারিয়েছে। আসলে ভয়, গান্ধিজীর প্রভাব নয়।

অথচ আকাশে মেঘ না থাকাও স্বাভাবিক। খুব বেশি দিন যাওয়াব আগেই শুনতে পেলুম, করেঙ্গে

ইয়া মরেঙ্গে। শান্তস্নিগ্ধ শরতের আকাশে সে যেন এক আশ্বিনের ঝড়। এখন এই করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে সম্বন্ধে আমার চাইতে আর সকলেই ভালো বলতে পারেন। যথেষ্ট উত্তেজিত হলেও, গান্ধিজীর আকাশ থেকে ভয় সংগ্রহ করা অনিবার্য নয় এটা প্রমাণ হলে, আমার এমন অনুভব হল, করেঙ্গে বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন, বোঝা গেলো না। টেলিগ্রাফের খোঁটা উপড়ানো, রেলের ফিশপ্লেট সরানো ইত্যাদি ইত্যাদি কি গান্ধিজীর করেঙ্গে? না, সেই শীর্ণ কটিবস্ত্র-সম্বল মানুষটি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে যেতে পারেন নি। তা পারলেই তাঁর করেঙ্গে হতো। গোটা মহাদেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসতো। যুদ্ধ হতো না। এ অঞ্চলে যুদ্ধ থেমে যেতো। আর তা হয়নি বলেই চেইন রিঅ্যাকশনে ১৯৪৭ এল। গান্ধিজীর পরাজয় হল। ভারতবর্ষের কিছুটা স্বাধীন হল।

এ সবই পরে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আর একবার গান্ধিজীকে যেন নিজের পরিবাবের মধ্যে দেখতে পেলুম। দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভারি অবাক লেগে গেল। দেখলুম, শ্বশুরমশায় দুপুরের গরমে বসে চরকা কাটছেন। কী কাণ্ড! খোঁজ নিলুম। কংগ্রেসেব মেম্বর? না। অভযাশ্রম নাকি? দূর করো। অনুসন্ধানে জানা গেল, ১৯১৯-২০তে কলেজ ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন, ফলে কেরানী। তবে চরকা কেন? নিজের কাপড়েব সূতো নিজে কাটেন। লাভ? সেই থেকে, ১৯১৯-২০ থেকেই, কিন্তু তাতে লাভ কী? সে সূতোর লোহিত মালায় সাবিত্রী দিদির, আর দিদিমায়ের মন-কাটা চরকার কথা মনে পড়ল। কিন্তু এখন ইংরেজি জানি বলে মনে হল—ওয়ে অব লাইফ নাকি? আবার যেন কর্পূরেব সুবাসেব স্মৃতি দেখা দিল মনে।

কিন্তু তখনও গান্ধিজীর সম্পূর্ণ পবাজয় হয় নি। অর্থাৎ ১৯৪৭ আসে নি। ১৯৪৬-এ একটা কনট্র্যাষ্ট গান্ধিজীর এবং আমার। নবমী পুজোর রাত আততায়ীব সংঘবদ্ধ শক্তির মুখোমুখি বন্দুক এবং বুলেট নিয়ে কাটিয়ে দিয়ে পাবনা ছাড়লুম। পাবনা হারালুম আমি চিরকালের জন্য। পাবনা হারালুম, পদ্মা হারালুম।

আর গান্ধিজী হেঁটে গেলেন নোয়াখালি। আর কে পারে?

কিন্তু এই ভালো হল। রাজনৈতিক পরাজয় হল, তিনি ভারতবর্ষের নীলাকাশ হয়ে রইলেন। কত গভীর সেই নীল! নতুবা, হয়তো আমরা তাঁকে মন্ত্রীটন্ত্রী করে বসতুম।

আর এখনও সেই নীলাকাশ তেমনি নীল। মেলোভ্যান ডেইলাস সেদিন বলছিলেন: আমাদের ভেবে দেখা দরকার প্রেডাকশান ও মিনস অব প্রেডাকশানের কথা শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করে কি না। গান্ধিজীর জন্মশতবার্ষিকী পালন কবার কথাতেই এই উক্তি। যখন সব দেশেই এমন কি আফ্রিকার দেশগুলিও যথেষ্ট পণ্য উৎপাদন করবে, সবদেশের বহির্বাণিজ্যই যখন বেকায়দা হবে, তখন আমরা চরকা কাটার মন ফিরে পাবো। কারিগরকে শ্রমিক করার লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ, মানুষকে তার ডিগনিটি ফিরিয়ে দেয়ার এক উপায়, চরকা কাটা, এ রকম উপলব্ধি হবে।

নিউ ক্যালকাটা

শান্তনুই কেন্দ্রীয় চরিত্র ; নাকি নায়ক।

কিন্তু প্রথমে প্রবীর সাণ্ডেল সম্বন্ধে আমাদের কী ধারণা হয়েছে তা বলে রাখি। সে নাট্যকার, আমাদের স্বশ্রেণী। এ এক রকমের পক্ষপাতই বটে।

প্রবীরের কথায় ক্রিস্টমাসের রঙীন মোমবাতির ছবি মনে আসে। দোহারা আকৃতি। ত্বকের রং হালকা বাদামি। গম্বুজাকৃতি মাথার প্রায় সবটুকু জুড়ে টাক। নাকটা উঁচু, ভারি মুখেও বড় দেখায়। ঠোঁটদুটোর গড়ন নিখুঁত। চিবুকে কিছু গোটি, যার রুক্ষ কালো রঙে পাটকিলে সাদা আঁশ দেখা দিচ্ছে। পোশাকের দরুণ বোঝা যাচ্ছে না তার শরীর পেশীবহুল কিনা, কব্জি দেখে ধারণা হয় এক সময়ে ক্রিকেট অথবা টেনিসে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে অনুমান হয়, এই চল্লিশ বছরে তার কোমরের ক্ষীণতা লোপ পাচ্ছে, কিন্তু মেরুদণ্ডের দু পাশের পেশীগুলোতে, এ বয়সে যা সাধারণ, তেমন ক্লান্তি আসে নি।

বিশেষ মোটা ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করে সে। কিন্তু বাইফোকল হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে নাকের ওপবের চাইতে ববং তার হাতেই বেশি দেখতে পাওযা যায়। চটপটত্বের অভাবে এমন হতে পারে? দুপাশে দেরাজ, সামনে হোয়টনট বসানো নিচু একটা টেবল। তার ওপরে কাঠের টেবল ল্যাম্প। টেবল আর টেবল ল্যাম্পের রঙ কাঁচা কাঠের। টেবল ল্যাম্পের গোড়ায় একটা বই, তার ওপরে প্রবীরের চশমাটা ভাঁজ করে রাখা।

অদূরে একটা নিচু টেবলে দুটো টেলিফোন। একটি কালো, যেন মোষের শিং। আমরা জানি, এটার উল্লেখ ডাইরেক্টরিতে আছে। অন্যটি সাদা, দেখে যেন মনে হয় চেস্ট বিশেষজ্ঞের টেবলে রাখা স্কায়াগ্রাম দেখার যন্ত্র। প্রায় টেলিভিশনই যেন, শুধু পাশে ঝোলানো মাউথপিসটায় টেলিফোনের কথা মনে আসবে। এটা আনলিস্টেড অর্থাৎ ডাইরেক্টরিতে উল্লেখ নেই। বন্ধুবান্ধব অবশ্যই জানে। কথা বলার সময়ে পর্দায় বন্ধুবান্ধবকে দেখাও যায়। তা, এটা প্রবীরের মতো একজনের পক্ষে বেশ বড়ই। (প্রবীর তো টেকনোক্র্যাটদের একজন নয়।) এ থেকে কারো কারো ধারণা, এটা বসানোর মূলে, কথা বলার সময়ে সুরথের ফ্যামিলি সার্কেলের অনেকটা দেখার সুবিধা হওয়া। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ওপরের তীর-আঁকা ডায়ালটা ঘুরিয়ে না দিলে এটাও ছবিহীন একটা দূরভাষী যন্ত্র মাত্র। ইচ্ছা না করলে তোমার বন্ধুকে তুমি দেখতে বা দেখা দিতে না পারো। তোমার ছবিও ওদিকের পর্দায় না ফুটতে পারে। নতুবা মনে করো, রাত দুটোয় বেলা সোমকে প্রবীর ফোনে ডেকেছে যখন হয়তো বেলা তার শোবার ঘরে, তখন এই ফোশন (টেলিফোন + টেলিভিশন = ফোনশন = ফোশন) কতটুকু শোবার ঘরের ধরবে, তা ঠিক করার স্বাধীনতা বেলার থাকা উচিত।

এখন বেলা নটা তো বটেই। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘরে টেবল থেকে দূরের অংশে জানালায় আসা দিনের আলো থাকলেও বই পড়ার জন্যে টেবল ল্যাম্পটা জ্বলছে। এটা রুচির কথা, প্রবীর টেবলের পাশের জানালাটা কদাচিৎ খোলে। দিনের স্মগ-চোঁয়ানো ম্যাটমেটে আলোর চাইতে কৃত্রিম আলোর মধ্যরাত্রির অনুভূতি লেখাপড়ার পক্ষে লাগসই মনে করে সে। মৃদু আলোয় ঘরটা এখন ঝিকমিক করছে। কিন্তু প্রবীর কোথায়?

টেবল থেকে খানিকটা সরে গিয়ে সোফাটার পেছনে, ঘরের সেই অংশে বিছানো রাগটার ওপর

দাঁড়িয়ে আছে। যেন স্টান্স, যোগারূঢ। তার পায়েব স্লিপাবটা বিশেষ সৌখীন। তার ট্রাউজার্সের রং চাঁপা ফুলের, তার পরনেব নাইটগাউন কমলা রঙের।

প্রবীর সাণ্ডেলের একটা ডাকনাম কিছুদিন আগেও তার বন্ধুমহলে চালু ছিল। ত্রিশ বছর বয়সেই এটাকে সে অর্জন করেছিল। তাকে শোপেনহর টু (দি সেকেন্ডের রসজনিত বিকৃতি) বলা হতো।

মদকে যারা ঘৃণা কবে প্রবীর তাদের সম্বন্ধে মিষ্টি কথা বলে না। কিন্তু তার নিজের কিছু কড়া বক্তব্য আছে। হুইস্কি, আবসাঁৎ ইত্যাদি যা কিছু দ্রাক্ষাজাত নয়, তার ওপর তার সবিশেষ অবজ্ঞার ভাব আছে। অথচ পোর্ট, ক্ল্যারেট ইত্যাদি ইত্যাদিতে, বিশেষ করে নৈশভোজনের পর, তার তৎপরতাও লক্ষণীয়। সেটাই বরং তাকে মুখর করে, সেই তৎপরতা। আর তখন সে যে শব্দ নিয়ে কারবার করে থাকে, শব্দেব কারবারী হিসাবেই সে যে সমাজে পরিচিত, তা বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায়, তাব মাথার গম্বুজাকৃতি গড়নটা তার কিছু কিছু অশান্তির কারণ হয়ে আছে।

শ্যাম্পেনে আকণ্ঠ-নিষিক্ত প্রবীব মৃত্যুর কথা উত্থাপন করতে পারে। হ্যাঁ, মৃত্যুই, তার চাইতে কম কিছু নয়, সেই শেষ হয়ে যাওয়া, সেই সীমান্ত, যেখান থেকে আব কেউ ফেরে না। এরকম এক সন্ধ্যায় তার বান্ধবী বেলা টেবলের তলায় তার শিনবোনে জুতোর ডগা ঠুকে দিয়েছিল , কিন্তু প্রবীব তাতে বরং তার বক্তব্যের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যাওযার অনুপ্রেরণা পায। সে সেকসের কথায় চলে এসেছিল। অক্লেশে বিনা দ্বিধায় বলেছিল--আব সেকসেও মৃত্যুর প্রতিকার নেই, প্রতিষেধ নেই। বরং, হে নবনারী, সেকস মৃত্যুর প্রথম পদসঞ্চাব। তোমাব বৃদ্ধি থেমে গেল, ক্ষয শুরু হল, সেকসের ব্যাপাবে জেগে ওঠার, যৌবন লাভের, ওই একটি অর্থই হতে পাবে। বলো, শোপেনহর নয়?

ইদানীং তার ডাকনামটা বদলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বঙ পছন্দের ব্যাপারে মত বদলই তার কাবণ। মেরুন, স্টীল ব্লু, ইত্যাদি রঙেব ওপর ঝোঁক ছিল তার ; এখন বাদামির নানা শেড থেকে কমলা রং পর্যন্ত তার পছন্দের সীমা। তার ফ্রককোট ব্রাউন রঙের, তা গ্যাবার্ডিন কিম্বা সার্জ হোক। আবো লক্ষণীয়, কখনও কখনও তার কোটের ঝুল এত লম্বা হচ্ছে যে তাকে ফ্রককোট না বলে ফ্রক বলার ঝোঁক দেখা দিলে অন্যায় হয় না। এরই সঙ্গে তাব মস্ত বড় টাকটার কথা মনে রাখতে হবে। তাব বন্ধুমহলে এখন তাকে ফ্রায়ার বলা হয়ে থাকে। কেউ ফাদার বললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ফ্রায়ার টাক। রঙ পছন্দ বাহ্য। সাদা মাংসের পুডিং এবং ক্ল্যারেটের ওপরে তাব এক ধরনের আকর্ষণ, নারী সম্বন্ধে একরকমের করুণামিশ্রিত শৈত্য, এবং মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতনতা তার এই ডাকনামটা স্থায়ী করবে বলে মনে হচ্ছে। ববিনহুডের গল্পের ফ্রায়ার টাক।

তিন কামরার এই ফ্ল্যাটে সে বাস করছে দশ বছরের ওপরে। অকৃতদার পুরুষের সংসার, যদি অধিকাংশ দিনের লাঞ্চ ও ডিনার হোটেলে অথবা ক্লাবে খাওয়াকে সংসার বলা হয়। সুন্দরী পাঠিকা, আপনাব সাজানো গোছানো মনে প্রবীরেব ব্রেকফাস্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। আপনার কৌতূহল নিরসনের জন্য বলতে পারি, এই ফ্ল্যাট-সমষ্টির তত্ত্বাবধায়ক একজন অবসর প্রাপ্ত হোটেল স্টুয়ার্ড। ডিম, হ্যাম এবং মিষ্টি কফির ব্রেকফাস্ট সেই ঢাকা ট্রেতে প্রবীরের ঘরে পৌঁছে দেয়। দরকার হলে লাঞ্চ এবং ডিনারও।

কথাটা যখন উঠল, তখন ফ্ল্যাট সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা যায়, এটাকে সিনেমাসঙ্কুল পল্লী বলা যেতে পারে। এই ব্লকের ফ্ল্যাটগুলোর অধিকাংশে, ধারে-কাছের ব্লকগুলোর অনেকাংশে, সিনেমার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বাস করে থাকে। সিনারিও লেখক, উঠতি ডাইরেক্টর, অভিনেতা. টেকনিসিয়ান, অভিনেত্রী।

কিন্তু প্রবীর নাট্যকার বলেই তার দিকে আমাদের পক্ষপাত। সুতরাং তার নাটকের কথা কিছু বলা যেতে পারে। পনের দিন হল, রেনেশাঁ থিয়েটারে সুরথ সোমের প্রযোজনায় তার নতুন নাটক

'সোনালী চামড়া' অভিনীত হচ্ছে।

রেনেশাঁ যেখানে অবস্থিত তাকে থিয়েটারপাড়া বলা হয়। নামটা সেকেলে হলেও আমরা বদলাতে পারি না। এই থিয়েটারে সুরথ সোম এবং তার মতো আর দুএকজন নাটক প্রযোজনা করে থাকে। অল্প সময়েই রেনেশাঁ ঐতিহ্য সঞ্চয় করেছে। সে ঐতিহ্যের একটা উপাদান এই যে মাঝে মাঝে এটির দরজা বন্ধ থাকবে। এবাবও সোনালী চামড়া উপলক্ষে খোলার আগে লোকে ভাবতে সুরু করেছিল, এবার বাড়িটায় একটা ডিপার্টমেন্ট-স্টোর বসবে।

থিয়েটার সম্বন্ধে কি তবে জনগণ উদাসীন? বরং বলা উচিত নাটক, যাকে আর্ট থিয়েটার বলা হয়, তার সম্বন্ধে জনগণের উৎসাহ কালোচিত ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। এই পাড়াতে, এই রাস্তাতেই একাধিক নাট্যগৃহ আছে সেখানে একই নাটক সাফল্যের সঙ্গে শত রজনী অভিনীত হচ্ছে।

বেনেশাঁ সম্বন্ধে শেষ কথা এখন বলা যাচ্ছে না। প্রবীরের বান্ধবী এবং সুবথ সোমের স্ত্রী বেলার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বেলা বলেছে, এক ধরনের ক্ষণজীবী সাহিত্যপত্রিকা আছে, ব্যবসায় মাব খেয়ে যা উঠে যায়, জীবিতকালে যাকে, আয়তনে পুষ্ট, বেশভূষায় উজ্জ্বল অন্য পত্রিকাগুলোর পাশে অন্ত্যজ বলে মনে হয়। থিয়েটারের মধ্যে রেনেশাঁ সেই সব ক্ষণজীবী পত্রিকার উপমেয়। অথচ একই রাস্তার ওপরে নীল, সোনালী, সিঁদুরে, এনামেলে রঙীন, আলো ঝলমল নাট্যগৃহগুলোকে দেখতে পাবেন। বিশ বছর আগে যে আধুনিকতা গত হয়েছে তারই রকম-সকম কী করে ব্যবসাতে লাগানো যায়, তাও দেখতে পাবেন সেখানে।

এই জায়গায় সুরথ সোম প্রশ্ন করেছিল, বিশ বছর? ঠিক বিশ বছরই কি?

বেলা বলল, এ বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? চলতি ভাষায় যাকে আমরা সার্থক নাট্যগৃহ বলি কিম্বা সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যপত্রিকা তারা ঠিক বিশ বছরের পুরনো জিনিসের কারবার করে কিনা? তা হলে, আমার মনে হয়, মতদ্বৈধতায় না গিয়ে জিনিসগুলো দুই দশকের দু-পাঁচ বছর বেশি পুরনো হওয়াও অসম্ভব নয়—এটা মেনে নেয়াই ভালো।

রেনেশাঁতে সুরথ সোম পরীক্ষামূলক নাটক নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রযোজনা করে থাকে। সুরথ কতখানি অ্যাটর্নি, আর কতখানি নাট্যপ্রযোজক, এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তার সমালোচকরা তা করেও থাকে। সুরথ এক সময় বলেছিল—তার শরীরটা ছফিটের ইঞ্চি তিনেক কম হলেই সারা জীবন সে অভিনয় করে কাটিয়ে দিতো। দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সার্থক অ্যাটর্নি ব্যবসার চাইতে নাটক-প্রযোজনাকে সে কম মূল্যবান মনে করে না।

সুরথের বন্ধুরা প্রচার করে, প্রযোজনার ব্যাপারে সে বিশিষ্ট এবং স্বাশ্রয়ী। তার চোখে ছন্দের বাহুল্য যেমন কাব্যের, জমানো প্লট যেমন উপন্যাসের, মঞ্চসজ্জার পারিপাট্যও তেমন নাটকের পক্ষে অশ্লীল। এমন নানা মত সে প্রযোগ করে থাকে। সব মিলে তার উদ্যোগ এখনও পরীক্ষামূলক। প্রবীর কয়েকজন প্রযোজক নিযে পরীক্ষা করার পর স্থির করেছে অতঃপর তাব নাটক সুরথের দ্বারাই প্রযুক্ত হবে।

ব্রেকফাস্টের পরে চুরুট জ্বালিয়েছে প্রবীর।

এখন কী করবে সে? বই খুলেছিল দেখা যাচ্ছে।

আজ তৃতীয় সপ্তাহের শুরু তার নাটকের। কাল সুরথ বলেছিল : নবজাতক নিয়ে ছদিন পরে, পনের দিন পরে উৎসব করার প্রথা ছিল, তোমার নাটক তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করছে, একটা উৎসব করা যায় ; কিছু পরিবর্তন চিন্তা করছো কি?

প্রথম রজনীর পর নাটককে পরিমার্জিত করার অধিকার অবশ্যই লেখকেরা কাজে লাগিয়ে থাকে।

তার জন্যে নাট্যকারের পক্ষে নোটস নেয়াও স্বাভাবিক। সুরথের কথা মনে রেখে টেবলের কাছে ফিরে গিয়ে নোটবুকটাকে তুলে নিয়ে প্রথম অভিনয়ের তারিখের নিচে লেখা নোটসগুলোতে চোখ বুলাল প্রবীর। নোটসগুলো পড়ে পড়ে কিছুক্ষণ চিন্তাও করল সে।

তৃতীয় অঙ্কর পরের সেই লম্বা বিরতিটা তার পছন্দ হয় নি। তখন থিয়েটার-লাগোয়া বারে উঠে গিয়েছিল অনেকে, ফয়েতে স্মোকিং বেঞ্চগুলোতে ভিড় জমিয়েছিল, হলে যারা ছিল এ বক্স থেকে ও বক্সে যাওয়া আসা করে শিষ্টাচার বিনিময়, ব্যবসার আলাপের এমন কি সামাজিক পরিচয়ের সূত্রপাত করছিল। এই বিরতি, কাজের চাপে ব্যস্তসমস্ত প্রেস-গ্যালারির মতেও, অপ্রয়োজনের। আর নাটকে যা অপ্রয়োজনের, যা কিছু আলগা তাই ক্ষতিকর।

প্রেস-গ্যালারির মত, হ্যাঁ, তা অবশ্য, দেখা যাচ্ছে প্রথম অভিনয়ের পরে খবরের কাগজে যে রিভ্যু থাকে সেটাই পরবর্তী কালে নাটকের সমালোচনায় ব্যবহার করা হয়। রদবদল করে সমালোচকরা সেই মতেরই অনুবর্তন করে চলে। নতুবা নতুন করে নাটকটাকে পড়তে হয়, অভিনয় দেখতে হয়। আর এই অনুবর্তন ত্রিশ বছর চলতে পারে—সাধারণত যা একটা নাটকের জীবিতকাল।

কিন্তু মঞ্চসজ্জার বারো ফিট উঁচু স্টিল-ব্লু ব্যাকড্রপ যেমন, এই বিরতিও তেমন সুরথের পরিকল্পনার অংশ। ব্যাকড্রপটা এরকম একটা অনুভূতি আনে যে আমরা আমাদের উল্লম্ফন এবং উচ্চিৎকার সত্ত্বেও সবটুকু ভরে ফেলতে পারি না, কাল এবং পরিব্যাপ্তির তুলনায়, অনেক ফাঁকা। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথমে সেই মঞ্চ জুড়ে, গোটা দৃশ্যটা জুড়ে যে এক জোড়া ছেঁড়া বুট তেমাথার গাছতলায় অবস্থান করে, যেন তা নায়কের মুখের ক্লোজ-আপ? তখন?

নোট খাতার পাতা উল্টোতে উল্টোতে প্রবীরের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দিন সাতেক আগেকার একটা তারিখের নিচে কিছু নোটস। কিন্তু তাব নিচে দুটো পাতার অনেকটা জুড়ে একটা স্কেচ আঁকা।

নোটস কিছু নেয়া আছে। সর্বোত্তম চেষ্টাকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা নাট্যকারের কর্তব্যও বটে। কিন্তু স্কেচ-সমেত নোটসগুলোকে চোখের সামনে রেখে প্রবীর ঠিক করল, নাটকে নতুন কিছু লেখবার নেই।

স্কেচটা বরং মনে করিয়ে দিল, সেদিন গম্ভীর মুখে নোটস নিতে বসে প্রকৃতপক্ষে সুরথের বক্সটাকে হালকা-হালকা টানে স্কেচ করেছিল প্রবীর। সুরথের মাথার পেছন দিকটা মুখের একটা পাশসমেত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঝুঁটিদার, খুবই ঝুঁটিদার মনে হচ্ছে সুরথের ভঙ্গিটাকে। হারেমে রাজকীয় টার্কির মতোই। হয়তো তখন নিজের প্রশংসা নিজের হারেমে উচ্চারিত হতে শুনে সে তৃপ্তি ভোগ করছে।

আর তা স্বাভাবিকও, কারণ সুরথের বক্সে, স্কেচই প্রমাণ, সেদিন বেলা ছাড়াও অন্য দুটি মহিলা ছিল। কিন্তু বেলা এই মহিলাদের সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় করিয়ে দেয় নি। এটা একটু সামাজিক বিচ্যুতি হল না? কিম্বা ভুল? এমন নয় যে সুরথের বক্সে রোজ সে সপরিবারে থাকছে! খুব সম্ভব, এই অন্য দুটি মহিলার কোন একজনের জন্যই বেলার থিয়েটারে আসা। সাধারণ দর্শক নয়, নাট্যকাবের বন্ধু যে প্রযোজক তারই অতিথি। ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর একজন।

আচ্ছা, আ, আচ্ছা ; বরং সে এখন বেরিয়ে পড়তে পারে। কিছু করার নেই এখন।

বেলার বাড়িতে যাওয়া যায়। তাকে এখন বাড়িতে পাওয়ারই কথা। সুরথ তার দপ্তরে চলে যাওয়ার পর থেকে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত বেলা বই পড়ে, ছেলেমেয়েদের তত্ত্ব-তল্লাশ করে।

পরনে হয়তো সেমিজের ওপরে চওড়াপাড় ইস্তিরি-লেপটানো শাড়ি, কানে সম্ভবত বড় একজোড়া দুল। এই পোশাকেই বেলা তার স্বকীয়তায় জাগে এরকম ধারণা প্রবীরের। এটার অন্যদিক এই, ধারণাটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে বেলাকে এই পোশাকে দেখার পরেই, কারণ এই পোশাকে বেলার

শরীরের ঢিলে ভাবটা ফুটে ওঠে, চওড়া পেট, ভারি পাছা, মোটা বুক, স্নিগ্ধ, আয়ত, ধীর চোখ, নাকের পাশে কিছু মেছেতার দাগ যা অন্য সময়ে পাউডারে মিলিয়ে যায়। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তখন তার দুটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে দেখে মনে হয় না, সেই তিনটি আধুনিক, মাজা, স্ট্রিমলাইনড শরীর এই শরীর থেকে উঠেছে।

উপরন্তু, এ সময়ে বেলার সেলাইয়েব টুকরি-রাখা টেবলটার পাশে অনায়াসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসা যায়। যে বেয়ারা দরজা থেকে বেলার কাছাকাছি পৌঁছে দেবে, তাকেই বলে দেয়া যায় এক কাপ কফি পাঠাতে। তাতে বড় জোর বেলার মুখের দিকে তাকাবে বেয়ারা, আর তুমি যদি দেখতে জানো, দেখবে, বড় জোর ইঞ্চিখানেক মাথাটা নোয়াল বেলা আর তা যেন সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতেই। কফি আসবার আগেই চেয়ারটাকে বেলার কনুইয়ের কাছে টেনে নিয়ে নিজের যে কোন সমস্যার কথা তাকে বলা যায়। তখন অবশ্যই তাকে সুন্দরী বলা চলে না। হয়তো বেলার শাড়ি থেকে একটা মৃদু সুগন্ধির ইশারা পাবে। কিন্তু তাতে সুবথের বিশেষ একটা সুগন্ধির দিকে ঝোঁকটা ছাড়া আর কিছু প্রমাণ হয না। এ সময়ে মনে হবে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চাইতে অন্যের সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর নেয়াতেই বেলার ঝোঁক।

এখন তাকে দেখে মনে হয় না এক সময়ে সে খানকয়েক বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ করেছিল, অন্তত মোরাভিয়া নামে এক ঔপন্যাসিকের দুখানার অনুবাদ পর পর সার্থক বলে মানা হয়েছিল। বিদেশি সাহিত্যের সার্থক অনুবাদ, রসগ্রহণের ক্ষমতা, ভাষার ওপরে দখল, সাহিত্যে লাগবার মতো রুচি ইত্যাদি প্রমাণ করে। নিছক সাহিত্যকর্মই কারো অস্তিত্বকে শাণিত করে তুলতে পারে। মোরাভিয়ার উপন্যাসগুলিকে তখনও সমাজের একাংশ অশ্লীল বলতো, তার ফলে বেলার সাহিত্যকর্ম তাকে অত্যন্ত ধারালো কবে দেখাতো। সুতরাং নিজের সমাজেও সে দূরস্থিত, আকর্ষণীয় একটি চকচকে মেয়ে হয়ে উঠেছিল।

পুবনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডক্টরেট এই বলেছে যে মোরাভিয়ার সেই অনাবৃত সেকস-চর্চা বাংলা সাহিত্যে এনে, বেলা সোম বাংলা থেকে রানি বউদি, হাসি দিদি এবং উদ্বাস্তু মেয়েদের ছিঁচকে সেকস-চর্চাকে তাড়াতে সাহায্য করেছিল। অবশ্য সেই থিসিস তুমি বাজারে কিনতে পাবে না। আর তা নাকি সুরথেব টাকায় একবারই ছাপা হয়।

পোশাক পালটাল প্রবীর।

এই ফ্ল্যাটগুলোর একটা সুবিধা আছে। ট্যাক্সির জন্য ভাড়াটেদের বিব্রত হতে হয় না। নিচতলায় গ্যারাজ। ব্লকের মালিক গাড়ির যোগান দিয়ে থাকে। প্রাইভেট কারের মতো দেখতে এই গাড়িগুলো।

একতলার গ্যারাজে তার পছন্দসই সিঁদুর রঙের বুইকটাকে পেল প্রবীর। তারিখ আর সময় লিখে মেকানিক লগবুক এগিয়ে ধরল।

এখানে একটু দেরি করল প্রবীর। তেলকালিমাখা গ্যারাজের এই মানুষগুলো সম্বন্ধে তার কিছু দুর্বলতা আছে। এদেব সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলে সে। এরাও ভঙ্গিটাকে জেনে ফেলেছে। তার ফলে যন্ত্র সম্বন্ধে প্রবীরকে চমকে দেয়াব, অবাক করে দেয়ার, টেকনিক্যাল ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রমাণ করার কোন সুযোগই তারা ছাড়ে না। প্রবীব তখন যে কথাগুলো বলে তার ইডিয়ম ইংরেজি: না! অথবা, তুমি এ রকম বলছো না! অথবা, তুমি বলছো!

হাতে এখন অনেক সময়। বেলা একটা পর্যন্ত। তখন লাঞ্চ। বিশেষ মৃদুগতিতে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে পথে নামল প্রবীর। দিনটা ঝকঝকে। রোদটা বরং কড়া হবে। প্রবীর অনুভব করল তা হলে তার ভাল লাগবে।

নোটসগুলোর কোন কোনটা এই সময়ে আর একবার মনে এল, দু-পাঁচ মিনিট মনের মধ্যে ঘুরল, কিন্তু সেটা সত্যিকারের লেখার ক্ষুধা নয়।

এ পাশ ও পাশের দ্রুতগামী গাড়িগুলো অফিসের দিকে ছুটছে তা বোঝা যায়। তুলনার প্রবীরের গাড়িটা গুড়গুড় করে গড়িয়ে চলেছে।

আর একঘণ্টা বাদে হলে কারো অফিসে গিয়ে দু দশ মিনিট কাটিয়ে আসা যেতো। এরকম আড্ডা ভালোও লাগে প্রবীরের। যখন ভারিগোছের কোনো বুরোক্র্যাটের গাম্ভীর্য প্রবীরের অস্থানোচিত হালকামিতে কাঁটা হয়ে উঠতে থাকে।

এখন সঙ্গী পাওয়ার সময়ই নয়। অথবা সঙ্গী পেতে হলে তাকে সিনারিও-লেখক, অভিনেতা, প্রযোজক বা তেমন কাউকে খুঁজে বার করতে হবে।

একটা ক্লাব আছে বটে জকিদের। ঠিক এই সময়ে তারা সেখানে স্নুকার খেলে থাকে। সেকালের ধর্মের গোঁড়ামিও এ বিষয়ে তাদের রীতি-নীতির গোঁড়ামির কাছে হার মানে। প্রবীর নিজে একবার দীর্ঘস্থায়ী আলগা সময়েব চাপে আবিষ্কার করেছিল এই ক্লাবটাকে।

নতুবা, একটা টাই অথবা চোখে লাগা একটা কিছু কেনার সুযোগে নিউ মার্কেটেব দোকানে দোকানে ঘুরে সময় কাটিয়ে দিতে পাবে।

একটা দোকানেব সামনে গাড়ি থামাল সে। অনুভব করল কিছু একটা কিনলেও হয। এক বাক্স চুরুট কিনল সে। দোকানের সেলসম্যান মুখ চেনা। কাউন্টাবে কনুই বেখে দাঁড়িযে প্রবীব নতুন কী কী সংগ্রহ এসেছে তাব খবর নিল। কিন্তু কতক্ষণই বা তেমন খবব দেয়ার থাকে? চোরা চোখে ঘড়িটা দেখল সে। আধ ঘণ্টা কেটেছে।

এতক্ষণ তো সে পুবদিকে এসেছে, এবাব দক্ষিণে গেলে হয।

আর মিনিট দশেকের পরে একটা পাবলিক বুথেব সামনে গাডি থামাল প্রবীর। রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ চওড়া সিঁড়ি। মোটা মোটা পলতোলা থাম। সেগুলোর মাথায় একটা প্রকাণ্ড সমবাহু ত্রিভুজ। ছবিতে দেখা কোন বিখ্যাত স্মৃতিমন্দিবের ছাপ আছে, প্রবীবেব মনে হল।

কিন্তু পাবলিক বুথ তো! স্লটে পয়সা ফেলে ডায়াল কবল প্রবীর।

তুমি প্রবীব তো? কোথায়?

পথে, পাবলিক বুথে।

সে কী! বিপদ নয তো? আসবো?

না, না। আদৌ না। ধাবে কাছে কোন বিপদ নেই! না, বেলা।

টেলিফোনে ভাসা কণ্ঠস্বরে কথার সেই সূক্ষ্ম আঁশগুলোকে লক্ষ্য করা যায না, যা চোখে মুখে উজ্জ্বলতার তারতম্যে ধরা পড়ে। বেলা কি নিরাশ হল?

বেলা বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, বলো তো কী, কী করছো তবে ওখানে।

কিছু না, একেবারেই কিছু না। ঘুরছি একটু। স্বাস্থ্যের পক্ষে—তুমিই বলেছিলে।

এখানে এসো না হয়।

কাল, আচ্ছা আজই অন্য এক সময়ে।

ফোনটাকে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে প্রবীর বলল, তোমার কী ধারণা হয়, বেলা, কোথায় যাওয়া যায় এখন?

পীযূষ মিত্রের কাছে যাবে?

পীযূষ পি, ইউ, পাগ পাস্-ম ম্ ম্, অর্থাৎ...তুমি বলছো।

পীযূষ মিত্র একজন সিনারিও-লেখক খুঁজে হয়রান হচ্ছে। আর তুমি যদি একবার এদিকে মন দাও! তোমার চেষ্টা সত্ত্বেও আর গোপন নেই যে কয়েকটি স্ক্রিপ্টে তোমার হাত আছে।

মানে—

তুমি পীযূষকে পাগ আর পাস বলেছো বটে।

দেখো শব্দ দুটো ইংরেজি। লিখতে পি আর ইউ লাগে।

পীযূষ শব্দটা ইংরেজিতে লিখতে তা লাগে বলেই তোমার মনে এসে থাকবে। আর তার নাম সইতে ও দুটো অক্ষর স্পষ্ট। কিন্তু—

না, না, বেলা। আমার সময় বেশ কাটছে। তুমি নিজেকে এমন অকেজো লোক মনে করো কেন যে সময় কাটছে না বলেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি? আচ্ছা, তুমি বলতে পারো ব্যারোক প্রদর্শনীর কী হয়েছে?

ব্যারোক—

হ্যাঁ, ব্যারোক।

তুমি ঠিক জানো ব্যারোক?

তাই শুনেছি।

আমি জানি না।...কিছু একটা হচ্ছে বটে। সে তো পুরনো চৌরঙ্গীর কাছে। যোগাড়যন্ত্র চলছে। ছবি-টবি ঝোলাচ্ছে। বোধ হয় আসছে সপ্তাহে খুলবে। কিন্তু পীযূষ কয়েকদিন আগে তোমার উল্লেখ করছিল। প্রস্তাবটাকে ভেবে দেখো। আমি শুনেছি চেক নিয়ে কোন হুজ্জুৎ করে না সে।

না, না। একশো বার। ওটা কিছু নয়। নিশ্চয় আমি চিন্তা করবো।

রিসিভারটাকে ঝুলিয়ে রেখে প্রবীর নেমে এল। ব্যারোকো...বড় বদখৎ মুক্তো. মাইকেল এঞ্জেলো প্রথম...এটা এখন আর গোপন নেই কোন কোন সিনেমা স্ক্রিপ্টের সঙ্গে সে যুক্ত। পীযূষ মিত্রের. হয়তো কথাটা ঠিকই যে পীযূষ মিত্র চেক নিয়ে হুজ্জুৎ করে না, যা আর কোন কোন সিনেমা ডাইরেক্টর করে থাকে। আর এ রকম একটা কথাও আছে, পীযূষ সিংহ বটে উপরন্তু কিছুটা ধোঁয়া-ওঠা, কিছুটা ক্ষুধার্ত। ইতিমধ্যে একটা অসমাপ্ত সিনেমার সঙ্গে তার নাম যুক্ত হয়েছে। এটা কি সত্য নয় যে বর্তমান কালে সৎ মানুষের পক্ষে কোন মহৎ আর্টকে সমাপ্ত করা সম্ভব নয়? কিন্তু প্রবীর নিজের ওপরে খুশি হয়ে উঠল। সুন্দর পেরেছে সে, সিনারিও লেখকদের ভাষায়, ম্যানেজ করতে। এই কায়দাটাকে অভ্যাসে এনে ফেলতে হবে। অভ্যাস মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব। বোধ হয় তখন বেলার এমন সব অনুরোধের সামনে কপালে বিনবিন করে ঘাম ফুটবে না। বেলার মুডের সম্বন্ধে না জেনে তাকে ফোন করা সব সময়ে নিরাপদ নয়।

কিন্তু চেক একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বেলার পক্ষ থেকে এ রকম যুক্তি উঠবে, ধরে নেয়া যায়, সাধারণত পুরুষমাত্রই নিজের মঙ্গল অমঙ্গল সম্বন্ধে অজ্ঞ। বেলা জানে, সংসারের ব্যাপারে পুরুষ হুঁ হাঁ করা ছাড়া আর যা কিছু করতে যায় তাতে বিড়ম্বনাই বাড়ে। প্রকৃতিই তৎপরা, পুরুষ দর্শক মাত্র। নিজের সংসারের এই সারাৎসার তত্ত্ব উপলব্ধি করেই সেকালের দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন।

এ চিন্তাটা অথবা এ ধরনের চিন্তাগুলো বেলা সব স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সমান ভাবেই করে থাকে। কিন্তু বিশেষ ধরনের চিন্তাও আছে, যেটা স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ করে, যখন তারা কোন পুরুষকে সমাজের কেজো সদস্য হিসাবেও দেখতে চায়।

সমাজে চেকবহুল কেজো সদস্য হিসাবে দেখা দিতে হলে প্রবীরের পক্ষে পীযূষ মিত্রের হয়ে সিনারিও লিখে দেয়াটা প্রয়োজনের চাইতে বেশি, বলা উচিত, স্বাভাবিক। প্রবীরের পক্ষে এজন্যে, যে চল্লিশ বছরের দাগ পার হওয়ার পরে সে এখন কি দপ্তরে গিয়ে বসতে পারবে আর? আর পীযূষ যখন নিজে থেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে পীযূষ সেই রকম একজন সিনেমা প্রযোজক যে চেক সম্বন্ধে হুজ্জুৎ করে না, এবং রোঁদ্যা, মিয়ান্দানির মতো মহৎ না হলেও, তাকেও সিংহ বলার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

বেলা এতগুলো শব্দে বলে নি, কিন্তু প্রবীর অনুভব করল, বেলা এর পরে যখন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে

কোন ডিনার টেবলের আড়াআড়ি তার দিকে তাকাবে তখন এই কথাগুলোই সেই বিষণ্ণতার তাৎপর্য হবে।

কথাটা টাকাপয়সার। সোজাসুজি বলে দিতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু একবার বলে নিতে পারলে সুবিধা আছে। অনেক সঙ্কট এড়ানো যায়, ভান কবার দরকার কমতে থাকে।

আর্ট থিয়েটারকে অবলম্বন করেই কেউ কেউ প্রফেশনের সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে। প্রবীরের বেলায় তা হচ্ছে না। অন্যদিকে নিয়মিত সিনারিও লেখবার কমিশন নিলে প্রবীরের আয় দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছতে পাবে। এরই সঙ্গে মনে করতে হবে পীযূষ খাঁটি, 'রিয়েল', রোঁয়া-ওঠা সিংহ যে চেক নিয়ে হুজ্জুৎ করে না।

এটা কি একটা সিটুএশন, যাতে প্রবীরের চরিত্র ধরা পড়বে?

প্রবীর সাগুেল লিখে থাকে। কেউ কেউ বলে তার লেখবার একটা আলগা স্টাইল আছে। তার এই স্টাইলকে ইতিমধ্যে নকল করতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেসব নকলে যথেষ্ট আলগা ভাব থাকলেও কী যেন একটা থাকে না যা থেকে বোঝা যায় সেটা প্রবীরের নয়। দু একজন সাহিত্য-সমালোচক আচমকা এমন উক্তি করেছে যে ইতিহাসের পাতায় পাতায় নামকরা লেখকদের জমাট মজলিশের পাশ দিয়ে লম্বা ফ্রককোটপরা একজন স্টাইলিস্টকে আপন মনে হাতের পাকানো সরু ছাতাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলতে দেখা যাবে। ইতিহাসের কথা ফসফস করে বললে অতিশয়োক্তিই হয়, এটাও সম্ভবত তাই, কিন্তু প্রবীবের স্টাইলে লেখা।

যাব লেখার স্টাইল সম্বন্ধে আমরা কিছু আশা রাখি, এত কথা বলি, তাকে নাম বলতেই চিনতে পারছি না! কেন? অন্য কথায় লেখবার এমন একটা স্টাইল থাকতেও সে উপন্যাস লিখল না কেন? কারণটা অবশ্যই তার মেজাজ। এর ফলেই কেউ কেউ তাকে সিনিক বলে। তারাই বলে, সিনিক হতে গেলে যে বিশেষ যোগাযোগ থাকা দরকার তা তার আছে। কিন্তু যারা তাকে ফাদার অথবা ফ্রায়ার বলে তারা বুঝে-সুঝে তাকে বরং ফিনিকল বলে শেষের অর্ধ 'ল'কে উচ্চাবণ না কবে।

মৃদুগতিতে সিঁদুর রঙের বুইকটাকে এদিক ওদিক এ চক্কর ও চক্কর চালাতে লাগল প্রবীর নিউ চৌরঙ্গীর স্রোতে। দুএকবার তার মনে হল একটা পাকে পড়েছে, কিছুতেই বেরোতে পারছে না।

এটাও একটা নাটক যা ব্যর্থ হয়েছে। তবে কি সে সাইকায়াট্রিস্টদের শরণ নেবে? কিছু আছে তার মনের গড়নে যার জন্যে সে ব্যর্থ নাট্যকার? মনটাকে বিশ্লেষণ করিয়ে নিলে ব্যর্থতার কারণটা ধরতে পারা যাবে? যেমন, ধরো, সে, বাজারের সেই প্রকাণ্ড সুন্দর কোফিগুলো প্রচুর নাইট্রোজেন-মিশ্রিত সারে যাদের বাড়বাড়ন্ত, তার তুলনায় সেকেলে গোবরেব সারের অপুষ্ট ছোট অপ্রচুর কোফি খেতে ভালোবাসে, প্রচুর ফলন অতি মিহি সুফলা ৭০৫ (ক) চালের তুলনায় সেকেলে তুলসীভোগ পছন্দ করে।

ভাবতে না ভাবতেই সে চক্কর কেটে বেরিয়ে এল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঠাহর করল সে ওল্ড চৌরঙ্গী ধবে চলেছে। ট্র্যাফিক দ্বীপে গুলমোর, আর গুলমোরের মাথা ছাড়িয়ে ইউক্যালিপটাস থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে। না, তার মনে কিছুই পাওয়া যাবে না যাকে ভয় করতে হবে। হয়তো দেখা যাবে কোন কোন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় মতের সঙ্গে তার মত মেলে না। হয়তো দেখা যাবে বিয়ের আগে সে বেলা সোমকে ভালোবাসতো।

কিন্তু গুলমোর কি থাকতে দেবে? রাস্তার নিচে যেদিন থেকে ট্রামের রাস্তা হয়েছে, তখন থেকে কথা উঠেছে গাছপালার শিকড় নিচতলার রাস্তার ক্ষতি করবে। আজকের রোদে গুলমোরগুলো দেখার মতোই মনে হচ্ছে। প্রবীর অনুভব করল—রেখে দেবার মতোই ; ও, লেট দেম বি লেফট। না, না, প্রবীর হাসল, থাক, থাক মনে যা আছে। মনকে পরিষ্কার করার জন্যে তাকে চিরে চিরে ভেতরটা রোদের আলোয় না আনাই ভালো।

এখন, ওল্ড চৌরঙ্গী এমন জায়গা, আমার তো মনে হয়, যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এখানে আসে না। কোন কোন দূরদেশের এয়ার-টিকেট, আর্কিওলজির মিউজিয়াম, দু একটি কিম্ভূত নামের সরকারী অফিস সাধারণত যার উদ্দেশ্য বুদ্ধির অগম্য, বিক্রয়যোগ্য চিত্রের প্রদর্শনী, উৎকৃষ্ট না হোক দামী মদের দু-একটা দোকান, মার্বেলসিঁড়ি-সমন্বিত কিছু সেকেলে ধরনের ফ্ল্যাট, ইত্যাদি ইত্যাদি যদি উদ্দিষ্ট হয় তবে এদিকে এসে লাভ আছে। প্রবীর হাসল— রোদে শুকিয়ে শুঁটকি মাছ করতে হয়।

গুড়গুড় করে প্রবীরের গাড়িটা এগিয়ে গেল আরও দুতিন মিনিট। কখন থামল বোঝা গেল না, এমন ভাবে থেমেও গেল। রূপসী পাঠিকা, প্রবীরের স্টাইলটা নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন। সে ব্যারোক চিত্রপ্রদর্শনীর দরজায় গাড়ি থামিয়েছে, কিন্তু তার চলা দেখে মনে হচ্ছিল, গায়ে রোদ লাগানো কিংবা গুলমোর সম্বন্ধে মন্তব্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তার নেই। অবশ্য গুলমোরের কাছাকাছি সুরথ অথবা তেমন কেউ থাকলে সে হয়াতো আর এগোতো না। সে কি তা হলে এই চল্লিশ বছরে সত্যি নিঃসঙ্গ? নাকি ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ আর তারপরেও কিছুক্ষণ এটাই, চল্লিশ পার হওয়া ব্যাচেলবের ভাগ্য?

বেলা যেমন বলেছিল, চিত্রপ্রদর্শনী এখনও দর্শকের জন্যে খোলা হয় নি। মাপজোখ, ছবি টাঙানো চলছে। কর্তাব্যক্তিদের অফিসে দু-একজনকে পাওয়া গেল। তিনটে করিডরে আর হলে প্রদর্শনী সাজানো হবে!

প্রবীর বলল, ছবি দেখতে এসেছি মশায়।

কিন্তু এখনই, সে তো রবিবারে—ওরা হতভম্ব।

একমেটে দোমেটে দেখা আমাদের দেশে রেওয়াজ ছিল। প্রবীর হাসি মুখে বলল।

কর্তাব্যক্তিদের একজন এরপর যে হলটা সাজানো হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেল প্রবীরকে। আধুনিক সন্ন্যাসীর মতো এই সান্ডেলকে তারা অনেকবার চোরা-চোখে লক্ষ্য করল। উপন্যাসের রীতি অনুসারে এখানে প্রদর্শনীর কিছু বর্ণনা পাঠক-পাঠিকা আশা করতে পাবেন। কিন্তু এখনই কী বর্ণনা দেব? কিছুই সাজানো হয় নি।

ছবি দেখে এবং কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ কবে প্রায় একঘণ্টা কাটল প্রবীবের। সে সিদ্ধান্ত করল দু-তিনবার অন্তত এই প্রদর্শনীতে আসতে পারবে সে। এবং অন্তত একখানা তেলরঙের ছবি নিজের ফ্ল্যাটে টাঙানোর জন্যে সংগ্রহ করবে।

গাড়িতে বসেও ছবিটার কথা মনে এল তার। ক্রাইস্টকে ক্রস থেকে নামানো হচ্ছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, তাঁর গায়ের রং গাঢ় বাদামি, পুরু ঠোঁট, মোটা খাঁদা নাক! সবুজ আখক্ষেতে নীল ক্যারেবিয়ান আকাশের প্রভাব, যেন ক্যালিপ্সো শুনতে পাবে, ক্রিকেট নেট, স্মক, ফ্রক পরা ক্রিওল শ্রমিক, অর্ন্তবর্ত্নী তিনটি নারী যাদের মুখে চোখে স্প্যানিশ প্রভাব কিন্তু যাদের গায়ের রং বরং কালো।

কথাটা এই : খোঁজো, তোমাকে দেয়া হবে ; চাও, তুমি পাবে। খুশিতে হেসে ফেলল প্রবীর সাণ্ডেল। কথাটা মূল্যবান না হলে এতদিন পরে আবার প্রমাণিত হতো না। খোঁজো, তোমাকে দেয়া হবে। এবং তা আশ্চর্যজনকভাবে, তোমাকে অবাক করে দিয়ে, তুমি যা আশা করো নি ততখানি। এই ছবিটা, আর ঠিক তখনই, যখন বিমূর্ত চিত্রণ, কৌতূহলী ফিলিস্টাইনদের জন্যে সাজানো মূল্যবান ইয়ারকি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন বিখ্যাত আঁকিয়ের সেক্রেটারী যেন কথাটাকে ফাঁস করে দিয়েছে।

ধারে-কাছে আর একটা টেলিফোন বুথ নিশ্চয়ই আছে। প্রবীব সাণ্ডেল বেলাকে ডেকে চিত্রপ্রদর্শনীর কথা বলবে এমন তাগিদ অনুভব করল। কিন্তু আসলে এটা পাওয়া নয়, পাওয়ার আশা। রবিবারের পরে যা পাওয়া যাবে তার প্রত্যাশা। বলো তো জীবন কী?

চুরুট ধরিয়ে নিল প্রবীর। লাঞ্চ পর্যন্ত সে এখন মনুমেন্টের কাছে গিয়ে কাটাতে পারে। এদিকে

রোজ আসা হয় না। লাঞ্চের পরে সে তার নাটক সম্বন্ধে চিন্তা করবে। নব-ব্যারোক আন্দোলন সম্বন্ধেও।

ট্র্যাফিক আইল্যান্ডের ইউক্যালিপটাস আর গুলমোর লাঞ্চ পর্যন্ত, লাঞ্চের পর মনুমেন্ট—এমন ব্যবস্থাও করা যায়। এখন উত্তাপটাও বেশ চড়া হয়ে উঠেছে দিনের। চামড়ায় তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করছে। প্রবীরের অনুভূতিটাকে অন্য কোন উপায়ের অভাবে ভাষায়, মোটামুটি দিনটাকে অনুভব হচ্ছে এরকম বলা যায়।

লাঞ্চের জন্যে ক্লাবে যাওয়া যায়। কিন্তু ক্লাব ড্রুরি লেনে।

গুলমোরের পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে প্রবীরের মনে পড়ল, এদিকেব একটা হোটেলে সে এবং বেলা একটা দিনের আট-নঘণ্টা কাটিয়েছিল। সেদিন বেলার অনূদিত প্রথম উপন্যাসটা বাজাবে এসেছিল বিক্রির জন্যে। বেলাকে কোণঠাসা বিপ্লবী মনে করলে, হোটেলের সেদিনের ঘব দুখানাকে অবরুদ্ধ দুর্গ বলতে হয়।

সেই সময়েও, অর্থাৎ যখন সে এবং বেলা হোটেলে একটা দিনের অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল, প্রবীবের স্কেচ করা অভ্যাস ছিল। তা না থাকলে বেলাব মতোই নার্ভাস হয়ে পডতো সে। ইলোপমেন্ট এই শব্দটাই ব্যবহার করে থাকে বন্ধুমহল এই ঘটনাটাকে উল্লেখ কবতে। সেই কয়েক ঘণ্টায় বেলাব খান পাঁচেক স্কেচ করেছিল সে। বই হাতে বেলা, ফাউন্টেনপেন কামড়ে ধরা বেলা, স্নানার্থিনী বেলা, ঘোটকী-হেন বেলা।

প্রবীরের মুখে হাসির উজ্জ্বলতা দেখা দিল। কোথায় আছে, আছে কি না সেই কালির স্কেচগুলো, কে জানে! তখন তাব স্কেচের মধ্যে চিত্রীদের নিপুণতা থাকতো নাকি? এখন, যেমন নোটবুকেব পাতায় সুরথেব বক্সেব স্কেচে, অধৈর্যের ভাবটাই দেখা যায় কিম্বা কার্টুনিস্টদের ভঙ্গি।

কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর নয় বেলার কাজন? বয়স অনুমান ত্রিশ। সুরথকে বাজকীয় মোবগ বলতে হলে তাকে ধারে-কাছে সব চাইতে বাহারে হেন বলতে হয়। কিছু বিদেশী, কিছু অসাধাবণ।

মসৃণ পুরনো হাতির দাঁতের মতো ত্বক, সুগড়ন ঝকঝকে দাঁত, চকচকে চোখ, অচঞ্চল মুখের পেশী, বড় এলোখোপা থেকে বেরিয়ে আসা খয়েরী রঙের এক গোছা নবম চুল। কিন্তু পাথরের মতো ; চুল, চোখ, ঠোঁট, রং দেয়া হয়েছে এমন পাথবের মতো, ঠোঁট দুটো পানসে গোলাপি।

এটা অসামাজিকতার ত্রুটি হয় নি বেলাদের পক্ষে, যে প্রযোজকেব বিশিষ্ট অতিথিকে নাট্যকারেব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়া হল না? প্রথমবারেই একটা ঘটনার সব দিক দেখা যায় না। এই দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার প্রশ্নটা মনে আসতেই প্রবীর দেখতে পেল, সেদিন সে থিয়েটাবে দেবিতে গিয়েছিল, আগে চলে এসেছিল। নিশ্চয়ই সুরথ তাকে খুঁজে পায় নি।

পরে সুরথ তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিল, জানিয়েছিল, যে অভিনেত্রী নায়িকার অংশে নামছে, তাকে দুরাতের ছুটি দিতে হবে। প্রবীর তা অনুমোদন করে কি না।

নিশ্চয়ই, ছুটি খুব ভালো উদ্ভাবন। কিন্তু তোমার অসুবিধা হবে না?

তেমন নয়, আর একজনকেই গোড়াতে তৈরি করেছিলাম, যদি মনে কবে দেখো। একটু বেশি বয়স, আর তার চাইতে অনেক সুন্দরী বর্তমান নায়িকাকে পাওয়া গেল বলেই, একে সাইডপার্টে সরিয়ে দিয়েছিলাম। যদি ছুটি দেয়া যায়, দুটো পার্টই সে করতে পারবে আর তাতে অসুবিধাও হবে না।

চেহারার সাদৃশ্য? নায়িকা আর সাইডরোল দর্শকরা গুলিয়ে ফেলবে না?

তাতে লোকসান নেই। সাইডরোল শুধু ঋতুর পরিবর্তন বোঝানোর জন্যেই লিখেছো। মাঝখানের সময়ের ব্যবধান বোঝানোর জন্যে। সাইডরোল না বুঝে দর্শক যদি ছদ্মবেশে নায়িকা বলে বোঝে তাতে নাটকের ক্ষতি হয় না।

তা হলে ছুটি দিও।

সুতরাং আজ থেকে দুরাত প্রধান অভিনেত্রীর ছুটি।

এ সময়ে অভিনেত্রী বদলকে মাঝ-ঝরনার ঘোড়া বদলানো বলা যেতো। কিন্তু ও ইঙ্গিতটাও মন্দ নয় যে নায়িকাই অপরিচিতের মতো পোশাকে রাস্তায় বেরিয়েছে। পোশাকটার তা হলে বদল দরকার। মুখের কথার দুএকটা হেরফের। গ্রে রঙের গ্রেট কোটের বদলে, কালো রঙের গ্রেট কোট ভালো হবে। কথায় দু-একটা অসহিষ্ণু অব্যয় জুড়ে দিয়ে নায়িকার আন্তরিক ক্লান্তির ইঙ্গিত দিতে হয়।

বদলি অভিনেত্রীব নাকের ডগাটা ওপরমুখো। এটা খুঁত। কিন্তু হয়তো কারো কাবো ভালো লাগে। কণ্ঠস্বর ভালো। শরীর একটু ভারি।

হোটেলটা ওল্ড চৌরঙ্গী থেকে বেরোনো একটা গলির মধ্যে। হোটেলের দিকে এগোতে গিযে একটা ট্রাফিক আইল্যান্ডকে আধখানা চক্কর দিতে হল। এতক্ষণে দিনের উত্তাপে পিপাসা পেয়েছে। একটা বাজতে অল্পই দেরি আছে। লাঞ্চের সময় হল।

হোটেলেব দরজায় প্রবীর সাগুেল ভাবল, দেখা যাক, সুরথ যখন সাহস পাচ্ছে।

দেয়ালের প্লাকে নিরামিষ আমিষ লাঞ্চের হলদুটোর পথ দেখানো। এখনই ভিড় হওয়ার সময় হয় নি। ছ-আনা টেবলে লোক বসেছে, বাকিটা খালি। একেবাবে কোণেব দিকে দু-তিনখানা টেবল খালি। এক সারি আগে এক টেবলে একজন মহিলা একা খাদ্যব জন্য অপেক্ষা করছে। মহিলাটির টেবলের পাশ দিয়ে প্রবীর তাব পছন্দ করা টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। খালি ঘরে ওয়েটারকে সহজে পাওয়া যায়। প্রবীর একটা সাদামাটা চাপাটি-তরকারি লাঞ্চের অর্ডার দিল।

মহিলাটিকে খুব নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে না? নিঃসঙ্গ, তা, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কখনও কখনও ভিড়ের মধ্যেও হঠাৎ সে রকম হতে পারে। কিম্বা ওটা তার গাম্ভীর্যের ফল। নীলপাড় বসানো দুধে কড়িয়াল। চৌকোণ পরকলার চশমা। ওহো! সেদিন সোনালী ফ্রেমের গোল চশমা ছিল, খোগাটা আরও বড আব আলগা ছিল, খোপা থেকে এক গোছা চুল অশ্বপুচ্ছের আভাস দিযে ঝুলছিল। কিম্বা ববং পেছন থেকে মুখের একটা পাশ দেখে স্কেচ করেছিল সে।

মহিলাটি আধ মিনিট সময়ে দু-তিনবার প্রবীরকে লক্ষ্য করল। তারপর সেই আগে বলল. একা নাকি?

প্রবীর বলল, হ্যাঁ, একাই এসেছি।

আধমিনিট পবে মহিলাটি বলল, আপনাকে—

এবার প্রবীরকে উঠতে হল, মহিলাটি টেবলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হল।

কিছু বলছেন আমাকে?

বসুন।

প্রবীর সময়-উপযোগী কথা খুঁজতে লাগল।

চিনতে পারেন নি? বসুন, এই টেবলেই বসি দুজনে।

প্রবীরের মনে হল চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে সে এর আগে. সুরথের বক্সে দেখবার আগে! চোখ দুটি? নাকি হাত দুখানা? প্রবীর চেয়ার টেনে বসল, মহিলাটি ওয়েটারকে ডাকল। বলে দিল, একই টেবলে খাবার দিও। সাহেব যে খাবারের অর্ডাব দিযেছেন আমার জন্যেও তাই এনো। বোধ হয় তোমাদেব অসুবিধা হবে না। প্রবীর বলল. দুটো অর্ডার মিশিয়ে আনুক। মহিলাটি হেসে বলল, তাও হয়. সেটাই ভালো হবে।

ওয়েটার মাথা নুইয়ে চলে গেল।

মহিলা বলল, ভেবে রেখেছিলুম বেলার বাড়িতে দেখা হযে যাবে, তখন ধন্যবাদ দেবো। নাটকের

আগে পরে সেদিন আপনাকে পাওয়া যায় নি।

প্রবীর সাণ্ডেল বলল, আপনি খুশি হয়ে থাকলে ধন্য হয়েছি।

লাঞ্চ এসে গেল। এখানে পাঠক, পাঠিকার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে নিতে চাই। একজিবিশনের ব্যাপারে যেমন, লাঞ্চ ইত্যাদির ব্যাপারেও বর্ণনাকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপরে ছেড়ে দিতে চাই। কারণ হিসাবে বলা যায়, আহারাদির বর্ণনাতে লেখকের ব্যক্তিগত রুচির ছাপ থাকে বলে মনস্তাত্ত্বিকরা ইঙ্গিত করেন, যার সত্যাসত্যের প্রমাণ দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি না, কিন্তু আসল কারণ গল্পটাকে সহজ করা।

লাঞ্চের মাঝামাঝি মহিলাটি বলল, আমার নাম মিত্রা। এখন কি চিনতে পারছেন?

বড়া জাতীয় কিছু একটা বেসামাল হল প্রবীরের মুখ আর কাঁটার মধ্যে। কায়দা করতে সে মাথা নোয়াল। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, এটা অবাক হওয়াব মতো ব্যাপার যে সে মহিলাটিকে চিনতে পারছিল না। স্কেচ করার সময়েও ধরতে পাবে নি। এ সেই। ভেবে দেখো এখন। মাস তিনেক আগে যাকে আনতে বেলা এয়ারফিল্ডে গিয়েছিল এবং প্রবীর সঙ্গী হয়েছিল বেলার। আচ্ছা, আচ্ছা। তখন কি মিত্রার মুখে ক্লান্তি ছিল ভ্রমণের, চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে চঞ্চল ছিল, এখানকার এই স্নিগ্ধতার বদলে মুখের পেশীগুলিতে উৎকণ্ঠাও ছিল?

এরপরে খাদ্য নিয়ে আলাপ চলল। আর কিছু খাওয়া উচিত কিনা, কী ধরনের খাদ্য ইত্যাদি।

লাঞ্চের প্রায় শেষে মিত্রা বলল, যখন দেখা হল আপনার সঙ্গে আর খানিকটা সময় কাটাতে পারলে ভালো হতো।

আদৌ নয়, আদৌ নয়। আপনার কাজ থাকতে পারে। তা থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো কোথাও যাওয়ার জরুরী তাগাদা আছে।

ব্যাপারটা তাই। ছোট্ট একটা তৃপ্তির শব্দ করে মিত্রা বলল, একটা সভায় একটু দরকার আছে। নতুবা—

ন্যাপকিনে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল মিত্রা। প্রবীরের সামনে কেসটা এগিয়ে ধরল।

বিল চুকিয়ে বাইরে এসে মিত্রা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়াল। এরকম ক্ষেত্রে পুরুষের পক্ষে অন্তত সঙ্গের মহিলার ট্যাক্সি যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বিধেয়।

পরিবর্তন অভূতপূর্ব হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা নজরে পড়বে, এমন কথা নেই। এ পথে অন্তত দশ পনরো মিনিটে ট্যাক্সি পাওয়ার কথা। মিত্রার ঘড়ি দেখা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে, তার তাড়া আছে। বিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর ধরা পড়ল ব্যাপারটা, একটা ট্যাক্সিও বাঁ বা ডান ফুটপাতের দিকে এগোচ্ছে না। ট্যাক্সির বিশেষ রং যানবাহনের স্রোতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বটে কিন্তু তা রাস্তার মাঝ-বরাবর স্রোতের ঠিক মাঝখানে, দূর পাল্লায় চলেছে।

মিত্রা হাসিমুখে কিন্তু বিরক্তির স্বরে বলল, কী ব্যাপার, ধর্মঘট করেছে নাকি?

প্রবীর বলল, ধর্মঘট। কই না, তেমন কিছু শুনি নি।

পাশে অপেক্ষমান একজন পথচারী বলল, ধর্মঘটই। নিচতলার ট্রাম সার্বিসে ধর্মঘট হলে এসব পথে ট্যাক্সির আকাল পড়ে। সব দেখুন গে অফিসপাড়ায় আর স্টক একসচেঞ্জে ভিড় করেছে।

তা হলে? মিত্রা বিপন্ন বোধ করল। বিরক্ত মুখে কিন্তু সরল গলায় বলল, এমনটা ঠিক প্রত্যাশা করি নি।

আমরা জানি এটা প্রবীরের পক্ষে কোন সমস্যাই নয়।

সে বলল, আরও খানিকটা একসঙ্গে যাওয়া যাবে, আসুন। ভালোই হলো, খুবই ভালো।

এই বলে সে তার সিঁদুরে বুইকটার পাশে গিয়ে দরজা মেলে ধরে দাঁড়াল। গাড়িতে বসে মিত্রা বলল, যোগাযোগ কেমন ঘটে দেখুন।

প্রবীর বলল, সেকালের রবিঠাকুর এমন সব ধর্মঘটকে ভদ্রগোছের ভালুক বলেছেন, যার হাত থেকে একজন রূপসীকে উদ্ধার করার সুযোগ জুটে যায়।

হেসে মিত্রা বলল, র‍্যাভিশিং!

দেখা গেল মিত্রার হাসি বেশ তরল। সে হাসলে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। সাধারণ কথার কণ্ঠস্বর বরং ভারি। এস্রাজের প্রথম পিতল তারটার কথা মনে হল প্রবীরের। আজকাল ওপরতলার রাস্তায় যত গাড়ি চলে তার বড় একটা অংশ ট্যাক্সি। তাদের অভাবে পথে ভিড়ই যেন কম। মিত্রার ঠিকানা সেমিনারে পৌঁছতে কম সময় লাগল অন্য দিনের চাইতে।

ইস্ট লেক এভেন্যুতে সেমিনার। ৮৩ নম্বর ইস্ট লেক এভেন্যু। সেমিনারের দোতলা বাড়িটাকে চারিদিকের পাঁচসাত-তলা বাড়িগুলোর তুলনায় অন্যজাতের মনে হয়। আকাশ থেকে দেখলে এক ফালি মাঠের মধ্যে একটা শ্বেতপাথরের বেদী বলে মনে হবে। চারিদিকের রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে হলের বারান্দায় পৌঁছনো যায়। বড়ো বড়ো থাম চারিদিকে, এ পদ্ধতিটাকে এখনও ডরিক বলা হয়। জানালাগুলো তো বটেই, দেয়ালের অনেকাংশ ফাইবার গ্লাসের। দেয়ালের কাচ মসৃণ, দুধ রঙের। জানালার কাচ নকসাদার।

শহরের পক্ষে এটা ভালোই হয়েছে। পাবলিক হল হিসাবেও বটে, আকাশের খানিকটা ফাঁকা রাখা গিয়েছে বলেও বটে।

সেমিনারে সিঁড়িতে মিত্রাকে নামিয়ে দিয়ে প্রবীর গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। দরজার কাছে নোটিশ বোর্ডটা চোখে পড়ল তার। বেশ বড় কালো হরফে লেখা আছে–দুইটি সংস্কৃতি। তার তলায় দুটি তারিখ, তার একটা অবশ্যই আজকের। তার তলায় বক্তাদের নাম। প্রবীরের মনে পড়ল মাস দুয়েক আগে খবরের কাগজে কিছু পড়েছিল এই আলোচনা সম্বন্ধে, অথবা বেলা, সুরথ, কিম্বা ক্লাবে বঙ্গ সেন কিছু বলেছিল।

অফিসে চাকরি না করার ফলে, অফিসে চাকরি করলেও কী অন্যথা হতো, লাঞ্চের পর অন্তত এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়া অভ্যাস হয়েছে প্রবীরের। আলোচনাটা বিশ্রাম নয়। বিশেষ করে বিষয়টা তর্কমুখর। প্রবীর এই দুটি সংস্কৃতিকে বিজ্ঞান-সংস্কৃতি ধ্রুব-সংস্কৃতি বলে থাকে যেহেতু কী এক অদ্ভুত উপায়ে অতি-প্রচলনের ফলে ধ্রুব বলতে ক্লাসিকসকে বোঝায়।

প্রবীর ভাবল, অন্য অনেকে মানব শব্দে নানা প্রত্যয় যোগ করে হিউম্যানিটিসের প্রতিশব্দ তৈরি করেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিউম্যানিটিস বলতে কি সে রকম বোঝায়? তুলনীয় হিউম্যানিটেরিয়ানরা! মানবতাবাদী? কে জানে! ঋতুটা, দিনটা, পায়রা দেখবার মতো বটে। ছবিটার কথা মনে পড়ল প্রবীরের। মৌচাকের গায়ে ব্যস্ত মৌমাছির মতো, মনুমেন্টের গোড়া থেকে আগা, মাথার ওপরে আকাশে, চারদিকের চত্বরে অসংখ্য পায়রা। মৌচাক যেমন থেকে থেকে চমকে ওঠে, পায়রার ঝাঁকের তেমন দেখতে দেখতে চমকানি লাগে। এক লক্ষ কথাটা আধিক্য, হাজার দশেক হলে অসম্ভব নয়।

হিউম্যানিটেরিয়ানরা যিশুকে ঈশ্বরের সন্তান মনে না করে মানুষ মনে করতো, সেজন্যেই এই নাম। তা হলে তারাই বা বিজ্ঞানপন্থী নয় কেন। অথবা প্রথম বিজ্ঞানপন্থী!

ওল্ড চৌরঙ্গীর পাশ ঘেঁষে মনুমেন্ট। যেমন আশা করা যায়, বেশ কিছু দর্শক জমেছে। সোনালি জ্যাকেট, কালোশাড়িপরা মেয়ের পাশে বেগুনী ম্যানিলাপরা তরুণ। আর চানাওয়ালারা ঠোঙায় করে পায়রার দানা বিক্রি করছে নানা সুরে হেঁকে হেঁকে। ঝকঝকে রোদ। অনেক উঁচু নীল আকাশ। শরৎকালের কথা মনে আসে। ম্যাগনোলিয়াই বোধ হয় গাছটা। ম্যাগনোলিয়া ক্যামবেলি।

সিঁদুর রঙের বুইকটা সেই গাছের নিচে থামল। কী ফুর্তি তাদের শীতের আমেজ লাগা অক্টোবরের দুপুরে।

রূপসী পাঠিকা, এই সেই মনুমেন্ট যাকে এক সময়ে শহীদ মিনার বলার হতো, কত না বিপ্লবকারী বক্তৃতা শুনতো সেকেলে কলকেতার মানুষেরা এখানে।

ব্লকের সদর দরজার কাছে ফুটপাতে দাঁড়াল মাধবী। গাঢ় খয়ের রঙে সাদা চৌখুপী বসানো স্কার্ট ; হালকার চাইতে কিছু গাঢ়, হলুদ রঙের তিনপোয়া হাতা ব্লাউজ। মাথায় গাঢ় বাদামি রঙের চামরের মতো চুল, কিন্তু চামর কখনও তত চকচকে এবং মসৃণ হয় না। চোখে সানগ্লাস। ঠোঁটদুটো হালকা লাল। কাঁধে ক্যামেরা-কেসের মতো ক্রোম-হলুদ ব্যাগ ঝোলানো। পায়ে আঙুল বার-করা উঁচু গোড়ালির স্লিপার। পরিপুষ্টর চাইতে বরং কিছু চাপা সুগড়ন পাছা, লম্বা পা, কিছু নিচু ছোট মাপের বুক। মুখে কিছু উৎকণ্ঠা যেন ট্যাক্সি খুঁজছে। অনুমান করি এতে মাধবীর বর্ণনা মোটামুটি দিতে পেরেছি। অবশ্য তার দেহের মৃদু সিভেট সুগন্ধ এতে ধরা পড়ে নি।

মনে হতে পাবে মাধবী ট্যাক্সির জন্যেই দাঁড়িয়েছে। এমন কি একটা ট্যাক্সি রাস্তার ওপার থেকে পাক খেয়ে মাধবীর ফুটপাতের দিকে এসে আস্তে আস্তে চলল। কিন্তু মাধবী অন্যদিকে চাইল। ট্যাক্সিটা চলে গেল। সে স্থির করল অমনিবাসেই যাবে।

ক্লাসিক থিয়েটারকে সংক্ষেপে ক্লাসিক বলা হয়। সেখানে রিহার্স্যাল। এই বাক্যদুটিকে অনুভব কবল মাধবী। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল সে। এই দ্রুতভঙ্গিটা এমন নয় যে শরীর সামনের দিকে নুয়ে যাবে, কিম্বা পদক্ষেপ থেকে গাঢ়তার আভাস কমবে।

আজ আবাব অমনিবাসে। কিছু দুরে বাস-স্টপ। হাতে সময় আছে। তার পোশাকও অমনিবাসে চলার উপযুক্ত করে পছন্দ করেছে।

ক্লাসিক থিয়েটার ড্রুরি লেনে। চারিদিকে এত সাইনবোর্ড কিঅস্ক, কিন্তু সেখানে এমন কোন চিহ্ন নেই যা থেকে বোঝা যাবে ক্লাসিক থিয়েটার ঠিক কোন জায়গায় হতে পাবে। যারা জানে, তারা জানে ড্রুরি লেন যেখানে লেক এভেন্যুব বুকে তীরের মতো বসানো সেখানে সেই ত্রিভুজাকৃতি ব্লকেই ক্লাসিক। নানা ব্যবসার সাইনবোর্ডের মধ্যে একতলায় শোরডিচ কাফেটেরিয়ার একটা পুবনো সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে। আর তখন ক্লাসিকের ফ্যানরা নিশ্চিন্ত হয় যে তারা ঠিকই এসেছে। (যাবা ক্লাসিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাদের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায়, ক্লাসিকেব ঠিকানায চিঠিপত্র দেয়ার অসুবিধা এই যে তার স্ট্রীট নম্বর অনেকেই জানে না।)

মাধবী মির্জা গালিব আর চার্চ স্ট্রীটের সংযোগে অমনিবাস স্টপের ছাতেব নিচে কিউয়ের শেষে গিযে দাঁড়ল। লেজটা খুব বড় নয়। কিন্তু মাধবী লক্ষ্য করল সে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কেউ কেউ ফিরে দেখছে। সে ঠোঁটদুটোকে ভেতরে টেনে এনে মুখটাকে গম্ভীর করল। অন্য কোন কোন রূপসীকেও এরকম করতে দেখেছি। ক্লাসিককে খানিকটা রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানে ক্লাসিকের প্রভাব বাইরে থেকেও চিনতে পারা যায়। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ছ নম্বব আই, টি রোড নতুবা ড্রুরি লেন নাম পেতো না, কিম্বা কাফেটেরিয়ার নাম শোরডিচ হতো না। নামগুলো শেক্সপীয়ারের সময়কার থিয়েটার পাড়া থেকে নেয়া, যা মাধবীদের জেনাবেশন জানে না। তা হলেও এমন লুকোনো ভাব কেন ক্লাসিকের, যা মাধবীরা সহজেই অনুভব করে? কারণ ক্লাসিকের চিন্তা সাধারণের চিন্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, সেজন্যেই যেন সেকেলে এবং পাপবোধে পীড়িত।

অনুমান করছি মাধবীর সঙ্গে ক্লাসিকের সম্বন্ধটা এখনও নতুন। সে জন্যই ক্লাসিক সম্বন্ধে তার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যায় নি। নতুন এলে কোন জায়গা সম্বন্ধে যেমন হতে পারে, ক্লাসিক সম্বন্ধে তার মনে এই কথাগুলো আপনা থেকে ফুটে উঠছে।

মাধবীর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তের নম্বর মেরুন রঙের অমনিবাসটা এসে দাঁড়াল। মাধবী

অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজের পুরনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে স্থিব করল, রুট অনুসারে অমনিবাসের রং করা ভালো হয়েছে। ভিড় ছিল, কিন্তু এমন নয় যে জায়গা পেতে অসুবিধা হবে। মাধবী আন্দাজ করল. প্রায় আধ ঘণ্টা গেলে লেক এভেন্যু। ড্রুরি লেন জংশনের কিছু উজান দিয়ে রুট। সেটুকু হেঁটে গেলেই হবে।

সিটে বসে গ্রীক ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে ক্ল্যাসিকের পুস্তিকাটাকে বার করল সে ব্যাগ থেকে। এটাও ক্লাসিকের বিশিষ্টতা, নাট্যকারদের সম্বন্ধে লেখা এই পুস্তিকাগুলো। লোকে বলে, পুবনো প্রাচীন লেখকদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল আছে। সেজন্যেই এই পুস্তিকাগুলো বিক্রি হয। আর বিক্রি হয় বলেই ক্লাসিকেব অভিনয়ের খবচ ওঠে।

লোকে বলে নি, কথাটা বলেছিল গীতা পাবকর। অনেকদিন গীতার সঙ্গে দেখা হয় না। এক সময়ে একই ফ্ল্যাটে থাকতো মাধবী আব গীতা। গীতা মাধবীব চাইতে বয়সে বড়। সায়েন্স ফিকশান নিয়ে বছরে যদি দশটা ছবি তোলা হয তবে তার অন্ততঃ তিনটিতে গীতা থাকবেই। তার বন্ধুত্ব মাধবী অস্বীকার করতে পারে না। ছমাস আগে এক সকালে ফেব্রুয়ারী ফেয়ারে দেখা হয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে গীতা ছুটে এসেছিল। জড়িয়ে ধরেছিল, চুমু খেয়েছিল। কোন কথাই শোনে নি। তার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন একটা অ্যাম্বারের মালা উপহার দিয়েছিল। আর বোধ হয় হাজারবার চুমু খেয়েছিল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল মাধবীর গডনেব। অবশেষে সন্ধ্যায আবার তারা বেডাতে বেরিয়েছিল গীতার গাড়িতে। গীতা নিশ্চয়ই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, আর সাযেন্স-ফিকশানের ছবিতে বারবার কনট্রাক্ট পাওয়া থেকেই বুঝতে পারা যায়, অভিনেত্রী হিসেবে তার আদর আছে। সে এমন যে তার সঙ্গে নিজের আর্থিক অবস্থা নিয়েও কথা বলা যায। বিদায় নেবার সময়ে গীতা বলেছিল, তুমি আবার আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। অভিমান ফুটে উঠেছিল তার স্বরে। বলেছিল, তুমি আসবে না জানি, সেজন্যে ঠিকানাটাও গোপন রেখেছিলে। কিন্তু আমি তোমার জন্যে এই মার্কোস স্কোয়াবের ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করে থাকবো।

গীতা ক্লাসিক সম্বন্ধে জানতো। বিজ্ঞাপন না থাকা সত্ত্বেও ক্লাসিকের এমন একটা প্রচার আছে মুখে মুখে, যার ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে অন্তত নামটা অজানা নয়।

রেনেশাঁ থিযেটাবেব প্রথম অভিনয়রাত্রিতে গীতাকে নিমন্ত্রণ করা যেতো। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর মতো সেও বিশেষ অতিথির আমন্ত্রণের কার্ড পেয়েছিল। পাঁচটি সিট মিলে একটি বক্স। সেই কার্ডগুলোর নিচে লেখা ছিল : অভিনেত্রী মাধবী ঘোষালের সৌজন্যে। গীতা পেলে নিশ্চয়ই খুশি হতো। কিন্তু মাধবী কার্ড কয়েকটিকে স্টুডেন্টস ব্যুরো অব কালচারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অথচ এ কাজটাই সে গীতার অনুকরণে করেছিল, তাকে যেমন একবার কবতে দেখেছিল, তেমন করেই হ্যান্ডবুক অব রেফারেন্সেস দেখে। এটা ঠিক কৃতজ্ঞতা নয়। গীতাকে কি তবে সে নিজের অগোচরে এড়িয়ে চলতে চায়? বাজেন এসেছিল সেই নিমন্ত্রণে। আর তারপর রাজেন এসেছিল তার সঙ্গীদের নিয়ে কালকের ডিনারে। কাল তার ছুটির প্রথম দিন ছিল। আর্ট থিয়েটার থেকে দুদিনের ছুটি।

কতদূর এসেছে দেখবার জন্যে ক্লাসিকের পুস্তিকাটার প্রথম পাতা থেকে চোখ তুলেছিল সে, (প্রথম পাতার চাইতে এগোতে পারে নি) তখন ব্যাপারটা তার চোখে পড়ল। পুরুষের দৃষ্টিতে সে যে বিশেষভাবেই আকর্ষণীয় এটা মাধবীর অজানা নয়। কিন্তু এমন সহজভাবে প্রকাশ্যে তার দিকে চেয়ে থাকতে খুব কম লোককেই সে দেখেছে। মাথার বারান্দা বারকরা টুপি থেকে বুঝতে পারা যায় আর্মির অফিসার। একদৃষ্টিতে যেন মাধবীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দ্বিতীয়বার দেখে মাধবীর মনে হল পরিচিত লাগছে মুখের আদল। সে অনুমান করল হয়তো কোন বোম্বাই ছবির সুন্দর পাঞ্জাবি-মার্কা নায়কের মুখের আদলের—যাতে কোনদিনই চিন্তার কোন রেখা পড়ে না—সঙ্গে

মেলে বলেই এমন হচ্ছে। অন্যদিকে মন নেবার জন্যে সে ভাবল, কিন্তু সেই বিশেষ আমন্ত্রণে একজনই মাত্র এসেছিল, সে রাজেন। আর রাজেন অভিনয়ের শেষে দেখা করে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানাতে এসেছিল! সেই প্রথম আলাপ। সে কী! লোকটি একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটবে নাকি!

হেলো।

কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিল। কালকের ডিনারে ছিল মিলিটারী একাডেমির অমল।

মাধবীর মুখে হাসি ফুটল ; সে বলল, আপনার মাথার টুপিই তার জন্য দায়ী। বসুন।

মাধবী সরে বসে পাশে জায়গা করে দিল।

অমল বলল, সামনের স্টপেই নামবো। এই পথেই কয়েক ব্লক আগে রাজেনকে ঢুকতে দেখলাম। রাজেনের খোঁজে গেলে এখানেই নামতে হবে। ফিরে যেতে হবে।

মাধবী বলল, তা হলে? যেন সে রাজেনের খোঁজেই তের নম্বরের অমনিবাস বেছে নিয়েছে। যেন নয়, নিশ্চয়ই। তবে কাজটা সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে করে নি। বাইশ বরং ড্রুরি লেনের মুখে যায়। সরাসরি ক্লাসিকে যাওয়ার বাস সেটাই। কিন্তু তের নম্বরই প্রথম এসেছিল।

মাধবী হেসে বলল, আপনাদের কথাই ভাবছিলুম, আর তখনই আপনার সঙ্গে দেখা হল।

অমল হাসিমুখে বলল, মরুভূমিতে এরকম হতে দেখা গিয়েছে। কোন বিশেষ জন্তুর কলোনির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই জন্তুর কথাই মনে হয়। গা ছমছম করে, তা সে টিকটিকি অথবা সিংহ হোক। এটা নতুন বইয়ের পাড়া, রাজেনের কথা মনে হতেই পাবে। আসুন, নামি।

নেমে পড়ল অমল আর মাধবী। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অমল হলুদ রঙের ব্লকটাকে দেখিয়ে দিল। বলল, গভর্মেন্ট সিকিউরিটির বিজ্ঞাপন আছে কিঅস্কে। তার সোজাসুজি দরজা দিয়ে ঢুকে যাবেন। অপাঠ্য দুষ্পাঠ্য পত্রিকার খান ত্রিশ চল্লিশ একসঙ্গে নিয়ে তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে, দেখবেন, দার্শনিক! এই বলে অমল আর্মি স্যালুট করে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। হনহন করে ফুটপাত বেয়ে এগিয়ে চলল।

রাস্তাটা বাঁকা, সে জন্যে সিকি মাইল দূর থেকেই ব্লকটাকে চোখে পড়ে।

মাধবী হাঁটতে সুরু করল। আর হঠাৎ তখন তার মনে হল, সে কি একটু আতিশয্য করে ফেলছে না? সম্ভবত রাজেন এখন ব্যস্ত আছে এবং তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া রাজেনকে এখন এটুকুই বলতে পারে, সে ক্লাসিকে যাচ্ছে রিহার্স্যালে।

অবশ্য, রাজেন তার সমবয়সী। দেখা হলে সেও কিছু বলতে পারে যা থেকে হয়তো লাঞ্চ, রিহার্সাল সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টাকে কাটানোর প্রস্তাব উঠতে পারে, এমন কি ডিনারের জন্যেও ফ্ল্যাটে ফিরতে পারে মাধবী রাজেনকে নিয়ে।

কিন্তু অভিনেত্রীরা কদাচিৎ ফ্যানের খোঁজে পথে ঘুরে বেড়ায়। বলতে পারো, মাধবী তেমন নয় যাদের অত্যুজ্জ্বল তারকা বলা হয়ে থাকে। অন্য দিকে, তার প্রথম ছবি যে বৃথা হয় নি তারও প্রমাণ আছে।

অথবা কিঅস্কের বিজ্ঞাপনই কথাটা মনে করিয়ে দিল। গভর্মেন্ট সিকিউরিটির বিজ্ঞাপনের গায়ে গায়ে লাগা দু-রঙে আঁকা মাধবীর নিজের প্রতিকৃতি। তাতে মাধবীর চোখদুটোকেই আট-ন ইঞ্চি লম্বা করে আঁকা হয়েছে। পক্ষ্মগুলোই ইঞ্চি দুয়েক। আর নীল চোখের মণিতে একটি উলঙ্গ বালকের ছবি। বিজ্ঞাপনটার ঔজ্জ্বল্য থেকেই বোঝা যায় দুএকদিন হল লাগানো হয়েছে। এখনও, ছমাস পরেও, এমন টাটকা বিজ্ঞাপন দেয়ার অর্থ ছবিটা দর্শক টানছে।

হলদে ব্লকটার চারপাঁচটি বড় দরজা এই রাস্তার ওপরে, কিন্তু কিঅস্কের সামনেরটি দিয়েই ঢুকতে হবে, বলেছিল অমল।

ছবিতে গোপন প্রতিরোধে ব্যস্ত একটি দলকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দলে এসে পড়ল নায়িকা (মাধবী), শরৎবাবুর সেই উপন্যাসে যেমন হঠাৎ নায়ক অপূর্ব এক বিপ্লবীদলে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপরে দেখানো হয়েছে প্রতি পদক্ষেপে নায়িকার দ্বিধার যন্ত্রণা। এখানে ছবির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অন্ত-এলার কাহিনীকে খানিকটা অনুসরণ করেছে। ওদিকে উপনায়ক, এক্ষেত্রে নায়িকার (মাধবীর) একদা ঘর বাঁধবার প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্ত পুরুষ, ঘর বাঁধবার অনুপ্রেরণাতেই প্রতিরোধ আন্দোলনের শত্রু, গোপন-পুলিশের (গো, পু) অফিসার। নায়িকার ঘরে এখনও সে প্রেমের অভিনয় করতে আসে। নায়িকা এবং উপনায়ক দুজনেই দুজনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। দুজনেই অভিনয় করে চলে ; উপনায়ক, আরও কিছু খবর জানার জন্যে; নায়িকা, দলের ঘাতকরা না আসা পর্যন্ত উপনায়ককে ধরে রাখবে বলে। এখানেই ছবির হাই-সিরিয়াসনেস সুরু। এই যে ছলনা তা নাকি প্রকৃতপক্ষে ছলনা নয়। চিত্রের ফটোগ্রাফি এখানে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে। উপনায়কের কোট খুলে দিচ্ছে নায়িকা, তখন আইডেনটিটি কার্ডটা মাটিতে পড়ে গেল। নায়িকা (মাধবী) সেটাকে যেন দেখতে পায় নি এমন করে আবার কোটের পকেটেই রেখে দিল। ওদিকে নায়িকা যখন কাফ করতে ব্যস্ত ডাকের চিঠি এল। উপনায়ক আনল সেটা ফ্ল্যাটের দরজা থেকে। মোটা সাদা কাগজের এনভেলপের কোণায় একটা হলুদ বিন্দু। ক্লোজ-আপে বিন্দুটা বড় হতে হতে পর্দা জুড়ে গেল, আব দেখা গেল সেই বিন্দুটাকে বিদ্ধ করে আছে তীরের মতো একটা কিছু। উপনায়ক (সুদেহী অভিনেতা সুমন্ত্র সেকালের ওয়াইসমুলারের তুলনায় কিছু মাত্র ন্যূন নয়, চুল এবং প্যান্টের কাটে বরং আরও আমাদের কালোচিত) বুঝতে পারল, শেষ প্রমাণ পেল নায়িকার প্রতিরোধ আন্দোলনেব শরিকত্বের। কিন্তু মন আর দেহ এক নয়। এখানে নাকি সেকালের রবিবাবুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ছবি। পরস্পরকে কী করে কায়দায় ফেলা যাবে ভাবতে ভাবতেই তারা আলিঙ্গন করল। দেখানো হয়েছে সে সম্ভোগে এতটুকু প্রবঞ্চনা নেই। এর পরে উপনায়কের মৃত্যু, নায়িকার কারাবরণ, এবং বিচারপর্ব। পাঁচ মাস ধবে বিচাবপর্ব চলেছিল, সেই সময়ে নায়িকা আবিষ্কার করল সে অন্তর্বত্নী। জেরায় দেখানো হযেছে, নায়িকা (মাধবী) উপনায়ককে (সুমন্ত্র) গোপুব অফিসাব হিসাবে ঘৃণা করে। কিন্তু জেরাব বাইরে সে স্বপ্ন দেখে। তার চোখের মণিতে, তার চোখ থেকে ঝরে পড়া জলের বিন্দুতে সুমন্ত্র অথবা তার সন্তান, অথবা এক থেকে আর এক, সুঠাম উলঙ্গ বালক হয়ে ফুটে উঠেছে। ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে প্রথম দিকে মাধবী সুমন্ত্রর ঘর বাঁধার পরিকল্পনা, তারই জন্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় সুমন্ত্রর গো.পু.র চাকবি নেয়া। এতেই নাকি নারী-পুরুষের প্রেমের সার কথা, সেই আত্মপ্রবঞ্চনা-সংযুক্ত আদিমশত্রুতার চমৎকাব ইঙ্গিত আছে। আর তার প্রমাণও আছে। বিজ্ঞাপনের ঘোষণাও দেখো। কম্পিউটারে গল্পের সমস্যা চাপিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এবং কী আশ্চর্য, কম্পিউটার এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে। বলো, কম্পিউটাব ভুল করে?

এখনও সগৌরবে চলছে ছবিটা। পীযূষ ডাইরেক্টর যে সিংহ তাতে সন্দেহ কী?

পলকের জন্যে মনে হল মাধবীর, এই ছবিই কি নিরঞ্জনের মনে সন্তানক্ষুধা জাগিয়েছিল? এরপর পীযূষকে কম্পিউটার-ব্রেন বলা হবে হয়তো।

হলটাতে খুব বেশি লোক নেই, যারা আছে তারা টেবলের দিকে মুখ নামিয়ে। মনে হবে অফিস, কিন্তু লাইব্রেরী যে তা বুঝতেও দেরি হয় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে মাধবী অবশেষে ঠাহর করল, একেবারে কোণ ঘেঁষে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে যারা বসেছে, তাদের মধ্যে দেয়াল থেকে তৃতীয় জনই রাজেন।

অনুমান ঠিকই হয়েছে। মাধবী কিছুটা এগোতেই তার পায়ের শব্দে বাজেন মুখ তুলল। গোটির ওপরে বুড়ো আঙুল রেখে যেন অবাক হয়ে দেখল মাধবীকে। যে পত্রিকাটা পড়ছিল সেটাকে বন্ধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল হাসি মুখে, দেখা হওয়াটাই এমন মূল্যবান যে কি করে জানলেন আমি এখানে আছি,

এখন কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি আলাপ একেবারে অসঙ্গত। আগে চলুন বাইরে যাই।

করিডরে এসে অপ্রতিভ মাধবী বলল, ড্রুরি লেনের শোরডিচ কাফেটেরিয়ায় বেলা একটায় লাঞ্চ করা যেতে পারে।

হাতঘড়ি দেখল রাজেন। কিন্তু ততক্ষণ?

মাধবী বলল, সেদিকেই আমার একটু কাজ আছে।

রাজেন বলল, ড্রুরি লেন? শোরডিচ? নাটকের মহলা?

মাধবী বলল, বেলা বারোটায় শুরু। খুব ধরেছেন তো।

ফুটপাতে দাঁড়াল ওরা। আঙুল তুলে ট্যাক্সির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজেন বলল, ড্রুরি লেনে শোরডিচের কাছে যদি কোন অভিনেত্রীর কাজ থাকে তবে সেটা ক্লাসিকের অভিনয় কিংবা মহলা, এটা বুঝতে শারলক হোমস না হলেও চলে।

ট্যাক্সিতে বসে মাধবী বলল, আমি কিন্তু আপনার কাজে বাধা দিলাম। রাজেন বলল, তা যখন দিয়ে ফেলেছেনই তখন অতীতকে বিদায় দিন—এই বলতো অমল। সুধীর বলতো, মৃতের কোন চিকিৎসা নেই। আমার মতে কোন কাজই এত মহামূল্য নয় যে বাধা দিলে ক্ষতি হবে।

মাধবী বলল, ট্যাক্সিকে বলুন কোথায় যাবে।

কথাটার জন্যেই ট্যাক্সিওয়ালা অপেক্ষা করছিল।

রাজেন বলল, ড্রুরি লেন, লেক এভেন্যু জংশন।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

দু এক মিনিটের জন্যে মাধবী একটা উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। বাজেন সিগারেট কেস বার করল। দুজনে সিগারেট ধরিয়ে নিল।

মাধবী বলল, কিন্তু সোজা ক্লাসিকে চলেছি কেন? খানিকটা নিছক ঘুরে বেড়ালে হতো না।

লাঞ্চের পরে যদি আবার মহলায় না যান খানিকটা ঘুরে বেড়ানোর সময় পাওয়া যাবে।

আমি যতক্ষণ মহলায় থাকবো?

শোরডিচের ওয়েটারদের সঙ্গে আমার মোটামুটি বোঝাপড়া আছে। বাবের পেছন দিকে একটা ময়লা টেবল আছে। এক কাপ কফি নিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ কাটানো যায়। কিন্তু আপনার পোশাক, চুলের কায়দা, পায়ের স্লিপার থেকে আমি বুঝতে পারছি, আপনার মন আজ ছুটি চাচ্ছে। মহলার চাইতে বরং অকশন ব্রিজ, অভিনয়ের চাইতে বরং ট্যুরিস্টদের ভঙ্গিতে শহরের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলো দেখে বেড়ানো।

হাসতে হাসতে মাধবী বলল, আপনার কলেজ পালানোর অভ্যেসটা এখনও আছে। নতুবা এমন নিখুঁত করে বলতে পাবতেন না।

রাজেন বলল, বটেই তো। আপনি ক্লাসিকের কর্তৃপক্ষকে বলে যদি আজ ছুটি নিতে পারেন কিম্বা লাঞ্চের পরে আর যদি না যেতে হয়, আমরা রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় গিয়ে সময় কাটাতে পাবি ; কিম্বা যদি টিকেট যোগাড় হয় সংস্কৃতি মাইফেলে গিয়ে দুচারটে বক্তৃতা শুনে আসতে পারি। অথবা যদি তেমন আপনার ভালো লাগে, সন্ধ্যায় রোমান ক্যাথলিক গির্জায় যেতে পারি। আজ কিসের একটা ধন্যবাদ দিবস আছে। সেন্ট পলসের অর্গ্যানিস্ট বাস্তবিক ভালো বাজায়!

মাধবী বলল, ক্লাসিকেই চলুন। যতক্ষণ মহলা চলবে, কিম্বা বেলা একটা অবধি এক ঘণ্টা সেখানেই থাকবেন। শর্ত এই, মহলার সময়ের কাঁচা অভিনয় দেখে হাসবেন না।

রাজেন বলল, এটা আমার একটা রোগ, পোশাক পরার আগে মানুষ, আর মঞ্চে উঠবার আগে নাটক আমার সহ্য হয় না।

ড্রুরি লেনে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সি। রাজেন বলল, লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে



সব গল্পের দিদিমা

থাকবো। এক ঘণ্টা আর কী এমন সময়? কিন্তু লাঞ্চের পরে কোথায়, তা ঠিক করা দরকার। সংস্কৃতির মাইফেলে যেতে হলে টিকেট যোগাড় করতে হবে। লাঞ্চের পরেই আবার বক্তৃতা সুরু হবে।

মাধবী বলল, কোথায় যেতে হবে তা নির্বাচন করার জন্যে আপনি এক ঘণ্টা সময় পাচ্ছেন।

শোরডিচ কাফেটেরিয়ার সামনে ট্যাক্সিকে বিদায় দিল রাজেন। কাফেটেরিয়ার সামনে করিডরের কথা আমাদের জানা আছে। করিডরে দাঁড়িয়ে রাজেন বলল, আপনাকে জানাতে পারি ক্লাসিকে যাওয়ার জন্যে যা দরকার অর্থাৎ সদস্য-কার্ড তা আছে আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে এদিকে এই অবসরে কারো কারো সঙ্গে দেখা করে নিতে পারি।

ক্লাসিকের সদস্যদের জন্যে নির্দেশ লেখা দরজার পর্দা ঠেলে মাধবী নেমে গেলে রাজেন কাঁচের ট্র্যাপডোর ঠেলে কাফেটেরিয়ায় ঢুকল। টেবল রিজার্ভ করল। তারপর পথে বেরোল। একটা পত্রিকা আছে রাজেনের। এ পাড়ার কোন ব্যবসাদার তার ক্ষুদে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে কিনা যাচাই করে দেখলে হয়।

প্রিয় পাঠিকা, অভিনয়ের মহলা সম্বন্ধে কৌতূহল থাকাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করি। কিন্তু গল্পটাকে সংক্ষিপ্ত করা দরকার, এই সুযোগে বরং মাধবীর হাউসকিপার সুরঙ্গমার কথা বলে নিই।

হাউসকিপার শব্দটার বাংলা আমার জানা নেই ; অনুমান করি, বিদেশি প্রথাটাকে যখন নেয়া হয়েছে শব্দটাকেও নেয়া যেতে পাবে। এমন অনেক কিছুই রোজই এসে যাচ্ছে সমাজে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কথা ধরুন। তারা নতুন নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যাধিক্যটা? তাদের সংখ্যা এখন প্রতি দশজন শ্রমিকে একজন হবে। কিম্বা কিছু বেশি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, নখকাটা, দাড়িকামানোর গ্যাজেট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর অতিকায় কমপিউটারগুলো পর্যন্ত ইলেকট্রিকের প্রসার।

মাধবীর হাউসকিপার সুরঙ্গমা— সেকালের আধুনিক এই নাম থেকেই বুঝতে পারা যাবে তার বয়স চল্লিশের সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।

ফ্রিজিডেয়ারের ওপরে ছোট টাইমপিসটায় বারোটার কাছাকাছি সময় হল। এক কাপ চা ভিজিয়ে নিয়েছে সে। মোটামুটি প্রায় আধঘণ্টা এখন তার বিশ্রামের সময়। এসময়ই সে চা শেষ করতে করতে খবরের কাগজটাকে পড়ে নেয়। এটা তার নিজের কাগজ। মাধবীর জন্যে যে কাগজ সেটায় তার সুখ হয় না। মস্ত প্রকাণ্ড চেহারার সেই কাগজ মাধবী কবেই বা পড়ে! টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষালের সময় থেকে আছে। আকারের বিরাটত্ব এবং স্থূলতাই প্রমাণ করে কাগজটা টেকনোক্র্যাট শ্রেণীর।

চা ঢেলে নিয়ে সুরঙ্গমা টুলটাকে বাঁ দিকে খানিকটা ঠেলে দিল। ওদিকে একফালি রোদ এসেছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসলে ভালো হবে। পিঠের পেশীতে আজ ব্যথাটা লাগছে না বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে রোদ তার পিঠের পক্ষে খুবই উপকারী। সেদিক থেকে দিনটা আজ বিশেষ ভালো। রোদটা আজ উজ্জ্বল, খানিকটা উত্তাপও আছে।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম পাতার ওপরে চোখ রাখল সুরঙ্গমা। ট্রাম-শ্রমিকদের মাইনা বাড়ার কোন সংবাদ সে আশা করেছিল, কিন্তু স্কুললিভিং পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা দেখতে পেল বরং। ছেলেকে এবার লেখাপড়ায় একটু বেশি করে মন দিতে বলতে হবে। আর তার নিজের চশমাটাকেও বোধহয় বদলানো দরকার।

আজ তার স্বামীর সকালে ডিউটি নেই তা সে কাল রাত্রিতেই জানতে পেরেছিল, আর কাল সকালের কাগজেই জানা গিয়েছিল ট্রাম-শ্রমিকদের মাইনা বাড়ার ব্যাপারে দুপক্ষে কোন নিষ্পত্তি

হয় নি। আজ ধর্মঘট শুরু আর সেটা নাটকীয়ভাবে কোন কর্মব্যস্ততার মুহূর্তে হবে। সেইজন্যেই অত সকালে বেরিয়ে গিয়েছে তার স্বামী। এটা যে নতুন তা নয়। বিশ বৎসর সে স্বামীর সঙ্গে আছে আর বিশ বৎসরই এই ট্রেড-ইউনিয়ান ব্যাপারটা তার মনে আশঙ্কার বিষয় হয়ে আছে।

এসবই কারণ যার জন্য কাল রাত্রিতে সে বাড়ি গিয়েছিল, যদিও কাল ছুটির দিন ছিল না।

হাউসকিপারদের ট্রেড-ইউনিয়ান নেই। কোন কোন চাকরিতে তা থাকা উচিত কিনা এ নিয়ে সন্দেহ আছে। হাউসকিপার, প্রাইভেট সেক্রেটারী, চেম্বারমেইড— এ চাকরিগুলো মালিকপক্ষের সঙ্গে কর্মচারীকে এত ঘনিষ্ঠ করে, শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা ভাবাই যায় না। বরং বিশেষ করে হাউসকিপারদের বেলায়, মালিকপক্ষের সঙ্গে একাত্মতা না জন্মালে চাকরির বিশেষ যোগ্যতার অভাব প্রমাণ হবে। একাত্মতা না বলো, বিশ্বস্ততা! মালিকপক্ষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুই তোমার কাছে গোপন থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবিকার খাতিরেই সে সম্বন্ধে তোমার স্বামীকেও বলা চলে না। তোমার চাকরি যেতে পারে, মালিকপক্ষ হঠাৎ দেউলে হয়ে যেতে পারে, কিম্বা সুরঙ্গমার জীবনে যা হয়েছে—সেই বর্ধিষ্ণু চিত্রকর যার হাউসকিপার ছিল সুরঙ্গমা—তার মতো আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটতে পারে ; তখন নতুন চাকরি পাওয়ার এটাই সব চাইতে বড় আশ্বাস হবে যে তোমার পুরানো মালিকপক্ষ তোমার বিশ্বস্ততায় তিলমাত্র সন্দেহ করে নি। মালিকপক্ষের মৃত্যুর পর তুমি স্মৃতিকথা লিখতে পারো কিনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অন্যান্য প্রায় সব জীবিকারই স্কুল আছে, হাউসকিপারের তা নেই। একখানা মাত্র উল্লেখযোগ্য বই আছে বাজারে। আর তাতে একটা পরিচ্ছেদে স্মৃতিকথা লেখার প্রশ্ন তুলে বরং সতর্ক করেই দেওয়া হয়েছে, তা লিখলে হাউসকিপারদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে মালিকপক্ষের মনে অবিশ্বাস দেখা দেবে।

ট্রেড-ইউনিয়ান না থাকলেও হাউসকিপারদের সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। অবশ্য এই ছুটিগুলোর অর্ধেক ভোগ করা যায়, যখন মালিকপক্ষ সপ্তাহান্তিক ভ্রমণে বার হয়। নতুবা ছুটির বদলে ওভারটাইম নিতে হয়।

কিন্তু কাল বিশেষ ছুটি নিয়ে রাত এগারটার শেষ ট্রামে সে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরতে একটু দেরিই হয়েছে তার।

খুব সকালেই উঠেছিল সুরঙ্গমা। কিন্তু তারও আগে তার স্বামী শয্যাত্যাগ করেছে। সে যতক্ষণ দাড়ি কামাচ্ছে, সুরঙ্গমা তার খাবার তৈরি করেছিল। তারপরে তার স্বামী এসেছিল রান্নাঘরে। খাকি প্যান্টে সাদা জামায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। দীর্ঘ একহারা চেহারা। গালের গোলালো ভাবটার অভাবে নাকটাকে আরও উঁচু দেখায়। মাথার সামনে একগোছা রুপোলি চুল। তার নাকটাকে অন্য কেউ বদখত রকমের উঁচু বলতে পারে, কিন্তু এখন সেটাকেই যেন সুরঙ্গমার ভাল লাগে। সাদা শার্টের ওপরে সে যখন খাকি কোটটা পরা শেষ করেছে, সুরঙ্গমা তার একখানা হাত তুলে নিয়ে নিজের গালের ওপরে চেপে ধরেছিল। হাত ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে অনুরোধ করছিল, একটু সাবধান কিন্তু।

এই কথাটুকু বলতে গিয়েই সুরঙ্গমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। নটার আগে ব্রেকফাস্ট করে না মাধবী। আর সুরঙ্গমার পটু হাতে ব্রেকফাস্ট গুছিয়ে দিতে চল্লিশ মিনিট যথেষ্টর চাইতে বেশি। কিন্তু মাধবীকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে এসে সে অনুভব করছিল তখনও সে হাঁপাচ্ছে। এটা এখন আর দু-চার মিনিটে যায় না। সারাদিন ধরে চেষ্টা করে করে নিঃশ্বাসে সমতা আনতে হবে। যদিও ডাক্তারের মতো অনেকটাই এর মানসিক। ফ্যাটি ডিজেনারেশান নয় সত্যি।

সাদা এপ্রন আর বনেট খুলে সুরঙ্গমা সেগুলোকে ফ্রিজিডেয়ারের পাশের কাবার্ডে তুলে রাখল। তার স্বামী নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ আর অভিজ্ঞলোকের চালচলন সাবধানই হয়ে থাকে।

পিঠে রোদ লাগছে সুরঙ্গমার। এটা তার চল্লিশ বছরের পিঠের পক্ষে ভালো। পেশীগুলো কী

সত্যি স্থিতিস্থাপকতা হারায় এ বয়সে? সুরঙ্গমার ব্লাউজের পিঠের বোতাম একটা খুলে গিয়েছে। গাজর রঙের খানিকটা পিঠে রোদ পড়ছে এখন।

আসলে ট্রাম এঞ্জিনিয়ারদেরও মাইনা বাড়া দরকার নতুবা ছেলেমেয়েকে একই সঙ্গে কলেজে পড়ানোর বোঝা সহ্যের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আর ট্রেড-ইউনিয়ান, যেখানে পার্ট-টাইম কাজের জন্যে সুরঙ্গমার স্বামী মাইনে পায়, সেটা কম হলেও তাতে ফ্ল্যাট ভাড়াটা দেয়া চলে। বেতন নিলে ঝুঁকিও নিতে হবে।

সুরঙ্গমা হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাল। এখন তাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আজ ঘরদোর মুছবার দিন। তাছাড়া ধোবিখানায় যেতে হবে। কাল দেখা গেল ভালো মদ কিছু নেই। অসুবিধায় পড়তে হতো কালকের ডিনার অন্য রকম হলে।

নিরঞ্জন ঘোষাল চলে যাওয়ার পর মাধবীর লাঞ্চে ওয়াইন জাতীয় কিছু থাকছে না। ডিনারেও কী চাইবে মাধবী তার অপেক্ষা করে থাকে সুরঙ্গমা। অন্তত এখন যে মদ ডিনারের শেষে চায় মাধবী, তা তেমন কড়া নয়, তেমন প্রচুর নয়, নিরঞ্জনের সময়ে যেমন ছিল। এটাই মাধবীব পক্ষে স্বাভাবিক, বরং নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, অন্তত টেকনোক্র্যাটদের ঘরে জন্মায় নি, যদিও অনেক দুব উঠেছে, যার প্রমাণ এই ফ্ল্যাট, এই ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা।

কিন্তু তা হলেও কালকের ককটেইলটা বরং অস্বাভাবিকই ছিল। পাঁচ কোর্সের ছোট ডিনার চার জনের জন্যে। মাধবী এক সময়ে পরামর্শ নেয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল, তোমার কি মনে হয় সাইডাব চলতে পারে ডিনারের শেষে, কিম্বা এইল? ব্র্যান্ডি আর কমলার জুসে কি ককটেইল হতে পারে? যেন মাধবী কোন অভিভাবিকা, ছুটিতে প্রত্যাগত ছেলেমানুষদের ডিনারের ব্যবস্থা করছে। অথচ মাধবীর নিজেব বয়সই বা কী হযেছে, কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

অবশ্য, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়, বয়স আর অভিজ্ঞতার বয়স এক নয়। পুরুষবন্ধুদেব বয়স বেশি হলে কম বয়েসেই বেশি বয়েসের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে মেয়েদের। আর মাধবীর সঙ্গীদের অনেকেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। নিরঞ্জন পঁয়তাল্লিশের দাগ অবশ্যই পার হয়েছিল।

প্রত্যেক জীবনের কতগুলো শর্ত থাকে। মাধবীর জীবনের শর্ত অনুসারে বয়স্ক লোকেরাই তার বন্ধু হবে। কারণ একজন নর্তকী বা অভিনেত্রীকে সমাদব করতে তারাই পারে, যারা আর্থিক ব্যাপাবে স্বাধীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, যারা সমাজে প্রতিপত্তির দরুণ বিরূপ আলোচনাকে আমল দেয় না। তেমন প্রতিষ্ঠা পেতে বয়স চল্লিশের কাছে চলে যায়।

কাল যারা এসেছিল তারা ছাত্রই যেন, অবশ্য এমন নয় যে সাইডার খাবে ডিনারের শেষে। পোর্ট দিয়েছিল সুবঙ্গমা। আর তার পরে বার্গাণ্ডি, আর তাতে তারা ভয় পায় নি। কিন্তু কি হালকা কণ্ঠস্বর থেকে, কি উঁচু গলার হাসি থেকে বুঝতে পাবা যাচ্ছিল, তারা যদিবা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে থাকে এখনও ছাত্রদের অভ্যাস ছাড়ায় নি। ডিনার শেষে তারা অকশন ব্রিজ খেলতে বসেছিল মাধবীর শোবার ঘরে।

এটা হয়ত খেয়ালই মাধবীর, তার বেশি কিছু নয় যে কাল রাত্রিতে তার ছাত্রদের সংসর্গ ভালো লেগেছিল, পোর্ট আব অকশন ব্রিজের হালকা একটা রাত্রি। তা ছাড়া আর কীই বা প্রমাণ হবে। নতুবা এমন মনে করতে হয় মাধবীর সেই সব চল্লিশ-উত্তীর্ণ বন্ধুরা সরে গিয়েছে।

কোন কথা মনের মধ্যে কী ভাবে চলতে চলতে কখন কোন চেহারায় বেরিয়ে আসবে তা কল্পনা করা যায় না। হঠাৎ এমন প্রশ্ন উঠল সুরঙ্গমার মনে, মাধবীর আয় যদি পড়ে যায়?

এই সব ব্যক্তিগত চাকরিতে সুবিধা অনেক আছে, কিন্তু এই মহা অসুবিধে যে মনিবের কিছু হলে সে ক্ষতি কর্মচারীর ওপরে তিনগুণ হয়ে লাগে।

কে এমন তার মতো ভুক্তভোগী? এই ব্লকেই সে দশ বছর চাকরি করছে হাউসকিপারের।

দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটে সেই স্মগে অন্ধকার, শীতে কাঁপানো কান্নার সকাল আসবে তা কেউ কল্পনাতেও আনে নি। কিন্তু সেই চিত্রকর আত্মহত্যা করল। তখন কিছুদিনের মধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল না এলে সুরঙ্গমাকে এখনও হয়তো বেকার থাকতে হতো। আর হাউসকিপার একবার দীর্ঘদিন বেকার থাকলে বাসি ব্রেকফাস্টের মতো চিরকালের অস্পৃশ্য হয়ে যায়।

মাধবী দেউলে হলে সুরঙ্গমার চাকরি থাকবে না। অথচ ঠিক দুমাস আগেই বাসনপত্তর ধোয়ার কলটা কিস্তিতে বন্দোবস্ত করে বসানো হয়েছে সুরঙ্গমার নিজের ফ্ল্যাটে।

মাধবীর এটা উঠতি সময়। কিন্তু অত্যন্ত খরচের হাত তার। নিরঞ্জন থাকতে যে মান ছিল, তাকে রাখতে গিয়ে এরই মধ্যে কিছু কিছু ধার হয়েছে। এখন তার প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের সরে গেলে চলে না।

অবশ্য এসবই অমূলক উৎকণ্ঠা হতে পারে। সকালে ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকে সুরঙ্গমা যে মাধবীকে দেখতে পেয়েছিল সে একেবারে সকালের রোদের মতো ঝরঝরে তাজা। ম্রিয়মাণ নয় বরং উৎসাহিত। সুরঙ্গমার ভয়ের কারণটার মূলে উৎকণ্ঠা ছিল। এই আত্মসমালোচনা করল সে। ট্রামশ্রমিকদের ধর্মঘটই সেই উৎকণ্ঠা। শ্রমিকনেতাদের কখনও কখনও বেকায়দায় পড়তে হয়। শ্রমিকনেতাদের স্ত্রীদের মনে ধর্মঘটের মুখে একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সে আশঙ্কা তার বেলায় সত্যি হলে, ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দূরে থাক, বহুদিনের চেষ্টায় সাজানো ফ্ল্যাটটাকেও ছাড়তে হতে পারে। এ অবস্থায় নিজের চাকরির ওপরে দরকারের চাইতে বেশি টান দেখা দেয়।

খবরের কাগজটাকে ভাঁজ করে রাখল সুরঙ্গমা। এবার কাজে লাগতে হবে। এখানে অবশ্য অনেক বিষয়ের সুবিধা আছে। চিত্রকরের ফ্ল্যাটে তা ছিল না। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, রেফ্রিজারেটার, রেগুলেটেড কুকার, অটোডিশওয়াশার এসব বিষয়ে নিরঞ্জনের রুচি আধুনিক ছিল। আর সে যে একজন প্রকৃত টেকনোক্র্যাট ছিল তার প্রমাণ এসবগুলোকে ফ্ল্যাটে আনতে সে অঙ্ক কষতে বসে নি। অন্যদিকে দেখো, ঘর গুছিয়ে তোলার আগ্রহই দেখা দিয়েছিল। দাড়ি কামানোর গ্যাজেট থেকে ইলেকট্রিক ম্যাসাজার— কিছুই যোগাড় করতে ভুল হয় নি।

আগে বিছানা রোদে দেয়া। মাধবীর শোবার ঘর শীততাপনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এটা সুরঙ্গমার বৈশিষ্ট্য যে সেকেলে ধারায় অন্তত সপ্তাহে দুবার বিছানাকে হাওয়ায় মেলে দেয়। চেয়ার জড়ো করে তার ওপর দিয়ে তোষক, রাগ, বালিশ পিরামিডের মতো করে সাজিয়ে দিল সুরঙ্গমা। রোদটা বেশ ঝকঝকে।

চাকরি, পেশা—সুরঙ্গমা এমন একটা শ্রেণীতে জন্মেছে যাদের পক্ষে চাকরি নেয়া আবশ্যিক। সেদিক দিয়ে সে, মাধবী আর তাদের মতো হাজার হাজার মেয়ে একই পথের পথিক। টেকনোক্র্যাটের মেয়েরা বাদে চাকরি ছাড়া কারই বা চলে?

পেশার ব্যাপারটা কিছু কৌতুকের। কে কী পেশা ধরবে তা বলা যায় না ; গুণ, পটুতা যতখানি, প্রায় ঠিক ততখানি ঘটনার পরম্পরা বলে দেয় কার কী পেশা হবে। একটা বালিকাকে দেখে বলে দেয়া যায় না, সে কলগার্ল, স্টেনো অথবা নার্স, কিংবা ডাক্তার হবে। সুরঙ্গমা হাউসকিপার হয়েছে। কিন্তু একবার একটা পেশা ধরলে সেটাতে দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেটা মাধবীর মতো রূপসীর পক্ষেও সত্য।

সব হাউসকিপার এমন চিন্তা করে কি না কিংবা ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট স্বামীর সঙ্গে বিশ বছর কাটিয়ে সুরঙ্গমার চিন্তা এমন রূপ নিয়েছে, উপরন্তু সেই লোকটি ধর্মঘটের নেতৃত্ব করছে বলেই আজ বিশেষ করে সুরঙ্গমা ভাবছে, তা আমাদের জানা নেই।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা ঠেলতে ঠেলতে সুরঙ্গমা ভাবল, মাধবী যদি নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যাসগুলোকেও ছেড়ে দেয় ভালোই হবে। ওয়াইনটা লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর এ বিষয়ে আর

সন্দেহ কোথায়? অভিনেত্রী হিসাবে, কিম্বা নর্তকী হিসাবে যদি অর্থ উপার্জন করতে হয় শরীরের যত্ন করতেই হবে। টাইপিস্টের যেমন দশটা আঙুল, শিক্ষয়িত্রীর যেমন ধৈর্য, সাহিত্যিকের যেমন মস্তিষ্ক, মাধবীর তেমন রূপ।

এমন কি মাধবীর পেশাটা এ রকমই যে তাকে নিরঞ্জনের কথা মানতে গেলে পেশা ছেড়ে দিতে হয়। আদালত থেকে আসবার পর এখন এটা অন্তত এ ব্লকের সবাই জানে, মাধবী নিরঞ্জনের ছেলেপুলের মা হতে অস্বীকার করেছিল। ডিভোর্সের আবেদন নাকচ করে দিয়ে আদালত একবছর পৃথক থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেখানে এই পেশার যুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই তুলেছিল মাধবীর উকিল।

এটা অবশ্যই অনেক দামী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। কিছুমাত্র শব্দ হয় না। সুরঙ্গমার নিজের ফ্ল্যাটের জন্যে কিনবার সময়ে এটাকেও ক্যাটালগে দেখিয়েছিল সেলসম্যান। কিন্তু নাম দেখলেই বুঝতে পারা যায়। হাতলের গায়ে সোনালী রঙে লেখা টেকনোক্র্যাট ; কিন্তু কখনও কখনও সামান্য একটা শব্দ কী রকম আটকে ধরে মনকে। সুরঙ্গমা বোধ হয় তিন-চার মিনিট ক্যাটালগে এটার ছবির দিকে চেয়েছিল। যেন সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। সে কি আর একটু কষ্ট করলে গারস্থি মার্কা দেয়াটার বদলে টেকনোক্র্যাট মার্কাটাকে কিনতে পারবে না?

তখন সেই বদখৎ-বড় নাকওয়ালা মাথার সামনের দিকে রুপোলি চুলের গোছা-সমেত ট্রামকর্মচারী কথা বলেছিল (সুরঙ্গমার চোখদুটো স্নেহে কোমল হয়ে উঠল), আমরা তো প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থই, কী বলো? মেজাজ বুঝে সেলসম্যান সুর পালটে ছিল, কথায় সাম্প্রদায়িকতার সুর এনে বলেছিল, আমাদের মধ্যবিত্তদের পক্ষে গারস্থিই ভালো। টেকনোক্র্যাট মার্কায় সুপার ক্যাথোড লিনিয়াল ব্রেক বলে যা আছে তা যে ঠিক কী তা সে নিজেও জানে না। অথচ দামে প্রায় দেড়গুণ বেড়ে যায়।

সুরঙ্গমা সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, অনেক কথা সে তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনাও করেছে। যার ফলে যেটা অন্য অনেকে বুঝতে পারে না সেটা তার কাছে স্বচ্ছ — টেকনোক্র্যাট কথাটা সমাজে স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছে। তারাই প্রতিপত্তির দিকে বেড়ে চলেছে। এটা এই শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য যে তাদের অনেকেরই, যেমন নিরঞ্জনের বেলায়, নিজের টেকনিক্যাল ক্ষেত্রের বাইরে কিছুমাত্র রক্ষণশীলতা নেই।

কিন্তু সুরঙ্গমার ফ্ল্যাটটা রক্ষণশীল। কিছু একটা যেন আছে যা রোজকার রোজ বদলায় না। তারই দিকে লক্ষ্য রেখে রেখে সে নিজের ফ্ল্যাটটাকে গুছিয়ে তুলেছে। ফ্ল্যাটের পর্দাগুলো, কারুকার্যবর্জিত জ্যামিতিক গড়নের আসবাব, সাদামাটা পর্সিলিনের বাসন, গারস্থি মার্কা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, গৃহস্থ মার্কা ডিশওয়াশার, ঘরোয়া মার্কা রেফ্রিজারেটর। সুরঙ্গমা বলতে পারে, বিজ্ঞাপন তাকে সব সময়ে বেসামাল করতে পারে নি। কথাটা হয়তো তার সংস্কৃতি।

মাধবীর মধ্যেও এমন একটা শক্ত হতে পারার ক্ষমতা আবিষ্কার করতে পেরে সুরঙ্গমা খুশি হয়ে উঠল। নিরঞ্জনের মতো একজন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, প্রকৃত টেকনোক্র্যাটের আদরেও যা আত্মবিলোপ করে নি।

এমন কিছু এখনও আবিষ্কার হয় নি, যার সাহায্যে সন্তানধারণের আগেকার আকৃতি বজায় রাখা যায়। সন্তানরা পেট আর বুকের গড়নকে ধ্বংস করবেই। মাধবীর মূল্য তাতে অনেকটাই কমে যেতো।

হাউসকিপারদের কথা আলাদা। একটু মোটা গড়নের, আর হালে শরীরে একটু মা-মা ভাবটাই হাউসকিপারদের মধ্যে দেখতে চায় মালিকশ্রেণীর লোকেরা।

ফ্লানেলের টুকরো দিয়ে শার্সির কাচগুলো মুছতে হবে এবার।

একটা জানালা খুলে তার সামনে দাঁড়াল সে। আজকের দিনটা বেশ খটখটে তা মানতেই হবে।

সারা বছর এরকম রোদ থাকলে পিঠের পেশীর জন্যে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। নতুবা—

বোম্বাইএর বিচে এক ছুটিতে গিয়েছিল সুরঙ্গমা। পনের দিন ছিল তারা সেখানে। সেই রোদে তার স্বামীর আর তার নিজের গায়ের রং লালচে বাদামি হয়ে উঠেছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে স্বামী বলেছিল, এখন তুমি চাকরিতে গেলে কিছুদিন কষ্ট হবে। কথাটা এমন একটা মোহ তৈরি করেছিল যে কিছুক্ষণ সুরঙ্গমা কিছু বলতে পারে নি। কিন্তু তার স্বামীও জানতো, সেও জানতো, পনেরো দিনেব ছুটিতে সঞ্চয়ের প্রায় সবটুকুই খরচ করে ফেলেছে তারা। চাকরিতে ফিরে না গেলে ফ্ল্যাট-লিজের কিস্তি শোধ করাই যাবে না। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা দূরে থাক। আর ভবিষ্যতের পবিকল্পনা মানে সহজ কথায় ছেলে-মেয়ে দুটির ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি করা, যাকে সংস্কৃতিই বলতে হয়।

তার চাকরিটা এমন যে সপ্তাহে দেড়দিনের বেশি ছেলেপুলের সঙ্গে বাস করতে পারে না সে। তাতে অবশ্য খুব অসুবিধাও হয় না। তেমন দরকার হলে টেলিফোনে কথা বলা যায়। উৎসব করতে হলে তারা এই মির্জা গালিব এভেন্যুর কোন রেস্তোরাঁয় আসে, একসঙ্গে লাঞ্চ করা যায়। এটা একটা আদর্শ বন্দোবস্ত নয় সেই সেকালের নিরিখে। মেয়ে বড় হয়েছে। কলেজে পড়ছে। ডেট দিচ্ছে বন্ধুদের। বলতে পারো, পক্স ইনকিউলেশন, পোলিও ইনজেকশন, ব্লাডগ্রুপ নির্ণয়, ইত্যাদি ছোটখাটো প্রাথমিক সংস্কৃতির ব্যাপাবগুলো থেকে শুরু করে কনভেন্টে পড়ানো ইত্যাদি ট্রামশ্রমিকের টাকাতেই হতে পারে। কিন্তু মনে করো, তার মেয়ে যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ডিশওয়াশাব, রেফ্রিজারেটব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে কিম্বা অটোমোবাইল চালাতে না জানে? সেজন্যই অন্তত এই গ্যাজেটগুলোকে নিজেদের ফ্ল্যাটে রাখা দরকার। একটা ছোটখাটো গাড়ির অভিজ্ঞতা দরকার। মেয়েকে তার সংস্কৃতির সাহায্যেই সমাজে আদর পেতে হবে। এসবেব বন্দোবস্ত করতে হলে সুবঙ্গমার চাকরি করা ছাড়া উপায় কী? না, না, সুরঙ্গমা প্রায় নিরুপায়। এমনিতেই তার মেয়ে একটু সেকেলে। যেমন, ধরো, আজকাল যেটা প্রায় সংস্কৃতির চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই অন্তত একবার কোন ভালো হসপিট্যালে গর্ভপাত করানো, তা থেকে তার মেয়ে রাগে পিছিয়ে থাকবে। না, সুতরাং, অন্তত গ্যাজেটগুলো দরকার। তার স্বামী একদিন বলেছিল, সময় বাঁচানোর জন্যই গ্যাজেট কিন্তু গ্যাজেটগুলো কিস্তিতে কিনতে আমাদের দুজনকেই চাকবি করতে হচ্ছে। সময়টাই হারিয়ে গেল। কিন্তু এটা রসিকতা ছাড়া আর কী হতে পাবে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে।

মাধবীরও পেশার ওপরে টান থাকা স্বাভাবিক। শার্সিগুলো খুব কম সময় নিল। সুরঙ্গমা প্যানট্রিতে ফিরে এল। বেতের একটা হাল্কা কেস আর প্যারাসল নিয়ে সে ধোবিখানায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হল।

টেকনোক্র্যাটদের রীতিনীতি একটু চঞ্চল। কেউ কেউ বলে ডাইনামিক। কেউ টের পাবে না, একদিন দেখা যাবে পোশাকে রদবদল হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে সিল্কে ফিরে এসেছে টেরিলিনের বদলে। তেমনি হয়তো এই ছেলেমেয়ের ওপরে ঝোঁক। সুরঙ্গমা ঠিক করলে, সপ্তাহান্তিক ছুটিতে এবার যখন সে ফ্ল্যাটে ফিরবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে, সন্তানপালন করাটা ফ্যাশানেবল হয়ে উঠেছে কি না। কয়েকদিন রোজ খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়লেই ব্যাপারটা ধরা যাবে। দেড়টা বাজে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে সুরঙ্গমা লিফটের খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াল।

যে দরজা দিয়ে মাধবী ক্লাসিকে গিয়েছিল, দেড়টার দু-এক মিনিটের মধ্যেই সেই দরজা দিয়েই সে ফিরে এল। রাজেন ইতিমধ্যে ফিরে এসে আটকে রাখা টেবলটায় অপেক্ষা করছে। মাধবী বসতেই লাঞ্চ এল।

অভিনয়ের মহলার পর গাল দুটো এখন আরক্তিম। উষা-ভ্রমণের পর এরকম হলে যে স্বল্প

ঘর্মাক্ততা থাকতো এখন তেমনটা দেখা যাচ্ছে না. অনুমান করি পরিশ্রমটা মানসিক, সবিশেষ বলতে হলে, আবেগের।

মাধবী বলল, রাজেনবাবু, ক্লাসিকের সদস্যকার্ড আপনার আছে তা শুনে গিয়েছিলাম।

রাজেন বলল, না বললে মনে হতো মিথ্যা ব্যবহার করলুম। যদিও ক্লাসিকের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে আবহাওয়া, বাজারদর, এমন কি কুকুর-প্রদর্শনী নিয়ে আলাপ করে, ক্লাসিকের কথা বলে না।

মাধবী বলল, সুতরাং আমরাও বলবো না।

রাজেন বলল, সংস্কৃতি মাইফেলের দুখানা টিকেট পাওয়া গিয়েছে। লাঞ্চের পরেই আবার শুরু। জেনে নিয়েছি চারটে প্রধান বক্তৃতা হবে এ বেলায়। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সিম্পোসিয়াম কথাটার চাইতে মাইফেল কথাটাকে চালু করা ভাল।

মাধবী ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে মুখ তুলল।

রাজেন বলল, অন্যদিকে আমি প্রকৃতপক্ষে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট নই কিন্তু তাই বলে প্রায় সমবয়সী একজনকে নিয়ে যদি নিছক পথে পথে ঘুরে বেড়াই তা হলেও কিছু বেমানান হয় না। অথবা আমরা রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে বেড়াতে পারি। কিম্বা মনুমেন্টের পাশে গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে পায়রা ওড়া দেখতে পারি।

মাধবী বলল, ও কয়েকটি আর একদিনের জন্যে তোলা থাক। আজ আমরা সেমিনারে যাবো। সেমিনারে এখন কী আলোচনা হচ্ছে বলুন। যাকে পূর্বাভাস বলে।

রাজেন বলল, আপনার ঝাল লেগেছে দেখছি।

ওয়েটারকে ডেকে আইসক্রিম আনতে বলে দিল রাজেন. মাধবী বলল, সেমিনারের আলোচনার অর্ডার দিয়েছিলাম।

রাজেন বলল, কতদূর এগিয়েছে তা জানি না। যতদূর আন্দাজ করেছি বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি আর মানবিকী সংস্কৃতি নামে যে কুৎসিত পরিভাষা দুটো তৈরি হয়েছে, ঝগড়াটা তাদের মধ্যে। আরও বেশি জটিল হয়েছে এজন্য যে দুটি দলই দুই-দুই উপদলে বিভক্ত।

কথা বলতে বলতে রাজেন, টম্যাটো সসের বোতল, সল্টসেলার, জলের গ্লাস আর নিজের বুড়ো আঙুল উঁচু করা বাঁহাত পরস্পরের থেকে প্রায় সমান দূরে রেখে একটা চতুষ্কোণের আভাস তৈরি করল টেবলের ওপরে।

মাধবী বলল, এর মধ্যে আপনি কোন দলে আছেন, কিম্বা আমার কাল রাতের ব্রিজ-পার্টনার সুধীর ডাক্তার?

রাজেন হেসে ফেলল, আমরা তো সেমিনারে যাচ্ছি। আলোচনা শুনে বুঝতে পারবো আমরা কে কোন দলের। আমাদের মেডিকোর কথা বলতে পারি, তার একটা সুন্দর পরীক্ষা আছে। আপনার ভ্যাকসিনেশন হয়েছে? টাইফয়েড ইনোকিউলেশন হয়েছে? বিসিজি টীকা নিয়েছেন? ব্লাড কোন গ্রুপের তার পরীক্ষা করিয়েছেন। কোন কোন জিনিস খেলে আপনার অ্যালার্জি হয়, তার তালিকা প্রস্তুত তো? এসবই যদি হ্যাঁ হয়, তবে বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক সংস্কৃতিতে আপনি অনেক দূর এগিয়ে আছেন।

মাধবী জল খেয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছে বলল, কফি আসুক। এগুলোর একটাও কিন্তু আমার করানো হয় নি।

রাজেন হেসে বলল, সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে আপনার সম্বন্ধে এখনই হতাশ হতে হবে কি না।

পুরনো কথার জের টেনে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, আর আমাদের ট্যাকটিশিয়ান অমল?

রাজেন বলল, সে ভারি মজার কথা। অমল অঙ্ক কষতে অভ্যস্ত, মিসাইল নিয়ে তার কারবার। বলা যেতে পারে মিসাইলের প্রায়োগিক উন্নতিই তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু সে দিন রাত শুভ-অশুভের কথা বলে। তার যুক্তি এই, মিসাইলের সুইচ টিপে দিলে সেটা অঙ্কের হিসাবে ইলেকট্রনিকসের সাহায্যে লক্ষ্যকে চুরমার করবে। কিন্তু লক্ষ্যটা একটা শহর হতে পারে। সুতরাং অঙ্কের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে। তার ঝোঁকটা মানবিকী সংস্কৃতির দিকে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু সে আকৈশোর অঙ্ক ও ইলেকট্রনিকস নিয়ে ডুবে আছে, অনুমান করি, তার এই ঝোঁকটা পড়ে শেখা নয়, দেখে শেখা। সে বোধ হয় মানবিকী উদ্বাসনী গোত্রের। রাজেনের বলবার কায়দায় মাধবী হেসে ফেলল।

কফি এসেছিল। সময় দেখল রাজেন। সেমিনারের লাঞ্চ-উত্তর বৈঠকে গোড়া থেকে যোগ দিতে হলে উঠতে হয়। উঠে দাঁড়াল তারা। বিল মিটিয়ে দিল মাধবী। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে পাশাপাশি হেঁটে বার হল তারা কাফেটেরিয়া থেকে।

অনুভূতিকে চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময়ে অনুভূতির ওপরে সুবিচার হয় না। মাধবী অনুভব করল, নিরঞ্জন ঘোষালের সঙ্গে কাটানো অনেকদিনের লাঞ্চ-উত্তর ঘণ্টাগুলো থেকে এগুলো পৃথক হতে চলেছে। রাজেনকে তার বন্ধুরা পরিহাসছলে দার্শনিক বলেছিল কালকের ডিনারে। গোটিযুক্ত রাজেনকে অল্পবয়সী দার্শনিকের মতো দেখায় ; অল্পবয়সী, যদিও মাধবীব চাইতে দুচার বছরের বড়ই হবে।

ট্যাক্সির অপেক্ষায় ফুটপাতে দাঁড়াল তারা। আর তখন মাধবী আবার ভাবল, মাধবী নিজেও যদি দর্শনের ছাত্রী হতো তাহলে রাজেনের কাছে পরীক্ষার খাতিরে তত্ত্বের কথা জানতে চাইতো। আর তা স্বাভাবিকই হতো। এখনও যদিও সে দর্শনের ছাত্রী নয়, তেমন খোলা মনে জানতে চাইলে কি ভালো লাগবে না?

কিন্তু অনেক সময়েই নিজেরা চেষ্টা না করলেও এমন ব্যাপার ঘটে যাতে পরিকল্পনা বদলে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন তারা ট্যাক্সি পেল না তখন শোরডিচের গেটম্যানের শরণ নিতে হল। তার কাছে জানতে পারা গেল ট্রাম ধর্মঘট সুরু হয়েছে লাঞ্চের ঘণ্টা থেকে। বাসগুলোকে অন্য সব রুট সাসপেণ্ড করে অফিস পাড়ার দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, নতুবা লাঞ্চের পরে অফিসগুলোতে খুব কম কর্মচারীই ফিরতে পারবে। উপরন্তু অমনিবাস যেদিকে যায় ট্যাক্সিও সেদিকে চলে। আর ড্রুরি লেন এমন রাস্তা নয় যে পরিচালকদের বিশেষ বন্দোবস্তের আওতায় পড়বে।

শুনে রাজেন বলল, লেক এভেন্যু দিয়ে হেঁটে চলতে থাকলে হয়তো ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

রাজেন গম্ভীরভাবে বলল, লাঞ্চের ভিড়টা কমলে লেক এভেন্যুতে ট্যাক্সি আসতে থাকবে, কিম্বা এদিকে যে সব ম্যাটিনি চলছে তার কাছাকাছি ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে।

শোরডিচের গেটম্যান বলল, লেক এভেন্যুর ওপরে সুদেহী, সেখানে কুস্তির ম্যাটিনিও আছে।

হেসে রাজেন বলল, তুমি দেখছি খবর টবর রাখো। তা হলে মিসেস ঘোষাল, আমরা এগোতে পারি। আপাতত সুদেহীর দিকে।

মাধবী হাসল। অফিস পাড়া থেকে দর্শক নিয়ে দু-একটা ট্যাক্সি অন্তত সেখানে আসতে পারে। [illegible] গেটম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাঁটতে সুরু করল তারা।

[illegible] বাধা মানুষের উপকার করে থাকে। পাঠক, আপনি সংস্কৃতি সেমিনারের [illegible] রেহাই পেলেন। কিন্তু প্রিয় পাঠিকা, এতক্ষণে আমাদের কারো কারো মনে [illegible] য়গুলো সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মেছে। এ অবস্থায় মাধবী এবং রাজেন যতক্ষণ [illegible] ক এগোচ্ছে, আমরা সেমিনারের বিষয়ে সেদিনের যে কোন সান্ধ্য [illegible] জ উদ্ধৃত করতে পারি।

রিপোর্টাজ ঃ

লাঞ্চের পরে অধিবেশনের মূল সুরটা ছিল সমন্বয়ের। বৈজ্ঞানিক ও মানবিকী সংস্কৃতির পার্থক্যের ওপরে সাধারণত জোর দেয়া হয়ে থাকে। প্রোটেস্ট্যান্টরা যেমন নিজেদের বক্তব্যকে জোরদার করে বলতে অভ্যস্ত ছিল এক সময়ে, তাদের কারো কারো যেমন সবিশেষ পিউরিটানিক ঝোঁক ছিল, যেমন একরোখা ডগম্যাটিকতা কোন কোন মার্কসপন্থীব মধ্যে সেকালে দেখা যেতো, সাধারণভাবে সেরকম একটা কট্টরতা ইদানীং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিওয়ালাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু লাঞ্চের পরে এই চতুর্থ অধিবেশনে (কাল শুরু হয়েছে, কালকের লাঞ্চ, ডিনার, আজ সকালের ব্রেকফাস্টের পর তিনটি অধিবেশন বসেছিল) পার্থক্যর চাইতে বরং ঐক্যের উপরে জোর দেয়া হয়েছিল, সমন্বয়েব এটাই পদ্ধতি।

প্রথম বক্তা অধ্যাপক মুডার (কার্ল) বললেন ঃ আর্ট এবং বিজ্ঞান দুইই মূলত অবধারণের প্রক্রিয়া, সহজ ভাষায় বলতে গেলে কঠিনকে জানার পদ্ধতি। কেউ কেউ প্রদীপেব মিঠে আলো এবং আর্কল্যাম্পের দ্যুতিকে, এই দুইয়ের পার্থক্য বোঝাতে তুলনা দিয়েছেন। এই দুই মানসপদ্ধতিকে যখন আমরা একই সময়ে চিন্তা করি, একটা আপাতবিরোধ আমাদের চোখে পড়ে। নতুন হলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ হয়েছে, তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু আর্টের সাহায্যে অবধারণের প্রাচীন পদ্ধতির তেমন কার্যকরণ বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয় নি। তা হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, বিজ্ঞানজগতে আমাদেব ধাবণাগুলোর বৈপ্লবিক অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আর্টের সাহায্যে অবধাবণ প্রক্রিয়াকে আমরা বাতিল কবতে পারি না। মানুষ নিজের প্রয়োজনে এই দুই অবধারণ পদ্ধতিকে আবিষ্কাব করেছে। বিজ্ঞান বিষয় এবং ঘটনাব সত্তাসার নির্ধারণ করে, জগতে সেই বিষয় এবং ঘটনার স্থানিক এবং কালিক অন্বয় নির্দিষ্ট করে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বিগত-অনুভূতি, সুখদুঃখসম। অন্য দিকে আর্ট ব্যক্তিসাপেক্ষ। স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় এবং ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধিই আর্টের লক্ষ্য, আর্ট অনুভূতিনির্ভর। সংক্ষেপে বিশ্বের নিরিখে মানুষকে জানাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, অন্যপক্ষে আর্ট মানুষের নিরিখে বিশ্বকে জানতে চায়।

পরবর্তী বক্তা (অধ্যাপক ভলকার্ট) আর্ট এবং বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ঐক্যের আর একটি দিক তুলে ধরেন। সাধারণত বিজ্ঞান এবং আর্টে‌র পার্থক্য দেখাতে আবেগের উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন : সিম্যান্টিক বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনই আমরা বলতে পারি,—ভর এবং শক্তির মতো সংবাদও বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ। বস্তুর সামীপ্যে আসা মাত্রই আমরা যেমন তার ভরকে দেখতে পাই তেমনি তার সংবাদ আছে বলে বুঝতে পারি। এই সংবাদকে আত্মীকরণই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। তাকেই জানা বলি। বস্তুমাত্রেরই যেমন জাড্য তেমনি একটি নির্দিষ্ট মাপের অনির্দেশ্যতা আছে। তারই সাহায্যে সংবাদ গোপন থাকে। এই সংবাদ আমাদের মনে বাহিত হলে সেখানে এক আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই আলোড়নকে আমরা আবেগ বলতে পারি। এই আবেগকে বোঝাতেই আমরা উত্তাপ, ঘনত্ব, ভর, ইত্যাদি শব্দকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করি। অন্য কথায় আবেগ, যাকে আর্টের উপজীব্য বলা হয়ে থাকে, তা মনের ওপরে এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না। এদিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সংবাদ আবিষ্কারের চেষ্টা যা বিজ্ঞানের লক্ষ্য আর সংবাদজাত আবেগ পরস্পর সংলগ্ন।

নন্দনতত্ত্বের অধিকাব আর্টের সীমায় আবদ্ধ থাকছে না। আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন এটা তাঁর হবিমাত্র নয়। অণুর স্বরূপ সম্বন্ধে নীলস বোরের প্রস্তাবকে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার উদ্ভাস মনে করেছেন। আইনস্টাইনের নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে বলা যায়, তা মননের উৎকাঙ্ক্ষী মুহূর্তে স্বজ্ঞার উদ্ভাস। আর সেই অবস্থাটা তার সঙ্গেই তুলনীয় যখন মোৎসার্টের মতো

কোন সঙ্গীতকার তাঁর অলিখিত সঙ্গীতের সম্পূর্ণ সুবলহরীমালা একটি মুহূর্তেই শুনতে পান। এই স্বজ্ঞা, এই কান্তি অনুভব—এইতো আর্টের স্বকীয়ত্ব বলে এতদিন ঘোষিত হযেছে।

এব পরেও খববের কাগজে প্রথম বক্তা স্নুডাব (কার্ল) এর উত্তর আছে। কিন্তু তার উদ্ধৃতি দেয়া আমাদের দরকাবের নয।

বাজেন বলল, একটা কথা আমি কিছুক্ষণ থেকে ভাবছি। এই দুপুব রোদে আপনার সঙ্গে হাঁটাহাঁটি কবাটা ভালো হচ্ছে না।

মাধবী একটা কাজ করল। কাছাকাছি একটা টফি-লজেন্সের দোকান দেখতে পেয়ে তরতর করে সেদিকে এগিযে গেল। টফি কিনে ফিবে এসে বলল, নিন, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কি কোন দুপুরে হাঁটেন নি? কিম্বা ডালমুট চিবোতে চিবোতে খেলা দেখতে যান নি কোন সহপাঠিনীর সঙ্গে?

রাজেন টফি নিল, পকেটস্থ করল। বলল, অন্তত সন্ধ্যার অভিনয়ের সময়ে ক্লান্ত দেখাবে আপনাকে।

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয। এই কড়া বোদ ত্বক পুড়িয়ে দিতে পারে। একটু ভাবল মাধবী। হর্সটেইল সমেত মাথা দুলিয়ে বলল, আজ ছুটি আছে। দরকার হলে আরও দুদিন ছুটি নিতে পারি।

রাজেন বলল, বোদে ঘোরাব চাইতে তা হলে কি আমরা কুস্তির হলে ঢুকবো?

মাধবী হাসিমুখে বলল, আমাব মনে হচ্ছে লাইটওয়েট কুস্তি আমাব ভালো লাগতে পারে।

হলে ঢুকতে ঢুকতে রাজেন বলল, আমি কিন্তু পয়েন্ট গুণতে জানি না।

মাধবী বলল, দেখা যাক দুজনে মিলে হিসাব রাখতে পারি কি না।

লেক এভেন্যুর কুস্তির হল সুদেহী, খববের কাগজকে বিশ্বাস করতে হলে বলা যায়, শহরের আধুনিকতর কুস্তির হলগুলোর একটি হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্লাস্টিক ও ফাইবাব গ্লাসেব ব্যবহারের অনুপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয। এই সব প্রায়োগিক খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় হলটায় রোম্যান বিপুলতাকে অনুকরণ করার চেষ্টা হয় নি। সব বিষয়ের আদিম রূপে একটা সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা থাকে। এ হলটায় তেমন কিছু চোখে পড়ে যদিও তা হযতো অনিচ্ছাকৃত, প্রতিষ্ঠাতাব আর্থিক কুণ্ঠার ফলও হতে পাবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই টিকেট কিনবাব পোর্চ। বাজেনরা যখন পৌঁছল তখন কুস্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু কুস্তি জোড়ায় জোড়ায়, মধ্যে বিরতি রেখে রেখে টিকেট কাটাও চলেছে। অল্পবয়স্ক দর্শকদের মধ্যে এক জন প্রৌঢ়কে দেখতে পেয়ে রাজেন তাকে প্রোগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি কিছু না বলেই বলল, আরে, মশায়, তবে আর বলছি কী? এখন বোধ হয় লাইট হেভিওয়েট লড়ছে। ঘড়ির কাঁটায় সময় মাপা আছে, মশায়, একটুও নড়চড় হবে না। এর পরে লাইটওয়েট। আজও যদি সে জোড়াই থাকে তবে বুঝতে হবে এটা কৃত্রিম লড়াই। লড়িয়েরা এদের মাইনে করা।

মাধবী জিজ্ঞাসা করল, মাইনে করা?

হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী, তবে আর বলছি কী? আজই শেষ পরীক্ষা করবো। যদি চাঁপা ল্যাণ্ডট হারে তবে বুঝবো, ওদের নিয়ম হচ্ছে দুবাজি জিতে তিন বাজি হারা, আর তারপর পরপর তিন বাজি জিতে দুবাজি হারা। এর ফলে সাধারণ লোক বুঝতে পারে না, মশায়, কে কখন হারবে। কিন্তু দেখে নেবেন, আমি যদি কলকাতার খাঁটি বাসিন্দে হই, লাইটওয়েটে চাঁপা ল্যাণ্ডট হারবে এই বাজিতে।

রাজেন এমনটা আশা করে নি। সে লোকটিকে আর খানিকটা কথা বলানোর জন্যে জিজ্ঞাসা

করল, আমার এই সঙ্গিনীটি লাইটওয়েট দেখতে চান। আমরা কি জানতে পাববো কখন লাইটওয়েট শুরু হবে?

লোকটি বলল, তবে আর কী বলছি, সে সব ঠিক আছে। লাইট হেভির পরে ঘণ্টা বাজবে। পাঁচ মিনিট ইন্টারভ্যাল। তারপরে আপনারা আসনে বসবার জন্যে আবও দু মিনিট সময় পাবেন। আবার ঘণ্টা বাজবে। তবে আব কী বলছি, তিনবার ঘণ্টা।

লোকটি ফোঁস করে খানিকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে দিল।

রাজেন বলল তা হলে বেশ সাজানো গোছানো ব্যাপার। কী বলেন?

কিউ ধরে এগোতে এগোতে লোকটি বলল, তাই বলে মনে করবেন না— তবে আর বলছি কী, এ কি মশায়, সেই জিনিস কবি ভোলা রায় যাকে ক্লাসিক বলেছে? সব মিশেল দেয়া।

রাজেন বলল, ভেজাল কুস্তি বলছেন?

তবে আর বলছি কী? এই যে এত টাকা খরচা, স্কুল কলেজে শেখানো, মশায়, কিছুমাত্র ক্লাসিক নেই এতে। এব চাইতে রক্তারক্তি বক্সিংও ভালো যদিও তা রোমান্টিক। তবু তো বক্তটায় ভেজাল থাকে না।

লোকটা যৎপরোনাস্তি কৃশ। পরনে মার্কেন্টাইল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মতো একেবারে হালকাটের জামা প্যান্ট। চোখে সোনার ফ্রেমের ইন্টেলেকচুয়াল সানগ্লাস। টিকেট কাটা হয়ে গিয়েছিল তার। টিকেট নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সে হলেব দবজাব দিকে ছুটল, তবে আর বলছি কী, আসুন আপনারা।

রাজেন একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞাসা করল, রক্তটা ভেজাল নয় বলছেন? কিন্তু ততক্ষণে আমাদেব বন্ধু হলে ঢুকে পড়েছে।

মাধবী ঝিরঝিব করে হেসে ফেলল।

রাজেন বলল, আমি খুব দুঃখিত, কথা বলতে গিয়ে টিকেট কাটা হল না।

মাধবী বলল, আমরা তা হলে খানিকটা বসে নিতে পারি ওদিকেব ওই বেঞ্চগুলোর একটিতে। দেখতে পাচ্ছেন পয়েন্ট গোণাব কোন মূল্য নেই। কারণ কুস্তিগীরবা ওঁদেব মাইনে করা।

বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরাল রাজেন।

মাধবী বলল, দু বাজি জিতে তিনবাজি হারা, আর তারপর তিনবাজি জিতে দুবাজি হারা। আর তারপর বোধহয় দুবাজি জেতা।

মাধবী বলল, আমাদের বন্ধু যদি পদ্ধতিটাকে ধরতে পেরে থাকে তবে অন্ততঃ এই কুস্তি কুড়িবার দেখেছে।

রাজেন বলল, উনিশ বারও হতে পারে। এইবার বুঝতে পারবে পৌনঃপুনিকতাব চক্রটাকে ঠিক বুঝতে পেরেছে কি না। কিন্তু ভাবছি, ওরা যদি ল্যাঙটের রং বদলে ফেলে তবে চক্র ধরার তাগিদে আরও কতবার তাকে কুস্তি দেখতে হবে।

মাধবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু ঘণ্টা বেজে উঠল বিরতি জানিয়ে। পায়ের শব্দে বোঝা গেল, এবার দরজাগুলো দিয়ে জনস্রোত বেরিয়ে আসবে। তারপর তাদের দেখতে পাওয়া গেল। নানা বয়সের, নানা চেহারার পুরুষ, স্ত্রীলোক, যুবা, যুবতী, কিশোর-কিশোরী। চুলের সাজের নানা কায়দা, পুরুষদের নানা ডিজাইনের রঙদার জামা, মেয়েদের অত্যন্ত নিচু কাটের ব্লাউজ, স্কার্টের অনেক উঁচু ছাট, বুঝতে পারা যাচ্ছে তারা আধুনিক রুচি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কারো মুখ শুকনো, কারো মুখ লাল, কারো মুখে বিষণ্ণতা, কেউ বা রক্তহীন হয়ে পড়েছে। দেখে বুঝতে পারা যায়, কুস্তিটাকে পুরোপুরি উপভোগ করেছে।

রাজেন বলল, আমরা কি এই সময়ে হলে যাবো? মনে হয় না কুস্তি ভাঙবার আগে ট্যাক্সি

আসবে।

মাধবী বলল, কিন্তু ট্যাক্সি এসে যদি চলে যায়?

রাজেন বলল, এত কাছে এসে ফিরে যাওয়াই বা কী রকম? তাছাড়া আমার সঙ্গিনীকে এই কুস্তি দেখার পক্ষে এতটুকু বেশি প্রবীণা মনে হচ্ছে না।

হলটার ঠিক মাঝামাঝি ফোম প্যাডের তৈরি মল্লভূমি। তাকে ঘিরে কিছু চেয়ারের আসন। দরজা কয়েকটিকে বাদ দিয়ে দেয়াল ঘিরে গ্যালারি।

ইন্টারভ্যাল শেষ হওয়ার আগেই রাজেন আর মাধবী হলে ঢুকে পড়ল।

মাধবী বলল, দরজার কাছাকাছি বসা যায় না?

রাজেন বলল, দেখা যাক, দেখা যাক।

তারা বসতে না বসতেই ঘণ্টা বাজল ইন্টারভ্যালের শেষ জানিয়ে। যেমনটা আশা করা গিয়েছিল, জনস্রোত দুড়দাড় করে ঢুকে পড়ল, গ্যালারির শূন্যস্থানগুলো ভরে উঠতে লাগল। চেঁচিয়ে এ ওর খবর নিতে লাগল। আগের লড়াই সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অকুণ্ঠিত মতামত বিনিময় শুরু হল। যেহেতু বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ গ্যালারির দূরস্থিত চাপেও থাকতে পারে, মতামত বিনিময় চিৎকাবের সাহায্যেও হতে লাগল কোন কোন ক্ষেত্রে। কী বলল? ইল্লে। ঝাপ্পুস। বেয়াকুফ। এমন ধরনের দু চারটে শব্দও, ওয়াইন গ্লাসের ফেনার মতো হাসির ওপরে কখনও ভেসে কখনও উপচে পড়তে সুরু করল।

মাধবী বলল, কিন্তু মল্লরা আসবে কোথা দিয়ে?

তার প্রশ্নের সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল। গ্যালারির তলায় খিলান দিয়ে প্রথমে একজন কুস্তিগীর ঢুকল। পরণে চাঁপা রঙের ল্যাঙট। চুলগুলো ছোট ছোট, কোঁকড়ানো। ফ্ল্যাশ-আলোর দরকার ছিল না। তার সুঠাম সুগঠিত হাল্কা দেহের পেশীগুলো যেন মৃদু একটা বাতাস লেগে নদীর জলের মতো ঢেউ তুলতে সুরু করল। কিন্তু অদ্ভুত বিষণ্ণ লোকটির মুখ।

রাজেন বলল, চাঁপা রং দেখছি।

কিন্তু মাধবী সানগ্লাস সরাল। তার চোখদুটোকে উজ্জ্বল দেখাল।

দ্বিতীয় কুস্তিগীর প্রবেশ করল। যেন তাকে ধরে রাখা হয়েছিল, হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে, এমন ভাবে দৌড়ে এল সে। শরীর-গঠনে সে প্রথম কুস্তিগীরের যমজ। শুধু তার মুখ আর চোখ যেন আত্মপ্রত্যয়ে ঝকঝক করছে।

মাথায় পাগড়ি বাঁধা গলায় পাঞ্জাবির উপরে সোনার তাবিজ ঝোলানো, লুঙ্গির মতো ভাঁজ করে ধুতি পরা, তিনজন প্রৌঢ় রিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারা অবশ্যই বিচারক।

আর একটা ঘণ্টা বাজল। রঙ্গস্থলী নিঃশব্দ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে নিস্তব্ধতা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। একটা চাপা উৎকণ্ঠা যেন দেবদারু তেলের গন্ধকে আরও ভারি করে তুলল নিঃশ্বাসের পক্ষে।

মাধবী বলল, চাঁপারঙের পালোয়ান বোধ হয় অসুস্থ। কিম্বা পৌনঃপুনিক মহাশয়ের মতো বলতে পারি, আজকে ওরই হারার দিন, আর তা জানে বলেই অত বিমর্ষ।

ওদিকে তখন পালোয়ানরা পাঁয়তারা সুরু করেছে। চাঁপারঙ আজ শুধু বিমর্ষই নয় যেন ভীতও বটে। শুধু এড়িয়ে যাওয়াই তার একমাত্র চেষ্টা। কিন্তু রঙ্গস্থলীতে কতক্ষণ শুধু এড়িয়ে যাওয়া যায়? এক আকস্মিক আক্রমণে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু হতে পারে সে অসুস্থ, হতে পারে সে বিষণ্ণ, কিন্তু দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফলে যা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে, তারই সাহায্যে সে পড়ল বটে কিন্তু উপুড় হয়ে মাটি কামড়ে ধরল।

উত্তেজনা দেখা দিল দর্শকদের মধ্যে। কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল, অন্যায়, অন্যায়।

রাজেন বলল, তোমার পৌনঃপুনিক মশাই দাঁড়িয়ে উঠেছে, দেখো।

ও তো হারবেই। খোঁজ করে দেখো, কাল রাত থেকে ওকে খেতে দেয়া হয় নি।

হঠাৎ যেন একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিল। প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁপারঙকে মাটির উপরে চেপে ধরেছে। যেন তার দম বন্ধ করে তাকে অসাড় করে দেবে।

উৎকণ্ঠায় মুখ শুকিয়ে উঠছে দর্শকদের।

মাধবী ফিসফিস করে বলল, এটা বোধ হয় ফাউল হচ্ছে। ওভাবে ঘাড়ের উপরে কনুই দিয়ে চাপ দেয়া।

রাজেন বলল, কী জানি? কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হর্ষোৎফুল্ল পালোয়ান বোধ হয় বেশি কঠোর হতে চেষ্টা করেছিল। মাটির ওপরে দু প্রস্থ ঘর্মাক্ত উজ্জ্বল পেশীর স্রোত পবস্পরকে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে। চাঁপারঙ যে ইতিমধ্যে হেরে গিয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকছে না। ঠিক তখনই হঠাৎ দেখা গেল কি করে এক ঝটকায় মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে চাঁপারঙ উঠে দাঁড়িয়েছে, রিঙের প্রান্তে সরেও গিয়েছে।

মাধবী বলল, ক পয়েন্ট গুণেছো?

রাজেন বলল, গুণতে হবে না যদি সাজানো ব্যাপার হয়।

কিন্তু অন্য কারণেই গোণা দবকার ছিল না। রিঙের ঠিক উপরেই ছাতের থেকে কালো একটা ডোম নেমে এল। ডোমের গায়ে মল্লদের কে ক পয়েন্ট পেল তা ফুটে উঠল আলোর অক্ষরে।

আবার পাঁয়তারা সুরু করল মল্লরা। এবার চাঁপারঙ বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার নিষ্ক্রিয়তা কিম্বা বিষণ্ণতা প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমা করবে না। বাধ্য হয়েই সে নড়াচড়া সুরু করল। মাধবীর পায়ের কাছে একজন স্থূলকায়া ভদ্রমহিলা বসেছিল। সে হঠাৎ বলল তীক্ষ্ণ স্বরে, এর জন্য পয়সা নেয়া উচিত নয়। এ ছেলেখেলা। সার্কাসের বাঘও এর চাইতে চটপটে থাকে।

হঠাৎ দেখা গেল মল্লরা পরস্পরের বাহু চেপে ধরে পা দিয়ে একে অপরকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে।

মাধবী বলল, দেখো দেখো।

রাজেন বলল, আমি অন্য একটা বিষয় লক্ষ্য করছি।

কী?

বুঝতে পারেন নি? মল্লরা ছাড়াও অন্য কিছু দর্শনীয় আছে।

কোনদিকে, কোথায়? মাধবী কৌতূহল জানাল।

রাজেন বলল, ঠিক তাই, যা আন্দাজ করেছিলাম, তাই বটে।

বাহ্, বলো না।

লক্ষ্য করুন, আমাদের ঠিক বিপরীত দিকে গ্যালারির উপরে তিন-চারটি দর্শক মাথা নিচু করে পরামর্শ করছে. ওরা কুস্তি দেখছে বলে মনে হয় না। এই এক্ষুনি আঙুল দিয়ে বোধ হয় আমাদেরই দেখাচ্ছিল।

মাধবী কৌতুক বোধ করে বলল, কেন?

ঠিক তখনই রাজেন যাদের কথা বলেছিল, তারা মুখ তুলল। দেখা গেল সংখ্যায় তারা মাত্র তিনজনই নয়, কিম্বা তাদের তিনজনের দেখাদেখি ধারে কাছের আরও কেউ কেউ মাধবী ও রাজেনকে লক্ষ্য করছে।

মাধবী বলল, কেন, ওদের কী আর উদ্দেশ্য?

রাজেন বলল উদ্দেশ্য মনোগত বিষয়। ঠিকঠাক বলে দেয়া কঠিন। অনুমান করি, বিখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী ঘোষালকে ওরা চিনে ফেলেছে।

মাধবী বলল, না না, তা কেন, তা হলে—

রাজেন বলল, অনেক আগেই এমনটা হতো। সানগ্লাসটাই চোখদুটোকে আড়াল করে রেখেছিল।

মাধবী ফিসফিস করে বলল, না, এ ভালো নয়।

কী ভালো নয়? আমাকে ওরা হিংসা করছে তাই?

আমি চাই না ওরা চিনুক।

তা হলে পালাতে হয়। কিন্তু এখন নামতে গেলে ভিড় পিছু না নেয়।

মাধবী বলল, তাই বলে দরকার থাকলেও আমরা বেরুতে পারবো না এটাই বা কোন কথা? আমাদের তো ট্যাক্সি খোঁজাই বড় কথা।

রাজেন মনস্তাত্ত্বিকের মতো বলল, অর্থাৎ আমরা ট্যাক্সি পাওয়ার আশাতেই এই কুস্তির দঙ্গলে এসেছিলাম। অর্থাৎ অভিনেত্রী মাধবী ঘোষাল এবং তার ভদ্রচেহারার সঙ্গীকে ম্যাটিনি কুস্তির আখড়ায় দেখা গিয়েছে, এটা প্রচারিত হয় তা আপনি চান না।

মাধবী বলল, আঃ যে কোন ছাত্রের মতোই দুষ্টু তুমি। এখন ব্যূহভেদের চেষ্টা দেখো।

ফুটপাতে পৌঁছে এদিক ওদিক চাইল রাজেন। আজকে ভুগতেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালাদের নাম গন্ধ নেই।

তা হলে? রাজেন প্রশ্ন করল।

আবার হাঁটা যায়। কোন একটা দিক ঠিক করুন।

তা করা যায় না এমন নয়, কিন্তু এই রোদটা আপনার রঙের পক্ষে ভালো নয়। তা ছাড়া সন্ধ্যার অভিনয়ে ক্লান্ত দেখাবে।

প্রথম কথা, আজ আমার ছুটি সুরু হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, রঙটা মাঝে মাঝে ঝলসে নেয়া ভালো।

মাধবী সিগারেট ধরাল। রাজেনের চোখে পড়ল তার ঠোঁটে রঙ আছে কি না আছে, হাতের নখগুলো সুগঠিত, সুকর্তিত, উজ্জ্বল প্রবালের মতো লাল।

রাজেন বলল, এখানে একটা ছায়াওয়ালা রাস্তা আছে। লেক এভেন্যুর পিছন দিকে। পুরনো বইয়ের পাড়া।

মাধবী রাজেনের মুখের দিকে চাইল, তার নিজের মুখটাই বরং লাল হল, মুখ নিচু করে হাতঘড়িটাকে দেখতে লাগল।

মাধবী বলল, আমরা আজ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের মতো চলেছি।

রাজেন বলল, কেন, গন্তব্য বদলে যাচ্ছে?

মাধবী তার মাথাটা একটু ঝাঁকাল।

তবে, দুপুর রোদে বইয়ের পাড়ায় চলেছি?

সবটা মিলে।

কিন্তু তাদের থামতে হল। পথের ধারে একজন যুবক যার গাল আপেলের তৈরি, সেই আপেলের লালে প্রায় সোনালী দাড়ি, কপালটা তামাটে হয়েছে রোদে, কপাল-ঢাকা খড় রঙের চুল, খাটো শর্টস্, থং দিয়ে বাঁধা স্লিপার, কাঁধে স্ট্র্যাপে একাধিক ক্যামেরা। ট্যুরিস্ট তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু যেন নতুন ধরনের। পথটা চওড়া। মনে হয় বটে হয় নরকে গিয়েছে কিংবা শেষ পর্যন্ত কোথাও না গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে স্কেচ করার কী হল যা যুবকটি করছে? মুখে বেশ একটা আত্মসমাহিত ভাব। কিন্তু রাজেনদের দেখেই যেন মুখ তুলল। একটু তাড়াতাড়ি দুপা এগিয়ে মাধবীকে বলল—মিস, বলতে পারেন এটা কোন শহর?

কেন কলকেতাই। আপনি এদিকে নতুন?

নতুন? না, না, তা কেন? নতুন লাগছে জায়গাটা। এটা নিউ আলিপুর কি?

সোজা গেলে নিউ আলিপুরের অমনিবাস পেতে পারেন।

দুশো গজ গিয়েই রাজেন একটা মাঝারি চওড়া গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। বলল, আমার যতদূর মনে পড়ছে এটার মাথায় বইয়ের গলি পড়বে। কিন্তু থামল রাজেন। বলল, কাজটা কি ভালো হল? নিউ আলিপুরের বাসস্টপ দেখিয়ে দেয়া উচিত ছিল।

মাধবী বলল, তা হতো, কিন্তু যে কোন লোকই তা পারবে।

হাঁটতে শুরু করল তারা। রাজেন আবার বলল, এখন যেন মনে হচ্ছে, এই বোধ হয় ভুল করে ক্লাসিকে ঢুকে পড়ে হৈ-হৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল কয়েকদিন আগে। নামটা বোধ হয় গেরি, গেরি স্যান্টায়ানা।

মাধবী খুশির স্বরে বলল, কিন্তু—

কী কিন্তু?

কুস্তির কি সবটাই ফাঁকি, মানে অভিনয়?

তাতে দোষের কী আছে যদি অভিনয় হয়ে থাকে? দর্শকরা কি সিনেমার ভালবাসা দেখে তৃপ্তি পায় না? এখানে যে উত্তেজনা যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল তা দর্শকদের চোখে মুখেই প্রমাণিত হয়েছে। এ ভাবে দেখলে পরিচালকদের দোষ থাকে না। আর চাঁপা ল্যাঙট আমাদের স্বজাতিও বটে। শিক্ষার্থী হিসেবে কেউ যদি গিয়ে থাকে তবে সে ঠকে নি। প্যাঁচগুলো শিখবার সুযোগ ছিল। কিন্তু পৌনঃপুনিক মশাই কেন গিয়েছিলেন অথবা নিয়তই গিয়ে থাকেন, তা আমার জানা নেই।

পৌনঃপুনিক নামটা মনে আসতেই রাজেন হো হো করে হেসে উঠল। মাধবী হাসল। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল। এগিয়ে গিয়ে রাজেনের বাহুর ফাঁকে নিজের হাতটা গলিয়ে দিল।

ঠিক এই সময়ে রাজেনের মনে হল : মাধবী যে অসাধারণ রূপসী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে করা যাক, একটা খুব বড় আর উজ্জ্বল লাল গোলাপের গুচ্ছ অথবা ঝাড় তার হাতে এসেছে, এবং সেটা তাকে প্রকাশ্যে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এরকম একটা ঘটনা কি করে সম্ভব হতে পারে? নিউমার্কেটের ফুলের দোকানগুলোতে এরকম একঝাড় গোলাপ কল্পনা করা যায়, যা থেকে একটি ডালে কয়েকটি পাতাসমেত একটি করে ফুল বিক্রি হয়। সেই দোকানে যদি কোনদিন কোন কারণে, অথবা নিতান্ত যোগাযোগের ফলে, একটি গোলাপও বিক্রি না হয় তবে দিনের শেষে এরকম একটা ঝাড় সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই ফুলের ঝাড় বয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় তাকে থামতেই হবে। তা তার বোর্ডিং হাউসের ছোট্ট কামরাটাও হতে পারে। তখন কী করবে সে সেই অজস্র ফুল নিয়ে?

গলিটার মাথায় প্রায় এসে পড়েছে তারা। রাজেন নিজের আলগা হাত তার নিজের অন্য বাহুতে আটকানো মাধবীর আঙুলগুলোর উপরে বুলিয়ে দিল। বইয়ের পাড়ায় বছর দশেক আগেও কর্তাদের দৃষ্টি ছিল। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রাস্তাটাকে চওড়া করার পর কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। দেবদারু আর জাপানিয়া। রাজেনের সঙ্গে বইয়ের পাড়ার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে গত তিন-চার বছরে। কাজেই রাজেনের কাছে বইপাড়ার এই রাস্তাটা চিরদিন গাছে ঢাকা, আধাবন্য। জলবায়ুর প্রভাবের ফলেই কিম্বা তার অভাবেই হয়তো গাছগুলো কিছুটা বৃদ্ধিরহিত। আর যত পাতা হয় তার চাইতে বেশি পাতা ঝরে পড়ে। রাজেন অনেকবারই মনে মনে বলে, নানা মূর্খের ভিড়ে একবার একদল বুদ্ধিমান লোক কি করে এসে পড়েছিল যারা কলকেতার পথে পথে গাছ লাগানোর কথা ভেবেছিল। নিজেকে তাদের অধস্তন পুরুষ বলতে আনন্দ হয়।

জুতোর তলায় শুকনো পাতার শব্দ ভালো লাগল রাজেনের। রাস্তার ভিড়টা হালকা। সেটা হয়তো ট্রাম ধর্মঘটের ফলেই।

কেমন ছায়া না? রাজেন জিজ্ঞাসা করল। মাধবী মুখ তুলল। একটা নিছক যোগাযোগের ফলে

তার বাঁদিকের গাল, কাঁধ, আর ব্লাউজের গায়ে জালিজালি ছায়া পড়ল কোন গাছের।

রাজেন ভাবল, সেপ্টেম্বরে পাতা ঝরার কি যুক্তি আছে? আর তার ও চিন্তাটাও ঠিক নয় যে যত পাতা হয় তার চাইতে বেশি পাতা ঝরে পড়ে। চিন্তাটায় আঙ্কিক সৌষ্ঠব নেই। কিন্তু মাধবী আশ্চর্য রকমের সুন্দরী। দু-এক পা যেতেই একটি দুটি করে বইএর দোকান শুরু হল। একটাতেও নিয়ন জ্বলে নি। পথের ধারের শোকেসগুলোতে সাজানো বইগুলোর জ্যাকেটের কালো, ধূসর, ক্বচিৎ সিঁদুর রঙের অক্ষর-বিন্যাসগুলো সেজন্যই যেন স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আলো জ্বললে এক বর্ণাঢ্যতা দেখা দেয় যার মধ্যে এইগুলো আর স্বতন্ত্র থাকে না। রাজেন ভাবল, একটু শুকনো বেরঙা ভাব। কিন্তু তাই ভালো নয়?

রাজেন ভাবল, বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছালে মেয়েরা হয়তো সাদামাটা, পুরনো, কিছু-রংজ্বলা পোশাকেও সামনে আসতে পারে, আর তখন বোধহয় সেটাই ঘরোয়া ভাবের উপকরণ হয়, ভালোও লাগে। বইযেব পাড়ায় শুধু সন্ধ্যাতে যারা আসে তাদের কারো কারো কাছে হয়তো এই আলোছাড়া শোকেসগুলো আকর্ষণীয় বোধ হবে না। রাজেনের সঙ্গে বইপাড়ার সম্বন্ধ এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে দিনের যে কোন ঘণ্টায়, এমন কি শোকেসের ধুলো ঝেড়ে নিরাভরণ শোকেস সাজিয়ে তোলার সময়েও কেমন দেখা যায় তা রাজেনের জানা আছে। এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন বলতে পারা যায়। এখন রাজেনের সঙ্গে দোকানের সেলসম্যান এবং কর্তাদের শুধু বই নিয়ে আলোচনা হয় না। বই লেনদেনের আলোচনার বাইরে ব্যক্তিগত বিষয়েও আলাপ হয়ে থাকে, কারো স্ত্রীর অসুখ বা ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথা উঠে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মাধবীকে বোধ হয় সুন্দরই দেখাবে সাদামাটা সেমিজের ওপরে তেমনি ঘরোয়া শাড়ি পবলেও। কিংবা শাড়ি পরার আগে শুধু সেমিজেও। না, না, তা সে পছন্দ করে না, নাটকেব রিহার্সালের মতোই সেটা তার কাছে অপছন্দের ব্যাপার। যদিও এমন হতে পারে যে সে নিজে হয়তো এখনও প্রাপ্তবয়স্কের রুচি থেকে দূরে আছে। একটু হয়তো সে সেকেলে, যে জন্যে প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে ধীরে ধীরে, স্তরের পর স্তর পার হয়ে।

পথের ধারের গাছগুলোর ঝরাপাতার সীমা ছাড়িয়ে সে বরং দোকানগুলোর দেয়াল-দরজা ঘেঁষে চলতে শুরু করল। একটা দোকানের সামনে শোকেসে পুরনো একজন লেখকের নাম দেখে থেমে দাঁড়াল। কী মুস্কিল, শোকেস তো লোভ জাগানোর জন্যেই সাজানো। দিন সাতেক পরে একদিন এসে দেখলেই হবে!

একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগল রাজেন। তখন তার ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হবে যে সে শিস দিচ্ছে। সে ভাবল, কিন্তু এই হোয়াইটহেডখানা নিয়ে সে কী করতে পারে। এর আগে স্যান্টায়ানা নিয়েও বুককেসের পেছনে লুকিয়ে রেখেছে, অন্তত কারো চোখে পড়লে এরকমই মন্তব্য করবে সে। অত্যন্ত দামী খাবার হোয়াইটহেড এবং স্যান্টায়ানা, যেন ফরাসী পদ্ধতির কিছু। ভূদেব সমাদ্দারের পার্টিতে যেমন একবার খেতে হয়েছিল।

আর তা ছাড়া? কী তা ছাড়া? তুমি তোমার এক কামরার বাথরুম-ছাড়া কমন-ল্যাভেটরিসমেত ফ্ল্যাটেও কাউকে নিয়ে যাও যদি, তোমার কর্তব্য হবে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যর দিকে নজর রাখা। কারণ হোস্টের গুণাবলী না থাকলেও তার ভঙ্গীটা রাখা উচিত, নতুবা অপরপক্ষের অসুবিধা হতে থাকে।

দেখো, মাধবীর পক্ষে বইয়ের পাড়াটা নতুন। আর এটা তার নিজের ফ্ল্যাট না হলেও এখানে সে বেশ অভ্যস্ত।

রাজেন পাশে মাধবীর দিকে চাইল।

সে কোণ করে রাখা নিজের বাহু ঝুলিয়ে দিল। মাধবীর হাতটা আশ্রয় হারিয়ে নড়েচড়ে বাহুটাকে আবার ধরল।

রাজেন বলল, আপনাকে আমাকে দুজনকেই দুহাতে ধরে বই তুলে দেখতে হবে।

মাধবীর মুখটা একটু লাল হল। সে নিজের দুহাতে হাতব্যাগের স্ট্র্যাপ ধরল। এ দোকানটা বেশ বড়ই। ফুটপাথ থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে কাউন্টারে পৌঁছতে হয়। হেড সেলসম্যান কাউন্টার থেকে দেখতে পেয়েছিল রাজেনকে। ডেকে বলল, আপনার হাত দেখা ঠিক হয়েছে মশায়, বুয়েছেন? স্টিপল চেজে কুইন অব ফারারাই।

রাজেন হেসে বলল, কেমন, দেখলেন তো?

আসুন, আসুন।

এখন নয় স্যার, এখন নয়। রাজেন হাসিমুখে এই বলে তাড়াতাড়ি দোকান পার হল। হাসিমুখেই সে ভাবল, নিশ্চয়ই হাত দেখার ভঙ্গী বিশ্বাস করে ফারারার ওপরে ধরে নি, ধরলেও যৎসামান্য। এর পরে ওরকম রসিকতার ফল মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বেশ কিছু ধরে, একেবারে ভরাডুবি। ঘোড়দৌড় আর কাকে বলেছে!

কিন্তু দামী খাবার দিয়ে সে কী করতে পারে? যেমন ধরো মাধবী ঘোষাল। সে যে প্রকৃতপক্ষে খুবই সুন্দরী, তাতে সন্দেহ কী? হেড সেলসম্যান মুহূর্তের মধ্যে তা অনুভব করেছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মতো একজন ছাত্র (ছাত্র বলাই ঠিক) কী করতে পারে মাধবীর মতো একজনকে নিয়ে? এখানে পর পর কয়েকটি দোকানই বড়। রাজেনের নিজের রসিকতা অনুসারে, প্রথমটি বেস্ট ইন দ্যা ওয়ার্লড, দ্বিতীয়টি ইন দ্যা সিটি, তৃতীয়টি বেস্ট অন দিস স্ট্রীট। এই রসিকতাই তার সঙ্গে শৌরীনবাবুর সখ্যের মূলে।

তার মনে পড়ল, দিন পনের আগে দোকানে এসে সে শৌরীনবাবুর অসুখের খবর শুনেছিল। আজকাল যা স্ট্রোক হচ্ছে! যে দেশে রেডিওর শব্দ শোনা যায় নি, যেখানে জীবন ঘণ্টায় পনের কি.মি.র বেশি দ্রুত নয়, হয়তো সেই ইনিস ফ্রিতে স্ট্রোক হয় না। কলকাতার পথে পথে গাছলাগানেওয়ালা পৌরপিতাদের মতো যদি রেডিও-ধ্বংসী কালাপাহাড়ও জন্মাতো!

রাজেন দোকানে ঢুকে পড়ল। কাউন্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কর্তার খবর কী?

কর্তা শৌরীনবাবু কাছাকাছি ছিলেন। একটা র‍্যাকের পাশ থেকে মাথা তুলে নিজেই বললেন, আরে বামুন যে! এসো এসো।

রাজেন বলল, না, মানে, কেমন আছেন জেনে যেতে চাইছিলাম।

এসো না হে। এলে কি তা জানতে পারবে না? উটি কে? ছাত্রী? তা এসো।

এ ডাক এড়ানো যাবে না।

দোকানের পেছন দিকে শৌরীনবাবুর চেম্বার।

সেখানে ঢুকে শৌরীনবাবু রাজেনকে বসতে বলে হাঁক দিলেন, ওরে, কেউ আছিস? তুমি ওদিকটায় বসো, মা লক্ষ্মী।

যেমন শৌরীনবাবুর গেরুয়া কেঠো ধুতি, যেমন তাঁর চেম্বারের নিরাভরণ চেহারা, তেমন এই ডাক তাঁর বৈশিষ্ট্য। যেন তাঁর সন্দেহ আছে তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দিতে পারে কি না।

একজন লিভারিপরা বেয়ারা দৌড়ে এল। শৌরীনবাবু বললেন, ওরে, বামুনের জন্যে একটু চায়ের জল চাপা।

রাজেন বলল, না, না, এই মাত্র, ওর আমি বিশেষ ভক্ত নই।

শৌরীন বললেন, আরে বামুন, কায়েতের হাতের চা ভালো লাগবে কেন. এ দোকান সে দোকানের ছাঁকনি নিঙড়ানো না গিললে কি চলে?

এই কথোপকথন এতো পুরনো যে এটাকে এখন আর বাড়তে দেয়া হয় না। রাজেন বুঝল

এখানে কিছুক্ষণ সে বসে, এটাই শৌরীনবাবু চাইছেন। বেয়ারা চেম্বারের এক পাশে রাখা হিটারে কেৎলি চাপিয়ে দিল। সে যখন চলে যাচ্ছে শৌরীনবাবু তাকে বলে দিলেন সে যেন পত্রিকার টেবল থেকে ওপর দিকের কয়েকখানা পত্রিকা দিয়ে যায়।

শৌরীনবাবু বললেন, পত্রিকা আসুক, ততক্ষণে এইগুলো দেখো দেখি বাপু, কদিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম। এই লাল পেনসিলটা দিয়ে পাশে পাশে দেগে দিও। আজকের দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখেছো? তোমার তো দৈনিক পত্রিকা পড়লে সারা গায়ে র‍্যাশ বেরোয়। হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, তোমার মাস্টারমশায়েব ওটাই অ্যালার্জি।

শৌরীনবাবু লাল পেনসিল আর বিলেতি এক দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্যসংখ্যা এগিয়ে দিলেন। এটাও নতুন নয়। মাঝে মাঝে রাজেন নতুন প্রকাশিত বিলিতি সাহিত্যপুস্তকের নামের পাশে লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে দেয়। শৌরীনবাবু বইযের অর্ডার দেয়ার সময়ে এই দাগগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজেন কাগজের আড়ালে ডুবে গেল। শৌরীনবাবু নিঃশব্দে তাঁর খাতাপত্র দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা যেতে লাগল। এটা শৌরীনবাবুর হিসাব পরীক্ষার ফলাফলের সূচক। রাজেনের পত্রিকার পাতা উল্টানোব শব্দ হচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে বাদে। একবার খাতা থেকে মুখ তুলে শৌরীনবাবু বললেন, গুযোরব্যাটা। পনেরো দিনেই সব ডুবিয়েছে দেখছি। ওরে, মা লক্ষ্মীকে খানকয়েক বই দে না, কবিতাবই দে। বেয়ারা ইতিমধ্যে চা করে দিয়ে গেল। একজন কর্মচারী খানকয়েক সদ্যপ্রকাশিত কবিতাব বই বেখে গেল মাধবীর সম্মুখে। শৌরীনবাবু প্রকাশকও বটেন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রাজেন এখানে ওখানে লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে চলল। কিছুক্ষণ বিস্মিতের মতো বসে থেকে মাধবী কবিতার বইগুলো উলটে দেখতে সুরু করল , কারণ অন্য আরও দু-একবারের মতো এবারও সে অনুভব করল, নতুন নাটকে মহলা দেয়াব সময় যেমন, নাটকের বাইরের জীবনেও তেমন, সে অন্য কাবো ডাইরেকশান ছাড়াই নিজেকে সিচুযেশনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আর তাতে সিচুয়েশনকে সে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারে। রাজেনের পড়া দেখে তাদেব কথা মনে হবে। কাজেই বিলিতি পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যা দৈর্ঘ্যে আড়ে যত ঢাউসই হোক, এখানে ওখানে দাগ দিয়ে দিয়ে শেষ কলমে চলে আসতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগল না তার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পত্রিকাটা দুভাঁজ করে তার ওপরে লাল পেনসিলটা রেখে সোজা হয়ে বসল রাজেন।

শৌরীনবাবু বললেন, উঠছো নাকি? আব একটু চা করাই, বসো। কিছু খাবার আনুক।

না, না।

রাজেনের কথার মাঝখানে কথা বসিয়ে দিয়ে শৌরীনবাবু বললেন, আরে তোমার জন্যে না হোক, মা লক্ষ্মীর জন্যে আনুক। আমার নতুন খদ্দের। তা ছাড়া রোদ পড়তে এখনও অনেক দেরি। আজকের কাগজ দেখেছো?

রাজেন বললো, কিছু আছে নাকি?

শৌরীনবাবু বললেন, সংবাদপত্রে কিছু থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে পড়ুয়ার ওপরে।

রাজেনের কানের কাছে রংটা গাঢ় হল।

পত্রিকাগুলোর সঙ্গে খান দুয়েক দৈনিক কাগজও এসেছিল। তারই একখানা টেনে নিল রাজেন।

শৌরীনবাবু বললেন, তুমি, বামুন, বলবে বই পড়ে শেষ করা যায় না, কাগজ পড়বে কখন? আমি অবশ্য অসুখের পনেরো দিন কাগজ ছুঁই নি। হাজার হলেও বামুনের কথা, একেবারে ফেলতে নেই। কিন্তু দুনিয়াটা তো নিত্যি রোজ বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে চলতে গেলে খোঁজ-খাঁজ রাখতে হয়।

তা তুমি কাগজ ছাড়া কোথায় পাচ্ছ বলো?

ইদানীং কাগজগুলো বেশ লম্বা মাপের হয়েছে। বরং যত বড় চেহারা তত তার মর্যাদা। কারণটা আমাদের আমদের ঠিক জানা নেই। এমন হতে পারে বড় চেহারার কাগজ হলে শীর্ষপংক্তিগুলোকে বড় বড় অক্ষরে ছাপানো যায়। দুইঞ্চি অক্ষরের শীর্ষপংক্তির চিৎকারে একাধিক সংবাদ দেয়া যায়।

দৈনিকটার প্রথম পাতা এ রকম সাজানো ছিল :

(প্রথম তিন কলমের মাথায়। চার মিলিমিটার অক্ষরে)

- স্পীকার কর্তৃক মূলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য
- প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বিবৃতি দেবেন

(এগার মিলিমিটার অক্ষরে)

মন্ত্রীমহোদয়ের মধুচক্রের দরজায়
অন্যদেশীয় রাষ্ট্রদূতের
গাড়ি আবিষ্কার?

পরের তিন কলামের মাথায় একটা হোটেলের ছবি।

(নিচে চার মিলিমিটার অক্ষরে)

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সৈন্য আহ্বান

পাঞ্জাব হরিয়ানায় বিদ্যুৎব্যবস্থা
বানচাল

(সপ্তম ও অষ্টম কলামের মাথায় চার মিলিমিটার অক্ষরে)

প্রথম মহাশূন্যে

(তিন মিলিমিটার অক্ষরে)

মনুষ্যবাহিত যান প্রেরণের সম্ভাবনা ভারতীয় বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

দু তিন মিনিটে পঞ্চম পাতা উল্টে গেল রাজেন। আর মিনিট দু-তিনে মাঝখানের আট-দশ পাতা শেষ করে পেছনের পৃষ্ঠায় চলে এল।

শৌরীনবাবু বললেন, পেলে কিছু খবর?

হ্যাঁ, তা—

মন্ত্রীমহোদয়ের মধুচক্রের দরজায় নাই থামলে! প্রথম মহাশূন্যটা লক্ষ্য করেছো? কথা বলতে গিয়ে হাসির দমকে সেটা রাজেনের গলায় কিম্ভূত শব্দ করে আটকে গেল। শৌরীনবাবু বললেন, ওটা তো একটা কিছু বটে। একেবারে প্রথম মহাশূন্য।

রাজেন বলল, এবং মনুষ্যবাহিতও বটে।

তুমি উত্তেজনা বোধ করছো না?

উত্তেজিত হওয়ার কথাই বটে, কিন্তু আমরা বোধ হয় ইতিমধ্যে খানিকটা ধরে নিয়েছি ওটা হবে। সকালের রেডিওতে যখন বলছিল, ফুটপাতের পানের দোকানগুলোর সামনে কিছু ভিড় ছিল। কিন্তু এটা সেই ভিড় নয় যা নেচে উঠবে।

ভিড় মানে ক্রাউড আবার নাচে না কি?

নাচে। প্রথম ভারতীয় স্যাটেলাইটের বেলায় ফুটপাত জুড়ে টুইস্ট নাচ হয়েছিলো। ছেলেরা এবং মেয়েরা নেচেছিল।

শৌরীন বললেন, কোথাও যাওয়া বলেই তো যান। কিন্তু মহাশূন্যে যাচ্ছ কোথায়? এ বিষয়ে কিছু ভেবেছ?

রাজেন কথা বলার আগেই বিস্মিত হয়ে চুপ করে গেল।

শেষ পাতাটার মাথায় এগারো মিলিমিটার মাপের বাঁকা অক্ষরে রঙ্গজগৎ লেখা। তার নিচে আর্টথিয়েটারগুলোর খবর। রেনেশাঁয় সোনালী চামড়া। একটা ইন্টারভিউ, দেড়কলামের খবর। দুটি কলামে দুটো দাঁড়ানো মহিলার ছবি। কিম্বা কথাটা বিস্ময় থেকে বদলে কুণ্ঠা হল। পাশে যে লোকটি বসে আছে তারই সংবাদ যদি ছবি-সমেত দৈনিক কাগজে ছাপা হয়ে থাকে তবে তা কুণ্ঠার কারণ হতে পারে, কারণ সাংবাদিকের মতামত সর্ববাদী সম্মত না হতে পারে, যার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তার বিড়ম্বনার হেতু হতে পারে, বর্তমান সঙ্গে যা উত্থাপন করা সমীচীন নয় তেমন কথা থাকতে পারে সাংবাদিকের আলোচনায়।

রাজেন অনুমান করবার চেষ্টা করল সানগ্লাসে চোখ ঢাকার ফলে মাধবীর মুখ কাগজে ছাপানো তার ফটো থেকে কতটা পৃথক হয়েছে। অবশ্য মাধবীর স্কার্ট ব্লাউজের পোশাক তার আত্মগোপনের কিছু সহায়তা করছে এখন।

কিছুটা বিব্রত হয়ে কাগজটা উল্টে রাখল রাজেন। কিন্তু তার আগেই অন্তত আলোচনার হেডিং এবং সাব হেডিং মাধবী এবং শৌরীনবাবুর চোখে পড়ে থাকবে। কারণ রঙ্গজগতের সাবএডিটর অন্যান্য সব এডিটরকে মাটি ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। আলোচনাটার হেডিং এরকম ছিল :

(দুই মিলিমিটার অক্ষরে) রেনেশাঁয়।

(চার মিলিমিটার) সোনালীচামড়া —সুরথ সোমের প্রযোজনা।

(দুই মিলিমিটার অক্ষরে) নায়িকা বদল না পালাবদল?

শৌরীনবাবু বললেন, সুরথ সোমটি কে বটে, বামুন? খুব বেশি নাম দেখি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কী সব করে। তা করুক। কিন্তু সোনালী চামড়ার কী?

রাজেন মৃদু হেসে বলল, গিয়ে দেখুন।

শৌরীন বললেন, তুমি যেতে বলছ? রিকমেণ্ড করো?

এই দেখুন, আমি কি সাংবাদিক, না সুরথ সোমের এজেন্ট?

শৌরীনবাবু হাসলেন।

রাজেন বলল, রোদ অনেকটা পড়েছে দেখছি।

বাইরে তাকাচ্ছ যে? ব্যস্ত আছ?

না, হ্যাঁ, তাও বটে, ভালো কথা ট্রাম খুলেছে নাকি?

কোথায় যাবে?

মির্জা গালিব এভেন্যুতে।

তা গাড়ি নিয়ে যাও না।

গাড়ি? ও, আপনার গাড়িটা?

তাই ভালো। নইলে গুয়োরব্যাটা সটকাবে ওটা নিয়ে।

সে কি! কে সটকাবে আপনার গাড়ি নিয়ে?

ওই তো বললুম, তোমরা যাকে শুভেন্দু বলো।

সাবাস, শুভেন্দুবাবু তো আপনার ছেলে।

তা হলে গুয়োরব্যাটা হয় না? বেশ যুক্তি! আরে আমি খাই বই বেচে। আর সে কি না রাতের আলো জ্বেলে টেনিস খেলে।

রাজেন হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আচ্ছা সে দেখা যাবে। শুভেন্দুবাবু এ গাড়ি নিতে নিজের গাড়িতেই আসবেন। কাজেই যে কোন একটা পাওয়া যাবে যদি ইতিমধ্যে ট্রাম না খোলে। কিন্তু আমাকে একটু সাহায্য করুন।

সে তো আমি অনেকদিন থেকেই বলছি, বাপু। বই বাছাই করা বাবদ —এখনও ছাত্র, মাঝে

মাঝে বেহিসেবী খরচখরচা হবে, তা হিসেবের বাইরে আমদানিও চাই বটে।

আরে, না, না। তা নয়।

তবে?

নাটক সম্বন্ধে, নাটকের কলা সম্বন্ধে কান্তিবিদ্যাগত আলোচনার কোন বই আছে?

শৌরীন ভাবলেন। গভীরভাবে ভাবতে গেলে তাঁর মৃদু মৃদু দোলার মুদ্রাদোষ আছে দেখা গেল। একটু পরে বললেন, রসো, হয়েছে। তুমি যা চাইছো ঠিক তা নয় হয়তো। গ্রী:ক নাটক সম্বন্ধে একখানা আসল বই আছে বোধ হয়। রসো।

শৌরীন নিজেই উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে মোটা চেহারার একখানা বই নিয়ে এলেন। নীল কাপড়ে বাঁধানো সোনালী জলে নাম লেখা। বোঝা যায় বেশ দাম ছিল এক সময়ে। বেশ কিছু দিন থেকে অবিক্রীত বইএর সঙ্গে পড়ে আছে।

রাজেন হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখে বলল, মেলা দাম দেখছি।

আসল যে।

না এত দামী জিনিস নিতে চাচ্ছি না।

শৌরীন বললেন, নেবে তো নাও না। দাম আর তোমাকে দিতে হবে না। ও আমার এমনিতেই লোকসান। দেখছো না নীল কাপড়ের বাঁধাই এখানে ওখানে সাদা হয়ে যাচ্ছে? কিন্তু খুলে দেখে নতুন বইয়ের গন্ধ পাবে। কী, বিনি পয়সায় নেবে না? দাও এক টাকা। কাউন্টারে নে যাও। ক্যাশমেমো কেটে দেবে।

রাজেন আবার হেসে ফেলল। এমন দামী বই আনলেনই বা কেন, পড়েই বা রইল কেন?

তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দু-একটি, বুঝলে কিনা, এক সময়ে বিষয়টার দিকে ঝুঁকেছিল। লেখালিখি করে বইটার খবর পেয়ে কর্তব্যক্তিদের নজরে আনলুম। তা তাদের দোষ নেই, হাওয়া বদলায়, নাকি পালা বদল হয়। তারই ফলে, নাকি ফলশ্রুতিতে, কাটল না। তা এখন সিনেমাস্কোপের গ্রীকরোমান রীলগুলো তো হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলেই দেখিয়ে দিচ্ছে। তা, বাপু, ছমাস ধরে এরকম একখানা বই পড়ে, তস্য নোট পড়ে, নোটের নোট নিয়ে যা মনে থাকে, এক সপ্তাহেই স্কুলের হলের ছঘণ্টার সিনেমা দেখে তাই হয়। বুঝলে কি না? হয় কি না হয় মা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করো। ওরে, বইখানার একখানা ক্যাশমেমো আনিয়ে দে কাউন্টার থেকে।

বেয়ারা এসে বইখানা আর রাজেনের হাত থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি ক্যাশমেমো এনে দিল।

রাজেন বলল, এবার তাহলে উঠি।

উঠবে? যদি অসুবিধা না হয় আগামী সপ্তাহে একদিন এসো। কিছু দিশি বই কিনতে হবে।

রাজেন এবং মাধবী উঠে দাঁড়াল। তাদের সঙ্গে শৌরীন কাউন্টারের দরজা পর্যন্ত এলেন। বললেন, রসো গাড়িটা ঘুরিয়ে আনুক। দরজার কাছে বসে থাকা ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন।

শৌরীনবাবু বললেন, ভালো কথা, তোমাদের ক্লাসিকে কি হচ্ছে হে?

বোধ হয় ইউরিপিডিস।

মানে, হয়তো আমি ঠিক বুঝতে পারি না এগুলো কেন হয়। একদিন আমাকে বুঝিয়ে দিয়ো তো। ওদের নীতিকে বাদ দিলে এসব নাটকগুলো কি একেবারে অর্থহীন খোলস নয়? অথচ ওদের সমাজনীতি আর আমাদের সমাজনীতি কখনো এক নয়।

রাজেন একবার শৌরীনবাবুর মুখের দিকে একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর হাতের বইখানার দিকে। তাকে অপ্রতিভ দেখাল।

শৌরীন বললেন, এখন নয়, অন্য একদিন তখন—

লিভারি পরা ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। রাজেন এবং মাধবী গাড়িতে বসল। শৌরীন তাঁর চেম্বারে ফিরে গেলেন।

গলির মাথায় পৌঁছে ড্রাইভার ঠিকানা জানার জন্য আড়চোখে পিছন দিকে তাকালে রাজেন বলল, সাতাশ মির্জা গালিব।

স্বভাবতই তারা পাশাপাশি বসেছিল। রাজেন লক্ষ্য কবল, মাধবী ড্রাইভারের পিঠের ঠিক মাঝখানটায় কিছু একটার ওপরে দৃষ্টি ঘিরে রেখেছে। তার মুখটা বরং নীলাভ দেখাচ্ছে। কিছু একটার ছায়া পড়লে যেমন হতে পারে। তাও নয়, বরং ফ্যাকাশে। খুব ক্লান্তি বোধ হয়। বোধ হয় খুব বিরক্ত হয়েছে আর তা গোপন করার চেষ্টা করছে। বইয়ের দোকানে এমনভাবে বসে থাকতে ভালো লাগে নি, না লাগাই স্বাভাবিক মাধবীর পক্ষে।

মাধবী একটু সরে বসল। তার ফলে তার দুটো হাঁটু বরং কোণাকুণিভাবে এগিয়ে এসে রাজনের হাঁটুতে ছুঁয়ে রইল। গাড়িটা একটা বাঁক নিল। বাইরে দিনের আলো তখন পড়ে আসছে। এটা দিনের উত্তাপ কমে আসার সময়। কিন্তু দিনমান রোদটা চড়া ছিল। একটা গরমের ঝাঁজ বাঁধানো পথ এবং দুপাশের বাড়ির দেয়ালগুলো থেকে উঠে আসছে মনে হয়। উত্তাপ কমার আগে বিকিরণ।

মাধবী তার হাত দুটো জড়ো করে বাজেনেব হাঁটুব ওপর রাখল। এরপর যদি যে মাথাটা কাত করে জড়ো করা হাতদুটোর ওপরে রাখে তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

মাথাটা বরং পেছনে হেলিয়ে মাধবী হাই তুলল। হাইযের মাঝখানে হাতেব পিছন দিক দিযে ঠোঁট আড়াল করল।

বাজেন বলল, একটু ড্রিঙ্কেব ব্যবস্থা করবো কি?

না।...মার্কোস স্কোয়াবে যাওয়ার শর্টকাট আছে এখান থেকে?

যাবেন?

একটু দ্বিধা করে মাধবী বলল, না।

ভারি ইন্টারেস্টিং।

কী? মাধবী উঠে বসল।

মনের এই ব্যাপারগুলো।

রাজেন আঙুলের মাথায় মাথায় গুণে বলল, ছমাস আগে ভদ্রলোক সাতাশ মির্জা গালিবই বলেছিলেন। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মনের কোথাও সেটা লুকোনো ছিল। আসল কথা ঠিকানাটা শুনবার সময়ে খুব ক্লান্ত ছিলাম।

একটা টানা নিঃশ্বাস ফেলল মাধবী। রাজেন সিগারেট বার করল।

মাধবীর দিকে এগিয়ে ধরল প্যাকেটটা।

মাধবী সিগারেট ধরাল।

রাজেন নিজের মনের কারচুপি ধরে ফেলে খুশি হয়ে উঠল, একটু জোরে জোবেই হেসে উঠল।

মাধবী বলল, বইএর দোকানের কর্তা ক্লাসিকের অভিনয়ের কী বলছিলেন? বাজেন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের চিন্তাটাকে ওজন করে নিল। বলল, কথাটার দাম আছে। প্রকৃতপক্ষে ওদের ট্রাজেডিগুলোর সঙ্গে ওদের সময়ের ধর্মাধর্মবোধ, নীতিবোধ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সেগুলোকে বাদ দিয়ে ট্রাজেডিগুলোকে অর্থহীন মনে হতে পারে। বাইরের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে রাজেন বলল, এই পথ ধরে মার্কোস স্কোয়ারে যাওয়া যায়।

মাধবীর মনের ওপর মার্কোস স্কোয়ারে গীতা থাকে এই অনুভূতিটা খেলে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা তো স্তব, খবরের কাগজে যা ছিল। আর মাধবী জানে সে সুন্দরী, বিশেষ রকমেই সুন্দরী।

আর ঠোঁটদুটোকে কিছুটা গোলালো করে চাউনিকে কিছুটা সংকীর্ণ আর নরম করলে যে কামনার

আমন্ত্রণ হয় তা কমসংখ্যক পুরুষই প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটা সে সিনেমার শেষ বইটা করতে গিয়ে আয়নার সামনে আবিষ্কার করেছিল। নিরঞ্জনের ওপর সার্থকভাবে অনেকবার প্রয়োগ করেছে। অবশ্য দুষ্টুমিভরা চোখে জিভের ডগা দাঁতে কাটলেও এমন একটা আকর্ষণ তৈরি হতে পারে যা কারো কারো পক্ষে কাটিয়ে ওঠা কঠিন। কিংবা ফিসফিস করে বলা দু-একটা কথারও তেমন জোর আছে।

মাধবীর গালে রক্ত ফিরে এল।

সে বলল ফিসফিস করে, না, মার্কোস স্কোয়ারে এখনই কিছু কাজ নেই।

রাজেন ভাবলো, বইয়ের দোকানে অতটা সময় কাটানো তার ভালো হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সঙ্গিনী তার সহপাঠিনীদের একজন নয়।

মাধবী তার বাঁ হাতটা রাজেনের মণিবন্ধের ওপরে রাখল।

এটাই যেন তার চিন্তাটাকে অনুপ্রেরিত করল। কিম্বা এটা ঠিক বোরড হওয়াও নয়। রঙ্গজগতের সংবাদটাই কী? তাহলে তার আড়াল করার চেষ্টা বৃথা হয়েছে, মাধবী তার আগেই আলোচনাটাকে দেখে নিয়েছে।

রাজেনের মুখ বিমর্ষ হল।

কিন্তু সে মাধবীকেই বরং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। অসাধারণ রূপ সে বিষয়ে কে সন্দেহ করবে?

রাজেনের চোখ দুটো স্নিগ্ধ হল। প্রবালের মতো করে রাঙানো নখগুলো-সমেত মাধবীর একখানা হাত সে নিজের হাতে তুলে নিল।

কিন্তু রাজেন ভাবল, সুবথ সোমের থিয়োরিটা একেবারে পাথরের ওপরে বসানো। নায়িকার রূপ যদি দর্শককে প্রয়োজনের চাইতে বেশি আকর্ষণ করে, নাটকের আবেদন প্রয়োজনের চাইতে কম পৌঁছবে তাদের মনে।

মাধবী বলল, গরম লাগছে না একটু?

রাজেন ভাবল, আর এক্ষেত্রে রূপের আকর্ষণ অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। সে আকর্ষণ যেন অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায়। যেন তা করোষ্ণ অপরাধের মতো কিছু। একটু যেন গরম লেগে ওঠা। কিন্তু সুবথ সোমের থিয়োরি যাই হোক, এটা বোঝা যাচ্ছে মাধবীকে দিয়ে নাট্যকার, প্রযোজকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। সে তেমন অভিনেত্রী নয় যা তারা চায়। আর এ ব্যাপারটা হয়তো কোন কারণে মাধবী ইতিপূর্বে জানতে পারে নি।

কিন্তু, রাজেন ভাবল, দুঃখ বোধ হলেও এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই, যেমন মহাশূন্যের মনুষ্যবাহিত যান সম্বন্ধে। যানটা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যবাহিত হবে কি না তা খবরের কাগজওয়ালারা গবেষণা করুক। আরও দুটো রাস্তা পার হয়ে মির্জা গালিব এভেন্যু। কাল যে ঘরে বসে তাস খেলা হয়েছিল সেটাই কি মাধবীর ঘর? কিম্বা সেই নরম বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে হয়তো অভিনয়ে যাবার আগে মাধবী খানিকটা বিশ্রাম করে নেয়। একটা জানালার হয়তো পর্দা তোলা থাকে। আর তা দিয়ে পড়ন্ত দিনের রঙ কিছু যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

মাধবী বলল, একটা সিগারেট জ্বলে শেষ হয়ে গেল, আমরা কিন্তু কথা বলি নি।

রাজেন বলল, একেবারে খাঁটি কথা।

সাতাশ মির্জা গালিবেই আপনার কাজ আছে মনে হচ্ছে।

তিনতলার ফ্ল্যাটে—একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অবশ্য আজই তা করতে হবে এমন কথা ছিল না। আপনার সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এবং দেখা করারও দুটোই ঘটিয়ে দিলেন শৌরীনবাবু।

তা হলে আবার কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা এখনই ঠিক করে নেয়া যাক।

আর দুটো রাস্তার পরে মির্জা গালিব। এই বইটা নিন আপাতত। আরও পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে দেখাবো।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ। ক্লাসিক নাটক, নাট্যকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা থাকতে পারে।

হাত পেতে বই নিয়ে মাধবী খুশি হয়ে উঠল।

বলল, আপনার কাজ যদি শেষ হয়ে যায় ডিনারের আগে, আর তার পরে যদি আর কোন এনগেজমেন্ট না থাকে, আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন? আজ আর বেরুব না।

রাজেন হেসে বলল, অন্তত এ পাড়া থেকে যাওয়ার আগে জানিয়ে যাব।

ভূদেব সমাদ্দার সাংবাদিক, কিন্তু কোন পত্রিকার সঙ্গে সে যুক্ত নয়। একটা সংবাদ সিণ্ডিকেটের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং তার ছআনা অংশেব মালিক।

তাব বয়স কিছুদিন আগে চল্লিশ পার হয়েছে। ছোটখাটো একহারা চেহারা, অত্যন্ত সাদা রং, কখনও কখনও রক্তহীন মনে হয়। নিখুঁত দামী পোশাক পরে থাকে। মাথায় পাতলা ধোঁয়াটে রঙের চুল উল্টে আঁচড়ানো, মাঝখানে সিঁথি। ডান চোখে মনাকল ব্যবহার করে। কথা বলতে বলতে বাঁ হাতের পিঠে ডান হাতের আঙুলের ডগা ঘষার অভ্যাস আছে। টেলিভিশন প্রভৃতি নানাবিধ গার্হস্থ্য গ্যাজেট নিজে সারানো হবি। মদেব ব্যাপারে রসপণ্ডিত (কনেসর)। আযকর দেবার পর বার্ষিক আয় আনুমানিক চল্লিশ হাজাব। এলিজিবল ব্যাচেলর। তার সম্বন্ধে হুজহুতে মোটামুটি এরকমই লেখা হয়ে থাকে।

কারো পেশা সম্বন্ধে কিছু না বলাই রীতি, আমাদেব সাহিত্যে কিন্তু এক্ষেত্রে পেশার দিকটা উল্লেখ না করলে সমাদ্দারকে চিনতে অসুবিধা হবে।

একটা পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সিণ্ডিকেট স্থায়ী কনট্রাক্টে আছে সপ্তাহে পাঁচ দিন ফিচাব যোগানোর। স্কুপ সংবাদ বিক্রির ব্যাপারে নীলামের পদ্ধতিটিকেই সে ভালো মনে করে। সংবাদটা কীভাবে প্রকাশ করা হবে কিম্বা আদৌ প্রকাশ কবা হবে কি না তার দায়িত্ব ক্রেতার। এক চতুর্থাংশ কলামের উপযুক্ত ছোট্ট একটা সংবাদ পাঁচ হাজার টাকায় কিনে কেউ বা সেটাকে একেবারে গিলে ফেলেছে এমন নজির আছে। ক্রেতা অবশ্যই তা লাভজনক মনে করে থাকবে। একি ব্ল্যাক মেইল অথবা এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আবিষ্কৃত সংবাদ চেপে যাওযা হলে সমাদ্দাবেব সাংবাদিক-বিবেক পীড়িত হয় কি না। এ বিষয়ে তার মত প্রণিধানযোগ্য। সে বলে থাকে : তাব নিজের বিবেক আছে বলেই সে বলতে পারে সাংবাদিকের বিবেক থাকা সম্ভব নয়। সে বলে, ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকের কাজ নয়, তাকে সাজানো গোছানো আকর্ষণীয় করাই তার উদ্দেশ্য। সত্য যেমন বিজ্ঞানের, সত্যের অনুকৃতি যেমন সাহিত্যের, অর্ধসত্য তেমন সংবাদপত্রের মালমশলা। অর্ধসত্য কি ক্ষতিকর নয়? ক্ষতি? সংবাদপত্র একটা ব্যবসা। প্রত্যক্ষভাবে সেগুলোকে পরিচালনা করে কোন রাজনৈতিক দল, কিম্বা কোন ব্যবসাদার, পবোক্ষভাবে অন্য অনেক বিজ্ঞাপনদাতা। সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতের তাৎক্ষণিক অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। দেখাও একটা দল যে তা করে না। বিজ্ঞাপনদাতা ব্যবসাদাররা নিজের স্বার্থের হানি করে সত্য উদ্ঘাটন করতে চাইবে, এরকম চিন্তা করাও হাস্যকর। সুতরাং সেই সংবাদপত্রগুলো, যাদের যে কোন একদিনের ব্যবহৃত কাগজগুলো বিছিয়ে দিলে বাংলাদেশকে ঢেকে দেয়া যায়, তা অর্ধসত্য এবং অর্ধসত্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা হলেও মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্র জনসমষ্টির কার্ডিয়াল ড্রপ ; ওটা দরকার। সকালে চায়ের সঙ্গে পাঁচ ফোঁটা গ্রহণ করলে সারাদিনের জন্যে বিবেক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, যদি বা সংবাদপত্রকেই বিবেক না বলো।

কিন্তু সমশ্রেণীর লোকদের কাছে এগুলো ঝাঁজালো রসিকতা বলে গৃহীত হলেও (যেমন স্ত্রীলোকের নিতম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে রূঢ় উল্লেখ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে) হুজুহুতে প্রকাশ করা

যায় না। তেমন বোধ হয় এ সংবাদটাও সেখানে দেখা যাবে না যে ভূদেব সমাদ্দার ইলেকট্রিক মেকানিক ফিটারদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারে। এই মেকানিকের দল, যাদের সংখ্যার শতকরা হার বর্তমানের জনসংখ্যায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তাদের প্রতিপত্তি দেখে কখনও কখনও মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তারাই গৃহের মালিক। যেমন এক সময়ে খুব বেশি এবং এখনও মাঝে মাঝে রাজনৈতিকদের সম্বন্ধে মনে হতে পারে। সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই তাদের ডাকা যেতে পারে, কিন্তু ভাবখানা এই যেন তারাই বলে দেবে, সমাজের মানুষগুলো নিঃশ্বাস নেবে কি না, কিম্বা কোন কবিতা পড়বে। সংখ্যাতীত গ্যাজেটের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের সাহায্য তোমার দরকারে লাগতে পারে, খুবই দরকার হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শোবার ঘরে বিছানায় বসিয়ে মেঝের কার্পেটে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে দেবে? শুনে মনে হয়, প্রথমত, কথাগুলো ভূদেবকে প্রত্যাখ্যান করেছে, মাঝরাতে তার ফ্ল্যাট থেকে চলে গিয়েছে এমন কোন ললনার। দ্বিতীয়ত, ভূদেবের এমন একটা দুর্বলতা আছে মেকানিকদের সম্বন্ধে যার জন্যে সে ববং সেই স্ত্রীলোকের প্রত্যাখ্যান মেনে নিয়েছে।

মির্জা গালিব এবং সাতাশ নম্বর বটে, তেতলার এই তিন কামরার ফ্ল্যাটটা ভূদেবের। সামনের এই ঘরটা লিভিং রুম। বেশ বড়, চওড়ার অনুপাতে লম্বাই বেশি। সে জন্যে ঘরটাকে একটা অদৃশ্য রেখায় দ্বিখণ্ডিত করতে অসুবিধা হয় না। এদিকে মাঝারি বড় একটা ব্যুরোকে ঘিরে খান কয়েক চেয়ার। ব্যুরোর ছাদ ক্রোম-হলুদ। চেয়ারগুলোর গদি গোলাপি। চেয়ারগুলোর কাঠের অংশ অ্যাম্বার রঙের। ব্যুরো যেমন সাজানো থাকে তেমন করেই সাজানো। একাধিক টেলিফোনের রিসিভার, একটি ডিক্টাফোন। ঘরের অন্য অংশে জ্যামিতিক নকশায় তৈরি নিচু নিচু সোফা ডিভানের সাজানোর কায়দায় একটা দুরূহ জ্যামিতিক নকসার আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সোফা ডিভানের বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলো ছিটে মোড়া নয়। ব্যুরো, চেয়ারের বেলায় যেমন, সুদৃশ্য দামী রেকসিনে মোড়া, রঙের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কিম্বা রেকসিনে বলা ঠিক হল না, চামড়াই বরং। চামড়া থেকে এর পার্থক্য বুঝতে হলে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে এবং সেখানেও সহজে বোঝা যাবে না।

ব্যবসার কথাবার্তা উপন্যাসে আনতে কেউ কেউ দ্বিধা করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রেকসিন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এমন কি শীতপ্রধান মহাদেশের বরফগলা কাদায়, যাকে ওরা স্লাশ বলে, এ বস্তুটি চামড়ার মতোই বিশ্বাসযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী। প্রতি বৎসর কয়েক কোটি জোড়া জুতোই রপ্তানি করা হচ্ছে সুরঞ্জিত তলাপাত্রের এই বিশেষ রেকসিন আবিষ্কারের ফলে। শুধু কি জুতো? কোট, জ্যাকেট, এবং চাদর-রেকসিন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে টেরিসিল্ক ও টেরিউলের আমদানি বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় এই রেকসিন তার দ্বিগুণ অর্জন করে। সেই কবে মসলিন ছিল আবার এই এতদিন পরে এই রেকসিন পাওয়া গেল। চারশ বছর ধরে এ অঞ্চলের লোকরা ব্যবসায় বিমুখ শুনবার পর ওটাকে সত্য বলে মনে হয়েছিল। এখন? এটা অতিশয়োক্তি নয় যে একদিন যেমন ইউরোপের পরিধেয়-রুচি নিয়ন্ত্রণ করতো এই অঞ্চল—এখন অনেকাংশে আবার তা করবে এমন মনে হচ্ছে। সুকসিন সুকসিন বোগদাদ রোম চীন/কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন। এবং সহসা প্রতিযোগিতায় হারতে হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। এক জাপানি ইঞ্জিনিয়ার যে এদেশে বিশ বছর বাস করার প্রমাণ দেখিয়ে উৎপাদন কেন্দ্রে চাকরি পেয়েছিল, সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো সে স্বদেশে ফিরে গিয়েছে কিছু গোপন তথ্য নিয়ে। হয়ত জাপানি পরিবর্ত বাজারে বেরুবে। অত সহজ হবে কি? আমেরিকা এর পরিবর্ত বার করেছে, বাজারেও চলছে। কিন্তু মটকা-গরদের সঙ্গে চীনা সিল্কের তুলনা? এই রেকসিন, সুরঞ্জিত তলাপাত্রের এই রেকসিন—কিম্বা গোড়াতে রেকসিন বলাই ভুল হয়েছে, নতুন জিনিস নতুন নামেই পরিচিত

করা উচিত—এই সুরাকসিন লেদারই, পুড়িয়ে দেখলেই অন্যান্য রেকসিনের সঙ্গে পার্থক্য ধরা পড়বে—যে গন্ধ লেদার পুড়লে পাও, অন্যান্য রেকসিনে তা থাকে না। কিন্তু লেদারের চাইতেও ভালো, কারণ লেদারে সব রং ধবে না। অন্য অনেক কারণে সুরাকসিন আলোচনার যোগ্য, কিন্তু অন্য সব কারণ ছেড়ে দিলেও এই অঞ্চলের লোকেরা যে চিবুক তুলে চলতে শিখেছে তার মূলে এই সুরাকসিন।

সে যাই হোক, এই বসবাব ঘরে সমাদ্দার কার্পেটে বসে একটা টেলিভিশন সেট শোধরাতে কিম্বা গড়ে তুলতে ব্যাপৃত। সমাদ্দারের পবনে কিমোনো। তার পাশে একটা টুলবক্স। সেটাকে দেখে তার হবি সম্বন্ধে আসক্তির একটা পরিমাপ করা যায়। টুলবক্সটা সেই রকমের একটি যা চাব অঙ্কের সব চাইতে বড় সংখ্যাতেও কেনা যায় না। পোর্টেবল ওআর্কশপ। বাক্সটার নিচে চাকা লাগানো। কাজ হয়ে গেলে সুইচ টিপলেই হল। ভেতরে বসানো মুষ্টিপরিমিত ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে চলতে সুরু করবে।

এখানে সত্যের খাতিরে গল্প থামিয়ে একটা কথা বলা দরকার। টুলবক্সটা দামী বটে কিন্তু তা থেকে বড়লোকের দামী জিনিস কিনবাব ঝোঁক ধবা পড়েছে, এমন মনে করা ঠিক হবে না। এটা টেকনোক্র্যাটদের আতিশয্যও নয়, আজকাল তাদের সেই অনেকদিনের পুরনো ভাষায় ফিলিস্তিন বলা হচ্ছে গোপনে। হবিহর্স বলে একটা কথা মনে পড়ছে। হর্স যখন তা খোঁড়ালেও চড়ার জন্যেই। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় সেই হর্সই বরং ঘাড়ে চেপে বসে। আর তখন ছবিটা বই দেখে ডু ইট ইয়োরসেলফের পর্যাযে থাকে না। ভেবে দেখা দরকার, জীবিকা-উপার্জনের বাইরে, খাওয়ার টেবল থেকে দূরে সবে এসে, এই যে একটি বিষয় যা মনকে তৃপ্ত কবে, পরিপূর্ণ কবে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তার চর্চাকে সংস্কৃতি বলা হবে কি না। পত্রিকার পৃষ্ঠায় গল্প লেখার হবি নিয়ে শুরু করে আমাদের কাউকে কাউকে যেমন এক পর্যায়ে ঔপন্যাসিক হওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে মনকে গুছিযে গুছিয়ে একটা গ্রন্থাগার করে তুলতে হয়, ভূদেব সমাদ্দারকেও তেমনি এই টুলবক্সটাকে যোগাড় কবতে হয়েছে। যেহেতু ভূদেব সমাদ্দার বিবেচক, বিবেকবান, এবং বিদগ্ধ, সে বলবে এই কারিগরির চচাই তার কাছে সংস্কৃতি। হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি। এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য না থাকলে কোন ললনাই শেষ পর্যন্ত সহনীয় নয়। যেতে দাও তাকে।

ভূদেব ঠুকঠাক করছে, খুটখাট করছে। একটা সরু তার কিম্বা তার চাইতেও সরু স্ক্রু টেনে বার কবে আলোতে তুলে ধরে পরীক্ষা করছে, ঘুণাক্ষর বুঝতে চেষ্টা করছে। স্ক্রু কষছে, নব মোচড়াচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, চিত্রকব যেমন ইজেল থেকে খানিকটা সরে গিয়ে অর্ধসমাপ্তকে লক্ষ্য করে, মাঝে মাঝে টেলিভিসন সেটটাকে চালু করে পরখ করেও নিচ্ছে। তার ফলে সেটার পর্দায় কখনও কোন উরস্বিনী গানের একটা কলি গেয়ে উঠছে, কোন কালোমুক্তা পায়ের ওপরে ফুটবল দোলাচ্ছে, কোন বিজ্ঞান-রোমাঞ্চিকার নায়িকা বাদামের মতো ছোট একটা ডিক্টাফোন যন্ত্রকে ডিনার টেবলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লাঞ্চেব আখরোট-বাদামেব প্লেট সাজাচ্ছে। বলা বাহুল্য এগুলোতে ইংল্যাণ্ড, ব্রাজিল এবং জাপান ধরা পড়ল।

কাজ করতে করতে ভূদেব কথা বলল। আমরা তখন নাটকীয়ভাবে ঘরটাতে অন্য আর একজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম। ঢাউস চেহারার কাগজটা নড়ল আর তার পেছন থেকে ভূধর স্যান আত্মপ্রকাশ করল। এই অপরাধ-বিজ্ঞানীর এরকম আত্মগোপন কবে বসে থাকা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চয়ই আতিশয্য হবে, কিন্তু এটাকে তার চালচলনের প্রতীক হিসাবে নিলে অন্যায় হয় কিনা ভেবে দেখবো, কারণ এটা আমরা ভুলতে পারছি না অপরাধবিজ্ঞান তার হবি, উপজীবিকার দিক দিয়ে সে রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

ভূদেব বলল, আ, ভূধর, আ, এখনও কি সন্ধ্যা হয় নি?

সমাদ্দারের স্বরে যেন বিষাদ, যেন সে অপরিসীম ক্লান্ত।

বস্তুত তখনও সন্ধ্যা হতে কিছু দেরি আছে। ভূধর কাগজ সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল। নিঃশব্দে হাসল। বলল, কোথায় আছে?

সমাদ্দার বলল, আট্রেবোয়, আমার মনে হচ্ছে, যদি তা বলো, শোবার ঘরেই আছে।

ভূধর উঠে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চাকা-লাগানো ছোট্ট সুদৃশ্য মদের বারটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল।

ভূদেব উঠে দাঁড়াল। নিচু হয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল। বলল, আ, ভূধব, দেখো, লুক, লো, ওটা এমারেলড আঁবসাৎ, ওটা ছিপি খোলা হয় নি এমন ভার্মুথ। আমার হাতে তেলকালি ভাই। তুমি দুটো গ্লাস ভরে ফেলো তোমার পছন্দ মতো। আবাব ভবো, আবার ভরো, আবার।

ভূধর দুটো গ্লাস ভরল। ভূদেব নিজের গ্লাসটাকে তুলে নিযে তার টুলবক্সের দিকে মন দিল। ভূধর আলোর দিকে গ্লাস ধরে মদটাকে দেখে দেখে মৃদু মৃদু চুমুক দিয়ে চলল। অনুমান হয সে ভাবছেও বটে।

ভূদেব একটা স্ক্রু নিয়ে কিমোনোর আস্তিনে মুছে টেলিভিশন যন্ত্রব যথাস্থানে লাগিযে দিয়ে পরখ করার জন্যে সুইচ লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে করতালির শব্দ চড়চড় কবে উঠল। অব্যর্থ, দক্ষ লেফট হুক। মুষ্টিযোদ্ধাদেব একজন টলতে টলতে কোণের দিকে সবে যাচ্ছে, তার ব্যথায় বিকৃত মুখ লালচে হয়ে উঠতেই গাঢ় রক্তের একটা ধারা গলা বেযে বুকেব দিকে নেমে এলো।

সুইচটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে ভূদেব মদেব গ্লাসটাকে তুলে নিয়ে বলল, আচ্ছা, ভূধব, ইনকামট্যাকস ডাইবেক্টরেট কিম্বা অ্যান্টিস্মাগলিং ব্যুরো--

কথাব মাঝখানে থামল ভূদেব, সাগ্রহে বরং টেলিভিশন স্ক্রিনের দিকে চেযে রইল।

ভূধর নিঃশেষ করা গ্লাসটাকে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে বলল, তোমাব কাজ হয়েছে? তা হলে আমরা বেড়াতে যেতে পাবি, কিম্বা কোন আর্ট থিয়েটারে।

স্ক্রু কষে কষে কেসটাকে শক্ত কবল ভূদেব। অনুমান করা যায়, নিজের পরিশ্রমের ফলে মোটামুটি সন্তুষ্ট হযেছে সে। শেষ বারেব মতো পরখ করার জন্যে সুইচটাকে একটু ঘুরাল। ছবিটা আর একটু স্পষ্ট হল। মুষ্টিযোদ্ধা দুজনেই সম্ভবত এই রাউণ্ডেই প্রতিপক্ষকে নকআউট কবতে কৃতসংকল্প। একজনের মুখ রক্তাক্ত, অন্যের ডান চোখটা ফুলে উঠেছে, রক্ত মেশানো জলের মতো কিছু একটা গড়াচ্ছে চোখ থেকে। দর্শকদের হাততালিব শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বিলম্বিত লয়ের তালে তাবা সমবেতভাবে করতালি দিচ্ছে খট খট খট। যেন কিছু একটাকে প্রতীক্ষা করছে তাবা। আব মুহূর্তেই তা ঘটে গেল। নিখুঁত, অনবদ্য একটা রক্তঝবানো আপাব কাট। আঘাতপ্রাপ্ত মুষ্টিযোদ্ধা টলছে, তার পেশীদৃঢ় পা দুখানা ন্যাকপ্যাক করছে। ঝড়ে-পড়া কলাগাছের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সে কানভাসের ওপরে আছড়ে পড়ল। দ্রুত আনন্দিত করতালি। ভূদেবের মুখে তৃপ্তিব চিহ্ন দেখা দিল, আ, বিউটি! একমুহূর্তে সে টেলিভিশন স্ক্রিনটার দিকে চেয়ে রইল। এখন সেখানে ফেড অফ হচ্ছে।

ভূধর হাততালির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে টেলিভিশন সেটটার দিকে চেয়েছিল। কেউ যেন তার কড়ার ওপরে নেচেছে এমন চেহারা হল তার মুখের। তার ভ্রু দুটো একটু ওপরে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসল।

সুইচ অফ করে একটা সোফাতে বাহু বেষ্টন করে ভূদেব ভূধরের মুখোমুখি গিয়ে বসল মদের গ্লাসটা নিয়ে।

ভূদেব বলল, এটা আজকাল ভালোই হয়েছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আহমেদাবাদ, ৩০ আগস্ট ১৯৬৭, বেলা ৪টা ১৫ মিনিট। এ-টি-এম-২ উপগ্রহ ব্যবহার করে আমরা প্রথম দূর-সংযোগ স্থাপন করেছিলাম। (সলজ্জ দেখাল ভূদেবের মুখ।)

ভূধর সিগারেট কেস এগিয়ে ধরল, তা, হ্যাঁ বলতে পারো।

আর, অবশ্য এটা সাজানো। মানে ঠিক তিন রাউণ্ডে নক আউট হতেই হবে, কারণ তিন রাউণ্ডের বেশি টেলিভিসন পর্দাকে তুমি আটকে বাখতে পারো না। তবু তারই মধ্যে জেনুইন রক্ত। এটা তোমার র‍্যাশনিং-এর চাইতে ভালো, যদি তা বলতে চাও। কী বলো?

ভূধর বিশেষ বিব্রত বোধ করল। বলল, তা অনেকটা ভালো। এক্ষেত্রে অন্তত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে না যেমন রোমের সেই ক্রীতদাসদেব পড়তো।

গ্লাস দুটো নিজেই ভরে নিল ভূদেব। বলল, ও, হ্যাঁ, একথা নয়, আসলে তুমি কিছু বলেছিলে।

বলছিলুম, তোমার হাতে যদি তেমন কাজ না থাকে বেড়াতে গেলে হয়।

এটা তোমার ফাঁকির কথা যদি ভেবে দেখো। এই দেখো, তুমি যে ঠোঁটে ছুঁইয়ে নামিয়ে রাখলে। একটু উপকার তো তোমার কাছে আশা করতে পারি, কিছু সাহায্য, আব তা মানুষ বন্ধু-বান্ধবের কাছে আশা কবেই থাকে। সমাজ বলতে যা বোঝায় সেখানে কি কেলেঙ্কারি আর ঘটছে না? কিম্বা তোমার অনুসন্ধানের বিষয়গুলো সম্বন্ধে এতটুকু ইঙ্গিত।

ভূধর বলল, তোমার লোকেরা যেখানে সংবাদ খুঁজে পায় না আমি সেখানে কিছু পাবো এ আশা করা যায় না। ভূধর হাসল, আর তা ছাড়া—

কী তা ছাড়া?

সোসাইটি-স্ক্যাণ্ডাল বলে আব কী অবশিষ্ট আছে?

এটা তোমার অত্যন্ত ক্ষমাশীলতাব পরিচয়, ভূধব।

তা হতে গেল কেন? তুমিই বলো না যে আমাদের ভুল ধাবণাগুলো শুধরে যাওয়ার ফলে এখানে স্ক্যাণ্ডাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

বাহ্, এই তো বেশ বলেছো। এ বিষয়ে তোমার চিন্তা অবশ্যই কাজে লাগানো যাবে। এখানে বলে রাখি, আমি একজন নতুন ফিচারিস্টের খোঁজ পেয়েছি। আসবার কথা আছে। যদি থাকো তখন আলাপ হবে। এখন বলো, স্ক্যাণ্ডাল খুঁজে না পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে তোমার মত কী।

ভূধব হাসল, ফুটিয়ে তুলতে পারলে বোধ হয় তুমি যা করতে চলেছো এটাই একমাত্র স্ক্যাণ্ডালের বিষয় হতে পারে। অশ্লীল হতে পারে।

বুঝিয়ে না বললে মানছি না। ভূদেব পায়ের ওপরে পা তুলে বসল।

এই ঝোঁকটাই বোধ হয় স্ক্যাণ্ডাল হতে পারে, বন্ধুবান্ধব পরিচিত যে যাই বলুক তার মধ্যেই অর্থকরী ফিচারের বীজ বা সংবাদের ইঙ্গিত খোঁজার ভঙ্গি। নতুবা অন্য কাকে কেলেঙ্কারী বলবে? আগে, এমন কি আমাদের প্রথম জীবনেও, স্ত্রীপুরুষের বিধিবহির্ভূত প্রেম কেলেঙ্কারিতে উৎস ছিল। এখন এটা সংবাদ হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, অ্যালায়েন্স বদলানোর সংবাদ, কিন্তু বিধিগুলো এখন এতো উদার যে তার বহির্ভূত কী হতে পারে ভাবা যায় না।

ভূদেব অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল। বলল, এর উত্তর আমি দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তুমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও আইন উদার হওয়ার ফলে কেলেঙ্কারি কি করে লোপ পাচ্ছে।

ভূধর বলল, কোন বিবাহিতা নারী যদি পরপুরুষকে স্বামীর চাইতে বেশি কৃপা করে, সমাজ কণ্টকিত হয় না আর ; কারণ সেটা ডিভোর্সের প্রকাশিতব্য সঞ্চয়যোগ্য প্রমাণ মাত্র। কোন অবিবাহিতা নারী যদি ভ্রূণহত্যার জন্য ডাক্তারের সাহায্য নেয় তবে সমাজ সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না কারণ নারীর সে অধিকার আছে।

ভূদেব বলল, বসো, রসো। স্যানমশাই, একটা বিষয় তুমি গোপন করছো, যদি তা বলতে চাও। মনে করো কোন ভদ্র পুরুষ, যাকে সমাজ ভদ্র বলে, সে যদি আবিষ্কার করে তার স্ত্রী পরগামিনী আর তা আবিষ্কার করে সে যদি প্রতিবেশীদের শান্তি নষ্ট করে চিল্লাচিল্লি করে? সেই চেঁচামেচি,

কথাটা দেখো চিন্নাচিন্নি, তা হলে স্ক্যাণ্ডাল হবে না? কিম্বা কোন অবিবাহিতা তরুণী যদি ভ্রূণহত্যার জন্যে হসপিট্যালের ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে পথের ধারে তা নিক্ষেপ করে, কিম্বা আনাড়ির হাতে প্রাণ হারায় তবে তা কেলেঙ্কারি হবে না? কিম্বা এখনও ইনসেস্টকে তোমরা বিধিসম্মত করো নি। সে রকম ঘটনা নেই? আ ভূধর, আমি এর আগেও লক্ষ্য করেছি আবসাঁৎ তোমার যেন কিছুটা ধার কমিয়ে দেয় —ভূদেব সমাদ্দার হাসল, বার থেকে নতুন একটা বোতল বাব করল, এটা সেই আদিযুগের হুইস্কি —সাহায্য নাও এবং তারপর বলো।

ভূধর সিগারেট রাখবার জন্যে অ্যাশট্রে খুঁজে এদিক-ওদিক চাইল। উঠে গিয়ে টেবল থেকে নিয়ে এল একটা। আবসাঁতের গ্লাসটায় মৃদু মৃদু চুমুক দিল। হেসে বলল, তোমার ধরন-ধারন আজকাল সূক্ষ্ম হয়েছে দেখছি। কিন্তু সব সংবাদসেবীর তা নয়। আজকের সকালের কাগজে মন্ত্রীমশায়ের কেলেঙ্কারি হিসাবে যা ছাপা হয়েছে সেটা খানিকটা কাদা ছিটানো বটে কিন্তু স্ক্যাণ্ডাল বলা যায় না। ভালো কথা, তোমাকে বলে রাখি, ও ব্যাপারটায় তুমি থেকো না। দুপুরে মন্ত্রীপরিষদের নির্দেশে ওই সংবাদের উৎস খুঁজে বার করার ভার নিয়েছি, এবং আমি আমার সহকারীদের নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরুও করেছি।

তাই নাকি? কিন্তু ও ব্যাপারটাকে তুমি কী মনে করো? ভূদেব হাসল।

সবই নির্ভর করবে মন্ত্রীমশায় নিজে কী বিবৃতি দেন তার ওপর।

সমাদ্দার বলল, ঠিক বলছো? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাক, দেখা যাক। কিন্তু স্ক্যাণ্ডাল যখন নেই, নাই থাকল, ইন্‌কামট্যাক্স অনুসন্ধান ব্যুরো যার বৈঠকখানা, তার কাছে সংবাদ নেই একি হতে পারে? তা ছাড়া তুমি বোধ হয় ট্যারিফ-বহির্ভূত বাণিজ্যের কনট্রোল বোর্ডেও আছো।

ভূধর একটু অবাক হল। বলল, তুমি যে দক্ষ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। টাট, টাট, এ খবর ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়া উচিত হয় নি।

ভূদেব আলাপটাকে সরিয়ে নিল, অথবা, বলো, আর্ট থিয়েটারে কী হয়?

বলো কী, আর্ট থিয়েটারে? আর্ট থিয়েটারে তোমার অ্যালার্জি হয় শুনেছি।

আচ্ছা, ভূধর, তুমি সত্যি কথা বলো তো, তুমি কি বেনেশাঁর কথা— আচ্ছা তা নাকি এক স্ক্যাণ্ডাল!

গিয়েছো? না, শুনে বলছো?

ভূদেব কিছুটা অপ্রতিভের মতো হেসে বলল, না, না। যেতে হবে একদিন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও আছে। তার ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। তুমি শুনেছো নাকি মাধবী ঘোষালের সেই ফিল্মটার সিনারিওর অনেকাংশই নাকি প্রবীরবাবুরই তৈবি। কিন্তু অমন একটা সিনারিও বেচবার পর আর্ট থিয়েটারের খোপে ফিরে যাওয়া, অবশ্য প্রত্যেকেরই রুচির স্বাধীনতা আছে।

ভূধর বলল, এর আগে আর্ট থিয়েটার নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। যার জন্যে অন্তত একজন অসহিষ্ণু ভদ্রমহিলা আমাদের গোরা-বিনয়ের অপবাদ দিয়েছিল। তোমার মত বদলায় নি, সুতরাং শুতে ফিরে লাভ নেই। তবে মাধবীও নামছে এই নাটকে এই খবর দিতে পারি।

ভূদেব হো হো করে হেসে উঠল। আচ্ছা, আচ্ছা, প্রবীর সাণ্ডেল তোমার বন্ধুস্থানীয়, আমারও পরিচিত। এর মধ্যেই যাব একদিন। দেখে আসবো। শুনেছি তা নাকি একটা স্যাটায়ার। ভালো কথা, নিরঞ্জন ঘোষালের ব্যাপারটাকে কী বলবে? নিরঞ্জন মানে মাধবী ঘোষালের স্বামী।

ভূধর অবাক হল। কী ব্যাপার?

অবশ্য ডিভোর্স বা জুডিশিঅ্যাল সেপারেশনের কথা বলছি না। মাধবী ডিভোর্স চেয়েছিল, নিরঞ্জন পরেরটি। জজ পরেরটিকেই দিয়েছে। কারণটা শুনেছো? মাধবীর কাউন্সেল বলেছিল, সন্তানলাভের

পর রমণীর মন হয়তো বন্দনাযোগ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তার দেহ অনিন্দিত থাকে না। আর আমার মক্কেল মাধবীর জীবিকার পক্ষে কান্তিই অপরিহার্য। নিরঞ্জনের ব্যারিস্টার বলেছিল, আমার মক্কেল একটি পুত্র চান, এবং মাধবীর কাছে থেকে চান, কারণ তাঁকেই তিনি ভালোবাসেন। এটা মানসিক অসামঞ্জস্য নয়। এর ওপরে ডিভোর্স চলে না। বরং মাধবীকে ম্যাচিওর হওয়ার সময় দেয়া হোক। আমার মনে হয় আইনেব ন্যায়পরায়ণতা তাতেই রক্ষা পাবে।

একেবারে মুখস্থ দেখছি।

সব কাটিংস রোজ পড়া হয় না। আজ সকালেই পড়ছিলাম। আর তার কারণ আমার নতুন ফিচারিস্ট রাজেনকে এর ওপরেই লিখতে বলবো ভাবছি।

এর মধ্যে কি স্ক্যাণ্ডাল আছে মনে করছো?

হুঁ, তা, যদি তা বলো ; এটা কি কেলেঙ্কারি নয়, এই পুরনো ধরনের চিন্তা একজন টেকনোক্র্যাটের পক্ষে?

ভূধরের চোখ দুটি একটু চকচক করে উঠল। অনুমান হল সে তর্কের কোন বিষয় পেয়েছে, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে তার কিছু বক্তব্য আছে।

সে সিগারেট ধরাল। ভূদেব আবার গ্লাস ভবতে গেল। সে হাত নেড়ে জানাল আর দরকার নেই। খানিকটা ধোঁয়ানোর পর ভূধর বলল, আচ্ছা উইল করাকে তুমি কী বকম মনে করো?

মানে? তাও ভালো। কিন্তু আসল কথা কী জানো, রেখে যাওয়ার মতো কিছু সঞ্চয় করছি না। একটা ছোট টাকার অঙ্ক অবশ্য একান্ত-সচিবের নামে নমিনেশন করা আছে। হঠাৎ কিছু হলে চলতিমাসের বিলগুলো শোধ করতে পারবে, শরীরটাকে পোড়াতে অসুবিধা হবে না।

তুমি না করলেও অনেক মানুষ উইল কবে থাকে।

তা করে, কিন্তু গ্লাস দুটোই খালি দেখো। বোঝা যাচ্ছে উইল কেউ করে, কেউ করে না।

তোমাকে অঙ্কের বইয়ের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। পুত্রকলত্রকন্যাকে উইল করে দেয়ার সময়ে কী রকম সব কঠোর চেহাবার ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয় তা যদি মনে করো। পুত্র অর্ধেক, কলত্র অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ, কন্যাবা প্রত্যেক অবশিষ্টের এক চতুর্থাংশ করে—

মনে পডছে বটে, ভূদেব বলল, ভাগটাকে অসমান রাখাই উদ্দেশ্য আর তাতেই নাকি গাণিতিক বুদ্ধির উন্মেষ।

তুমি কি লক্ষ্য করেছো শুধু অসমান রাখা নয়, বড় ভাগটা সব সময়েই একজন পাচ্ছে আব সে পুত্র। এটা পক্ষপাতিত্ব নয়!

তা যদি বলো এমন অসাম্য আরও আছে। ভূদেব দুটো গ্লাসই আবার ভরল। ক-এর দিকে এরকম একটা টান সব সময়েই ধরা পড়ে, যার ফলে খ-কে ক-এর চাইতে বেশি খাটতে খুটতে হয়, ক-বাবু প্রায়ই কাজ ফেলে সরে পড়ে আর খ-কে খেটেখুটে নিজের কাজের সঙ্গে তার কাজও তুলে দিতে হয়, অথচ পাওয়ার ব্যাপারে ক-বাবু কিছু বেশিই পেয়ে থাকে।

ভূধর হাসল। বলল, আমি মনে করি ব্যাপারটায় সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন আছে। মানুষ পুত্রকেই অধিকাংশ সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে যদিও আইনে, উইল না থাকলে ওয়ারিশরা সবাই সমান হকদার!

কেউ কেউ সমাজকেই অনেকটা দিয়ে যায়।

যে সারাজীবন সমাজের কল্যাণ করেছে মৃত্যুর পরেও সমাজের কল্যাণ করতে থাকবে তার বিদেহ শক্তি দিয়ে, এরকম একটা ইচ্ছে থেকে এটা হতে পারে। কারণ, ভুলে যেয়ো না, টাকাটা শক্তির সিম্বল মাত্র নয়, শক্তিকে টাকায এবং টাকাকে শক্তিতে পরিণত করা চলে। কলত্র এবং কন্যাকে দেয়ার বেলাতেও এমন কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। নিজের বিমূর্ত প্রেম আর স্নেহ তাদের

কাছে রেখে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়তো। কিন্তু পুত্র? আকৃতি, প্রকৃতি, এমন কি নাম—এসবের ঐক্যে নিজেই যেন অন্যদেহে থেকে যাওয়া—তাই নয়?

ভূদেব হেসে বলল, রসো, রসো। সমাজকে যা দিচ্ছি সেটা কল্যাণকামনা, বউ আর মেয়েকে দিচ্ছি ভালোবাসা আর স্নেহ, এগুলো আমার অস্তিত্বের একটা দিক যা আমার অস্তিত্বের পোটেনশিয়াল অবস্থায় থেকে যাবে, আর ছেলের বেলায় আকৃতি, প্রকৃতি, নাম—উপরন্তু আমার শক্তির অধিকাংশ পোটেনশিয়াল নিয়ে আমিই থেকে যাবো, দেহে এবং মনে?

ভূধর কিছু বলার আগেই ব্যুরোর ওপরে রাখা একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে উঠল। ভূদেব উঠে গেল। একটু কথা বলেই একটা প্যাড টেনে নিল। টেলিফোনে শুনে শুনে কিছু লিখল। তারপর জানিয়ে দিল, ঠিক এখন সে অন্যভাবে ব্যাপৃত, পরে লোক পাঠাবে। কিন্তু সংবাদটা তার সিণ্ডিকেট থেকে আসছে, উপজীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটু চিন্তা করল সে ফোনটা রেখে দিয়ে। প্যাডে লেখা সংবাদটা আবার পড়ল।

তারপর ফিরে এসে বলল, আপাতত আমার আর তোমার সে সুযোগ নেই স্যানমশাই, কারণ আমরা অপুত্রক। ওটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। এখন এসো বর্তমানের খোঁজ-খবর নেয়া যাক। তুমি তো তিব্বতীদের কায়দায় বছরগুলোর নামকরণ করে থাকো। এ বছরটাকে কী নাম দেবে? অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এসেছি আমরা। তেমন কিছু ভেবেছো? যে বছর বাঘে ধান খেল, কিম্বা সূর্য যে বছর তুষারাবৃত?

ভূধর হেসে বলল, তোমার মনে আছে দেখছি। পর পর দুটি বছরকে একই ধরনের নাম দেওয়া হয়েছে বটে। একটু থেমে আবার বলল, তিব্বতীরা সেকালে বছরের নামকরণ করতো রাশিফল গণনা করে। আমাদের সময়ে বছরগুলোকে নাম দিতে তুমিও পারবে যদি সংবাদগুলোকে ভালো করে বিশ্লেষণ করো। কিন্তু কী সংবাদ পেলে ফোনে? চোখ দুটি চঞ্চল।

ভূদেব বলল, তোমার নামকরণে সারা বছরের সামাজিক মনোভঙ্গীর মূলভাবটা ধরা পড়ে কিনা জানি না, কিন্তু নামটা টাটকা রসিকতা হিসাবে তোমার পাঠকদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমার গোঁফটা মুছেও নাও। এমারেলড হয়ে উঠেছে আবসাঁতে।

ভূধর বলল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। গ্লাসে একটা মৃদু চুমুক দিয়ে আবার বলল, তুমি যখন এতই আগ্রহী তোমাকে বলতে পারি, এ বছরটাকে আপাতত যে বছর মৃত্যুভয় দেখা দিল, এমন একটা নাম দেয়া যায় কিনা ভাবছি।

ভূদেব বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এবার আমি তোমার কৌশলটা ধরে ফেলবো। স্ট্রীট অ্যাকসিডেন্ট নিশ্চয় গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বেশি, আর এটা বোধ হয় তোমার গ্রাফে ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে. কিম্বা, কিম্বা সংখ্যায় তেমন বেশি না বেড়েও অ্যাকসিডেন্টগুলো অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি মৃত্যু ঘটাচ্ছে অথবা তুমি লাইফ ইনসিওরেন্সের গ্রাফে কিছু দেখেছো, এনডাউমেন্টের তুলনায় হোললাইফ পলিসি বেশি নিচ্ছে লোকে, কিম্বা সাধারণভাবে পলিসির সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে।

ভূধর মৃদু মৃদু হাসল।

ভূদেব বলল, কী, ঠিক হচ্ছে না?

ভূধর বলল, জরিপ করা দরকার, ব্যাপক এবং গভীর। তোমাকে ডিভোর্স কোর্টের সংবাদ এবং নথিপত্র দেখতে হবে, আত্মহত্যার বিবরণগুলো সংগ্রহ করতে হবে, তার মনস্তত্ত্বগত কারণগুলোকে খুঁজে দেখতে হবে। তোমরা সাধারণত আত্মহত্যাটাকে একটা গা-সওয়া সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা হিসাবে দেখে থাকো আজকাল। স্ট্রীট অ্যাকসিডেন্টের মতোই একটা শতকরা হিসাবের ব্যাপারের চাইতে বেশি কিছু মনে করো না। তুমি কী খবর পেলে? কারো আত্মহত্যার কি?

ভূদেব বলল, ডিভোর্স কোর্টেও, বলো কী? এলেন পো-র সেই 'লাল মৃত্যু' গল্পের মতো দাঁড়াচ্ছে, গতবার যা সিনেমায় দেখা গিয়েছিল।

ভূধর বলল, টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষালের ব্যাপারটাকে কী মনে করো?

সে কী।

কিন্তু ভূধর আর কিছু বলার আগেই দরজার পুশ বেলটা মৃদু মৃদু বাজল। ভূদেব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আগন্তুকে দেখে, এসো, এসো, বলে অভ্যর্থনা করল।

রাজেন ঢুকতে ঢুকতে বলল, আমার কয়েকদিন দেরিই হল বোধ হয়।

তোমার মত পড়ুয়া মানুষের একটু দেরি হলেই স্বাভাবিক হয়। এসো, এই আমার বন্ধু ভূধর সেনমশাই, সমাজতত্ত্ববিদ, অপরাধবিজ্ঞানী, আর এই আমার তরুণ বন্ধু রাজেন, দর্শনের ছাত্র। তুমি যদি পানীয় চাও, রাজেন বিনা দ্বিধায় বারের কাছে এগিয়ে যাবে। আপাতত দেখতে পারো এই এমারেলড আবসাঁৎ তোমার পছন্দ কিনা। আমরা যা আলোচনা করছিলাম তাও বলে দিচ্ছি। আমাদেব জীবনে মৃত্যুভয় এসেছে আর তার ফলে আমরা অনেক কিছু ঘটাচ্ছি, উইল করে পুত্রকে অধিকাংশ সম্পত্তি দিচ্ছি, অপুত্রক অবস্থায় পুত্রের জন্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ডিভোর্স কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি। এমন কি আত্মহত্যাও করছি। আচ্ছা স্যানমশাই, মৃত্যুভয়ে আত্মহত্যা করাটা বাঘের ভয়ে বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দেয়া হল না! কী বলো রাজেন, তাই হয় না?

রাজেন তর্কে ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ করল। তার মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখা দিল। কিন্তু আলাপের যে কোণটা তার দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাকে না ধবলে আলাপটা চুপসে যাবে। সে বলল, অন্তত মানুষের মৃত্যুভয় থাকাটা অদ্ভুত নয়। বরং আমার মনে হয় মৃত্যুভয় আব অন্ধকারকে ভয় একই বয়সের। জাতেও প্রায় এক। পশু আর মানুষে যত তফাৎ আছে তার মধ্যে এটাও একটা যে পশুর মৃত্যুভয় নেই, ওটা মানুষেরই।

ভূধব বলল, সুন্দর বলেছেন। মৃত্যুভয় বিচারবুদ্ধির সঙ্গে, চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। চিন্তা করলে ওটা বাড়ে, অন্যদিকে ওটাকে এড়ানোর জন্যে মানুষ নানা রকমের চিন্তাও করে।

রাজেন সজ্জলভাবে বলল, এ বিষয়ে আমাদের বিনাদ্বিধায় একমত হওয়া উচিত।

ভূদেব বলল, মৃত্যু আছে। কিন্তু তাকে আমরা কি সত্যি তেমন ভয় করি? জীবনটাকে আশি বছরের বেশি টেনে নেয়া কঠিন, কিন্তু যা কিছু আমবা করি তা কম করেও একশো বছরের জন্যে মৃত্যুকে আমল দিলে তা করতাম না।

ভূধর বলল, আমরা যা কিছু করি তা অন্তত একশো বছর থাক এরকম আকাঙ্ক্ষা থাকে আমাদের মনে নেই, কে তুমি পড়িছ বসি—? ওটা মৃত্যুকে ভুলবার চেষ্টা।

রাজেন একটু ভেবে বলল, হয়তো, কাজটা করার সময়ে, আমি মরে যাবো সুতরাং কাজট দীর্ঘস্থায়ী করে করবো, এরকম ভাবি না আমরা, কিন্তু যদি জানতাম যা কিছু করছি তা আমা মৃত্যুতেই শেষ, তা হলে আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই কিছু করতে চাইতো।

ভূদেব বলল, উদাহবণ দাও।

ধরুন দেশপ্রেমিক যুদ্ধে যাচ্ছে, যদি সে জানতে পারে তার সব চেষ্টাই বৃথা হবে কারণ কর্তৃপক্ষ বরং পরাজিতের সন্ধিকে মেনে নিতে প্রস্তুত, তবে কি সে প্রাণ দিতে চাইবে? ধরুন একটা বিপ্লবে কথা। মানুষ তার জন্যে ক্ষতি স্বীকার করে প্রাণ দেয়। কিন্তু যদি সে জানতে পারে যে, ে ধারণাগুলোর সমষ্টি তার বিপ্লব, সে ধারণাগুলোর মধ্যে অনেক চিন্তার ত্রুটি আছে, সে পথ বহুলাংে পরিত্যক্ত হবে, তার মৃত্যুর পরে তার ধারণাগুলোকে অন্য অনেকে বহন করে নিয়ে চলবে ন তা হলে কোন বিপ্লবই হতো না। আমার পরেই প্লাবন নয়, বরং আমার পরে অন্য অনেকে যাব চিন্তার দিক দিয়ে, চেহারায় যতই অনৈক্য থাক, আমিই বটে—এ সম্বন্ধে নিশ্চয় বিশ্বাস না থাকে

প্রাণ দেয়ার ঝুঁকি অনেকেই নেবে না।

ভূধর বলল, তা হলেই দেখা যাচ্ছে উত্তরপুরুষ তার ভালো কিছুর উত্তরাধিকারী হবে এ না জানলে মানুষ মৃত্যুভয়ে সম্মোহগ্রস্ত হতো, কিছুই করতো না। কিন্তু মানুষ মৃত্যুভয় দূর করতে চায়, নিজের কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, সুতরাং সে উত্তরপুরুষকে কল্পনা করে, পেতে ইচ্ছা করে, উইল করে।

রাজেন বলল, ব্যক্তিগতভাবে তাই বটে। কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত কাজকর্মও তো আছে, সেখানেই আমরা সবচাইতে হতাশ। আগে ধর্ম ছিল, নীতি ছিল, অন্তত ঐতিহ্য ছিল। তা থেকে আমরা বুঝতাম। জানতাম আমার কী করা উচিত। আশা করতাম নীতিগুলো আমার পরেও সমাজ মেনে চলবে। এখন সে বিশ্বাস আমরা করি না। মানুষ একটা বিশেষ নীতিকে কেন মেনে চলবে বারবার, যার কোনও যুক্তি নেই? মানুষের কোন অবস্থায় কী করা উচিত তা কে বলতে পাবে? আর সে জন্যেই হতাশা। উইল করে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, যদিও আপাতত তারই সাহায্যে মৃত্যুভয় থেকে পালাতে চেষ্টা করা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত টাকা পয়সার এবং সামাজিক নীতির উইল।

ভূদেব বলল, এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনের মত খুব কাছাকাছি। মোট কথা এই, মৃত্যুভয় আব তার নিজেব মধ্যে সন্তানেব ব্যবধান না থাকলে, কিম্বা সে ব্যবধানকে যদি অর্থহীন বলে মনে হয়, বাঘেই খাবে যখন একদিন, তখন আজই খাও বলে মানুষ বাঘের মুখে মাথা দিতে পারে —এই বলছো?

ভূধর বলল, অনারোগ্য ব্যাধিতে যে ভুগছে অনেক চেষ্টা কবতে করতে একদিন সে তার এতদিনেব সব চেষ্টাকে পাগলামি মনে করে যার জন্যে চেষ্টা তাকেই নষ্ট করতে পারে।

কিংবা, রাজেন বলল, জীবনটাকে ভার বলে বোধ হতে পারে যা কাঁধ থেকে ফেলা দেয়া উচিত , কিম্বা ভান বলে বোধ হতে পারে, সুতবাং নেপথ্যে যাওয়ার আগেই মুখোস খুলে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়া ভাল।

ভূদেব একবার পায়চারি কবে এল। আব তখন একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটল!

একবার একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল। কয়েকটি কিশোর এক ভাঙাবাড়ির দুপুর রোদের বারান্দায় বসে আপসে ভূতেব গল্প কবছিল। এই ভাঙা ইঁটটা ভূত হতে পারে, ওই দেয়ালের ফাটলটা প্রকৃত পক্ষে কাবো বুকফাটা কান্না হতে পারে। এ বকম সব আলাপে গল্পটা এমন জমে উঠেছিল যে এক সময়ে কিশোর কজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে দুড়দাড় করে ছুটে পালাল। আর এই পরিত্যক্ত বারান্দার ওপরে রোদটুকুও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, ইটেব টুকরোগুলোর ওপরে তা যেন ঠা ঠা করে হেসে উঠবে। এই ঘটনাটাব মতো কিছু যেন ঘটল এখানে। যেন অস্বাভাবিক কিছু অবতরণ করেছে, তা যেন মৃত্যুভয়ই। দু পাঁচ মিনিট ধরে এটা যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে চলল এই ঘরটায়। অন্তত একটা অস্বস্তি।

তারপর ভূদেব একটু জোরে জোরে বলল, তোমার কোথাও এনগেজমেন্ট আছে, ভূধর? নেই? বা, নাইস! আমি একটা প্রস্তাব তুলছি। ডিনারে চলো। ডিনারের পরে সিনেমা, কিম্বা হিপোড্রোমে। তুমি কি এর আগে কখনও হিপোড্রোমে গিয়েছো, রাজেন? হোটেলের ডিনার-নাচ অসম্বৃত বস্ত্রের। এসো, আমরা আদিম পুরুষের মতো নির্দয় হই। হিপোড্রোমের বিবস্ত্রা যুবতীদের নাচ নির্দয় পুরুষদের জন্যই, যদি বলতে চাও।

সে হাসল। তার মুখের রং এমনিতেই ফ্যাকাশে।

ভূধর নিচু হয়ে বসে বারে পছন্দসই মদ খুঁজতে শুরু করল। সে ভাবল, মৃত্যুর তাড়া খেলে রমণীর দেহকে আশ্রয়। এটা কি আদিম কিছু, নাকি মানুষের উদ্ভাবন! সে কাশল যেন গলা সাফ

করতে। রাজেন সিগারেট ধরাল।

অবশেষে মনের মতো কিছু একটা সে পেয়েছে—বোতলটাকে ভূধর যে ভাবে তুলে ধরল সস্নেহে তা থেকে আন্দাজ করা যায়। নিঃশব্দ আনন্দিত আমন্ত্রণে বোতলটার ভিনটেজের তারিখের দিকে রাজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোতলটাকে বারেব মাথায় রাখল সে। কপাল কোঁচকানো, কিছু কী ভাবছে সে? বারের নিচের দেরাজ থেকে তিনটে নতুন ওয়াইনকাপ তুলে বোতলের পাশে সাজাল। যেন সে ঘর্মাক্ত গরমে হাঁপাচ্ছিল এমনভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আ, কুল ক্ল্যারেট। আমি সব সময়েই স্বীকার করি যে কখনও কখনও সমাদ্দারের গুহায় নিছক উৎকৃষ্ট মদের আশাতেই এসে থাকি।

রাজেন বলল, কথাটা অন্তত ঠিক পুরুষদের মতোই হয়েছে।

গোটি সত্ত্বেও রাজেনের মুখ সলজ্জ দেখাল। সে বলল, কোন কোন সময়ে মনে একটা সমস্যা দেখা দেয়। মানুষ যখন সিগারেট আবিষ্কাব কবে নি, এবং যে দেশে মদ চলে না, তখন এবং সে দেশে পুরুষরা বেকায়দায় পড়লে কী অবলম্বন করতো এবং করতে পারে।

ভূধর বলল, আ, দর্শন! তুমি কি বলবে, সিগারেট এবং মদ, চমকানো শিশুর মায়েব স্তনকে আঁকড়ে ধরার বয়সোচিত পরিবর্ত?

ভূধরকে ক্ল্যারেটের বোতল খুলতে দেখে ভূদেব পায়চারি থামিয়ে ফিবে এল। ভূধবেব মুখোমুখি বসে তাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, অন্যলোক কী বলবে তার অপেক্ষা না করেই সে বলতে পারে সময়ের উপযুক্ত মদ বাছাইয়ের ব্যাপারে ভূধরের ট্যালেন্ট সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল। কিছুক্ষণ ক্ল্যারেট চলার পর ভূদেব রিঙ্কোতে ডিনাবেব প্রস্তাব উত্থাপন করল। প্রথমে ভূধর এবং পবে রাজেন রাজী হওয়াতে টেলিফোনে রিঙ্কোকে ডেকে দোতলার ব্যালকনিতে ডিনারের কথা বলে দিল ভূদেব। কারণ রিঙ্কো ভূদেব এবং ভূধব দুজনেরই ক্লাব, এবং যেহেতু (বাজেনের মুখ চেয়ে) রিঙ্কোর ব্যালকনি ডিনারে পোশাক পরতে হয় না। কিন্তু রাজেন কাজেব জন্য এসেছিল। সুতরাং সে বিষয়টা এখন উত্থাপিত হল সহজেই। ভূধর উপস্থিত থাকাতে কোন অসুবিধা হল না।

একটু আনুপূর্বিক বলা দবকার।

সিণ্ডিকেট লক্ষ্য করেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও আজকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিন্তার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ব্যবসাব খাতিরে এই ঝোঁকটাকে কাজে লাগানো চাই। যারা সুযোগ খুঁজে নিতে চায় তারা সুযোগ পেয়েও থাকে। কিছুদিন আগে রাজেন সিণ্ডিকেটের অফিসে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল, রূপদর্শন এবং আমরা এই রকম ধরনের একটা বিষয়ে। গত মঙ্গলবারের কাগজে সেটা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ হওয়ার পরেই প্রবন্ধর কাটিং বিলের কাগজপত্রর সঙ্গে ভূদেবের টেবলে গিয়েছিল। নামটা নতুন দেখে প্রবন্ধর প্রথম দিকটা পড়েছিল ভূদেব। তখন তার মনে হয় ব্যবসার দিকে এরকম প্রবন্ধ কাজে লাগতে পারে। তারপরই খোঁজখবর নিয়ে ভূদেব রাজেনেব সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

এই জায়গায় রাজেনের প্রবন্ধটার একটা সংক্ষিপ্তসার দিলে রাজেনকে অর্থাৎ তার স্টাইলকে বুঝতে সাহায্য করবে না, কিন্তু তার ভঙ্গিটাকে কিছুটা ধরা যাবে। প্রথমেই সে বলেছে, অজন্তার চিত্রে কিম্বা কোণারকের ভাস্কর্যে নারীর রূপের যে আদর্শ ছিল এখন তা নেই। নিতম্বের পৃথুলতা, বক্ষের নিটোল আতিশয্য, মুখের লাবণ্যমণ্ডিত পর্ণপত্রের পূর্ণতা এখন আর আদর্শ বলে মানা হয় না। লম্বাটে পায়ের ওপরে মাঝারি মাপের নিতম্ব, ছোট ম্রিয়মান বুক, বরং ডিমের মতো গড়নের মুখ, চোখের কোণে ক্লান্তির কালি, মোটামুটি এগুলোকেই বর্তমানে নারীর রূপের মূল আদর্শ বলা যেতে পারে।

এর পরে সে লিখেছিল, আদর্শটা বদলানোর কারণ মানুষের বাস্তববোধ। বাস্তবে অজন্তার চিত্রে

উৎকীর্ণ রমণীকে পাওয়া যায় না। এখন প্রকৃতির বর্ণনায় কোন সাহিত্যিক মহান পর্বতমালা, বিশাল অরণ্য, বিরাট সমুদ্রকে নিয়ে টানাটানি করে না। সূর্যোদয়ের বর্ণনায় কালোর বুকে অরুণ রঙের প্রভার কথা না বলে মিলের চিমনির প্রথম ধোঁয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। কালোরঙে ডুবানো ব্রাশের মতো বাতাসের আঁকা ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশের গায়ে চলতে থাকে। এখন গ্রোটেস্ক বা কিম্ভূতই আমাদের মনে ধরে, কিন্তু সেই কিম্ভূতত্বে কিছুটা ক্লান্তির ভাব থাকতে হবে। লাবণ্য আর প্রফুল্লতা বরং এই বিশেষ ধরনের গ্রোটেস্কের বিরুদ্ধে। নিটোল ক্ষণে একখানি করপল্লব তারই হতে পারে যে সংসার সম্বন্ধে শিশুর মতো চিন্তা করে। আমাদের এই বর্তমানে যার মন শৈশব-সাবল্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ, সে ছাড়া আর সবাই কিছু না কিছু হতাশা অনুভব করছে। তার পক্ষে হাত দুখানা কিছুটা শির বার করা হওয়াই মানানসই হবে। অনেক কিছুর মুখোস খুলে গিয়েছে বলে মুখোসের তলায় আমরা কতটা ক্লান্ত তা ধরা পড়ছে।

আর কখনই মানুষ এমন প্রত্যক্ষভাবে ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার চেষ্টা করে নি, এখন যেমন করছে। যেহেতু ইন্টেলেকচুয়াল হওয়া বয়স আর অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ, সাহিত্যে বয়ঃসন্ধিকালের নায়িকা অনেকদিন আগেই লোপ পেয়েছে। এখনকার সমাজেও উদ্ভিন্নযৌবনা অষ্টাদশীরা প্রেমপাত্রী হিসাবে মূল্যবান নয়, ছাব্বিশ বরং, এমন কি অভিজ্ঞতার ছাপযুক্ত ত্রিশের দিকে ঝোঁক। এখন আমরা টিনে রাখা ফল পছন্দ করি তা নির্বীজ হলেও।

ভূদেব বলল, আ, ধন্যবাদ ভূধর। শোন রাজেন, আমাদের বন্ধু ভূধর বলছিলেন, এ বছরটাকে যে বছর মৃত্যুভয় দেখা দিল, বলা যায়। এ বিষয়ে কি ফিচার লেখা চলে রাজেন?

রাজেন বলল, তাই কি?

কিন্তু ভূধর হাতঘড়ি দেখল।

বলল, সে আর একসময়ে, কী বলো সমাদ্দার? এখন বরং প্রস্তুত হতে হয়। রাজেনবাবুর স্বাস্থ্য ভালো। আর্লি ডিনারের অভ্যাস আছে। এবং বিশেষ করে যখন তুমি হোস্ট। এখন বরং পোশাক পালটে নাও।

ভূদেব বলল, ঠিক বলেছো, .ট প্রেমেনপ্রস্তাব। ঠিক তাই রাজেন, ঠিক তাই। যদি তা বলো আমরা পথে বেরিয়ে এমনকি আমাদের ব্যালকনির ডিনারে আলাপ করতে পারবো। তোমার লেখা এখনও হবি। সেজন্যেই আবার বলছি তুমি চেষ্টা করে দেখো যে বছর মৃত্যুভয়ে ভীত—এই বিষয়ে ফিচার লেখা যায় কিনা। পাঁচ মোহর রইল পার ফিচার। পরে রেট বাড়বে, কী বলো? আচ্ছা আমি পোশাক পালটে নি।

রাজেন বলল, আপনি আমার পক্ষে অত্যন্ত দ্রুতচিন্তায় অভ্যস্ত। দেখা যাক কী হয়। আপনি তৈরি হতে হতে বরং আমি এই ব্লকেই একজনের সঙ্গে দেখা করে আসি। দশ মিনিটেই আসবো।

অবশ্য, বলে ভূদেব নিজেও পোশাক পাল্টাতে গেল।

রাজেন অবশ্য সিনেমা-অভিনেত্রী মাধবী ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। তাকে বলেছিল রাজেন এ পাড়া থেকে যাবার আগে জানিয়ে যাবে। ফিচার লেখার কথা মনে এল রাজেনের, যে বছর মৃত্যুভয় দেখা দিল! কী নাম! অবশ্য বোধ হয় হালকা সুরের হবে। আগেকার ফিচারটার কথা মনে পড়ল। সে রকম সুরেই হতে হবে।

লিফট দোতলায় লাগতেই হঠাৎ মনে হল রাজেনের। আশ্চর্য! আশ্চর্য! ফিচারে যাকে রূপের মান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে সে, তার মধ্যে, সেই রসিকতার আড়ালে আকর্ষণীয় রূপ সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাই সে প্রকাশ করে ফেলেছে, আরও আশ্চর্য যে তার সঙ্গে মাধবী ঘোষালের রূপের মিল আছে। তাহলে মাধবী ঘোষালের সিনেমাটা দেখেই কি ফিচারটার ঝোঁক এসেছিল তার মাথায়! তাহলে সে তো মাধবীর রূপের প্রচ্ছন্ন প্রশস্তি। নিজের এই আবিষ্কারে সে অবাক

হয়ে গেল। তার মনে পড়ল আজ সারাদিনে মাধবীকে কীরকম দেখিয়েছিল। ভাবি সুন্দর না? খুবই সুন্দর। কিন্তু এটাই আশ্চর্য নয় কি যে সে নিজের অজ্ঞাতসারে মাধবীর রূপের বৈশিষ্ট্যকে নারীর রূপের আদর্শ হিসাবে দেখাতে চেয়েছে।

পোশাক পরতে পরতে ভূদেব বলল, আচ্ছা ভূধর, উইলটা খুব খারাপ কিছু নয়, তাই নয়? মানে ক্ল্যাসিক সাহিত্যেও তার উল্লেখ আছে, যেমন ধরো বিষবৃক্ষে। ভূধরের লজ্জা তার মুখেও প্রকাশ পেল। এই রকমই সাধারণত হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি কোন উপগ্রহের সাহায্যে কত তারিখে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক কটায় প্রথম স্পেস্ টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ স্থাপন করা গিয়েছিল তা বলেছে, এখন সেই বিষবৃক্ষে উইল খোঁজ করছে।

ভূধর বলল, থাক ভূদেব, থাক। মৃতদের শান্তিতে থাকতে দাও। এই বলে সে হাসল।

ভূদেব বলল, আদৌ নয়, তুমিই কি তা দিচ্ছো বন্ধু? তুমি আজ উইলের জটিল ভগ্নাংশ ভাবতে ভাবতে ঘরে এসেছ। এবং মৃত্যুর কথা উঠেছে তোমার মনে। আমার আন্দাজ কি খুব বিপথগামী হবে যদি তোমার তদন্ত অনুসন্ধানগুলোর মধ্যে একটা খুব বড় রকমের উইল এবং ডেথ-ডিউটির কেস এসে থাকে?

ভূধর বলল, তা তোমাকে বলতে পারি। ঠিক অনুসন্ধান নয়। কিছুদিন আগে চোখে পড়েছিল বটে ডেথ ডিউটির অঙ্কটা। তবে ওটাকে ফাঁকি না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ শুরু হয় না তা তো জানোই। এঘরে ঢুকেই বরং ব্যাপারটা মনে পড়ল, তোমার ঘরের আসবাবে সুরাকসিনের ছড়াছড়ি দেখে।

চমৎকার। সৌরভ পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিও না যেন। টাকার অঙ্কটা বেশ বড় কিছু হবে। সুরঞ্জিত তলাপাত্রের কথাই বলছো নিশ্চয়? তার উইল। আর কী? তা সুরাকসিন যত টাকা বৈদেশিক অর্থ অর্জন করে তার একটা অংশ সে রয়্যালটি হিসাবে পেতো। শতকরা এক টাকা হলেও সেটা মাঝারি বড় একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির লাভের অঙ্কর চাইতে কম নয়। আর একটু বলো।

সুরাকসিনকে সিনথেটিক লেদার বলা হয়, কেমন কি না?

তা হয়।

অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত মরা চামড়া।

বাচ্যার্থ তাই। কিন্তু উইলের কথা কী বলেছিলে না?

ভূধর বোধ হয় চিন্তা করে নিল কতটা বলা যায়। বলল, আচ্ছা কতদিন হলো সুরঞ্জিতের মৃত্যু হয়েছে বলতে পারো?

ভূদেব বলল, এক মিনিট। সে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতেই তার ব্যুরোড্রয়ার্স খুলতে অগ্রসর হল।

ভূধর হেসে বলল, তোমার মতো একজন সাংবাদিকের ব্যুরোড্রয়ার্সে সুরঞ্জিতের ইনডেকস কার্ড থাকবে, তাতে তার তারিখ, সংক্ষিপ্ত জীবনী, তার সম্বন্ধে কোন পত্রিকা বা পুস্তকে কবে কী আলোচনা হয়েছিল, তা সবই লেখা থাকার কথা। কিন্তু অতটা দরকার নেই। মোটামুটি বছর দু'এক হল কী বলো?

তা হল। দু বছরের দু একমাস বেশি হবে। এটা সেপ্টেম্বর, তা দু বছর তিন মাস চলছে বলতে পারো। ভূদেব কড়ে গুণে নিল।

তুমি নিজেই একটা জীবন্ত ইনডেকস। তার সম্পত্তির একটা হিসাব নেয়া হয়েছে। ডেথ ডিউটি কত হতে পারে তার প্রাথমিক অঙ্ক কষা হয়েছে। কিন্তু উইলের প্রবেট নিয়ে কেউ সামনে আসছে না।

বলো কী? ভূদেব বেশ উত্তেজিত হয়েছে বোঝা গেল। খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিম্বা তুমিই তো

খোঁজ নেবে। যদি সংবাদটা আমার কাজে লাগার মতো মনে করো, অথবা তুমি আর বাছাই করার কষ্ট করো না। যা কিছু পাবে 'র' পাঠিয়ে দিও। তুমি কত চাও বলো?

ভূধর হাসল। দুআঙুল ক্ল্যারেট ঢেলে নিল। বলল, এখন এ বিষয়ে আমার কোন কর্তব্য নেই, ডেথ ডিউটি ফাঁকি দিলে আমার কাজ শুরু হবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বো বাঁধল ভূদেব নিখুঁত করে।

বলল, তাও বটে। ক্ষুধাও পাচ্ছে। টাকার অঙ্ক নাই বললে, একস্‌চেঞ্জ ইনফরমেশন হিসাবেও হতে পারে। এই যে রাজেনও এসে গেছে।

রাজেনের যতটা সময় লাগার কথা তার চাইতেও কম সময়ে সে ফিরে এল। মাধবীর ফ্ল্যাটের ঘণ্টার সুইচ টিপতেই হাউসকিপার সুরঙ্গমা সাড়া দিয়েছিল। দরজা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু মাধবী নিজে ছিল না। সুরঙ্গমা বলেছে, মাধবী মার্কোস স্কোয়ারে গিয়েছে, বলে গিয়েছে রাজেনবাবু এলে এ খবরটা যেন তাকে দেয়া হয়।

ভূধর বলল, তা হলে আমরা এখন বেরুতে পারি।

রিঙ্কো ক্লাবটার বয়স ত্রিশ বছর হল। ক্লাবের অনেক সদস্য আছে যারা আশা করে ক্লাবটা তিনশো বছর বাঁচবে। আর এই সময়ের মধ্যে কোন কোন সদস্য নিজের স্মৃতিকথা লিখবে তাতে ক্লাবের আনন্দিত উল্লেখ থাকবে, এবং সেই স্মৃতিকথা থেকে সমাজের যুগপরিবর্তনের ধরন-ধারনগুলোকে বুঝতে পারা যাবে, যেহেতু সদস্যদের অনেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি।

একটা আটতলা ব্লকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলা অধিকার করে ক্লাব। সদস্যদের একটা গণনীয় সংখ্যা ক্লাবে লাঞ্চ করতে আসে। ক্লাব-ডের কথা বাদ দিলে ডিনারের সংখ্যা তার চাইতে কম নয়। ক্লাব-ডে ডিনারে অবশ্যই তিলধারণের স্থান থাকবে না। সুতরাং দোতলার বড় হলঘরটায় ঢুকে পড়লে একটা বিশিষ্ট হোটেলের কথা মনে হবে। হয়তো ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডটা একটু নতুন রকম সাজানো। ক্লাবের নিয়ম অনুসারে দরজায় প্রাইভেট লেখা থাকা সত্ত্বেও ক্লাব-সেক্রেটারিয়েটের অনুমতিসাপেক্ষ অসদস্যরাও এখানে অর্থাৎ এই বড় হলে আসন খালি থাকলে লাঞ্চ এবং ডিনার করতে পারে। কিন্তু হলের এদিকে ওদিকে যে ছোট হল আছে সেখানে অথবা ব্যালকনিগুলিতে ডিনারের অধিকার ক্লাব-সদস্য ছাড়া আর কারো নেই। তেতলা পুরোপুরি প্রাইভেট। সেখানে সদস্যরাই যেতে পারে, তাদের অতিথিরাও যেতে পারে না। নীরবতা অথবা নিঃসঙ্গতা অনুভব করার জন্যে অথবা ধ্যান করার জন্যে (তা রাজনৈতিক অথবা সমাজতাত্ত্বিকও হতে পারে) কোন কোন সদস্য কখনও কখনও তেতলার কোন ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এমন একজন সদস্য এখনই আছে যে গত ছ সপ্তাহ থেকে নিজের মহার্ঘ্য ফ্ল্যাট ছেড়ে তেতলার ইজিচেয়ারে কাটাচ্ছে।

ক্লাবের আহারাদির ব্যবস্থা ভালো। কিন্তু আমাদের পূর্বকথিত সঙ্কল্প অনুসারে ডিনারের কাঁটা-চামচ ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলবো না।

যেহেতু তিনজনের ডিনার, সেক্রেটারির অফিস একটা গোলটেবিলের ব্যবস্থা করেছিল। ওয়েটার আসতেই ভূদেব বলল, হুক, এই পানীয় দিয়েই শুরু হল। ডিনারের বসার ভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। ভূদেবের গলার ন্যাপকিন বেঁধে বসার ভঙ্গি থেকে তাকে বহুভোজী মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা বিপরীত। আহার করার চাইতে আহার সম্বন্ধে গল্প করাটাকেই সে ডিনার মনে করে। ভূধর ন্যাপকিন কোলের ওপরে বিছিয়ে বসেছিল। লক্ষ্য করা গেল ঝাঁজালো স্বাদের আহার্যে তার আকর্ষণ কম। রাজেন তার বয়সের ধর্ম অনুসারে যে-কোন ধরনের ডিনারের সদ্ব্যবহার করতে পারে। আলাপটা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে খবরের কাগজের সংবাদে পৌঁছল। মন্ত্রী-মহোদয়ের মধুচক্র সম্বন্ধে সংবাদটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

এই আলাপের একসময়ে ভূধর বলল, কেন যে আজকালকার দিনে এরকম সংবাদকে সংবাদ মনে হয় কারো কারো, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। আমি তো বলেছি ও আর স্ক্যাণ্ডাল নয়।

তাই নাকি? ভূদেব বলল।

তাই নয়? এটা কি যথেষ্ট কেলেঙ্কারি? মন্ত্রীমহোদয়কে একটা মানুষই মনে করতে হবে তো? বলো। কম বয়স হলে বলতাম বয় মিটস্ এ গার্ল। একে কী বলবো? শেক্সপীয়ারের ভাষায় বুড়ো লম্পটের কামনা অন্ধকারে জোনাকির মতো? কিম্বা বলবো পিঁজরাপোলের বুড়ো ঘোড়া ছ্যাকড়া-টানা ঘুড়িটাকে দেখতে পেয়েছে, শেষেরটির বয়স কিছু কম এই যা?

ভূদেব হাসল। হেসে বলল, তাহলে ওটাকে এখন আলাপের বাইরে রাখো। দেখা যাক।

ডিনারের মাঝামাঝি একটা মৃদু কৌতুকের ব্যাপার হল। বক্তৃতার ঢঙে কেউ কথা বলছে এমন শুনতে পাওয়া গেল। ব্যালকনিগুলো এমনভাবে সাজানো যে অনায়াসেই হলের ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডটা চোখে পড়ে পর্দা সরালে। বড় টেলিভিসন পর্দায় আমাদের পূর্ব পরিচিত সংস্কৃতি-সেমিনারের বক্তৃতা দেখানো হচ্ছে।

ভূধর বিব্রত বোধ করে বলল, খাবার সময়ে এ সব ঝঞ্ঝাট মনে এলে তা হজমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

এটা বোধহয় টেলিভিশনের সংবাদ-পবিক্রমা জাতীয় ব্যাপার। সারা দিনের মূল্যবান ব্যাপারগুলোকে কেটে কেটে দেখানো হচ্ছে। একটি বছর ত্রিশ বয়সের সুন্দরীব মুখ ফুটল পর্দায। ও, আচ্ছা, এ দেখছি আমাদের পূর্বপরিচিত মিত্রাই। বক্তৃতা দিচ্ছে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তেই টেলিভিশনেব পর্দায় ভূধরকেই দেখা গেল বক্তৃতা দিতে। ভূধর সলজ্জভাবে বলল, এতে আর কিছু না হোক নিজের বক্তৃতার ভঙ্গিগুলোর ত্রুটি নিজের চোখে ধরা পড়ে।

রাজেন ভূধরকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, এতে, মানে এই টেলিভিশনে, রেডিওতে যা হয়েছিল তার চাইতেও পড়ার অভ্যাস কমে গেলেও, দু এক ক্ষেত্রে সত্য কথা শুনতে পায় লোকে। এটা ভালোই।

সে ভাবল, ভূধরবাবুর মতটাকে সে সমর্থন করতে পারে।

সে আবার বলল, এখন সব চাইতে আলোচিত বিষয়ই সংস্কৃতি।

ভূদেব বলল, কিন্তু ভূধর, তুমি কি বলতে চাও বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বলতে কিছু কল্পনা করা কষ্ট-কল্পনা?

ভূধর আর একবার মনে করিয়ে দিল কবে কোন এক বৃদ্ধা মহিলা তাদের দুজনকে গোরা-বিনয়ের অপবাদ দিয়েছিল। বলল, ক্লাবের রান্না সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার।

পর্দা টেনে দিয়ে তারা আহারে মন দিল।

ভূদেব তার পুরনো কথায় ফিরে এসে বলল, থাই অব দি নিম্ফ অ্যাট ডন শুনতে যাই মনে হোক, বুঝলে রাজেন, তা কিন্তু ক্রিম এবং শ্যাম্পেন সহযোগে পরিবেশন করা ব্যাঙের ঠ্যাং। ভূধব বলল, সেই উষায় দেখা বনবালার উরুদেশ খেতে কী রকম? কিন্তু প্রিয় পাঠিকা, নিতান্ত সময়ের অভাবে মুখরোচক অনেক আলোচনাকেই বাদ দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। যেমন নানা রকমের আহার্য সম্বন্ধে ভূদেবের আলাপ।

ডিনার শেষে তাদের সিনেমা বা পেট-নাচ দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল। অন্য অনেকে ডিনারের শেষে সিনেমা এবং পেট-নাচ দেখার পব নিজেবাও কোথাও নাচে কোন নাইটক্লাবে। কারণ রাত আটটায় ডিনার শেষ করে রাত তিনটেতে ফ্ল্যাটে ফেবাব মধ্যে অনেকটা আলগা সময় হাতে থাকে।

ডিনার শেষে প্রায় এক ঘন্টা পরে ভূদেব প্রভৃতি ক্লাবের নিচে ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। আকাশের

যেটুকু চোখে পড়ল তার রঙ কালো। চাঁদ উঠেছে মনে হল কিন্তু মেঘে ঢাকা। তারাগুলো অস্পষ্ট। স্মগের দৌরাত্ম্য ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। সেজন্যেই তারাগুলো অস্পষ্ট এবং কিছু দূরের নিওন টিউবগুলোকে কুয়াশা ঢাকা মনে হচ্ছে।

তারা ট্যাক্সির খোঁজেই দাঁড়িয়েছে। এটা একটা প্রয়োজনীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিজের গাড়িতে ডিনারের জন্যে যত লোক বার হয় ঠিক তত লোকই ট্যাক্সিকে পছন্দ করে। কারণ নিজের গাড়ি পার্ক করার দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ঘটনা যা বাইরের সময়ের অধিকাংশকে গিলে ফেলতে পারে, ট্যাক্সি নিয়ে তা সব এড়ানো যায়।

কিন্তু সিনেমা, নাইটক্লাব, অথবা হিপোড্রোমে সেই বিবস্ত্র পেট-নাচ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা তারা কাজে লাগাল না। দেখা গেল রাত্রিতেই ভূধর কোথাও অনুসন্ধানে যাবে। সে ভূদেবকে নিমন্ত্রণ করল না বটে কিন্তু সে যেখানে যাবে সেখানে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ থাকতে পারে এরকম ইঙ্গিত করল। এবং তা শুনে ভূদেব বলল, তার হাতে যখন কাজ নেই তখন কিছুক্ষণ সে ভূধরের সঙ্গী হতে পারে। হিপোড্রোমের বিবস্ত্র নাচ সম্বন্ধে রাজেনের মত আমরা আন্দাজ করতে পারি। সে থিয়েটারের নটনটীকেও দেখতে চায় না তাদের সাজ শেষ হওয়ার আগে।

ট্যাক্সি আসার আগে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল।

ভূধর হঠাৎ বলল, ডিনার-আন্তিক চুরুট চিবুতে চিবুতে, আচ্ছা, ভূদেব, এই মন্ত্রীমহোদয়ের কেলেঙ্কারিটা কী বলো তো ঠিক। যদি মনে থাকে, এই তৃতীয়বার বলে ফেললাম।

সে তো কাগজেই দেখেছো।

ঠিক তা নয়, তবে, মানে—ভূধর ভাবল আসলে মন্ত্রীমহোদয় কিছু নয়। দেখতে হবে গভর্নরই এই স্ক্যাণ্ডালের আসল উদ্দেশ্য কি না।

ভূদেব এবং ভূধর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিচক্ষণ কেউ তাদের লক্ষ্য করলে অনুভব করতো, তারা যেন দুজনেই দুজনাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে, প্রাথমিক চমৎকারিত্বের পর দুজনে দুজনের মুখের রেখার বৈশিষ্ট্যগুলোকে মুখস্থ করার চেষ্টা করছে। অথবা যেন ডিটেকটিভ নম্বর ... ডিটেকটিভ নম্বর খকে যাচাই করার চেষ্টা করছে।

ভূধর হাসল, আচ্ছা, কী বলো?

হাঁ দেখো, কেমন কি না? ভূদেব বলল সে নিজের মনকে অন্যদিকে নিতে চেষ্টা করল। আর তার মনে তখন টেলিভিশন পর্দায় দেখা সেই সুন্দরীর ছবিটাই দেখা দেবে মনে হল, যাকে আমরা মিত্রা বলে চিনেছি।

কিন্তু, হয়তো ভূদেব অনুভব করল, ভূধর যে মন্ত্রীমশায়ের কিম্বা মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে সংবাদের উৎস অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে হাসল। একটা ট্যাক্সি দেখে সে ইঙ্গিত করল। ট্যাক্সিটা থামতেই রাজেনকে তুলে দিল। বলল, ভূধর, তুমি তো সেমিনারে ছিলে, মহিলা বক্তা কে কে ছিলেন?

ভূধর অনুভব করল, বলা যায় না এখনই, তবে ভূদেবের সংবাদ-সিণ্ডিকেট যে এর মধ্যে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে সে বলল, এসো ভূদেব। মহিলাকে সুন্দরী বলছো। তা তোমার পক্ষে তার পরিচয় জানা কি কঠিন হবে? তবে তাঁকে প্রবীর সাণ্ডেল পৌঁছে দিয়েছিল বলতে পারি।

সে ভূদেবের মনাকল আঁটা চোখটাকে লক্ষ্য করল। আর তখনই তার মনে হল এটা কি তার মনের দীনতা যে সে ভূদেবের মতো বন্ধুকেও সন্দেহ করে? (হয়তো এই সাময়িক উদারতা সুন্দর ডিনারটার ফল) তা হলে সে কি সাইকাইআট্রিস্টের কাছে যাবে? পাঠকমশাই, বুঝতেই পারছেন এটা সম্ভব নয় ভূধরের মতো একজন অন্য কারো কাছে নিজের মন মেলে ধরে।

না, সাইকাইআট্রিস্টের কাছে মন মেলে ধবতে সে পারে না। কাবণ তার মন তো সমাজের এবং এমন কি রাষ্ট্রীয় তথ্যেব একটা ব্যাবোড্রয়ার্স যা গোপন রাখতেই হয়। কিন্তু এই ডিনারের পর তাব সাধারণ মানুষের মতো বন্ধুত্ব অনুভব কবতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভূদেবেব প্রতি একটা চাপা সতর্ক শত্রুতা নয়। ট্যাক্সিটা চলছে। সে ভাবল, ও, আচ্ছা একটা কাজ কবলে হয়। ভালো একটা ফেনসিং হলে যেতে পাবে তারা। আব মুখোস এঁটে তবোযাল নিয়ে খেলতে পারে। সে আর ভূদেব। লোকে খেলে বলেই ফেনসিং হল। বোধহয ভূদেবেব সঙ্গে একঘণ্টা ফেনসিং করলে মনটা শান্ত হয়। ভূদেবও দক্ষ ফেনসাব।

রাজেনের কথা না বললে পরিচ্ছেদটাকে শেষ করা যাচ্ছে না।

নিজেব এক কামরার ফ্ল্যাটে ফিবে সে জামা খুলল, জুতো খুলল। কিন্তু গুছিয়ে রাখবার অবসর পেল না। ফ্যান খুলে দিল। বেসিনেব কল থেকে আঁজলা কবে জল খেয়ে ট্রাউজার্সে হাত মুছল। টেবলে গিয়ে বসল। স্তূপাকার বই ঠেলতে ঠেলতে সে বিড়বিড় কবে যেন বলল, সবো সবো, তোমাদেব ছোটভাইকে একটু কাগজ পাতবাব জাযগা দাও। ঠিক লেখা নয়, নোটস নেয়া ফিচারের জন্যে। সে শর্টহ্যাণ্ডে লিখল :

সাহিত্যে আয়কব বিভাগেব কথা লেখা হয নি, অথচ আযকব দেযা উচিত এমন অনেক লোকেব কথা লেখা হয়। আমাদের একটা ধারণা আছে, সাহিত্যে টাকাব অঙ্ক লিখলে তা সাহিত্য থাকে না। অথচ টাকাব অঙ্ক সুতবাং আয়কবের কথা না বললে কি আধুনিক পুরুষ চবিত্র হয? বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ আযকব বিভাগেব নোটিশ পায নি। কৃষ্ণকান্তেব উইলেব ওপবে ডেথ ডিউটি ধার্য হয নি। নগেন্দ্রনাথ আয়কব বিভাগের মুখোমুখি হলে দুটো সংসাবেব সাহস পেতো কিনা সন্দেহ কবা যায। আর নগেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে কিছু কালোটাকা সঞ্চয় কবতে পাবলে তাব গোপন ব্যয় নিজেব স্বার্থে ব্যবহাব কবার জন্য কুন্দকে বিবাহ না কবে মিসট্রেস হিসাবে বাখতে চাইতো। আব ডেথ ডিউটির চাপ থাকলে হযতো রোহিনীকে কেউ উইল চুরিতে নিযুক্ত কবতো না।

অন্যদিকে ফাঁকি দেওযাটাকে যে আত্ম-অবমাননা মনে কবে আযকবেব ব্যাপাবে তাবও কিছুটা কম করে বলা অভ্যাস হচ্ছে। মন কোন একটা কাযদা বপ্ত কবতে পাবলে সেটা সব ক্ষেত্রেই ব্যবহাব করতে পাবে। আয়কব ফাঁকির অভ্যাস অন্যত্র কাজে লাগাতে পাবে।

এই পর্যন্ত লিখে রাজেন খিল খিল কবে হেসে উঠল।

ওদিকে দেখো, আয়কর, সুপারট্যাক্স ইত্যাদি মানুষকে উদাব কবে তুলছে। উনবিংশ শতাব্দী এমন কি বিংশ শতাব্দীরও গোড়াব দিকে উপন্যাসে পুঁজিবাদী বলতে এক শ্রেণীব শ্রমিকশোষক কৃপণকে বোঝাতো। এখনও কোন কোন সাহিত্যিক এ চিত্রটিকেই বহাল রাখছেন। কিন্তু তার কারণ তাঁরা সুপারট্যাক্স ইত্যাদিকে হিসাবের বাইরে রাখছেন। বর্তমানের এইসব টাইকুন, কর্মচারীদের বাহা খরচ, বোনাস ইত্যাদির ব্যাপারে এত উদাব যে কিছুদিনেব মধ্যে পুঁজিবাদী বলতে নাই দিয়ে মাথা খারাপ কবে এমন কাকামশায়কে বোঝাবে।

গোটি সত্ত্বেও রাজেনের মুখটা কোমল দেখাচ্ছে। তার হাসিটা প্রায় অল্প বয়সী মেয়েদের হাসির মতো কোমল।

সে লিখল, দেখো, ভালোবাসা বলতে বেশির ভাগ বিরহের মধ্যে অল্প কিছু সম্ভোগের খাদ বোঝাতো। এখন রেলওয়ে, সাবওয়ে, এরোপ্লেন এক কথায় ট্রান্সপোর্টের ফলে বিরহ কাল্পনিক ব্যাপার। ভালোবাসা বলতে এখন প্রেম করা বোঝায়। চিন্তার অভ্যাস শতকরা নব্বুইটা ক্ষেত্রে আমাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি আমাদের চরিত্রকে নির্ধারিত করছে। অনুরূপ ভাবে আয়করও হয়তো।

একদিনের পক্ষে একটিই ভালো। রাজেন উঠল, সিগারেট ধরাল। একটা বই খুলতে গেল।

কিন্তু তা না খুলে ভাবল। তার মুখটা করুণ হল। মৃত্যু এই শব্দটাই যেন তার মনে ঘুবে বেড়াল, মৃত্যু, মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ের সঙ্গে আত্মহত্যার কি সত্যি যোগ আছে কোন কোন ক্ষেত্রে? তা বটে, এ সম্বন্ধেই ফিচার লেখার কথা বলছিল সমাদ্দার। যে বছর মৃত্যুভয় দেখা দিল।

রাজেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, তুমি কি ঐন্দ্রিলা চৌধুরীর ঘটনাটা জানো? যদিও এখনও সেই আত্মহত্যার ঘটনাকে সাহিত্যে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া, সাহিত্য-মেলাঙ্কোলিয়া বলেই সকলেব ধাবণা ; কিন্তু ভূদেব সমাদ্দাবেব সিণ্ডিকেট এবকম একটা ইঙ্গিত করেছিল, অসুখী দাম্পত্যবন্ধন। আঠাবো থেকে আটত্রিশ—বাসব চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ বৎসর সাহিত্যিক-সখ্য এবং প্রকাশ্য অবিবাহিত দাম্পত্যজীবন কাটিযে (তাবা পরস্পরকে স্বামী এবং স্ত্রী বলেই পবিচয় দিতো) হঠাৎ তাবা তাদের বিবাহটাকে রেজিস্ট্রি কবতে গেল কেন, এমন কথা বলেছিল সিণ্ডিকেট। আর তার দু'বছবের মধ্যেই কী এমন সুগম্ভীব মনঃকষ্টে পীড়িত হল ঐন্দ্রিলা যে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ঐন্দ্রিলার চেহারাটা মনে পড়ল। সুগঠিত চেহারাটা ছিল তার। কিন্তু পুরুষের মতো কাটা চুল, টাই ও শু-সমেত পুরুষের পোষাক, শেষের দিকে চুরুটও থাকতো মুখে। একজন স্ত্রীলোক বিশেষ কবে যে মৃতা তার সম্বন্ধে এমন ঘনিষ্ঠ আলোচনা করা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। পনেরো বছর আগেও স্ত্রীলোকদের মধ্যে পুরুষের মতো নির্ঝঞ্ঝাট হওযার জন্য চিকিৎসিত হওযাব প্রথা ছিল। সহজ, খুবই সহজ অস্ত্রোপচার। তার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বলেই তাব গায়নোকোলজিস্ট বলে থাকবে, নতুবা বিশ বৎসর পরে অন্য কী আগ্রহে তারা তাদেব অবিবাহিত দাম্পত্য-নৈকট্যকে বিধিসম্মত করতে যাবে? আর তারপরে কি ঐন্দ্রিলা বুঝতে পাবল তাব সেটা স্থাযী বন্দোবস্ত হয়ে গিযেছে চিকিৎসকের অপটুতায়?

রাজেন অনুভব কবাব চেষ্টা করল। ঐন্দ্রিলাব সম্বন্ধে এই ধাবণা সত্য হলে তার মনোভাব কী বকম হয়েছিল তা বুঝবাব জন্যে নিজেব মনেব গভীবতম অংশে সমবেদনা নিযে পৌঁছুতে চেষ্টা কবল। কিন্তু কিছু লাভ হল না। বোধহয় বযসেব পার্থক্য এ বিষয়ে কাজ কবছে।

একটা তুলনা দেযাব চেষ্টা কবল সে। কিন্তু তাও খুঁজে পেল না। তখন সে উঠে বেসিনেব ট্যাপ খুলে জলেব ধাবায হাত পেতে মুখ নিচু করে জল খেল। এখন ঘুমোলে মন্দ হয় না।

কিন্তু তুলনাটা তাব জানলার উপরেই ছিল। টবে বসানো একটা পাতাবাহাব। সাবা বছব রঙীন পাতা দেখা দিচ্ছে, ঋতুতে ঋতুতে পাতার রং বদলায়। ফুলেব মতো পাতা। ছোট গুঁড়িটা ছেয়ে অজস্র ফুলের কুঁড়ি বার হয় কিন্তু একটু বড হলেই সেগুলো আরও রঙীন পাতা হযে ওঠে। দুএক বছব গুঁড়িটায একটা চুলেব মতো ফাটল দেখতে পাবে। সেই ফাটল ভেদ করে একটা পল্লব দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে পল্লবের সবুজ পাতাগুলোর ঘেবের মধ্যে একটা মোচা ফলে। যে আগ্রহে রঙীন পাতায় বাহার, আর যে আগ্রহে সবুজ পাতার আচ্ছাদনে মোচা দেখা দিয়ে থাকে, তারা পৃথক। কিন্তু তা দু এক বছরে একবারই মাত্র।

অবশ্য এটা আধুনিক বোটানিস্টদের কৃতিত্বের চিহ্ন, ড্রয়িংরুমে পিতলের টবে বসানো তিনফুট উঁচু, ঝুরিনামানো বামন-বট যেমন। স্বাভাবিক অবস্থায় নাকি এই পাতাবাহারের গুঁড়ি ভেদ করে যতগুলি কুঁড়ি বার হয় ততগুলোই মোচা ফলে থাকে। রাজেন বিছানায় গিয়ে বসল। ট্রাউজার্স টেনে খুলল।

ছোট দেয়াল ঘড়িটা মৃদু ধাতব শব্দ তুলে রাত একটা বাজাল। হঠাৎ আবার ইনকামট্যাক্সের কথা মনে হল রাজেনের। আর সে হেসে ফেলল।

টেলিফোনটা বেজে বেজে নিজে থেকেই থামল।

প্রবীর পোশাক খুলে ঘরের গাউন চাপাল গায়ে। সোফায় পায়ের উপরে পা তুলে বসল। পাশের

দিকে তাকাল যেন সেখানে কিছু আছে। একটু সবে বসল যেন ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

সে বরং একটু অসুবিধাতেই পড়েছে।

পায়রা কয়েকটির মতো সে ছটফট করছে মুক্তির জন্য কিন্তু তার সেই মুহূর্তটাও যেন চিরকালের জন্য সেই চটের থলের অন্ধকারে বন্দী হয়ে গেল। মানুষের হাত যে অত কালো দেখাতে পারে, তার আঙুলগুলো কালো প্যান্থারের দাঁতের মতো হিংস্র তৃপ্তিতে ঝকঝক করতে পারে, তা প্রবীর জানতো না। ছোলা-মটর বিছানো রকের উপর গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে নিমেষের মধ্যে ছোঁ দিয়ে প্রথম পায়রাটাকে ঝোলায় পুরে আবার হাতটা রকের ধারে রোদ পোয়াতে শুরু করল। ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে গলা ফুলিযে ফুলিয়ে দ্বিতীয় পায়রাটা এগিয়ে এল ছোলামটরগুলোকে দেখতে। তখনই আবার—

ছটফট করে উঠে দাঁড়াল প্রবীর। না, না, তার কিছুই করার নেই। তুমি বলবে ক্ষুধা, তুমি বলবে নিচের তলার দারিদ্র্য, তুমি বলবে উপরতলার পিজনপাই-এর যোগান? অ্যাবসার্ড। নিজেকে নীরোগ করার চেষ্টা? ওর সাইকাইয়াট্রিস্ট কি বলেছে, ওর মনের এই চাপা হিংস্রতা আছে যাকে কখনও কখনও ভেট দিলে তবে সে সুস্থ থাকবে? আর এমন কোন আইন নেই যার জোরে গাছ থেকে যারা ফুল ছেঁড়ে, কিম্বা মনুমেন্ট থেকে পায়রা সবায় তাদের এ শহর থেকে কিম্বা রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা যায়।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল প্রবীর। নিতান্ত অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তাকে। রৌদ্র-উজ্জ্বল পায়রা-চমকানো আকাশের নিচে পায়রার মনুমেন্টের গোড়ার কাছে এমন কালো নিঃশব্দ হিংস্র হাত হয়তো চিরদিনই আছে। নতুবা পৃথিবী তেমনভাবেই রোমান্টিক হতো যেমন ভুল ধারণা হচ্ছিল প্রবীরের তখন।

থিয়েটারে আজ সে যাবে না। তাহলে? সেখানে আজ সুরথ নতুন অভিনেত্রী নিয়ে পরীক্ষা করবে। আর হয়তো এ নাটকটার জন্য কোন সন্ধ্যাতেই যেতে হবে না থিয়েটারে। মাধবীকে দিয়ে যা হয়নি, নতুনটিকে দিয়ে তা হবে এমন মনে করার যুক্তি কোথায়? মাধবী সুন্দরী, আধুনিক সৌন্দর্যের মাপে তো বটেই। কিন্তু তার সৌন্দর্যই অভিনয়ের অন্তরায় হচ্ছে এ রকম একটা চিন্তা যেন আছে সুরথের চিন্তায়।

মনে হল, একটু ভাববে প্রবীর। অন্তত চিন্তার সূচনাটা হল। সৌন্দর্য অভিনয়ের অন্তরায়, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পিত পরিচ্ছন্নতাও তাই—এটা কি সেই যাদুভীতিরই আর এক চেহারা, যে যাদুর থেকে দূরে থাকার জন্য কবিতা বিরস ও কুরব, উপন্যাস অ্যান্টিনভেলে পরিণত?

কিন্তু চিন্তার দিকে যেতে চায় না প্রবীর। তার মনের অবস্থাটাকে বোঝাতে হলে বলতে হবে, সে যা অনুভব করছে তাকে একটিমাত্র বিদেশী শব্দেই প্রকাশ করা যায়। অনূঈ। সেটাই লাগসই।

অবশ্য, প্রবীর ভাবল, লোকে বলতে পারে তোমার নিজের ভাষার কোন শব্দ দিয়ে কেন প্রকাশ করতে পারছ না। উত্তরটা খুব সহজভাবে দেয়া যায়। হোটেল, ক্লাব, অটো, নানাবিধ গ্যাজেট, নানা রকমের খাবার এবং পানীয় যেমন প্রায় সব দেশেই এক হয়ে গিয়েছে এখন। সে সব যেমন গোড়ায় বিদেশ থেকে এসেছিল এই শহরে, মনের এই অবস্থাকে–যা হয়তো বিদেশ থেকে এসেছিল–বোঝাতে এখন বিদেশী শব্দটাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এবং এটাও অনূঈ-এর একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষণ যে এখন তোমার চিন্তায় যা আসবে তা ভোঁতা হতে বাধ্য, রসিকের মতো উজ্জ্বল বা সিনিকের মতো ধারালো কিছু ভাবতে পারলে তো অনূঈ কেটেই যায়।

সোফা থেকে উঠে খবরের জার্নাল রাখার টেবলটার দিকে এগিয়ে গেল প্রবীর। কেউ যত্ন করে গুছিয়ে রাখে নি কিন্তু একের পর এক রেখে দেয়ার ফলে একটা প্যাটার্ন হয়েছে বটে। জার্ণালগুলোর

মোড়ক খোলা হয়নি। আর দৈনিক কাগজগুলো, প্রবীর যেন বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল। তাহলে এই মাস দুয়েক দৈনিক কাগজগুলোকে ছোঁয় নি। অন্য সময়ে হলে হয়তো সে বলে ফেলতো, বাঃ বেশ হয়েছে তো।

কিন্তু এখন সে বরং তিনচারদিনের কাগজ টেনে নিয়ে সোফাটায় ফিরে গেল।

তা খবরের কাগজকে তুমি অবহেলা করতে পারো না, যদিও তুলনাটা লাগসই হচ্ছে না। ঘুমের পরে হাত-পা টানটোন করে, হাই তুলে না নিলে যেমন নিজেকে জেগেছি বলে মনে হয় না, খবরের কাগজ পড়াও তেমন ব্যাপার। খবরের কাগজে ছাপানো সংবাদ, টিকাটিপ্পনি, বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত কলমের ব্যাপারগুলো ঘুমে মিইয়ে যাওয়া মনকে রোজ সকালে তাজা করে তোলে। কিম্বা বোধহয় তারযন্ত্রের তুলনাই ভালো। যত ভালোই হোক যন্ত্রটি, তাকে বেঁধে না নিলে কি সুখ লাগে? খবরের কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে মনকে বেঁধে সমাজে পা বাড়ায় নাগরিক।

কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত। ভারতীয় লুনা কর্তৃক চন্দ্রস্পর্শ। রোহিনী নাকি নাম। আচ্ছা, ও, আচ্ছা। মন্ত্রীমহোদয়ের, ছি-ছি, স্ত্রীলোকঘটিত..(এরা কি কিছুতেই বুঝবে না ওটা অপ্রাপ্তবয়স্কতার চিহ্ন?)...সাংস্কৃতিক সেমিনার। প্রবীর চুরুট ধরাল। সেমিনারের সংবাদটা আদ্যোপান্ত পড়ে, মন্ত্রীমহোদয়ের স্ত্রীলোকঘটিত সংবাদটার পাশ দিয়ে চলতে চলতে সে ভাবল, এতে আবার রাজনৈতিক টানাটানির ব্যাপার আছে নাকি? তারপর মহাশূন্যযানের চন্দ্রাঘাতের খবরে গিয়ে পৌঁছাল। যাই বলো, উঁচু ট্রাপিজের উপরে যখন খেলা দেখায় তখন তাকে ভালো না লেগে উপায় নেই। বেশ কিছুদিন আগে এ অঞ্চলে সেই বোধহয় সর্বপ্রথম বলে ফেলেছিল, এইসব উপগ্রহ হিটলারি রকেটের গায়েগতরে বাড়া উত্তরপুরুষ। উদ্দেশ্যও কি বদলেছে? তা সত্ত্বেও চন্দ্রাঘাত সাধারণ ব্যাপার নয়। প্রকাশিত বিবরণটুকু পড়ল সে।

কিন্তু অনুষ্টুব স্বভাবধর্ম এই, মন চিন্তার খোজে শিকড় ছড়ায় না, যদিও অবশ্যই এ সব সংবাদ সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে অসাধারণ উত্তেজনা সঞ্চার করছে। অনুষ্টুব আনাটমি যেন দেখতে পারে এমন অনুভব করল প্রবীর। এ অবস্থায় একা এক টেবলে বাজে মদের তলানিসমেত একটা গ্লাস সম্মুখে নিয়ে বসে, দু'তিন রাতে পরিসর শূন্যে ভোঁতা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে গোঁফ চোমরানো যায়, আর কিছু নয়। অথচ ট্র্যাফিক আইল্যান্ডের গুলমোরের স্তবকগুলোর কথা ভাবো, কিম্বা অর্ধেক সাজানো গ্যালারির সেই ছবিটিকে। হ্যাঁ, অবশ্যই, ছবিটা। ছবিটা কি সে নিজস্ব করতে পারবে? প্রবীরের নির্গতরক্ত মনে যেন আবার রক্তসঞ্চার হবে এরকম মনে হল।

প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। সে আবার খবরের কাগজে চোখ নামাল! এখন আবার সেই উদ্দেশ্যহীন দৈনিকতাই, তারই তরঙ্গের উপরে ভেসে থাকা। প্রতিটি অতীত দিন বাসি খবরের কাগজের মতো অর্থহীন, অথচ প্রতিটি আজ টাটকা ভাঁজ করা মৃদু সুগন্ধযুক্ত। আর তা ছাড়া প্রত্যেকের উদ্দেশ্যহীনতা অন্যের উদ্দেশ্যহীনতা থেকে পৃথক।

কিন্তু এটা প্রবীরের ভুল ধারণা, কিম্বা তার তৎকালীন মেজাজের নির্দেশক যে সে সবটা দেখতে পাচ্ছিল না যেন। এই উদ্দেশ্যহীন দিনমাত্রিক জীবনের লক্ষণই এই যে তুমি একা থাকতে পারবে না। একা থাকতে পারলে জীবনটাকে এক রকমের রোমান্টিক সন্ন্যাসে ভরে তোলা যেতো। তরঙ্গের উপরে ভাসমান বস্তুগুলি যেমন পুঞ্জীভূত হতে থাকে এখানেও তেমনি সংযোগহীনরা যূথবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রাখে।

টেলিফোনটা আবার বাজল। প্রবীর উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল।

কী আশ্চর্য, বেলাই নাকি?

হ্যাঁ। কখন ফিরলে? কটা বাজে বলো তো?

হাতঘড়ি দেখলে প্রবীর। বেলা তিরস্কার করলে এরকম দেখা তার অভ্যাসটা বটে।

দেখো, ঠিক—প্রবীর খুব সতর্ক ভাবে এগুল।

সেটা আর নতুন কথা কী? কিন্তু মিত্রা তো নতুন, অন্তত অনেকদিন পরে আবার এসেছে এদিকে, তার বেলাতে? সে ইতিমধ্যে একবাব টেলিফোনে খবর নিয়েছিল তোমার।

যদি কিছু মনে না করো, বেলা, একটু বুঝিয়ে বলো।

আ, প্রবীর, তোমার টেবলেব উপরে যেখানে এনগেজমেন্ট ক্যালেণ্ডার তার কাছে কার্ডস্ট্যাণ্ডে কি মিত্রাব কার্ডটা দেখতে পাচ্ছ না?

ধরো। দেখি।

তোমাকে আর কষ্ট করে দেখতে হবে না, প্রবীর। আটটায় ডিনার। আর এখন সাতটা বাজে।

মানে?

তোমাকে একটু আগেই যেতে হবে। আমি আসছি বরং, পনের মিনিটের মধ্যে তোমার ব্লকে পৌঁছে যাচ্ছি।

মাউথপিসটা হাতে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর। তার আগেই বেলা সংযোগ কেটে দিয়েছে।

মিত্রা? ও হ্যাঁ, মিত্রা। আজই এক সঙ্গে লাঞ্চ হযেছে। আব সেমিনাবেব দবজায়, আসছেন তো আজ, এমন কিছু বলেছিল। অদ্ভুত, না? পরশুদিন একজন লিভারিপরা আর্দালি এসেছিল বটে কার্ড নিয়ে। আর তাকে দেখে প্রবীরের ধাবণা হয়েছিল হয়তো কোন কলেজের কিম্বা কোন স্কুলমিশনেব কোন উৎসব হবে। প্রবীর তখন শার্টটা বদলেছে, বেলা ঢুকে বলল, এ কী?

ওয়াড্রোবের দরজা হাট কবা। বেলা কথা না বলে এগিয়ে গেল। তার যেন স্থির করাই ছিল। সিপিয়া রঙের কোটটাকে বার করে আনল। নিজেই খুলে ধরল প্রবীরের হাত গলানোব জন্যে।

বসো, বসো, সুবথ যাচ্ছে?

সে তো আজ আবার পরীক্ষা করছে নতুন অভিনেত্রী নিযে।

তা হলে আমার পক্ষে এটা স্বার্থপবতা হচ্ছে না?

না, হ্যাঁ, তা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পুরুষকে তা হতে হয়।

কোট পরে প্রবীর সোফায বসল জুতোর ফিতে বাঁধতে।

ডিনারে আব কাবা আসছে? সাহস দেখিয়ে প্রবীর বলল।

বেলা একটা হাত-আয়না আর ব্রাশ উদ্ধার কবে এনে সামনে দাঁড়াল।

অধ্যাপক স্নুডার, শোভন সামন্ত, পীযূষ ডাইবেক্টর—সুরথ যাবে না—তুমি যাচ্ছ, অল লায়নস বলতে পাবো।

প্রবীরের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হল। বেলাব হাত থেকে আয়না নিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রবীর।

শোভন সামন্ত মানে যে হৃৎপিণ্ড না মস্তিষ্ক কীসে ছুরি চালায?

হ্যাঁ। সেই। প্রবীর তুমি কিন্তু সেখানে এরকম—

কখনই না। কিন্তু তোমার সেই পীযূষও তো লায়ন!

অসম্ভব নয়। কী অন্যায় হবে মিত্রা যদি তাকে নিমন্ত্রণ করে থাকে? সিনেমা প্রযোজক হিসাবে তাকে লায়নই মনে করা হয়, যতই তুমি পাগ্ বলো।

গাড়িতে বসে বেলা বলল, এদেশে মিত্রা ধরতে গেলে এই প্রথম ডিনার দিচ্ছে। আর তোমার মনের মতো হবে। ককটেইলের বদলে বেদানা, আনারস আর কমলার শরবৎ। নিরামিষ ডিনার। ওয়াইন হিসাবে পোর্ট থাকবে।

প্রবীর ভাবল এটাই উদ্দেশ্যহীন দৈনিক পৃথিবী। দুটি নারীর সান্নিধ্যে ভাসমান থাকার সুযোগ দেখা দিয়েছে এখন।

কথা বলার জন্যই সে বলল, এটা কি খানিকটা উন্নাসিকতা হল না এই নিরামিষ ডিনার? আর

পাগও যদি যায়—

বেলা আশা করছিল প্রবীর কথা বলবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বলল, কী, থেমে গেলে যে? ডিনারে পৌঁছনো পর্যন্ত পীযূষ সম্বন্ধে তোমার যা যা বলার আছে বলতে পাবো।

প্রবীর বলল, তা নয়, আমি মিত্রার কথাই ভাবছি। এই তো এক সঙ্গে লাঞ্চ হল। অদ্ভুত না?

বেলা বলল, আদৌ নয়। লাঞ্চে তোমাদের আকস্মিক দেখা এবং আলাপ হয়ে গিয়েছে। আর এখন তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তাকে তুমি আগেই চিনতে।

এখন মনে পড়ছে, মানে লাঞ্চের সময়েই এরকম মনে হচ্ছিল, তোমার সঙ্গে এয়ারফিল্ডে গিয়েছিলাম। মিত্রা যেদিন এসেছে।

বেলা একটু হেসে বলল, আরও আগে। তখন তুমি ভারতীয় ডেভিস কাপ টীমেব একজন হবে কিম্বা যামিনী রায়কে গুরু মেনে ছবি আঁকবে, সেটা স্থির করতে পারছিলে না। আর হবি ছিল পামিষ্ট্রি, আর সে হবি তোমাকে লেডিকিলাব হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছিল।

প্রবীব বলল, দশ পনেবো বছর আগে কি না তাই বলো। তোমার মামী সেই হোয়াইট বাশান মহিলা শাশা, শাশাঙ্কা, আর মিত্রা, মানে তুমি তো তার ননদিনী।

বেলা বলল, এবার তুমি ঠিক চিনতে পেরেছো। বাকিটুকু বলি, মিত্রা এখন বাগীশ্বরী বক্তৃতা দিচ্ছে এই শহবেব পুরনো বিশ্ববিদ্যালযে। বিষয় অবশ্যই জীবনে সংস্কৃতিব স্থান।

দাঁড়াও, দাঁডাও, এই মিত্রাই কি সোয়ান-প্রিন্স ব্যালেব সেই নর্তকী?

বেলা হাসল, তাও যা হোক মনে পড়ল।

প্রবীর বলল, আব সেই মামী? মিসেস তলাপাত্র নয়?

তিনি সপ্তাহ খানেক হল এসেছেন। আবাব বেরুবেন ট্যুরে।

গাড়ি চালাচ্ছিল বেলা। সে একটু সাবধানী। পথের দিকেই ববং মনোযোগ তার। প্রায় দুমিনিট পরে বলল সে, তুমি পার্টিতেও এমন চুপ করে থাকবে না কি!

প্রবীর বলল, যেমন এ অবস্থায় অস্ফুটস্বরে ম্‌ম্‌ করা হয়, তা বৈ কি সে আব কি। আব তারপব হাসল। আঠারো থেকে প্লিশ এই প্রায় দুই যুগ সে অনেক ডিনাবে অনেক ধরনের সঙ্গ লাভ করেছে। ভাবল সে, অর্থাৎ মসৃণ নাগরিক ভদ্রতার পক্ষে যা স্বাভাবিক তেমন কথা এবং হাসি। তার বেশি? শূন্য টিকেট টানা।

নিউ আলিপুরে তলাপাত্র ম্যানশনে গাড়ি থামল বেলার। সেই কলোনিয়াল ম্যানশনের হাতায় গাড়িগুলোকে দেখে বোঝা গেল অতিথিবা অনেকেই এসে গিয়েছে, প্রবীর ও বেলাই বরং দেরি করেছে।

কিন্তু আর একটু দেরি করি আমরাও। সেই সুযোগে স্থির করে নেয়া যাক নিউ আলিপুর কেন। রূপসী পাঠিকা, আপনি কি নিখিলস্ ল'টা জানেন? আচ্ছা বরং প্রবীর সাণ্ডেলের উপন্যাস কোথা যাও থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক। ল'টা এই যে কলকেতায় যারাই আধুনিক তারাই দক্ষিণমুখো। অর্থাৎ কলকেতা শহরটা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে বাড়লেও, সংস্কৃতিগত আধুনিকতা ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুব এই পর্যাযে অগ্রসর হয়েছে। উত্তর বা পূর্ব কলকেতায় কি বাড়ি উঠছে না? কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে টালার নতুনপাড়া, বেলেঘাটার সি আই টি পাড়া, পার্ক সার্কাসের হিন্দুপল্লী— মানসিক আধুনিকতাব দিক দিয়ে কেউই যথেষ্ট নয়। কিংবা এও না বলে, হে রূপসী পাঠিকা, নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখুন। কোন রাজপুত্র এসে যদি আপনাকে খুব লম্বা একটি ক্রিম রঙের জাগুয়ারে তুলে উধাও হতে চায় (তা যতই আপনার বয়স হোক রাজপুত্রদের সোনার কাঠির স্পর্শে আপনাদের প্রকৃত অর্থাৎ প্রথম যৌবনের সত্তাই জেগে ওঠে) আপনি কি নিউ আলিপুরের বাড়ি চাইবেন না? এর একটা কারণ আছে। এক সময়ে নিউ আলিপুর, ভবানীপুর,

বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্ক ইত্যাদির মনীষীরা একত্র হয়ে এই স্থির করে : নিখিল আমাদের ঘরের ছেলে, তার ল'টাকে নষ্ট হতে দিতে পারা যায় না। আসুন আমরা স্থির করি কলকেতায় আমাদের চাইতে সংস্কৃতিতে প্রাগ্রসর কেউ হয় নি, হবে না। তারা এই দলবাঁধার কাজটা সার্থকভাবেই করেছিল। প্রায় পাঁচ বছর বড়বাজার, কাশীপুর, বরানগর ইত্যাদির মানুষেরা বিপক্ষতায় এক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। মন্ত্রীত্ব রাখা দায়। কিন্তু এখনও নিখিলস্ ল বহাল আছে। এ বিষয়টাকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, তাও আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন। মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না। রুটির পরেই তার মনের ক্ষুধা জেগে ওঠে। গাড়ি, আরও লম্বা গাড়ি, বাড়ি, আরও আধুনিক বাড়ি, পোশাক, আরও আধুনিক পোশাক—এমন করে মন হাতড়ে চলে। কেননা সে দিন গত যখন এই মনের ক্ষুধাকে ধর্মের আফিমে ভুলিয়ে রাখা হতো, কেননা মানুষ সংস্কৃতিকে রুটির সমান মূল্য দেয়। নিউ আলিপুরে বাড়ি সুতরাং সংস্কৃতি।

প্রবীরেব এই কথাগুলোর একটা প্রমাণ এখনই দেয়া যেতে পারে। এই তলাপাত্র ম্যানশনকে লক্ষ্য করুন। এটা সেই হেস্টিংস ভবনই (সেই লর্ড হেস্টিংসের) যা বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখানে সরিয়ে বসানো হয়েছে। একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং বোমান্টিক নয়? সুরঞ্জিত তলাপাত্র যাকে টেকনোক্র্যাটরা নিজেদের মধ্যে সুপার টেকনোক্র্যাট বলে, তার সংস্কৃতি-ক্ষুধা এমন একটা বাড়ি ছাড়া মেটে? তার শেষ জন্মদিনের কেকটাই নাকি ষাট কেজি ওজনের ছিল।

লম্বা, গ্রেহাউণ্ডের চাইতেও গ্রেহাউণ্ড, গাড়িগুলো পাশাপাশি। কিন্তু এখন কি বেলাদের অনেক দেখা চোখেও অনুভব হলো, হ্যাঁ, অতিথিরা এসেছেন, এবং তাঁরা অল্পবিস্তব সিংহ। এবং তাঁদেব মধ্যেও সবিশেষ ওই গাড়িখানা যার নম্বর লাল অক্ষবে লেখা, এবং থামা অবস্থাতেও যাব লাল আলোটাও নম্বব প্লেটকে উজ্জ্বল রেখেছে। মন্ত্রীটন্ত্রীদেব কেউ হবে। তা হলে মিত্রার আয়োজনটা কম নয়।

হলের দরজায় মিত্রা এবং মিত্রাব পাশে গেবি স্যান্টাযানা। তখন অতিথিদেব যাবা আসার এসে গিয়েছে। এখন অন্যান্য অতিথিদেব সঙ্গে প্রবীর সাণ্ডেল ও বেলা সোমকে পরিচিত করে দিতে পাবলেই মিত্রা হোস্টেসের চেযাবে বসতে পাবে। অতিথিদের স্বাগত কবা সম্বন্ধে কি আপনাব কোন কৌতূহল আছে? অনুগ্রহ কবে হাউ টু বিসিভ এ গেস্ট, মেন অ্যাণ্ড পার্সোন্যালিটিস, হাউ টু বি রিসিভড এই তিনখানা বই-এর যে কোন দুখানা পড়ে নেবেন। ফরাসী ভাষায় লেখা মঁশিয়ে লে গেস্ট, অথবা মাদমোয়াজেল হোস্টেস বলে যে বই দুখানা আছে তাদের সম্বন্ধে নিউ আলিপুর অঞ্চলে এই সন্দেহ, আদৌ তা ফরাসী নয় যদিও যথেষ্ট আদিরসাত্মক, এবং প্রকৃতপক্ষে সুইস হোটেল ব্যবসায়ীদের দ্বারা হোটেল কর্মচারীদের জন্য লিখিত।

সুতরাং ইউবোপ-অভিজ্ঞা ব্যালেরিনা মিত্রা প্রবীর ও বেলাকে নিখুঁতভাবে সুস্বাগত করার পর কী হল তা বলতে পারি।

এ ঘরটায় এখন চারজন মহিলা এবং ছজন পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি। মহিলারা হচ্ছেন মিত্রা, বেলা শাশাঙ্কা, গার্টুড্ স্লুডার। মিত্রা ও বেলা সোমকে আমরা চিনি।

শাশাঙ্কা জাতে রাশান ছিল। এখন অবশ্যই ভারতীয়। কেউ কেউ বলে সে সেই বিখ্যাত বায়োলজিস্ট সুরঞ্জিত তলাপাত্রের স্ত্রী, কেউ বলে তা বটে তবে একসিস্টেনশিয়ালিস্ট মতে (অর্থাৎ এমন কি রেজিস্টার্ডও নয়)। কেউ বলে পি. এ.। চল্লিশ বছরে এখনও আকর্ষণীয়া যদি কারো রাশান টাইপ সৌন্দর্য ভালো লাগে। গ্লোব ট্রটার (অবশ্যই সব রকমের যানবাহনের সহায়তায়)। কেউ কেউ বলে কী যেন একটা তার ভেতরে আছে যা তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

গার্টুড স্লুডার অধ্যাপক কার্ল স্লুডারের কন্যা। জার্মান। মাপ আটত্রিশ, ছাব্বিশ, চল্লিশ ; বয়স পঁচিশ। লাল চুল। বর্তমানে কলকেতায় পিতাকে সাহায্য দিতে। সিমান্টিকে এম-এস-সি এখন বরং

বই-গুটানো হলিডে মুডে। পিতা অধ্যাপক স্নুডার একই সঙ্গে বহু কাজে ব্যস্ত। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস (আট ভল্যুমে এবং জর্মানে) লিখছেন। দিল্লী জাতীয় মহাবিদ্যালয়েব সংস্কৃতি একীকরণের চেয়ারে আছেন আগামী একবছরের জন্য। সারা ভারতে সংস্কৃতি সভাগুলিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেমন সেদিন কলকোতায়। সুতরাং বিপত্নীক অধ্যাপক পিতার সেবায় গার্ট্রুড নিজেকে ব্যাপৃতা রেখেছে।

অধ্যাপক স্নুডারের কথা প্রায় বলা হয়েছে। বলা দরকার তার নর্ডিক নাক এবং টাকের কথা। তার আট ভল্যুমের চার ভল্যুম বেরিয়েছে। ইতিমধ্যে শোনা যায় তা নাকি ঠিক তেমনই হয়েছে যা নাকি জর্মানরাই পারে। তুলনীয় হেগেল।

অতিথিদের মধ্যে প্রবীরকে আমরা ইতিপূর্বে চিনি। শোভন সামন্ত হার্ট স্পেশ্যালিস্ট। বেঁটে-খাট চেহারার এই হার্ট স্পেশ্যালিস্ট হার্ট ভালব অপারেশনে সিদ্ধহস্ত। ভিজিট ছশোচল্লিশ, ভালব অপারেশন ছহাজার চারশো। সব চাইতে বিখ্যাত হার্টস্পিড থিয়োরীর জন্য। শরীরের মাপ ইত্যাদির সাহায্যে বলে দিতে পারেন ঘণ্টায় কত কিলোমিটার ফাস্ট লাইফ পেশেন্টের হার্ট সহ্য করবে। একটা অখ্যাতি আছে। সাইকাইআট্রিস্টদের (সরকারি ক্লিনিকের তাদের বেলাতেও) দুচোখে দেখতে পারেন না। সাইকাইয়াট্রিস্টরা যে বলে মনের অবদমিত কামনা বাসনাকে প্রকাশ করে দিতে পারলে হার্টের অসুখ, প্রেশার ইত্যাদি থাকে না, তাকে তিনি অবৈজ্ঞানিক বলেন। লোকে বলে একবার এক সাইকাইয়াট্রিস্ট প্রমাণ করেছিল, শোভন সামন্ত এই এতদিন পরেও তার চিকিৎসাশাস্ত্রের বিচক্ষণতার পুরস্কার স্বীকৃতি হিসাবে ইংল্যাণ্ডের রাজার দেয়া সার খেতাব কামনা করেন (দেখ কাণ্ড, স্বাধীন ভারতে!) তা থেকেই শোভনের এই রাগ। কিন্তু তা হলেও টেকনোক্র্যাটদের সঙ্গীদের একবারও শোভনের কাছে বুক দেখান নি এমন কেউ নেই। কারণ এটা তো বৈজ্ঞানিক কালচারেরই অঙ্গ যে জানতে হবে নিজের সম্বন্ধে।

পীযূষ অবশ্যই রোঁয়া-ওঠা সিংহ, সিনেমা ডাইরেক্টর। যার সিনেমায় প্রবলেমগুলোর কম্পিউটার-সমর্থিত সিদ্ধান্ত দেখা দিচ্ছে। সেই প্রাচীন রবিঠাকুরের পরে কে আর বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির এমন ডিপ্লোম্যাট! রবীন্দ্রনাথ যেমন ঠাকুরপরিবারের মিথ তৈরি করেছিলেন, পীযূষও যে তেমন তার পরিবার সম্বন্ধে করবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু এবার শেষ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ এবার আমাদের সম্মুখে অলীক মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতি মন্ত্রী। মাথায় বড় চুল হিপিদের মতো। গায়ে লাল গেঞ্জি টিনবয়দের মতো (যদিও এটা ডিনারের নিমন্ত্রণ; কিন্তু এই কাম্য।) সংস্কৃতি মন্ত্রী যে ক্রমশ মন্ত্রীসভায় প্রধান এমন কি গভর্ণরের পরেই এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। তা হবেই বা না কেন? মনে করুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কিম্বা পুলিশ মন্ত্রী। তারা তাদের বিভাগে নিশ্চয়ই মূল্যবান। কিন্তু রোগীদের এবং ডাক্তারদের সংস্কৃতি কিংবা পুলিশদের অথবা তাদের হেপাজতে থাকা আসামীদের সংস্কৃতি? সেখানে তো এই সংস্কৃতিমন্ত্রী। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক মন্ত্রীর দপ্তরেই সংস্কৃতি মন্ত্রীর প্রভাব আছে। আগে কেউ কেউ সংস্কৃতিমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু অলীকের মতো এমন আধুনিক কি! ইতিমধ্যে সংস্কৃতির বিষয়ে লেখা তাঁর একখানা বই পুরনো কলকেতা মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে। না, ধর্মকে তিনি আফিম বলেন নি। এ বিষয়ে তাঁর সাহস গগনস্পর্শী। তাঁর ব্যাখ্যা তাঁর ভাষাতেই বলা যাক :

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব দেবদত্ত কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে চেষ্টা করেন, তাই বৌদ্ধধর্ম। ক্রাইস্ট ছিলেন পরাজিত মানুষের একজন। রোমান শাসনে নিপীড়িত মানুষ যাদের সাহস ছিল না অভ্যুত্থানের, তাদেরই তিনি শিখিয়েছিলেন এক গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দিতে। এই ভাবে তিনি রোম্যানদের শাসনকে মেনে নিয়ে মাটির দিকে মুখ রেখে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছিলেন। আমাদের চৈতন্য পণ্ডিতের ধর্মমতে দাস্যভাব, তৃণ থেকে সুনীচ হওয়ার মূলেই মুসলমানের কাছে পরাজিত হয়ে পরাজিতের মনোভাবকে চিরস্থায়ী করা। এমনকি রাজা রামমোহনের

আত্মীয় সভাও তাই। জমিদার সামন্তদের মুখপাত্র হিসাবে তিনি ইংরেজ প্রোটেস্ট্যান্টদের অনুকরণের চেষ্টা করেছিলেন সুবিধা আদায়ের জন্যে।

...কিন্তু এসব প্রয়োজন হতো না এত গসপেল লেখার, এত কীর্তন বা ব্রাহ্মসঙ্গীতের, যদি তখন সাইকাইআট্রিস্টরা থাকতো। মনোবিকলনের সাহায্যে তাঁরা এই সব ধর্মমতপ্রোক্তার মূল অভাববোধ ধরে দিতে পারতেন।

অলীক মুখোপাধ্যায় অবশ্য ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। কারণ তিনি রাজনৈতিকও বটে। এবং ধর্ম সম্বন্ধে ওরা যা স্পর্শকাতর। হয়তো ভোটে গোলমাল করে দেবে। মাইনরিটিও বটে।

এখন ডিনারের আগেই ককটেইল চলেছে। ডিনারটা নিরামিষ। কিন্তু এটা তো এখন ডিনার নয়। নিঃশব্দে যে লোকগুলো বোতল গ্লাস আইস ইত্যাদি সরবরাহ করছে তাদের লিভারি একেবারে নতুন। সেটাই স্বাভাবিক। মিত্রা কি এর আগে ডিনার দিয়েছে? অন্যদিকে এই লিভারি তৈরি কি প্রমাণ করে এবার থেকে সে কলকেতাতেই থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী বক্তৃতামালা শেষ হলেও? অবশ্য সার্বিটরদের মধ্যে দুতিনজন অন্তত বেলা সোমের বাড়ির এবং তারই ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

আলাপটা হচ্ছিল অলীক মুখুজ্যের থিয়োরী নিয়েই। এটা খুব স্বাভাবিকই। তিনি ভালো কথা বলতে পারেন। সংস্কৃতি ধর্ম নয়, এটাই তিনি বোঝাচ্ছিলেন। ধর্ম, তিনি বললেন, ধরে রাখে, পিছনে টানে। অগ্রগতির বাধা। পক্ষান্তরে সংস্কৃতি, কালচার, মানুষকে অগ্রসর করে।

এ আলোচনায় অল্প-বিস্তর সকলেই যোগ দিচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, কালচার একটা বিজ্ঞানের বিষয় বলেই গণ্য হওয়া উচিত। আপনারা শুনলে আনন্দিত হবেন, আগামী বছর থেকে আমাদের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কালচারে এম-এস সি পড়ানো হবে।

প্রবীর বলল, স্নো সাহেবের জয় হোক। এতদিন যে হয় নি তার কারণ আগের মন্ত্রীসভা আমাদের বর্তমান মন্ত্রীসভার মতো ছিল না।

পীযূষ বললো, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতে, সাহিত্যে যখন এম-এস সি পড়ানো হয় তখন এতদিন সংস্কৃতিতে কেন এম-এস-সি পড়ানো হয় নি ভাবতে অবাক লাগে।

ডক্টর শোভন বলল, তার কারণ এই যে আমরা এখনও মুখে যত বলি কাজে ততটা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি মানি না। এটা একটা সোসাইটি স্ক্যাণ্ডাল। গত সপ্তাহে একজন টেকনোক্র্যাট বুক দেখাতে গিয়েছিলেন অসুস্থ হওয়ার পরে। আগে আসেন নি কেন? পঁয়ত্রিশ বছর হলে ছমাসে একবার ক্যানসারের জন্যে, তিনমাসে একবার হার্টের জন্যে চেক আপ দরকার। ওদিকে টেকনোক্র্যাট, কিন্তু মনে প্রাণে গেঁয়ো।

হো হো করে হেসে বলল অলীক মুখুয্যে, না, এরকম আপনি বলছেন না।

পীযূষ বলল, নিচে থেকে ওপরে উঠে আসা লোক। কিন্তু এমন কি দক্ষ-শ্রমিকদেরও আজকাল এই বোধটা আছে। তারাও তো এইসব চেকআপের সুবিধা না পেলে আন্দোলন উপস্থিত করে।

ডক্টর শোভন বলল, এমন কি দেখা গেল সে নিজে জানে না তার রক্ত কোন গ্রুপের। এমন কি কোন কোন খাদ্যে তার অ্যালার্জি হয় তাও জানে না।

বেলা সোম বলল, দেখো প্রবীর, তোমার উপন্যাসে বর্বরচরিত্র আঁকার কেমন মডেল।

মন্ত্রী বলল, এটা একটা সামাজিক মেলামেশা, নতুবা আপনার কাছে আপনার রোগীর নাম জেনে নিয়ে তার বিভাগীয় মন্ত্রীকে নোট পাঠাতুম। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-সচেতনতার অভাবে কী হয় দেখুন।

প্রবীর গম্ভীর মুখে বলল, হয়তো সে স্টেট সাইকাইআট্রিস্টদের কো-অপারেটিভে যায় নি। রেকর্ড নেই তার গোপন অবচেতন আকাঙ্ক্ষার।

[illegible] অলীক মুখোপাধ্যায় তার জিভ চিবুতে চিবুতে চিন্তা করল : কারো নাম উল্লেখ না করে [illegible] বিভাগীয় প্রধানদের নামে ছাড়া যায়, তাতে জনৈক টেকনোক্র্যাটের এই

বর্বরসুলভ আচরণে সরকার বিড়ম্বনা বোধ করছেন, তা বলা যায়।

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের এই আলাপ (যার সারমর্ম উদ্ধৃত করা হল) শেষ হওয়ার আগে টিং করে একটা মৃদু মধুর শব্দ হল। ডিনার তৈরি।

তেরো কোর্সের ডিনার, তাও নিরামিষ। সুতরাং তার বর্ণনা দিতে গেলে এই বইটার নামই রাখতে হয় ডিনার পার্টি।

বাইশটা মোমবাতি কেকে। গেরি স্যান্টায়ানা (যাকে মিত্রা শান্তনু বলে ডাকল) ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলি নিবিয়ে দিলে ডিনার শুরু হল। এটা কি তবে শান্তনুর (স্যান্টায়ানা যার অন্য নাম) জন্মদিনের ডিনার? তা হলে সে-ই তো এই অল লায়নস ডিনারের কেন্দ্রে।

কেমন দেখাচ্ছে তাকে? কী বর্ণনা করা হবে? তার নীল চোখ, সোনালী গোঁফের সিল্ক?

শান্তনু একবার সল্টসেলাব এগিয়ে দিতেই গার্ট্রুড স্নুডার বলল, আমাকে একটা ডেট দিতে পারেন না?

তৃতীয় কোর্সে (সুন্দরভাবে এগোচ্ছে ডিনার। সার্বিটররা মূলত বেলা সোমেব হাতে গড়া।) আলাপটা সংস্কৃতির দিকেই ঝুঁকল। (কেননা এরা সমাজসচেতন।) মন্ত্রী অলীক মুখুয্যে বলল, মানুষের সভ্যতা বলতে তার টেকনোলজির উন্মেষ ও উন্নতিকেই বোঝায়। যাবা এখনও তাঁতে কাপড় বোনে, প্রদীপের আলোতে থাকে এবং তীর ধনুককে অস্ত্র মনে করে তাবা এক সময়ে তৎকালীন সভ্যতাব অগ্রপথিক ছিল। এখন? সুতবাং যাবা টেকনোলজির অগ্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে সংস্কৃতিকে খোঁজে তারা সভ্যতাকে বাদ দিযে সভ্য হতে চায। সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মনের সেই সুসংস্কৃত অবস্থা যখন টেকনোলজিব অগ্রগতিকে বুঝতে, তাকে নিজের অঙ্গীভূত কবতে এবং টেকনোলজির আবও নতুনতর পদক্ষেপকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকে।

অবশ্যই। পীযূষ বলল, সিনেমা যখন তিন ডাইমেনসনেব ছবিও তুলছে তখনও কেউ কেউ নাটক লিখে থাকে। যেন স্টেজক্রাফট শত চেষ্টা কবলেও সিনেমা ক্রাফটেব ধারে-কাছে যেতে পারে।

টেবলেব তলায় বেলা একবাব প্রবীরেব পা ঠুকে দিল। প্রবীর তখন ছুরির মাথায় ভাজার কুচি সুন্দর করে তুলে মুখে পুরল।

শোভন বলল, নিশ্চয়। যে, আমরা একটা উদাহরণ নিতে পাবি, এখনও জানে না কোন কোন খাদ্যে তার অ্যালার্জি, অর্থাৎ মেডিক্যাল টেকনোলজির এতটুকুও নিজের কাজে লাগাতে পাবে নি, তাকে আর সংস্কৃতিবান বলতে পারি নে।

অধ্যাপক স্নুডার বলল, কিংবা, ধরুন, কোথায আমার অবচেতনে কী কামনা চাপা পড়ছে তা জানবার যে টেকনোলজি অর্থাৎ সাইকাইআট্রিস্টের সাহায্য, না নেযাও কিছুটা গোঁড়ামি।

মনে হল শোভনের চোখ দুটি চকচক কবল। স্নুডার কি অজ্ঞাতসারে তার কড়ায় পা রেখেছে? কিন্তু শোভন হাসল। সাইকাইআট্রিস্টদেব প্রতি তার রাগের গোপন কারণ এই বৃদ্ধেব জানাব কথা নয়।

চতুর্থ কোর্সের গোড়াতে গার্ট্রুড হেসে বলল, দু-একদিনের মধ্যে আমাদের দিল্লিতে ফেবাব কথা। তবে যদি ডেট দাও আমি কলকাতায় থেকে যেতে পারি। তাই নয়, ড্যাডি?

অধ্যাপক স্নুডার অভ্যাসবশেই বলল, অবশ্য, অবশ্য।

শাশাঙ্কা বলল, একজন অবশ্য সামাজিকতা মানবে, তাই নয় স্যান্টায়ানা?

অবশ্যই, অবশ্যই। বলল শান্তনু।

অধ্যাপক স্নুডার বলল, সাইকাইআট্রিস্টরা যখন অবচেতন মনের গ্রন্থি খুলে কোথায় না পাওয়ার ফ্রাস্ট্রেশান বলে দিচ্ছে, তখন চাই না বলাটা কিংবা চাইলে চাওয়া বাড়ে, এমন কিছু বলাটাই

অবৈজ্ঞানিক হচ্ছে। এবং মন্ত্রীমহোদয়, ধর্মমতের সঙ্গে যে কামনাকে দমন রাখার উপদেশ (আপনার বইয়ের জার্মান অনুবাদ আমাদের কনসাল আমাকে দিয়েছেন) তার মূলেই এই সত্য যে সেইসব পরাজিত মানুষের প্রতিভূরা তৎকালীন টেকনোলজিকেও নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে পারছিল না।

মন্ত্রী অলীক মুখুয্যে সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

নবম কোর্সে বেলা সোম আলাপটার নেতৃত্ব নিল। সে বলল, ধন্যবাদ শাশা, তোমার বার্ডস, র‍্যাটস এবং ফিশেস আমি পড়েছি। এটাকে একটা সংযোজন বলতে হবে।

আলাপটা শাশাস্কার বইয়ের দিকে গেল। পাখিদের দলবেঁধে থাকাব মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ, ইঁদুরের ভয়ঙ্কর দেশপ্রেম, মাছেদেব নতুন নতুন দল তৈরির দক্ষতা নিয়ে কথা হল।

অধ্যাপক স্লুডার বললেন, ঠিক। ঠিক। দেখুন, পিঁপড়ে কেমন সুবিন্যস্ত সমাজে বাস করে কিন্তু টেকনোলজি দখল করতে না পেবে ইভোলিউশনে পিছিয়ে গেল।

দশম কোর্সে বেলা আবার হেসে নেতৃত্ব নিল। মিত্রার আত্মজীবনী যার সিবিয়াল সবে আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে, তার কথা তুলল।

প্রবীর বলল, মাই, দেখো মিত্রা, ছোটবেলায় আমি তোমার কাছে কোন প্রস্তাব করি নি তো?

মিত্রা হেসে বলল, তখন থেকেই আপনি দার্শর্নিক।

দশম কোর্স ধরে এই ব্যালেরিনা হোস্টেসেব অভিজ্ঞতা নিযে কথা চলল।

একাদশ কোর্সেও বেলার নেতৃত্ব থেকে গেল।

কিন্তু, প্রবীব, ছোটবেলায় তুমি নেহাৎ ভালো মানুষ ছিলে না। লেডিদের হাত দেখে বেডাতে।

হাত দেখা একটা খেলাই কিন্তু দেখা গেল বর্তমানেব কলকেতাতেও এ বিষযে কৌতূহল কমে নি। মন্ত্রী মহোদয় অলীক মুখুয্যে দুহাত ঘষে ডান হাতটা প্রবীরেব সামনে এগিযে দেযার ভঙ্গী কবল।

এ সময়ে যেমন করা উচিত প্রবীব তাই করল অর্থাৎ বলল, ওটা এমন একটা ব্যাপাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছি।

কৈশোরের সারল্যেব মতো বলছেন?

ঠিক তাই, ঠিক তাই। প্রবীর বলল, ওটা কৌমার্যের মতোই। হায়, হাবালে আব ফেবে না। হামটি ডামটি দেয়াল থেকে পড়লে রাজার সব তুরুক আর সব পাইক মিলেও জুড়ে দিতে পারে না।

শান্তনু বলল, কিন্তু কিছু একটা আছে। যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে থাকে। একটা এয়ারস্ট্রিপে এই ঘটনা ঘটেছিল। ক আর খ দুজনেই পাইলট। ওরা দুজনেই বিষ্যুৎবার আর তেবোকে ভয় পেতো। সেজন্য সম্ভবপক্ষে ওরা তা এড়িয়ে যেতো। একবার ক আর খ দুজনেরই ডিউটি পড়ল একটা গোপন ফ্লাইটের। পাইলট মেসে এ নিয়ে আলাপ হল। বারটা বিষ্যুৎ এবং তারিখটা তের পড়েছে। স্কোয়াড্রন লিডারকে এ বিষয়ে ওরা দুজনেই বলল। অন্য সব বিষয়ে কড়া হলেও তিনি এ বিষয়ে কিছু উদার। ক আর খ-এর বদলে গ আর ঘ বিষ্যুৎবারে ফ্লাই করল। পরের দিন ক আর খ। যথা সময়ে ক-র প্লেন আকাশে উঠল। খ-র জেট স্টার্ট নিচ্ছে, সে ককপিট থেকে হাত নাড়ল। পর মুহূর্তেই শব্দটা হল। আগুন নিবিয়ে ধ্বংসস্তূপ থেকে খ-র অবশেষ যখন বার করা হল, মনে হল তার মুখে হাসিটা যেন অবিকৃত। পরে দেখা গিয়েছিল চার্টে খ-এর এই ফ্লাইট তেরো নম্বরে লেখা আছে।

তখন আলাপটা মানুষের ভাগ্যের কথায় এল। কোথায় যেন কিছু ঘটে আর মানুষ তখন তার সংস্কৃতি, টেকনোলজি, বিজ্ঞান সত্ত্বেও ভাগ্যের কাছে হার মানে। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে একই বছরে পাশ করা ফার্স্টবয় প্রথম অ্যাকশনে মারা গেল আর দশম স্থানের সেকেণ্ড লেফটেনেন্ট

জেনারেল হয়েছে বেঁচে থেকে এমন প্রমাণ আছে।

তেরো কোর্সের ডিনার। শেষ হতে রাত দশটা। ততক্ষণে সবাই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেছে, পরস্পরকে অনেকটা চিনেছে। শান্তনু পীযূষের নতুন বই এর শুটিং-এ থাকাব নিমন্ত্রণ পেয়েছে, গার্টুডকে ডেট দিয়েছে। অলীক মুখুয্যে মিত্রার আত্মজীবনী ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি থেকে ছাপাব আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অধ্যাপক স্নুডার সোমবারে দিল্লির ফ্লাইট নেবার আগে শোভনের চেম্বারে হার্টটা দেখিয়ে নেবে।

ডিনার ওয়াইন ছিল না, কিন্তু এখন ওয়াইন চাইতেই ওয়াইন এল। এটা ভালোই। মন্ত্রীমহোদয় ডিনারে ওয়াইন ব্যবহার করবেন না। এটা আমাদেব জাতীয় রাজনীতির একটা ভিত্তিপ্রস্তব।

এটা সেই আগের বসার ঘর নয়। এটায় পৌঁছে মনে হচ্ছে একেবারে টাটকা সাজানো। যেন সন্ধ্যাবেলায় আমেজ। এখরে ওরা দলে দলে বসেছে। খুব দূরে দূবে নয়, তা হলেও যেন গ্রুপ করে বসাটা বোঝা যায়। শান্তনু আর গার্টুড উঠে গেল ব্যালকনিতে দাঁড়াতে ওযাইন কাপ নিযে।

মিত্রা হেসে বলল, মেয়েটি ভালোই, তাই নয়?

প্রবীব বলল, ওদের একটা কমন ল্যাংগুয়েজ আছে, তাই নয়!

শোভন, শাশাঙ্কা, পীযূস দেখা গেল শোভনের হৃৎপিণ্ড গতিবেগের থিয়োবী নিযে আলাপ করছে। হৃৎপিণ্ড একটা যন্ত্র যার কাজ সেন্টিমিটাব, গ্রাম, সেকেণ্ডে মাপা যায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই শাশাঙ্কা ও পীযূষ শোভনেব থিয়োরীতে আগ্রহশীল। কেননা এরা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিব লোক।

চুরুট নিয়ে বসেছে অধ্যাপক স্নুডার এবং মন্ত্রী অলীক মুখোপাধ্যায়। নীল সরু সুগন্ধি ধোঁযার মধ্যে তাবা আলাপ করছে। স্নুডাব বলল, ইলেকট্রিসিটির সব ফাংশান যেমন কতকগুলো ল দিয়ে বোঝানো যায়, মানুষেব জীবনকেও তেমন যেতে পাবে।

ঠিক তাই। এবং এটা জানতে পাবাই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির লক্ষণ।

হোস্টেস মিত্রাকে অবশ্যই যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে এ গ্রুপে ও গ্রুপে গিয়ে বসতে হচ্ছে। সেই সুযোগে প্রবীর বলল, যদি ভেবে দেখো বেলা, এখন আমরা যেতে পারি।

তখন তখনই নয়, আরও আধ ঘণ্টা পরে মন্ত্রীমহোদয় বিদায় নিতে প্রবীর এবং বেলাও বিদায় নিল।

পথে বেরিয়ে বেলা বলল, এখনই কি তে মাব ফ্ল্যাটে ফিরবে? সে ঘড়ি দেখল। তুমি যদি না লেখো আজ, এই তো সন্ধ্যা হল।

যা সব মাথায় গেল। বেরিয়ে না গেলে শুধু স্যাটায়ারই লেখা সম্ভব।

একটা পছন্দমতো বার মনে করো দেখি। তোমার মনে রাখতে হবে কোন মহিলা যদি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরতে না চায় তবে পুরুষের কর্তব্য তাকে পছন্দমতো কোথাও নিয়ে যাওয়া। তুমি যেন কী হচ্ছো প্রবীর!

প্রবীর বলল, পুরনো চৌরঙ্গী থেকে পার্ক স্ট্রিটের দিকে চলতে গেলে সেই পুরনো হোটেলটা আছে। যেটায় একদিন তোমাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ইলোপ করেছিলুম। নিচে বারও।

এতক্ষণে পুরুষেব মতো কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে নস্ট্যালজিয়া আছে। কিন্তু তার আগে, এই নিউ আলিপুর থেকে চৌরঙ্গী যাওয়ার আগে।

বেশি পিপাসা পেয়ে থাকে নেতাজী সুভাষ ডকের বুকে জাহাজে যেতে পারি। কখনও কখনও চোরাই বোর্দো নাকি সত্যি পাওয়া যায়।

আ! প্রবীর তুমি কি কখনও মানুষ হবে না! ওই চোরাই বোর্দো যে সত্যি চোরাই বোর্দো, রঙ করা কাশীপুরী চোলাই নয় কে বলেছে!

বেলা, স্টিয়ারিং তোমার হাতে, দয়া করে পথে চোখ দাও। কুকুব বা কুকুরের মালিক অথবা

অন্য কারো গাড়ি জখম হতে পারে। বরং স্টিয়ারিং আমার হাতে দাও।

আর তারপর ঘণ্টায় পাঁচ কি.মি.।

বেশ, তা হলে সামনে চোখ রেখে হালকা কথা বলে যাও। আমি হুঁ হ্যাঁ করি।

স্টিয়ারিং বদলানো যেতো না ; কারণ যে লাইনে গাড়ি ঢুকেছে তার গতি অন্তত চল্লিশ কি, মি, এবং সেই চলমান এসক্যালেটর থেকে ডাইনে বাঁয়ে সরা যায় না। গাড়ি থামানো দূরের কথা। টেকনোলজিকে কাজে লাগানো বৈকি! কত রঙের, কত মাপের গাড়ি সেই স্রোতে। এবং যেন আলোতে হাসছে তাদের স্টিয়ারিংএ বসা মেয়েরা। তাদের চকচকে ছাদ, ক্রোমিয়াম ফেনডার।

তুমি কি লক্ষ্য করেছো, গার্ট্রুড ডেট পেয়ে কলকেতায় থেকে যাচ্ছে।

নিশ্চয় প্রেম বলছো না। যদিও তোমার কাছে এই প্রথম শুনলাম।

শান্তনু অবশ্য সুন্দর। সিনেমার পাঠান নায়কদের মতো না হলেও অনেক অনেক দ্রুত।

তোমার আমার চাইতে নিশ্চয়।

আজকের সব ব্যাপারটাই শান্তনুর জন্যে!

সেই মোমবাতি নিবিয়ে কেক কাটল বটে।

মিত্রা অনেকদিন পর কলকেতায়। হয়তো এখানে স্থায়ী হতে চাইছে।

আত্মজীবনী লেখা স্থিতি সূচনা করে।

যেন সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুকে তুলে ধরতে চায় সমাজে।

হুঁ।

ইনট্রোডাকশনটা ভালো হয়েছে যুবকটির পক্ষে।

হ্যাঁ।

আচ্ছা মনে হয় না শান্তনু পাইলটদের একজন ছিল?

গল্পটা শুনেছি।

ছুটিতে হয়তো। খুব রিস্কের চাকরি কিন্তু।

হ্যাঁ।

মিত্রার কাজন। মিত্রা সুরঞ্জিতের স্ত্রীর মেয়ে, কিন্তু—

সেকেলে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো বলছো।

এরকম কথা আছে সুরঞ্জিতের স্ত্রী তার দুটি বন্ধুকে খুব ভালোবাসতো। এবং সুরঞ্জিত এসব ব্যাপারে উদার ছিল।

এগিয়ে যাও। কিংবা সামনে দেখো গাড়িগুলো দুভাগ হচ্ছে। কোন ভাগে যাবে বেছে নাও।

তোমার সেই হোটেলেই যাচ্ছি।

গাড়ির গতি প্রায় দশ কি. মি-তে এসেছে। সামনে হোটেল-পাড়াগুলোর একটি।

পনের মিনিটের চেষ্টায় গাড়ি পার্ক করতে পারল বেলা সোম।

আর তারা সেই হোটেলের দিকে চলল পায়ে হেঁটে।

হোটেলের বারে ঢুকতে ঢুকতে বেলা বলল, এটা সেই হোটেলই দেখো, যেখানে মোরাভিয়ার অনুবাদ করে পালিয়েছিলাম।

নস্ট্যালজিয়া। তখন তোমার আমার পঁচিশ হবে, বেলা সোম।

প্রবীর, ভিড় আছে দেখো। ওদিকে ওই টেবলটা খালি। কনিআক কিন্তু।

বারের দিকে এগোতে এগোতে প্রবীর বলল, অবশ্যই। তখনও কিন্তু কলকেতার অনেকে কনিআককে কগন্যাক বলতো।

প্রথম গ্লাস শেষ হওয়ার পরে বেলা বলল, আচ্ছা, প্রবীর, কিছু যদি মনে না করো—

কী যে বলো, বেলা, মনে করে দেখো সেদিন আমরা কনিআক নিয়ে দুর্গের দরজা বন্ধ করেছিলাম।

আহা, প্রবীর, সাইকাইআট্রি তো বিজ্ঞান।

টেকনোলজি বরং বলো।

তা হলে দেখো।

দেখছি। লোকটা, ওই যে, বোধ হয় প্রথম আবসাঁৎ নিয়েছে।

আ, প্রবীর, প্রকৃতপক্ষে মানুষের মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে টেকনোলজির যোগ নেই?

অলীক, অলীক।

মন্ত্রীমহোদয় সত্য বলতে পাবেন না।

দেখো, কনজেনিট্যাল উইকনেস আলোচনাটা, কানাকে কানা বলার মতো।

আচ্ছা, প্রবীব, তুমি মানে, তোমার সাইকাইআট্রিস্ট কে? কেউ নয তো? কেন?

তোমার কি ধারণা, বেলা, যে-- আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে কী ধারণা তোমাব? তুমি কি মনে করো, আমার কোন গোপন আকাঙ্ক্ষা আমাকে পীড়িত কবছে। কিংবা পাপবোধে--

আহা, প্রবীর --

মানে, তুমি কি মনে কবো বেলা, কথাটা এই, সুরথ সোমেব স্ত্রীব সৌন্দর্য আমার মনকে অভাবগ্রস্ত করে বেখেছে?

কনিআকের কাপ দ্বিতীয়বাব ভরল বেলা সোম।

বলল, ধন্যবাদ, প্রবীব। তুমি সাহসী বটে এখন। কিন্তু তা নয়। ওটা তো ওই অভাববোধ, দুএকবাবেব অভিজ্ঞতায চিরকালেব মতো চলে যেতে পারতো।

সমারসেট মম বলছো! আক।

আ, প্রবীব, কিন্তু সাইকাইআট্রিস্টবা কি শান্তি দিতে পাবে? মনে কবো কোন একজন টেকনোক্র্যাট কর্মচারী টাকাব লোভে জার্নালিস্টের কাছে এমন কি মিলিটারি সিক্রেট ফাঁস করেছে। তারপব সে কী কবে?

সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যায এবং কনফেস করে।

কনফেস?

ব্যাপাবটা তাই নয়?

মানে কনফেস করে পাপবোধেব চাপ থেকে মুক্তি পেতে ফাদারদের বদলে সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যায়। আ, প্রবীব, আ, তুমি কি তোমাব নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছ?

না, না। বেলা, আব নয়। মানে তোমার চোখদুটি অরুণ-লোচন। কী বলছিলাম? না, না, বেলা, আর নাটক থেকে উদ্ধৃতি হলেই বা দোষ কী? [illegible] পাপবোধ ছাড়া কি সাহিত্য হয়? এটা কি, অলীক মুখুয্যে কোট করে, একটা বৈজ্ঞানিক ক্রিশ্চিয়ানটি নয়, ক্যাথলিক, মেথডিস্ট, শেষে সায়েন্টিফিক।

রাত বারোটা বেজে যেতে প্রবীর বলল বেলাকে উঠতে। এই এতটা সময় কী আলাপ করল তারা? একেবাবে অতীতেব কথা যা আমাদের এই ইতিহাসে অবান্তর।

কনিআকের বোতলটা নিতে যাচ্ছিল বেলা। প্রবীর বলল, যেতে দাও। দরকাব হলে সুরথ একটা নতুন বোতল খুঁজে দিতে পারবে।

কিন্তু এখন সুরথ কোথায়?

এবার আমি গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছি। তুমি একবার চান্স দাও, বিশ মিনিটে সৌমিক মানে সোম-ম্যানশনে পৌঁছে যাবো। ডার্লিং, ডার্লিং, একটা চান্স।

কিছুদূরে গিয়ে গাড়ির স্রোতে পড়ল প্রবীর। তেমনি আলো-চমকানো এবং নানা রঙের পতঙ্গ, কিন্তু এখন যেন বর্ষা মরে গিয়েছে, তাই কিছু জোর কমেছে। ক্যালকাটানরা বলে : এর কারণ এই রাত বারোটায় মোটরের স্পিরিট বেড়ে যায়। বেলা সোম গাড়ির জানালায় যুক্তকর রেখে মাথাটা তার ওপরে কাত করে রেখেছে। হাওয়া লাগাচ্ছে।

সৌমিক যাওয়ার পথে গাড়িটা বাঁক নেবে। প্রবীর খুঁজছে কোথায় গাড়ির স্রোত ভাগ হচ্ছে মাছের বাঁকের সিউডোপডের মতো। বেলা বলল, দূর, এত সকালে কেউ ডিনার থেকে ফেরে? প্রবীর, মির্জা গালিবে চলো। তোমার ফ্ল্যাটে।

এটা প্রবীরের ফ্ল্যাট।

প্রবীর ইতিমধ্যে কোট খুলেছে। একটা পিঠ-মোড়া চেয়ারে পিঠ টান করে বসেছে সে। বেলা ইজি-চেয়ারে। পায়ের ওপরে পা তুলে বসেছে। তার হাতে একটা পত্রিকা। সামনে তেপায়ায় বোর্দোর বেঁটে বোতল।

প্রবীর বলল, বেলা রাত দুটো হল। যদি কিছু মনে না করো আলাপটা শেষ করলে হতো না!

এই তো পীযূষের সঙ্গে আলাপ হল।

হয় নি কে বলেছে?

ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাল বেলা। একটু পরে আবার বলল, প্রবীর বলবো কি কথাটা? তুমি কি একটু মন দিয়ে শুনবে?

বলো। শুনছি। নাকি সিগারেট নেবে? হাই তুলল প্রবীর।

তোমার শেষ নাটকটা কিন্তু স্যাটায়ারে দাঁড়িয়েছে।

বলে যাও।

তোমার সেই মঞ্চে রাখা বুটজোড়া মানুষের পথ হারানো বোঝায় বটে, কিন্তু তুমি যে সুরাকসিন সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা করেছো সেটা কি চড়া সুরের স্যাটায়ার নয়।

তারপর বলো।

তুমি কি ইঙ্গিত করো নি, যে সুরঞ্জিত তলাপাত্র চেয়েছিল জিনতত্ত্ব অধিকার করে নতুন মানুষ সৃষ্টি করবে? কিন্তু যা হয়েছে তা মরা চামড়া। লেদার যা প্লাস্টিকের মতো তৈরি করা চলে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড একত্র করে। লেদারের মতো, বরং লেদারের চাইতে ডিউরেবল, কিন্তু মরা চামড়ার বেশি নয়।

বেশ তো।

তাতে কি বিজ্ঞানকে স্যাটায়ার করা হয়নি?

হয়তো। কিন্তু তারপর কী?

দেখো, যতই তোমরা বলো, সাহিত্য আর্ট ইচ্ছাপূরণ নয়, কিন্তু সেজন্যই কি অর্থাৎ তোমার নাটকে ইচ্ছাপূরণের অভাব বলেই শ্রোতাও কম?

বেলা, বেলা, একটু কনিআক নেবে। নতুন বোতল আছে।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন দৃশ্যটা পরিবর্তন হল। প্রবীরের টেবলে রাখা ফোশনটা বাজ করল। প্রবীর রিসিভার তুলে নব টিপতেই পর্দায় সুরথ সোমকে দেখা গেল।

হাল্লো, বলল প্রবীর, মিসেসকে খুঁজছো? দেবো ফোন? সুরথ তার হাতের বইটা নামিয়ে সিগারেট ধরাল। তার মুখের পরিবর্তনে বোঝা গেল সে একটু নিশ্চিন্ত হল।

প্রবীর বলল, এই যে বেলা, সুরথ ওদিকে।

বেলা ফোশনের রিসিভার ধরল।

সুরথ বলল, আসব নাকি গাড়ি নিয়ে, মানে—।

কী করছো? বেলা বলল।

সুবথ বলল, একটু বাঁয়ে সরে দাঁড়াও, প্রবীরকে ঢেকে দিচ্ছ। আব বলো কেন। শাশাঙ্কার লেখা বার্ডস, র‍্যাটস্ ও ফিশেস পড়ছি। বেশ লিখেছে কেমন কিনা?

তাই বলে এই রাত দুটোয় বই পড়ছো। শোও নি?

ফোশনের পর্দায সুরথ গোপন পরামর্শের অভিনয় করল। গলাব স্বর নামাল। বেলা, একটু মুস্কিলই।

সে কী?

মানে তোমার ছোট মেয়ে। বাড়িতে ডেটকে এনেছে। এতক্ষণ ডর্মিটরিতে বসে দুজনে কৃষ্ণকীর্তন করছিল।

বেশ তো।

ওদিকে করিডরে আলো নেই যেন।

বেশ তো।

আ, বেলা। আমি জানি না কী কবা উচিত। যদি তোমার ছোট মেয়ের ডেট সোফাতে ঘুমোতে চায? আমার কি উচিত হবে তাদেব সামনে গিয়ে দাঁড়ানো?

বেলা উঠে দাঁড়াল। হ্যাণ্ডব্যাগটা হাতে নিল। বলল আবার ফোশনের সামনে এসে, সোম, স্ক্যাণ্ডাল করো না। আমি রওনা হচ্ছি। হ্যাঁ এখনই, এখনই। বাই, বাই, প্রবীব।

দবজা খুলে ধবল প্রবীব বেলার জন্যে।

বেলা লিফটের দবজা থেকে জুড়ে দিল, প্রবীর, আলাপটা হল না।

কে বলেছে, কে বলেছে তা হল?

রূপসী পাঠিকা, নভেলেব এই এক রীতি, একের পব এক সিচুয়েশন তৈরি করা হবে, তা চরিত্র উম্ঘাটন করবে এবং সেই আবিষ্কারেব বিস্ময় আপনাকে সমাপ্তিব দিকে উন্মুখ করে রাখবে। যেন যুক্তি এই যে, বাস্তবে জীবনে প্রথম দেখে যেমন পরিণতি বোঝা যায় না, জীবনের অনুকরণ নভেলেও যেন তেমন হয, কিন্তু এটা তো কৌশল মাত্র। আপনি নিশ্চয় ধবতে পেবেছেন, এপর্যন্ত যে ব্যক্তিগুলিকে সমাজ থেকে বাছাই করে হাজির করা হয়েছে তাবা একত্র হবেই। সুতরাং এই বিজ্ঞানের যুগে তাদের একত্র হওযার যুক্তিগ্রাহ্য পরিস্থিতি তৈবি করার আনুপূর্বিক বিস্তার বাদ দেয়া যায়। তার ফলে অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রগুলোকে পুতুল মনে হতে পারে। তাতে লোকসান নেই। পুতুলনাচও আর্ট। উপরন্তু সে ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে একই আসনে বসে আপনি দেখবেন পুতুল চরিত্রগুলো কী এক সুতোর টানে, আপনাব জানা কিন্তু তাদের কাছে অজ্ঞাত ভবিষ্যতেব দিকে চলেছে।

এ বিষয়ে সুবিধা এই, প্রবীর সাণ্ডেলও নাটক এবং উপন্যাসের আর্ট সম্বন্ধে আজকাল এরকম বলতে সুরু কবেছে। সে চিঠি লিখছিল সুবথ সোমকে। সে লিখল, আমরা থিয়েটারে যখন যাই তখন জেনেই যাই চরিত্রগুলো কৃত্রিম। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলো বা চৈতন্য-স্রোত কিছুই তাদের অকৃত্রিম করতে পাবে না। নিজের মনের ঠিকানা নেই তো অন্যের মনেব অকৃত্রিম কথা বলা! সুতরাং নাটক আর নভেল ঈশ্বরের তৈরি পৃথিবীর ছায়ামাত্র না হয়ে মানুষের তৈরি আদি অকৃত্রিম পৃথিবী এমন অনুভূতি কি ভালো নয়?

বলা বাহুল্য এটা চিঠির আকারে প্রবন্ধ। অনুমান করি, এটা আর্ট ফোরামের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ পেলে কিছু গোলমাল সৃষ্টি হবে প্রবীরদের কলকেতায়। আর তা হতেই পারে, কেননা ইতিমধ্যে প্রচার, সেই নর্তকী যে তিন মহাদেশের রাজপুরুষদের হৃৎপিণ্ড নিয়ে এক দশক খেলা

করেছে তার লেখা আগামী সংখ্যা থেকে বার হবে। না বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালা নয়, আত্মজীবনী।

প্রবীরের যুক্তি মেনে বলে দেয়া যায় আমাদের এই নভেলকেও খণ্ড খণ্ড করার একমাত্র উদ্দেশ্য সময়ের ব্যবধান বোঝানো। সেই অল লায়নস ডিনারের পর একমাস পার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গার্ট্রুড স্নুডারের সঙ্গে শান্তনুর পরিচয় যথেষ্ট গভীর হয়েছে। গার্ট্রুড ডেট চেয়েছিল, যদি আপনাদের মনে থাকে। উপরন্তু মনে রাখতে হবে সেকালের সেইসব ভাবপ্রবণ উপন্যাসের নায়িকার মতই গার্ট্রুডের অভিভাবক বিপত্নীক পিতা। এই একমাসে প্রবীর সাশুেল শশী শাশাঙ্কার লেখা বার্ডস, র‍্যাটস ও ফিশেস পড়েছে। মরুভূমির পুরুষ টিকটিকি তার গর্তে ভুলে ঢুকে পড়েছে এমন স্ত্রী টিকটিকিকে কিছু বলে না, যদি স্ত্রী জন্তুটি কিছু ভিন্ন রঙের এমন কি ভিন্ন গোত্রেরও হয়, কিন্তু আসুক তো অন্য এক পুরুষ সে সহোদর হোক কিংবা পিতা। অবশ্য এ সংবাদে প্রবীর কিছু উৎসুক হয় নি। এ তো আছেই। কিন্তু স্টার্লিং পাখির তারে বসার ব্যাপার, আর মাছের সিউডোপড প্রবীরের বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করেছে। স্টার্লিং-এর চঞ্চল ঝাঁককে একই সঙ্গে উড়তে, একই সঙ্গে টেলিগ্রাফের তারে বসতে দেখেছে প্রবীর। লাইন ধরে বসে এবং সবই যেন সমান দূরত্বে, কিন্তু প্রবীর জানতো না এই দূরত্ব অঙ্কে মাপা, অর্থাৎ যতদূব সম্ভব ঘনিষ্ঠ অথচ সেই সঙ্গে এমন যে একে অন্যকে কিছুতেই ঠোঁটে ছুঁতে পারে না। ছুঁতে চেষ্টা করলে ঠোঁটের ঠোকর এক চুলের জন্যে ফসকে যাবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বীজ? কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য মাছের সিউডোপড। বিশাল এক জলচর প্রাণীই যেন সেই মাছের ঝাঁক। হঠাৎ যেন তার পা গজায়। কখনও সে পা কিছুক্ষণের মধ্যে গুটিয়ে যায়, কখনও বা সে পা বলশালী হতে হতে দেহের চাইতেও স্ফীত। আসলে তো তা মূল ঝাঁকের গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু মাছেব নতুন পথে ঝাঁক বেঁধে যাওয়ার চেষ্টা। প্রথম কয়েকটি ছিটকে গেল, তারা যদি ভালো টানতে পারে অথবা ভয় পেয়ে আসল ঝাঁকে না ফেরে তবে ক্রমশই তাদের পেছনে আরও মাছ চলতে থাকে, পুবনো ঝাঁকের যেখানে পা বেরিয়েছে সেখানে এসে পেছনের মাছেরা বুঝতে পারে না কোনদিকে মূল ঝাঁকটা চলেছে। আমাদের ম্যাস মুভমেন্ট অথবা রেভোল্যুশান? আরো ভালো লেগেছে প্রবীরের এটাই যে শশী কোথাও পাখি, মাছ প্রভৃতির ব্যবহারের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের তুলনার ইঙ্গিতও করে নি। অথচ পড়তে পড়তে এই রকম এক চিন্তা আসে : সাধারণত যাকে আমরা মানুষের গুণ বলি যেমন সেক্স-সচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, বিপ্লব এসব একেবারে নিম্নস্তর পশুপক্ষী জন্তুর মধ্যেও আছে। আর পিঁপড়ে এবং মৌমাছির সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রভিত্তিক জীবনের কথা তো জানতামই। কী তবে মানুষের গুণ? বন্দুক আবিষ্কার?

প্রবন্ধ থেকে চোখ তুলে যেন মিত্রাকেই দেখতে পেল প্রবীর। শশীকে নয়। আগেকার দিনের ভ্রমরকৃষ্ণ নয়। ঠিক সোনালিও নয়। খড়ের রংএর চাইতে কিছু ঘোর, বাদামের ঝরা পাতার রং বরং, এমন রেশম স্পর্শের এবং অনেক চুল, কী এমন খারাপ? সুন্দরই দেখায় মিত্রাকে যদিও তার বয়স যেন বা ত্রিশ হল। কিছু চ্যাপ্টা কিন্তু চওড়া নিতম্ব, পাথুরে-সাদা গায়ের রং, হাসিটা গোলাপি রঙের কারণ তার লিপস্টিক ঠোঁটের স্বাভাবিক রঙের চাইতে হালকা। স্পিনস্টার নয়। স্বামী তাকে তৃপ্তি, স্বাধীনতা ও নিঃসঙ্গতার কোমলতা দিয়ে গিয়েছে--অনুভব করা যায়, বলা যায় না, কেননা বাগ্মিতা হবে।

অন্যদিকে এই অবসরে অন্তত দুবার দেখা হয়েছে মাধবী ঘোষালের সঙ্গে গীতা পাবকরের। গীতা পাবকর অর্থাৎ সেই স্বনামখ্যাতা সায়েন্সফিকশন-ধন্যা সিনেমার আধুনিকী ডোলরেস ডেলরিও, যে নাকি মার্কোস স্কোয়ারে ফ্ল্যাট রাখে। গীতা তাকে বলেছে, এর পর আমাকে আর ছেড়ে যেয়ো না। দ্বিতীয় বারে যখন মাধবী নিজে ফ্ল্যাটে ফেরার জন্য সোফায় উঠে বসল, গীতা তার পায়ের জুতো এনে দিল স্লিপার সরিয়ে জুতো পরিয়ে দিল, তা করতে গিয়ে মাধবীর পায়ের বিরল মেয়েলি রোমগুলির উপরে হাত বুলিয়ে দিল, মাধবীর হাঁটুর উপরে নিজের মাথা রেখে দু এক মিনিট থাকার

পর যখন উঠে দাঁড়াল গীতা, তখন তার ডাগর চোখদুটি বিরহের জলে ভরে উঠেছে সেকালের উপন্যাসে যেমন হতো নায়িকাদের।

দশটা বাজল। প্রবীর ডেস্ক থেকে উঠল। স্টাইলই আসল কথা। অর্থাৎ গদ্য তৈরি করা। তাতে কি ছবির মতো ওয়াশ পদ্ধতি চলে? একটু হালকা যেন করা দরকার। বাঁধুনি বুনোটকে একটু ফাঁক ফাঁক করতে হবে, সেকালের খদ্দরে সুতোগুলো একটু অসমান আর বুনোট একটু ফাঁক ফাঁক থাকতো না? বরং নতুন করেই লিখবে। কী লাভ কিছু বলে যদি ভালো করে বলাই না হল!

প্রবীর সুতরাং চাঁপা গ্যাবার্ডিন ট্রাউজার্স পরল পছন্দ করে, জামা পছন্দের ব্যাপারে প্রায় লাল রঙের সার্জের ফ্রক কোট। গোটিতে আজ যেন দু তিনটি সাদা দাড়ি দেখা গেল হঠাৎ, এর আগে দেখা গেছে মনে হয় না। সানগ্লাসে চোখ ঢাকল, এখন সে খানিকটা রোদ লাগাতে চায় গায়ে।

ব্লকের নিচতলা থেকে সিঁদুর রঙের সেই গাড়িটাকেই পছন্দ করল সে। লগবুকে সই করে পথে বেরিয়েই সে মনস্থির করে ফেলল। দেখা যাক, দেখা যাক এই এতদিনেও কি গোছানো শেষ হয় নি? কী আবার? ওল্ড চৌরঙ্গীর সেই নিওব্যাবোক ছবির প্রদর্শনী। হয়েছে নিশ্চয়ই, এতদিনে প্রদর্শনীব মাঝ-বয়স হওয়ারই কথা। ভালোই লাগবে। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা কার্টিলেজ মচকে গেল, মনের যদি তেমন উপাস্থি থাকে। ছবিটা কি হাতছাড়া হবে? অন্যদিকে হাতছাড়া বলার যুক্তিই বা কি? মনে মনে কারো আকাঙ্ক্ষা অনেক দূর এগিয়ে গেলেই তাকে হাতে আসা বলে না। ছবিটা প্রায় এই এক মাসে প্রথম দেখাব পর থেকে প্রবীবেব মনে বেড়েছে।

প্রবীর সাণ্ডেল সুতবাং তাব সিঁদুব রঙেব ট্যাক্সিকে অভ্যস্তর চাইতে বেশি (প্রায় দশ কি. মি, ঘণ্টায়) গতি দিল।

চরিত্রগুলোকে এক সঙ্গে আনাব এই এক সুযোগ জুটে যাচ্ছে। চিত্র প্রদর্শনীর যেদিন বেলা দশটায় রোঁয়াওঠা লায়ন-সদৃশ চিত্রপবিচালক পীযূষ প্রভৃতি কযেকজন ছাড়া সকলকেই প্রায় উপস্থিত করা যাচ্ছে। সোম দম্পতি (বেলা এবং সুরথ), কলকেতার পুবনো বিশ্ববিদ্যালযের বাগীশ্বরী বক্তৃতাদানরতা নর্তকী মিত্রা, তাব কাজন শান্তনু, তাব গ্যাল (এখন কলকেতায় ডেট-যুক্ত বান্ধবীকে গার্ল না বলে গ্যাল বলা হচ্ছে) গাড্ডুড সুডাব, সাংবাদিক (সংবাদ সিণ্ডিকেটের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) ভূদেব সমাদ্দার, অপরাধবিজ্ঞানী ভূধর স্যান (ভূধর ও ভূদেব দেখা হলেই কথা কাটাকাটি করে, তার দরুণ গোরা-বিনয় এই অপবাদ আছে তাদের), গীতা পারকর ও মাধবী ঘোষাল এবং শেষে একা রাজেন। প্রবীর সে দিকেই যাচ্ছে। নতুন একজনকে উল্লেখ করছি। তিনি আধুনিক ঋত্বিক, সংস্কৃতি-মন্ত্রী অলীক মুখুয্যে। তারা একত্র হয়েছে বলেই দৃশ্যটা বর্ণনীয়।

প্রবীর সাণ্ডেল খানিকটা বোদ গায়ে লাগাতে চায়, নভেম্বরের রোদ, যা বেলা দশটাব পরে কলকেতায় আরামপ্রদর চাইতে তীক্ষ্ণ, কিন্তু বিশেষ একটা ছবির কথা তার মনে পড়েছে। ক্রস থেকে নামানো হচ্ছে যিসাসকে, আখের ক্ষেত ও ক্রিকেটনেটের আভাসযুক্ত, প্যালেস্টাইনের চাইতে বরং কালচে সবুজ পটে ; কম্পোজিশনে যাদের দর্শিকা বলে মনে হয় তারা ক্রিওল রমণী, একজন অন্তত গর্ভভারাতুরা, কারো মুখে যেন স্পানিশ-হলুদ ছাপ আছে; যদিও তাদের গায়ের রং যেন মেটের চাইতেও বরং কালো , আর সব মিলে যেন এক কম্পোজিশনই, রেখাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দিয়ে আবেগ ; আর সেই কালচে সবুজ, মেটে, মেটেকালো, নীলের ছোঁয়াচ লাগানো মেটের মধ্যে যিশাসের রক্তের মতো লালের ছোঁয়া। কোথায় কতটুকু কোন রঙ তা যদি কথা সাজিয়ে বলাই গেল তবে ক্যানভাস আর তেল রং কেন? এ রঙগুলি কি সচেতন বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায়? ভাবল প্রবীর।

বেলা এই প্রদর্শনীর পেট্রনদের একজন। এবং বেলা সোম, আপনারা জানেন, সোসাইটির ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। কাবণ এটা তাব নিজের অনুভূতি-সমর্থিত মত যে এমন সব ব্যাপারে উদাসীন

থাকাতেই কলকেতার নেক্রপলিসের মনোভাব গড়ে উঠছে। সুরথকে তার বিবেক পীড়া দিয়েছে। বেশ কিছুদিন, সে গত কয়েকদিন থেকেই অনুভব করছে, বেশ কিছুদিন, সে অন্যায়ভাবে বেলাকে তার প্রাপ্য দিচ্ছে না। প্রয়োজনের নয়, বেলা একাই সমাজে অক্লেশে ভাসমান ; কিন্তু দম্পতির পুরুষপক্ষ হিসাবে চুরুটের কড়া গন্ধ, বেমক্কা পুরুষ-রসিকতা এবং উচ্চগ্রামের হাসি নিয়ে বেলার পেছনে তার থাকা উচিত। খুবই উচিত, কেমন কিনা?

গার্টুড ও শান্তনু কাল ডিনারের আগে ম্যাটিনিতে গিয়েছিল। আনা কারেনিনা পছন্দ করেছিল গার্টুড, সেই পুরনো আনা এবং তলস্তয়েরই, তবে নতুন প্রযোজনা। গার্টুড বলেছিল : আচ্ছা, স্যান্টায়ানা, বলো রোমিও-জুলিয়েট ছাড়া আনা কারেনিনার কি তুলনা আছে? কেমন এক অন্ধ নিয়তি, কিংবা নিয়তি কথাটা ঠিক হল না, অনিবার্যতা বোধ হয় বলা উচিত। নতুবা সব দিক দিয়ে—

শান্তনু বলল, আমি শুনেছি এ রকমের আর এক তুলনা, হ্যামলেট আর ব্রাদার্স কারামাজব।

জানো, স্যান্টায়ানা, এগুলোই আমার প্রিয় বই। একজন একাই দুখানা—রোমিও আর হ্যামলেট আর পৃথিবীর অন্য সেরা দুজনে অন্য দুখানা। আনা কারেনিনা আর ব্রাদার্স ক্যারামাজব।

সুতরাং তারা আনা কারেনিনার টিকিট কিনেছিল। কিন্তু একটু অসুবিধা ঘটল। নায়ক (ব্রনস্কি নাকি?) যখন ন্যুড আনাকে একটি একটি কবে আঙুর খাইয়ে দিচ্ছে (এটা কোন প্ররোচকের কীর্তি আমার জানা নেই, কিন্তু ওরা যখন দেখেছিল তখন এরকম দৃশ্য ছিল স্বীকার করছি) হঠাৎ শান্তনু গার্টুডের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, বাইবে যাবে?

কেন?

আক্!

শেষ পর্যন্ত বাইরে যায় নি তারা, কারণ দৃশ্যটা তখনই বদলে গিয়েছিল কিন্তু ডিনারে আবার কথা হল।

গার্টুড একবার সল্টসেলাব টানল, একবাব তোয়ালে দিয়ে চিবুকটা মুছে নিল।

বলল, আপত্তি কেন? ন্যুড বলে?

হ্যাঁ।

পৃথিবীর সব সেরা ছবিগুলোর কয়েকটি কিন্তু ন্যুড।

কিন্তু, কিন্তু, বাঃ, ন্যুড নড়লে বডি হয় না?

মানে? ও! তা বডি কি সুন্দর নয়? ঝিকমিক করল গার্টুড। গার্টুডের মুখের থেকে চোখ নামিয়ে প্লেট থেকে রুটির কুচি কুড়িয়ে আঙুলে গুলি পাকাতে পাকাতে শান্তনু বলল, বডি কি আর্ট? আমি ঠিক, কিন্তু শোন, আচ্ছা হ্যামলেট তো তোমার প্রিয়, বলো, যদি গদ্যে হতো? ল্যামের মতো গদ্যেও তো লেখা আছে গল্পটা, তা কি হ্যামলেট? কবিতার ভাষাও কি হ্যামলেটের অংশ নয়? ন্যুড আর বডি কি এক? রং নেই? রং ছাড়া কি ন্যুড হয়? রং মানে কবিতার ভাষা। মনে করো—

গার্টুডের চোখ দুটো শান্ত এবং উজ্জ্বল হল। এ যেন গুণবানের আর একটি গুণ আবিষ্কার। কিন্তু তার মুখে একটা দুষ্টু হাসি যার খানিকটা খোঁচানো, খানিকটা বা সস্নেহ, খেলা করে গেল।

এরপর চিত্রের কথা হল। শান্তনু একেবারেই বক্তা নয়। সে যা বলল তা পাশাপাশি রাখলে এমন দাঁড়ায় : গঁগা, কেমন? পল গঁগা। সেগুলি কি বডি নাকি? রং আর কম্পোজিশন নয়? বডির তো রেখা থাকে, সে রেখা রঙে মুছলে তবে ন্যুড। আসলে খানিকটা অনুভূতি, ক্যানভাস না হলে বলাই যেতো না।

উঠে দাঁড়িয়েছিল শান্তনু খেতে খেতে। ট্রাউজার্সের পেছনের পকেট থেকে একটা কোণা-তোবড়ানো ভাঁজ-পড়া কার্ড বার করল, কার্ডটা বরং রাখো, টুডি, কাল যেয়ো দশটায় ওল্ড চৌরঙ্গী প্রদর্শনীতে যদি তা ভালো লাগে।

হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়েছিল গার্ট্রুড। সম্মুখে তখন ডিনার আর শান্তনু ; কে তাকায় কার্ডের দিকে? ডিনার শেষে বেরোতে বেরোতে একই মুঠোয় ধরা কার্ড, বিল, খুচরো পয়সা ব্যাগে পুরতে পুরতে সে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তুমিও আসছো তো—বেলা দশটায়?

একটু অসুবিধা ছিল। অধ্যাপক কার্ল স্নুডার তার কর্মস্থল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালযে ফিরে যাবে সকালের প্লেনে, কাজেই ডিনারের পরেই গার্ট্রুড হোটেলে ফিরেছিল। আগে থেকেই কথা ছিল, রাত্রে সেটা ঠিক হল। সুইটটা আরও একমাস থাকবে তার নামেই। ইতিমধ্যে গার্ট্রুড আব একটু বাংলা শিখে নিক। ক্রিস্টমাসে বরং অধ্যাপক ফিরে আসবে কলকেতায। সুতরাং সকালেব প্লেনে তুলে দিতে গিয়েছিল গার্ট্রুড বিপত্নীক পিতাকে।

এরোড্রোম থেকে ফিরতে ফিরতে ট্যাক্সিতে বসে কার্ডটাব কথা মনে হল তার। কালকের আর্ট সম্বন্ধে আলাপে, স্যান্টায়ানাকে অত্যন্ত শার্প মনে হলেও, সে যে ভুলো মনেব, এমন একটা মমতায়ুক্ত ধারণা হচ্ছে তার। অন্তত এখন তাই মনে হচ্ছে না তার কথা ভাবতে গিয়ে? কার্ড তো সেটা? ব্যাগ হাঁটকাতে হাঁটকাতে ভাবল—রাখবার কী ছিরি? হাসল সে। কিন্তু খুঁজে পেয়ে পড়তে গিযে রাবাবস্ট্যাম্পের গোল ছাপটা দেখে অবাক হল। কনট্রিবিউটার্স কার্ড—ওয়ান গেস্ট এলাউড। ভারি কৌতুকের তো! কার বা গেস্ট হয়ে গিয়েছিল ছবি দেখতে। রাস্তায় কুড়িয়ে পায নি তো?

মিত্রাব আসাটা যেন কেমন আকস্মিক। একাই এসেছে সে। মনে হতে পারে যেন বাইবের লোক, হাতে সময় পেয়েছে, কলকেতায় চিত্র প্রদর্শনী দেখে যাচ্ছে।

গীতা ও মাধবীর বেলা দশটাতে আসাও নেহাৎ যোগাযোগ। যদি না গীতাব সিগারেট কেনার কথা বলতে হয়। সে থাকে মার্কোস স্কোয়াবে, কিন্তু সিগাবেট কেনে ওল্ড চৌবঙ্গীব এক ফিরিওয়ালার কাছে। একশো বছবেও নাকি টাইপটা বদলায় নি, সেই মাথায সাদা লেসের টুপি, পরনে লুঙ্গিব ওপবে আধময়লা মলমলেব পাঞ্জাবী, চোখে সুরমা। সিগারেটে মারিউআনা। গাঁজা বললে সহজ হয়।

ডক্টর অলীক মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতিমন্ত্রী এসেছে উদ্যোক্তাদের ডাকে। শ্রেষ্ঠত্বের পুবস্কার দেয়া হবে। বিচারকদের মুকুটমণি মন্ত্রীমহোদয়। সে অবশ্য ছবি না দেখেও বিচারসভার নেতৃত্ব দিতে পারে। কাবণ কলকেতায় এ বিষয়ে একটু সেকেলে ভাব আছে, ছবিব প্রদর্শনীতে দর্শকদের মন্তব্যের খাতা আছে। সেখানে সকলেই মন্তব্য লিখতে পারে, সব দর্শক অর্থাৎ জনতা। তাদেব মন্তব্যেব যোগফল থেকে ছবিগুলোব গুণাগুণ নির্ণয ক'রা হয়ে থাকে। তা করে পার্টির ওরা এবং তা ঘোষণা করে সংস্কৃতিমন্ত্রী। এ ধারাই কলকেতায় চলে আসছে। কাজেই ডক্টর অলীক মুখোপাধ্যায় জ্ঞানী লোক রূপে (তিনি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট শুনেছি) চিত্রের বিচারকদের নেতৃত্ব দেবে, এ একরকমের অনিবার্যতা। এবং এটাও অনিবার্য যে মন্ত্রীরা কখনও কখনও ছবি দেখতে এসে পেডেরাস্ট বলে চেঁচাবে। কিন্তু ঘোষণা করার জন্যে তো নিজে আসতে হয় না, নিজে ছবি দেখতে হয় না। তবে সে নিজে এসেছে কেন? সংবাদপত্রের কোন এক মন্ত্রীমহোদয়ের সেই যুবতী–মধুচক্রের সংবাদ মনে করুন। কোথাও যদি খুন হয় আর কাছাকাছি যদি কেউ গা-ঢাকা দেয় তবে তার ওপরে সন্দেহটা বর্তায় না? সুতবাং এখন মন্ত্রীমহোদয় মাত্রেই আরও বেশি সপ্রকাশ হওয়ার সব সুযোগ নিতে চাইছিলেন। সংবাদটা ঠিক কোন মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে তা বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং সংবাদটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনাবই নয়। আর সংবাদটার লক্ষ্য যদি সে হয়, তবে যাকে নিয়ে তার কেলেঙ্কারি রটতে পারে তাকেও সে আসতে বলেছে। সুযোগ হলে কথাও বলবে। সেবকম সারল্য কি নিষ্পাপেব লক্ষণ মনে করে না লোকে? অবশ্য লোকের বলা? ওরা বলে? কী বলে? বলতে দাও।

ওদিকে সাংবাদিক ভূদেব সমাদ্দার আঁচ পেয়েছে। এখানে মন্ত্রীমহোদয়ের ফটো উঠবে। যদি সেই মেয়েটার কাছাকাছি দাঁড়ানো অবস্থায় কোন ফটো উঠে যায় তবে সে ফটোটা থেকে প্রয়োজন মতো অন্য কম্প্রোমাইজিং ঘটনার ফটোস্টাট তৈরি করা যাবে। প্রমাণটা মিথ্যা হবে? সাংবাদিক

ভূদেব সমাদ্দার জানে—সে ছাড়া কে বেশি জানে? —সাংবাদিকতা অর্ধসত্যের অন্য নাম : সত্য যাকে বলি অধিকাংশ সময়েই তো সাজানো ঘটনা ছাড়া প্রমাণ হয় না।

ভূধর স্যান ভূদেবের বন্ধু হিসাবে একটা কর্মহীন দুপুর কাটাতেই এসেছে। অন্যদিকে সে মন্ত্রীমহোদয়ের কেলেঙ্কারি কে প্রকাশ করছে তা প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্তও বটে। সে সন্দেহ করছে ভূদেবই সে-সাংবাদিক। ভূদেবের চালচলনের ওপরে লক্ষ্য রাখার সুযোগ সে ছাড়তে চায় না। ভূদেবই কি এমন সুযোগ ছাড়বে? সে কি তার চেলাদের সঙ্গে দু-একবারও ফিসফাস করবে না? যদিও সে এসেছে এবারের এই নিওব্যারোক ছবির প্রদর্শনীর ওপরে ফিচার লেখার মালমশলা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এবং সেজন্যেই রাজেনকে সে আসতে বলেছে। তা ছোকরার দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনত্ব আছে। তার যে দুটি লেখা পড়েছে মন্দ লাগে নি।

রাজেনের খুব ভালো লেগেছে আসতে। এসপ্লানেডের কাছে সাবওয়ের ট্রাম থেকে উঠেছে সে। মনুমেন্টের পায়রার মৌচাকের পাশ দিয়ে হেঁটে আসতে তার অবাক লাগল—আর্লি লাইল্যাক নাকি সামনের ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডে? পুরানো কলকেতার সেই সিটি-ফাদারদের ধন্যবাদ দিল সে মনে মনে, যারা ইংরেজদের প্রতিমূর্তি সরাতে সরাতে হঠাৎ একসময়ে ট্রাম বাসের দিকে মন দিয়ে তাদের মাটির নিচে পাঠিয়েছিল, আর তাদের পরিত্যক্ত জায়গায় এইসব গাছে ভরা ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ড বসিয়েছিল। সাইমিয়া-ক্যাসিয়া জাপানিয়া-ক্রিপ্টোমেরিয়া, ইউক্যালিপট্যাস। তাদের, সেই গাছ-প্রেমিক লোকগুলোর, বংশধর হিসাবে রাজেন নিজেকে ক্যালকাটান বলতে গর্ব বোধ করে। রাজেন লক্ষ্য না করলেও, আমরা দেখলুম এক মাসে সে মনে মনে দ্বিতীয়বার এই মন্তব্য করল।

বাড়িটার সেমি-গথিক মুখপাতের ওপরে খড়ের বেড়ার বিভ্রম চাপানো। বস্তুত এটা খড় নয়, খশখশ। সামনে সিমেন্টের, আলপনা আঁকা টবে কলাগাছ। দেখা যাচ্ছে সেই নন্দালি এখনও চলছে।

প্রবীর ভেবেছিল, ঢুকেই সে দেখবে ছবিটা আছে কি না। আশ্চর্য। কত বেড়েছে ছবিটা তার মনে এই এক মাসে! কিনতে পাওয়া যাবে? কিন্তু সুবিধা হল না। রিসেপশ্যনিস্টদের দরজাতেই সে বেলার চোখে পড়ে গেল। বেলা বলল, আচ্ছা?

প্রবীর বলল, আচ্ছা বেলা. এক মিনিট, যদি কিছু মনে না করো—

বেলা বলল, কিন্তু প্রবীর—

কী কিন্তু? ও, আচ্ছা, আচ্ছা, তুমিও? বলল প্রবীর।

বেলার পেছনে সুরথ এবং তার একটু পাশের দিকে পেছনে মিত্রা।

কিন্তু বেলা বলল, মিনিট দুয়েকে মন্ত্রীমহোদয় ও নির্বাচকরা ঘুরতে শুরু করবেন, তুমি কি অন্তত তাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না?

প্রবীর মুঠো করে নিজের গোটি চেপে ধরল। পাশের সোফাটায় বসে পড়ল।

বেলা বলল, কী হল?

এইসব মন্ত্রীমহোদয়, আচ্ছা, বেলা মন্ত্রীমহোদয়দের সম্বন্ধে—তাদের সম্বন্ধে কী ধারণা তোমার ডার্লিং? আর্টোফবিয়া বলবে?

কথাটা কি ঠিক হল? সুরথ জিজ্ঞাসা করল এগিয়ে। আর্টোফবিয়া বলছো? প্রবীর চোখ তুলল।

তুমি এতো রাগ করছো কেন? বেলা জিজ্ঞাসা করল।

হায় বেলা, আমার মতো হতাশ পুরুষ এই মুহূর্তে এই কলকেতায় আর কেউ নেই।

বলল বেলা, কোনদিক দিয়ে এগোনো উচিত তা তুমি বুঝতে পারছো না প্রবীর। এজন্যই তোমার মনে হচ্ছে সামনে না যাওয়া লোকসান। এসো আমরা বসি।

প্রবীর বলল, এইজন্য আমার বিয়ে করা হলো না বেলা, যে প্রয়োজনের সময়ে তুমি কদাচিৎ সাহায্য করে থাকো। কী বলো? এদের কি ক্যাটালগও আছে, ছাপানো কিংবা হাতে লেখা? ছবির

ক্যাটালগ যাতে মার্জিনে দাম লেখা থাকতে পারে?

সুরথ সোম বলল, তুমি একখানা ছবি কিনতে চাও এই তো? কিন্তু বেলা, তোমরা বন্ধুর এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে যদি—

মিত্রা বসবার আগে রিসেপশ্যনিস্টদের টেবল থেকে এক কপি ক্যাটালগ তুলে আনল।

বেলা বলল, তুমিই ভেবে দেখো, প্রবীর। একটু টুরিজম ঘেঁষা নয়?

সুরথ সোম যোগ দিল, বিশেষ জাতীয় টুবিজমই বলতে হয়, প্রায় নতুন গোলার্ধের বলতে পারো। কিন্তু এখানে কি পিকাসোও আছে?

পাতা উল্টোতে উল্টোতে প্রবীর বলল, হাঁ, তোমরা একটু পিকাসো নিয়ে চালাও।

রিসেপশ্যনিস্টরা ক্যাটালগ আপ-টু-ডেট রাখার চেষ্টায় কয়েকটি ছবির পাশে দাম লিখে রাখলেও, অনেক ছবির পাশেই নট ফর সেল লেখা। উপরন্তু পিকাসোর, সেকালের পিকাসো্র আলোচনা যখন সেকালের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, প্রবীরের মনে হল চুবাশি নম্বব ছবিটাই হয়তো সেই ছবি। কিন্তু এই যদি তার বর্ণনা হয় তবে বৃথাই ছবিটা তার মনে বেড়ে উঠেছে। প্রবীর আবার ক্যাটালগ উল্টাল, মিত্রার আঙুলগুলো এবং বেলার কানবালার ছায়া-পড়া গালের ওপরে লক্ষ্য রাখতে রাখতে। নিওব্যারোক সম্বন্ধে উদ্যোক্তাদের মন্তব্য চোখে পড়ল।

প্রবীর স্বগতোক্তি করল, আক!

বেলা বলল, এখন তুমি এমন করছো বটে, প্রবীব। কিন্তু তখন মোবাভিয়া এবং পিকাসো অ্যান্টিফ্যাশিস্ট বলেই হৈচৈ, তা কিন্তু বলো নি।

প্রবীর ভাবল অন্যদিকে সুবিধা এই ছবিটার পাশে নট ফর সেল লেখা। বলল, ও হ্যাঁ, মোরাভিয়া। কে যেন প্রথম সেগুলিকে বাংলাভাষায তর্জমা করছিল?

বেলা হেসে বলল, কলমটা আমারই প্রবীর, স্বীকার করছি ; প্রেরণা তোমার কিন্তু।

প্রবীর ভাবল, এটা ভালোই, নট ফর সেল লেখা, প্রদর্শনী জুড়নোর আগে আর দু-একবার দেখা যাবে। বলল, আমরা কাটিযে উঠেছি কী বলো? মোবাভিয়া এবং পিকাসোকে?

ঠিক এই সময়ে মন্ত্রীমহোদয় পারিষদ-আদি-সহ এসে পড়ল। অনেক জুতোব নানাবিধ শব্দ, অনেক সুপরিপাটি উভয় সেকসেব পোশাকের ঝিলিক এবং ঝলকানি, মন্ত্রীমহোদয় সস্ত্রীক (সংবাদপত্রের প্রচার কী মিথ্যা!), গীতা পাবকল, মাধবী ঘোষাল (ঠিক এখন কোন তারকা এমন উজ্জ্বল আর!), এখানে ওখানে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। ঢেউএর মাথা এবং শেষই, তা সমুদ্র কিংবা প্লাবনের হোক, চোখে পড়ে ; মাঝখানটা একটা নামহীন বর্ণনাহীন স্ফীতি। ঢেউটার শেষ দিকে প্রবীর ও সুরথ ভূধর স্যানকে দেখতে পেল। ভূধরের পাশে ভূদেব সমাদ্দার।

রিসেপশ্যনিস্টদের ঘরে দাঁড়িয়েই বলল ভূদেব, বুঝলে স্যানমশাই, চল্লিশ একটা বয়স যখন কোমর পেতিবুর্জুয়ার মতো নিজের ডিয়ারনেস এলাউন্সের বৃদ্ধিকেই সমাজবাদ মনে করে থাকে। সুতরাং আমি বসছি।

ভূধর বলল, ও।

সে ভাবল, অত সহজে ধরা দেবে না ভূদেব, যদি সে-ই মন্ত্রী মহোদযের কেলেঙ্কারি উদ্ঘাটন করে থাকে। বসলেও ক্ষতি নেই, কারণ বোঝা যাচ্ছে এখানে যদি ভূদেবের কোন ট্র্যাপ থেকে থাকেও সে যন্ত্রের সুতো আছে অনেক দূরে। আর তা ছাড়া এটা, সংবাদপত্রে প্রচারিত এই কেলেঙ্কারি, প্রকৃতপক্ষে যদি মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে না হয়ে এই এক মন্ত্রীমহোদয়ের বিরোধীই হয়ে থাকে, তবে তাকে খুব বেশি করিৎকর্মা না হলেও চলে। কেননা এই অনুসন্ধানে মন্ত্রীমণ্ডলীর আগ্রহ নির্ভর করবে পার্টিতে অলীক মুখুজ্যের অবস্থানের ওপরে, অন্য কথায় তলে তলে তার পায়ের তলায় মাটি কতদূর সরিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং কে তা সরিয়ে দিচ্ছে তার ওপরে। (ভূধর আত্মসমীক্ষা

করল না। তা হলে সে বুঝতো ব্যুরোক্র্যাট হিসাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর এবং সাধারণভাবে পার্টির ওপরে তার শ্রদ্ধা থাকলে—কারণ, না থাকলে কাজ কবাই যায় না—যে কোন মন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে পৃথক করে নেয়া মাত্র সে অকিঞ্চিৎকর মনে করে।)

সুতরাং চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে প্রবীর সাণ্ডেলকে দেখে বরং খুশি হল। বলল, এসো সমাদ্দার, আমরা পরস্পরের পরিচিত হই। ইনি প্রবীর সাণ্ডেল, এবং ইনি সুরথ সোম, আর ইনি ভূদেব সমাদ্দার। আশা করি নামই যথেষ্ট পরিচয়। আর ইনি রাজেন, আমাদের তরুণ বন্ধু, দর্শনের ছাত্র। প্রবীর এদিক থেকে বেলা সোম ও মিত্রা বসুর পরিচয় দিল।

বাজেন এবং প্রবীর এই সময়ে পরস্পরকে দেখল। দুজনের মুখে গোটি। বয়সের পার্থক্য আর বঙে পার্থক্য। এটুকুই সাদৃশ্য। নতুবা, যেমন হয়ে থাকে, এই তিন দশকের স্টাইলিস্ট পরবর্তী তিন দশকের স্টাইলিস্টকে চিনতে পারল না। রাজেন একবার জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বড় করে প্রবীরকে দেখে নিল।

সিগারেট কেসগুলো বার হলে প্রবীর বলল, খুব খানিকটা বাজাব পর রেডিও বন্ধ হলে, সেই নিস্তব্ধতা যেমন ঠাণ্ডা, তেমন গভীর, তা নয়?

ভূধর বলল, কিন্তু কতক্ষণই বা তা, দুই প্রোগ্রামে কতই বা তফাৎ সময়ের?

ঠিক তাই, ঠিক তাই। আমাদের সে সুযোগ নেয়া উচিত। বেলা হেসে বলল, দুই উচ্চ চাপের মধ্যে যে চাপহীন বায়ুবলয় থাকে, অর্থাৎ মন্ত্রীমহোদয়ের কিছু পেছনে পেছনে চলে ছবি দেখা সেবে নেয়া ভালো।

রাজেন বলল, কারণ নিম্নচাপের পিছনে সাইক্লোনিক কিছু থাকাও অসম্ভব নয়।

ভূধর ভাবল, বেশ বলে ছোকরা। দরজার বাইরে ভিড়টা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। হয়তো খবরটা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ছড়িয়ে গেছে নয়, যে মন্ত্রীমহোদয় আসছে। জনতার করতালিই সমালোচনার প্রতিষেধ, কী এমন আব?

সুতরাং, বলে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। হযতো প্রবীর এবং সুরথ প্রথম, তারপর সকলে।

একটা যোগাযোগের ফলে সোমদম্পতি, প্রবীব, মিত্রা, উভয় ভূ-আদ্যাক্ষর এবং রাজেন ভিড় থেকে পৃথক এক গ্রুপ হয়ে ছবি দেখতে অগ্রসর হল।

এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে তারা এগিয়ে চলল। নানা রকমের ছবি। খুদে খুদে প্লাস্টিকের ফলকে লেখা ছবির নাম, নম্বর, চিত্রীর নাম। বলা বাহুল্য এদের পক্ষে ছবির প্রদর্শনী এই নতুন নয় ; এবং নোটিস খুঁজে দেখছি গতবারও অন্তত এই সময়েই প্রদর্শনী হয়েছিল ছবির এবং এরকম গ্রুপে না হলেও প্রবীর প্রভৃতি প্রদর্শনীতে এসেছিল। ছবি দেখার নিখুঁত পদ্ধতি এদের জানা আছে।

কিন্তু এক সময়ে প্রবীর বলল, আচ্ছা, সোমসাহেব, মেয়েরা শুনছেন না, বলো মন্ত্রীমহোদয়ের কি মেটে মেটে চেহারার গর্ভবতী স্ত্রীলোকে আকর্ষণ থাকতে পারে, তাও যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখা পবিষ্কাব, শার্প না হয়?

সুরথ বলল, অর্থাৎ?

তোমার কি মনে হয় না যে মন্ত্রীমহোদয়েরা যেন কোন ছবিতেই এসব ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না?

তা তুমি এটায়, একে চার ধরতে পারো।

এটাই আশ্বাস, এটাই আশ্বাস। প্রবীর বলল।

এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়ার এক প্যাসেজের দেয়ালে খানকয়েক ছবি। তার একখানাকে লক্ষ্য করে সুরথ বলল, এটাতেও গর্ভবতী স্ত্রীলোক দেখছি বেডৌল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের।

এটাই নাকি! হ্যাঁ, এইটি। প্রবীর বলল।

হেসে বেলা বলল, আমাদেব টুরিস্ট কি এটাকেই কিনতে চায নাকি?

ভূদেব বলল, কিন্তু যিসাসের রং কি ওরকম কালচেপানা ছিল? আর তা ছাড়া কাবো হাত মোটা, কারো ঘাড় উঁচু, গায়ের এক জায়গার রং অন্য জায়গা থেকে পৃথক।

দলটা ছবির নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। প্রবীব একহাতে অন্য হাতের আঙুলগুলোকে মোচড়াল। যেন কিছুকে চেপে দিচ্ছে। তার মুখে একটা হাসি ফুটল।

ভূধর ভাবল, অবশ্য ভূদেব সমাদ্দার, তার টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্র সারানোব হবিই প্রমাণ, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রয়োগ-মেলের লোক। কিন্তু এদিকে প্রবীর, না, অসম্ভব, হয়তো সে মার্নবিকী সংস্কৃতিরই, তাই সম্ভব ; কিন্তু তাই বলে কি, একি সম্ভব, যে সেই ক্ল্যাসিকভঙ্গীতে ছবি দেখা হবে? রেমব্রান্টের ছবি দেখা থেকেই শুরু, কোথাও কোথাও মানবিকী সংস্কৃতির এবা ছবি দেখার ঘরে শীর্ষাসন করে ছবি দেখে। সে নাকি এক নতুন কোণ থেকে দেখা। বেলা বলল, এই ছবিই নাকি প্রবীর?

ছবিটার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে অধীব রাজেন বলল, ছবিটা সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

বার্থডে সুলভ ভঙ্গিতে বলল প্রবীব, আ, বেলা সোম, এজন্যই, যদি তা বলো আমার তোমাব সম্বন্ধ ব্রাদার-সিস্টার হয়ে বইল।

মিত্রা হাসল ঝিকমিক করে। তার সোনার ফ্রেমেব চশমা, পিঠের ওপব দুভাঁজ করে জালের থলেতে ঝুলিয়ে বাখা চুল, প্রায সাদা এমন গোলাপি লিপস্টিকে আঁকা ঠোঁটে তাকে ঝিকমিকের চাইতেও তৃপ্ত মনে হল।

ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ তখনও এই গ্রুপটি চুরাশি সংখ্যক ছবিখানাব নিচেই, ওদিক থেকে প্রায় উল্টো পথে শান্তনু ও গার্টুড ঢুকে পড়ল। হয়তো তারা মন্ত্রীমহোদয়দের উদ্বেল স্রোতেব চাপে কোন বিপরীতমুখী অবহেলিত খাড়িতে পাক খাচ্ছিল এতক্ষণ।

বেলা বলল, এই যে শান্তনু।

শান্তনু চোখ তুলে চাইল, কিন্তু ছবিব সম্মুখে গ্রুপটিকে দেখে হঠাৎ যেন লজ্জায় লাল হযে উঠল। ছুটে পালাল সেই ঘব থেকেই।

বেলা হেসে বলল, হরিণ যেন।

মিত্রা বলল, একজোড়া হবিণ, কেমন মানিয়েছে, তাই নয়!

এ ছবিটার পর অন্য ছবিগুলোও দেখল তাবা। একঘবে দাঁড়িয়ে, সেটা ঘোড়াব ঘর, তারা খানিকটা আলোচনা করল গত বছরের প্রদর্শনী সম্বন্ধে। সব ঘোড়া একজনের নয়, অনেক চিত্রীব সেই লাখ লাখ ঘোড়ায় দেয়াল ঢাকা। পোস্টকার্ড সাইজেব স্কেচ থেকে, লাইফ সাইজ তেলরঙে সাদা ঘোড়া ও একটি প্রজাপতি। কিন্তু ঘোড়া কি এত হিংস্র হয? তার দাঁত কি এমন অসংখ্য, এমন ধারালো কিউবাযেড, অথচ তাব লম্বা চো:'়লের সবটুকু, স্ফীত শিরা সত্ত্বেও, ভেলভেটের মতো কী নরম চামড়াতেই না ঢাকা থাকে। লাল, সিপিয়া ও গ্রেব সেই কম্পোজিশনের তলায় লেখা লাল ঘোড়া।

ভূদেব সমাদ্দার বলল, গতবারেও কি ছিল?

হুঁ, তা, না, বোধহয, বলল সুবথ, জলরঙে আর ছোট সাইজে ছিল।

ভূধর বলল, তা হলে এক বছরে আরও বেড়েছে চিত্রীর মনে।

তারা যে আলাপ করল তা সব উদ্ধৃত করলে আরও অনেক সময় লেগে যাবে। যদিও সে সব উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ কেউ বলল, দাঁতগুলোয় পিকাসোর ধাঁচ নয়। কিন্তু থাক সেকথা। সময় এখন দশটা থেকে এগারোটা হবে। উত্তাপ জমেছে বাতাসে। তীক্ষ্ণ লাগছে। খটখটে শুকনো আভাস। এই অনুভূতিটাই প্রবীরের সব চাইতে প্রিয়। পরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বেলা বলল,

ফয়েতে বার আছে।

তা হলে আর কথা কী? বলল ভূধর।

আর এ কয়েকটি ঘর ঘুরে ঘুরে যদি আমরা ফয়েতে না পৌঁছই, বলল ভূদেব, বুঝতে হবে উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা আছে, একজিকিউশন নেই।

যথারীতি তারা আলোচনা করে চলল ছবি সম্বন্ধে। দেখা গেল পিকাসো প্রিয় নয় বেলার। তার জীবনী যা নাকি তার মিসট্রেস-ছাত্রী-সন্তানের জননীর লেখা, তার কথা উঠল। পিকাসো, সে ছাড়া কে? নতুবা শিশু যখন হাঁটতে শিখছে মায়ের হাত ধরে তখন বিল সাইকস আর পাবলো পিকাসো ছাড়া কে পাবে মায়ের মাথাকে হাতুড়ি দিয়ে থেবড়ে দিতে? কিংবা কার কল্পনায়, পিকাসো ছাড়া, অমন শিশু আসবে? কারণ কঠিন অনিবার্য এনকেফেলাইটিস ছাডা কি শিশুর স্কাল অমন দোমড়ানো বাঁকানো তরমুজ হয়?

সুরথ বলল, আ, বেলা, সেই মিসট্রেস পিকাসো-হেন মডার্নিস্টের ছাত্রী এবং সেক্রেটারী, সুতরাং যথেষ্ট আধুনিক হলেও হয়তো অন্ধ এক রমণীয়তায় সেই অবিবাহের কোন সন্তানকে হাঁটতে শেখাচ্ছিল পিকাসোর বাংলোর হাতায়!

প্রবীর বলল, আর পিকাসো তা দেখে থাকবে। আর তখন সেই মা ও ছেলের সম্বন্ধে তার মনে যা করবার আগ্রহ উঠেছিল, তাই ছবিতে ফুটছে।

রাজেন বলল, সর্বনাশ! হো হো করে হেসে উঠল।

প্রবীর হেসে বলল, তাই নয়? আর্ট সম্বন্ধে এরকম মত আছে না? যে শিল্পীর নিজেব জীবনেব ছায়া পড়ে শিল্পে।

এ আলাপে অবশ্যই অ্যান্টি-মডার্নিস্ট নিওব্যারোক ঝোঁকটাই আছে। ফয়েতে গিয়ে উপস্থিত হল তারা এই আলোচনা নিয়েই। ফয়েতে বার। নানা পানীয় ছাড়া স্ন্যাকসও আছে। উপরন্তু হোটেলের মতো সাজানো নয়। বরং অর্ধসমাপ্তি এবং অসুবিধার ছোঁয়াচ থাকায় পিকনিকের আভাসযুক্ত। দামের কথা শুনে ভ্রু তুলেছিলুম। পরে বুঝলুম পরিকল্পনাই এই : প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বাজারের চাইতে চড়া দামে পানীয় বিক্রি করে প্রদর্শনীর সম্ভাব্য ক্ষতি তুলে নিতে চাইছে। সেজন্যই ওয়েট্রেসরা এয়ারহোস্টেসতুল্যা—সজ্জায় ও প্রসাধনে।

গ্রুপে সাতজন, প্রবীর, সোমদম্পতি, মিত্রা, দুই ভূ-আদ্য এবং রাজেন। ফয়েতে আরও পানীয়প্রার্থী অবশ্যই ছিল। তাদের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দুচারটে চেয়াব খালি। কিছু খালি আসন পাওয়া গেল একদিকে, কিন্তু সংখ্যায় খান দুয়েক কম পড়ল গ্রুপের পক্ষে। ভূদেব বলল, রাজেন তুমি বয়ঃকনিষ্ঠ, এদিক ওদিক থেকে দু একখানা হাতাও।

রাজেন বেশ ইনফর্ম্যাল হতে পারে। স্কিউজমি জাতীয় কিছু উচ্চারণ করে স্টিলের খান দু-এক চেয়ার বারবেলের ভঙ্গিতে শূন্যে তুলে নিয়ে এল। আর তার এই সাবলীলতায় যেন গ্রুপের মেজাজটা আরও একটু হালকা হল।

ভূধর স্যান বলল, রাজেনের মতো বয়ঃকনিষ্ঠরা সংখ্যায় ইদানীং কমে যাচ্ছে।

ভূদেব বলল, উঁ, তা, এ বিষয়ে কি তোমার কোন নির্দিষ্ট মত আছে, স্যানমশাই? ড্রাই মার্টিনি, কী বলো?

সুরথ বলল হাসিমুখে, মার্টিনি এবং ড্রাই। এখানে অবশ্য সাতে এক, কেমন কিনা?

প্রবীর বলল, কফি কি ভালো হতো না? তামিলদের আর কিছু কনট্রিবিউশন নাও থাকে যদি, এটা মানে কফি—

বেলা বলল, প্রবীর স্টক সম্বন্ধে তোমার মতামত জানার সুযোগ আমরা এখনও পাই নি কিন্তু।

মিত্রা বলল, কিন্তু বোর্ডে চক দিয়ে যা লিখেছে তাতে শেরি আছে সাইডারের পরে।

প্রবীর বলল, প্রকৃতপক্ষে ওটা কি এই কলকেতাতেই কানপুর-আগত ঝোলা গুড়ের তৈরি নয়, ওই শেরি?

বেলা হেসে বলল, আ, ফাদার, ওরা কি শুনছে না? তুমি বরং শেরির অর্ডারই দাও।

শেরির অর্ডার নিয়ে গেল ওয়েট্রেস।

প্রবীর বলল, আচ্ছা, ও আচ্ছা, কিন্তু কথাটা হচ্ছিল, সংখ্যায় রাজেনরা সাতে এক কিনা।

হয়তো তা নয়, বলল ভূধর, ওরা কমছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কলকেতার হিপিরা গড়-বয়সে আমেরিকানদের চাইতে বড় হবে। দেখা দরকার, কী বলো, সমাদ্দার?

সুরথ বলল, কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার আছে, কেমন কিনা? ওরা যদি কমে থাকে তবে ভেবে দেখা উচিত। ভেবে দেখা উচিত, তার জন্য আমাদের সাগুলের সুইফট আন্দোলন দায়ী কিনা।

মিত্রা বলল, ইনট্রেস্টিং!

ভূধর বলল, কয়েক বছর আগে গালিভার্স ট্রাভেলসের কয়েকটা দৃশ্য সাজানো হয়েছিল বটে মোমের পুতুল দিয়ে উত্তর কলকাতার নতুন আলবার্ট হলে।

ভূদেব বলল, ইকজ্যাক্টলি। সেই ডিম ভাঙার ছবি নিয়ে প্রায় নতুন করে ডিম ভাঙার ব্যবস্থা হয়েছিল অ্যাসেমব্লিতে। মনে পড়ছে গত বছর? না—

আগ্রহভরে রাজেন বলল, তিন বছর হল। কিন্তু প্রবীরবাবু কি সেই পুতুল সাজানোর ব্যাপারে ছিলেন?

বেলা হেসে বলল, কালে বীজ নিষেক করে যঃ পলায়তি। মিত্রা, সব পুরুষ মাকড়সা মরে না বোধ হয়, কী বলো?

মিত্রা বলল, স্ট্যাটিসটিকস নিলে বলা যায় হয়তো তেমন মাকড়সা কটা বাঁচে। কিন্তু প্রবীর কী করেছিলেন, বলো।

শেরি এসেছিল। ভূদেব খুলল।

সুরথ বলল, তেমন তেমন লিখিয়ের চারশতম জন্মদিন, দুশতম জন্মদিন এমন কি আড়াইশতম ইত্যাদি করতে দেখা যায় ; কিন্তু খুচরো, যেমন তিনশ বাহাত্তর বা দুশ একচল্লিশতম জন্মদিনের উৎসব শোনা যায় না, যায় কি? মনে হচ্ছে এরকম কিছু একটা, তা তিনশ একাশিতমও হতে পারে, প্রবীর যা পালন করার উদ্যোগ করেছিল ডীন সুইফটের ক্ষেত্রে।

বেলা বলল, আচ্ছা, প্রবীর, তুমি কি আগে থেকেই বুঝেছিলে সুইফটের জন্মদিন পালন করতে গেলেই গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী আসবে? আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-চেহারার এই বিদ্বেষভরা ক্ষুদে পতঙ্গগুলো, আর সে বিদ্বেষও লম্বায় অথবা চওড়ায় ডিমভাঙার মতো হাস্যকর বিষয় নিয়ে, তা মনে করিয়ে দেবে?

সুরথ শেরির স্বাদ নিয়ে বলল, তা, কিন্তু—

প্রবীর গ্লাসের ঠিক উপরে নাক রেখে ঘ্রাণ নিল ; মুখ তুলে বলল, কী কিন্তু?

সুরথ বলল, অবশ্য তখন খুব ডিম ভাঙাভাঙির ব্যাপার চলেছে, অর্থাৎ স্যানমশাই, আপনার মনে পড়বে, প্রকৃত সোশ্যালিজম নিয়ে তখন খুবই উচ্চকণ্ঠের আলোচনা চলেছিল, কেমন কিনা? অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ীভাবে গভর্নরের শাসনে নিশ্চিন্ত হওয়ার আগে।

ভূদেব বলল, সরকার থেকে সেই মোম প্রদর্শনী বন্ধ করা হবে, অথবা অপোজিশন পার্টির ভলেন্টিয়াররাই হাত লাগাবে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেমন বিরুদ্ধতা করা হাস্যকর হবে মনে করা হয়।

সুরথ বলল, পার্টির কাগজে প্রদর্শনীর আর্টগত দিকটাতে কিন্তু খুব ধিক্কার দেয়া হয়েছিল। সে

অবস্থায় তা স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক, কেমন কিনা?

বেলা বলল, কিন্তু আমার ধারণা সাণ্ডেলের লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। নইলে আয়ার্ল্যাণ্ডের শিশুদের ভাজা, সিদ্ধ, শূল্যপক্ব ইত্যাদি নানা রকম ডিশে পরিণত করলে তাতে যে আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষকদের খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব একই সঙ্গে দূব হতে পারে এবং নতুন নতুন খাওয়ার মুখের চাপও কমবে— সুইফটের এ প্রস্তাবের অনুবন্ধ করবে কেন প্রবীর?

ভূদেব বলল, সোমসাহেব, মনে হয় লেখা মাত্রই ফর্ম ছাড়া আব কিছু নয়। একটা স্বচ্ছপ্রায় কিউবযেড তৈরি করাই হয়তো উদ্দেশ্য লেখকের। আমরা. যারা পাঠক, সেই কিউবয়েডের বিভিন্ন অসমান মাপের তল নিয়ে, আব যেহেতু সেটা স্বচ্ছপ্রায তাব ভিতরেব আলোর নানা খেলা নিয়ে, অনেক আলোচনা করে থাকি।

মিত্রা যোগ দিয়ে বলল, সাধারণভাবে বলতে স্ফেরযেড্ও বলা যায়। নতুবা সে বিনীত প্রস্তাবে সুইফ্‌টের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল?

ভূধর বলল, এবং হযতো প্রবীববাবুও জানতো না তাব সেই বসিকতা (বসিকতাই না কথাটা?) জনসংখ্যা থেকে কম বয়সের শতকবা হার কমানোর দিকে কীবকম প্রবোচনা দেবে।

মিত্রা বলল, মন্দ নয় এদের শেরি, আচ্ছা. কিন্তু, কম বযসেব ওবা সত্যি যদি কমতে থাকে?

সুরথ বলল, ভালো খুবই ভালো। উত্তম বলা যায। যাদেব কোমবে বাত এবং ব্লাডপ্রেশাব, তেমন লোকদের শুধু যুদ্ধে পাঠালে, অর্থাৎ চল্লিশেব ওপাবে না গেলে, মানে অন্তত কর্নেল হওয়াব বয়স না হলে যুদ্ধে যাওযাব অনুমতি যদি না থাকে, সব যুদ্ধই, তা ন্যায কিংবা অন্যায় হোক, বিশ পনের মিনিট, তাবপবে অ্যাসমব্লিতে টেবল চাপড়ানব বেশি নয।

ভূধর ঠা-ঠা কবে হেসে উঠল।

প্রবীব বলল, কিন্তু—

তাব মুখের কথা কেড়ে নিযে বেলা বলল, সোম, সাণ্ডেল কিন্তু নিজের সঙ্গে সুইফটের দৃষ্টিভঙ্গিব পার্থক্যটাই প্রচাব করেছিল, যদি ভেবে দেখো।

প্রবীর বলল, না, না।

বেলা বলল, পার্থক্য নেই বলছো? তোমাব সেই থিসিসটা ভেবে দেখো। বিনষ্ট ভ্রূণ দিয়ে কোন কাজই হয় না ; তার চাইতে আর কিছুদিন লালন পালন কবে বিধিসঙ্গতভাবে হত্যা কবতে পারার সুযোগ সুইফ্‌টের প্রস্তাব অনুযায়ী বিশেষ অর্থকরী হতে পারে খাদ্যাভাবগ্রস্ত বাঙালির পক্ষে, এবকম কিছু বলেই, তারপর তুমি বলেছিলে এটায় তোমার সায় নেই। কারণ বলেছিলে, শিশুদের মেবে ফেলার ফলে সব মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে বিপ্লব হবে না, কারণ বিপ্লব হতে বুড়ো প্রবোচক এবং যুবক লড়াইবাজ দরকার। সুতরাং বিপ্লবের খাতিরে যুবকদের দরকার। তারপর তুমি বলেছিলে, বরং ফিপটিয়েথ বার্থডেতে প্রচুর পরিমাণে বারবিট্যুরেটস খেয়ে বেশ একটা সুন্দর আর্টিস্টিক ফিনিশে পৌঁছনো যেতে পারে। আর তা বার্ধক্যে বনং ব্রজেৎ-এর এক আধুনিক রূপ। তোমার প্রস্তাব ছিল, ছেলেমেয়েদের লালনপালন করা যেমন পিতামাতার অবশ্য করণীয়, পিতামাতাকে ফিপটিয়েথ বার্থডের এই আর্টিস্টিক সমাপ্তিতে পৌঁছে দেয়াও ছেলেমেয়েদের অবশ্য কর্তব্য। মৃদু সঙ্গীত ও ফুলের মধ্যে পঞ্চাশ পৌঁছনো পিতামাতারা চিরনিদ্রায় মগ্ন হবেন। এ বিষযে তুমি অ্যাসেম্ব্লি মেম্বারদের এমন পাকা আইন করতে অনুরোধ করেছিলে যাতে সংবিধানের নামে সুপ্রীম কোর্ট ঠোকরাতে না পারে।

বাজেন খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর একটু অবাক হয়ে যেন প্রবীরকে দেখতে লাগল। মিত্রা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল, হয়তো সে র‍্যাভিশিং বা তেমন কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভূদেব বলল, তা বেশ ভালোই। কিন্তু বোতলটা ছোট মাপের লক্ষ্য করুন। চার টেবলস্পুনে এক শেরিগ্লাস

যদি হয় এটায় আটাশ টেবলস্পুন কখন ছিল না।

ওয়েট্রেস কাছেই ছিল। আর এক বোতল শেরি দিয়ে গেল।

ফ্যাকাশে দেখাল ভূদেবের মুখ। ফঁ্যাশ করে সেকালের কায়দায় দেশলাই জ্বেলে চুরুট ধরাল ভূধর স্যান।

সে তো সমাজবিজ্ঞানেও কাজ কবে। বলল, বোধ হয় কথাগুলো একটা ফুটনোটের মতো ছিল সুইফটের সে বিনীত-প্রস্তাবের অনুবাদের নিচে, তাই নয়?

সুবথ বলল, সে রকমই মনে পড়ছে। কিন্তু না, বেলা, তুমি বড্ড ধারালো করে ফেলেছো। কিংবা তাই হয়। কাবণ প্রবীব আব তুমি এক নও। কথাগুলো প্রবীরের চেহারার সঙ্গে মিলছে কি?

বেলা বলল, সেসব ফুটনোট অবশ্যই প্রবীরের ভাষায়।

ভূধব বলল, তা বৈ কি। যেন গুছিয়ে বলে উঠতে পারছে না যেন বাঁধুনি নেই, এমন একটা ভাষা। কিন্তু কী ঘুষিটা!

সুবথ বলল, যেন শেরিতে ঠোঁট লাগাতে গিয়ে বরং তাকিয়ে বংটা দেখে নিচ্ছে, কিংবা শেরিগ্লাসটাব সামনে বসে গোটিতে আঙুল বুলানোই যেন বা আসল কাজ।

বিব্রত প্রবীর তাড়াতাড়ি শেবিব গ্লাস মুখে তুলল। নিজের স্টাইলের প্রশংসা বা বর্ণনায় সে যেন কোণঠাসা হচ্ছে।

ওয়েট্রেস বোতলটা খুলে দিল। মিত্রা দাঁড়িয়ে উঠে গ্লাসগুলো ভবে দিল। বাজেন অবশ্য গ্লাসেব উপবে হাত রেখে সেকালেব নেমন্তন্ন খাওয়ার কায়দায় তাকে আব দিতে নিষেধ করল। সে স্থিব করল প্রবন্ধটাকে খুঁজে বাব কবে ভালো করেই পড়তে হবে, ভাবল, এ তো খুব সহজ কথা, যদি সুবথেব এমন বলার ক্ষমতা না থাকবে সে কি করে প্রবীব সাগুলের বন্ধু হতো।

রাজেন বলল, যখন সকলকে শেরি দিয়ে মিত্রা বসেছে, আমরা কিন্তু ছবি দেখতে এসেছিলুম।

ভূধর বলল, তাই কি?

বলল ভূদেব, তাই কি?

সুবথ বলল, নইলে বলতে হয় রিচুয়াল। তাই উদ্দেশ্য, কেমন কিনা?

বেলা বলল, এটা এখন প্রদর্শনীব ঋতু বলছো?

প্রবীর বলল, হুঁ, তা ঋতু কিংবা মৌসুম, থিয়েটারের পর এখন ছবির, আমাদের এই কলকেতায়।

কিন্তু, রাজেন বলল, কিন্তু আমরা কি ছবির ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলাম না?

সুরথ বলল, রিচুয়ালে মানুষ বলি দেওয়া হতো, তখন তার চাইতে সিরিয়াস কী? তবু তা কিন্তু রিচুয়াল। না হলে মন খুঁতখুঁত, হলে কিন্তু লাভ কী?

প্রবীব বলল, কিংবা সকালের চায়ের কাপের সঙ্গে কাগজ পড়া, সেকালেব রিচুয়াল, একালের অনিবার্য অভ্যাস।

ঠিক এ সময়েই মিত্রা এক মুহূর্তেরও কম সময়ে বেলাকে কিছু বলল, আর বেলা তা শুনে অবাক হল। এমন অবাক যে বিস্ময় তার ঠোঁটে এবং চোখে কাঁপছে।

বেলা বলল, আচ্ছা, ফাদার, চুরাশি নম্বরই তো, তাকেই তো তুমি কেনার উপযুক্ত বোধ করছো?

সুরথ বলল, তা কিন্তু নট ফর সেল।

তা হলেও তোমাকে পাইয়ে দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে মিত্রা খোঁজ নিতে পারে। বেলা বলল।

আ, থ্যাঙ্কস্, বলল প্রবীব, থ্যাঙ্কস। অবশ্য. -

রাজেন কাউকে জিজ্ঞাসা না করে ব্যাপারটা নিজের মনে মিলিয়ে নিতে পেরে খুশি হয়ে উঠল। ফাদার বলল কেউ যেন প্রবীরকে। সেটা কি তার পোশাকের জন্যে! তা বটে, তা বটে, অত লম্বা ঝুলের প্রায় গেরুয়া ফ্রককোট। মিটমিট করে হাসল রাজেন।

সুরথ সোম খানিকটা শেরি নিয়ে বলল, হিআর্স টু এট্রিফোর।

কিন্তু মাঝপথে শেরি-সভা ভাঙল তাদের। প্রকৃতপক্ষে নিম্নচাপবলয় পার হয়ে এসেছিল সময়। বেলার মুখের দিকে চেয়ে সুরথ আন্দাজ করে পিছন ফিরল। ফয়ের দরজার কাছে বেশ একটা জনতাই যেন। মন্ত্রীমহোদয়ের উচ্চচাপ পরিক্রমার তুলনায় একে ঝড়ই বলা যেতে পারে।

সুরথ বলল, আরেকদিন তখন রিচ্যুয়াল নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ভূদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ডিসপার্স করা চাই এখন, কিংবা ডানকার্ক বলতে পারো। সুদক্ষ পশ্চাদপসরণ।

বেলা প্রবীরকে বলল ফিসফিস করে পাশাপাশি বেরোতে বেরোতে, ফোরম্যানিটি, দেখো মেলে কিনা। সব জামাতেই মেয়ের মুখ, আর মই, আর এটাই বোধ হয় একেবারে হালফ্যাশান, গলায় ঝোলানো এই সব লর্নিয়েট কিংবা আতস কাচ।

প্রদর্শনীর দরজায় নিজেদের গাড়িগুলোকে অন্যগুলো থেকে আলাদা করে নেয়া একপেটি জটপাকানো রেশমি সুতোব মুখ খুঁজে পাওয়ার চাইতেও কঠিন। সুরথের সাদা ঢাউস মার্সেডিজ তবু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রবীর বা আর কারো গাড়ি?

সুরথ বলল, ভোলা দত্তর কবিতা মনে পড়ে, বেলা?—ন্যাজে মার্সেডিজ বাঁধা মানুষের মতো সামনে আর পিছনে এদিকে আব ওদিকে ঠোক্কর খাই।

প্রবীর বলল, আচ্ছা, সোম, যদি ভেবে দেখো, তোমাকে দেখেই কি এই ইমেজ মনে এসে থাকবে?

এই সময় ভূদেব ও ভূধরের আলোচনা থেকে কলকাতার এক হাল সমস্যার কথা জানা গেল। ভূদেব অপরাধবিজ্ঞানী সাংবাদিক, ভূধর স্যান অপরাধবিজ্ঞানী। খোঁজ-খবব কে বাখে তাদের মতো, কিন্তু এমনই তর্কপ্রবণ যে সেকালের গোরা-বিনয়ের মতো গল্পকে থামিয়ে দিতে পারে। সুতরাং তাদের আলোচনার সারমর্ম বলি।

আমার কিন্তু ধারণা সমস্যা থাকাই ভালো, তাতেই মানুষের নব নব গুণাবলীব উন্মেষ হয় ; নতুন জীবিকাব সন্ধান পাওয়া যায়। কী বলা হবে এদের? ফ্রিল্যান্স ক্যাবি? কথায় বলে কলকেতার ক্যাবি। লণ্ডন, ন্যুইঅর্ক, মস্কোয়া, এমন কি টৌকিও, কোথাও এমন ধূর্ত ক্যাবি? কোথায় এমন রাস্তা সরু, যে রাস্তা নাকি নানা রাজনৈতিক ইলেকশন পৃষ্ঠপোষকতার চিহ্ন, হকার ইত্যাদির ধ্বংসস্তূপে সমাকীর্ণ? এখন এই ক্যাবিদের মধ্যে যারা সুপার আর্টিস্ট তাদের পক্ষে নিয়মিত কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাথায় তোবড়ানো বারান্দা-দেয়া টুপি, গায়ে মেকানিক-হেন তেলকালি মাখা ওভারঅল, সোনা বাঁধানো দাঁতে খড়ের টুকরো চিবোনো এমন দুচারজনকে দেখতে পাবে, যেখানেই গাড়িগুলো জট পাকিয়েছে, সে জট চলন্ত কিংবা পার্ক করা গাড়ির হতে পারে ; দু আঙুল তুললেই হল। সেকালে চৌরঙ্গীর কাছে-ভিতে হঠাৎ তোমার কানের পিছনে কেউ যেমন ফিসফিসিয়ে উঠত, রিঅ্যাল কলেজ গার্ল স্যার ; ঠিক তেমন করেই কেউ ফিসফিসিয়ে উঠবে। চমকে ফিরে দেখবে, যেমন উপরে বলা হয়েছে, সেই তোবড়ানো টুপি আর ময়লা ওভারঅল ; উপরন্তু হয়তো মুখের গন্ধটা তীব্র এবং টাটকা, হয়ত রিঅ্যাল কাশীপুর ভডকা, দশটা টাকা আর তারপর সরে দাঁড়াও, কারণ যে গালাগালি ছুটছে তার তুলনায় সেকালের দেশদ্রোহী, মিরজাফর, রিভিশনিস্ট ইত্যাদি প্রায় মন্ত্রের মতো পবিত্র। কিন্তু তখন তোমার প্রাণে এক অপরিসীম স্নিগ্ধতা আসবে। গাড়ির চাবিটা দিয়ে দাও৭ দশ মিনিটে তোমার কাছে গাড়ি এসে গেল।

মিত্রা সৌভাগ্যবতী, এখনও গাড়ি কেনেনি এ শহরে। ভূ-আদ্যাক্ষর দুজনেই জীবিকার খাতিরেই হুঁশিয়ার, দূরে পাশের এক গলিতে গাড়ি পার্ক করে রেখেছিল।

প্রবীর রুমাল বার করে তার টাকটাকে মুছে নিল। খটখটে গরম বাতাস, রোদটাও বিঁধছে ;

বেশ ভালো, বেশ ভালো।

এখানে সকলেই একটু দাঁড়াল। গ্রুপ ভাঙতেই যেন দ্বিধা। সুবথ তার গাড়ির দিকে খালি এগোচ্ছে আব পিছোচ্ছে।

প্রবীরের পাশ ঘেঁষে রাজেন একবার বলল, ছবিটা সম্বন্ধে—

প্রবীর চাইল রাজেনেব দিকে। কিছু বলবেন?

রাজেন হাসল। নবম দেখাল তাব হাসিটা।

প্রবীব বলল, ইম্যাচিওর, কিন্তু যেন স্বপ্নের ঘোরে আঁকা। একটা অনেকক্ষণ স্থায়ী স্বপ্ন। স্যাডিস্ট। এবং লিবিডোও প্রকট। তা হলেও স্বপ্নে ছাড়া হয় না, হয় কি? হাসি-হাসি হযে উঠল প্রবীরেব মুখ।

ঠিক তখনই সুরথ খুব তাড়াতাড়ি বলল, টা-টা।

সামনে পিছনে তাকাল না সে। নিজের ভাঁজ-কবা কনুইয়ের আঁকশিতে বেলার হাত আটকে হনহন কবে গাড়ির দঙ্গলের দিকে ছুটল।

গ্রুপটা ভাঙতে সুবিধ' হলে ভূ-আদা দুজন ও বাজেন যে যার দিকে রওনা হল। কিন্তু তার আগে ভূদেব সমাদ্দাব বলল, কেমন সুন্দরী নয়?

ভূধব বলল, কে, অলীক মুখুযোব স্ত্রী?

না।

স্ত্রী নয় বলছো?

না।

তুমি ঠিক জানো?

আবে না, মিত্রা বাসু।

আচ্ছা? ও, তাই বলো। ভূধব তাব সন্ধানী দৃষ্টিতে ভূদেবেব মুখে তাব চিন্তা পড়তে চেষ্টা কবল। ভাবল সে, এটা কি সমাদ্দাবেব আব একটা কৌশল নয়?

প্রবীব ভাবল, এক কাজ কবলে হয়। যে কোন টেলিফোন থেকে তাব ব্লকের ম্যানেজারকে খবব দিলে হয়। ডুপ্লিকেট চাবি এবং মেকানিক পাঠিয়ে গাড়ি উদ্ধাব কববে। যে কোন টেলিফোন—তা যে কোন হোটেলের টেলিফোনও হতে পারে।

সামনে চেয়ে সে মিত্রাকে বলল, আগে একদিন গাড়ির আড়িতে একত্র লাঞ্চ হয়েছিলো, যদি—

মিত্রা হাসল। বলল, কোন এনগেজমেন্ট নেই। ভালোই হবে।

প্রবীব অবশ্য খেয়াল করল না যে তার গাড়ি উদ্ধাব সম্বন্ধে চিন্তা একত্র লাঞ্চ কবাব চিন্তার পবে হলেই লজিকাল হতো। চিন্তা ধাপ ডিঙিযেও চলে। দুপা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে তবে লজিক্যাল হয়?

মন কোনদিকে যাবে তা বলা যায না, যায কি?

কযেক পা একা গিযেই রাজেনের মনে হল, কী যেন, কী যেন, একটা মধুর আর সুন্দর কিছু। ও, হ্যাঁ। মাধবী ঘোষাল। আর আজ তাকে আবও কিউট মনে হচ্ছিল। কিউট নাকি কথাটা? রূপসী, সুন্দরী এসব শব্দ যেন নয়। রাজেনের মুখে হাসি ফুটল। প্রায় স্বগতোক্তির মতো ভাবল সে—একটা ফুলন্ত চেরির ডাল না!

কিন্তু, রাজেন, কী করবে তুমি সেই একগুচ্ছ রূপ নিয়ে? টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষাল যাকে ধবে রাখতে পারল না? অবশ্য নিরঞ্জন তেমন করে একটি সন্তান দাবী করতে না থাকলে হয়তো জুডিশিয়াল সেপারেশন হতো না। মাধবীর যুক্তিটাও দেখো— সন্তানকে নিজের রূপ থেকেই ধার

দিতে হয় যা সে চায় না।

অন্যদিকে মন গেল রাজেনের. আর তাতেও সে মনে মনে হাসল। মৃদু একটা মোচড়ানি যেন লেগেছিল তখন, সেকালেব ভাষায়, বুকে। তাকে যুবক বলে মনে হওয়াতেই সেই মোচড়ানি। মাধবীকে কোমরে জড়িয়ে ধবে নাচের ভঙ্গিতে এক যুবক যেন মন্ত্রীমহোদয়ের ছবি দেখার প্রদর্শনীতে চলেছে। অবশ্য প্রায় সঙ্গেই বোঝা গিয়েছিল—কপাল ও ঘাড় ঢাকা চুল. পরনে স্ল্যাকস ও টি-শার্ট এবং পায়ের কিম্ভূত স্লিপাবে হিপি যুবক হতে বাধা ছিল না, কিন্তু যুবকের দাড়ি যত মিহি করেই কামানো হোক অমন তেলানো হয় না গাল, আর সেই সায়েন্সফিকশন-সিনেমাধন্য বাস্ট, উপরন্তু ঠোঁট রাঙানো ছিলো প্রায় কালচে এমন গভীর লালে।

তলে তলে তা হলে, কে এই ব্রাহ্মণবেশী, এই প্রশ্ন করেছিল তার মন। গীতা পাবকর—সে ছাড়া আর কেউ নয়. যদিও তার সিনেমায় স্ল্যাকসের বদলে মিনিশর্টস থাকে। ওটা কি একটা পোজ, সেই কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটা? দেখাচ্ছে, উভযেই ফিল্ম-তারকা হলেও পরস্পবকে ঈর্ষা কবি নি?

কিন্তু মাধবীর ব্যাপারটা ভাবো। নিরঞ্জন টেকনোক্র্যাটই—কিছুদিন আগেকার সুবঞ্জিত তলাপাত্রদের মতো তেমন না হলেও বর্তমানের প্রথম সাবির। যতদূব মনে পডছে ডায়েলক্টিক্যাল প্র্যাগম্যাটিজম নামের বিষয়ে তার কিছু পেপাবস আছে। আর টেকনোক্র্যাটরা অবশ্যই নতুন কিছু করার দিকে ঝুঁকে থাকে। তাতেই কি সন্তান কামনা?

মনে করে দেখো. ভূধর স্যান বলেছিল মৃত্যুভয এই সন্তানকামনাব মূলে থাকতে পাবে। যে মৃত্যুভয়, মুছে যাওযাব ভয, পাটিগণিতে পুত্রকে সম্পত্তিব অধিকাংশ দেয়ার অঙ্কগুলোব মূলে।

হযতো সমাজে অল্পবয়স্কের সংখ্যা কমেছে। বয়স্কদের অর্থাৎ চল্লিশোর্ধদের সংখ্যার অনুপাত যদি জনসংখ্যায় সব নজিব ছাপিয়ে বেশি হয়ে থাকে তবে টেকনোক্র্যাটদের সন্তানকামনা কি তাব রিঅ্যাকশন হতে পারে? প্রাকৃতিক রিঅ্যাকশন? তা হলে তো মানতে হয় প্রাকৃতিক ল'গুলোর নিজের স্বাতন্ত্র আর অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। হ্যাঁ, কম বযসেব অনুপাত কমেছে বটে, স্কুলে, কলেজে. বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপ নেই এখন আব, যেমন সেকালে শোনা যেতো। সেকালে এক ভয়ংকব দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল যৌবন এবং বয়স্কতায়। জিতে গেছে বয়স্কবা। কারণ বযস্করাই যুবকদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যুবকদের থেকে বয়স্করা জন্মায় না, যদিও যুবক কালে বযস্ক হয়।

রাজেন আপন মনে হেসে ফেলল। এদিক ওদিক তাকাল হেসে ফেলে। কেউ কি দেখল?

কিন্তু তাই বলে বয়স্কদের সংখ্যার অনুপাত যদি বেড়ে থাকে, তা ঘটেছে বিশ বছরের চেষ্টায়, অবশ্যই প্রবীর সাণ্ডেলের একটা প্রবন্ধে নয়। বাইরের প্রমাণও এই যে প্রবন্ধটা বা প্রবন্ধগুচ্ছ, যেমন ওরা বলল, বছর তিন চার আগে মাত্র লেখা হয়েছে।

একই সমাজে নিবঞ্জনের স্ক্যাণ্ডাল, প্রবীবের প্রবন্ধ, আর ভূধবের মৃত্যুভযেব ঘোষণা! কিন্তু তাদের কোথায় যোগাযোগ? বোঝাই যাচ্ছে প্রবীরের প্রবন্ধ সমাজে কিছু ঘটানোর কারণ নয়, বরং সমাজে যা ঘটছে তার রিঅ্যাকশন।

না, ফীচার লেখার বিষয়ের অভাব নেই, অর্থাৎ যেমন সে লিখতে চায়। বয়স্কদের জয়ই তেমন একটা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কী সেই যোগসূত্র যা দিয়ে নিরঞ্জনের সন্তানকামনা আর প্রবীরের প্রবন্ধ বাঁধা যায়? আছে, অবশ্যই আছে। তা কি এমন হতে পারে বয়স্করা এখন সন্তান সম্বন্ধে নেগেটিব পজিটিব দুরকমই ভাবে। অর্থাৎ আগে যেমন না ভেবেই সন্তান হত ; যৌবনলাভ, বিবাহ ও সন্তান একই সিরিজে ছিল, এখন যেন তা নয়। নয়ই তো—দেখো ভূদেব ব্যাচেলর, হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভূধরও তাই। আর প্রবীর? হয়তো সেও। হ্যাঁ, এটাও জানা দরকার তাকে কেন ফাদার বলা হয়. তা কি পোশাক পছন্দের ব্যাপারই। হয়তো আজকাল সন্তান সম্বন্ধে চিন্তা করা হচ্ছে। সেকস ও সন্তান পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যাপাব করার চেষ্টা না কি? অর্থাৎ একটু যেন

সিযেরিযাস ভঙ্গি সন্তান সম্বন্ধে। অর্থাৎ আগে যেমন পবেরটি আগেরটির বাইপ্রোডাক্ট ছিল, তা নয়।

অবশ্য বযস্কদেব পৃথিবী—তাব মানে রাজেন, বয়স্কদেব সম্বন্ধে তুমি যে খুব জানো তা নয় হযতো।

না, বেশ কড়া বোদ। একটা ড্রাগস্টোবে ঢুকল বাজেন। লাঞ্চেব সময হয়ে আসছে নাকি এরই মধ্যে? অবশ্য এটা ভালো হল, ভূদেবেব ফিচাব লেখাব ব্যাপাব এনে সে ইতিমধ্যে বয়স্ক পৃথিবীব মধ্যে চলাফেবা কবতে সুরু কবেছে। এক গ্লাস জল খেল ওয়াটাবকুলাব থেকে নিজে ভরে নিয়ে।

এই তা হলে প্রবীর সাণ্ডেল। ভাবতে কেমন লাগে না? স্টাইলিস্ট, কিন্তু যাদের মেজর লেখক বলে তা নয, তেমন আউটপুট নেই। কিন্তু বেশ খানিকটা ঐতিহ্যেব অঙ্গ যেন। তিন বা পাঁচ বছব আগে প্রবন্ধে ডীন সুইফটের জন্মতিথি পালনেব চেষ্টা প্রকৃতপক্ষে কিছু একটা বলার স্টাইল। তাব বেশী কিছু কি? এ কি বিশ্বাস করা যায়, পঞ্চাশতম জন্মতিথিতে প্রচুর ব্যারবিট্যুরেটসেব সাহায্যে সমস্যা সমাধানে প্রকৃতপক্ষে তার কিছুমাত্র গবজ ছিল? আব, কথাটা মনে হতেই খুশী হয়ে উঠল বাজেন, ভাবি সুন্দব বলেছিল সুবথ সোম · মানুষটাকে দেখো, যেন শেরিতে ঠোঁটে লাগাতে গিযে ববং তাকিয়ে বংটা দেখে নিচ্ছে. কিংবা শেবি গ্লাসটাব সামনে বসে গোটিতে আঙুল বুলানোই যেন তা। এটাই প্রবীবেব স্টাইলেব বর্ণনা হতে পাবে।

বাজেন সংকল্প কবল. পডতে হবে সেই প্রবন্ধসমষ্টি। দেখতে হবে স্টাইলটাই আসল কিনা।

কিন্তু এটাও কি স্টাইল, বিশেষ একটা ছবিব জন্য তেমন আগ্রহশীল হওয়া?

এখান থেকে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডেব গাছেব ছায়া আবাব। একটু দাঁড়ালো একটা আইল্যাণ্ডে বাজেন। বাঃ, ইউক্যালিপটাসটাব গাযে ১৯—লেখা। কী হযেছিল ১৯—তে এখনো মনে বাখাব মতো যে লাগানো হযেছিলো এই গাছগুলো?

বাজেন উটোপথে হাঁটতে সুরু কবল হাসিমুখে।

কথাটা, অবশ্য, বিচ্যুযাল। ওবা বলেছিল বিচ্যুযাল। হেসে ফেলল আবাব বাজেন, এই তৃতীযবাব হল। এই ছবিব জন্য আগ্রহও কি একটা বিচ্যুযাল? থিযেটাবেব মৌসুমেব পব এখন ছবিব মৌসুম আসতেই সে মৌসুমেব বিচ্যুযাল মনে পডেছে। আগে যেমন কখনও সবস্বতী পুজো, কখন চডক, কখনও পুজোব মৌসুম। হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে সে শুনেছে, লিপিবদ্ধ অঙ্গ আছে বিচ্যুয়ালেব। এবং তা নিযে মত-পার্থক্যও আছে। বেমব্রাণ্ট নাকি এক চোখ বন্ধ করে দেখতে হয। আব মাতিস নাকি শ্যাম্পেনেব পবে ভালো।

অন্যদিকে, সেকালে যেমন পুজোব সমযে নতুন জামাকাপড কিনে ঠাকুব দেখতে যাওযা হতো, একালে তেমন ছবি দেখতে আসা। একদিকে যেমন অর্থহীন, অন্যদিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ। ঠিকই বলেছিল ওবা। প্রথা নয, অভ্যাস নয, এগুলোব চাইতে অর্থহীন এবং এগুলোর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, তখন তাকে বিচ্যুযালই বলতে হবে।

আব কিছুক্ষণ শেবিব আসবটা চললে জানা যেতো।

কিন্তু সে কথাটাকেও দেখো. ফোবম্যানিটি। রাজেন হো হো করে হেসে উঠবার ব্যাপারে সাবধান হল। ফোরম্যান ফোবম্যানিটি, যথা হিউম্যান--হিউম্যানিটি। কালচার সম্বন্ধে প্রবন্ধে একটা লাগসই শব্দ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, প্রায় একই রকম জামার কাট এবং প্রায় একই রকমের ছাপছোপ তাতে, আর অনেকের বুকে কারে ঝোলানো লর্নিয়েট ছিলো। রিচ্যুয়ালের পোশাক ; আগে, বইয়ে যেমন পড়া যায়, পুজোয় রেশম মটকা পরা হতো।

নিজের চিন্তার আবিষ্কারে খুশি হয়ে উঠল রাজেন। কিন্তু, তা হলে, এদের অর্থাৎ সোমদম্পতি,

প্রবীর, এদের পোশাকে? হুঁ, সুযোগ পেলে আবার দেখতে হবে, ভালো করেই দেখতে হবে, হয়তো খুব সূক্ষ্ম বলে ধরা যায় নি, হয়তো এদেরও ছবি দেখায় রিচ্যুয়ালসম্মত পোশাক আছে। যেমন দেখো, ইংরেজরা কোন কোন ব্যাপারে টেইলকোট পরবেই এখনও।

হ্যাঁ, তা, রিচ্যুয়াল বলতে পারলে, সহজ হয় বিষয়টা, যেমন ক্রিকেট মাঠে, কম্যুনিটি ডিনারে, আর এই ছবির প্রদর্শনীতে। ব্রতপালন?

এবং কালক্রমে এটাও কি ব্রতপালনের অঙ্গ হবে যে প্রবীর সাণ্ডেলরা ততক্ষণই ব্রতক্ষেত্রে থাকবে যতক্ষণ না ফোরম্যানিটি আসে? রাজেন ভাবতে চেষ্টা করল, পলিনেশিয়ায় কিংবা মেলেনেশিয়ায় এমন কোন ব্রত আছে কিনা যাতে একদল এলে আর একদল হঠাৎ ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে সরে যায়।

রাজেন নিজেকে সতর্ক করল, চিন্তা করতে গিয়ে এমন হাসি পাওয়া ভালো নয়। রাজেন চোখ তুলে দেখল, সে আবার চিত্র-প্রদর্শনীর সামনে এসে গিয়েছে।

হ্যাঁ, এটাই তো ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ড থেকে পথ বদলানোর উদ্দেশ্য। দেখা যাক, দেখা যাক। ছবিগুলো আর একবার দেখলে ফিচার লিখতে সুবিধা হবে। আর ফিচারে চুরাশি নম্বর ছবির আলোচনা করলে প্রবীরের কলম থেকে কিছু বার হতে পারে কি?

তা ছাড়া প্রবীরের পুরনো লেখাগুলো পড়তে হবে।

এখন কিন্তু, চিত্র-প্রদর্শনীতে ঢুকল রাজেন, লাঞ্চের ঘণ্টার এত কাছে ফোরম্যানিটির ভিড় না থাকাই সম্ভব।

এদিকেও দেখো : আচ্ছা, প্রবীরের এই আগ্রহ ছবিটায়, তাও কি রিচ্যুযালের অঙ্গ? কিন্তু সে তো বলেছিল স্বপ্নের ঘোরে আঁকা, অর্থাৎ যাকে হোয়াইট ব্লেজ অব ইনস্পিরেশন বলে, অনুপ্রেরণার ভাস্বর দীপ্তি—কেমন, তাই নয়?

কাউন্টারে দর্শনী দিয়ে রাজেন এগোতে লাগল।

তা হলে কি এমন হতে পারে যে বয়স্করা যখন একত্র হয় তখনই তাদের জানা কোন বিচ্যুয়ালেব আয়োজন করে? (একত্র হওয়া মানে দৈহিক নয়, একই বিষয়ে চিন্তা প্রকাশ কবাও হতে পারে।) এবং এখানে ওখানে আবহাওয়ায় সন্তান সম্বন্ধে যে নেগেটির এবং পজিটিব আগ্রহ দেখা দিচ্ছে, তাও কি রিচ্যুয়াল, তেমন চিন্তা করা?

আ, রাজেন দর্শন-ছাত্র, নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করল, আ, একবারে একটিকে ধরো। ছবিটাই কি যথেষ্ট বিষয় নয়!

ছবিটাই। প্রবীর স্বপ্নের ঘোরে আঁকা, লিবিডো এবং স্যাডিজমকে ছাপিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করেছিল। নয়?

আচ্ছা? এমন কি হতে পারে, বয়স্করা যখন একত্র তখন রিচ্যুয়ালই, রিচ্যুয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কখনও কখনও যখন সে একা, যেমন এই ছবি সম্বন্ধে প্রবীর সাণ্ডেল, তখন গুটি কেটে বেরিয়ে আসার মতো কিছু হয় না?

প্রাক্তনা নতকী মিত্রা ও প্রবীর সাণ্ডেলকে আজ ট্যাক্সির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

প্রবীর বলল, একটা ঠাণ্ডা আর অলস জায়গা আছে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আর একটু দূরেও সেটা, যেতে যেতে লাঞ্চের সময় হবে।

মিত্রা বলল, ভালোই হবে।

ট্যাক্সিতে বসে প্রবীর নিজের ক্লাবের ঠিকানা বলে দিল। দেখা যাচ্ছে রিক্সো ভূদেব ভূধরের

মতো প্রবীরেরও ক্লাব বটে। পাঠক মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন এই ক্লাবগুলো প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা যাওয়ার পর ইংরেজদের দেশের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। এটা সমাজতত্ত্বের চিন্তার বিষয় যে ইংরেজরা এ দেশে থাকতে যা করা হয়েছে তারা চলে যাওয়ার পর তার চাইতে অধিক অনুকরণ করা হচ্ছে। তা হোক, সেটা কিন্তু নভেলের বিচার্য বিষয় নয়।

অফিস-সেক্রেটারির কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল দক্ষিণের ব্যালকনিতে খালি আছে টেবল, যদি ব্যালকনি চায় প্রবীর।

প্রবীর বললে, তা তো চাই-ই, ও টেবলটায় লাঞ্চের পরেও রিজার্ভড চাইছি।

সেক্রেটারি টেবলের তলায় লাগানো বেল বাজিয়ে বোয়কে ডেকে দিল।

টেবলে চারজন বসা যায়। দুজনে দুপারে বসতেই অন্য চেয়ার দুখানা ভাঁজ করে করিডরে সরিয়ে দিয়ে বোয বিদায় নিল। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

প্রবীর বলল, কেমন জায়গাটা ঠাণ্ডা নয়! লাঞ্চের পরে দুখানা ইজি চেয়ার আনিয়ে নেয়া যেতে পাবে।

মিত্রা হেসে বলল, তবুও লোকে বলে, মৃত্যুর কথা বলে অথবা মদকে তিরস্কার করে আপনি ডিনারের আলো নিবিয়ে দিতে পারেন।

বেলা তো? প্রবীব বলল, বেলা ওরকম বলে। তা সে যাই হোক লাঞ্চ আনবার আগে একটা কথা বলে নি। আপনাকে ধন্যবাদ। শাশাঙ্কার বার্ডস, র‍্যাটস ও ফিশেস পড়েছি।

আমি, এ ধন্যবাদের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা, সেই অনেকদিন আগে যখন হাত দেখে লোকের ভাগ্য বলতেন তখন বোধ হয় আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন।

ও, আচ্ছা, কয়েকবার ঠোক্কর খেয়ে সহজ হবে। যা বলেছিলুম, তাঁব প্রত্যক্ষ করাব ক্ষমতা যেমন তীক্ষ্ণ, ভাষাও তেমন যথাযথ। কী আশ্চর্য আমরা যারা মানুষ সম্বন্ধে লিখি তাবা এমন করে মানুষকে প্রত্যক্ষ করি না।

ওযেটার খাবাব নিয়ে এল।

প্রবীর বলল দেখো আমি, তোমাদের জানান কথাই, গরম খুব একটা পছন্দ কবি না ; কাজেই আব দুচার প্লেট যা আনবার একবারেই সঙ্গীসাথীদেব সাহায্য নিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হয। আব আধঘণ্টাটেক পরে এক বাক্স টার্কিশ রিস্কো আর পোর্ট আছে তো?

পোর্ট? ওয়েটার একটু অবাক হল।

লাঞ্চে দেয়া হয় না, তাই নয়? তা একটা বরফের চাঙরিতে ডুবিয়ে এনো। কেউ যেন না দেখে।

ওযেটার চলে গেল।

প্রবীর বলল, কী বলছিলুম? ও, বইটা বেশ ভালো হয়েছে।

প্লেট টেনে নিল সে।

নাও, সুরু করো, দেখো কী বকম রান্না।

একটু কম ঝাঁজালো। আচ্ছা আজকের কায়নসিডেন্সটা, যোগাযোগটা ভালো। ছবির প্রদর্শনীতে সকলের দেখা হয়ে গেল।

তা হল। মুখ তুলল প্রবীব।

কিন্তু, মিত্রা হাসল, ছবি দেখাটা কি রিচুয়াল?

কাস্টম বলছো? মুস্কিল, খুবই মুস্কিলের প্রশ্ন তা এক অর্থে—এ-কে প্রথা, বলতে পারো। যেমন রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়া, শরৎকালে কলকেতার বাইরে যাওয়া। অথবা--

অর্থাৎ খবরের কাগজ পড়া যেমন দৈনিক প্রথা, এটাও তেমন মরশুমি প্রথা, এই ছবি দেখা।

কিংবা রিচ্যুয়ালই। এদের নিশ্চয়ই মন্তব্যের খাতা আছে। মন্তব্য লিখতে না পারলেও মন খুঁত-খুঁত করে। যেন ঠিক দেখা হয় নি মনে হয়। চপটা এখানে মাটনেরই দেখো। অবশ্য অন্য অর্থে—

এ কথাটা বলেই প্রবীর একটু থামল। চামচটা দোলাল বরং। একটা তুলনা তার মনে এসেছে, যেন সেটাকেই মনে মনে তৌল করছে। কিন্তু প্লেটের দিকে মন দিল।

বরং বলল, আচ্ছা, এটা কেমন হল না, পোর্টে আপনার রুচি কি না তা না জেনেই বলে দিলাম : এখন অবশ্য এসব পোর্ট আমদানি করা।

পর্টুগাল থেকেই।

অন্তত রিস্কোতে ভেজাল নেই। এমন কি এখানে ভডকা, লেবেলেই দেখতে পাবেন, মেড ইন রাশা।

অনেক সময়ে কথায় কথায় সমসাময়িককালে পড়া বই থেকে কিছু মনে এসে যায়। মিত্রাব হয়তো তেমন হল।

সে বলল, আমরা অজস্র পরিমাণে মদ আমদানি করছি।

দেখতে হবে আমবা পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার চল্লিশেব সাত ভাগ। অঙ্কটা তাই নয়?

বলছিলাম, অথচ এক সময়ে মদ খাওয়াটা আইন করে বন্ধ করাব কথা হয়েছিল।

উঁ, ও, হ্যাঁ, তা তো বটেই। তবে আমেরিকার এ সম্বন্ধে যা করা হয়েছিল, আর তাতে যা ফল হয়েছিল, তা ভাবা হল না কেন? ভাবা উচিত ছিল, তাই নয়? একদিকে চোঁয়ানো জুতোর কালি গিলে প্রাণ দেয়া , অন্যদিকে ওটা একটা জীবনযাপনের ধারা, মদ না খাওয়া। তুমি সব দিক দিয়ে ইউরোপের সব নেবে, মোটরগাড়ি, জামাকাপড়, ইস্তক স্টেট ক্যাপিট্যালিজম আব মদ নেবে না, তা কি হয়!

হাসল প্রবীর।

এমন কি ছবির মবশুমী প্রদর্শনী।

বিলক্ষণ।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে তোয়ালে তুলে ঠোঁটের দুপাশ মুছল প্রবীর। বলল, কে যেন বলেছিল, ও তোমাব সেই ডিনাবের হার্ট অপাবেশন স্পেশালিস্ট, কত কি মি ঘণ্টায় যেন সর্বোচ্চ গতি হতে পারে হার্টেব? তার বেশি যদি হার্ট চলে, যদি তোমার টেলিভিশন সেট ক্রমশ বড় হয়, গাড়িগুলো ক্রমশ লম্বা না হলে যদি তোমাব কুণ্ঠা হতে থাকে, যদি ক্রমশ গ্যাজেট বাড়তে থাকে তোমার ঘরে, বলো মাঝখান থেকে ওই মদটাকে বাদ দেয়া চলবে কি? টেলিভিশন, জেট, পিল ছাড়া এক পৃথিবী থাকতে পাবে, অন্তত অসম্ভব নয় থাকা, যেখানে মদের দরকার নেই, মস্তিষ্কই সেখানে নেশায় বুঁদ করে দিতে পারে মানুষকে।

মিত্রা বলল, না, আমার পোর্টে কোনো আপত্তি নেই। ওটা মিথ্যা কথা বেলার—

কী?

যে আপনার কথায় শ্যাম্পেন যে থাকে তা শ্যাম্পেনের থেকেই পাওয়া, এখন অন্তত পোর্টেব মত মিষ্টি।

প্রবীব হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু দেখো, এটা কি প্রথা না রিচ্যুয়াল, এই মদ খাওয়া?

আচ্ছা, ওকথা দুটো থেকে এই মনে হয় না, খানিকটা যেন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মদ খাওয়া চলছে। প্রথা এবং রিচ্যুয়াল দুয়েতেই, যে পালন করছে তার ইচ্ছার কোন বালাই নেই!

জীবনযাপনটাকেই যদি একটা কর্মকাণ্ড মনে করো, তবে পোর্ট খাওয়া, ছবি দেখা সবই তার অন্তর্ভুক্ত রিচ্যুয়াল বলতে পারো। না ঘটলে মনে হয় কোথায় যেন ত্রুটি হল। হলেও বা কী লাভ?

একটু থেমে প্রবীর আবার বলল, বেলাই প্রমাণ, বেলার মা মস্কো এমব্যাসিতে চাকরি করার

সময়ে বারোমাসের তের ষষ্ঠীর খবর নিতেন চিঠি লিখে। এরকম গল্প আছে, ঝিঙে-ষষ্ঠীর জন্য মস্কোর সবজি বাজারে তেমন লম্বাটে সবুজ রঙের কিছু পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজও করেছিলেন একবার।

টার্কিশ এবং পোর্ট এল। শুধু ছিপি দেখা যাচ্ছে এমনভাবে বরফে ডুবানো পোর্ট। সিগারেট-দানে টার্কিশ।

আ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বলল প্রবীব। হাসি উপহার দিল ওয়েটাবকে।

ওয়েটার চলে গেলে মিত্রাকে বলল, ছিপি খুলে দি। দুটো গ্লাসই টৈটুম্বুব ভরে নাও। হাতে তেমন ঠাণ্ডা লাগে রুমালে ধবো। ফর্ম্যালিটির কোন মানে নেই।

গ্লাস ভবে নিয়ে মিত্রা বলল, জীবন যাই হোক, ঝিঙে-ষষ্ঠীর জন্য মস্কোর সবজি বাজাবে যাওয়া একটা অমর কাহিনী।

নিঃশব্দে পোর্টের স্বাদ নিল প্রবীর। বলল, বিজ্ঞাপন মনে করো না, কিন্তু দেখো, যেমন হওয়া উচিত এমন কি রঙও। আর জীবন, যদি ভেবে দেখো. তাও কি একটা একটানা রিচ্যুয়াল নয়? কেন বাঁচতেই হবে? না বাঁচলে ভালো ঠেকে না, বেঁচে কিন্তু লাভ কী?

আমাদের মনে পড়বে, প্রবীরের মতো আমবাও বলতে পারি বেলাই প্রমাণ, প্রবীরকে যেসব কারণে তার বন্ধুমহলে কখনও কখনও ফাদার বলে উল্লেখ করা হয, তার একটি এই যে জীবনমৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপার নিযে সে চিন্তা কবে এবং বিশেষ করে ডিনারের শ্যাম্পেনেব পবে এই সব মূল ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। এটা ডিনার নয, লাঞ্চ মাত্র এবং পোর্টে শ্যাম্পেনের ঝাঁজ থাকাব কথা নয় , তা সত্ত্বেও প্রবীরেব চিন্তার এই ঝোঁক দেখে মনে হয়, লাঞ্চ তাকে পরিতৃপ্ত করেছে।

দ্বিতীযবার গ্লাস ভবে প্রবীর বলল. মিত্রা, ফর গডস সেক, আমাদের মানে বিঙ্কোর টার্কিশ একটা দেখো। নিজে সিগাবেট ধবাল প্রবীর। বলল, আবার সিগারেব মতো রং দেখে ভেবো না তেমন কড়া, ব্যাপাবটা আদৌ তামাক পাতা নয়, কাগজই।

মনে হল, প্রবীর এবার ইজিচেয়ার চাইবে। লাঞ্চতৃপ্ত দেহে এক ঝলক দিবানিদ্রা আসে যদি ক্ষতি কী! কিন্তু দেহের কোষগুলি যা চায় তাকে আমরা সব সময়ে আমল দিই না।

সিগারেট ধরিয়ে মিত্রা বলল, বেলা আপনাকে আগেই বলেছে। চরাশি নম্বর ছবিটি সম্বন্ধে সতিই আপনার ইনট্রেস্ট আছে?

প্রবীর বলল, চুরাশি, ও তাকে তোমবা চুবাশি বলো, কিংবা যাই বলো, ভালো. ছবিটি ভালো।

প্রদর্শনী শেষ হতেই ওটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবাব ব্যবস্থা করবো।

অর্থাৎ?

ছবিটা সম্বন্ধে আপনার মত জানবার আগেই আপনাকে বলা উচিত বোধ হয়, ছবিটা শান্তনুর আঁকা।

শান্তনু? ম্ ম্ ম্, ভালো, আই মিন—মানে--

প্রবীরের মাথার চারিদিকে আলোব বেষ্টনী দেখা দিল না, কিন্তু সে নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মিত্রা বলল, শান্তনু খুশিই হবে, যদি জানে আপনি ছবিটাকে নিতে রাজী হয়েছেন।

মুহূর্তের জন্য ছবিটাকেই আবাব যেন দেখতে পেল প্রবীর। হাত বাড়িয়ে পোর্টের বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে নিল নিজের গ্লাসে। খুশি-খুশি মুখে কী ভাবল। খুব মৃদু একটা হাসি ঠোঁটে জড়িয়ে গেল। মৃদুস্বরে বলল, আর একটু নেবে?

হ্যাঁ প্রবীর খুশি হয়েছে। ক্বচিৎ এমন হয়, যে যা পেলে তুমি খুশি হও তা তোমার দুশ্চিন্তা না ঘটিয়েই তোমার কাছে এসেছে।

কিন্তু তখনই ওয়েটার এল প্লেট সরাতে।

এখন টেবিলে পোর্টের বোতল, দুটি ওয়াইন গ্লাস আর ক্লাবের নাম লেখা সেই টার্কিশ সিগারেট ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্যালকনির প্রান্তে গিয়েছিল প্রবীর আর মিত্রা ওয়েটারকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে। হাতে ওয়াইন কাপ। রাস্তার চঞ্চলতাকেও লক্ষ্য করা যায়। এ ভঙ্গিটা ব্যালকনির অন্যতম সুবিধা। ঝাঁ করে একটা সুপারসোনিক কিছু রাস্তা বরাবর উড়েও গেলো। ওয়াইন কাপ নামিয়ে রেখে, মনে হল, প্রবীর বলবে, আচ্ছা, ও আচ্ছা। কিন্তু তা না বলে টেবল থেকে একটু পিছিয়ে নেপোলিয়োঁর ভঙ্গিতে দুহাত বুকে রেখে মিত্রার মুখের দিকে চাইল।

সে বলতে যাচ্ছিল, দেখো, ছবিটার মধ্যে সুপারসোনিক জেটের মতো রেখাকে টপকে যাওয়ার দুঃসাহস আছে অথচ তা কিম্ভূত নয়, আকারের টানকে এড়িয়ে গিয়ে নয়। কিন্তু তা না বলে, বলল, তোমাকে যদি ছবিটা পাওয়াব আগেই ধন্যবাদ দিয়ে ফেলি তা হলে সেটা রীতির দিক দিয়ে ঠিক হয় না বোধ হয়, তাই নয়?

আশ্চর্য সুন্দব আর তৃপ্ত দেখাল মিত্রাকে।

কিন্তু তখনই আলাপটাকে ঘুরিযে নিল, আর তা দুজনেই। (এটা কি রীতি মাত্র যে অনুশীলিত সামাজিকতায় কদাচিৎ কোন বিষয়ে আগ্রহের আতিশয্য ধরা দেয়?) মিত্রার আজ বক্তৃতা নেই। আর প্রবীর আজ একবার থিযেটাবে যাবে অবশ্য, তা সন্ধ্যাব পরে। সুতরাং তাবা এখন আলাপ করতে পারে। এ ব্যালকনিতে তাদের কেউ বিরক্ত করতেও আসবে না।

কিন্তু কী বিষয় হবে এ আলাপের? কোন বিষয় আছে? কিংবা বিষয়ের আতিশয্যই বৈশিষ্ট্য? লাঞ্চের পবে যখন কাজের চাপ নেই সেই অবসরে এ বিষয়ে সে বিষয়কে ছুঁয়ে ছুঁযে কথা বলে যাওয়া। একে কি উপভোগ্য অর্থহীনতা বলবেন? কেননা যা হতে পারে, তা এই যে এতে পরস্পবের কোন কোন বিষয়ে অন্তত রুচিটা জানতে পারা যায়, আর তেমন ভালো আড্ডা হলে পরস্পবকে খুব পরিচিত একজন বলে মনে হয।

অথবা সেই পরিচয়ও কি অর্থহীন নয়? তুমি কী ও কেন, তাই কি জানো? আর তা যদি জানা সম্ভব হয়ই, সে জানারই বা মূল্য কী?

রূপসী পাঠিকা, আপনার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখুন, প্রবীর ও মিত্রা কেমন তাদের নিজেদের তৈবি কথোপকথনের স্রোতে ভাসছে।

শান্তনু এবং গার্ট্রুড যেন ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু মাত্র মিনিট পাঁচেক। রাস্তার এদিকে ওদিকে নিঃশব্দে তাকানো দেখে তাই মনে হল। অবশ্য এটা এমন হতে পারে যে তারা ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করেনি। নিছক অভ্যাস, অথবা রিফেক্স, পেভমেন্টে দাঁড়ালে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে চোখে মুখে নিজের অজ্ঞাতেই এরকম একটা ভাব ফুটতে পারে।

এখন কি তারা গার্ট্রুডদের ফ্ল্যাটে যাবে? এখনই? ফ্ল্যাটের বিপরীত দিকে রাস্তা পার হয়ে একটা তামিল ইটিংহাউস আছে। সেখান থেকে লাঞ্চ সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর তা স্থির করলে গার্ট্রুডদের ফ্ল্যাটে ফিরতে হয় এখনই।

নিচু গলায় গার্ট্রুড বলল, আর একটু বেড়াই, কী বলো?

সে চলতে সুরু করল। আর তখন তার মনে হল, সে নিজেই বয়সে বড়ো, তাকেই কি সাহস দেখাতে হবে!

সামনে একটা ফুটপাতের ফলের দোকান তাকে কিছু সাহায্য করল। ভুটানি আপেল কিনল সে।

নাইস, বলল শান্তনু হাতে নিয়ে।

গার্ট্রুড হাসল, খেয়ে দেখো, খেতেও ভালো হতে পারে।

এটা খুব সাহসের কথা, তাই নয়? এই অনুভব করল গার্ট্রুড।

রুমালে মুছে নিয়ে আপেলে কামড় দিল শান্তনু।

পাশাপাশি হেঁটে চলল তারা। গার্ট্রুড তার আপেল থেকে খানিকটা কামড়ে নিয়ে বলল, অবশ্য আঙুর আর আপেল এক নয়।

পথে যানবাহনের ভিড় তো আছেই, পেভমেন্টেও বেশ ভিড়। দুএকবার তাদের দুজনের মাঝ দিয়েও দুএকজন হন্তদন্ত নাগরিক গলে যাচ্ছে।

শান্তনু বলল, ট্যাক্সি নেবো, ট্রুডি?

ভালো লাগছে রোদ। বেশ চামড়া বেঁধানো, নয়?

সামনে ট্রাম স্টেশনে নামার সিঁড়ি। এটা একটা সমস্যা যাব সমাধান এখনও হয় নি। মুখটা এমন যে একসঙ্গে জন দশেকের বেশি পাশাপাশি নামতে পারে না।

শান্তনু হেসে বলল, ঘড়িটা বন্ধ দেখো। গেটের মাথার ঘড়িটাকে দেখল সে। গার্ট্রুড কব্জি উল্টে নিজের ঘড়িটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখল।

বলল, এসো। হাসল সে। হাত তুলে নিজের কপাল থেকে একগোছা চুল সরিয়ে দিল।

ট্রামে?

গার্ট্রুড গেটের ভেতরে শান্তনুর হাত ধবল।

কোথায় যাবে? শান্তনু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কবল।

চলো না। বলল গার্ট্রুড।

সে ভাবল, বেশ সিটগুলো এই ট্র্যামের। দুজনই মাত্র বসতে পারে। ট্রাম বোঝাই মানুষের ভিড় আব তার মধ্যে একটি সিটে পাশাপাশি দুজন। ট্যাক্সিতে ভিড় থাকে না বলেই অত কাছাকাছি যেন বসা হয় না।

শান্তনু সামনেব বিনটায় প্রায় শেষ হয়ে আসা আপেলের বুক ফেলে দিল। গার্ট্রুড বলল, খেতেও ভালো, তাই নয়?

আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা ট্রাম তখনই ছাড়বে। আর ফাঁকাও যেন। গার্ট্রুড উঠে পড়েছে। শান্তনু উঠতে উঠতে বলল, লেনিন সরণি? সে কোথায়? গাড়িটা সে দিকেই যাবে।

গার্ট্রুড বলল, এসো, এসো।

ট্রামটা একটা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়ল, আর সেই ঝাঁকিতেই তারা সামনের একটা-দুটো খালি সিটেব দিকে এগিয়ে গেল।

পাশাপাশি বসে গার্ট্রুড বলল, আপেল কিন্তু আঙুর নয়।

আঙুর?

পেছন থেকে কে একজন বলল, চে গুয়েভারার মূর্তির সামনে নামলে ফলের দোকান আছে, আঙুর পাওয়া যায়।

শান্তনু কেন, এ অবস্থায় আমরা সকলেই চমকে উঠতুম।

সে ফিরে দেখল মাঝবয়সী এক অপরিচিত যাত্রী। গার্ট্রুড হাসি চাপতে লাল হয়ে উঠল। শান্তনু এক ঢোক জল গিলবার মতো মুখভঙ্গী করল। তার এই দুষ্টুমির ভঙ্গিটাও চিনে রাখা দরকার।

এখানে অবশ্য আমরা, যারা প্রাচীন, বুঝতে পারছি। পেছনের সিটের যাত্রী নিজের চরিত্র দিয়ে প্রমাণ করলেন, লেনিন সরণি ও চে গুয়েভারার মূর্তি সত্ত্বেও কলকেতা আজো সেই কলকেতাতেই।

শান্তনু বলল ও আঙুর? হ্যাঁ, তা আঙুর।

গার্টুড বলল, তোমার আবার আঙুরে অ্যালার্জি নেই তো?

পেছনের সিটের যাত্রী বলল, কার যে কিসে অ্যালার্জি!

এবার ফিরল না শান্তনু। দু-আঙুলের মাথা দিয়ে গার্টুডের উরুর ওপরে অদৃশ্য প্রায় চিমটি কাটল। কিন্তু খিলখিল করে হাসল গার্টুড।

নিজেই হাসি থামাতে থামাতে বলল, স্যান্টানায়া, দেখো দেখো, দেয়ালের গায়ে কী হাসির কথা লেখা আছে। যাঃ, পার হয়ে গেল, দেখতে পেলে না।

পেছনের সিটের যাত্রী দ্বিধা করতে লাগল।

শান্তনু বলল, আমরা কোথায় চলেছি তার সম্বন্ধে ধারণা আছে?

তোমার কি ধারণা এ ট্রামের টার্মিনাস নেই?

এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারি, যেখানে শুঁটকি চিংড়িভাজা আর মাটির ভাঁড়ে চা-ই একমাত্র লাঞ্চ হতে পারে।

চিংড়িপোতা? কিংবা মেটেবুরুজ?

অর্থাৎ তুমি আর আমি কলকেতায় কিছু চিনি না এই তো? মনে করো এখন আমরা কোন বলকানি শহরে। এখানকার ভাষা তবু আমি তুমি জানি। সে শহরে কখন 'J' অক্ষর ভাওয়েল, কখন বা ব্যঞ্জনবর্ণের ধার ঘেঁষা, তাও না জানতে পারো।

বস্তুত তারা কলকেতার কীই বা জানে।

এই সুযোগে মনে হচ্ছে, শান্তনুর কলকেতা আসার কথা। কারণ শান্তনুর হঠাৎ তা মনে এল। বেশ নাটকীয় দৃশ্য যা একটি নভেলী প্রারম্ভ হতে পারতো। ১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের এক বেলা দশটায় উনিশ কুড়ি বছরের এক সুশ্রী যুবক পুরনো আলিপুরের এক কলোনিয়াল ম্যানশনের সম্মুখে ট্যাক্সি থেকে অবতরণ করল। বোঝা যায় যুবক এ অঞ্চলে নতুন। যুবকের গণ্ডদেশ আপেলের মতো লাল, চোখ যেন নীলাভ, মুখে মিষ্ট স্লাভনিক ধাঁচ। পরনে খাটোর চাইতেও খাটো শর্টস ও ছবি-আঁকা শ্যামোয়া লেদারের জ্যাকেট, পায়ে গ্রীক মার্বেলমূর্তিতে যেমন দেখা যায়, তেমন হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার ফিতে জড়ানো চপ্পল। ট্যাক্সিটি ১৯৪০ মডেলের মিটারযুক্ত ফোর্ড। আশ্চর্য এই, মিউজিয়ামের উপযুক্ত বিষয় এখনও সচল আছে। কিন্তু সেজন্যই যেন সেই যান যুবকের পছন্দ। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে গলায় ঝুলানো ক্যামেরায় ছবি নিল, যেন সেটা সেই মহা অতীতের ঘোড়ায় টানা ফিটন।

দ্বিতীয়ত, যদি বা এটা নভেল হতো, যেমন ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মিত্রার দেয়া সেই অললাযনস ডিনারকেই প্রারম্ভ করা যেতো। মিত্রা বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই সেই পার্টি দিয়েছিল। শান্তনুকে কেক কাটতে দিয়ে এবং অন্যভাবেও সামনে এগিয়ে দিয়েছিল।

শান্তনুর কলকেতা আসার ব্যাপারটা (কথায় বলবো কি?) আমাদের এরকম সন্দেহ, একটু যেন অপ্রকাশ্য রাখার চেষ্টাই কারো কারো। চিংড়িপোতা আর মেটেবুরুজের ইদানীং এই এক পরিচয় আছে সেখানে বিদেশী নাবিকরা আত্মগোপন করতে পারে। এই পরিচয়, যার অনেকটা কাল্পনিক, কি শান্তনুর মনে কলকেতা আসার প্রথম দিনের কথা জাগিয়ে দিয়েছে!

শান্তনু বলল, কোথাও নামো, ট্রুডি, সিগারেট খেতে ইচ্ছা।

গার্টুড বলল, দেখো দেখো, ওটা কিসের বিজ্ঞাপন।

ট্রামের বডিতে লেখা 'সুরাকসিন'।

পড়ল।

আমাকে ইকোনমিস্ট হতে বলো?

বলা হয়, পোড়ালেও চামড়া-পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়। রেক্সিনের মতো রং উঠে গিয়ে কাপড় বেরিয়ে পড়ে না, ইত্যাদি।

তার চাইতে সামনের স্টপে নামি বরং।

আপাতত সিগারেট চাই।

আর গার্ট্রুড বলল, আর্টিস্ট বরং কী বলো, ইকোনমিস্টের তুলনায় আর্টিস্ট।

ট্রামের গতি কমছে, তারা উঠে দাঁড়াল।

এটা একটা জংশন সম্ভবত, কিন্তু তারা ট্রাম না বদলে ওপরে উঠে এল। সিগারেট বার করলে গার্ট্রুড পেভমেন্টে উঠে।

কিন্তু ঠোঁটে বসানোর আগে, চের আঙুর, এই বলল। লাইটার ধরিয়েছিল শান্তনু, দুজনের মুক্ত হাসির দমকে নিবে গেল।

সিগারেট ধরাল তারা।

শান্তনু বলল, কোথায় এসেছি বলতে পারো?

গার্ট্রুড মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে এদিক ওদিক চাইল। মুখ দেখে বোঝা গেল, সে কোন পাত্তাই করতে পারছে না।

লস্ট। বলল শান্তনু।

ঝিকমিক করে হাসল গার্ট্রুড। তা হলে এসো, খানিকটা হাঁটি।

কিন্তু চুলের গোড়ায় কপাল ঘেমে উঠেছে তোমার।

বাঁ হাতে সিগারেট নিয়ে ডান হাতে শান্তনুর হাত ধরে বলল, চলো, চলো। আচ্ছা, লোকটা বোধ হয় খুব পরোপকারী, চের আঙুরের কথা যে বলেছিল?

খানিকটা পায়ে পা মিলিয়ে হন হন করে চলে গার্ট্রুড বলল, হঠাৎ আঙুর কেন বলো তো?

তারপর নিজেই সে বুঝতে পারল। দুতিন ধাপ ডিঙিয়ে গিয়ে সে নিজের মনকে প্রশ্ন করল, ওটা কি পুরুষের হিংসা যে ম্যাটিসের নুড আনাকে দেখে শান্তনু আক করে উঠেছিল। নিজের এই মনগড়া থিসিসটা বলবে কি না এই ভাবতে গিয়ে তার ঠোঁটে হাসি ফুরফুর করে উঠল।

শান্তনু বলল গম্ভীর সুরে, আ, ট্রুডি, তুমি আনা কারেনিনার আঙুরগুলোকে বালিশের তলায় রেখেছিলে রাতে।

ন্যুডের সমালোচনা থেকেই তো ছবির কথা উঠেছিল। হঠাৎ তা মনে পড়ল। গার্ট্রুড চলা থামাল না, কিন্তু তার নিজের চোখ দুটিকে বড় বড় করে দেখল শান্তনুকে। নিজের হাতে ধরা শান্তনুর হাতে চাপ দিল।

হঠাৎ বেশ জোরেই বলল, তুমি একটা জিনিয়াস, তুমি একটা জিনিয়াস। হাতে ধরা শান্তনুর হাতের পিঠটা নিজের ব্লাউজের বুকে চেপে ধরল। না, সে বায়োকেমের লোক। ছবি সম্বন্ধে কিছু বোঝে না। কিন্তু সে তো নিজের চোখে একটা গ্রুপকে দাঁড়াতে দেখেছে শান্তনুর ছবির সামনে। আর সে গ্রুপে তার পূর্ব পরিচিত (সেই অল লায়নস ডিনার স্মর্তব্য) মিত্রা বাসু, বেলা সোম ও প্রবীর সাণ্ডেল (অর্থাৎ তিনটি অন্তত সিংহ সিংহী)। বলো, এ চিন্তাটা শান্তনুকে আরও কিউট করে না?

কিন্তু ছবি সম্বন্ধে আমরা কিছুই আলোচনা করি নি। বলল শান্তনু।

ও, সশব্দে ঠোঁটের সাহায্যে বৃত্ত রচনা করল গার্ট্রুড।

দুয়েক পা গিয়ে বলল, আমার মুখে প্রশংসা না শুনলে খোকার মন উঠছে না।

না, ঠিক তা নয়।

গার্ট্রুড বলল, তবে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো? যদি এখন হেমন্তের নিষ্প্রভ বিকেল হতো, এই কলকেতায় যদি এমন পথ থাকতো যেখানে গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ে, তবে সেই পথে

চলতে চলতে থেমে দাঁড়াতুম, তোমার মাথায় হাত রেখে মুখটাকে নুইয়ে আনতাম, নিজের চিবুক সেদিকে তুলে ধরতুম। কিন্তু তাই বা কেন?

কী তবে?

প্রবীর সাণ্ডেলকে তুমি স্নব বলবে?

কিছু বলার মতো চিনি না।

তোমাদের বাড়ির ডিনারে লক্ষ্য করেছিলে, চিত্রপরিচালক পীযূষকে সে পাত্তা দিতে চায় না। অর্থাৎ নিজের এক্তিয়ারে সেও কম বুড়ো সিংহ নয়।

হয়ে থাকবে তা।

হয়েছিল। বাবাও তা লক্ষ্য করেছিলেন। অথচ চিত্রপরিচালক পীযূষকে মিয়ান্দানির চাইতে বড় এমন কি এপটিনস্টাইনের সমকক্ষ মনে করা হয়।

কিন্তু—

গ্রুপটাকে লক্ষ্য করেছিলে তোমার ছবির সামনে?

তা করেছিলুম।

প্রবীরকে মাঝখানে রেখে দাঁড়িয়ে ওরা একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখছিল না?

হয়তো কাজন মিত্রা এব্যাপারে ওদের উৎসাহ দিয়ে থাকবে।

বেশ বাপু, তুমি ছবি আঁকতে জানো না, জানো না। তুমি বলো, ছবিটার দোষ কী কী।

এটা একটা সমস্যাই হতো শান্তনুর পক্ষে।

সে বলল, কোথায় এলুম তা বলো।

অবশ্য ছবিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। রাশাতেই প্রথম। সাহিত্যে এম-এস-সির মতো চিত্রবিদ্যাতে তারাই প্রথম এম-এস-সি পড়ানোর ব্যবস্থা করেছ। এবং সেসব বইয়ের অনুবাদ ইংরেজিতেও আছে, গার্ট্রুডের মাতৃভাষা জর্মনেও। কাজেই সে পড়ে নিতে পারে। এবং তখন সে শান্তনুকে আরও ভালো বুঝতে পারবে। ছবিটা কতটুকু সমাজ-সচেতন, কতটুকু দেশের যোজনার ব্যাপারে সহায়ক, তা যেমন বোঝা যাবে ; তেমন বোঝা যাবে কোথায় কতটুকু কী রং লাগানো হয়েছে। এবং জর্মনদের মতো, সে তো নিজেই জর্মন, এতে কোথায় লিবিডো, কোথায় ইগো ইত্যাদি।

ক্ষিদে পেয়েছে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল গার্ট্রুড।

কিন্তু তখনই তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে গেল।

পথের ধারের বাড়িটার দরজায় বেশ বড় বড় করে লেখা ইনডোর টেনিস ইনকরপোরেটেড।

তার মানে? শান্তনু বলল।

হয়তো বুড়োদের ক্লাব!

একসক্লুসিব বলছো?

সব মানে জানতে হবে কেন?

অবশ্য অবশ্য।

কিন্তু বাড়িটার থামওয়ালা দরজা পার হয়ে যেতে যেতে শান্তনু থেমে দাঁড়াল। পিতলের টবে রাখা পামের মধ্যে খাকি লিভারি পরা দারোয়ানকে দেখে। সিঁড়ির ওপরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে দারোয়ান মহাশয় পকেট আয়নায় গোঁফ নিরীক্ষণ করছে। কখনও ডান হাতে ছোট্ট আয়না, বাঁ হাতে গোঁফ ; কখনও বাঁ হাতে আয়না, ডান হাতে গোঁফ। গোঁফ বা আয়না, কাকে বাগে আনা শক্ত তা বোঝা যাচ্ছে না।

শান্তনু বলল, ট্রুডি, একে দশ ধরতে পারো। এটা বোধ হয় টেনিসের মিউজিয়াম।

গার্ট্রুড বলল, আমার ইনট্রেস্ট নেই মিউজিয়ামে।

এবার দারোয়ানের কর্তব্যবোধ জাগরিত হল।

সে বলল, দো টাকা পার্গেম। রিয়েল টেনিস, কফি গ্রিল বি আছে। কেলাব ফর্শেল।

গার্টুড বলল, এরকম তো শুনি নি। ঝিকঝিক করে হাসল সে।

ক্লাব ফর সেল। অর্থাৎ টাকা দিলে একটা দুটো গেমের জন্যে তুমি সাময়িক সভ্য হতে পারো।

দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা দেয়া দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, যাইয়ে।

শান্তনু হেসে বলল, দেখতে হচ্ছে।

খেলতে দোষ কি দু' এক সেট? গার্টুড বলল।

রিসেপশন টেবলে পৌঁছে দেখা গেল, খেলা বিক্রীর ব্যবসা মন্দ নয়। উঁচু খিলানের ছাতেব নিচে কালো রঙের মেঝেতে টেনিসকোর্ট। এয়াব কনডিশন করা। নেট টানা আছে। কোর্টের দুপাশে বসবার আসন। বিসেপশন টেবলের কাছেই টেনিস বুট নানা মাপের। বুট ছাড়া কেউ এলে লাগবে। তার আলাদা ভাড়া। তা বুটগুলোর চেহারা পরিচ্ছন্ন বটে। একদিকে নানা কোম্পানির তৈরি র‍্যাকেট। এমন কি যদি পোশাক বদলানোব দরকার হয়, ম্যাক্সির বদলে শর্টস, নানা রঙের নানা মাপের। না, না, বিকিনি পরে খেলার লাইসেন্স নেই এখানে।

গার্টুড টাকা দিতেই রিসেপশনিস্ট চাবি দিল নম্বর দেয়া ক্যাবিনেটের।

গার্টুড তাতে হ্যাণ্ডব্যাগ রেখে বলল, জুতো পালটে নিয়ে এসো।

রিসেপশনিস্ট তার ব্যবসার তাগিদে বলল, কোচ নেবেন? দু একটা লব, দু একটা স্ম্যাশ অথবা যদি আপনার ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইবকে আরও ক্লাস?

তারা যে ওস্তাদ খেলুড়ে এমন প্রমাণ নেই। কিন্তু লাঞ্চের আগের এই পরিস্থিতিটা অভিনব। এয়ারকণ্ডিশনের টেম্পারেচার এবং প্লাস্টিকের আড়ালের নিওন থেকে আসা আলোয় শীতের বিকেলকে অনুসরণ করার চেষ্টা ছিল। অন্তত তা রিশেপশনিস্ট সুইচ টিপতেই তাদের ভালো লেগে গেল।

দেখা গেল, কোর্টের এপার থেকে ওপার ছুটতে পারে গার্টুড এবং ক্লান্তিতে হাঁপালেও সহজে সেট ছাড়তে রাজি নয়। শান্তনু যতটা, তার চাইতে অনেক বেশী খেলতে চায় সে। দ্বিতীয় গেমের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ সে নেটের কাছে সরে এল। বলল, দেখো তো চোখে কী পড়েছে।

শান্তনু নেটের গায়ে র‍্যাকেট রেখে দুহাতে গার্টুডের মুখ তুলে ধরে চোখের মধ্যে খুঁজল। বলল, কিছু নেই, বোধ হয় কপালে যে চুল এসে পড়েছে তারই বাড়ি লেগেছে!

এই বলে সে কপালের চুল সবিয়ে দিতে গেল।

গার্টুড বলল হেসে হেসে সরে গিয়ে, সেট বাঁচাও আগে।

কিন্তু একে কি খেলাই বলা হবে? একবার একটা ভলি ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গার্টুড বলল, তোমার জুতোর ফিতে আলগা রয়েছে দেখো। আর একবার গার্টুড যখন সার্ভিস ডবলফল্ট করল, শান্তনু বলল, চেরি আঙুরের চাইতে খারাপ নয়, কী বলো?

কিন্তু আইনমতো সেটা শেষ হোক না হোক, ওদের খেলা যখন শেষ হল, শান্তনুর কপালে কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়েছে ; গার্টুডের মার্বেল সাদা কপালে তার খড়রঙের চুল ঘামে আটকে গিয়েছে; একটু হাঁ করে, বরং যেন আইসক্রিমের স্টিক চোষার ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে।

ইনডোর টেনিস ইনকরপোরেটেড থেকে বেরিয়ে এসে গার্টুড বলল, এটা কিন্তু আমার আবিষ্কার। কেউ কি ভাবতে পারে খেলা নিয়ে এমন ব্যবসা হয়?

আচ্ছা, স্যান্টায়ানা, কারা এদের খরিদ্দার? যারা ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না, অথবা যারা মেম্বার হওয়ার আগে কিছুটা খেলা রপ্ত করতে চায়।

অথবা যারা তোমার মতো পাগলী। চুলগুলো যেমন হয়েছে তাতে তোমাকে হিপি বলবো, কিংবা ইপি, বুঝতে পারছি না।

শান্তনুর হাত ধরল গার্ট্রুড্। বলল, তুমি যদি আমাকে জড়িয়ে ধবে টলেটলে চলো, তা হলে লোকে আমাদের মাতাল বললেও বলতে পারবে।

এমন নেশা লেগেছে নাকি!

কিন্তু এটা ভল্টের নিচের টেনিস কোর্ট নয়। বেলা বারোটা পার হযেছে আগেই। রোদ বিঁধছে গায়ে। রুমাল বার করে কপাল মুছল গার্ট্রুড, বলল, তোমাকে,—আচ্ছা তোমাব চুলে যদি ফড়িং লেগে থাকতো।

ফড়িং, হো, হ্যাঁ, তা ফড়িং কেন?

কোন দেবতার যেন তা ছিল।

এই মরেছে। এবকম কোনদিন শুনি নি। কিন্তু তোমার ক্ষিদে পাচ্ছে না ট্রুডি? আব তাতে আমার মনে হচ্ছে এটা ব্যায়লা কিংবা বেলেঘাটা তা এখনও বোঝা যায় নি।

রাস্তাটাকে সামনে পিছনে দেখল গার্ট্রুড। যাকে ডাউনটাউন বলে তা নয়। একটু যেন কম নাগরিক। অথবা প্লাইউডের শস্তা আসবাবেব কারখানা, যা বাড়তে বাড়তে ফুটপাতকে দখল কবাব চেষ্টা করছে সেটা এবং বালিশ-তোষকেব দোকানটা পাশাপাশি থাকাতে এবকম মনে হল।

ট্যাক্সি নেবো, বলল গার্ট্রুড্।

তখন তাবা ট্যাক্সিব প্রতীক্ষায। গার্ট্রুড বলল, কোথায় যে যাই, কী যে কবি। ওটা কি ড্রাগস্টোর? ওমা তাই তো। এসো বাছা, তোমাকে একটা আইসক্রিম কিনে দি।

কিংবা বিয়ার—

না, বাছা না, লাঞ্চের আগে বিয়ারের মতো বয়স নয় তোমার।

তারা সত্যি পাশের ড্রাগস্টোরে ঢুকল। এ এক সুন্দর আমেরিকায়ানা যে কলকেতায় ড্রাগ স্টোবে আইসক্রিম, স্ন্যাকস্ ও ওষুধও পাওয়া যায়।

সত্যি আইসক্রিম কিনল গার্ট্রুড।

কিন্তু যখন শান্তনু আইসক্রিমের মাঝামাঝি, গার্ট্রুড কিছু সংগ্রহ করতে ওদিকেব কাউন্টারে গেল। কী একটা বড়ি কিনল। জল চেয়ে নিয়ে গিলল।

গার্ট্রুড যেন নাচতে নাচতে ফিবে এল। শান্তত্ত বলল, মাথা ধরে নি তো? মাথা দোলাল গার্ট্রুড, হাসল সে ঝিরঝির করে।

লাঞ্চ একটাতে হলে ক্ষতি কী? বলল শান্তনু। বরং একটু বিশ্রাম করো।

কিছু নয়। একমাস টানা অবসরের প্রথম দিন আজ। বলে গার্ট্রুড উঠে দাঁড়াল।

দুমিনিটে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে গার্ট্রুড বলল, ওকে আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলো।

পোশাক পালটাবে?

কেন, এই চেক কি ভালো লাগছে না।

অতুল। পার্টিশনের কাচটা তুলে দেবো?

সিটের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে পরমুহূর্তে উঠে বসে বলল গার্ট্রুড, একটা সিগারেট দাও বরং। শান্তনুর পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিজেই সিগারেট দেশলাই বার করে নিল।

সিগারেট ধরিয়ে শান্তনু হাসি-হাসি মুখে কিছু বলল যা ধরা গেল না। গার্ট্রুড দুএকবার নাকে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে আবার সিটের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিল। স্বাস্থ্য অথবা সুখ যেন বারবার মার্বেলরঙের গালে রং লাগাচ্ছে।

আচ্ছা স্যান্টায়ানা, উঠে বসল গার্ট্রুড, তুমি কি একটাও গাছ দেখেছো?

গাছ! ও হ্যাঁ, গাছ? টেনিস ইনকরপোরেটেডের টবে বেঁটে পাম ছিলো না।

বাঃ, তা হলে তো তুমি ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডের গাছের কথাও বলতে পারো। তা সেগুলো অবশ্য গাছই। কিন্তু পাখি? একটাও পাখি দেখো নি, তাই নয়!

এটা এখন ডাউনটাউনে ঢুকছে ট্যাক্সি। এখানে পাখি কোথায়?

গার্ট্রুড যেন হঠাৎ সম্বিত পেল। সিগারেটে টান দিল। ধোঁয়া ছাড়ল।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে গার্ট্রুড বলল, তুমি লিভিং রুমেই বসো। আজ থেকে এই ফ্ল্যাট একলা আমারই।

বসবার ঘরের সোফাটাতেই বসল শান্তনু। তখন শান্তনুর পাশে এসে বসল গার্ট্রুড, যদিও তা করতে সোফার উপরে জমানো খানকযেক বই খালি চেয়ারটাতে ছুঁড়ে দিতে হল।

এখন? এই বলে হাসল গার্ট্রুড। আমরা ছবি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

কিন্তু লাঞ্চ?

সামনের তামিল ইটিং হাউসটা দেখ। ওখানেই সেরে নেয়া যায়। (একটু ভাবল গার্ট্রুড) কিংবা—

কিংবা ফ্ল্যাটে কি দুজনের উপযুক্ত স্রেফ রুটি, মাখন আর কফি হবে না?

তাহলে তো পোশাক বদলানোরও দরকার নেই।

অথবা যদি কোন রেকর্ড প্লেয়ার থাকে এবং প্রিসলির বক এন রোল। শান্তনু উঠে দাঁড়াল।

ববং—

কী ববং?

আমার পাশে এই সোফাতেই শোও। তুমি কখনো ঘাসে শুয়েছো স্যান্টায়ানা?

সোফাটা চওড়া। গার্ট্রুড শুয়ে একটু সরে যেকেই শান্তনুরও জায়গা হয়ে গেল।

সেকালের বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, আলো নিভিয়া গেল। তাঁর এক নায়িকা বলেছিল, তীর্থ করলে বলতে নেই। প্রকৃতপক্ষে, রূপসী পার্টি গ, আমাদের এই প্রয়োগ-কৌশলই পছন্দ, এমনকি এ বিষয়ে রবিবাবুর কন্দরে আবদ্ধ আকারহীন অন্ধ সেই জন্তুর হাতড়ে বেড়ানোর প্রয়োগ-কৌশল জানা থাকলেও! কারণ তীর্থের তৃপ্তির একটা প্রসাদ আছেই। বিলক্ষণ, কিন্তু একালের পক্ষে তা কি গ্রহণযোগ্য? এমনকি সেই যুগ্ম গিরিচূড়া, তার সানুদেশ, বিস্তৃত অধিত্যকা ও কন্দর প্রভৃতির বর্ণনায় নারী ও পৃথিবীকে অভিন্ন করার কবিপ্রসিদ্ধিও আর আধুনিক নয়।

এখানে শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিস্থিতিটা উভয়ের পক্ষে নতুন। যদিও বেলারা (বেলা সোম, প্রবীর সান্ডেল ইত্যাদি) কলেজ ছাড়ার পর থেকেই স্কুলেও সেক্স পড়ানো হচ্ছে। টেলিভিশনের এবং/অথবা সিনেমাস্কোপের সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাস. বক্সিং, কুস্তি, বিভিন্ন ধরনের নাটক, সাহিত্য ও চিত্রের বিজ্ঞান (সমাজ-সচেতনতা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি) প্রভৃতি যেমন কারিকুলামে ধরা হয়েছে, তেমনি সেক্স-জ্ঞানকেও আবশ্যিক করা হয়েছে। ওটা নাকি ডোমেস্টিক সায়েন্স এবং হাইজিনের মতোই। কারণ, এ বিষয়ে বেশ কিছুদিন আগে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা ও সংবাদপত্রের সম্পাদকরা বুঝতে পেরেছিলেন—নতুবা দেশটা পিছিয়ে থাকছে।

তাহলেও সমুদ্র সম্বন্ধে বিজ্ঞান বা কাব্যের পুঁথি পড়া এবং তার তরঙ্গিত বুকে নিজেকে সঁপে দেয়া এক কথা নয়। সেই আবেগের কথাই এসে পড়ে। নতুবা সেই পিলটার কথাই বলতে হয় যা গার্ট্রুড ড্রাগস্টোরে গিলেছিল অ্যাসপিরিনের মতো। নাকি এটা তেমন পিল যা (যদি কেউ নিত্যনৈমিত্তিক পিল খেতে ভুলেও থাকে) যে কোন অবস্থাতেই আধঘণ্টারও কম সময়ে কার্যকরী এবং অমোঘ, এবং উপরন্তু যাত একটা নেশার ঘোর লাগে, যদিবা কারো কারো ক্ষেত্রে প্রায় বিশ কাউন্ট ব্লাড-প্রেশার চড়ে যায়।

কিন্তু যেহেতু এটা উপন্যাস, আমরা বরং রুচির বর্ণনা করি।

গার্টুড বলল, শান্ত, এই আমার ভাল লাগে, এই দুপুরের অলস মধুর উত্তাপ আর নিস্তেজ আলো। রাত্রি নয়, বরং হেমন্তের বিকেল যেন। সবুজ শিফনের সেমিজটাকেও সে কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে দিল।

ঘণ্টাদুয়েক পর বিঙ্কোর সদর দরজার কাছে বিদায় নিল মিত্রা বাসু।

প্রবীর বলল ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে, শান্তনুকে একেবারে নতুন করে দেখছি।

রিঙ্কোর দরজা থেকে ওল্ড আলিপুরের ম্যানশন—তা অনেকটা দূরই হবে। একথাও ঠিক, শহরের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুর দূরত্বে গত কয়েক বছরে কিছু তারতম্য ঘটেছে। মাঝখানে দূরত্বটা সঙ্কুচিত হয়ে চলেছিল ক্রমশ আরও দামি আরও দ্রুতগামী গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এখন আবার দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে সেই দ্রুতগামী গাড়িগুলোর সংখ্যা আরও বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। যদিও সেই দুঃস্বপ্ন এখনও সত্য নয় যে সমস্ত পথ ফেন্ডার-বাম্পারে লাগা একটামাত্র গাড়ির মালা।

তা হলেও কলকেতার ক্যাবি! এর আগে একবার তাদের একাংশের কথা বলেছি—সেই ফ্রিল্যান্স মেকানিক ড্রাইভার যারা পার্ক করা গাড়ির দঙ্গল থেকে, পাঠিকা, মুহূর্তে আপনার গাড়িটাকে একটা দশটাকার বদলে, বার করে আনে। আর এই অংশে যারা প্রকৃত ক্যাবি! আমার তো মন হয়, এদের গুণপনা এবং কলাকুশলতা বর্ণনা করা সেদিনই সম্ভব হবে যেদিন ক্যাবিদের নেভিল কার্ডাস আত্মপ্রকাশ কববে। আপনাদের মনে পড়ে কি, কবজির একটা মোচড়, সিল্কের একটা ঢেউ, আর বলটা বাউন্ডারি পেরিয়ে বিশ্রাম কবেছে, তেমনি ফেন্ডার বাম্পারে লাগা ছুটন্ত সারিব মধ্যে সেই এক অচিন্তনীয় অসম্ভব মুহূর্তে আপনার নির্বাচিত জায়গার প্রায় এক গজের মধ্যে পেভমেন্টের ধারে গাড়ি এনে দেয়—মুখে একটা খিস্তি, চাকার একটা মোচড় আব গাড়িটা থেমে গিয়ে তার এঞ্জিন মৃদু চাগ চাগ করছে।

এ বিষয়ে আমাদের পূর্বপরিচিত দর্শন-ছাত্র রাজেনের মত প্রণিধানযোগ্য। তার ভাইটানুবা পত্রিকায় সে একাধিকবার এরকম মত প্রকাশ কবেছে যে সংস্কৃতি শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক, যোগরূঢ় অর্থে তা যতদূর সম্ভব উৎপন্ন পণ্য হাতানো—অন্তত বৈজ্ঞানিক-সংস্কৃতিগোষ্ঠীর প্রায়োগিক মেলের সংস্কৃতি একেই বলা যায়। এবং যতদিন এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হচ্ছে, ততদিন ফেন্ডাবে-বাম্পারে লেগে চলা এবং ক্যাবিদের নেভিল কার্ডাসকে আহ্বান করাই হবে স্বাভাবিক।

কোথায় এখন রাজেন? পাঠিকা, আপনার মনে থাকবে সে লাঞ্চের জোড়াতালি ব্যবস্থা করে চিত্রপ্রদর্শনীতে ঢুকেছিল। এখন সে ড্রুরি লেনে শোরডিচ কাফেটেরিয়ার সংলগ্ন সেই ক্লাসিক থিয়েটারে এবং সেখানে বসে সে তার ভাইটানুবা নামক পত্রিকার জন্য প্রুফ দেখছে। ত্রিশ পাতার চটি পত্রিকা—যার বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র কবিতা (কখনও বা), দুটি প্রবন্ধ (অবশ্যই), গল্প অথবা একাঙ্ক নাটক (পাওয়া গেলে ; তা যদি ছাপার উপযুক্ত হয়)। তার আর্মির ডাক্তার বন্ধু অমল বলে, ভিটামিন যদি চলে, কলকেতার রাস্তার নাম যদি লেনিন সংযুক্ত হতে পারে, যদি বাংলাদেশে ক্রিশ্চান ধর্ম আর মার্কসবাদ উটকো বিপত্তি না হয়, ভাইটানুবা কোন পত্রিকার নাম হলে ক্ষতি কী?

ক্ষতি নেই। বরং স্বাভাবিকই, ইংরেজি সাহিত্য ঘেঁষা এই পত্রিকার নাম। নব-জীবন রাখলে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হতো না। কিন্তু তাতে পত্রিকার সম্পাদকের মনোভঙ্গীটা ঠিক ধরা পড়তো কি? আমরা কি মনের দিক দিয়ে জোব চার্নকের ব্রাহ্মণী-বিধবা স্ত্রী সেই লীলার বংশধর নই? এবং এখন সকলেই জানে, ইংরেজিআনা বাদ দিলে আমরা ক্যালকাটানও থাকি না, শিকড় ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে রাজেন, সংস্কৃতির এই দিকটা চিন্তা করছিল না। সে বরং সংস্কৃতি, ছবি দেখার মৌসুমী আগ্রহ এবং ছবি কেনার কথা ভাবছিল।

খাবার টেবল থেকে সরে এলেই মানুষের মনে অন্য ক্ষুধা জাগে। এক সময় তো ছিল, ঈশ্বর, আত্মাকে পরিমার্জিত সংস্কৃত করার জ্ঞান, সাধনা ইত্যাদিকে সংস্কৃতি বলা হতো। আর তা থাকার ফলে মানুষ নিজেকে ফাঁপা কাঁচের গোলক মনে করতো না। ঈশ্বব গত হওযাব ফলে সংস্কৃতি একদিকে হল লম্বা ধরনের গাড়ি কেনা, নতুন ধরনের জামা-কাপড় পরা, ডাক্তাববা যে সব ওষুধ প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সব শেষের ফ্যাশানটাকে নিজের উপরে প্রয়োগ করা ইত্যাদি ; অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি চর্চা করা। এখন হয়েছে কি সেকালে যারা দলবদ্ধভাবে দুর্গোৎসব দেখতে যেত বা চড়ক, কিংবা ঝিঙে ষষ্ঠীতে ঝিঙে খেত, তারা সবাই ঈশ্বরকে খুঁজতে ব্যস্ত ছিল না। কিন্তু দলবদ্ধভাবে নতুন জামা-কাপড় পরলে ভালো লাগতো। সেখানে যেন দু-এক মুহূর্তের জন্য ব্রতপালন কবে মনটাকে ভরাতো। এখনও তেমন ছবির দিকে মৌসুমী ভিড। রাজেন বয়স্ক পৃথিবীর এই কৌতুক (কিংবা আত্মপ্রবঞ্চনা বলবে?) লক্ষ্য কবে হাসল আপনমনে। এ বিষয়ে সেই ফোরম্যানিটির যূথবদ্ধ ভিড়, আর প্রবীর সান্ডেলের গ্রুপ, এমন কি মন্ত্রীমহোদয় অলীক মুখুয্যেব পারিষদবর্গ যাদের মধ্যে চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণে এম-এস-সি নিশ্চয়ই একাধিক ছিল (নতুবা লাল ঘোড়ার ঘরে অত সমাজ-সচেতন ভিড় কেন?), সবই এক। এ সেই দুর্গোৎসবের প্রতিমা দেখার ভিড়ই, ডাকেব সাজ, ঢাকেব বাজনা, কেউ বা সাপের খোলস কিংবা ঘুঁটে দিযে প্রতিমা তৈবি কবাব কলাকৌশল দেখে , বড জোর কারো মনে পুরাণবর্ণিত রূপ অস্পষ্টভাবে দেখা দেয় , (এটা কিন্তু কৌতুকেব—আগে, অনেকদিন আগে মহালয়ায যেমন হেঁড়ে গলার বিচিত্র উচ্চারণে বিসর্গগুলোকে 'হ' উচ্চাবণ করে শক্তিপুবাণ পাঠ হতো, প্রাচীনের গবেষক বাজেন এসব নিশ্চযই জানে, এখনও এই ছবির মরশুমে প্রতিদিন সকাল আটটায এবং রাত্রি সাড়ে নটায় বেডিও খুললে দেলাক্রোয়া, পিকাসো, অবন ঠাকুব, ইত্যাদি ইত্যাদি শুনতে পাবে।) কিন্তু এরকম একটা প্রবাদ আছে, সেই প্রতিমা-দর্শকদেব ভিড়ে লাখে এক তান্ত্রিক আসতো। এবং সে নাকি প্রতিমায় আদি-অন্তহীন জন্ম-জীবন-মৃত্যু স্রোতের মহাকালীকে দেখতে পেত। তখন তাব মন উদাস-আনন্দে পূর্ণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু প্রবীর? এই ছবি দেখার মৌসুমি আগ্রহে তার বৈশিষ্ট্য কি লুকিযে থাকা তান্ত্রিকের মতো কিছু? সে কি নিজেব অস্তিত্বকে সৌন্দর্যবোধে মিশিয়ে দিয়ে সার্থক, জীবন-ছবির ঘবে ঘুবতে ঘুবতে? নাকি সেই মৌসুমি ছবি দেখতে চুরাশি নম্বরে আগ্রহ দেখানোর বৈশিষ্ট্য, বা তার স্টাইলটাই দেখানো আসল কথা?

কিন্তু আমরা পথের ভিড়ে জমাটবাঁধা ট্যাক্সির কথা এবং ফ্রিল্যান্স ক্যাবিব কথা বলছিলুম, কিন্তু এটা নেহাৎ অহেতুক বিচরণ হচ্ছে হয়তো। রিঙ্কো ক্লাব থেকে মিত্রার রওনা হওয়াব মুখে যে ভিড়টাব কথা উঠে পডেছে, তা বেলা চারটের পথে থাকতে পাবা অসম্ভব না হলেও, আজ কিন্তু এখন নেই।

রিঙ্কো থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড় নিয়েই যে পথটা, ট্যাক্সি সেটায় পড়তেই মিত্রাব মনে এক ভিড়েব রাত্রির স্মৃতি দেখা দিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, কেননা, সে রাত্রিতে ডিনারে যেতে আসতে সে এবং শশী এবং শান্তনু এইপথে চলেছিল। সে রাত্রির স্মৃতি বলতে কিন্তু সাধারণত যে ভাবাবেগ আকর্ষক ঘটনা মনে আনা বোঝায় তা নয়। আর এমনও নয় যে সে রাত্রির স্মৃতি এই বর্তমানের বিকেলকে স্থানচ্যুত করে নেমেছে। এক গ্লাস সোডায় রঙিন পোর্ট ঢাললে (মনের ভুলেই একমাত্র এরকম হতে পারে) দুটো মিশে এক হওয়ার আগে পোর্টের জামরসের রঙ সাদায় গুলে যাওয়াব আগে নানা আকারে নিচে নামে ; সেই রাত্রিব স্মৃতি গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা বেলা চারটের শুকনো ধুলো-ওড়া পথে মিশল সে রকমভাবেই মিত্রার মনে ; মনের ভুল এভাবটাও মনে রাখতে হবে, কিংবা কথাটা লাঞ্ছতৃপ্ত দেহের নিঝুম ঘুমেলা ভাব।

সে রাত্রিটাও অসাধারণ ছিল না, ডিনারটাও না। সেটা একটা সাদামাটা ডিনারই ছিল স্টেট বি হোটেলে। সে হোটেল এজন্য যে সকালের কাগুজি বিজ্ঞাপনে জানা গিয়েছিল ম্যাগিয়ার ব্যান্ড আছে সেখানে। স্টেট বি হোটেল বলতে অবশ্যই বিশেষ কোন এক হোটেল নয়, রাষ্ট্র পরিচালিত বি অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল ; যেহেতু শ্রেণী শব্দটাই অ্যালার্জিজনক, সেজন্য বি ; ম্যাগিয়ার ব্যান্ড (হাঙ্গেরিয়ান বললে কথাটা রাজনৈতিক পক্ষপাত সূচনা করে না?) পালা করে এ হোটেল ও হোটেল করবে।

কিন্তু ট্যাক্সির মুখেই যেন ভিড়, আর ফুটপাথ স্টলে সমাকীর্ণ হওয়ায় রাস্তায় পায়ে চলা মানুষের ভিড়। কলকাতার ক্যাবি, এই যা ভরসা। কিন্তু কলকেতাব ক্যাবি স্বতই করিৎকর্মা হোক, পৌরপিতারা তেমন নয়। এটা মিত্রার চোখে নতুন করে লাগছে, কারণ সে বেশ কিছুকাল বিদেশে থেকে এসেছে। নতুবা বোধহয় বলা উচিত—কলকেতার পৌবপিতারা, তাব পৌরপিতারাই, যেমন কলকেতা, কলকেতাতেই আছে। তোমাকে মেনে নিতে হবে এই ঐতিহ্যবাহিতা। (কাবো কারো মতে এই পৌরসভাই ভারতীয় ডেমোক্রেসির আদি জননী, ভোটের জন্য অন্যায়, চুবি, স্বজনপোষণ, কাজ না করিয়ে খাতায় নাম দেখিয়ে কর্মচাবী পোষা ইত্যাদি, এখানে এই মাটিতেই জন্মেছে, মা)। সেই কবে একবার হঠাৎ ট্রামকে রাস্তার নিচে পাঠিযে বাস্তায় কিছু গাছ লাগানো হয়েছিল। (হায, এদেশের সূর্যকে কিছুতেই নিউইয়র্ক, পারি, লন্ডনের মতো ভদ্র করা যায না, মাঝে মাঝে মানুষের মনে গাছের ছায়ার জন্য বর্বর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।) ক্লাইব স্ট্রিট, হ্যাবিসন রোডের বদলে একসময়ে নেতাজী সুভাষ রোড, মহাত্মা গান্ধী বোড, পরে আবার বদলে লেনিন সরণি, হো চি মিন বোড, গুয়েভারা বীথি, ফিডেল কাস্ট্রো সড়ক ইত্যাদি হযেছে, কিন্তু ট্রাফিক-জ্যাম, ডাস্টবিন উপচানো ডাবের খোলা ইত্যাদি, এবং ফুটপাথ-জোড়া হকাব সেখানেই আছে, যেখানে ছিল।

আর সে রাত্রিতে শশী শাশাঙ্কা মন, স্মৃতি ইত্যাদি নিযে কথা বলছিল ডিনার থেকে ফেরার পথে।

এখন মিত্রাও কোন বিশেষ ব্যাপারে মন রাখতে চাচ্ছে না। ববং এইতো এতক্ষণ কলকেতার পৌরসভা ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা কবল। এখন কী মনে আসবে, তা মনও জানে না। প্রবীর সান্ডেলের সঙ্গে লাঞ্চটা ভালো হয়েছে।

এখন তেমন ভিড় নয় পথে, তবু থামল ট্যাক্সি। আর ঠিক সেজন্যই যেন মিত্রার মনের উপর দিয়ে কথাটা খেলে গেল। একটু যেন চোখের পাতাটা কাঁপল তার, তারপর সে চোখ তুলল। একটু অবাক হল যেন সে। হঠাৎ কথাটা মনে এল কেন? ডানদিকের দোকানটার সামনে ভাঁজ কবা লেপ-তোষক, তবে সে সবেরই দোকান এটা। মিত্রা অবাক হয়ে নিজের মনের মধ্যে যেন কথাটা মনে আনার কারণ খুঁজল। নিজের হ্যান্ড ব্যাগ খুলে সিগারেট বার করে ধরাল। সাইকাইআট্রিস্ট।

আর তখনই সবুজ আলো পেয়ে মোড়টা পার হল ট্যাক্সি।

অবশ্য এই শব্দটা মনে হওয়ার একটা মনস্তত্ত্ব-সমর্থিত কাবণ এই হতে পারে (মনস্তত্ত্ব নাকি উপন্যাসে প্রকাশযোগ্য!), মিত্রা বুঝতে না পারলেও, এর আগের বার এ মোড়টা পার হতে গিয়ে, সেই ম্যাগিয়ার ব্যান্ডের স্টেট বি হোটেলের ডিনারের রাত্রিতে, এমন লাল আলোব সামনে গাড়ি থেমেছিল, আর তখন ডান হাতের কাছে ছোট একটা সাইনবোর্ড, যা নাকি ব্লকটার ঢাউস ঢাউস সাইনবোর্ডের মধ্যে প্রায় অদৃশ্য, যাতে চোখ পড়েছিল শশী শাশাঙ্কার, পরে মিত্রার। সেই মোড় বটে, এখন চোখে পড়ল না। মোড়টার কম্পোজিশন শব্দটা মনে এনেছে নাকি?

সবুজ আলো জ্বলতে না জ্বলতে মোড়টা পার হল ট্যাক্সি আর মিত্রা তখন ভাবল, সাইনবোর্ডটা দেখা গেল না। বোধহয় তাতে লেখা ছিল, প্রাইভেট সাইকিক এজেন্সি। আর শশী (শাশাঙ্কা) তখন তা নিয়ে আলাপ করেছিল। আর তা সুবিধারও ছিল, কারণ তার আগেই শশী মন, স্মৃতি এসব

সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলাপ করছিল, ডিনারান্তিক আয়াসের আলাপ। মিত্রা মনোবিকলনের ব্যাপারটা জানে না এমন নয়, কিন্তু শশীর মুখে খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে তাব বোধ হয়েছিল, শশী এ বিষয়ে যেন পপুলার অথরিটিদেব একজন।

মিত্রা বলেছিল, সেই স্টেট বি হোটেলের ডিনার থেকে ফিরতে ফিরতে, সেকালের হোমিওপ্যাথদের মতো বলছো? গূঢ় কিছুর আশায় এইসব প্রাইভেট এজেন্সিতে যায় লোকে? কথাটাও দেখো, সাইকিক, যার সঙ্গে আধিভৌতিকতার যোগ আছে।

শশী বলেছিল সিগারেট ধরিয়ে (এখন যেমন মিত্রা ধরিয়েছে), তা নয়, মানে তুলনাটা, উঁ, হ্যাঁ, ব্যাপারটা বরং সেই সব সেকালের প্রাইভেট ক্লিনিকের মতো যা খুব কাজে লাগত, গর্ভপাত স্ত্রীলোকের মৌল অধিকারেব অন্যতম বলে আইন পাস হওয়ার আগে। তখন যে কোন স্টেট হসপিটালে গিয়ে এখনকার মতো অত সহজে বলাও যেত না, ঘটানোও যেত না। তখন এই সব প্রাইভেট ক্লিনিকের খুব আদর ছিল—আর তা প্রয়োজনের বলেই।

কিন্তু সেগুলোর সম্বন্ধে ভয় ও ঘৃণার ভাবও ছিল। তাই নয়?

তা কিছু ছিল হযতো, কিন্তু তাই বলে এই প্রাইভেট ক্লিনিকের ডাক্তারবা কোন রকমেই হাতুড়ে ছিল না। পুলিসেব সাথে হৃদ্যতাব সম্পর্ক রেখে চলত, পুলিসও তাদের প্রাইভেসিতে নাক গলাতো না।

এখন যেমন সে সব প্রাইভেট ক্লিনিক আর নেই, তোমাব এই প্রাইভেট সাইকিক এজেন্সিও হয়তো তেমন উঠে যাচ্ছে।

শাশাঙ্কা একটু ভেবেছিল। বলেছিল, ঠিক তা নয়, তাই না?

এবপবে শাশাঙ্কা ইউনিযান অব সাইকাইআট্রিস্টদের ল্যাবোরেটবি—এবাই বৈধ, সবকার সমর্থিত—আব প্রাইভেট সাইকিক এজেন্সিব স্বল্পসংখ্যাব অফিসগুলোব মধ্যে কী পার্থক্য, অন্তত তার চোখে যা ধরা পড়েছে, তা নিযে আলোচনা কবেছিল।

তফাৎটা কি ট্রুথ-সিরাম ব্যবহাবে? মিত্রা প্রশ্ন করেছিল। মিত্রার কি আগ্রহ দেখা দিচ্ছিল সেদিনই, সেই বি হোটেলের ডিনার থেকে ফিরতে ফিরতেই, মনস্তত্ত্ববিদদের সম্বন্ধে? জানা বিষয়ে শশীর সঙ্গে আলাপ করে জানাটাকে আবও নির্ভরযোগ্য করাব সুযোগ পেয়ে সেদিকে ঝুঁকেছিল?

তাও বটে, কিন্তু তাই নয়। ট্রুথ-সিরাম ব্যবহার দু ক্ষেত্রেই হয়। ইউনিয়ান অব সাইকাইআট্রিস্টদের ওরা তা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে, আর প্রাইভেট এজেন্সির এরা পেশেন্টের মত নিয়ে, তা পেলে তবে। স্টেট ফ্যাকালটি অব মেডসিন যেমন রোগীকে অপারেশন করা হবে কি না সে সম্বন্ধে রোগীর সঙ্গে পরামর্শ কবে না, ইউনিয়ান অব সাইকাইআট্রিস্ট তেমন কখন কোথায় ট্রুথ-সিবাম ব্যবহার করতে হবে, সেজন্য ভিজিটারের মতের অপেক্ষায় থাকে না।

শাশাঙ্কা বলেছিল, লক্ষ্য কবো ইউনিয়ানের ওরা বোগীকে বলে ভিজিটার। যেন একান্ত স্বেচ্ছায় আপন খুশিতে গিয়েছে তাবা। এজেন্সিব ওবা বলে অবজেক্ট। যেন অবজেক্টই বিশ্লেষণের। কিন্তু আসল তফাৎটা এই, ইউনিয়ান ল্যাবোরেটারিব রেকর্ড সব সময়ে দুকপি হয়ে থাকে, যার এক কপি যায় পুলিশ বিভাগের নানা শাখায়, ভিজিটারের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব হিসাবে ; প্রাইভেটের রেকর্ড ওরা প্রাইভেট রাখার চেষ্টা করে। আর সেজন্য পুলিশ ওদের উপরে অত্যাচার করে থাকে, যেমন হামলা আগে সেইসব প্রাইভেট মেটার্নিটি ক্লিনিকে করতো কখনও কখনও। লাল নখের এনামেলে পথেব আলো এসে পড়েছিল শশীর, যখন সে গাড়ির জানলার বাইরে হাত নিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়েছিল।

সে বলেছিল, আইন অনেক সময়ে পুলিশের পক্ষে থাকে। সব দেশের আইনেই বলা আছে, যদি কেউ কোন অপরাধের সংবাদ জেনেও গোপন করে তবে সেও অপরাধ করেছে বলতে হবে—অ্যাকসেসরি আফটার ফ্যাক্ট।

মিত্রা বলেছিল, কিন্তু ডাক্তারকে রোগী যা গোপনে বলে, তা গোপন রাখবার অধিকার আছে ডাক্তারের।

তা ততক্ষণ যতক্ষণ সেটা কোন গোপন অপরাধ নয়।

কিন্তু, মিত্রা আবার প্রশ্ন করেছিল, পুলিশ বিভাগেব নিজেরই তো ট্রুথ-সিরাম ব্যবহার করার ল্যাবোরেটরি আছে।

শশী বলেছিল একটু মৃদু হেসে, সে তো চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সেকেলে অপরাধের বেলায়। মনে করো, দেশদ্রোহিতা, কিংবা পার্টির সমালোচনা, পার্টি বিবোধিতা, এগুলো তো গোপনে হয়। বাইরে ঘটনা ঘটবার আগেই তো মনে মনে ঘটে থাকে। আব আগে থেকে তা জানাও দরকার।

মিত্রা বলল, কিন্তু যাদের কিছু লুকানোব আছে তাবা ইউনিয়ান ল্যাবোরেটারিতে যাবে কেন?

আ, মিত্রা। ফিজিক্যাল চেক আপেব সঙ্গে সঙ্গেই আজকাল চিন্তার চেক আপ হয়ে থাকে মাসেক দুমাসে। মাসেক দুমাসে ডাক্তার দেখায় না এমন সেকেলে লোক শতকরা পাঁচজনও কি আছে? আর যখন অথোরাইজড মেডিক্যাল এ্যাটেনড্যান্ট কাউকে ইউনিয়ান অব সাইকাইআট্রিস্টে খোঁজ-খবর নিতে বলে, তখন না নিয়ে উপায়?

লুকিযে থাকা লেপাবের মতো অবস্থা হয তার? কুষ্ঠী না কথাটা?

তা ছাড়াও, শশী বলেছিল, দেখ মানুয নিজের মনের অস্বস্তির কারণ জানতে চায , কেন সব থেকেও সুখ নেই , কেন অস্থিরতা আব চঞ্চলতা আব কুণ্ঠা আর উদ্বেগ আর অতৃপ্তি, তা জানতে চায। এটাকে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিব বা আসল সংস্কৃতিব ঝোঁক বলতে পাবো।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে সামনের অ্যাশট্রেতে সেটা টিপে টিপে নিবিযে দিল মিত্রা। শশীব কথাই মনে হল তার। পথের কথা আর মনে আসছে না যেন। ও, আচ্ছা মজার ব্যাপার তো। সেই দশটায় বেরুনোর সময়ে দরোয়ান তাকে যে এক্সপ্রেস চিঠিটা দিয়েছিল, সেটাকে কোথায় রাখল তবে? ঠিকানা লেখা থেকেই বোঝা যায়, সেটা শশীর লেখা। এক্সপ্রেস মানে জরুরি, এমন নয় ; শশীর কাছে সত্যিই জরুরি কোনটা বা কোনটা এক মুহূর্তেব জন্য জরুবি মনে হয়েছিল, তা বোঝা শক্ত। হ্যান্ডব্যাগটা খুলল মিত্রা। চিঠিটা সেখানে রয়েছে। মোটা কাগজেব বড় চৌকোণ খামে কালো কালিতে লেখা ঠিকানা। শশীর ছাড়া আর কার?

চিঠিটা হাতে নিয়ে মিত্রা শশীর কথা ভাবল ; তা বিজ্ঞান-সংস্কৃতি এখন স্থায়ী রাজ্যলাভ করবে, আর শশীও তারই সমর্থক। কিংবা কথাটা ঠিক হল না, বলা উচিত বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিরাজ কবতে যদি ভোট চায় তবে শশী হবে একজন বিবেকবতী ভোটাব। বেলা এবং তার মতো দুয়েকজন ছাড়া, কে নয়? বেলার বসিকতাটা মনে এল মিত্রার। বেলা বলেছিল, তা আগে সাহিত্য-সমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব পলিটিক্যাল সায়েন্স, সঙ্গীত, ইকোনমিক্সে লোকে এম এ পাশ করতো, এখন এম এস সি পাশ করে।

শশীর এই যে সব জানতে চাওয়া, প্রাইভেট কিংবা ইউনিয়ান—যে সাইকাইযাট্রিস্ট হোক, তাদের সম্বন্ধে জানা, এর মূলেও বৈজ্ঞানিক মনের ঝোঁক আছে। শশীর বিশ্বপরিক্রমার—সারা বছরই তো ঘুরছে--যদি কেন্দ্র থাকে, তবে তা ভিয়েনা। এবং সেখানেই তার হেলথ চেক আপ হয়। এবং মিত্রা বিশ্বাস করতে পারে, সেখানেই শশীর ব্যক্তিগত প্রাইভেট সাইকাইয়াট্রিস্ট আছে।

শশী কিন্তু বলেছিল, শুধু কি তাই, মিত্রা? এ বিষয়ে আমি একটু চিন্তাও করেছি। আজকালকার এই সাইকাইয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া, যা চল্লিশ পেরোনো মেয়েদের সার্কিনোমার জন্য চেক আপের মতো, এর মূলে কিন্তু—কী বলো তো?

কী বলতে চাইছ?

একটা ট্রাডিশান। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রয়োজন ছিল কনফেশনে তাতে মনে শান্তি আসতো। তাই

নয়? এখন সব রাষ্ট্রই ধর্মকে আর দশটা হবির মতো একটি মনে করে থাকে, যদি না তার চেয়েও খারাপ মনে করা হয়। কিন্তু ট্রাডিশানটা থেকে গিয়েছে।

মিত্রা এই ধরনের কথায় উঠে বসেছিল সোজা হয়ে।

শশীর মুখেই প্রথম শোনা গেল, এর আগে কোথাও পড়েছে বলে মনে পড়ল না, কথাটা কিন্তু ধাক্কা দেয়ার মতো—এই চিন্তার স্মৃতির উপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে মিত্রার মন ব্যাগের মধ্যে আঙুলে ধরা চিঠির দিকে একাগ্র হল।

শশী শেষে বলেছিল, ওই সবুজ বারান্দা-টুপি, পুরনো স্ট্রাইপ-সার্জের সুট পরা, চিমসে মুখ ও সাদা চোখা দাড়িওয়ালা লোকটাই শশীর নিজের অ্যাটেন্ডিং সাইকাইআট্রিস্ট এখানকার। অর্থাৎ হঠাৎ কিছু হলে ভিয়েনার স্পেশালিস্টের কাছে পৌঁছনোর আগে এই লোকটি।

এ পথ তার পরিচিত। আর পনের মিনিট লাগবে ওল্ড আলিপুরে পৌঁছতে। শশীর চিঠি এক্সপ্রেস হলেই জরুরি হবে, এমন নয়। হয়তো যেখানে যখন পোস্ট করছে, সেখানে তখন এক্সপ্রেস ছাড়া অন্য চিঠি নেয় না বলেই এক্সপ্রেস।

হঠাৎ একটু শিউরে উঠল মিত্রা। ট্রুথ সিরাম সাধারণ নাম। তা সাধারণের পরিচিত সোডিয়াম পেনটোথাল হতে পারে। মিত্রা যেন একটা সাদা চার দেয়ালের ঘর দেখতে পেল। যার একপাশে একটা মাত্র লোহার খাট, হাসপাতালে যেমন থাকে। স্যালাইন দেয়ার মতো কৌশলেই বাড়িয়ে রাখা বাহুর শিরায় শিরায় ফোঁটা ফোঁটা ডাইলুটেড সোডিয়াম পেনটোথাল ঢুকছে। হ্যাঁ, সেই অবস্থায় মস্তিষ্ক ঘুমিয়ে পড়ে, অন্তত মিথ্যা তৈরি করার মতো এনার্জি থাকে না মস্তিষ্কের অথচ কথা বলে যাওয়ার মতো খানিকটা শক্তি তখনও থেকে যায়। ভয় ভয় করে উঠল যেন মিত্রার।

তারপর সে হাসল। শশীর চিঠিটা মেলে ধরল চোখের সামনে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। না, ঠিক তা নয় , নরউইজিয়ান এক তিমি শিকারের ডিজেল বোট থেকে লিখেছে। শীত নয় ওদিকে এখন? এক স্পার্ম হোয়েলের পিছনে চলেছে তারা সকাল থেকে। অবশ্য চিঠিটা পোস্ট করার সময় পর্যন্ত না হোক, লেখার সময় পর্যন্ত।

আজকাল এমন আপাত নিঃসঙ্গ ডিজেল বোট থেকেও ছোট ছোট হেলিকপ্টার ডাক দেয়া-নেয়া করে।

আর একটা সিগারেট ধরাল মিত্রা জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।

দাড়াও, দাড়াও।

ট্যাক্সি পেভমেন্টের কোল ঘেঁষে দাড়াল।

পাশের দোকানটা ফুলের। কার্নেশন? হ্যাঁ, তাই তো।

এক গোছা কিনে আনল ক্যাবি মিত্রার নির্দেশে।

ভারি সুন্দর না? বলল মিত্রা। আজ রাত্রিতে তো [illegible]তেই থাকবে সে ডিনারে। কালকের লেকচারের স্ক্রিপটা একটু দেখে নিতে হবে।

ট্যাক্সি আবার চললে সে শশীর চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

না, এখন আর তেমন বিপজ্জনক নয়, এই তিমি শিকার। হারপুন এখন আর হাত দিয়ে ছোঁড়া হয় না। আর, তা ছাড়া স্পার্মাসেটি অথবা চর্বির জন্য শিকার করারও জরুরত কিছু নেই। স্পোর্ট, স্পোর্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এমন ভায়োলেন্ট, একটা এত বড় প্রাণস্পন্দনকে হত্যা করার এ দৃশ্য আর কোথায় পাবে?

তা হয়, ভাবল মিত্রা, একটা স্পার্ম হোয়েল রাস্তাটাকে আড়াআড়ি শুয়ে আটকে দিতে পারে।

মোড় নিল গাড়িটা। চিঠিটা খামে না পুরে হ্যান্ড ব্যাগে রাখল। ব্যাগ বন্ধ করল। বলল সে আপনমনে, কত জায়গার কত বর্ণনাই না শশীর চিঠিতে আসে, যখন সে চিঠি লেখে।

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সিট থেকে কার্নেশনের গুচ্ছ তুলে নিয়ে দেখল। সোনালি ফ্রেমের চশমা থেকে তার দীঘল চোখদুটি একাগ্র হয়ে রইল ফুলগুলোর দিকে। কিন্তু, শশীর কথা এত ভাবছে কেন সে? প্রকৃতপক্ষে সাইকাইআট্রিস্টদের কথাই তো আসছিল মনে। যেন সাইকাইআট্রিস্টদের সঙ্গে শশীকে দেখে পেয়ে, সে এগিয়ে গিয়ে শশীকে অবলম্বন করেছে। সে কি সাইকাইআট্রিস্টদের তেমন পছন্দ করে না? অর্থাৎ, সে কালে কোন কোন ক্রিশ্চিয়ান যেমন কনফেশনে রাজি হতো না।

একটা কুণ্ঠা যেন গলার তলায়। কিন্তু এখন হঠাৎ সাইকাইআট্রিস্টদের কথাই বা মনে হল কেন? তার অবচেতন মনই কি এজন্য দায়ী? সেরকম, ওরাই বলে বটে।

তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে হয়ে একটা নিঃশব্দ হাসি তৈরি হল। হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে (যেন তা লাঞ্চের আতপ্ত মোহ কাটিয়ে ওঠার ফলেই বা) উঠল তার মন। ফুলগুলোর গায়ে আলতো করে আঙুল বুলিয়ে সে ভাবল, শশীকে এবার বলতে হবে—মানে বলা যেতো তখন—মানুষ তা হলে বেশি মর‍্যালিস্ট হতে চাইছে এযুগে, যদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক ডাক্তার দেখানোর মতো সাইকাইয়াট্রিস্টকেও কনসাল্ট করে অন্তত বছরে একবার। অর্থাৎ এটাও যদি সেই পাপবোধের চাপই হয় যা তাকে অস্থির করে তোলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা মর‍্যালিস্ট হওয়ার অন্য নাম নয়?

আর এদিকে হিপিদের দেখো। মারিউয়ানা, এল এস ডি, হেরোইন,—কত কী। সেও বোধহয় অস্থিরতা, অবসাদ, অনূই, পাপবোধের পীড়া থেকে মস্তিষ্ককে সরিয়ে দেয়া। রসো, রসো। ওটা যদি ক্রিশ্চিয়ান কনফেশনের ট্রাডিশান, এটা হবে ভারতীয় সন্তদের সাধনার ঐতিহ্য।

ক্যাবি পিছন ফিরে বাড়ির নম্বরটা জানতে চাইল। নম্বরটা বলে মিত্র আঙুল দিয়ে ম্যানশনটাকে দেখিয়ে দিল।

ফুরফুর করে উঠল একটা নিঃশব্দ হাসি তার মুখে। তারপরে লেকচারের সময়ে নতুন কথা মনে এসে যেমন গম্ভীর হয় তার দৃষ্টি, তেমন হল। চশমাটাকে অভ্যাসবশে ঠিক করে নিল নাকের উপরে।

সে ভাবল, হিপিদের সম্বন্ধে তার চিন্তাটা হয়তো রসিকতা। কিন্তু শাশাঙ্কার ও কথাটা—সাইকাইআট্রিস্টকে কনসাল্ট করা ক্রিশ্চিয়ান কনফেশনের ট্রাডিশন—চিন্তা করার মতো বিষয় বটে। অন্তত প্রবীরের সম্মুখে এটা রাখা যায় শাশাঙ্কার মতো হাসিমুখে।

ড্রাইভের শেষে পোর্টিকোর নিচে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগ হাতে উঠতে উঠতে মিত্রার মনে হল, কী আশ্চর্য, কথাটা ছবি দেখাই না? এটা এখন আর অস্বীকার করা যাবে না, ছবিটা ভাল, খুবই ভাল হয়েছে। আর শান্তনুই এঁকেছে। কী রক্তের মতো গভীর লাল এই কার্নেশন। সবুজ রঙের বারান্দা দেয়া টুপির নিচে চোখা সাদা দাড়ি ভয়ঙ্কর নয়?

সিঁড়িতে পা দিয়ে মনে হল, আজ কিন্তু সে একা এ বাড়িতে।

রাজেনের হাতঘড়িতে তখন চারটে পার হয়েছে। আলোর অভাব বোধ হল। সকাল থেকে দুপুর ফাইবার গ্লাসের স্কাইলাইটের দৌলতে যে ঘোলাটে আলো আসে এখন তা একেবারে নেই (বেসমেন্টের স্কাইলাইট অর্থাৎ রাস্তার লেবেলের কিছু উপরে একতলার প্লিনথের ফাইবার গ্লাস)

প্রুফের কাগজপত্র ভাঁজ করে রাজেন ব্যাগে পুরল। ব্যাগ থেকে চিলতে সাদা কাগজ বার করে কলম খুলে সে ভাবল, তার পরে পত্রিকার মলাটের বিজ্ঞাপনটা লিখল। বিজ্ঞাপনটা এই রকম আগামী সংখ্যায় প্রবীর সান্ডেলের স্টাইলের উপর একটি আলোচনা থাকবে।

ভালো কিছুর প্রত্যাশায় যেমন কখনও হয়, তেমন একটা হাসি দেখা দিল রাজেনের ঠোঁটের কোণে। ব্যাগে লেখাটা পুরে, ব্যাগ বন্ধ করে, উঠে দাঁড়ানোর জন্য ব্যাগের হাতল ধরেছে, এমন সময়ে তাকে থামতে হল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঠোঁটের কোণ কঠিন হয়ে উঠল। অথবা

শব্দটা যথাযথ হল না। কেউ কেউ সিয়ারিয়াস মেজাজে গেলে প্রথমে ঠোটের কোণে ধরা পড়ে।

প্রিয় পাঠিকা, আপনাকে আশঙ্কার দোলায় রাখতে চাই না। রাজেন যখন মাথা নিচু করে লিখছে, তার টেবলেব সামনে নিঃশব্দে এবং সঙ্গোপনে দুই ব্যক্তি এসে দাঁড়িয়েছিল। কালো রঙের সান্ধ্যপোশাক পরা দুজনকে পৃথক পৃথক দেখলে কারো কিছু মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এখন যেন এক মুহূর্তেই এই ম্লান আলোয় তাদের চিনতে পারা গেল। তারা যেন ভূতগ্রস্ত ; কথাটা ঠিক ভূত না হতে পারে কিন্তু তেমনই কিছু যেন, অথচ সেটা তাদের নিজের আত্মাই হতে পারে। সাধারণত আমরা ধারণা করি, আত্মা দেহের ভিতরে কোথাও থাকে, এক্ষেত্রে যেন বিপরীত ; আত্মা একটি সহজ আবরণের মতো দেহকে আবৃত করে রেখেছে, স্বচ্ছ কিন্তু অদৃশ্য নয়, সুন্দর নয়, আব তাব নিজেরও যেন রঙ আছে। যেন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস থেকে নেমে আসা নাইহিলিস্ট। ঘাতক নয়, কিন্তু এই বেসমেন্টের ক্ল্যাসিক থিয়েটাবের সঙ্গে সংযুক্ত ক্ল্যাসিক সংস্কৃতির কর্মপরিষদের দুজন সদস্য।

রাজেন বলল, আজই?

দুজনেই মাথা নুইয়ে জানাল, আজই বটে।

রাজেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পা বাড়াল। একজন সদস্য তাব হাত থেকে ব্যাগটা নিল। সরে দাঁড়িযে রাজেনকে এগিয়ে যেতে দিয়ে তার পিছনে চলল। রাজেনের মুখ ইতিমধ্যে দার্শনিকসুলভ ও প্রফুল্ল। সেই কি এই সংস্কৃতিব নেতাদের পিছনে সত্যিকারেব নেতা?

ওবা যখন ট্যাক্সিতে উঠছে তখনই কলকেতার সেই বিখ্যাত স্মগ বাস্তায় নামতে শুরু করেছে। স্মগ তো এখন সব দেশেই, তবে কলকেতার স্মগ বিখ্যাত কেন? স্মগের উপাদানেই বোধহয় এই পার্থক্য। পশ্চিমদেশে কুয়াশা থাকে, এখানে কয়লার ধোঁয়া।

আব এই স্মগ ততই গাঢ় হবে যত তাদের ট্যাক্সি এগোবে, কারণ তাদের গন্তব্য উত্তর কলকেতার প্রাচীন কাশীপুরও পেরিয়ে।

ট্যাক্সির ভিতরের আলোটা বোধহয খাবাপ। আরোহী তিনজনের মুখ ইতিমধ্যে অস্পষ্ট। এমনও হতে পারে, এই আলোটা এমন জ্বলছে দেখেই ট্যাক্সিটাকে বাছাই করা হয়েছে।

প্রায় আধঘন্টা চলছে ট্যাক্সি। এ পর্যন্ত একবারও ক্যাবি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেনি। বরং তার এবং যাত্রীর আসনের মধ্যে কাচের পর্দাটাও তুলে দেয়া। অবশ্য এসব বিষয়ে সব তথ্য আমার জানা নেই। এমনও হতে পাবে, ট্যাক্সিক্যাবের ভিড়ে মিশে থাকলেও এটা ক্ল্যাসিকের নিজস্ব গাড়ি।

অন্ধকার এদিকে বেশ গভীর। পথের আলো স্মগে আচ্ছন্ন। পথ অসমান, গাড়ি লাফাচ্ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে না, তবে অনুমান, অনেক পৌরপিতার উত্থান-পতন সত্ত্বেও উত্তব কলকেতার পথ গাড়াগর্তের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

এতক্ষণে সদস্যদের একজন কথা বলল, সামনের ওইটি।

অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার বাড়িটা পাঁচতলা উঁচুই হবে, কিন্তু তা বোঝার উপায় নেই। ক্বচিৎ এ জানালায ও জানালায় উঁচুতে নিচুতে এক একটা টিমটিমে আলো চোখে পড়ে। নিচের তলায় পথের উপরে একটা জায়গায় একটা অস্পষ্ট আলো।

এবার গন্তব্যটাকে চিনতে পারা গেল। কিছুদিন থেকে এটাকে হিপিপাড়া বলা হচ্ছে বটে। আগে নাকি বরানগর বলা হতো। এখন যে প্রাচীন কলকাতার পরিচয় লেখা হয়েছে, তাতে নাকি বলা আছে সেকালে এটা প্রাগগ্রসর রাজনৈতিক মতবাদের ঘাঁটি ছিল।

রূপসী পাঠিকা, কলকেতার হিপিদের সম্বন্ধে আমার পরিচিত অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে। এমন কি বেলা সোমের ধারণাও এ বিষয়ে খুব পরিষ্কার নয় তা আগেই দেখেছি। ব্যাপারটি মনে করা যাক আবার।

হঠাৎ কোন হোটেলে গিয়ে দেখলুম, যেন এক জাহাজ বিদেশি এসে নেমেছে। জাহাজ ছাড়বার আগে তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে খাচ্ছে, আব দু-দশ বছরের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিচ্ছে, জোরে জোরে কথা বলছে এবং শিস দিচ্ছে, অথবা খেতে খেতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতপা ছড়িয়ে নেচে নিচ্ছে! এবং যদি দেখেন, তাদের বিদেশি বলে মনে হওয়ার কারণ তাদের পোশাক, অর্থাৎ পুরুষদের কোট নানা রঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি ; যদি দেখেন, তাদের শার্টে বাঘভাল্লুক, সাপখোপ এবং নগ্নিকা এবং পুরীর মন্দিরের গায়ের মিথুন আঁকা ; টুপিতে যদি দীর্ঘ ময়ূরেব পালক অথবা ঝুমকো গোঁজা থাকে ; এবং টুপির নিচে যদি কারো কারো কান থেকে ঢাউস ঢাউস শাঁখের বালা ঝুলতে দেখা যায় ; যদি মেয়েদের পোশাকে শেরউড দস্যু অথবা পর্তুগিজ বাকেন্নারের অনুকরণ হয় এবং বিশেষ করে সে পোশাকের ডাবলেট যদি উরুর তিন-চতুর্থাংশই উন্মুক্ত রেখে থাকে ; কারো কারো চোখমুখ যদি সবুজ, নীল, কালো, সোনালি রঙের ছোপে ভরা থাকে, তবে এরকম মনে করা ভুল হবে যে আমরা হিপিদের কাছে পৌঁছে গিয়েছি। বরং উল্টো, এরাই সমাজেব সেই অংশ যারা সমাজকে তার নীতি-সমেত ধরে রাখছে, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রাযোগিকমেলের এরাই কৃতসিদ্ধ ধারক এবং বাহক, প্রবীর সান্ডেলের ভাষায় ফোরম্যানিটি। এরাই সেই ফোরম্যান-কৌমের নরনারী—যদিও প্রত্যেকেই হয়তো ফোরম্যান নয়—যাদের বেতন, ভাতা, লভ্যাংশেব বোনাস, প্রোডাকশন বোনাস মিলে যা প্রাপ্য, তার অঙ্ক অধ্যাপকদেব, বৈজ্ঞানিকদেব এমন কি লেখক ইউনিয়ানের নথিভুক্ত সেই সব প্রাগগ্রসর লেখকদের তুলনীয় অঙ্ককে ছাড়িয়ে যায়। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সদর দরজার কাছে একটা আলো, তার সামনে একজন হিপিকে দেখা গেল। পরিচিত মহলে এর নাম জেনারেল। প্রকৃতপক্ষে কিছুদিন আগে চাকরি ছাড়ার সময়ে সে আর্টিলারির লেফটেনেন্ট কর্নেল ছিল। লোকে বলে, এ বাড়ি অথবা ব্লকটার ভাড়া সেই দেয়। অন্যমতও আছে। ভাড়া স্টেটের ট্রেজারিতে জমা পড়ছে, কেউ নিচ্ছে না। তুলে দিচ্ছে না এজন্য সে কলকেতার টুরিস্ট আকর্ষণগুলির অন্যতম নাকি হযে উঠছে এই হিপি কলোনি। হয়তো বিদেশের হিপি কলোনির মতো তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এখনই এটা, কিন্তু ভারতবর্ষেব অন্যান্য প্রান্তে নাকি ইতিমধ্যে এব প্রভাব পড়েছে। কে যেন সেই বাঙালির ললাটে তিলক এঁকে দিয়ে বলেছিল, বাঙালি আজ যা ভাবে, গোটা ভারতবর্ষ আগামীকাল তা ভাববে! এরকমও শোনা যায় এই হিপি কলোনির কথা বিদেশের বিলেতের পত্রিকায় একবার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এই কলোনি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এখন এই অস্পষ্ট আলোতে জেনারেলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, তার পোশাকটা সাধারণ। লোকে বলে, দিনের বেলায় দেখলে বোঝা যায় পোশাকটা আর্টিলারি অফিসারের পোশাকই, শুধু ইনসিগনিয়াগুলি নেই ; আর শীতে গ্রীষ্মে এই একই সার্জের পোশাক পরে থাকে জেনারেল, ফলে ধুলো, মদের দাগ, ঝোলের দাগ, অনেক কিছুই প্রায় বিবর্ণ সেই পোশাকে দেখা যাবে। জেনারেল এখনও সেই চামড়া-বাঁধানো ব্যাটনটা ব্যবহার করে থাকে। জাঁকালো গোঁফের নিচে তার দাঁতগুলো তামাকের ধোঁয়ায় বাদামি। কিন্তু কেউ কেউ বলে, দিনের বেলায় জেনারেলের চোখ কখনও কখনও গোষ্পদে ধরা অসীম আকাশের মতো গভীর হয়ে ওঠে।

সে চাকরি ছেড়েছে, কিংবা তাকে ছাড়ানো হয়েছে, এ নিয়ে কিছু মতদ্বৈধ আছে। হয়তো দুই-ই ঠিক, উভয় পক্ষেরই এ ছাড়া আর চলছিল না। অথচ ব্যাপারটা ঘটেছিল কুলু উপত্যকায় এক কুমোরকে কুলালচক্রে কল্কি বানাতে দেখে। কর্তৃপক্ষ বলে, অতগুলো ক'এর জট খুলতে না পেরে মাথা খারাপ হয়েছে বেচারির—সসেমিরা আর কী। জেনারেল কিছু বলে না। সেদিনকার সঙ্গী তাকে কোট করে। ঘূর্ণমান কুলালচক্র দেখতে দেখতে জেনারেল হঠাৎ সেই কুমোরকে জোড়হাতে নমস্কার করে বলেছিল, তুমি তো তবু কিছু করো, তুমি তবু তো রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই বাঁচতে জানো ; কারণ মাটি, রোদ, জল আর তোমার দুখানা হাতই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কলোনির সদর দরজায় মুখে বটে, কিন্তু কোন অর্থেই পাহারাদার নয়, অভিভাবকও নয়। তিনজন অপরিচিত লোককে দরজার কাছে নামতে দেখে সে ভ্রূক্ষেপও করল না। অন্যদিকে তা করার কথাও নয়। টুরিস্টরা আসে, ফোরম্যান-কৌমের লোকেরা আসে, কিংবা বলা উচিত টুরিস্টমাত্রেই তো ফোরম্যান-কৌমের লোক। গবেষকেরা আসে। শেষোক্তদের একদলের মতে এরাই প্রকৃতপক্ষে অস্তিবাদী মানুষ।

রাজেন এবং তার সঙ্গী দুজন সদর দরজা পেরিয়ে কতগুলি ঘর পেল। দরজা জানালা হাঁ খোলা। সেগুলিতে কেউ কেউ থেকেছে এর আগে, এমন মনে হল না। অবশেষে উপরে উঠবার সিঁড়িব কাছে এসে একটা ঘরের মেঝেতে মোমবাতি জ্বলতে দেখা গেল। মোমবাতির কাছাকাছি রান্নার কিছু উপকরণ ছড়ানো। অনুমান, কিছু রান্না হয়েছে এখানে। রাজেন এদিকে ওদিকে চাইল। দেয়ালের আস্তর খসা, কিন্তু দরজা জানালা আস্ত, মেঝের সিমেন্টেও গর্তগাড়া নেই, এরকম একটা বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট ভাল ঘর। কিন্তু মানুষগুলি কি লোপ পেল? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে রাজেনরা অবাক হল। সিঁড়ির পিছনদিকে ঘুরে এল। কাগজের ঠোঙা দিয়ে আড়াল করা একটা মোমেব আলোয় তিনজন হিপিকে দেখা গেল। ঠিক করে বলে দেয়া শক্ত, অনুমান দুটি যুবতী এবং একজন যুবক। যুবকের প্রায় এক হাত লম্বা বেণী, একটি যুবতীর চুল করাতের দাঁতের মতো ঢেউ তুলে কাটা, অন্যটির বাবরি চুল কাঁধে লুটোপুটি করে। একজন যুবতীর পরনে লংপ্যান্ট এবং ব্লাউজ, অন্যজনের সর্টসের উপরে বুকের দিকে তোয়ালে ঝোলানো, পিঠ খোলা। যুবকটির সন্ন্যাসীর মতো চাদর জড়ানো। তাদের মতোই ঘাড়ের উপরে গিঁট বাঁধা। এরা বোধ হয়, গুহাবাসী হওয়ার চেষ্টা করছে।

রাজেনদের দেখেও ওরা নজবে আনল না। একবাব শুধু মনে হল, যুবকটির মুখে একটা হাসির বেশ ফুটল। তার নানা অর্থ করা যায়, যার একটা অর্থ হতে পারে—শহরের সেই আহাম্মুকদের আর এক দল চিড়িয়া দেখতে এসেছে। একটু ভাল কবে লক্ষ্য করলে রাজেনরা দেখতে পেতো, তারা অত্যন্ত ছেঁড়া, নোংরা কয়েকটা তাস নিয়ে কিছু খেলছে—রামি বা অমবার কিছু হবে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠল রাজেনরা। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে উঠল তারা।

এটা একটা হলঘর। বোধ করি, কোন এক সময়ে অফিস-ফ্লোর ছিল। দেয়ালের আস্তর নেই। কংক্রিটেব বলে ইট চোখে পড়ছে না। দেয়ালের এখানে ওখানে ছবি আঁকা মকশো করা হয়েছে। কোথাও একটা চড়ুই। কোথাও একটা গাছের নিচে দেয়ালজোড়া কুটির। চক-খড়ি, চারকোল, গেরুয়া মাটির টুকরো—কী না ব্যবহার করা হয়েছে।

হলটায় একটু ভিড়ই বটে। অন্তত দশ-পনের জন তাদের চোখে পড়ল। কেউ একা একা সংসার পেতেছে। কেউ কেউ দু-তিনজনের দলে। একার সংসারে একজন সর্বাঙ্গে ছাই মেখে বসে চালানি পোর্কের খালি কৌটো দিয়ে বঙ্গো বাজাচ্ছে।

দু-তিনজনের একটি দল থেকে উঁচু আলাপের স্বর শুনতে পাওয়া গেল। রাজেনরা শুনল, তাদের একজন একটা ছোট কাঠের বাক্সের উপরে বসে বলছে : মাদাব লীলা, তোমার নিকট আমাদের অপরাধের শেষ নাই, যেহেতু তোমাকে জীবন্ত পোড়ানোর চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতঃপর কতবারই তো জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশ যৌবন, পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে চার্ণকবনিতা, হে কলকেতা কালচারের গার্ডিয়ান সেন্ট, অথবা বাঙালি তথা ফোর্ট বিলিয়াম সভ্যতার আদিললনা, এবার নিজগুণে অপসৃতা হও, আমরা কাঁদিয়া বাঁচি। দেখো, দেখো, এখনও বাঙালির সংস্কৃতি বিদেশি ভাব দেখা মাত্র নিম্ফোমেনিয়াগ্রস্তার ন্যায় ধাবমানা।

রাজেনদের দল যেন কাউকে খুঁজছে। তাদের পায়ের শব্দেও এ দলটির কেউ মুখ তুলল না।

দূর দেয়ালে যেখানে একটা ছায়ায় কুটির আঁকা, সেখানে দুজনের একটি দল। একজন খেজুরপাতার বিবর্ণ একটা ত্রিপল টুকরো গায়ে দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে। দ্বিতীয়জন

কালো একটা ভোট-কম্বল গায়ে উঠে বসেছিল। একটা কাঁধ এবং গলার নিচের খানিকটা চোখে পড়ায় তাকে যুবতী বলে অনুমান হল। গায়ের রঙ বাঙালির পাশে ফর্সাই, কিন্তু কপালে এবং গালের এখানে ওখানে খয়েরে আঁকা বেশ কয়েকটি বর্তুল, অথবা সেগুলো আঠায় সাঁটা প্লাস্টিকেরও হতে পারে। একটা ছোট হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে নিজেব উরুর কিছু নিচে একটা ইনজেকশন দিল সে। একটু যেন বুঁদ হয়ে বসল। তারপর যেন মাদার লীলার প্রার্থনা শুনেই খিলখিল করে হেসে শুয়ে পড়ল। হাসির কারণ অবশ্য রাজেনরাও হতে পারে। অথবা ইনজেকশনটা।

রাজেনরা একটু দাঁড়াল যেন। কিন্তু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। এদিক ওদিক চাইল। পাশের ঘরের দরজা খোলা, সেখানেও হিপি।

রাজেনদের উদ্দেশ্য এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তারা কি মানবিকী ধ্রুব সংস্কৃতির জীর্ণাবশেষ খুঁজতে এসেছে? অথবা সত্যিকারের একসিস্টেনশিয়ালিস্ট যারা, যাদের কাছে যে কোন সভ্যসমাজের নীতিরীতি নসিয়া, যারা যে কোন সভ্যসমাজে অ্যাবসার্ড, তারাই হিপি? অথবা তারা কি নবপর্যাযের নাইহিলিস্ট! অনুমান করি, এখনই তা বুঝতে পারা যাবে না।

কার্নেশনেব গুচ্ছ হাতে নিয়ে মিত্রা হাসি হাসি মুখে তার নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। ভারি যেন তৃপ্তি বোধ হচ্ছে। ফুলগুলো কী মৃদুভাবে আতপ্ত! গালের সঙ্গে লাগাল। হাসি হাসি দেখাল তার মুখ। সোফায় বসল সে। মিত্রা কিন্তু হঠাৎ হাই তুলল। না, তার এমন বয়স নয় যে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডটাকে ক্লান্ত বোধ করে। বরং মধ্যদিনের লাঞ্চ-শেষের আলস্য, যা একটু দেরিতে এল। কারণ সে বাইরে ছিল। তা এটা বা কী! যাদের দুপুরে অফিস নেই সেইসব মহিলারা, যেমন বেলা সোম ; যাদের পেশা সন্ধ্যা থেকে, যেমন মাধবী ; এমন কি সুরঙ্গমার মতো হাউস-কীপাররাও এই লাঞ্চ-শেষের মধ্যাহ্ননিদ্রায় অভ্যস্ত।

সুতরাং (আব সে একাও তো এই ম্যানশনে, প্রকৃতপক্ষে কলকেতায় এবাব আসবার পর এই প্রথম) মিত্রা একটা ছবির বই হাতে বিছানায় গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজল।

বইয়ের শেলফের পাশে রাখা টাইমপিসটায় টিং করে একটা শব্দ হল। এরই মধ্যে ছটা? ডিনার সাতটাতেই। তা হলে তাব আগেই শান্তনু আসবে। ডানদিকের পর্দার ওপারে শান্তনুর শোবার ঘর।

খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে শান্তনুর খাটের পাশে ছোট টেবলটায় গুচ্ছটাকে রাখলে হয়। কিন্তু তা কী করে হবে? আজ শান্তনুর ডেট ট্রুডির সঙ্গে। কিন্তু এখন উঠতে হয়। ঘুম ভাঙ্গার আগে তার নিজের হাত দুটো পরস্পরকে যেন একের বেশি পাকে জড়িয়ে ধরল। অস্পষ্টভাবে তার মনে হল, সারসেবা বোধ হয় এমন করে পরস্পরের গলায় পাক খেয়ে যায়।

একটু তাড়াতাডি হাতের পাক খুলে ফেলল। তেমন তাড়াতাড়ি চোখ মেলল সে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার চোখ। সে ভাবল, শান্তনুর ছবি তা হলে উতরেছে। প্রবীর সাণ্ডেলকে ঠকানো যায় না বাজে কিছু দিয়ে, এটাই প্রমাণ।

কিন্তু সিগারেটের গন্ধ নাকে এল। আর পায়ের দিকে চোখ পড়তেই উঠে বসল।

ও মা তুমি, কখন এলে? আজ না তোমার ডেট ট্রুডির সঙ্গে?

এলাম, এই কিছুক্ষণ। দেখলাম ঘুমোচ্ছ। শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে, কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো ইনসপিরেশন।

কী রকম? কিংবা রসো চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।

ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো। শান্তনু হাসল, এই ঘুমে শ্লথ মুখটাকেই আমার আঁকার কথা মনে হল। হঠাৎ মনে পড়ল, দুপুরের ঘুম থেকে যখন বিছানায় উঠে বসেছো তখন তোমাকে কেমন দেখায়। আর সে জন্যই পাহারা দিচ্ছি বসে যাতে চুলে চিরুনি দিতে না পারো। বরং একটা সিগারেট

খেয়ে নাও।

মিত্রা হেসে বলল, তুমি কি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে, শান্তনু, কোন দৃশ্যে কাউকে দেখে মনে হল?

উঁ, আ, তা দেখো ইনসপিরেশন কথাটা ঠাট্টা হয়তো। কিন্তু আমি জানি না, আমি জানি না, আজ পোর্ট্রেট আঁকতে আর তোমার পোর্ট্রেট আঁকতেই একটা পরিষ্কার নির্দিষ্ট আগ্রহ কেন বোধ করছি।

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল শান্তনু। মিত্রা সিগারেট নিলে বলল, এসো স্টুডিওতে।

মিত্রা বলল, কিন্তু, পোর্ট্রেট তো কমিশনের কাজ। তার জন্য কি তাড়াতাড়ি চলে? যদি তুমি কারো পোর্ট্রেট করো সে কি সময় ঠিক করে দেবে না?

তাই বলে কি পোশাকের ব্যাপারে, কিংবা বসার ভঙ্গিতে আমার বলার কিছু থাকে না? কী যে বলো। এসো, এসো।

মিত্রা হাসল খিল খিল করে।

এত জোরে হাসছো যে! তোমার কি মনে হয় এটা আমার ভুল হচ্ছে!

না।

তবে? পোর্ট্রেটে তোমার জামাটা হবে প্রিন্সেস পেটিকোট। চৌকোণা নীল সাটিনের জামা থাকবে গায়ে।

স্টুডিওটা এখনও ঠিক স্টুডিও হয়ে ওঠে নি। বরং এখনও বসবার ঘরের মতো, যার সোফা ইত্যাদিকে বরং এক দিকে ঠেলে দিয়ে ফ্রেঞ্চ উইনডোর কাছে ইজেল রাখার জায়গা করা হয়েছে। তার সামনে একটা ছোট উঁচু টেবলে রং। বাড়তি আলোর জন্য যে টিউবটাকে লাগানো হয়েছে সেটার উপস্থিতি দেয়ালের গায়ে দেখা মাত্র বাড়তি বলে বোঝা যায়, আর তখন এই সিদ্ধান্ত আসে, এ ঘরটার ব্যবহার এখন বদলাচ্ছে।

শান্তনু বলল, তোমার পোর্ট্রেট এর আগে কেউ আঁকে নি?

এঁকেছে। তার তখন টাকার দরকার ছিল। অথচ কমিশন পাচ্ছিল না। তখন ভেবেছিলাম, নিজের পোর্ট্রেট আঁকালে তারপর আর কয়েকটি আঁকার কমিশন পাবে ভদ্রলোক।

তবেই তো দেখো।

মিত্রা বলল, সে কিন্তু ঘুম থেকে ডেকে তুলে পোর্ট্রেট আঁকতে বসে নি।

আ, কী যে বলো! আমি...তোমার সেই চৌকোণা ব্লাউজের নীল রং, যেখানে হুক খোলা তার ধারের আপেল রং। তোমার কানের দুলের লম্বা নীলচে টানটা, উপরের যে আলোর ছায়া নীল হয়ে তোমার গালে গলায় তা দেখতে পাচ্ছি যেন।

তাহলে কি আমাকে তেমন ব্লাউজ আর তেমন দুল যোগাড় করতে হবে?

না, ওটুকু আমি কল্পনা থেকে থাকতে পারবো। কই, চলো!

এখন কিন্তু চা খাওয়ায় সময়। করে আনি।

দেরি করো না, দেরি করো না। আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি। চা নিয়ে সেখানে এসো। আর চুলে হাত দিও না কিন্তু। যেমন আছে তেমন থাকবে। না, লক্ষ্মীটি, চোখে মুখে জল দিও না, যেমন আছে, যেমন আছে।

শহরে ছবির মরশুম শেষ হল, এ কথাটা থেকেই বোঝা যায়, এখন এটা নভেম্বর মাস। সূর্যের সঙ্গে আমাদের টেকনোলজি এখনও পেরে ওঠেনি বলে কলকাতা শহরে এখন শীতটা আরও গাঢ় হয়েছে। কিন্তু কী তার প্রমাণ? সমাজতত্ত্ববিশারদেরা বলেন, তোমার গ্রোসারকে লক্ষ্য কর, কিংবা

আগে যাকে জগুবাবুর বাজার বলতো এখন যার নাম কাস্ট্রো সুপারমার্ট সেখানে যদি যেতে পারো দেখবে লেটুস, গাজর, কোফি কী পরিমাণে ও কত টাটকা অবস্থায় জমা আছে। অবশ্যই বলতে পারা যায়, নভেম্বরেই কি সব লোক তা খেতে পারে? পারে না, কারণ তখন যেমন এখনও তেমন, এসব আনাজ নতুন উঠলে একটু বেশি সুস্বাদ থাকে এবং দামেও চড়া। সেই সুপারমার্টে এখন টেকনোক্র্যাটদের ভিড়, মাঝেমাঝে দুএকজন বেশি ওভারটাইমযুক্ত ফোরম্যানকে দেখতে পাবে।

নিশ্চিতই এ নিয়ে হৃদয়কে উত্তপ্ত করার কারণ নেই। টেকনোক্র্যাটরা যেমন আছে এবং টেকনোক্র্যাট বলতে এখন তাদেরও বোঝায়, আগে যাদের বুরোক্র্যাট বলা হতো ; আর তা যুক্তিসঙ্গতও বটে, কারণ পুলিশের ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার কিংবা ডিষ্ট্রিক্ট সিক্রেট সার্ভিসের কর্তার যে কর্তব্যভার তাও কি বিশেষভাবেই টেকনিক্যাল নয়? যদিও তারা টেকনোক্র্যাসির নিতান্ত নিচের স্তরের যেহেতু তখনকার দিনে রাইটার্স বিল্ডিংস ব্যুরো এবং জেলার ব্যুরোতে যেমন তফাৎ ছিল এখনও তা আছে, এবং আপাতদৃষ্টিতে একটা সমতার ভাব থাকলেও এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংসের তাঁরাও মনে মনে জানেন, সেকালে যেমন এখনও তেমন, প্রকৃতপক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংসএ না এলে বুরোক্র্যাট অর্থাৎ এখানকার ভাষায় টেকনোক্র্যাট হওয়া যায় না ; এবং সে সত্ত্বেও এটাও দ্রষ্টব্য সমতার মধ্যে যেমন কেউ কেউ বেশি-সমান, অনেক টেকনোক্র্যাসির দাবির মধ্যে প্রকৃত টেকনোক্র্যাসির দাবি করে থাকে নিরঞ্জন ঘোষালের মতো লোকেরা। কিন্তু আসল কথা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, বলছিলুম টেকনোক্র্যাটরা যেমন আছে, তেমন আছে তাদের বেতনের জ্যোতিষশাস্ত্রসুলভ অঙ্কগুলি। কী করবে তারা তা দিয়ে? সম্পত্তি করতে পারো না। কিংবা একমাত্র সম্পত্তি যা করতে পারো তা শহরের উপকণ্ঠে দশমিক পাঁচ একর জমির উপরে কুটির। তুমি তাকে সাততলা করতে পারো। লাভ? ভাড়া দেওয়া চলবে না তো। ছেলেকে দিয়ে যাবে? দেয়ও বটে। কিন্তু তাতে ছেলেরই আপত্তি, তাতে তার নিজের অর্থে দশমিক পাঁচ সংগ্রহ করার সুখ ও সুযোগ নষ্ট হচ্ছে, এমনই আইন। আইনই যা প্রতি পদক্ষেপে, এমন কি চেয়ারে বসে থেকেও আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে তোমার কব্জিতে অনুভব করবে, যদিও তা এক সময়ে আর দশটা অভ্যাসের মত সহনীয় হয়। সুতরাং সুপারমার্টেই আয়ের অনেক অংশ অনেক দামের কেনাকাটায় ব্যয় করার দিকে টেকনোক্র্যাটদের ঝোঁক আছে।

আসলে কিন্তু যাতে শীতের তারতম্য বোঝায় তা স্মগের তারতম্য। দেশে দেশে যে স্মগের তারতম্য, তাছাড়াও একই দেশের বিভিন্ন ঋতুর স্মগে তফাৎ আছে। কলকাতার স্মগ সম্বন্ধে নানা রকম চিন্তা করা হয়েছে। তার মূল কারণ যে কলকারখানা এবং অটোমোবাইলের একজস্ট সে তো সবাই জানে। সমস্যার সমাধানে দেশের ফিজিসিস্ট, কেমিস্ট, মনস্তত্ত্ববিশারদ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকরা মাথা খাটাচ্ছে। এখন থেকে দশ বছর আগে এক সম্পাদক প্রেরণার এক ভাস্বর মুহূর্তে তার পত্রিকায় নানাবিধ অব্যবস্থার দারুণ সমালোচনা করতে করতে প্রস্তাব করেছিল, কয়লা পোড়ানো, ডিজেল পোড়ানো আইন করে বন্ধ করে দিয়ে, সমস্ত কলকারখানা, রান্না, অ্যাটমিক এনার্জিজাত ইলেকট্রিসিটিতে চলবে। কিন্তু তাও যদি সম্ভব হয়, রেলওয়ে ট্রেন, ট্রাম সবই না হয় ইলেকট্রিসিটিতে চলল ; ট্যাক্সি, লিমুসিন, জাগুয়ার, প্যাকার্ড ইত্যাদির কী হবে? সেই দুঃসাহসী বিবেকবান সম্পাদক তখন লিখেছিল, ট্রাম যদি মাথার উপর টাঙানো ইলেকট্রিক তার ছুঁয়ে চলতে পারে তবে অটোমোবাইলগুলিই বা চলবে না কেন? প্রত্যেক রাস্তার উপরে তার চওড়াই অনুসারে সাত, আট, দশ, পনেরো, পঁচিশটা তার টাঙাতে কে আটকাচ্ছে? সে তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে অটোমোবাইলগুলি পর পর লাইন বেঁধে চলবে।

অবশ্যই সেই সম্পাদকের কথা কেউ শোনে নি। কারণ (১) আমাদের দেশের তুলনায় অন্যদেশে স্মগ আরও বেশি গভীর হলেও এরকম কিছু তারা করে নি, এবং তারা না করলে আমরা কিছু

করি না, (২) পরিত্যক্ত যুদ্ধজাহাজ এবং প্রাচীন হয়ে যাওয়া টাইপের এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক বিক্রি করে আমাদের দেশ তত ধনী হতে পারে নি যে রাস্তার মাথায় অত তার খাটাবে, (৩) মানুষের মনের মধ্যে তার পুরনো চালচলনের দিকে এক ভয়ঙ্কর রকমের টান আছে। স্মগ ব্যাপারটা ক্রমশ অগ্রসর হলেও এখন কলকেতার আবহাওয়ার অঙ্গ। সুতরাং তাকে রাতারাতি বদলে দিলে ওযে অব লাইফ বদলে যায় না? সুতবাং কলকেতায় তার ফ্রিলান্স মোটর মেকানিক, এবং ক্যাবি এবং স্মগ থেকে গিয়েছে। নতুনত্ব যা তা ওজেন যন্ত্র। অক্সিজেন জেনারেটর থেকেই ওজেন। আগে যেমন ফ্রিজ, এয়ারকুলার, প্রভৃতি বিয়েতে যৌতুক দেয়া হত এখন তার সঙ্গে উপরন্তু ওজেন দেয়া হয়। ঘরেই থাকে ছোট হলে, বড হলে বাথরুমের মাপের একটা ঘর করে দিলেই হয় তার জন্য, সেখানে বসেই নলে ঘরে ঘবে বাডতি অক্সিজেন ছড়ানো যায়।

এ শীতের স্মগ এড়ানোর অন্য আর এক উপায় শহরেব বাইরে চলে যাওয়া এবং আয় অনুসারে কুলু, সিমলা, নেপাল, তবাই থেকে সুরু করে, পিটসবার্গ, প্যাটাগোনিয়া, আরিজোনা, যে কোন জায়গায় অথবা এমন কি জাহাজে করে প্যাসিফিকেও যাওয়া যায়। এই জাহাজগুলোর গন্তব্য নেই, ভেসে বেড়ানোই কাজ। এখন আর সেকালেব মতো বৈদেশি মুদ্রার অভাবে বেড়ানো বন্ধ হয় না, যেহেতু ভ্রমণে ব্যয়িত অর্থ সাধাবণ বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সে যাই হোক, মাধবী ঘোষালেব হাউসকীপার সুরঙ্গমা মাধবীর ব্রেকফাস্ট তৈবি করতে করতে এরকমই চিন্তা করছিল। বেলা নটা বাজে, ফ্ল্যাট এখনও নিঃশব্দ। স্টোভে একটা মুবগী সিদ্ধ হচ্ছে, এই সুযোগে সুরঙ্গমা খববের কাগজ খুলে প্রথম চায়ের কাপ শেষ করতে করতে নানা ভ্রমণকেন্দ্রের বিজ্ঞাপনের ওপর দিয়ে চোখ বুলিযে যাচ্ছিল। যে ঋতুব যা। তাব ফলেই এই চিন্তা। অবশ্যই বলা যেতে পাবে, এই চিন্তায় নতুনত্ব কিছু নেই যেহেতু স্মগ এবং তার সম্বন্ধে নানা চিন্তা সব ক্যালকাটানেবই সাধাবণ সম্পত্তি। কিন্তু সুবঙ্গমাকে যাবা বিশেষ ভাবে চেনে, তাদের সন্দেহ হবে এরকম তির্যক দৃষ্টিতে কোন বিষয়কে দেখার মূলে তাব স্বামীর প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, সেই ট্রাম শ্রমিক ইউনিযানেব মাঝারি মাপের নেতাব।

সুরঙ্গমার নিজের আয় তাব স্বামীব আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একটা অঙ্ক তৈরি করে না যা দিয়ে ফি বছর সপবিবারে কলকারখানাহীন, এমন কি অটোমোবাইলের বদলে পনি চলে, এমন কোন পাহাড়ী উপত্যকায যেতে পারে। প্যাসিফিকেব উৎসব-জাহাজে ভেসে বেড়ানো দূরের কথা। ইনস্টলমেন্টে একটা সাধারণ চেহারাব ওজেন কিনতে নিশ্চয়ই পারে তারা এবং তিন বছরের ভবিষ্যৎ আয়ের একটা বড় ভগ্নাংশ তাব জন্য বাঁধাও দেয়া যায়। কিন্তু তাহলে গাড়ি কেনার ইচ্ছেটাকে ত্যাগ করতে হয়। অথচ তার মেযে এখন বড় হযেছে। নিজেদের গাড়ি ছিল না, নিজের গাড়ির স্টিয়াবিং হুইলে হাত রাখে নি, এটা প্রায় অখ্যাতির সামিল হতে পারে ; এবং সুরঙ্গমার এই মত আমরা আগে থেকেই জানি যে এরকম অভাববোধ মনের সাংস্কৃতিব গঠনের মধ্যেও কিছু অভাব রেখে যায় বলে মেয়েব বেলায় তেমন হোক তা সে চায় না।

সুরঙ্গমা কিছুটা কনজারভেটিভও বটে। কেন? তা কি পেটিবুর্জুয়া সুলভ নিজের অভাবকে নীতিতে পরিণত করা, যার প্রান্তিক উদাহরণ বুনো রামনাথ? সে যাই হোক, সে যে রক্ষণশীল তার প্রমাণ এই যে বিশবাইশ বছরে পুবনো হয়ে স্থায়িত্ব প্রমাণ করার আগে সে কোন বিষয়ে হাত বাড়ায় না। এখনই একটা প্রমাণ দেয়া যায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তার কপালে না থাক, বাঁকা সিঁথির মধ্যে খুব সরু করে দেয়া সোনালি সবুজের একটা রেখা আছে ; সিঁদুর নয়, কিন্তু তারই পরিবর্ত : তার চোখের চারিদিকে উপরের ও নিচের পাতা হালকা কালো দিয়ে রং করা,

যার ফলে চোখের কোলে সব সময়েই কালিমা, অত্যধিক ব্যবহৃতা নারীর যেমন হতে পারে, এবং এককালে যেমন কালো করা ফ্যাশান ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণীয় যে কপালে বা গালে কোন রং করে না। এবং খুব ছোট্ট করে বলা যায়, একবারও গর্ভপাত করায় নি। এবং সে জন্যই, এই মনোভঙ্গির জন্যই, কলকেতার স্মগ তার কাছে তেমন দুঃসহ কিছু নয়।

মুরগিটা স্টিমে সিদ্ধ হচ্ছে, ঘড়ির কাঁটা দেখে নামানো যাবে। কাগজের পাতা উল্টাল সুরঙ্গমা।

যখন নটা ত্রিশ হয়েছে তখন সে কান পাতল। এতক্ষণে মাধবীর চটির শব্দ শুনতে পাওয়া উচিত। তা না হলে ঠিক দশটার জন্য যে প্রাতঃরাশ সে গুছিয়ে তুলছে তা ধোঁয়ানো গরমে থাকবে না যখন দেরি করে টেবলে আসবে মাধবী।

অথচ কাল মাধবীর তেমন দেরি হয় নি। আর ডিনারে তেমন কিছু উচ্ছ্বাসও ছিল না। তিনজন ছিল ডিনারে—মাধবী, গীতা পাবকর এবং দাড়িপরা সেই দর্শনের ছাত্রটি যে নাকি আগে একদিন একটা বই উপহার দিয়ে গিয়েছিল মাধবীকে। এই দ্বিতীয় ডিনার হল মাধবীর ঘরে ছাত্রটির। কী যেন নাম? সুরঙ্গমার স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ নয় কিন্তু নামটা সে মনে করতে পারল। রাজেন। এগারোটার সময় মাধবী বলেছিল, তুমি শোও গে সুরঙ্গমা। সুরঙ্গমা আর কিছু লাগবে না জেনে রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে নিজের বিছানায় শুতে গিয়েছিল। তখনই ঘুম আসে নি। অনুমান ঘণ্টাখানেক ঘুম এবং জেগে থাকার মাঝখানে ছিল সে এবং তারই এক সময়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার, ল্যান্ডিং-এর উপরে কথা বলার শব্দ কানে গিয়েছিল তার।

তো, গীতা পাবকরকে সে দেখা মাত্রই চিনেছে এমন নয়। সিনেমা দেখার ফলে চেনা-চেনা লাগলেও আপনাকে চিনেছি এমন কিছু ভঙ্গি করা যায় না। তার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা যে হাউসকীপারের পক্ষে তেমন করা প্রফেশনাল এটিকেট নয়। এক্ষেত্রে মাধবী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আর তাতে সুরঙ্গমা খুশিই হয়েছিল। সে যে গীতা-ফ্যান তা নয়, তাহলেও গীতা যে মূল্যবান অতিথি তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে গীতাও ভারি সুন্দর অমায়িক ব্যবহার করেছিল। অত বড় অ্যাকট্রেস হয়েও।

হাউসকীপারদের এমন স্বাধীনতা সাধারণভাবে দেয়া থাকে না, কিন্তু সুরঙ্গমা মাঝে মাঝে মাধবীর ঘুম ভাঙায় বটে, নিরঞ্জন ঘোষালের সঙ্গে তার জুডিশিয়াল সেপারেশানের সেই ঘটনার পর থেকে।

প্যান্ট্রি থেকে লিভিংরুমে যাওয়ার একটা বাড়তি চাবি তার কাছে। তা দিয়ে লিভিংরুমে তা থেকে শোবার ঘরে ঢুকল সুরঙ্গমা।

শোবার ঘরের আলোটা লিভিংরুমের চাইতে কম উজ্জ্বল, কারণ লিভিংরুমে ইলেকট্রিকের আলো ছাড়াও প্লাস্টিকের পর্দা বসানো সিলিং লাইট দিয়ে বেলা নটার পর স্মগ-চোঁয়ানো আলো খানিকটা আসে। এসেছেও তা। কিন্তু সুরঙ্গমা লক্ষ্য করল পর্দার নিচে ও উপরে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শোবার ঘরে এত আলো থাকাটাই অযুক্তির হয়, যদি মাধবী জেগে না থাকে।

পর্দাটা সরাল সুরঙ্গমা আর তখন সে অবাক হল। নেটের আড়াল সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাধবী এখনও বিছানাতেই। তাহলে এমন স্পষ্ট আলো থাকা উচিত নয়। এখনও সে যেন ঘুমোচ্ছে, অর্ধেকটার চাইতে বরং বেশি যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সে। একখানা হাত মাথার তলে, হাত বেয়ে চুল ছড়িয়ে আছে, উঁচুতে তোলা হাতের নিচে একটা স্তনের আভাস। মাধবী অবশ্যই সুন্দরী, আর তাকে সুন্দরই দেখাচ্ছে এখন। নেট সত্ত্বেও আলো গিয়ে পড়েছে তার সুন্দর আর উজ্জ্বল ত্বকে। একই দৃশ্য পৃথক মনে পৃথক ভাবের উদ্রেক করে থাকে। বিকিনিপরা মাধবীর অনেক ছবি সিনেমার পর্দাতেই দেখা যায়। এখানে সেই বিকিনিও অনুপস্থিত। সুতরাং একটু নতুন দেখাচ্ছে বটে, যেন সেকালের কোন চিত্রকরের আঁকা ন্যুড। কিন্তু সুরঙ্গমার চোখে তার চাইতে স্পষ্ট হয়ে পড়ল বিছানার অন্য বালিশজোড়া যা মাধবীর বালিশের পাশে দেখা যাচ্ছে। নিরঞ্জন ঘোষাল যাওয়ার

পর এই প্রথম।

আর আলোও তাহলে সেজন্য এত উজ্জ্বল, আর ঘরেব উত্তাপও আনন্দিত পঁচাত্তর ডিগ্রিতে 'তোলা, অর্থাৎ পাশের বালিশজোড়া থেকে মাধবীকে দেখা হয়েছিল ঘুম ভাঙার পরেও এই সকালে।

অবাকই হল সুরঙ্গমা. তার ঠোঁটের কাছে একটা প্রশ্নের ভাঁজ পড়ল। তাহলে ডিনার শেষে রাজেন থেকে গিয়েছিল? সুরঙ্গমাব চোখ দুটো স্নিগ্ধ হল, সেই পুরনো গল্প। মাধবীর মত একজনের মনে সঙ্গহীনতা খুবই প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পাবে। কিন্তু প্রশ্রয় দিলেও, সুরঙ্গমা ভাবল তার পিছিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এ দরজা অথবা সে দরজায় বাজেন এসে পড়তে পারে, আর তাহলে জানাজানি হতে বাকি থাকে না। সাক্ষী হয়ে ডিভোর্স কোর্টে যাওয়া হাউসকীপারের প্রফেশনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

পিছিয়ে গেল সুরঙ্গমা। বোঝা যাচ্ছে দেরি হবে ব্রেকফাস্টের। আহা তা হোক। কী এমন বয়স হয়েছে মাধবীর? কত ছেলেমানুষই না তাকে দেখাচ্ছে নেটেব আড়ালে ঘরের এই কৃত্রিম রোদ পোয়াতে।

সুরঙ্গমার পায়েব শব্দ ঠিক কানে গিয়েছিল তা নয়। কিন্তু মাধবী অনুভব করল যেন তার ওঠাব সময় হয়েছে। আর সে যেন ক্লান্ত এবং দুঃখিত কোন কারণে। আর তারপরে আবার সে চোখ বুজল। মাথাটাকে ভার বোধ হচ্ছে একটু। জিভটাও যেন।

হয় কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়াব আগে সে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিল, কিংবা সকালে ঘুমেব গাঢ়তা কমে যাওযাব পবে সে চিন্তা কবে থাকবে ; কতটুকু চিন্তা, আর কতটুকু স্বপ্নের ঘোরে দেখা যখন বলা যায় না। সে চিন্তাটাব সারাংশ একটা ছবিব মতো সে দেখতে পেল। সাধারণত আমরা বইয়ে যেমন লেখা থাকে তেমন করেই চিন্তা করি। লাইনে লাইনে এগিয়ে যাই চিন্তাকে অনুসরণ কবে করে। ছবির চিন্তা একই বাবে চোখে পড়ে। বলতে পারা যায় সবটুকু ছবিব মত ডিটেইলস একই বাবে দেখা সম্ভব নয়। তা না হলেও মোটা বক্তব্যটা একই বারে ধরা দেয় না? তাবপর ডিটেইলস দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে বক্তব্যটা ক্রমশ বেশি স্পষ্ট হয়।

সে ভেবেছিল কলগার্লদেব কথাই কাল রাতে কিংবা আজ সকালে ঘুমেব ঘোরে। তেমন একজন কলগার্ল যে প্রকাশ্যে স্কুলে শিক্ষিকা , যে ছিল মাধবী ঘোষালের জননী, আর শিক্ষিকা ; তখন তার নাম মাধবীও ছিল না। শিক্ষিকাদেব বেতন তখনই অর্থাৎ দুদশক আগেই বেশ খানিকটা বেড়েছে বটে আন্দোলনের ফলে, কিন্তু তখনও তা এয়াব হোস্টেসের একমাসেব বেতনের সমান নয়, কলগার্লের সাতদিনের উপার্জনের চাইতে অনেক কম, সিনেমা অভিনেত্রীর আযের কথা না তোলাই ভালো। অর্থোপার্জনই তো শিক্ষিকা হওয়ার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অন্যভাবে যদি আরও সার্থকশ্রম হয় তা হলে ক্ষতি কী? আর কলগার্ল প্রকাশ্যে না হলেও চলে, টুরিস্ট-সিজনে দোভাষীর কাজও করতো তাব জননী, দোভাষী এবং গাইড।

ভালোবাসা সম্বন্ধে পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। মাধবীর জননী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা (অবশ্যই নিজের বলে পরিচিত না করে) খোলা বইয়ের মতো রেখেছিল মাধবীর সামনে। ভালোবাসা? কারণ মাধবী বড় হয়ে কলগার্ল হবে এটাই আশা করেছিল তার জননী। কারণ সে জননী ছিল একজন সৎ কলগার্ল। এফিসিয়েন্ট কলগার্ল , এবং সে প্রাণপণে বিশ্বাস করতো, তুমি কী পেলে সেটাই বড় কথা, কি করে পেলে তা ভাবে সেকেলে লোক। বেশ কথা, এ কি শুধু কলগার্লের বেলায়? কি করে বিপ্লব হয়, কি করে ভোট পাওয়া যায় সর্বত্রই কি একথা খাটে না? না, তুমি ক্ষমতা পেয়েছো এটাই বড় কথা, কি করে তা পেলে সে সব কথা ভাবে, যারা পরলোকে ও পারলৌকিকে বিশ্বাস করে, আব পরলোক তো কথার কথা মাত্রই।

ভালোবাসা? মাধবীর জননী তাতে নিশ্চয় দক্ষ ছিল, নতুবা প্রায় এক দশক তার অর্থোপার্জন

মোটামুটি ভাল থাকবে কেন? অন্তত একজন বুদ্ধিমান পুরুষকে নতুবা, পর পর পাঁচ-ছটি সিজন ধরে রাখতে পেরেছিল কেন? আর তা ছাড়া সে মহিলাটি কখনও কোন প্রতিবিপ্লবী, ডোপপেডলার, অথবা ফাটকাবাজকে সঙ্গ দেয় নি, এক রাত্রির জন্যও ভালোবাসে নি। বরং তার এই এক রীতি ছিল যতদূর সম্ভব সমধর্মী হতে হবে। একবাব সে এক ডিপ্লোম্যাটকে সঙ্গ দিয়েছিল, যে নাকি বায়োলজিস্ট ছিল প্রথম জীবনে। সংবাদটা পেযে সে নিজের র‍্যাক খুঁজে বায়োলজিব বই বার করে হাতে যতটুকু সময় ছিল পড়ে নিয়েছে। অবশ্য ততটা পড়ে নি যাতে নিজেকে ক্লান্ত দেখাবে। আর তা ছাড়া করুণাবতী ছিল তার জননী। ধন্যবাদ তাকে। কারণ মাধবী ঘোষাল দুঃখ সত্ত্বেও বেঁচে আনন্দিত। তাকে ধন্যবাদ, যখন মাধবী এসেছে জানতে পেরেছিল, তখন প্রচলিত সাংস্কৃতিক এবং সহজ উপায়ে তাকে এই আলো থেকে সরিয়ে দেয় নি। মাধবী মুখ তুলল। আলোটা ঘরে। ঘরের উত্তাপটা আরামদায়ক। পায়ের শব্দ পেল সে। সুরঙ্গমা ব্রেকফাস্টের আয়োজন করছে? ভারি তৃপ্তিদায়ক সুরঙ্গমাব ব্রেকফাস্ট, ডিনারের চাইতেও ভালো। ধন্যবাদ দিতেই হয়। সে তো সহজেই, সেই কলগার্ল জননী, মাধবীকে না আসতে দিতে পাবতো। আর নিজের সম্বন্ধে সেই জননী মাধবীকে সব কিছু বলেছে তখন মাধবীর বয়স ন বছর, যখন স্কুলে সেক্স সম্বন্ধে মাস্টারনী দু একটা কথা মাত্র আলোচনা করেছে। কী হলো হঠাৎ একদিন, সকালে মায়ের ঘুম ভাঙল না।

তবু ভালোবাসার কথা যদি বলো, তা যদি পরিবাবের জন্য পরিকল্পনায় নিযুক্ত হতে পারে, তবে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের পরিকল্পনায় নিযুক্ত হবে না কেন? ভালোবাসা আব সেই আবেগভূষিষ্ঠ আকর্ষণ নয় যা শরীর ও মনকে দুর্জ্ঞেয় দুর্নিবার বিদ্যুতের মতো টানে, ঝড়ের মতো গ্রাস করে। হয়তো এখনও ইলেকট্রিক তবে তা তারে তারে চলা, সুইচের সাহায্যে অফ অন করা যায় পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে, নিজেকে ভালোবাসার জন্য নানা রকমে প্রস্তুত করে। সে নিজেই কি নিজের সম্বন্ধে পরিকল্পনার জন্য নিরঞ্জনকে দূরে ঠেলে দেয় নি?...কিন্তু কেন অমন হল? মাকে দেখে কি তেমন মনে হতো? অনেক বেলায় মিস্ত্রিরা দরজা খুলেছিল। বিছানায় মা। উলঙ্গ দেহটা কী ভয়ঙ্কব বিশ্রী বকমেব আড়ষ্ট, এক হাতে টেলিফোন তখনও, পাশে খালি ওযুধের শিশি।

মাধবী উঠে বসল। নিজেকে সে রকম অবস্থায় দেখতে পেল নাকি? লম্বা আলখেল্লার মতো ঢিলে সেমিজটা তুলে গায়ে দিল। একটু তাড়াতাড়ি করল সে। কারণ সে অনুভব করল কিছু, যাকে অন্য ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বলা যেতো, কিন্তু ভুললে চলবে না এক সময়ে মাধবী বেলি-ডানসার ছিল। গলায় ফিতেটা টেনে বাঁধল না বলে বুকেব মাঝামাঝি পর্যন্ত খোলা বইল।

কপাল থেকে চুল পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে ভাবল, এসব দুঃখের কথা মনে হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? মাথাটা ভার বলে?...লোকে বলেছিল এটা খুব সহজ আত্মহত্যার ঘটনা। কিন্তু, কিন্তু মাধবীর বুকের মধ্যে কী যেন ঠেলে উঠছে।

ও, হ্যাঁ, সেই সিগারেট কেসটা তাকে কষ্ট দিয়েছিল বটে, কিন্তু গীতা কি সত্যি তেমন ভাবতে পারে? অথচ তাই মনে হয়েছিল। তখন ডিনার শেষ হয়েছে। রাজেনকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। সে মর‍্যালিটি সম্বন্ধে বলতে সুরু করেছিল। সিগারেট কেসটাকে বার করেছিল গীতা, সোনার উপরে ক্ষুদে ক্ষুদে হীরে দিয়ে ইংরেজি জি পি এই অক্ষর দুটি লেখা সত্যি সুদৃশ্য। সিগারেট কেস বার করে কিন্তু যেন একটু ইতস্তত করে সেটাকে না খুলে টেবলের উপরে রেখে দিয়েছিল গীতা। তখনই দুষ্টুমি বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল মাধবীর। নিজের সিগারেট কেসটা অনায়াসেই উঠে গিয়ে আনতে পারত কিংবা গীতাকে ইঙ্গিত করতে পারতো সিগারেট দিতে। তা না করে যেন গীতার সিগারেট কেসটার উপরে তার আদেখলেপনা জম্মেছে এমনভাবে সেদিকে হাত বাড়িয়েছিল সে। আর ঠিক তখনই সেটাকে সরিয়ে নিয়েছিল গীতা। এটা একটা হাসির হাত কাড়াকাড়ির ব্যাপার

হতে পারতো। কিন্তু মনোভাব তো বোঝা যায় চোখে মুখে। অন্তত রকমেব একটা ব্যস্ততা দেখা দিয়েছিল গীতার ভঙ্গিতে ; তার চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধ তিরস্কারেব মতোই কিছু ছিল যা চাপতে চেষ্টা করায়, অভিনয়ের চাইতে বরং সিয়ারিয়াস হয়ে উঠেছিল। ঠোঁটের কোণ কঠিন। আর তা রাজেনেব চোখও এড়ায় নি। সে তাব কথার মধ্যে থেমে গিয়েছিল, যেন সঙ্কোচে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল যখন গীতা ছোঁ মেবে তার সিগারেট কেসটা তুলে নিল। তখন তীব্রভাবে, তাব মনে ক্ষত তৈার করে যেন, অনুভব কবেছিল মাধবী, হয়তো সে গীতার মতো সার্থক নয় অভিনেত্রী হিসাবে গীতা সার্থক, অন্তত সায়েন্স-ফিকশ্যান সিনেমায় তার দাম প্রথম দু তিনজনেব মধ্যে ; কিন্তু তাই বলে মাধবী কী এত কোণঠাসা, এত অভাবগ্রস্ত যে সিগারেট কেসটা তা সোনায় হীরার টুকরো বসানো থাকলেই তার আদেখলেপনা দেখা দেবে?

ব্যাপারটা পরে অন্যরকম হয়েছিল, কিন্তু সে প্রথম আঘাতের ক্ষতটা এমন গভীর হয়েছিল যে পরে অন্য অনেক ঘটনার প্রলেপেও তা নিশ্চিহ্ন হয নি, ববং ঘুমে যখন স্মৃতিব বাছবিচার কমে গিয়েছে, ক্ষতটাকেও সে আবার খুলে দিয়েছে। গীতা না বললেও, এমন কি তাব মনে এমন চিন্তা না উঠলেও এই সুযোগে মাধবীর মন গীতার সঙ্গে তার তফাৎটাকে আবার ধরিয়ে দিযেছে।

কিন্তু এসব যদি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার হয়, তবে আমরা বলতে পারি, মাধবীব চিন্তার মূলে রাজেনেব ডিনাবান্তিক আলাপও থাকতে পারে। কাবণ রাজেন আলাপ করেছিল মর‍্যালিটি নিযে। সে হাসি হাসি সলজ্জ মুখেই এমন সব কথা বলে। সে বলেছিল, এক সময়ে মব্যালিটি বলতে সত্য কথা বলা, পাপ পুণ্যের বিচার করে চলা, পবলোক, সতীত্ব, ইত্যাদিকে মূল্য দেয়া বোঝাত। এখনও সেই আগের মাপকাঠিতে আমরা মর‍্যালিটিকে মানি না। সতীত্ব এখন একটা ব্যক্তিগত হাইজিনের চিন্তা, পবলোক কোথায থাকবে এখন? আমরা কি বায়ুলোকে অনেক দূব ঘুবে পৃথিবীর উর্ধে শুধু যে শূন্য ও মহাশূন্য তা অধিকাব করি নি? সত্য কাকে বলে? এম-এল-এ দের বিবৃতি নয়? আমাদের বিচারে সত্য তাই-ই যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নতুবা একই ইতিহাস বারবাব লিখতে হয় কেন? তাই বলে, (রাজেন বলেছিল স্টিমিত কবে তাব গোটির মধ্যে হেসে), একে কেউ যেন ইমমব্যালিস্টদেব যুগ মনে না করে। বরং মানুষ এত মর‍্যালিস্ট আব কোন যুগে ছিল না। মর‍্যালিটির সেই প্রথম যুগে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরেব সঙ্গে নিজে সংযোগ স্থাপন কবেছিল, যে ঈশ্বর নাকি মানুষেব স্রষ্টা এবং যার বিধানে মানুষ নাকি সুতোর টানা পুতুলেব মতো চলতে বাধ্য ছিল। সেই ব্যক্তি যে দশ বিশটা হুকুম জারি কবেছিল, তাই ছিল মর‍্যালকোড। তার লঙ্ঘন হলেই পাপ হতো। শাস্তি যে শুধু পরলোকের জন্য তোলা থাকতো তা নয়, ইহলোকেই বহুসংখ্যক কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সুযোগ ছিল। এমন ঈশ্বব নেই বলে আমরা নিজেদেরই মর‍্যালিস্ট ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইতিমধ্যে কেউ আবাব আর এক ঈশ্বরেব সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং দশ বিশটা হুকুমও জারি হয়েছে। এখন অবশ্য সে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় এবং পারলৌকিক মনে করা হয় না, বরং ভয়ঙ্কর রকমে বৈজ্ঞানিক বাস্তব মনে করা হয়। তাব নাম বদলে তাকে রাজনীতি বলা হচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক রাজনীতির নির্দেশ আমরা প্রাণপণে মেনে চলি। এবং আমরা সেদিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মর‍্যালিস্ট। এই মর‍্যালিটি সম্বন্ধে আলাপ, মাধবীর ঘুম ভাঙার পরের চিন্তায়, কলগার্ল সম্বন্ধে যে মর‍্যালিটি অর্থাৎ যৌক্তিকতার চিন্তা ছিল, তাতে প্রভাব রেখেও থাকতে পারে। কিন্তু এখন অবান্তর। এখনও তাকে খানিকটা তন্দ্রাগ্রস্ত মনে হচ্ছে, এবং তন্দ্রার ঘোরে অনেক সময়ে এটায় ওটায় মিশে যায়। যদিও লম্বা পাদুটো ঝুলিয়ে বসেছে মাধবী। মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে। আব ঠিক তখনই তার চোখ পড়ল গীতার সিগারেট কেসটার উপরে। চেয়াবের উপবে গীতার পোশাক, তার উপবে সিগারেট কেসটা। উজ্জ্বল আলো পড়েছে সিগারেট কেসটায়। সেটা যে কী চোখ ধাঁধানো রকমের সুন্দর তা বোঝা যাচ্ছে এখনও।

না, প্রকৃতপক্ষে গীতা সিগারেট কেসটার ব্যাপারে কিছুমাত্র আঘাত দিতে চায় নি তাকে। রাজেন তার ডিনার আলাপ শেষ করে চলে যেতেই গীতা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ফ্ল্যাটের। প্রায় ছুটে এসে বসেছিল মাধবীর পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট কেসটা নিয়ে, একটু দ্বিধা করে খুলেছিল সেটাকে। চার-পাঁচটি সিগাবেট ছিল, সেগুলো হাতে ঢেলে নিয়ে কেসটাকে মাধবীর দিকে এগিয়ে ধরেছিল। তখন বোধহয় নিজেই বুঝল সিগারেট-সমেত কেসটা তেমন করে ধরলে তবু সিগারেট মাধবীর আগ্রহেব ছল হতে পারে। সিগারেট ছাড়া কেসটায় আগ্রহ প্রমাণ হল না এবার। এটাই আরও বিসদৃশ মনে হয়েছিল তখন।

কিন্তু গীতা হাসল, বলল, তুমি কি একটা সিগারেট নেবে, মাধু? এই সিগারেট?

গীতা চার-পাঁচটি সিগারেট সমেত তাব হাতের তেলো মাধবীর সামনে ধরেছিল। একটা সুন্দর নিখুঁত ভঙ্গি যা বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীদেরই পক্ষে ভেবে পাওয়া সম্ভব।

মাধবী একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ভিতবে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে যে কোন অবলম্বন পেলেই সেদিকে হাত বাড়াবে, বিচিত্র কী? সে তাকিয়ে দেখল, তার মনে হল এই ব্র্যাণ্ডটাব নাম যেন তাব পরিচিত।

এমন পবিস্থিতি না হলে গীতা তেমন কৈফিয়ৎ কখনও দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

মাধবী ব্যাপারটা সহজ করে দেয়াব জন্যে হাত বাড়িযে গীতাব হাতের তেলো থেকে একটা সিগারেট নিয়েছিল। তখন সে লক্ষ্য করেছিল, এটাই সেই সিগারেট ব্র্যাণ্ড যা কিনতে একদিন গীতা তাকে সঙ্গে করে মার্কোস স্কোয়ার থেকে পুবনো চৌরঙ্গীব সেই তামাকের দোকানটায় গিয়ে সেই বুড়ো তামাকওয়ালাকে দেখেছিল, যার চোখে সুবমা, মাথাব লেসের টুপি এবং গায়ে খুব পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবী ছিল। লোকটির দাঁতগুলো ছিল তবমুজের বিচির মতো কালো এবং চোখা কিন্তু দাড়ির যেটুকু মেহেদি রঙানো নয়, তা ছিল সাদা।

গীতা বলেছিল, তুমি কি এ সিগাবেট একটা খাবে, মাধু? আস্তে আস্তে ধোঁয়া নিও। তোমাকে বলি, এটা মাবিউআনা।

গীতার মুখ, সময়ের ছাপ পড়বে না এমন অচঞ্চল, উদাস, দূরস্থিত। মাধবী এক মুহূর্তেই যেন এতক্ষণ যে অভিনয় হল তার মূল সূত্রটাকে দেখতে পেল এবং গীতা যে কেন সিগারেট কেসটাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করল, তা বুঝতে পেরে অদ্ভুত রকমে চাপমুক্ত অনুভব করল নিজের মনকে। প্রায় হেসে উঠল সে স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুসাবে, হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল।

বলল মাধবী, (চাপমুক্ত মনের আবার প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে) মারিউআনা? তা আর হতে হয না। এটা তোমার গেছো মেয়ে হওয়াব অভিনয়।

হেসে বাঁচি নে, বা তেমন কিছু বলেছিল গীতা। দুজনে দুটো সিগারেট নিয়ে বাকিগুলোকে কেসে ভরে তারা সহজ হয়েছিল অর্থাৎ সে অবস্থায় সেই প্রথম মাবিউআনার ধোঁয়া নিতে নিতে রক্তহীন মুখে মাধবীর পক্ষে সহজ হওয়া যতটা সম্ভব, তা যদি আন্দাজ করে নেয়া যায়। ব্যাপারটা সহজ হয়েছিল, কিন্তু মনের দাগ? অর্থাৎ গীতার সঙ্গে অভিনেত্রী হিসাবে তার পার্থক্য?

মাধবী পা বাড়িয়ে বিছানার নিচে স্লিপার খুঁজল, সকলেরই জানা আছে একজন সিনেমা অভিনেত্রীর সে রকম নগ্ন পায়ের বিস্তার সাধারণত বিশেষ আগ্রহের বিষয়। স্লিপার পায়ে গলিয়ে প্যানট্রির দরজার কাছে গেল লিভিংরুমের মেঝে পার হয়ে, সুরঙ্গমাকে ডাকল, সুরঙ্গমা এলে বলল, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, সুরঙ্গমা, তুমি কি তৈরি, বলতে ভুলে গেছি দুজনের ব্রেকফাস্ট দিও।

সুরঙ্গমা বলল, আমিও তৈরি, আমিও তৈরি।

সে মনে মনে হাসল, তোমাদের যে বয়স। কিন্তু আমাদেরও বয়সের অভিজ্ঞতা আছে। আগেই তা বুঝেছি, আর ব্রেকফাস্ট দুজনের মতোই করে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

মাধবী বলল, আমি এখনই তৈরি হবো। আর ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।

ভাবল সুরঙ্গমা : এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণই।

মাধবী স্নানের ঘরে যাবে। তার আগে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। নিজের সিগারেট কেসটা আয়নার সামনে পাওয়াতে সিগারেট ধরাল, আয়নার সামনে প্যাঁচের উপরে ঘুরতে পারে এমন টুলটায় বসল। সিগারেটটাকে নিজের চোখের সামনে এনে সে ভাবল, এটা কিন্তু সে আদৌ জানতো না কেন মারিউআনাতে কেউ কেউ এত আগ্রহ জানিয়ে থাকে। আলডুস হাক্সলির সময়েই নাকি, গীতা বলেছিল, এটা বুঝতে পারা গিয়েছিল মারিউআনা অথবা গাঁজারও এমন এক গুণ আছে যা দৃশ্যমান শহরের ডিটেইলস ভুলতে সাহায্য করে। এটা নাকি সেই আলডুস হাক্সলিরই আবিষ্কার যে ভারতীয় সন্তরা যাকে যোগ, সমাধি ইত্যাদি বলতো তার মূলে ছিল গাঁজার ধোঁয়া। গীতা বলেছিল, মনে করো তোমার এই ঘরে অনেক জিনিসপত্র আছে। লক্ষ করে দেখো সবই জ্যামিতিক রেখায় আবদ্ধ। সেই রেখার বাইরে তারা কি ছড়িয়ে যেতে পারে? ভালো করে দেখো। কোন ঘড়ি কি গলে গড়িয়ে পড়ছে এমন মনে হয়? অথচ সালভাডর ডালির সেই ছবিটার কথা মনে করো। সেই মরুভূমির ধূসর নির্মল পটের সামনে টেবিলে রাখা, টেবিলের উপরে গজানো বাজেপোড়া গাছের ডালে ঝোলা, কিংবা মেঝের উপর যে হাত ক্রমশ ভ্রূণের আকার নিচ্ছে তার গায়ে ঘড়িগুলো টফির মতো, জল পাওয়া লজেন্সের মতো গলে আসছে।

তুমি বলবে ভ্রম, ইল্যুশন। কিন্তু এমনই কি আমাদের মনে এই সবের প্রকৃত যে ছাপ পড়ে তার প্রতিকৃতি হতে পারে না? আমার তো মনে হয়, মাধু, মারিউআনা সব জিনিসকেই রেখার বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে পারে।

মাধবী বলেছিল, কিন্তু ট্রামে চড়তে গিয়ে যদি কোথায় হ্যাণ্ডেলের রেখা বুঝতে না পারো? বা তেমন কিছু।

কিন্তু পাবলো পিকাসোর একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি বুঝতে কি তুমি রেখা খুঁজবে?

তুমি কী বলতে চাও?

শুধু ছবিওয়ালা কেন, মনে করো যারা অ্যাবসার্ড নাটক লেখে। একটা কাপ বা একটা বোতলের চারিদিকে যেমন রেখা, আমরা মানুষের আচরণ যা দেখি সেগুলোকে লজিক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে রাখি না? মারিউআনা সেই লজিককে তুলে দিতে সাহায্য করে। তা ছাড়া—

কী আবার তা ছাড়াও?

যে কোন শিল্পী তা সে ছবিওয়ালা, ভাস্কর, কিংবা কবি হোক যা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় সে কি যা সে অনুভব করেছে, যা দেখেছে তার প্রতিভাস নয়? এখন এই যে ছাপ পড়ে শিল্পীর মনে তা কি আরও বিশুদ্ধ, আরও গভীর হয়ে ওঠে না যদি তার চারিদিকে রেখার, চিন্তার, লজিকের রেখাগুলো না থাকে? আমি শুনেছি সে রকম ছাপই এক সময়ে ক্যালিপসোর স্কেল ভাঙা সুর, ডাইলান টমাসের কবিতার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

মাধবী সিগারেটটাকে অ্যাশট্রেতে রাখল।

তখন, যখন গীতা বলছিল, মাধবী খুব আস্তে আস্তে সেই বিশেষ ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের স্বাদ নিচ্ছিল, মাধবী অনুভব করছিল ধোঁয়াটা যেন মাথার মধ্যে ঢুকে, ব্যথা দিয়ে নয়, ধোঁয়ার মতোই নিঃশব্দ হালকার চাইতেও হালকা হয়ে, কোন কোন রেখাকে মুছে দিচ্ছে বটে। তখন সম্ভবত এই রকম কিছু বলেছিল গীতা : কেউ বলেনি আলডুস হাক্সলির আগে, কিন্তু গাঁজার ধোঁয়ার ফলেই ভারতীয় সাধকদের কাছে পৃথিবীকে ভ্রমাত্মক মনে হতো , মায়ামাত্র মনে হতো। পৃথিবীর রেখার ধাঁধার বাইরে গিয়ে তারা গোটা বিশ্বটার আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পেরেছিল।

কিন্তু এখন? একথা বললে খুব বেশি বলা হয় যে কোন কোন ঋতু যেমন কারো কারো বিশেষ

পছন্দ, তেমন দিনের কোন কোন উত্তাপ কারো কারো কাছে বেশি প্রীতিপ্রদ। তার শোবার ঘরের এই উত্তাপ যা ৭৫ ডিগ্রীর উপরে কিন্তু আশিব খুব কাছে, আর এই আলো যা একটু বা ল্যাভেণ্ডার রঙের তা মাধবীর ত্বককে খুবই হৃষ্ট করতে পারে (যা মাধবী হয়তো এখনও আবিষ্কার করে নি) কিন্তু কোন কোন সকালে সে যে নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করে তার সঙ্গে হয়তো এই উত্তাপের যোগ আছে। (হয়তো এই উত্তাপ পরিচালনের ব্যাপারটা টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জনের সময়কার অভ্যাস।)

আয়নার সামনে মাথাটা ঝাঁকাল সে, এবং খুব মৃদুভাবে, খুবই মৃদু, তখন কোন যৌবনবতী ঘোটকীর মাথা ঝাঁকানোর ছাপটা মনে আসতে পারে।

মাধবীর ফ্ল্যাটে, অর্থাৎ যা নিরঞ্জন ঘোষালের মতো টেকনোক্র্যাট মাধবীর জন্য পাঁচ বছরের লিজ নিয়েছিল তাতে অনেক শোবার ঘর তো আছেই সুতরাং একাধিক স্নানের ঘরও। মাধবী তারই একটার দিকে গেল।

ততক্ষণে সুরঙ্গমা তার রান্নাঘর এবং প্যানট্রির মধ্যে যাতায়াত করে একজনের জন্য তৈরি কবা ব্রেকফাস্টের এদিক ওদিক, লম্বায় চওড়ায় গভীরতায় এটা ওটা যোগ করে দুজনের পর্যাপ্ত ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। তার গাজর রঙের বাহুদুটো ব্যতিব্যস্ত, তার কপালে চুলেব দাগের একটু নিচে ঘেমে উঠছে। টিং করে শব্দ হল। ফিরে দাঁড়াল সুরঙ্গমা। শব্দটা ঘড়ির নয়, স্টোভেব থেকে এসেছে। কেননা সেখানে তখন ফিলেট স্টিক। কিন্তু ঘড়িতেও দশটা বেজে কয়েক মিনিট।

ক্ষুধার সময় কারো কারো প্রসাধনের কথা মনে থাকে না। কালোয় সাদা আর হালকা লালে প্রজাপতি-আঁকা কিমোনোয় গা ঢেকে খাবার ঘরের টেবলে মাধবী সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌঁছে গেল। আর তার পায়ের শব্দ পেয়ে গীতা, রাজেন নয়, পৌঁছে গেল টেবলের কাছে।

গীতা বলল, আ, ডার্লিং, কী সুন্দর দেখায় তোমায় এ কিমোনোটায়।

শুধু পায়ের শব্দ নয়, গলার স্বরও, সুতরাং সুরঙ্গমাও তা শুনে ব্রেকফাস্ট দিতে শুরু করল।

সুরঙ্গমার রীতি এই, ব্রেকফাস্ট টেবলটাকে সে সাজিযে দেয, ওয়েটাব বা শেফের সঙ্গে তফাৎ এই হাউসকীপারের। দেখতে দেখতে প্লেট, পিরিচের আকার পছন্দ করার ফলে এবং আহার্যের রংগুলো পছন্দ করার ফলেও, সেগুলোকে এদিকে একটু ওদিকে একটু লক্ষ্য করে টেবলে বসাতেই একটা যেন ছবির মোটিফ ধরা দিতে লাগল। সব সময় সকলের চোখে তা ধরা পড়ে এমন নয়, মোটিফটা যদি পদ্ম বা ওই জাতীয় খুব পরিচিত কিছু না হয়। কিন্তু মাধবী জানে, সুরঙ্গমা নিজেই তাকে একদিন বলেছিল, সেদিন মাধবী জিজ্ঞাসা করেছিল একই সেটের টি-পট পিরিচ, প্লেট, পেয়ালা ব্যবহার না করে বিভিন্ন সেটের বিভিন্ন জ্যামিতিক গড়নের সেগুলোকে কেন ব্যবহার করছে? (এখন কথা হচ্ছে, এটাকে আর্ট বলা হবে না সায়েন্স বা ডোমেস্টিক সায়েন্সই বরং? হয়তো সুরঙ্গমা তাতে এম-এস-সি নয়।) কিন্তু তার মতো হাউসকীপাররা জানে মানুষের জীবনের সুখ ও আনন্দ যে কোন উপায়ে অর্জন করাটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সাধনার বিষয়ও।

সুরঙ্গমা টেবলটা সাজিয়ে দিয়ে সরে গেল।

মাধবী আহার্যের দিকে চোখ দিয়েছিল। ঢাকা প্লেটগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সুগন্ধ ধোঁয়া উঠছে। মাধবী মাথা নুইয়ে সেই সঙ্গে তার কোলের দিকে ঢাকাদেওয়া প্লেটটা খুলল।

কিন্তু সুরঙ্গমা একটু অবাক হবে এবার? সে ব্রেকফাস্ট টেবলে মাধবী ছাড়া দ্বিতীয় যাকে আশা করেছিল সে রাজেন।

সাইডার নেবার জন্য সে আলমারি খুলল। তার মন সাইডার খোঁজাতেই ব্যস্ত, তা খুঁজতেই সে ভাবল : তাহলে? এ বিষয়ে কি তা হলে চিন্তা করবে? কিছু অস্বাভাবিক বলবে? তা বটে রাজেন তো নয়। এ বিষয়ে একটা থিয়োরী আছে অবশ্য। এখন থেকে বছর পনের আগে অনুমানে,

সেটা খুব আলোচিত হয়েছিল এবং কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক সে বিষয়ে বিশেষ গভীর সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। যারা থিয়োরিটাকে সামনে এনেছিল তারা এমন বলেছিল, পুরুষ ভালোবাসার অন্যপক্ষ হতে পারে না, যদি তাকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা বলতে চাও, কারণ পুরুষের মনটাই আগ্রাসী আগ্রহে তৈরি। পুরুষ ভালোবাসাকে সংসার, সন্তান ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, ভালোবাসা তখন ডানাকাটা পরীর মাংসল উদর।

সাইডারটা পেল সুরঙ্গমা আলমারির নিচের তাকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে হল তাকে। এখন অবশ্য থিয়োরিটার কথা আর প্রকাশ্যে আলাপের বিষয় নয়। প্রেম সম্বন্ধে কোন বিষয়ই আর সম্পাদকের লেখার উপযুক্ত সামাজিক কৌতূহলের? তখন শোনা গিয়েছিল, তেমন অস্বভাবী প্রেম শিল্পীদের অনুভবের বিষয় হতে পারে, কেননা শিল্পীদের অনুভবের শক্তি জনসাধারণের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। হওয়া সম্ভব।

কিন্তু এটাও লক্ষ্য করো, কোন বিবেকবতী হাউসকীপারের পক্ষে বাড়ির মালিকের সম্বন্ধে এ জাতীয় চিন্তা করা উচিত হচ্ছে না।

এটা কিছুই নাও হতে পারে। সাইডারের বোতল, দুটো তারা, নামিয়ে দিয়ে সুরঙ্গমা দেখল টম্যাটো সসটা একটু বেশি ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু তার তৈরি ব্রেকফাস্টে যেরকম আগ্রহ থাকা তার ভালো লাগে তেমন স্বাভাবিকভাবেই খাচ্ছে গীতা এবং মাধবী।

গীতা বরং বলল, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, সুরঙ্গমা।

গীতা মুখ তুলল। তার ভ্রূ কামানো, কালই হয়তো তা হয়েছে, আর এখন নতুন করে আঁকা হয় নি। বোঝা যাচ্ছে তাহলে, গীতার গালও প্রমাণ, ব্রেকফাস্টের আগে গীতা পারকর নামের এই অদ্ভুত নিকটে আসা দেশবিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী ব্রেকফাস্টের আগে রঙের ব্যবহার করে না --সুরঙ্গমা এই ভাবল।

এখন গীতাকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! স্বাভাবিক আর সাধারণ মানুষের মতো।

অবশ্যই এটা একটা সংবাদ যা 'শিনার ফ্যানের' পেলে আনন্দে পাগল হবে।

সুরঙ্গমার আর কিছু করার নেই এখানে। কফিপট ভরে আনবে মিনিট পনের পরে। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের জলটাকে লক্ষ্য করল। নিজের জন্য চা ভিজিয়ে দিল, খবরের কাগজের এখনও অনেকটা পড়া বাকি। এটা তার নিজস্ব কাগজ, মাধবীর কাগজটা থেকে স্বভাবতই লম্বা চওড়া এবং বেধেও ছোট। আর সম্পাদকীয়টাই পড়া হয় নি তার। অন্য অনেক অনেক অনেকের মতো ওটা না পড়া পর্যন্ত সুরঙ্গমারও দিনটা আরম্ভ হয়েছে মনে হয় না, নিজেকে ভোঁতা মনে হতে থাকে। সুতরাং কাগজটাও টেনে নিল সে। সে আর একবার বলল, এটা হয়তো কিছুই নয়, গুরুত্ব কেই বা দিচ্ছে?

গীতা বলল, তুমি কি মন্ত্রীমহোদয়ের গল্পটা পড়ছো? কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট বেরিয়েছে।

কী গল্প?

জনৈক স্ট্রিপটিজ অ্যাকট্রেস এবং মন্ত্রীমহোদয়।

এতে কি গল্প হয়?

তুমি বলবে অ্যাডোলেসেন্টদের আলাপের বিষয়? গীতা বলল, কিন্তু গল্পটা এ জন্যও নয় যে মন্ত্রীমহোদয় বিবাহিত এবং তা সত্ত্বেও এই স্ট্রিপটিজ ; সকলেই জানে তা হলে এটা বালকবালিকার আলাপের বিষয় হতে পারতো। তা সত্ত্বেও যখন গল্পটা কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন কি মনে হয় না অন্য কিছু, অন্য কোন দিক দিয়ে হয়তো এটা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে।

তুমি কি বলবে —অবশ্য আমি মন দিই নি গল্পটায়, ডিটেইলস পড়ি নি, সব কি পড়া যায়?

তুমি কি বলবে, স্ট্রিপটিজ এবং তার এক ফ্যান নিয়ে যখন গল্প বলাই হচ্ছে তখন অন্য দিকটাই মুখ্য ; কিংবা এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে জনসাধারণ সত্যি আশা করে এবং সাধারণ মানুষ হিসাবে যে যাই করুক, যখন কেউ মন্ত্রীমহোদয় তখন তাকে খানিকটা অসাধারণ হতে হবে, স্বজনপোষণ, চুরি, এসব থেকে সে দূরে থাকবে এবং স্ত্রীকে এমন ভালোবাসবে সে বেলি ডানসার থেকেও দূরে থাকা যায়। এমনকি মিথ্যা বলবে না।

এ দিকটা আমি ভেবে দেখি নি, তোমাব হাউসকীপার কিন্তু ভালো রান্না করে, হোটেলের মতো স্বাদ নয়, একটু কম স্বাদু, যেন ঘবোয়া। অন্য একটা দিক সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে সেটা পড়ে দেখ। এখনই বোঝা যাচ্ছে না কোন দিকে যাচ্ছে গল্পটা। আমি পুরনো কাগজ রাখি না বড় একটা। অথচ এরকম ব্যাপারে খাস ইংল্যাণ্ডে একাধিক মন্ত্রীর চাকরি গিয়েছিল।

গীতা হেসে বলল, বলাই ভালো পড়িও না তেমন একটা এবং এ বিষয়ে আমিও তোমার মতোই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কাব করেছি বলেই বলার মতো মনে হচ্ছে। সেই মহিলাটি বড় কথা নয়, আসলে তার নাম ক্লিনিক। বলতে গেলে এক রকমের রিসার্চ হচ্ছে সেখানে। আমি, তুমি আর দশজন যা সম্বন্ধে আন্দাজ করি, খানিকটা অবিশ্বাস করি তারই গবেষণা বলতে পারো। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা। বাৎসায়নের কথায সত্যি কিছু আছে কিনা জানা, আর কোয়াক থেকে ডাক্তারের মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরে বাৎসায়ন সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করাব চেষ্টা বলতে পারো। এ রকম ইঙ্গিত আছে, এর ফলে প্রিয় মহিলাটিকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আব বেধেও নাকি বাড়ানো যায়। (গীতা হাসল) শবীবের মাপ নয়। তা হলে তো শুধু চিনি আর ফ্যাট খেতে থাকলেই হয়।

মাধবী বলল হেসে, এই দিকটা তোমাকে অ্যাপীল কবছে নাকি?

বাহ্ কববে না? কী যে তুমি বলো, মাধু। তুমি কি জানো না কোন ফলে কেন কষ, কেন টক তা আবিষ্কার কবেই থামে না মানুষ, ফলটাকে নিজেব স্বাদের মতো কবে নিতে বীজ থেকেই টকেব হেতু সরিয়ে দেয়া যায়। ফলে সে বীজ থেকে যে গাছ এবং যে ফল তো হবে টকশূন্য কিংবা ঠিক ততটুকু টক যা তুমি চাও। প্রেমের পার্টনাবের তেমন পরিবর্তন কি ব্যঙ্গার্থে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে বাড়ায় না।

মাধবী বলল, ভেবে দেখি নি। ঠিক এই সময়েই সুরঙ্গমা কফিপট নিয়ে এল। আব তাতে যেন মাধবীর ভাবনার সুবিধা হল। সে গীতাকে দেখল আরও কাছে থেকে দেখার মতো কবে। সেও দেখল গীতার জ্র কামানো এবং এখনো সেখানে পেনসিল বুলানো হয় নি, গীতাকে ববং বক্তহীন দেখাচ্ছে তার উপরের ঠোঁট—আচ্ছা, (একেবারে অবাক হয়ে গেল মাধবী) আচ্ছা, ওই সরু, নাইলনের সরু সুতোর মতো প্রায় আধ ইঞ্চি দাগটা? ছুরির দাগ? প্লাস্টিক সার্জারি? এবার আরও অবাক হয়ে দেখল মাধবী (এতদিন দেখে নি মাধবী, কারণ প্রসাধনের আগে গীতাকে দেখার সুযোগ হয় নি) নাকের দুপাশে তেমন দুটি দাগ আছে, নাইলনের সরু সুতোর চাইতেও সরু কিন্তু মুখের ত্বকেও চাইতে বেশি সাদা। আর ঠোঁট আর নাকেব দুপাশেব দাগগুলোকে বর্ধিত কবলে একটা ত্রিভুজ হতে পারে। প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া কিছু নয়। মাধবী অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য, সে এতদিন জানতেও পাবে নি!

আব এখনই আবাব প্লাস্টিক সার্জারির এই ব্যাপারটা ঢেকেও যাবে। কেন না ব্রেকফাস্টের পরেই গীতা গালে এবং ঠোঁটে বং দেবে, জ্রও আঁকবে। কিন্তু এটাও কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজের সৌন্দর্যকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেধে বাড়িয়ে নেয়া নয়? বলতে পারো, সৌন্দর্য কোনদিকে কতদূর বাড়ানো যায়? কিন্তু, মাধবী নিজের যুক্তিকে অটুট বাখল, এক্ষেত্রে তা অসম্ভব কিছু নয়, সায়েন্স ফিকশন সিনেমার নায়িকার কল্পনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব মিলিয়ে নেয়া। না, না, এটা অবাক করার মতোই কিছুই। অনেকদিন তো মার্কোস স্কোয়ারে এক ফ্ল্যাটে ছিল। তখনও জানে নি যেন গীতাকে।

কফি ঢালল গীতা দুই কাপেই। হাত কাঁপল না তার। অথচ মনের ভুলে মাধবী যেন তার হাত কাঁপবে এমন আশা করেছিল। তা কাঁপল না। হ্যাঁ, মাধবী স্বগতোক্তি কবল মনে, গীতাকে দেখে বোঝা যায় না তাই বাইরেটা এমন। কিংবা এমনটা কি স্থির আত্মপ্রত্যয়ে হয়? অথবা এটা গীতার মনের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গির ফল। অথবা অভ্যস্ত পোজ?

হঠাৎ যেন মাধবী সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল, মনের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিই হবে।

সে কি প্রেমের ব্যাপারেও স্বাভাবিক থেকে কিছু পরিবর্তন কবে নিতে চায় না? মাধবীর মুখটা লাল হল। সে কি বিচলিত হবে? রাত্রির স্মৃতিতে কি পাপবোধের নীল রং দেখা দেবে?

গীতা বলল, একেবারে চুপ করে গেলে কেন, মাধু?

(মাধবী সত্য বলল), তোমার কথা ভাবছি।

কী ভাবছো?

(মাধবী মিথ্যা বলল), তুমি কি আজ বিকেলেই রওনা হচ্ছো?

তোমার কি খুব একলা লাগবে কলকেতায় ডার্লিং?

(মাধবী অর্ধেকটা মিথ্যা বলল), বা! তা লাগবে না?

কিন্তু যেতেই তো হবে।

(কথার পিঠে বলা কথা), প্যাসিফিকে? আর তা স্মগ এড়াতে?

তোমার কি অন্য রকম ধারণা হচ্ছে?

তা ছাড়া আর কী? দল বেঁধেই তো যাচ্ছ। ডাইরেক্টর, ক্যামেবাম্যান, সকলেই। তোমাদেব শেষ বইটার পুরো টিমটাই তো বলছিলে।

তা যাচ্ছেই তো। শুটিংও হবে।

(সত্য আগ্রহ দেখা দিল মাধবীর), শুটিং?

সন্দেহ হচ্ছে তাই। ডাইরেক্টর প্যাসিফিকে আসা নানা জাতের, নানা দেশের, এবং নানা চমকপ্রদ দৃশ্যের মধ্যে দলেব লোকদেরও ছবি তুলবেন। সেগুলো যোগ করে, সামনে পিছনে নিয়ে কী একটা স্ক্রিপ্ট উদ্ভাবন করা যায় না?

অদ্ভুত, ইনট্রিগিং।

তুমি কি মনে করো, মাধু, ড্রামার বিষয়টাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই দৃশ্য, দৃশ্যগুলোকে একত্র করার জন্যও তো ড্রামা হতে পারে!

মাধবী গীতার দুটো হাতই দেখতে পেল এক সঙ্গে। এক হাতেব চারটি আঙুলের চূড়ায় পিরিচ, অন্য হাতের দু আঙুলে কাপের হাতল ধরা। ম্যানিকিকিওর কবা সুচলো নখ, নীল শিরার আভাসযুক্ত ক্রিম রঙেব ত্বক, এমন লম্বাটে হাত।

মাধবী ভাবল, একটুও চঞ্চল নয়, দেখো। আজই তো যাবে, তিন মাসেব জন্য সে যাওয়া, অথচ এতক্ষণ মন্ত্রীমহোদয়ের কথা ভাবছে, আলাপ কবছে। কোথাও যেতে হবে ভাবলে মানুষের মন কি যাওয়ার বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে এমন আলাপ করে? কাল রাতে ডিনারে বরং চঞ্চল হয়েছিল। মারিউআনা সিগারেট এবং সিগারেট কেসটার ব্যাপার উঠে পড়ার আগে রাজেন সম্বন্ধে একটু অসহিষ্ণুও যেন হচ্ছিল, ঘড়ির কাঁটা যত চলছিল।

কফি শেষ করল গীতা। এদিক ওদিক চাইল। হাসল। কিছু যেন খুঁজছে সে। নিজেই সেই সিগারেট কেসটা নিয়ে এল। খুলল, বলল মিটমিট করে হেসে, নেবে?

মাধবী হাত বাড়াতে গেল, দ্বিধা কবল, তাবপর হঠাৎ যেন এক সাহসিকতা দেখাতে হাত বাড়িয়ে সে সেই সিগারেট নিল।

বলল, তোমার সঙ্গী হতে।

এগারোটার পবে ব্রেকফাস্ট শেষ হল। ভ্রূ এঁকে এবং মুখে রং দিয়ে গীতা যখন তার ভারি হ্যাণ্ডব্যাগটাকে নিযে বার হল তখন সাড়ে এগারোটা পার হয়েছে। ব্লকের সদব দরজা পর্যন্ত নেমে গেল মাধবী। গীতার গাড়িটায় তাব শোফাব সকাল থেকে এ পর্যন্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছিল। সে-ই নেমে দরজা খুলে দিল। গীতা গাড়িতে উঠল, মাধবী ও গীতা দুজনেই দুজনের দিকে চাইল। হাত তুলল। এটা তো ঠিক মার্কোস স্কোয়ারে ফিরে যাওয়া নয় মির্জা গালিব এভেন্যু থেকে। দুজনেরই মনে ছিল, প্রকৃতপক্ষে এ বেশ কিছুদিনের জন্য প্যাসিফিকে যাওয়ার যাত্রা শুরু, এবং দুজনেই সিনেমা অভিনেত্রী যাবা মনেব যে-কোন অনুভূতিকে শরীরভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি ও হাতের ইশারায যথেষ্ট, অন্তত দর্শক যাতে ধরতে পাবে ততটা, বাড়িয়ে তুলতে জানে। সুতরাং এটা যে কোন সিনেমায় বসানোব উপযুক্ত বিদাযদৃশ্যেব মতো গুরুত্বপূর্ণ হল।

প্রিয় পাঠিকা, গীতার চবিত্রে কি, আমাদের কাছে, বেশি রং পড়েছে মনে হচ্ছে! তাব ভালোবাসাকে নিখাদ করার ইচ্ছায়, তাকে পুরুষবর্জিত করার চেষ্টায়, তার ডোপ-সিগারেট (মর্জিনাকে মনে আনা এবং তা থেকে এতে মারিউআনা আছে এমন প্রমাণ করাব জন্য) যার নাম আলিবাবা এবং তার চরিত্রেব এসব আনুষঙ্গিক একই অধ্যায়ে প্রকাশ হয়ে পড়া কি ভারি হল? তা হলে এব কারণ কি তাকে প্যাসিফিকে যেতে হবে মনে করে সে একটু উত্তেজিত ছিল, অথবা এর কাবণ কি তাকে এতক্ষণ মাধবীর চোখ দিযে দেখা হয়েছে এবং মাধবীব মন কালকের ডিনারের পর থেকেই কি একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ হযে পড়েছিল? নতুবা বলতে হয়, তার আলিবাবা সিগারেট সংগ্রহের ব্যাপার যে বিশেষ কিছু তা কি ইতিপূর্বেই মাধবীর চোখে পড়া সম্ভব ছিল না? অথবা তাব শোফার নিশ্চযই আন্দাজ কবে, যে সিগাবেট সংগ্রহ করতে তাকে মার্কোস স্কোয়ার থেকে ওল্ড চৌরঙ্গী যেতে হয়, তা যদি সিগাবেট হিসাবেই ভালো হতো তাহলে অনেক বড় দোকানে পাওয়া যেতো। কিংবা তার মুখের প্লাস্টিক সার্জারির চিহ্ন নিশ্চয়ই তার স্টুডিওর মেকআপ বিশারদরা অন্তত কিছুদিন থেকেই দেখছে। প্রেমটা অবশ্য ঝড়ের মতো সহসা প্রবল হয়ে ওঠে। গীতাব কাল ডিনার শেষে নিজের ফ্ল্যাটে ফেবার কথা ছিল। হঠাৎ স্থিব করেছিল অন্য রকম।

মাধবী ফ্ল্যাটে ঢুকল ব্রেকফাস্টেব ঘর দিয়ে। টেবলের সামনে দাঁড়াল। যেন কিছু সে মনে করার চেষ্টা করছে। কী বা মনে করবে? পাকস্থলীর খাবারগুলো তাকে তৃপ্তি দিচ্ছে ইতিমধ্যেই। সে কিছু ভাববে? সে কি প্রেম সম্বন্ধে ভাববে? সে ঘবের আলো লক্ষ্য করল। সে কি দু-একটা আলো নিবিয়ে দেবে? একদিকের ছাতে বসানো আলো সে নিবিয়ে দিল। টেবলে রাখা কাঁটা চামচ এবং পাত্রগুলোকে এখন একটু অন্য রকম দেখাল। এবং সে জন্যই যেন তার চোখ পড়লো চকচকে রংটায়, সোনা রং। গীতা তার সিগারেট কেসটা নিতে ভুলে গিয়েছে।

ঘরেব উত্তাপ এমন যে খালি গায়েও কাবো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সে কি উত্তাপটা একটু কমিয়ে দেবে?

লিভিং রুমে গিযে দাঁড়াল মাধবী। পাশেই ডরমিটরি।

সেখানে ইলেকট্রিক ম্যাসাজারটা তার নিকেলের প্লেট নিয়ে ঝকঝক করছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, খুবই ভালো ওই ম্যাসাজারটা, বিশেষ করে যদি শরীরের গড়ন ঠিক রাখতে হয়। আর তোমাকে কিছু করতেও হয় না। মিনিবিকিনি পরে নিতে হয়, চোখে গগলস দিতে হয়, যদি তুমি আল্ট্রাভায়োলেট রে চেয়ে সুইচটাকে টেপো ; কোন একটা ছবির বই নিতে হয় এবং সিগারেট যদি আল্ট্রাভায়োলেটে তোমার দরকার না থাকে ; তারপর মেশিনটাকে গো বলার মতো ভঙ্গিতে বসলেই হলো। সুইচও টিপতে হয় না, রোলার, প্যাড, কাপ মেসিনের সর্বত্র থেকে বেরিয়ে এসে

তোমার শরীরকে থাবড়াবে, মৃদু মৃদু চটকাবে, টেনে টেনে ধরবে। কনট্রোল করার জন্যেও তোমাকে ভাবতে হয় না, কারণ এ মেশিনটা ক্যাথডরশ্মির কায়দায় চলে, তোমার শরীরেব বিঅ্যাকশনেও সে রশ্মি ছিন্ন ও সংযুক্ত হয়ে মেশিনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে ; যেহেতু মধ্যবিত্তদের ঘবে এখানে ওখানে সুইচ যুক্ত যে ম্যাসাজাব দেখতে পাও এটা সে শ্রেণীর নয়, বলতে পারো টেকনোক্র্যাট শ্রেণীর, বা পার্টির নেতা ও মন্ত্রী এবং নিরঞ্জন ঘোষালের মতো টেকনোক্র্যাটের পক্ষে কেনা সম্ভব ; যা সব চাইতে বৈজ্ঞানিক এবং একখানা নয়া মডেলের আমেরিকান সুপাব ফোর্ড কনভার্টিবলের সমান দামী ; কেননা এটা টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষাল কিনেছিল তাব প্রিয়তমা নারী মাধবীব দেহের বক্ররেখা ও বর্তুলগুলিকে চিরকালের জন্য যথাস্থানে রাখতে সাহায্য করতে ; বলতে গেলে, সন্তান এলে —যে সন্তান নিরঞ্জন চেয়েছিল, —যে ক্ষতি হবে মাধবীর শরীরেব গড়নে তা ফিরিযে দেবে এই মেশিন, এই রকমের আশ্বাস মাধবীকে দিতে।

নিরঞ্জনের সঙ্গে জুডিশিয়াল সেপাবশন চলছে যেহেতু সে আশ্বাসে মাধবী প্রবোধ মানে নি, আর কমাস চললেই তা স্থায়ী হবে। নিরঞ্জন কিছুই সরিয়ে নেয় নি, ফ্ল্যাটেব লিজ তো বটেই, এই দামী গ্যাজেটগুলোও রেখেই গিয়েছে। নিরঞ্জন কি তা হলে মাধবীকে ভালোবেসেছিল, এবং এখনো ভালোবাসে!

না, সে ম্যাসাজারকে, যদিও তা সুপার ক্যাথোড লিনিয়াল ব্রেকযুক্ত, প্রশ্রয় দিতে চায় না। সে ববং শোবার ঘরের দিকে চলল। কিন্তু হঠাৎ থেমে দাঁড়াল—একেই কি পুরুষেব আগ্রাসী মনোভাব বলে? কী হতো, নিবো, (হ্যাঁ তোমার সেই ফেয়ারোদাড়ি-সমেত এবং বড়নাক-সমেত মুখমণ্ডল দুহাতের আঙুল দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে তোমাকে সেই রোমান জারেব নাম অনুসারে নিরো বলতে মাধবীর ভালো লাগতো) কী হতো একটি সন্তান পেলে? তোমার গুণপনা, তোমার চেহারায় উত্তরাধিকারী হতো? তোমাব অর্থেব অবশ্যই নয় কাবণ তা হতো বেআইনি, আব এখনকার পৃথিবীতে এসব বিষয়ে বেআইনি কাজ কবাব কথা কেউ ভাবে না। কাল রাজেন সুন্দর বলেছে যে যুগটা মব্যালিস্টদের। বাজনৈতিক মর্‍্যালস কা হতো তেমন উত্তরাধিকারী? খেলনা? অবসর যাপনের কিছু, খুব ভালো ধরনের একটা কুকুবে তা কি চলে না, কিংবা স্টেট অর্ফ্যানেজে তেমন মানুষ-শিশু সংগ্রহ করাও যায়। মাধবী তোমাকে খুব ভালো বেসেছিল কিন্তু—

চলার মাঝখানে হঠাৎ থেমে মাধবী এই ভাবল, তার ফলে দিব বদলে সে ববং শোবার ঘরের দিকে চলল চিন্তাটাকে পাব হয়ে, কারণ চিন্তাটা তো হালকা, এখন আর ভেবে লাভ নেই এমন কিছু, অনির্দিষ্ট গতিতে চলা মেঘের মতো, সে মেঘের পাশে ব্রেকফাস্টের আরাম আছে।

এখন সকালের ঘুমভাঙার কষ্টটাও নেই। আচ্ছা ওটা কি কালকের আলিবাবার ধোঁয়া নেয়ার ফল হতে পারে? অর্থাৎ অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছিল? নতুবা ব্যাপারটা একেবারে একটা ভুল ধারণা থেকে মানসিক আঘাত পাওয়া। হেতু যদি মিথ্যা হয় ফলটাও কি তা নয়? তার প্রমাণ গীতা কেসটাকে অবহেলায় ফেলে রেখে গিয়েছে।

শোবার ঘবে বিছানায় বসল মাধবী। না, শরীর তার খারাপ হয় নি। কিমোনো সে গুটিয়ে তুলে নিজেব একটা পায়ের গঠন দেখল বুড়ো আঙুলকে কেন্দ্র করে পা'টাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামনের দিক, পিছন দিক। এখন সে কী করবে একটানা বেলা দুটো পর্যন্ত ছবির বই নিয়ে শুয়ে? যেমন? যেমন তার জননী সেই কলগার্ল দুপুর কাটাতো। না, অবশ্যই সেগুলো ছবিতে সেক্স নয়। বরং ক্লাসিক উপন্যাস, ছবিতে ক্লাসিক নাটক। আর তার ফলে মা কত জানতো। এটা কি দৈনন্দিন থেকে উপরে ওঠার আগ্রহ? হঠাৎ মাধবী নিজের হাতেব পিঠ মুখে চাপা দিয়ে যেন আর্তস্বর ঠেকাল। এটা অবশ্যই নাটকীয় জেশ্চার। কিন্তু, কিন্তু কেন একজনকে আত্মহত্যা করতে হয়!

মাধবী তার বিছানায় বসেছিল, তখনই উঠল। টেলিফোনটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাজেনকে সে কাল ডিনারে বলেছিল বটে, বড়ো একা লাগে। রাজেন প্রথমে চমকে উঠে পরক্ষণেই যেন একটা কার্ড বার করে বলেছিল, টেলিফোন আমার ঘরে নেই, কিন্তু কার্ডে যে নম্বরটা দেয়া আছে ওটা বারোয়ারি নম্বর। ডাকলে, যদি ঘরে থাকি, বিরহ দূর হবে।

ডায়াল করল মাধবী কার্ডটাকে চোখে সামনে ধরে। কনেকশনের শব্দ পাওয়া গেল। ওপার থেকে কে একজন ভারি গলায় কথা বলে উঠল। তাও ভালো। ওপারের লোকটি অবশেষে বলল, ধরে থাকুন, পেলে কনেকশন দেবো আবার।...কী আশ্চর্য, সে কি নিজের মন নিয়ে খেলা করছে! এক চিন্তা দিয়ে অন্য চিন্তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে?

নিজের বাহুতে চোখ পড়ল ফোন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে। অ্যালাবাস্টার বলতো নিরঞ্জন। আর তা নিশ্চয়ই কাল ডিনারের পরে একবার, আর আজ ব্রেকফাস্টের পরে একবার আলিবাবা খেলে পুড়ে যায় না।

ফোনে আবার যেন কনেকশন পাওয়া গেল। না, পুড়ে যায় নি, বরং...হাল্লো।

কে? রাজেনের গলাই।

আমি মাধবী, মাধবী ঘোষাল। ডার্লিং...(বরং গীতাও ঠিক নিরঞ্জনেব মতো তেমন গলাতেই প্রশংসা করেছে। আবার মুখটা লাল হল মাধবীর।)

ডার্লিং! (রাজেন কি চমকাল?)

রাজেন নও? আমি মাধবী। (আশ্চর্য গীতা বলছিল, তার সে আগ্রহ নাকি বৈজ্ঞানিক। নিরঞ্জনদের মতো প্রাকৃতিক নয়। আর এটাও বোধ হয় বৈজ্ঞানিক যে এখন একটু একটু করে মনে যা আসছে, তার কারণ তার কাছে নানা রকম বলে মনে হয়েছে, অর্থাৎ মন গোপন করতে চাইছে। কিন্তু তেমন করে যে আত্মহত্যা করেছে তার হাতে কেন টেলিফোনের রিসিভার! না, না, কী এমন বয়স তার?)

হাসছেন নাকি?

দূর করো। রাজেন, বলতে পারো? না, তুমি এলে বলবো। তুমি এখনই একবার আসবে?

শরীব খারাপ নয়তো?

কী যে বলো, বরং—

এখনই যেতে হবে? হাসছেন তো।

খুব কি অসুবিধা হবে?

গলার স্বরটা একটু অন্য রকম।

তা তোমায় বলতে পারি, হয়তো মারিউআনা--

মারিউআনা?

হ্যাঁ, কাল থেকে ডোপ-সিগারেট টানছি। তুমি যাওয়ার পর থেকেই। এতে কি গাঁজা থাকে কিংবা ভাং?

মাধবী হাসতে হাসতে ফোন ছেড়ে দিল। আচ্ছা, আত্মহত্যা কি ছোঁয়াচে রোগ?

সে ফিরে দাঁড়াল আর তখন ভাবল, রাজেন দার্শনিক, সে অনেক জানে।

রমণীরা কি ভেবে কাজ করে? কিংবা কাজটা করে তার যুক্তি ভেবে বার করে? রাজেন দার্শনিক, এটাই কি তাকে ডাকার কারণ? দর্শনের সাহায্যে কি সে জানতে চায়, মিথ্যার আঘাতে মনে সত্যিকারের ব্যথা হয় কি না?

মাধবীর চিন্তা আবার সেই ব্যথার দিকে গেল।

হঠাৎ যেন ঘটনাটা ঘটল, দর্শন শব্দটার উচ্চারণই যেন তা করাতে পারে। এতক্ষণ সে এদিক

ওদিক ভেবেছে। আসল ব্যাপারটা তো তার মনেরই। সেজন্যই এতক্ষণ এতভাবে তার নিজের রূপের কথা মনে হচ্ছে, যে রূপকে বাঁচানোর জন্যই সে নিরো, নিরঞ্জনের ভালবাসাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে কি কোন মনস্তাত্ত্বিককে বলবে তার মনকে একটিবার দেখে দিতে।

আসল কথা, (তার মুখটা নীল দেখাল, যেন বুকের ভিতরে ব্যথা হচ্ছে,) আসল কথা সে আর্ট থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে। একটা সিগারেট কেসের উপরে, নতুবা, গীতাব অমন আগ্রহে তার হেসে ওঠাই স্বাভাবিক হতো। একটা হীরে-বসানো সিগারেট কেস নিরঞ্জন টেকনোক্র্যাট, যে নাকি ইকোনমিক্সের অর্থাৎ রাজ্যের ব্যবসা বিভাগে নীতি-নির্ধারক, মাধবীর পায়ের কাছে রাখতে প্রস্তুত ছিল, যদি তা বলো। রূপ তার আছে। কিন্তু সে কি আবার প্রবীর সাণ্ডেলের কাছে যাবে? এতটা সময়ই বা লাগল কেন তার এ সহজ বিষয়টা বুঝতে? অথবা বুঝেও তা কথা দিয়ে স্পষ্ট কবতে ॰

মাধবী ভাবল, তাব চিন্তা গভীরতার দিকে সরে গেল। আর তখন অলিখিত মর‍্যাল কোডের মতো; সব অবস্থাতেই মর‍্যাল কোড থেকে যায় মানুষের, তার মনে হল কোন ব্যাপারে বেশী রকমেব দুঃখিত হওয়া কি অন্যের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর জন্য নয়? তাই তো সেন্টিমেন্টাল। তার মন নিজের সমর্থনে অতীত থেকে কিছু খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল। কী গভীব রকমে ধোঁয়া রঙের সেই স্মৃতি, যেন প্রায় সিপিয়া। তাব জননীর, অর্থাৎ মাধবী ঘোষাল হওয়ার আগে যে তার জননী ছিল। তাব জননীর লিখবার ডেস্কেব ঠিক উপরে দেয়ালের মাঝামাঝি, বসলেই চোখ পড়ে এমন জায়গায়, একটা ব্রোঞ্জ প্লাকে ভারডিগ্রিস রঙে লেখা ছিল ইংরেজিতে, ডাজ এনিথিং রিএলি ম্যাটার। কবিতা নয়, উজ্জ্বল গদ্য নয়, লাটিন বা সংস্কৃত নয়, একেবারে চলতি ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এমন শব্দে লেখা যেন সেকালের গুরুর কাছে পাওয়া মন্ত্র : ডাজ এনিথিং রিএলি...

এটাই হয তো—নিরঞ্জন থেকে বিচ্যুত হলেও মাধবী কি আবার অন্য রকম হবে—টেকনোক্র্যাটদের কালচাবের সুতো যাব চাবিদিকে ভঙ্গুর দানাগুলো বেঁধে ওঠে। ডাজ এনিথিং রিএলি ম্যাটার?

নীল দেখাল মাধবীর মুখ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপল সে, কিংবা গীতা যেমন করে আলিবাবার ধোঁয়া ছেড়ে দেয় ধীরে ধীরে তেমন করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাধবী। ওটার মানে এই হবে বোধ হয় যে কিছুতেই কি সত্যি যায় আসে? 'সত্যি' একথাটার উপবেই জোর।

মাধবী বরং ব্রেকফাস্টেব ঘরে গেল। গীতার সিগারেট কেসটা তুলে নিল, খুলল। ওমা, এ যে দেখছি প্রায় দশটা আলিবাবা। তা হলে গীতার সঙ্গে স্টক থাকে যা থেকে সে এই কেসটা ভরে। কী দুষ্টু মেয়ে, বাবা! দশটা তার মানে সে যদি তিনটে করে খায় দিনে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, তিন দিন চলে যায়। লাইটারটা ফ্লাওআর ভাসের গোড়ায়। সেটা তুলে নিয়ে মাধবী চেয়াবে বসবে এমন সময়ে বেশ জোরে কেউ নক করল।

রাজেনই।

মাধবী হেসে উঠল। সে এত খুশি হয়েছে যে, রাজেন যে অদ্ভুত বকমে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে তা তার খেয়ালে এলো না।

বসো, বসো।

ব্রেকফাস্ট ঘরের চেয়ারে বসল রাজেন। চেয়াবে ঘেঁষে দাঁড়াল মাধবী। এখনও তার পরনে শিফনের স্বচ্ছ সেমিজটাই। তার উরু হাতলটাকে স্পর্শ করে রইল। হঠাৎ সে নিচু হয়ে দু হাতে রাজেনের মুখ আঁজলা করে ধরে, (তার এক হাতে সিগারেট কেস অন্য হাতে লাইটার রইল অবশ্য) রাজেনের ঠোঁটের দু আঙুলের মধ্যে নিজের ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল, খুব ভালো তুমি। কিন্তু রাসপবেরি জ্যাম খেয়েছো বুঝি ব্রেকফাস্টে!

রাজেন তার বিরক্তি এবং বিস্ময় গোপন করতে পারল না কথা না বললেও, কিন্তু মাধবী তা

লক্ষ্য করল না।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল মাধবী, খিলখিল করে হাসল।

বলল, কফি দিতে বলি!

আলিবাবা ধরালে মন্দ হয না। গীতাব কেসটা খুলল সে। সিগারেট নিল। একটু কি দ্বিধা! তারপরেই লাইটাবটা জ্বালাল সে। একটু উঁচু গলায় বলল, কফি দিও সুরঙ্গমা, দুজনের।

রাজেন মনে মনে আন্দাজ কবার চেষ্টা করল, এটা কি মাবিউআনার ফল, কিংবা এই সিগাবেটটাই তেমন।

হঠাৎ সে বলে বসল. আগেই সিগাবেট খাচ্ছেন। কফি খেয়ে নিলে হতো না।

তাই? জিজ্ঞাসা করল মাধবী। সিনেমা অভিনেত্রীর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ভ্রূ উঁচু করে এই প্রশ্নটাকে গভীবতর করল।

মুখ থেকে হাতে নিল সিগারেট মাধবী। বলল, ডাজ এনিথিং রিএলি ম্যাটার?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রাখল সে। দুহাতের তেলো একত্র করল, আঙুলেব ডগাগুলো নিজেব চিবুক ছুঁয়ে রইল।

রাজেন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমাদেব প্রোগ্রাম কি জানতে পাবি না?

আপনি বলুন, তা কী হতে পারে।

রাজেন হেসে বলল, আগে কফি আসুক।

মাধবী বোধ হয এতক্ষণ নিজের অজ্ঞাতসারেই চেষ্টা কবছিল জেস্টিকুলেশানটাকেই মুখে আনতে। একটা ঔদাস্যের ভাব তার মুখে ফুটল। সে বলল, কিংবা রিএলি ডাজ এনিথিং. .

রাজেন ভাবল, এটা অবশ্য বয়স্ক লোকেদেব মনেব একটা ভঙ্গি হতে পাবে। না, ঠিক ঔদাস্য নয়। অনূঈ বলতে পাবো। আর তাহলে ববং এখন একটা কথা বলাব বিষয খুঁজে বার করে মাধবীকে বলতে দিযে, কিংবা টেবলেব উপরে ভাসতে দিযে তাব কিনারায় ঝুলে ঝুলে চলাটাই সামাজিকতা। কিন্তু এটা কি তাই মাধবীর? মাধবী কি এখনই বোরড হতে পাবে? ববং একটু সিয়ারিআস টাইপ নয? যে নাকি অভিনেত্রী হওয়ার জন্য একজন টেকনোক্র্যাটকে দুবে বাখতে পাবে।

মাধবী বলল, আমরা অবশ্য মন্ত্রীমশাযের স্ক্যাণ্ডালটা আলাপ করতে পারি।

মন্ত্রীমশায়? কেন? বাজেন প্রশ্ন করল।

কিন্তু সে ভাবল, এটা কি সেই ব্যাপার, তাদের চাইতে কিছু বয়স্ক নরনাবী টেবলে বসে যেমন অন্যের কথা এনে নিজেদের মধ্যেকার ফাঁক ভরে তোলে? হতে পাবে, আমরা সবাই তো বয়স্কদের দেখে শিখি। কাল ডিনারে অবশ্য এমন বোরড মনে হয় নি মাধবীকে।

বাহ্! মন্ত্রীমশায় এবং সেই বেলিডানসার, জানেন না?

খবরের কাগজে বার হচ্ছে, তাই না?

কফি আনল সুরঙ্গমা।

মাধবী বলল, কিংবা কফির পরে চলো আমরা বেড়াতে যাই। একদিন যেমন আমরা ঘুরেছিলাম বটে। আমাকে কোথাও নিয়ে চলো।

আর তা ছাড়া, রাজেন কথা শেষ না করে ভাবল, মন্ত্রীমশায়, কেন মন্ত্রীমশায়, কী এসে যায়, সে কী করেছে, তা জেনে মাধবীর। কিন্তু গলাটা তোলার কায়দা দেখো। অবশ্যই তা হতে পারে। টেকনোক্র্যাটদের অনেক ডিনার টেবলে নিশ্চয়ই বসেছে মাধবী এবং ম্যানার্স হিসাবে অন্যের দিকে লক্ষ্য বেখে শিখেছে। তাও বটে, কাল যেমন ডিনারে বলেছিল, আপনি দার্শনিক, কিছু বলুন।

দর্শন পড়ার যা দোষ, রাজেন ভেবে চলল, সত্যিকারের অনূঈ, কার হতে পারে কলকেতায়? হয়তো, প্রবীর, হয়তো তার মতো আর কেউ, হয়তো হয়তো। মানসিক ভঙ্গি থেকেই তো এই

চূড়ান্ত ধরনের বোরডম আসতে পারে যাকে অনুঈ বলে। কিন্তু সেই অনুঈএ তো প্রকৃতপক্ষে কিছু আছে কি না সে প্রশ্নই নেই, থাকলেও তার মূল্য কী সেই প্রশ্নও নেই।

কফি এগিয়ে দিল মাধবী। বলল, চলো, যাবো, তোমার সঙ্গে রোদে রোদে ঘুরবো।

রাজেন কফি নিল। কাপ না তুলে নিচু হয়ে ঠোঁট ছোঁয়াল কাপে। মিটমিট করে হাসল, বলল মনে মনে, আ, মাধবী প্রকৃতপক্ষে অনুঈএর অভিনয় সহজ, আরও কিছু অভিজ্ঞতা না হলে এ জীবনটাকে ভার বোধ হতে পারে না তোমার।

আর তা ছাড়া সত্যি কি টেকনোক্র্যাটরা বোরড? তারা কি তাদের ঘরের চারিদিকে—অফিস ঘর এবং শোবার ঘর—ছড়ানো গ্যাজেটগুলো সম্বন্ধে বোরড?

দর্শন কোন কোন মানুষকে অনুকম্পাশীল করে। এবং অনুকম্পার এই অর্থ কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার না করে ব্যক্তিটি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছে তা দিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করা।

রাজেন, সুতরাং, ভাবল, মাধবী তার এই অক্সিজেনতৃপ্ত, আলোয় উজ্জ্বল এবং নিয়ন্ত্রিততাপ ঘরে বসে যা বলছে তা হয়তো এক রকমের অবিশ্বাস কিন্তু তা থেকেই ক্রমশ অনুঈ জন্মাতে পারে। অবিশ্বাস, ঔদাস্য, তারপর অনুঈ। সে ক্ষেত্রে এই যে নানা রকমের মদ, নানা রকমের খাবার এবং নানাবিধ গ্যাজেট, এবং প্রত্যহ নবাগত বেলিডানসারের ভিড, এসবের মধ্যে আগ্রহ না দেখে অভ্যাস দেখতে হবে টেকনোক্র্যাটদেব?

কফিটা ভালো আপনার, মিসেস ঘোষাল।

আর একটু কি চিনি লাগতো?

মৃদু একটা শব্দ হল। তাদের বাঁয়ে দরজা। তাব নিচে এক টুকরো কাগজ যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে। রাজেনের চিন্তায় সংযুক্ত মন লক্ষ্য করল না কিন্তু চোখে পড়ল। কাগজের টুকরোটা বাড়ল, একটা খবরের কাগজের রূপ নিল ঘরের মধ্যে এসে।

অন্যমনস্ক হয়ে কফি খেতে গিয়ে রাজেনের ঠোঁটে শব্দ হল।

মাধবী বলল, ক্রিম দেবো?

রাজেন হাসিমুখে মাথা নাড়ল, ভাবল, মদ, স্ত্রীলোক, গ্যাজেট প্রভৃতিতে আগ্রহ, ঠিক তাই না হয়ে বাধ্যতামূলকতাও হতে পারে। এর একটা সুন্দর · াম দিয়েছি আমরা, নেসেসিটি। এই নেসেসিটি সংগ্রহ করাব জন্যই জীবনটা ব্যয় হয়, যে জীবনটার জন্যই নেসেসিটি। থরোর মতো চোখ থাকলে দেখা যায়, জীবনমশায় সেই গুবরেপোকার মতো তার শরীরের দশগুণ বড়ো মাটির গুলিটাকে পিছনের দুপায়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো খেলিয়ে যাচ্ছে, কখনই কাযদায় আসছে না, সব সময়েই গেল-গেল ; জীবনের জন্যই, তার আবামের জন্যই, কিন্তু জীবনে কখনো সেই ব্যালান্স রাখার কলাকৌশল বন্ধ হল না। হঠাৎ রাজেন হেসে ফেলল কথাটা কমপালসিবনেস, বাধ্যতামূলকত্ব। টেকনোক্র্যাটদের ক্ষেত্রে মাটিব গুলিটা দুদশ মণ ওজনের হবে।

সে নিচু হয়ে নতুন আসা খবরের কাগজটা তুলে নিল। খুব বড় না হলেও মাঝারি ঢাউস। কাগজটা মেলল সে চোখের সামনে। এটা দুপুরের কাগজ। রাইটার্স কো-অপারেটিবের মুখপত্র। নিতেই হয়, বিশেষ করে মির্জা গালিব এভেন্যুতে, কারণ এটা শিল্পী-সাহিত্যিক-অভিনেত্রীদের পত্রী। অন্য কাগজ সদর দরজায় থাকে ব্লকেব। তুমি কুড়িয়ে নেবে তার অপেক্ষায়। এটা কিন্তু সিঁড়ি, এলিভেটর, লিফটের সাহায্যে উপরে আসে, দরজা বন্ধ থাকলে দরজার ফাঁক গলিয়ে ভিতরে ঢোকে। কারণ লেখকরা, শিল্পীরা তোমাকে তাদের মত জানাবে, জানাবে, জানাবে। অবশ্য সব কাগজই এক দিক দিয়ে কম্পালসিব। পারো, সকালে উঠে তোমার প্রিয় সম্পাদকের মুখ না দেখে থাকতে? সে আগের দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে কোনটাকে প্রধান মনে করল, যার সম্বন্ধে কী তার মত তাকে

নিজের বুকের মধ্যে ভরে নাও না? যদিও বলো, তুমি সে কাগজ বেছে নিয়েছো। এটা অবশ্য নতুন ধরনের কম্পালসিব, কারণ এ দরজার ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকে। এবং তোমার দলের। দলবদ্ধতা কম্পালসিব।

এটার একটা অন্যদিকও আছে। অন্তত একটা আলাপের বিষয় যোগায় তো বটে। মাধবী বলল, কী এমন সংবাদ? বাব বার বলা হলেও আবার বলতে হবে, কথাটাকে সে ছুঁড়ে দিল, যা থেকে আন্দাজ হয় সে হয়তো লিঙ্গুইস্টিক এবং অরেটরির স্কুলে পড়েছে।

এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীর খবব দেখুন। বাজেন বলল।

বা, তাই তো! কোন ছবিটা প্রথম হয়েছে? মাধবী বলল।

দাঁড়ান দেখছি। হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি।

টেবলের উপবে কাগজটা বিছিযে সংবাদটাকে খুঁজে বার করল, তার তলে আঙুল রাখল রাজেন। নিজেও বলল, এ রকম আন্দাজ কবা যায়। ২৭ নং ছবি, লাল ঘোড়া, সাতশো তেইশ পয়েন্ট।

কত পয়েন্ট পেয়েছে? সাতশো তেইশ। এর আগের বাব যে প্রথম হযেছিল? মাধবীর কৌতূহল গোপন বইল না।

সাতশো. এক দেখছি। বাজেন বলল। এক নিমেযে কলমটার শেষ পর্যন্ত পড়ে নিযে সে কাগজটাকে মাধবীব দিকে এগিয়ে দিল।

মাধবী বলল, আমরা কি লালঘোড়া দেখেছিলাম?

খুবই সম্ভব, যদি গিযে থাকেন নিওব্যাবোক প্রদর্শনীতে। চার নম্বর ঘবেই ছিল বোধ হয়। সেই যে আঠারো ফিট বাই তেইশ ফিট ক্যানভাসে তেল বং।

মনে পড়ছে না। খুব লাল কিছু একটা ছিল।

রাজেন মাধবীর স্মৃতিকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করল, সেই সবুজ রঙের জলে দু একটা ছোট ঘোডাব ব্যাকগ্রাউণ্ডে আট-ন ফিট উঁচু ইঁটরঙের ঘোড়ার ছবি।

ও, আচ্ছা। মাধবী এবাব যেন মনে করতে পারল। কিন্তু সোজা নয় সাতশো তেইশ পয়েন্ট পাওযা।

মাধবী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। আব একটু আয়েস কবাব জন্য টেবলেব উপরে স্লিপার সমেত পা তুলে দিল। সেমিজের আলগা ঘের সবে এসে তাব সিনেমা প্রশংসিত উরুব মাঝামাঝি অবস্থান করল।

হঠাৎ সে আদুরে সুরে বলল, বাজেনবাবু, ছবিটা কি সত্যি ভাল ছিল না?

সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে তার গোড়াটা তর্জনী মধ্যমা আর বৃদ্ধের মধ্যে গড়াতে গড়াতে রাজেন ভাবল, এই আদুরে সুরটা নেহাৎ অভ্যাস যা সিনেমার ভয়েস রেকর্ডিংএ লাগে, আর মাধবী হয়তো তা কাটিয়ে উঠতে চায়।

সে বলল, সাতশ তেইশটি দর্শকের প্রথম প্রেফারেন্স পাওয়া সহজ কথা নয়। খুব বড়, দেয়ালজোড়া, অন্য সব কিছুকে আড়াল করা আর সব চাইতে উজ্জ্বল রং অর্থাৎ লাল ছিল না ঘোড়াটা?

তা হলে আপনিও কি প্রথম প্রেফারেন্স ভোট দিয়েছিলেন?

এখন হয়েছে কী, ছবি সম্বন্ধে রাজেন কিছু ভেবেছে, একাধিকবার সে প্রদর্শনীতে গিয়েছে, তারপর হঠাৎ প্রবীরের সঙ্গে একমত হয়েছে, এবং উপরন্তু ভাবছে ছবিটাকে কেন্দ্র করে এবারকার প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভূদেব সমাদ্দারের সিণ্ডিকেট ফিচার লিখবে। তাও যদি না হয় নিজের ভাইটানুবা পত্রিকায় তো বটেই। এ অবস্থায় নিজের মতামতকে যেখানে বলে লাভ নেই সেখানেও প্রকাশ

করে ফেলে অনেকেই। সে বলল, তা, হ্যাঁ, আপনি কী বলেন? আবও ছবি ছিল সেখানে, তাই না? যাদের রং হয়তো উজ্জ্বল লাল নয়, আর ঘোড়ার মতো সহজ শক্তির প্রতীক যাতে আঁকে নি চিত্রকর। কিন্তু আমরা কি এখন বেরুবো!

ছবির কথাটা শেষ হোক। তাবপবে লাঞ্চের জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করবো।

বরং পোশাক পবে আসুন, পথে যেতে যেতে আমরা ছবি নিয়ে আলোচনা করবো।

পোশাক কথাটা কি মাধবীর মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করল? একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত হল তার, যাকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পারলে এই বকম এক অনুভূতি হয়, ও আচ্ছা, পুরুষ কিনা, তাই অভিভাবকের মতো ভঙ্গি। কিন্তু অনুভূতিটা খুব স্বচ্ছ হল না তার মনে। এবং চট করে পা নামাল না সে। বলল হেসে বরং, একটা বাজে না কেন? বরং আরম্ভ করুন, অন্তত বলুন কোন ছবিটা।

রাজেন ভাবল, আশ্চর্য, কী করা যায় এমন একজনকে নিয়ে। সে বলল পঁচাশি, ছিয়াশি, সাতাশি এসব নম্বরের ছবিগুলো দেখেছিলেন।

সেদিকে একটা ক্রসের ছবি ছিল? মাধবী বলল।

তা হলে দেখুন, আপনারও মনে থাকার মতো মনে হয়েছিল ছবিটাকে। চুরাশি নম্বরটা আর একবার ভেবে দেখুন।

তত ভালো মনে পড়ছে না। সেটাই সব চাইতে ভালো?

এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। হয়তো সেটা সাতশো তেইশ পাওয়া দূরের কথা পাঁচশো পয়েন্টও পায় নি। (খোঁজ নিতে হবে কত পয়েন্ট, ভাবল রাজেন—এটা কি কৌতূহলের বিষয় নয় যে জনতা তার নিজের পছন্দ থেকে কত পয়েন্ট দূরে?) কিন্তু ওটাকেই আমার ভালো মনে হয়েছে।

মাধবী হেসে বলল, আচ্ছা, তা হলে উঠি এবং পোশাক বদলাই। সে পা নামাল, উঠল চেয়ার থেকে, বলল, পুরুষের কথা মানা উচিত।

সে কী?

মাধবী ভুবন ভোলানো হাসি হেসে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল পোশাক ছাড়তে।

রাজেন ভাবল, মাধবী কি নিছক সময় কাটানোর জন্যেই ডেকেছিল, কিংবা নাটকের আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ করে সুন্দরীরা, পোশাক পরতে অনেকটা সময় নিয়ে থাকে। রাজেন খবরের কাগজটাকেই আবার টেনে নিল। হ্যাঁ, অনেক সংবাদ থাকে, নাটক, কবিতা, উপন্যাস সম্বন্ধে রাইটার্স কো-অপারেটিবের মতামত। সে এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীর উপর লেখা প্রবন্ধটাতেই চোখ রাখল আবার। এটা থেকেই লালঘোড়ার সাতশো তেইশ পয়েন্ট পাওয়ার সংবাদ পেয়েছে। সব সময় মন অলিখিত শাসন মানে না। হঠাৎ রাজেনের মন যেজন্য চুরাশি নম্বর ছবিতে চলে গেল, যেটা এখন প্রবীর সাণ্ডেলের ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হয়েছে। রাজেন হঠাৎ যেন দেখতে পেল। লিখতে লিখতে যেমন কখনও কখনও সে নিজের ঘরে একা একা হেসে ওঠে, এখন যেন আবিষ্কারটাকে সে শিষ দিয়ে অভিনন্দিত করবে। ঠোঁট গোল হল শিষের জন্য কিন্তু মনে পড়ল এটা অন্য ঘর, তার বইঠাসা ঘরের ম্যাটমেটে আলো নয়। আবিষ্কারই বলতে হবে। সে স্থির করল, কাল পরশু একদিন প্রবীর সাণ্ডেলের বাড়িতে ছবিটাকে দেখতে যাবে। প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করবে সে দেখেছে কি না, যদি প্রবীর নাও দেখে থাকে তবে সে তার সন্দেহের কথা বলবে। কারণ এখন তার অন্তত অস্পষ্টভাবে হলেও মনে হচ্ছে ছবিটায় দু-একটি পোর্ট্রেট আছে, যেমন রেনেশাঁ ও ব্যারোকে থাকত অনেক সময়ে। তা হলে? নাকি, গর্ভিনী সেই ক্রিওল রমণী যে সেই মহিলাটি, যার নাম মিত্রা, তার পোর্ট্রেট এমন বলার আগে আ। একবার তাঁকে দেখা উচিত, এবং চিত্রকর শান্তনুর নিজের মুখের আদরা

আছে ক্রসে যে গাছ তার অর্বুদের মতো গাঁটটায়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই তো ক্রসে বিদ্ধ মুখ, ক্রাইস্টের চিত্র তো আলোয় এবং রংয়ের আঁকা নুয়ে পড়া এক বিষণ্ণ স্নিগ্ধতা।

রাজেনের চিন্তাটা তাকে তুলে দিল। সে হাসিমুখে পায়চারি করে এল ঘরের একদিক থেকে অন্য দিক।

ওদিকে তখন প্রসাধন করছে মাধবী। মাধবী সুন্দরী এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু সিনেমা-চিত্র-আমোদীর প্রশংসার বিষয়। কিন্তু পাশের ঘরে রাজেন এবং তার চোখে ন্যুড এবং নেকেডে পার্থক্য জীবন্তে ও মৃতে পার্থক্যের সমান। সুতবাং বর্ণনাকে সংযত করাই আবহাওয়ার সঙ্গে মেলে।

মাধবী নিজেও বরং চোখ নামাল আয়না থেকে এবং ভাবল, জানি, জানি, খুব লোভনীয়, কিন্তু তাই বলে কি প্রবীর সাণ্ডেলকে গিয়ে বলা যায় আর একটা নাটক লিখুন আপনি, আমি আর একবার নায়িকা হয়ে অভিনয় করবো।

না, প্রবীর সাণ্ডেলের কাছে যাওয়া যায় না, (কানের ক্যাটস-আই দুলদুটিকে খুলে কালচে নীল স্টিলের চাকতি পরল সে।) তা যাওযা যায় না, যদিও প্রবীরও নাট্যকার হিসাবে ফ্লপ করেছে, সে যেমন অভিনেত্রী হিসাবে। ভয় কবে না তার মুখের দিকে চাইতে? সাহিত্য সম্বন্ধে রাজেনকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে কি? তাহলে হয়তো জানা যাবে প্রবীর ফ্লপ করেও কেন টানতে পারে। রাজেন বরং এমন যে সঙ্কোচ থাকে না। রাজেন অবশ্যই খুব সাধারণ নয়, কিন্তু তাব বেশি কি সে পেতে পারে এখন যদি না সে সিনেমায় ফিরে যায় পীযূষের ডাক আসা মাত্র। রাজেন এক রকমের পুরুষও বটে।

রাজেন বলল, লাঞ্চ প্যাকেট কিনে নিয়ে আমরা অন্য এক জগতে যেতে পারি। বরানগরের দিকে হিপি পল্লীতে। সেখানে আমরা যাওয়াব কথাও আছে।

আমাদের কলকেতায় এখন চিত্রপ্রদর্শনীর মরশুম শুরু হয়েছে। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে চিত্রী-সমবায়ের সেই বিরাট বাৎসরিক সমাজ-সচেতন চিত্রপ্রদর্শনী যার অন্য নাম স্টেট গ্রাফিক একজিবিশন শুরু হয়েছে যার দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী অলীক মুখোপাধ্যায় এবং যার ছবিগুলি নিঃশেষে বিক্রীত হয়ে পার্টি-সদস্য, পার্টি-সহানুভব ভদ্র ব্যক্তিদের শোবার ঘর, বসার ঘর এমন কি রান্নার খোপগুলির দেয়াল ভরে ফেলবে। কারখানার চিমনির কালো, ব্লাস্টফার্নেসের আগুনে রং, নীল রঙের কনভেয়র বেল্টের পাশে পাশে তাদেরই অঙ্গ হিসাবে বলিষ্ঠ পেশীবহুল পুরুষ যাদের চোখ ভবিষ্যতের দিগন্তে; সমান বলিষ্ঠা, উন্নতবক্ষা, পৃথুল নিতম্বিনী নারী যাদের চোখ দীপ্তিমান; জন-সমাজের সার্থক অগ্রগতি যে ছবিগুলি সমাজ-সচেতন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এবার কলকেতা থেকে বাইরে যাওয়ার পালা শুরু হবে। যেমন সেই সেকালে পুজোর সময়ে হতো। তাই বলে এটাকে সেকেলে ব্যাপার মনে করা যুক্তির হবে না। বরং উল্টো। হাওড়ায় এ সময়ে প্রতিদিন পাঁচখানা স্পেশাল ছাড়ে। 'এ' স্পেশাল, 'বি' স্পেশাল করে 'ই' স্পেশাল পর্যন্ত। বলা বাহুল্য খরচ পৃথক, কিন্তু তাই বলে সেকেলে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদি নয়। (বস্তুত শ্রেণী ক্লাস প্রভৃতি শব্দ লোপ পেয়েছে এবং তা চিরকালের জন্য এবং এই ফাইভ স্টার হোটেল থেকে ওয়ান স্টার হোটেল, 'এ' স্পেশ্যাল থেকে 'ই' স্পেশ্যালের মধ্যে শ্রেণীহীনতাই বিরাজ করছে বলা যায়।)

কোথায় যাবে এরা এই এত গৌড়জন? উত্তরে এই বলা যায় কুলু, কাশ্মীর, কাংড়া, কন্যাকুমারী, কাঞ্জিপুরম এইভাবে 'ক' দিয়ে সুরু করে 'ছ' পর্যন্ত আসতে ট্র্যাভেলার্স গাইড বইটাতে দুশো পৃষ্ঠা লেগেছে। রূপসী পাঠিকা, ট্র্যাভেলার্স গাইডকে যদি আপনি যথেষ্ট মনে না করেন তবে রাজস্থান

পর্ব কেরল পর্ব বলে বত্রিশ পর্বের যে আকর পুঁথি আছে (যাকে নাকি রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়া হয়েছিল এবং যার লেখক এক রেলকর্মচারী বলে শুনেছি, এবং যা নাকি কারো কারো মতে রেলওয়ে বোর্ড-এর আরও-ভ্রমণ-করুন দপ্তরই লিখিয়েছিল) তাও পড়ে নিতে পাবেন।

এখানে কিন্তু একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা দরকার। কতগুলো শহর আছে যার নামের আগে ছোট ছোট তারা আঁকা। দেখে মনে হবে এগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য। কিন্তু এগুলিকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। প্রকৃতপক্ষে এই শহরগুলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট। স্টেট সাইকাইআট্রিস্টদের মতে যেসব সিটিজেনের মধ্যে সর্বভাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এসব শহরগুলি তাদের জন্য নির্দিষ্ট। আপনার আমার যেতে নিষেধ নেই কিন্তু স্টেট সাইকাইআট্রিস্টরা এইসব সিটিজেনকে ঠিক সুস্থ বিবেচনাও করে না।

পরামর্শ চাইলে আমি আপনাকে তিনখানি ভারতীয় ড্রিম বোটের (স্বপ্ন নৌকা বলা হবে?) যে কোন একখানাকে বেছে নিতে বলবো। জল-ইন্দ্রাণী কলকেতা থেকে ছেড়ে ফিলিপাইনস পর্যন্ত যায়, জল-শিবানী মাদ্রাজ থেকে ছেড়ে ক্যারেবিয়ান উপসাগরে আর জল-ব্রহ্মাণী বম্বে থেকে ছেড়ে কৃষ্ণ উপসাগরে, আপনার খুশিমত বেছে নিন। ধাবগামী, আলোকমালায় সজ্জিত, সুইমিং পুল, ক্যাবারে, নাইট ক্লাব সমন্বিত এই সব জাহাজ তো প্রমোদভ্রমণ এবং স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্যই।

কিন্তু তা হলে লোকে কুলু, কাশ্মীর, কাংড়ায় যায় কেন? একে কি নস্ট্যালজিয়া বলবেন? অক্টোবর থেকে তো এই সব পাহাড়ে শীত নামবে। প্রকৃতপক্ষে এই শীত, তুষার, বরফ এটাই কাম্য। যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পাবেন, এরা সকলেই ক্রিস্টমাস সিজনটা এই সব তুষারশীতলতার রাজ্যে কাটিয়ে আসে। এবং ঠিক তখনই, ক্রিস্টমাস-সিজনেই এই সব উপত্যকার শৈলনিবাসে ভিড় হয়ে থাকে। কেনই বা না হবে? তখন কি এই সব শহরে তুষারপাত হয় না, এবং এসব শহরের ক্রিস্টমাস একেবারে ইউরোপের কোন কোন ক্রিস্টমাস উৎসবের আবহাওয়াকে ফিরিয়ে আনে না? এখন তো ইউরোপীয়ানরা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু তাই বলে তাদের যা ভালো তা কি গ্রহণ করা হবে না? তাদের ধর্ম অর্থাৎ ক্রাইস্টের জন্মদিনের উৎসব? দূর করো। ক্রাইস্ট ইউরোপকে যা দিয়েছেন তা তো রক্তপাত। কোন ইউরোপীয় এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দিয়েছে? কিংবা রক্তপাতকে যদি বিপ্লবের অঙ্গ মনে করো, বল আফিম। কিন্তু উৎসবটা সংস্কৃতির ব্যাপার।

আয়, সব ব্যাপারটার অর্থাৎ এই ভ্রমণপ্রিয়তার মূলে অবশ্যই ইকোনমিক্স। সোজা কথায় ট্যাক্স আদায়। আমরা ট্যাক্স না দিতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রপরিচালিত যান-বাহনে হোটেলে যা খরচ করি তাতে না কি কালোটাকার কিছু অংশ রাষ্ট্রের ভাঁড়ারে ফিরে সাদা হয়।

এবারের নভেম্বরে, সুতরাং, মিত্রা যে কুলু উপত্যকায় গিয়েছে সেটা অস্বাভাবিক নয়, কষ্টকল্পনাও নয়।

কিন্তু তার আগে রাজেন ও মাধবী যে হিপি কলোনীতে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

আমরা লক্ষ্য করেছিলাম আর্ট থিয়েটারের ব্যর্থতা মাধবীর মনে তার মায়ের মৃত্যুর কথা ফিরিয়ে এনেছিল। এবং আলিবাবা মার্কা মারিউআনা সিগারেট তাকে শান্তি দিচ্ছিল না, যার ফলে রাজেনকে সে ডেকে এনেছে। না, না, আর্থিক অভাব নয়, অস্বাচ্ছন্দ্যও নয়। ফাস্ট লাইফের লাঞ্চ-ডিনার সমন্বিত সেই সব মেলামেশার পক্ষে কোন অযোগ্যতাও নয়। ব্যর্থতা ও মৃত্যুর উপর দিয়ে সে হাল্কাভাবে ভেসে যেতে চেষ্টা করলেও তার উষ্ণ সুকোমল বুক ও পেটের নিচেই যেন এক অতল অন্তহীন কালো। বলো, বলো, বলো জীবনে কি কিছু বিশ্বাসযোগ্য, কিছু যুক্তিসঙ্গত? জীবনটাই বা কী? এপারে ওপারে অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালো শূন্যতা নয়? মহাশূন্যে তো

মনুষ্যবাহিত যান যাচ্ছে (খবরের কাগজই প্রমাণ) কিন্তু জীবনের দু প্রান্তে যে শূন্যতা, সেখানে?

ব্লকের নিচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষা করতে করতে মাধবী রাজেনের কাঁধে হাত রাখল। সেকালে এবকম ভঙ্গিতে কে কী মনে কবতো তা বলে লাভ নেই। রাজেন ভাবল : এই সব অভিনেত্রীদের বোধ হয় এমন সব ভঙ্গি দ্বিতীয়-স্বভাবে পরিণত হয়। মাধবীর অন্য হাতে সিগারেট ধরা। রাজেন আপন মনে হাসল। একবার চোরা চোখে যেন মাধবীর মুখ দেখল। ট্যাক্সি পেতে দুচার মিনিট দেবি হচ্ছিল।

মাধবী রাজেনেব হাসিটাকে লক্ষ্য করল এবার।

বলল, হাসছো যে?

আচ্ছা, আচ্ছা, মিসেস ঘোষাল। এই সিগারেটগুলো কি নতুন? আপনার চোখ একটু লাল দেখাচ্ছে।

খুব খারাপ লাগছে দেখতে?

তখনই ট্যাক্সি এল।

পাশাপাশি বসে সিগারেটটা ফেলে দিল মাধবী। রাজেন লক্ষ্য না করার ভান করল। দুএক মিনিট নিজেব এই কাজটাকে অনুভব করল মাধবী। ডাজ এনিথিং রিঅ্যালি ম্যাটাব? কোন কিছুতেই কি এসে যায়? যেমন সে বাধ্য হল রাজেনের। অভিনয নয় তো? সে কি তা হলে রাজেনকে ধরে ধবে চলতে চাইছে? এটা তা হলে সেই পুরনো ব্যাপার হবে, লতাগুলি কোন-না-কোন গাছকে জড়িয়ে ধরে ওঠে।

রাজেন তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুঁথিতে ড্রাগ, অর্থাৎ গাঁজা, ভাং, এল-এস-ডি ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহারে মনের এবং শরীরের উপরে (শেষেবটা কিছু পরিমাণে, কেননা বিষয়টা এক্সপরিমেন্টাল সাইকোলজি, ডাক্তারি নয়) কী প্রভাব হয তা জেনেছে ; এবং এসব ব্যবহাবের ফলে এবং ব্যবহার না করেও মনের অবস্থা কখনও কোন কোন অবস্থায় একই রকম হয় কি না—সে বিষয়ে প্রবন্ধও লিখতে হয়েছে তাকে। সুতরাং সে নির্বাক রইল। কিংবা মাধবী মারিউআনা সিগারেট ফেলে দেয়াতে সে কি স্বস্তি বোধ করল?

মাধবী বলল, জানেন, আপনাকে আমি ভয় পাই।

কেন?

আমার ধারণা হয় আমার কিছু গোপন থাকে না। মনের ভেতরটা দেখতে পান।

আপনাকে তা হলে অভয় দিই। দর্শন পড়লে এরকম শক্তি জন্মায় না।

রাজেন মাধবীকে আবার দেখল। না, স্বাস্থ্যের কিছু ইতর-বিশেষ হয় নি। একটু কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে? এটা হয়তো সাময়িক। এক গোছা পাকানো চুলের রিং বাঁ গাল ঘেঁষে বুক ছুঁয়ে আছে। সিঁথিটা কিছু অবিন্যস্ত। চোখের প্রান্তগুলি লাল। চোখের কোলে নীল কোমল কালিমা। টেলিফোনে ডাকাব সময়ে যে চঞ্চলতা ছিল, তা কি এই চেহারার মধ্যে কোথাও আছে?

রাজেন বলল, আমার এই ব্র্যাণ্ডের একটা সিগারেট খাবেন?

এখন নয়। পরে। মাধবী বলল, প্রকৃতপক্ষে দর্শন শব্দটাকে জানি। দুচার জন দার্শনিকের নাম জানি। কিন্তু তার চাইতে বেশি কিছু জানি না।

একজন অভিনেত্রীর আছে তা কেউ দাবি করে না, যেমন একজন ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ারের কাছেও নয়। তা ছাড়া এখন আমরা একটা দলছাড়া লাঞ্চের আশায় চলেছি। একটু হালকা, কিছুটা বেহিসাবী ব্যাপার।

রাজেন ভাবল, টেলিফোনে যে স্বর তা কি অভিনয-কুশলতা অথবা মারিউআনার ফলে হার্টে কিংবা নার্ভে কোথাও শক লেগেছিল? হয়তো নতুন ইচ্ছে এই অভ্যাসটা।

মাধবী বলল, একদিন, আপনার সময় হলে, মৃত্যু এবং জীবন সম্বন্ধে আপনার কাছে শুনবো।

তা বেশ একটা আলাপের বিষয় হতে পারে। কিন্তু আপাতত ওই হোটেলটাকে দেখুন. ওখানে লাঞ্চপ্যাকেট সংগ্রহ করা যায়।

এখুনি নিলে তা কি খাওযার মতো থাকবে একটা দুটো পর্যন্ত? হিপি পাড়ার কাছে কি হোটেল নেই? কিংবা চলো এখানেই। তোমাব হযতো কষ্ট হবে।

কাশীপুর ব্রিজেব কাছাকাছি টুস্টার (বি) হোটেলে ট্যাক্সি ভেড়াল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল লাঞ্চপ্যাকেট এগাবোটাব আগে হবে না। আধ ঘন্টা দেবি আছে। মাধবী বলল. ট্যাক্সি বিদায় হোক। বরং একটা বিয়ার খেয়ে নেয়া যাক। হোটেলের যেখানে লাঞ্চপ্যাকেট বিক্রি হয় তাব বাঁদিকের দবজা।দযে যে বারে যেতে হয় তা তীরচিহ্নই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

বিয়ার নিযে একটা খালি টেবিল দখল করল তাবা। রাজেনের একবার মনে হল মারিউআনার সঙ্গে বিয়ার মিশে বিভ্রাট ঘটায় না তো! কিন্তু সে বাস্তবজ্ঞানে হিসাব করল, মিসেস ঘোযাল হিসাবে মাধবী ককটেইল পার্টিতে অভ্যস্ত এবং সেখানে বেএক্তিয়ার হলে চলে না।

মাধবী বলল, আপনি কিছু ভাবছেন। ঠোটে হাসি দেখছি।

ঠিক তখনই রাজেনের মনে পড়ল গত সপ্তাহে পড়া প্রবীর সাণ্ডেলেব লেখা আবসাঁৎ নামে প্রবন্ধটি। চিত্রপ্রদর্শনী থেকে ঘুবে গিয়েই সে খোজখবর নিয়ে লেখাগুলোকে খুঁজে পায। সুইফটের জন্মতিথি পালনের নাম করে যে প্রস্তাব সে করেছিল. অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ নবনারীর একান্নতম জন্মদিনে প্রচুব বারবিট্যুবেটস খেয়ে ফুল, রেডিও-সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার- সেটা নাকি প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রবীরেব ক্যাথলিক গোঁড়ামির প্রমাণ, সে কিছুতেই গর্ভপাতের উদার আইনটাকে নরহত্যা ছাড়া আর কিছু মনে করে নি। এব ফলে সে আবসাঁৎ নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিল। তিনখণ্ডে বিভক্ত এই প্রবন্ধ পড়ে ডিকুইন্সির ইংলিশ মেইলকোচ নামে লেখাটাব সঙ্গে কারো কারো তুলনা করতে ইচ্ছা হযেছিল। কাবণ ভাষাব এই কারুকাজ যা কখনও কখনও সবুজ পাথবেব মতো উজ্জ্বল, কখনও বমণীর সবুজ চোখের মতো তরল-আলোক, কখনও সবুজ ভাইপারের সুন্দর উদ্যত ফণা পরন্তু কখনই আবসাঁতেব সবুজ রংকে ভুলতে দেয় না, আঃ কোথায় পাবে? সেই প্রবন্ধে বলেছিল প্রবীব, বার্বিট্যুরেটস পঞ্চাশে পৌছনো গান্ধীবাদীদের জন্য ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু আবসাঁৎ, আমাকে বলতে দাও, সকলের। কি করে সেই আবসাঁৎ ধীরে ধীবে পরিপূর্ণ নার্ভস-প্যারালিসিস নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত লোকসংখ্যা কমানোর সুন্দব অনিবার্য ব্যবস্থা হয কি না আবসাঁৎ, এই প্রশ্ন পাঠকের মনে তুলেই মুচকি হেসে সে সরে গিয়েছে।

ভাবতে আব কতটুকু সময় লাগে? কিন্তু ভাবনা মধুর হলে চোখে ছাযা পড়ে।

মাধবী বলল, কী এমন ভাবছো?

বিয়ার গ্লাসের উপরে হাত রেখে রাজেন বলল, আবসাঁতের সব চাইতে বড় আমদানিকারকেবা একবার প্রবীর সাণ্ডেলের নামে ক্ষতিপূরণেব মামলা করতে চেয়েছিল, কারণ তার এক প্রবন্ধ নাকি আবসাঁতকে সবুজ ভাইপারের বিষ এই প্রমাণ করে হঠাৎ আবসাঁতের দাম কমিয়ে দিয়েছিল। মৃত্যু ভয়ই। কিন্তু আপনার ওই কার্লটা যা গাল ছুঁয়ে বুকে নেমেছে ওটার দাম হাজার গিনি ; নিরঞ্জন কী বলতেন?

মৃত্যুভয় বলছো? কিন্তু আবসাঁৎ ছাড়া ককটেইল আমি ভাবতে পারি না। তোমাকে এখন থেকে আমি তুমি বলবো। ছাত্র ছাত্রীদের মতো তুই বলতে পারবো না। আমার চোখে কী দেখছো?

রাজেন ভাবল, পলকের জন্য মারিউআনাই কি চোখ লাল করে? সে বলল, তাতে আমার আপত্তি নেই। বলছিলাম, নিরঞ্জন ঘোষাল এই কার্লের দাম হাজার গিনি স্থির করতেন কি না?

মাধবী বলল, রমণীর অতীত জীবনের কথা বর্তমান সঙ্গী যদি তোলে তবে বুঝতে হবে অতীত পুরুষ সম্বন্ধে তার কিছু হিংসা আছে।

মাধবী নিজের মনে খুঁজল নিরঞ্জন কখনো তার চুলের প্রশংসা করেছিল কি না। কারো এক বিষয়ে ঝোঁক থাকে, কারো অন্য বিষয়ে। যেমন তার প্রথম নাটক দলের সেই কোচ। কপালে লাল ফোঁটা দিয়ে তার সামনে দাঁড়ালে তাকে দিয়ে পোশাকের সুটকেস বইয়ে নেয়া যেতো, যেমন মধ্যবিত্ত স্বামীরা কবে। রাজেন, দেখা যাচ্ছে, খোপা ভাঙা চুলের ভারে কবিতা লিখতে পারে। কিন্তু নিরঞ্জন? ও, হ্যাঁ, একথা বলা যায়, যদি প্রথম দেখাকে মূল্য দিতে হয়, নিবঞ্জন তাকে কিশোবের পোশাকে দেখতে সব চাইতে ভালোবাসতো। নিরঞ্জনদের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিস্টদের ক্লাবে সে গেস্ট-আর্টিস্ট হিসাবে অভিনয় করতে গিয়েছিল। সঙ্গে তাব সেই প্রথম নাটকদলের কোচ। এবং যথাবীতি সে মাধবীকে গরদের শাড়ি, লাল টিপ পরিয়ে নিযে গিয়েছিল। নাটকটা ছিল শেক্সপীয়াবের। তাকে বোজালিণ্ড গ্যানিমিড সাজতে হয়েছিল। উন্নাসিক ছিল নিরঞ্জন। ইকোনমিক্সেব পণ্ডিত, প্ল্যানিং-এর সুপার-গাণিতিক যেমন হতে পাবে। কিন্তু (মাধবী বিযাব গ্লাস ঠোঁটেব কাছে দুহাতে তুলে তার কানাব উপর দিযে হাসছে যেন।) যখন সে গ্যানিমিড সেজে অভিনয় শুরু করেছে, অর্থাৎ পরণে টাইট প্যান্ট, সাদা শার্ট এবং মাথায় চওড়া-ব্রিমেব টুপি যাতে একটা ফুল গোঁজা ছিল, নিরঞ্জনেব মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এবং ভেবে দেখতে গেলে হনিমুনে প্রায গ্যানিমিডেব পোশাকই পরতো মাধবী। চওড়া ব্রিমের টুপি গ্যানিমিডের একটা ছিল, মাধবীর প্যান্ট সার্টের সঙ্গে মিলিয়ে বেশ কয়েকটি, আর তাতে পালকের নানা মাপের ডিজাইনগুলিও বিভিন্ন ছিল। অনেক সময়, হ্যাঁ, প্রায় বেশির ভাগ সময়েই এই ছদ্মবেশটাই, অর্থাৎ পুরুষের সাজ, পছন্দ হতো নিরঞ্জনের। শর্টস, স্পোর্ট সু,টি শার্ট আর মেক্সিকান সমব্রেবো টুপি পবে ঘোড়দৌড় দেখতে যাওয়ার কথা ভাবো, যখন প্রথম নিরঞ্জন প্রস্তাব করছিল, একটি সন্তানের।

মাধবী মাথা ঝাঁকাল। বিয়ার গ্লাসটাকে নামাল টেবলে। বলল, জানো, বাজেন, আমি একবার শেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করেছি।

রাজেন বলল, দি আইডিয়া। ঠিক ধরিয়ে দিয়েছো। ক্ল্যাসিকে ওরা শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট অভিনয় করার কথা ভাবছে। যদি ওরা ওফেলিয়ার পার্ট দেয় তোমাকে, প্রত্যাখ্যান করো না।

ওফেলিয়াব কি হাজার গিনিব কার্ল ছিল?

রাজেন হেসে বলল, খুব ধরেছো। আমি ও কার্লটাকে কোথায় বসাই, কোথায় দেখেছি ভাবছিলাম। এমন সময়ে শেক্সপীয়ার মনে এনে দিলে তুমি। আমার মনে হচ্ছে কার্লের এই উদাস সৌন্দর্য ওফেলিয়াকে মানায়।

বেশ কথা তো। এই তো তুমিও আর্পনি ছেড়েছো। বলো তো, আমি কেন শেক্সপীয়ারকে ভাবছিলুম।

রাজেন একটুখানি দ্বিধা করল। শেক্সপীয়ার যেন সব চাইতে সহিষ্ণু। এমন কি বসবাব ঘরেও পাশাপাশি সোফায় বসে শেক্সপীয়ার অভিনয় করা যায় মঞ্চ ও আলোকসম্পাত ছাড়াই। মাধবী যে অভিনেত্রী হিসাবে সিনেমায় সার্থক ও আর্ট থিয়েটারে ব্যর্থ, এটাই কি তার শেক্সপীয়ার মনে এনেছে? না, না, এটাকে, এই সমস্যাকে এখন আলাপের বিষয় করা যায় না।

রাজেন বলল, এই বিয়ার কাপ, কিংবা এই ঘরের সাজসজ্জা, কিংবা, কিংবা নিরঞ্জন ঘোষালের কথা, তার কথা তো আমরা তোমার এই খোপা ভাঙা চুলের কথায় এনেছিলাম, এ সব কিছু থেকে তোমার মনে সেই আভনের কবির কথা এনে থাকবে। কিংবা আরও দূরের কিছু যা আমাদের এই আলাপে নেই কিন্তু তোমার মনে আছে।

মাধবী বলল, আচ্ছা, তুমি শেক্সপীয়ারের সনেটগুলো পড়েছো নিশ্চয়।

তুমি কি সেই পুরনো ব্যাপারে আগ্রহী? আজকাল আর সনেট লেখা হয় না।

কেন?

শেষ হিসাবে, সনেটে যে মন্ময়তা তা বোধ হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। শেক্সপীয়ার তার প্রেমের অনুভূতিতে যেভাবে ব্যস্ত ছিলেন আমরা বোধ হয় তা হই না।

মাধবী বলল, সে হাসল, অতীত পুরুষের কথা বলছি, কিছু মনে করো না। ও কি, তোমার গ্লাস খালি! বিয়ারটা কিন্তু ভালোই। আর একটা টিন দিতে বলো। দেখো লাঞ্চপ্যাকেট হতে এখনও দেরি আছে। দ্বিতীয়বার তাগাদা দিতে লজ্জা করবে।

ওয়েটারকে ডেকে আর এক টিন সিকিমি বিয়ার দিতে বলল রাজেন।

মাধবী বলল, নিরঞ্জন ঘোষাল বলতো শেক্সপীয়ারের সনেটগুলোর উদ্দিষ্ট পুরুষটি কোন লর্ড নয়। তার থিয়েটারে যে ছেলেটি রোজালিণ্ড, অলিভিয়া এমন সব মেয়েচরিত্র অভিনয় করতো, সেই!

রাজেন বলল, এটা বোধ হয় একটা গল্প যা অস্কার ওয়াইল্ড লিখেছিল। কিন্তু হলই বা সেই ছোকরা অভিনেতা, তাতে কী?

মাধবী বিয়ার ঢেলে দিতে সময় নিল।

মাধবী বলল, যদি গল্পও হয়, একজন পুরুষ আর একজন পুরুষের তেমন তীব্র প্রেমের উদ্দেশ্য হতে পাবে, এটা তা হলে গল্পলেখক বিশ্বাস করতো। এটা তা হলে সেই গল্পলেখকের, লেখকের অনুপ্রেরণা সম্বন্ধে মত হতে পাবে। আচ্ছা স্যাফো বলে কি এক কবি ছিলেন?

কিছু কবিতা আছে স্যাফোর নামে।

কবিতাগুলো সবই রমণীর রূপলাবণ্যর প্রশংসা শুনেছি। অথচ স্যাফো নিজে একজন মহিলা ছিলেন।

যদি একথা সত্য হয় তবে মহিলার রূপলাবণ্য একজন মহিলারও, পুরুষের মতো, কবিতার অনুপ্রেরণা হতে পাবে এই বলছো?

কবিতার অনুপ্রেরণা অভিনয় নয়! নিজের তীব্র অনুভূতিও বটে।

অর্থাৎ স্যাফোকে তাঁর কোন বান্ধবী এমনভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল, যাকে প্রেম বলা যায়?

অন্তত তেমন প্রেম কি, অন্তত তর্কের খাতিরে, স্যাফোর কবিতার কিংবা অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পের, শেকসপীয়ারের সনেটের অনুপ্রেরণা হতে পারে?

রাজেন বলল, তুমি কি আর একটু বিয়ার নেবে? ইউরোপে কোন কোন দেশে নাকি আইন করা হয়েছে যাতে পুরুষ পুরুষকে বিবাহ করতে পাবে। অর্থাৎ একজন পুরুষ ম্যারেজ রেজিস্টারে অন্যের স্ত্রী বলে উল্লেখিত হয়। কিন্তু তারা সবাই কবি অথবা চিত্রকর কিংবা সঙ্গীতজ্ঞ এমন নয়।

কিন্তু মনে করো, যদি, এমন দুজনের যদি শিল্প-উদ্দেশ্যও সহধর্মী হয়। হতে পারে। তাদের সেই ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে শিল্পসাধনা। তাতে কি শিল্পের পক্ষে সুবিধার হয় না?

ব্যাপারটা কি কিছু পরিমাণে, কেন, অনেকটাই কি অস্বাভাবিক হয় না? .

মাধবী হেসে বলল, এবার তুমি হেরে গেলে, দার্শনিক। স্বাভাবিক কাকে বলে? এই যে বিয়ার খাচ্ছি এটা কি স্বাভাবিক? কিংবা যে আবসাঁৎ-এর কথা উঠেছিল, তার তীব্র তিক্ততা? বরং এটা কি মানুষের আবিষ্কার নয় যে এই অস্বাভাবিক ক্ষতিকর পানীয়, (এগুলো না দুধ না জল) মানুষের ভালো লাগে? কিংবা মানুষ আকাশে উড়বে, জলের তলায় চলবে এগুলোও কি অস্বাভাবিক নয়? কিন্তু চলো। দেখো লাঞ্চপ্যাকেট হল কি না। কিংবা মনে করো একজন খুব বড় টেকনোলজিস্ট। যে দিনের রাতের বেশির ভাগ তার টেকনোলজির চিন্তায় ব্যস্ত, সে যদি পুরুষ-প্রেমিক খোঁজে মনের মানুষ হিসাবে, কিন্তু বহু দিনের নীতিবোধ তাকে পীড়িত করে বলে তেমন মহিলাকেই পছন্দ

করে যে অন্তত পোশাকে একটি যুবক। তুমি কি পুরুষদের পাশে এমন পোশাকের নারীদের দেখো না?

তুমি কি একে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলবে, টেকনোলজিকে কাজে লাগানোর বুদ্ধি?

তারা উঠল বার থেকে। কাউন্টারে একটু দাঁড়াতেই লাঞ্চপ্যাকেট এল। ওদের সঙ্গে বয়ে নেয়ার মতো কিছু নেই দেখে প্লাস্টিকের হালকা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগও একটা দিল হোটেল, সামান্য পয়সার বদলে। সেকালে কলকেতাতেও এত সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না। এ তো কাশীপুরের কাছে।

পথে যখন তারা ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছে তখন রাজেনের মনে হল, এই চিন্তাগুলো কি মাধবীর নিজের অভিনয়কলার সম্বন্ধে চিন্তার সঙ্গে যুক্ত? এই চিন্তাগুলো এবং ম্যারিউআনা সিগারেট। পাশে দাঁড়ানো মাধবীকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। স্বাস্থ্য দেখো, গালের রং, চোখের ঔজ্জ্বল্য, আর ব্লাউজের বুকে সেই চুলের পাকানো গোছা। যার পাকটা এখন যেন একটু আলগা বলে চুলের রেশমী ভাবটা বেশি ধরা পড়ছে।

রাজেন বলল, তুমি শেক্সপীয়ারের কথা অনেক বলেছো। কিন্তু মিসেস ঘোষাল, যদি ওফেলিয়ার পার্টটা তোমাকে দেয়, নিও।

মাধবী মাথা ঝাঁকাল। হাতঘড়ি দেখল বলল, লাঞ্চপ্যাকেটটা কিন্তু এগারোটার আগেই পেয়েছি। রোদটাও দেখো কেমন খটখটে আর উজ্জ্বল। ট্যাক্সি আসছে না। আমরা কি হাঁটবো? একদিন আমরা হেঁটেছিলাম।

অন্তত হেঁটে ব্রিজটা পার হওয়া যায়।

ধন্যবাদ। মাধবী হাতব্যাগ থেকে গগলস বার করে পরল। বলল আবার, তোমার ব্র্যাণ্ডের একটা সিগারেট দাও।

ব্রিজটা পার হল তারা।

মাধবী বলল, হিপিদের কিন্তু আমি দূর থেকে দেখেছি। তাদের কলোনি বলছো। সেটা বেশি নোংরা?

তেমন নয়।

তুমি কী ভাবছো বলো তো? এই বেলা হিপিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলো না হয়।

রাজেন হাসল, ওদের সম্বন্ধে কিছু বলার মতো জ্ঞান আমার নেই। তোমাকে একটা কথা বলতে পারি, ওদের সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। আমি ঠিক টুরিস্টদের চিড়িয়াখানা দেখার মন নিয়ে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র প্রকারান্তরে ওদের যে সাহায্য করে তা টুরিস্ট আকর্ষণ বাড়াতেই। ওদের সেই পুরনো ভাঙাচোরা ব্লকটা যাকে মেরামত করলেও ভাঙাচোরার চেহারা বজায় রাখা হয় তাকেই ওদের কলোনি বলা হয়। নেপালের বাইরে এতবড় হিপি কলোনি নাকি নেই। তুমি দেখবে টুরিস্ট আকর্ষণ বাড়াতে সেখানে কাশীপুরের তৈরি ভোদকা প্রচুর বিক্রি হয়। টুরিস্টরা মনে করে তা সব রাশা থেকে এসেছে কিন্তু কাশীপুরেই তৈরি আর তা আশি পার্সেন্ট অ্যালকোহল।

তুমি সেখানে কী করো?

কিছুই করি না। টুরিস্টদের পেছন পেছন ঘুরি। ওরা বোকার মতো নানা প্রশ্ন করে। হিপিরা যদি উত্তর দেয়, প্রশ্ন আর উত্তর টুকে রাখি। বুঝতে চেষ্টা করি ওদের জীবনে যূথবদ্ধতা আর রিচ্যুআল আছে কিনা?

রাজেন হঠাৎ হেসে উঠল।

হাসছো যে! হিপিদের কথা?

না। ইউরোপ থেকে সমাজতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমাজ-অভ্যাস সব এনেছি অর্থাৎ পোশাক, ডিনার, লাঞ্চ। না। এটাও বোধ হয় ভাবছিলাম না। বোধ হয় টেকনোলজির কথা। এখন থেকে

প্যান্ট, শার্ট, স্ট্র-হ্যাট পরা মহিলা দেখলে বিযাব, আবসাঁৎ, উড়োজাহাজেব কথা মনে হবে যেমন তুমি তুলনা দিয়েছো। মধুকে মদে পবিণত কবা বৈজ্ঞানিক চিন্তাব ফল—এতে সন্দেহ নেই। এবং প্রাপ্তবযস্ক মানুষ রুটিব সঙ্গে মধু শিশুদেব ব্রেকফাস্টেই দেয, নিজেদেব জন্য মদ রাখে।

কিন্তু ট্যাক্সি নিতে হবে। টপোগ্রাফি বলে কথা। বাস্তা এখানে মযলা। এখানে ভাঙা, ওখানে গর্ত, এখানে যদি ডাবেব খোলা, ওখানে ডাস্টবিনেব পাশে ষাঁড। মনে হবে যেন সি এম ডি এ এদিকে কখনও আসে নি। প্রকৃতপক্ষে বাজেন এব আগে হিপি কলোনিতে গেলেও কখনই হেঁটে যায নি। এমন কি হতে পাবে হিপিদেব ছন্নছাডা জীবনেব দিকে যেতে হলে বাস্তাটাও এমন ছন্নছাডা হতে হবে? আগেকাব দিনে যেমন বস্তি আব বিপ্লবকে চিন্তায পাশাপাশি রাখা হতো বস্তি-বেকাব-বিপ্লব। তা হলে বাস্তাটাকে এমন নোংবা বাখাই পবিকল্পনাব ফল যাব পিছনে অন্তত টেকনোলজি থাকে। এই কথাটা মনে হতেই বাজেন হেসে উঠল।

বাডিগুলো কিন্তু ঝকঝকে, অন্তত ভিতবেব দিকটা। আব টুবিস্টদেব ভিডও তেমন নয। ফুটপাত বলতে যা অবশিষ্ট তাব একটা অংশে ওবা দাঁডাতেই ট্যাক্সি পেল।

কযেক মিনিট পবে মাধবী বলল, দার্শনিক সেখানে কি আমি মুখ বুজে থাকবো?

আদৌ নয। তুমি প্রশ্ন কবতে ওবা কী উত্তব দেয, তা শুনতে আমি উৎকর্ণ থাকবো।

রূপসী পাঠিকা, এখানে আপনাব পবামর্শ দবকাব। হিপিদেব কলোনিব কথা কি সবিস্তাবে বলা হবে? ইতিপূর্বে একবাব বলাও হযেছে কিছু। বুঝতে পাবা যাচ্ছে না এটা আমাদেব উপন্যাসেই বা কী কাজ দেবে। লক্ষ্য বাখবেন যদি লাগে।

টুবিস্টদেব ভিড তেমন নেই বটে, তা হলেও বাজেন মাধবীব ঠিক আগে তিন চাবজনেব একটা আমেবিকান দল দুটো ট্যাক্সি থেকে নামল ব্লকটাব কাছে।

মাধবী বলল, আমাব কিন্তু ভয কবছে।

ট ট, একটা অভিজ্ঞতা ছাডা আব কিছু নয। তেমন কপাল হলে পৌনঃপুনিক মশাইএব মতো একজনকে পেযে যেতে পাবো, সাতপুকুবেব ব্যালকাটান, হযতো চুনাপুকুবেব মিস্তিব। সুদেহাব কথা মনে পডে? সেই চাঁপা ল্যাঙট?

মাধবী খিলখিল কবে হেসে উঠল।

ব্লকেব যে-কোন দবজা দিযেই ঢোকা যায কিন্তু তাব আগে প্রবেশ মূল্য জমা দিতে হবে। সে ঘবে বীতিমতো অফিসেব আবহাওযা এবং সেখানে অবশ্যই সবকাবি ট্যাক্স কলেক্টবই প্রবেশ মূল্য নিযে টিকেট কেটে দেয। এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে তুমি কী কববে এবং কী কববে না, তা বলে দেযা হয একটা পুস্তিকাব মাধ্যমে।

বাজেন বলল, এসো। তোমাকে একটা গোপন কথা বলে দিই। টুবিস্টদেব পথে না ঘুবে আমবা অন্য দবজা দিযে ঢুকবো। এই ব্লকটাব নানা তলে নানা ঘবে প্রায এক হাজাব মানুষ থাকে। তুমি নিশ্চয এই এক হাজাব মানুষকে দেখতেও চাও না, তাদেব সকলেব সঙ্গে আলাপ কবা দূবে থাক। আমবা ববং সেখানে যেতে পাবি যেখানে আমি এদেব কথা কিছুটা বুঝতে পাবি। যদি সত্যি তুমি এদেব সম্বন্ধে জানতে চাও তা হলে তোমাকে এখানে বাবে বাবে আসতে হবে। পবিচয আবম্ভ যে কোন জাযগা থেকেই সুব কবতে পাবো।

দুটো বাজে তখন। মিসেস মাধবী ঘোষাল বলল, তোমাব কি ক্ষিধে পায নি?

মনে কবিযে দিযে ভালো কবেছো, এই বলে বাজেন উঠে দাঁডাল।

এখন তাব সব চাইতে বড কর্তব্য এমন একটা জাযগা খুঁজে বাব কবা যেখানে তাবা লাঞ্চ প্যাকেট নিযে বসতে পাবে। অবশ্যই প্ল্যানিং-এব যুগেব এই দুপুবে তেমন জাযগাব অভাব হবে না, তা আমবা না দেখেও বলে দিতে পাবি। ব্লকেব উল্টো দিকে একশ গজ গিযে সাবওযেব স্টেশন।

সেখানেই ওয়েটিং হলের একপাশে রাজেন একটা ছোট কাফেটেরিয়া খুঁজে পেল ইদলি দোসার সঙ্গে কফি বিক্রি হচ্ছে।

মাধবী বলল, তা হলে লাঞ্চ প্যাকেট না আনলেও চলতো।

কারো কারো এমন হয় যে ইদলি বা দোসা পছন্দ নয়। রাজেন বলল, কেমন লাগল ওদের? ওরা কি একসিস্টেনশিয়ালিস্ট?

হুঁ, তা, বলতে পারো একদিক দিয়ে। যখন ওরা কিছু করার চাইতে বরং কিছু হওয়াকে মূল্য দেয়। যখন চিন্তা করার চাইতে অনুভব করাকে মূল্য দেয়। কিন্তু এরা একসিস্টেনশিয়ালিস্টও নয়। সার্ত্রর মতো একসিস্টেনশিয়ালিস্টকে এরা ঝুটা মনে করে। সেকালের সেই ভদ্রলোকও মর‍্যালিস্ট ছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন, দ্বিধার মুখে কোন কিছুটা পছন্দ করবো তা যখন স্থির করি তখন সারা পৃথিবীর জন্যই পছন্দ করি। তিনি যদি পছন্দগুলো লিখে যেতেন দেখা যেতো তিনি একটা নতুন নীতিগ্রন্থ লিখে ফেলেছেন।

তা হলে এরা কী?

আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় নি, এদের কথাগুলো থেকে একটা বিষয় পবিষ্কার হয়ে ওঠে যে এরা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মিথ্যাচার ধরে ফেলেছে, নীতি মানেই যে ধাপ্পা তা সে সার্ত্রের সাবা পৃথিবীর জন্য পথ পছন্দ করা হোক, কিংবা কার্ল মার্কসের শ্রমিকেব মহত্বের ধারণা হোক, অথবা ক্রাইস্টের ভালোবাসার ধর্ম হোক? প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরা এই কথাই বলে এবং সব সময়েই এগুলোকে লঙ্ঘন করে এবং অবিশ্বাস করে।

যেমন?

যেমন ধরো একটা কথা আছে, ব্যভিচার করবে না। বলো, এটা কোন প্রাপ্তবয়স্ক না বলেছে? কিন্তু হিপোড্রোমের পেট-নাচ, সিনেমার নগ্নিকাব অভিনয়, এবং এরকম প্রকাশ্য ব্যাপার ছাড়া ডিভোর্স আদালতে যা প্রকাশ পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি, মিথ্যা আচরণ প্রমাণ করে না? যেমন ধবো, ক্রিশ্চিয়ান বলতে যারা আফ্রিকা ও এশিয়াকে শোষণ করে, তাদের বোঝাতো না? কিংবা ডিমোক্রেসি কি মুষ্টিমেয় চতুরের শাসন নয়? অথবা শ্রমিকের স্বর্গরাজ্য কি আর্মি ও পুলিশের সাহায্যে কতিপয় মধ্যবিত্তের দেশশাসন নয়? এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়? টেকনোলজির আবিষ্কারগুলোকে দিয়ে এমন করে নিজের ঘর ভরে তোলা যে নিজেরই জায়গা হয় না?

এরা কি নাইহিলিস্ট?

রাজেন হাসল, এরা কী, তাই জানতে চেষ্টা করছি। আপাতত দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি মানুষ গত তিনশ বছর ধরে স্টিম, ইলেকট্রিসিটি, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি শক্তি দিয়ে প্রকৃতিকে যে নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করেছে, সেটাকে মূল্য না দিয়ে যতদূর সম্ভব এরা প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করতে চায়। ফুলের বোটানি না পড়ে তার রূপ ও সৌরভ চায়। চাঁদে মানুষ পাঠানোর প্রতিযোগিতা না করে চাঁদের কিরণের জালিকাটা আলোর রহস্য উপভোগ করতে চায়। মনে করো জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য।

লাঞ্চপ্যাকেটে কফি ছিল। কয়েকটা পয়সার বিনিময়ে কাফেটেরিয়ার উনুন থেকে গরম করে আনল রাজেন।

বলা বাহুল্য হিপিদের এই কলোনিতে আসায় রাজেন ও মাধবীর উদ্দেশ্য পৃথক ছিল। গবেষণা আর সময় কাটানো এক নয়। যদিও সময় কাটানো মাধবীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। আমাদের যদি মনে থাকে, সে নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। তার সঙ্গে কোথাও ব্যর্থতার হতাশা ছিল এবং মৃত্যুর একটা দৃশ্য মনে আসছিল, তবে যে মৃত্যু তাকে সাবালক পৃথিবীতে রওনা করে দিয়েছে নিঃসঙ্গও করেছে।

মাধবী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বলো, রাজেন, ডাজ এনিথিং রিঅ্যালি ম্যাটার? বলো, সত্যি কি কিছুতেই যায় আসে?

একদিক দিয়ে অবশ্যই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মিল ছিল। রাজেন দার্শনিক ঔদাসীন্য নিয়ে হিপিদের দেখছে, বিচারবিবেচনার নাকি সেটাই পথ। তার নিজের ও হিপিদের মধ্যে এই ঔদাসীন্য নিশ্চয়ই পার্থক্য রেখে দেয়। মাধবী বিন্দুমাত্র সহানুভূতি অনুভব করছে না হিপিদের দিকে।

সে বলল, ট্যাক্সি দেখো কিংবা এটা তো সাবওয়ে স্টেশনই। ট্রামেই চল। কিন্তু এটাকে কি অ্যান্টি-কালচার বলবে না?

রাজেন সাবওয়ের টিকিট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আপন মনে হাসল। জিজ্ঞাসা করল, আমরা পুরনো চৌরঙ্গীর টিকিট নিয়েছি। চে গুয়েভারা বীথিতেও নামতে পারি। তারপর কোথায়?

চলো তো। কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। কিংবা এটা কি নন-কালচার?

তুই বলবে?

রাজেন সিগারেট ধরাল। মাধবীকে ধরিয়ে দিল। মাধবীর চোখে এখনও সেই গগল্স জোড়াই। সে কী দেখছে বোঝা গেল না।

মিনিট পনের পরে মাধবী বলল, বুঝতে পারছি তুমি এখনও মত দিতে তৈরি হও নি। একটা কথা কিন্তু বলা যাচ্ছে। মনের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব জন্মায়, সেই দ্বন্দ্বে অবসান ঘটাতেই তলিয়ে যাওয়া। সাঁতার দিয়ে জলের ধাক্কা, ঢেউয়ের নাকানিচোবানি সহ্য করার বদলে নদীর তলার পলিতে আশ্রয় নেয়া। এক রকমের এসকেপিজম্।

অন্তত দ্বন্দ্বটা ঠিক ধরেছো। একটু এগিয়ে বলতে পারো সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হওয়া। খুব সিয়ারিয়াস মনে হয় না?

না, মাধবী হিপিদের নোংরা পরিবেশে নিজেকে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু ওরাও কি তার মতো অন্তরে গোপন-করা সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত? অথচ ট্রামে বোঝাই যাত্রী. এরা সবাই যেন হর্ষোৎফুল্ল। যেন যে যার অফিস কারখানায় পৌঁছুলেই বোনাসের টাকার খামটা আজই পাবে।

চিন্তার লজিক সব সময়ে বোঝা যায় না। কথা থেকে তার গোড়ায় কী চিন্তা ছিল আন্দাজ করতে হয়।

মাধবী বলল, একটা গল্প জানো। একটা গোপন প্রেমের কাহিনী। তার পর বোধহয় সেই নায়িকা আর তার নবজাতককে মেরে ফেলা হল কিংবা তাদের মৃত্যু হল নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরে। তারপর তাদের কবর দেয়া হল: কবরের উপরের ঘাসগুলো খুব জোরদার হওয়াতে একটা ঘোড়া তা খেয়ে খুব বলবান হল।

তুমি বোধ হয় মপাসাঁর গল্পের পঙ্কোদ্ধার করলে। এরকম তার একটা গল্প আছে। নায়িকার জন্য নায়ক সমাজ সংসার ত্যাগ করে পেল না তাকে। যেন সেই করুণাহীনা ভাগ্যের মতো, অনুপ্রেরণার মতোই কেউ। অবশেষে নায়িকার মৃত্যু হল। কবর খুঁড়ল নায়ক শেষ দেখা দেখতে। দেখল, পচনশীল মাংসে পোকা কিলবিল করছে। কিংবা বোধ হয় মৃত্যুর আগেই সেই করুণাহীন একবার মাত্র বক্ষোবাস খুলেছিল এবং নায়ক দেখল সেই স্তন যা নায়কের কাছে সৌভাগ্যের স্বর্ণচূড়া, ক্যানসারের ক্ষত শুধু। কিন্তু গল্পটা কেন?

মানুষ কি সত্যি মৃত্যুর কথা ভাবে? মানুষ তা হলে আত্মহত্যা করে কেন?

দেখো, আপাতদৃষ্টিতে হতাশা আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। কিন্তু কোন সুন্দরী এবং ইন্টেলেকচুয়াল, কোন সুন্দরী এবং অতি-প্রশংসিত অভিনেত্রী যদি তা করে তবে তাকে সেকালে মনস্তাত্ত্বিক রোগ বলা হতো।

এখন?

এ আলাপটা কি ভালো হচ্ছে? মেরিলিন মনরোই প্রথম ঐতিহাসিক মহিলা যে খ্যাতির শিখরে, অর্থসম্পত্তি যখন চূড়ান্তভাবে পেয়েছে তখন আত্মহত্যা করেছিল। কেন? ঘুমের বড়ি হাতের কাছে ছিল বলে? সেটা কি তাকে মৃত্যু হয়ে আহ্বান করতো। হাতে টেলিফোনের রিসিভার ছিল কেন? কারো সঙ্গে কথা বলা অর্থাৎ কারো কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছিল? হয়তো, হয়তো মনের মধ্যে একটা কালো শূন্যতা থাকে, সব সময়ে তার চারপাশ দিয়ে যাওয়া আসা, এক সময়ে নিজের অজ্ঞাতে তাতে পড়ে যাওয়া। কিন্তু মিসেস ঘোষাল, আমরা এখন কোথায় যাবো?

গগলসটাকে চোখ থেকে সরাল মাধবী, বাঁ বুকের উপরে কার্লটাকে একটু পাকিয়ে দিল। বলল, দার্শনিক, আমার ফ্ল্যাটে এখন নিস্তব্ধ দুপুর। সেখানে আমরা ক্ল্যারেট পেতে পারি আইসে বসানো। তোমার কি পিপাসা পায় নি?

মাধবীর লাল ঠোঁটদুটো হাসল। কিন্তু তার চোখে কি ক্লান্তির মতো কিছু ছিল!

মাধবী বলল, ততক্ষণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, বলো, সুখী হওয়া ছাড়া জীবনের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সুখী হওয়ার পথই বা কী? শুধু টাকায় সুখ হয় না বোধহয়। অনেক টাকাওয়ালা মানুষও নিজেকে শিকড়ছাড়া উদ্দেশ্যহীন মনে করতে পারে।

তুমি কি কালচারের কথা বলছো? কেউ কেউ বলে বটে, নট বাই ব্রেড এলোন। শুধু রুটি নয়। ঐতিহ্য থেকে পাওয়া এমন কিছু থাকে যার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে না নিলে নিজেকে শিকড়ছেঁড়া মনে হয়।

তাদের ট্রাম তখন পুরনো চৌরঙ্গীর কাছে। ট্রাম থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দুপা যেতেই লেনিন সরণির গায়ে চে গুয়েভরা বীথি।

মাধবী বলল, তোমার লাঞ্চটা ভালো হয় নি। এসো কিছু স্ন্যাক্স কিনে নিয়ে তবে ট্যাক্সি ডাকি। হাসছো যে?

না, না আদৌ হাসছি না। এসো কিছু ডালমুট কিনি আর কাজু। নাকি সৈয়দ আলির দোকান থেকে ঈজিপসীয়ান খুস-কাবাব কিনবে? শুনেছি ওরা পৃথিবীর সব দেশের রান্নাঘরের হাঁড়ির হাল-হকিকৎ জানে। কিংবা মেওয়া কিনতে পাবো। এত ভালো নাকি আর কোথাও নেই।

তা হলে বরং চিউইং গাম কিংবা চকোলেট ক্যাণ্ডি দেখো। হাঁটতে হাঁটতে চলো ক্ল্যাসিকে। না দার্শনিক, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছে না তো?

আদৌ না। চে গুয়েভরা কে জানো? আমিও জানি না ঠিক। বোধ হয় একজন রোম্যান্টিক কবি ছিল। স্যাডিস্ট শেলী বলবে নাকি? কিন্তু আমরা আমাদের শহরের রাস্তার নাম রাখি। কিন্তু এটা আমাদের ঐতিহ্য, বিদেশী লোকদের মতামত চিন্তাকে আমাদের মুখে না বসালে আমরা সুখী হই না। সেদিন হিপিদের কলোনীতে একজন একথাই বলেছিল। আমরা প্রকৃতপক্ষে জোব চার্ণক নামে এক বিদেশীর সৃষ্টি। সেই থেকে সেই বিদেশী ঐতিহ্য। ও না হলে আমাদের তৃপ্তি নেই।

সলটেড কাজুবাদাম কিনল রাজেন। ক্যাণ্ডি কিনল মাধবী। রাজেনের হাতে দিয়ে বলল, মুখটাকে মিষ্টি করো। চলো আমরা হাঁটবো। ক্লান্ত হয়ে যখন আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছাবো, ঘুম পাবে। ঘুম থেকে উঠে ক্ল্যাসিকে যাব। ঘুমানোর আগে ক্ল্যারেট ভালো লাগবে দেখো। তুমি দেখো, নিরঞ্জন ঘোষালের পছন্দ করা ক্ল্যারেট খারাপ হয় না।

ক্যাণ্ডি মুখে দিয়ে রাজেন বলল, আজ আমরা কিন্তু পৌনঃপুনিক মশায়ের দেখা পাই নি।

মানুষের ভাগ্যে রোজ একরকম হয় না।

কিংবা আজ আমরা চিন্তায় ক্লিষ্ট ছিলাম।

তা কি অন্যায়? আমরা তো সুখী হতে চাই। তুমি যে শূন্য কালো গহ্বর মনে আছে বলেছো,তার উপরে ব্রিজ কি ক্রিয়েটিভ আর্ট নয়? কিংবা ক্রিয়েটিভ আর্টই তার উপরে একমাত্র ব্রিজ হতে পারে।

ব্রিজ কি? ব্রিজ নয় বোধ হয়। বোধ হয় সেই কালো শূন্যতার পার দিয়ে দিয়ে খানিকটা চলার পথ।

মাধবীকে মির্জা গালিবের ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে রাজেন বিদায় নিতে চেয়েছিল। মাধবী ছাড়ল না। আইসে বসানো ক্ল্যারেট খেতেই হল।

মাধবী তাকে একটা ফটো অ্যালবাম দেখতে দিয়ে পোশাক বদলাতে এবং সুবমাকে ন ডেকে ক্ল্যারেট আনতে গিয়েছিল।

ফটো অ্যালবামটা কেন? হাতের কাছে ছিল বলে? দার্শনিক রাজেনকে বই দেয়া ধৃষ্টতা হবে বলে? তা কি রূপসী নাবীব আত্মম্ভরিতা, কারণ অধিকাংশ ছবিগুলি তো মাধবীবই? কিংবা নিজেব মনে যে চিন্তাস্রোত ছিল তা তাব নিজেব অজ্ঞাতে অ্যালবামটাকে পছন্দ কবেছে?

ক্ল্য.:রেটের সময়ে কথা হল।

মাধবী বলল, তুমি হিপিদেব ঘবের দেয়ালেব ছবিগুলি কি লক্ষ্য কবেছিলে?

টুরিস্টদের একজন যাব নকল নিচ্ছিল?

আর বলছিল কী যেন কথাটা?

নাগবিক আদিমতা।

হাসছো যে? ওব মানে কী?

বোধ হয একজন নতুন পিকাসো। কিংবা পাগলাগাবদেব কারো আঁকা।

ওবকম আঁকে কেন?

পৃথিবীটাকে ওরকম দেখতে পায।

ক্ল্যারেট শেষ করে বিদায নিল বাজেন. তখন মাধবীর হাই উঠছে দুপুবের ঘুমের।

আবার দেখতে পাচ্ছি বাজেনেব কথা না বলে পরিচ্ছেদটা শেষ করা যায না। রাজেন পাবলিক লাইব্রেরীতে ঢুকল। এটা খুব সৌভাগ্যের কথা তার অভ্যস্ত চেযাবটা খালি। একটু ভেবে রাজেন শিল্পকলাব উপবে মাদক দ্রব্যেব প্রভাব সম্বন্ধে বই চেয়ে স্লিপ পাঠাল। হযতো বইএব বদলে ক্যাটালগ আসবে! বাজনকে নিজেই পছন্দ কবে নিতে হবে

এই অবসরে সে ভাবল ·

হিপিদেব সেই হলটাব দেযালে যে ছবি ছিলো তা কি এল এস ডি বা তেমন কোন জিনিসেব প্রভাবে আঁকা? চিত্রকর যদি পিকাসোর মতো কেউ হতো তা হলে ক্যানভাসে আঁকতো অর্থাৎ যদি তাব হিসাববুদ্ধি অবশিষ্ট থাকতো। দেখাই যাচ্ছে এ ছবির বাজাব আছে, অন্তত যদি আমেরিকান টুবিস্টদেব চোখে পড়ে। সুতরাং ধবে নেয়া যায, ছবি আঁকার সময়ে চিত্রীব হিসাবী বুদ্ধি ছিল না। দৃশ্যমান জগৎও বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছিল মস্তিষ্কে। এক তীব্র মাদকের ফল?

মাদক, মদ, ইত্যাদি কি মানুষের অনুভূতিকে তীব্রতর করে? কোন বনস্পতিসদৃশ লেখক কবুল করেছে সে নাকি গাঁজা খেতো। আমাদের দেশেব অনেক ঔপন্যাসিক নাকি মদ খেয়ে লিখতে বসে। তা কি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে? গাঁজা খেয়ে আবোলতাবোল বকা আব সাহিত্য কি এক? সন্দেহ আছে। সুখের জন্য, সখের জন্য, তুমি মদ খেতে পারো, কিন্তু উপন্যাসের জন্য?

যেমন ধরো মাধবীব মারিউয়ানা সিগারেট খাওয়া। একরকম বিলাসিতা, আর এটা সে নতুন শিখেছে। কালরাত্রির ডিনারে যে হীরা বসানো সিগারেট কেসটা গীতা বার করেছিল, সেটাই আজ মাধবীর কাছে ছিল। ফ্যাশন আসছে নাকি এটা অভিনেত্রীদের মধ্যে?

আজ কিন্তু মাধবীকে নতুনভাবে দেখছে সে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে একই মানুষ দুদিন দুরকম দেখাবে।

আজ মাধবী একা একা বোধ করছিল। অথচ একা তো সে নিজেই ইচ্ছা করে হয়েছে। নিরঞ্জনেব সঙ্গে জুডিশিয়্যাল সেপারেশনে তাব আগ্রহ কম ছিল না।

রাজেন হাসল আপন মনে, ও আচ্ছা আজই তো সে ফটো অ্যালবামটা দেখেছে। অথচ কত সুখেই ওরা ওদের বিবাহিত জীবন শুরু করেছিল—প্ল্যান ম্যাথমেটিকস বা ইকোনমিক্যাল ম্যাথমেটিকস টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষাল এবং অভিনেত্রী মাধবী। তোমার মনে হতে পারে, ফটো অ্যালবামটা তোমার হাতে দিয়ে মাধবী বলতে চাইছিল, ওই সুখের স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে, বলো, আমার একা লাগবে না? অবশ্য তা হওয়াব কারণ নেই। এমনও মনে করা যায় না অ্যালবামটা নিরঞ্জন ঘোষালকে মনে করিয়ে দিয়ে মাধবী রাজেনের কাছে তার ব্যাপারে সীমারেখা বোঝাবে।

. নানা আর্কিটেকচার ও স্কাল্পচারকে ব্যাক্গ্রাউণ্ডে বেখে তোলা মাধবীর ছবি। আর সেই সব ছবিতে মাধবী যদি স্বল্পবাস পরিহিতা না হয় তবে প্যান্ট, টি-শার্ট, হ্যাটে সজ্জিতা। এমন কি পায়েও পুরুষদের জুতো। কয়েকটি ছবি আছে, সেগুলো বোধ হয় কাশ্মীর বা তেমন উপত্যকায় তোলা, যাতে নিবঞ্জন ও মাধবী একই পোশাক পবেছে, একই রকমের পুরুষের পোশাক এবং মস্ত মস্ত স্ট্র হ্যাট। শুধু মাধবীর হ্যাটে বেশ বড় একটা পালক গোঁজা। ফটোগুলি রঙিন। তাতে পালকটাকেও মূল্যবান, অন্তত দুষ্প্রাপ্য দেখায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নয়, দুই বন্ধু।

রাজেন মনে হাতড়ালো, কোথায় দেখেছে এমন ছবি? ও এই বিশেষ দাঁড়ানোর পোজটা—ক্ল্যাসিকের থিয়েটারে রোজালিণ্ড। গ্যানিমিড সেজেছিল যে গত বছর শেকসপীযাব অভিনয়ে, সেও এটাকে অনুকরণ করেছিল। এটা একটা প্রচলিত পোজ ওই পার্টটার, বোধ হয ক্ল্যাসিকের বুকলেটেও ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু এটা মাধবীর ভালো লাগল কেন? তা দেখো, তাব এই হানিমুনের পোশাক যেন আধুনিক-থিযেটাবে গ্যানিমিডের পোশাক কিংবা তারই বকমফেব?

কে যেন বলছিল এই কথাই, (হ্যাঁ মাধবীই) শেক্সপীয়াবেব সনেট উল্লেখ করে এই ভালো লাগার কথা। নিরঞ্জনই অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পটাকে বলেছিল মাধবীকে।

বাজেন যেন আবিষ্কার করল। আচ্ছা, আচ্ছা, এতে কি নিরঞ্জনের মনেব বিশেষ ভঙ্গীকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ তার রুচি, পছন্দ, এই সব ব্যাপার ধরা দিয়েছে মাধবীর এই পুরুষ পোশাকে?

একটা ঠাণ্ডা ধীর সিগাবেট ধরাল রাজেন। এরকম কথা আছে বটে, সেকালে ইউবোপেব কেউ বলেছে, পুরুষের বন্ধুত্ব রমণীর সঙ্গর চাইতে পুরুষের পক্ষে বেশি প্রয়োজনের। পুরুষ বলতে অবশ্যই সেখানে প্রতিভাবান, শিল্পী, রাজনৈতিক, সেনাপতি, কবি ইত্যাদিকে বোঝাচ্ছে। কেন? সহধর্মিতা, সহমর্মিতা? র‍্যাঁবোর সখ্য একজন বিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক সুপ্রতিষ্ঠিত কবিকে তাব স্ত্রী ও সন্তানকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, এমন গল্প আছে। নিরঞ্জন অবশ্যই প্রতিভাবান প্ল্যান-অঙ্ক বিশারদ। তা হলে?

মাধবী নিশ্চয় ইকোনমিক্যাল ইকোয়েশনগুলোর সমাধান করতে পারে না। রাজেন যেন ডিটেকটিভের মতো চিন্তা করল। তা হলে এটা কি নিরঞ্জনের সাইকাইআট্রিস্টদের কোন মন্তব্য থেকে নিজের পছন্দকে বেছে নিতে শেখা?

এটা কিন্তু একেবারে অপ্রমাণিত ব্যাপার। অন্য কথায় সেই সাইকাইআট্রিস্ট যে নাকি নিরঞ্জনের মনোবিকলন করে বলেছিল সে কিসে সুখী হয়, তার সাক্ষ্য ছাড়া এমন বলা যায় না। কিন্তু নিরঞ্জন শেক্সপীয়ারের সনেট রচনা নিয়ে যা বলেছে বলে জানা গেল মাধবীর কাছে, তা থেকে কি নিরঞ্জনেব ঝোঁক বোঝা যাচ্ছে মনের?

কিন্তু তা নয়, সে তো মাধবীকে নিয়ে চিন্তা করছিল। মাধবীর নিশ্চয়ই এই জন্মগত অধিকার আছে যে সে সুখী হবে। এবং সে বুঝতে পেরেছে শিল্পকলাই সেই সুখ পাওয়ার পথ। এমন কি মনের সেই অন্ধকার অতল মৃত্যুগুহার উপরে ব্রিজই শিল্পকলা। সে অভিনেত্রী হিসেবে ইতিমধ্যে

ব্যর্থতার আঘাত পেয়েছে। তা সত্ত্বেও অভিনয়শিল্পে তার সমস্ত অস্তিত্ব মগ্ন করে সুখী হতে চায়। জীবনমরণের সমস্যা নয়? আর এই ব্যাপারে নিঃসঙ্গ বোধ করে সে কি সঙ্গিনী খুঁজছে! সহমর্মী কোন নারীকে? যে পুরুষের মতো নানা দাবি নিয়ে উপস্থিত হবে না।

রাজেনের হঠাৎ মনে পড়ল যেন, কাল ডিনারে মাধবীর ফ্ল্যাটে গীতা পাবকর ছিল। তার পরণে সায়েন্স ফিকশন সিনেমার উপযুক্ত টেডিবয় পোশাক ছিল। এই হীবাকুচি বসানো সোনাব মবিউয়ানা সিগারেটের কেসটাও গীতার উপহার। আর বোধ হয় সেই নিওব্যারোক ছবিব প্রদর্শনীতে মাধবীর বয়ফ্রেণ্ডের মতো মাধবীর সঙ্গে গীতাকেই সে দেখেছিল। গীতার মধ্যেই কি মাধবী শিল্পকলার সহমর্মী সঙ্গিনীকে খুঁজছে? কী অদ্ভুত তৃষাতুরা মাধবী তা হলে?

আবাব সাইকাইআট্রিস্টদের কথাই মনে হল রাজেনেব। মানুষ নতুন হয়ে ওঠার চেষ্টাতে, পাপেব বোঝা কমাতে, অতীতের ব্যর্থতার স্মৃতি ভুলতে সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যায়। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মীয় কনফেশনের মতো এটাও ইউবোপীয় সভ্যতার আবিষ্কার। মাধবীকে তাব শিল্পী-জীবনেব প্রয়োজনীয়তার কথা কি তার সাইকাইআট্রিস্ট ধরিয়ে দিতে পেরেছে?

এটাও ডিটেকটিভের মতো আন্দাজ কবা হচ্ছে?

কিংবা এটা কি বৈজ্ঞানিক কালচার থেকে পাওয়া! তুমি জেনেছো কোন কোন ক্ষেত্রে সমকামিতা শিল্পকলা বা কবিতার পক্ষে অনুপ্রেরণার উৎস হয়, সুতরাং সেই অবস্থায় নিজেকে আনতে চাও তা অপ্রিয় হলেও, কষ্টদায়ক হলেও ; যেমন কলেরা, পক্স, টি-বি প্রভৃতির জন্য ইনজেকশন নেয়া অপ্রিয়, কষ্টকর, বিরক্তিজনক হলেও অসভ্য মানুষ ছাড়া সকলেই তাতে রাজী হয়। সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যাওয়াটাও অবশ্যই বৈজ্ঞানিক-সংস্কৃতির পরিচয়। নিজের মনকেই বা রহস্যময় কেন মনে কবা হবে? কেনই বা তার স্বরূপ জানা হবে না?

কিন্তু মাধবী আজ মৃত্যুর কথাও বলেছে। সে কি কোন আপনজনেব, যে সুন্দরীও ছিল. তার মৃতদেহ দেখেছে? আহা। এই মৃত্যুর রঙটা মাধবীর বঙকে যেন গভীব করে দিচ্ছে।

এখন মাধবী তার দুপুরের ঘুমে অচেতন, কারণ এখনও সে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবতী। এবং রাজেন সেকালের কোন কোন ইংরেজ লেখক আফিম খেতেন কি না, খেয়ে লাভ হয়েছিল কি না, আধুনিকতর কালে নিও-বিটনিকরা হেরোইন প্রভৃতির দিকে কতখানি আকৃষ্ট এবং এসব নেশা তাদেব চিন্তা শক্তিকে কতটুকু অসাধারণ করেছিল এবং করতে পারে—এই গবেষণামূলক বই নিয়ে লাইব্রেরীতে ব্যস্ত। তার কিছু আগে নিউ আলিপুরের হেস্টিংস ম্যানশনে মিত্রা এবং শান্তনু স্টেট গ্রাফিক একজিবিশন থেকে ফিরেছে।

বলা বাহুল্য একজন চিত্রী যখন চিত্র-প্রদর্শনীতে যায় শতকরা আশিটা ক্ষেত্রেই তা নিজের ব্যাপার নিয়ে। গেরি সান্টায়ানা সই করা একখানা ছবি এবারের স্টেট গ্রাফিক একজিবিশনে প্রকৃতপক্ষে আছে। ছবিটিকে একখানা পোর্ট্রেট বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিকেটে তার নাম স্টাডি ইন ব্লু। গেরি সান্টায়ানা সই কেন? শান্তনুকে দেখলে বিদেশী বলে মনে হতে পারে কিন্তু এই বিদেশী নাম কেন? একটা স্রোতেব দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, অনেক স্রোতের সমবায়ে সে স্রোত। মনে হবে, তার কোন কোনটি যেন সাধারণের সঙ্গে চলে না, কোনটি ছোট ছোট পাক খেয়ে পিছিয়ে যেতে যাচ্ছে, কোনটি বা একটা পাতা বা কাঠি নিয়ে এমন খেলায় ব্যস্ত যে এগিয়ে যেতে হবে এই কথাটাই মনে নেই। অনেক স্রোতের সমন্বয়েই সে সংস্কৃতিধারা। সেই স্রোতগুলির একটি বিশ্বমানবতা। এবং এটা কিছু নয়। সেকালেব সেই রবিঠাকুর এবং অন্য অনেক মনীষী বহুবার বলেছেন এই বিশ্বমানবতার কথা। জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি এক সময়ে আমাদের পশ্চিমের

জানালাগুলোকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল ধন্যবাদ তাঁদের যাঁরা পশ্চিমের সব জানলাগুলোকে খুলে দিতে সাহায্য করেছিলেন। সেই বিশ্বমানবতার ঐতিহ্যে মেয়েদের নাম যেমন আইভি হতো, রুবি হতো, শান্তনু তলাপাত্র তেমন গেবি স্যান্টাযানা নাম নিয়েছে।

মিত্রা এখন তার বসবার ঘরে। প্রাইমাডোনা হিসাবে যখন তাকে সন্ধ্যায় ব্যালের জন্য প্রস্তুত হতে হতো তখনকার দিনে এই সময়টা তারও দুপুরের বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। না, এখন সে ঘুমাচ্ছে না। বরং তার মুখে চিন্তার চিহ্ন।

প্রকৃতপক্ষে সে লেখার কথা ভাবছে। কেন এই সময়টা তার লিখতে ইচ্ছা করে, বেলা তিনটে থেকে পাঁচটায়? এই সময়ের উত্তাপে, এই সময়ের আলোতে কি এমন কিছু আছে যা তার স্মৃতির স্বপ্নের সঙ্গে মেলে?

এখন সে তার লিখবার ঘরে যাবে। সেখানে এতক্ষণে তার লিখবার খাতার পাশে টেবল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার ঝি। সেই টেবল ল্যাম্পের পাশে নিশ্চয়ই একটা ড্রাই মার্টিনির বোতল থাকবে এবং ওয়াইন কাপ। ঝি ই তা রাখবে ঘড়ি ধরে। বলা যায় মিত্রার চালচলনে ডিসিপ্লিন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়তে পারে, যদি কেউ কাগজে সকাল থেকে রাত্রি সে কী করে তা লিখে নিয়ে লক্ষ্য করে। কিন্তু এটা বোধ হয় জীবনের আর্ট কিংবা ডিসিপ্লিনের ফল যে যেকোন সময়ে তুমি যদি হঠাৎ তাকে দেখো, মনে হবে অপচয় করার মতো কী অফুরন্ত সময় তার হাতে। কিংবা ব্যালেরিনাকে স্টেজে দেখলে তার স্বচ্ছন্দে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে দাঁড়িয়ে যাকে ভেসে থাকা বলাই যথোপযুক্ত—থাকা দেখে স্টেজের বাইরের কঠোর রেয়াজের কথা মনে হয় না।

সকাল নটার মধ্যে তার ব্রেকফাস্ট শেষ হয়। নটা থেকে দশটার মধ্যে তার ম্যাসাজার আসে। মাসে তিন চারদিন ছাড়া রোজই সে আসে। ব্যালে নর্তকীকে অপরিসীম কায়িক শ্রম করতে হয়। তখন ম্যাসাজ ছিল শরীরের ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখতে। এখন? এই ম্যাসাজই একমাত্র ব্যায়াম যা ছাড়া তাকে বাতে ধরতে পারে। কোমর বেড়ে ভুঁড়ি হতে পারে। ম্যাসাজারের পর সপ্তাহে একদিন করে হেয়ার ড্রেসার আসে। শ্যাম্পুও করে দেয় সে। এবমাস হল হেয়ারড্রেসার সোফিয়া মোদী আসছে না। বারোটা থেকে একটা সে জর্নাল, কাগজ, গল্পের বই পড়ে। একটা থেকে আড়াইটা লাঞ্চ। লাঞ্চের পর যদি কোথাও এনগেজমেন্ট না থাকে তবে পাঁচটা পর্যন্ত স্মৃতিকথা লেখে। পাঁচটায় চা। এবং গল্পগুজব, সংসারের হিসাব, ব্যবস্থা। এখন তো সে হোটেলে থাকছে না। কলকেতাতেই কি সে থেকে যাবে স্টেজ থেকে রিটায়ার করার পরের দিনগুলো কাটাতে? ছটা থেকে আটটা, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিচ্ছে তার নোটস তৈরি করা। অথবা বক্তৃতা দিতেই যাওয়া। আটটায় ডিনার। দশটা পর্যন্ত গল্পগুজব। টেলিভিশন দেখা। এগারোটা বেডটাইম।

এই এত খুঁটিনাটি আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু ঠিক এই কথাগুলি এখন মিত্রা ভাবছে বলে আমাদের বলার দরকার হল। সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কী করে সে? তার সময়সূচীর সম্বন্ধে চিন্তা থেকে এটা বাদ পড়েছে নাকি? আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির সামনে বসে থাকে চোখে কালো গগলস এঁটে। সে তো ম্যাসাজের সময়ে বেলা দশটার মধ্যেই হয়ে থাকে, যখন শুধু হাল্কা চাদর গায়ে জড়িয়ে তার বসবার ঘরে বিশ্রাম নেয়।

না কথাটা ঠিক হল না, সত্যভাষণ হল না। গত তিনমাস অন্তত নয়। তুমি বলতে পারো না মিত্রা, স্মৃতিকথা লিখবার সময় হিসাবে বেলা দুটো থেকে চারটের উত্তাপ কেন তোমার উপযুক্ত মনে হয়। তেমন দশটা থেকে বারোটার আবহাওয়াও কেন শান্তনুর ছবি আঁকার পক্ষে ভালো লাগে। এই সময়ে শান্তনু ছবি আঁকে।

অবশ্য বলতে পারো এই সময়পঞ্জী তিনচার মাসেরই। তার আগে এমনটা ছিল না। তখন বেলা দশটা থেকে লাঞ্চ পর্যন্ত মার্কেটিং ছিল, কলকেতার সঙ্গে পরিচয় করা ছিল, শশী শাশাঙ্কার সঙ্গিনী

হওযা ছিল। এমন সমযে (অর্থাৎ মিত্রা যখন তাব স্মৃতিকথা লিখবাব জন্য ড্রাই মার্টিনিব পাশে টেবল ল্যাম্পটাব কথা মনে কবছে) শান্তনু এল।

কাজ আছে?

কাজ? কেন? বোস। মিত্রাকে তো সুখীই দেখাচ্ছে।

শান্তনুব হাতে কযেক তা কাগজ। তাব একটা এগিযে ধবে বলল, এই নাও তোমাব ড্রেসাবেব স্কেচ।

কোথায় পেলি? (সুখ কাকে বলে তা কি তুমি জানো? সময ঝুলে থাকে না , যেমন এই বসবাব ঘবেব আবহাওযায ড্রাই মার্টিনি বঙেব দুপুবে, তাকে একটা ভবন্ত হ্রদ বলে মনে হয।

বাহ, তোমাব অ্যালবামে ফটো আছে না? এখন দেখো, তুমি যাকে কোথাও কোথাও ফানি কবে এঁকেছো তাব সঙ্গে মেলে কি না। চোখেব কোণে কিছু ভাঁজ দিযে দিযেছি। এই টানগুলোকে লক্ষ্য কবো।

ছবিটা হাতে নিযে দেখল মিত্রা। (সুখটা কি প্রকৃতপক্ষে হজমে জানাচ্ছে যা, এমন একটা সুপাচ্য লাঞ্চ শেষেব অবস্থা নয?) বলল তোব এ কল্পনাটা কাজে লাগাবে। ফটো না দিযে ছবি দিলে ভালোই হবে।

তোমাব সেই হেযাবড্রেসাব ডবোথি টমটমওযালাব ঘটনাটা আবাব পড়া দবকাব। অ্যালবামে দেখলাম তাব ফটো আছে। স্কেচটা বাব কবা যায।

তা বব। কিন্তু তাব নাম ছিল ট্যাণ্ডেমওযালা। তাকে টমটমওযালা মনে কবিস না। ডবোথি ট্যাণ্ডেমওযালা।

আজ কিন্তু এক কাজ কবা যায, মানে আজই তোমাব ট্যাণ্ডেমওযালাব স্কেচ কবতে বসছি না, চাযেব জন্য আজ বাইবে বেবোলে কেমন হয?

চাযেব জন্য কেউ সাধাবণত বাইবে যায না।

ছবিব জন্য যায? মনে কবো একটা ছবি যাকে এইমাত্র ভাসিযে দেযা হল।

আজই বিকেলে আবাব যেতে চাই স্টার্জিবিশানে? ছবি কিন্তু জাহাজও নয নৌকাও নয।

ছবিটাব কী দুর্গতি কবল ওবা জানা দবকাব। আমি চাইছিলাম, দেযালে আব কোন ছবি না দেয। অন্তত চাবিদিকেব তিন যুটেব মধ্যে আব কোন ছবি না আসে। ওখানকাব সেক্রেটাবিকে বললে বাজি কবানো যায না?

বলে দেখা যায। কিন্তু লিখতে দিবি না এখন? মিত্রা হাসল।

আবে এ কী কবেছো? চুলটাকে বদলে ফেলেছো। এক্সিবিশন থেকে ফিবে বুঝি? ছি ছি।

হ্যাঁ। স্নান কবাব সমযে। ভাবছি কাল সকালে হেযাবড্রেসাবেব কাছে যাবো।

কেন ও চুলটা কি ভালো ছিল না?

ও স্টাইলটা দিতে তো তোব আব দবকাব নেই।

বেশ কথা, মানুষ যদি একটা আবিষ্কাব কবে তবে তাকে ভুলে গিযে আবাব পুবনোতে ফিবে যায? একি শ্লেটে অঙ্ক কষা? মুছে আবাব অন্য আব একটা যোগ অঙ্ক কবা? নাকি আমাদেব এযাবাপ্লেনেব ডিজাইন আবাব ডাকোটায ফিববে

ব্যাপাবটা কী জানিস? বিশ্ববিদ্যালযে বক্তৃতায যেতে কেমন অস্বস্তি বোধ হতো।

জোলো যুক্তি। বলো কেউ কি অর্থাৎ কোন প্রবীণ ডীন বা তেমন কেউ ও চুলেব কাযদাটাব খুব বেশি বকমে প্রশংসা কবেছে কি না।

তা যদি কবেই থাকে

ঠিক তাই। প্রাইমা ডোনা, না কি প্রধানা মহিলা বলবো, কিন্তু পদ্মবিভূষণ ব্যালেবিনা মিত্রাব

পক্ষে এমন প্রশংসা শোনা কি নতুন অভিজ্ঞতা? তাই বলে অমন চুলেব—

আমাব ছবিব কথা বলছিলাম। কাল হেযাবড্রেসাব এলে তাব সঙ্গে না হয পবামর্শ কবা যাবে, তা ছাড়া—

আমাকে একটু ভাবতে দিলে পাবতে।

মনে কব এখনই তো আবাব একজিবিশনে যাওযাব প্রস্তাব হচ্ছে। সেখানে অজ্ঞাত থাকাব পক্ষে চুলটাকে বদলে নেযা সুবিধাব হবে দেখিস।

আচ্ছা বসো। না, কথা বলে যাও। এই বলে পকেট থেকে পেনসিল বাব কবল শান্তনু। মানে তোমাব এই হেযাব ডুব স্কেচটা কবে নিচ্ছি।

কিন্তু এখন তো আমাব লেখাব সময।

বেশ তো লিখবে। না হয ড্রাই মার্টিনি খাবে, বলো এখানে আনিযে দিই। তাতে আমাদেব চাযেব জন্য বাইবে যাওযা আটকাবে না। আব সেক্রেটাবিকে বললে সে বাজি হতে পাবেও যদি সে জানে তুমিই সেই ব্যালেবিনা, যদিও এখন বিটাযার্ড।

কী পাগলেব মতো বলছিস?

উঁ? আচ্ছা দাঁড়াও, এটা এমন ভাবে এখানে একটা পাক খাবে। এদিকে একটু চাও, তা, মানে বাঁ দিকে।

মিত্রা হেসে ডানদিকে মুখ ঘুবাল।

উঁহুঁ, উঁহুঁ বলল শান্তনু। বাঁ দিক বোঝো না?

কাগজেব উপবে পেনসিল ঘষতে ঘষতে শান্তনু বলে চলল, ভেবেছো ঠকাবে আমাকে? আসল কথা কি জানো, আমি স্মৃতি থেকে আঁকতে জানি। আচ্ছা এই দেখো, সেদিনেব ডিনাবেব প্রবীব সাণ্ডেলেব টাকটা ঠিক এঁকেছি কিনা?

মিত্রাকে শান্ত বাখাব জন্যই যেন এবটা স্কেচ বাব কবে মিত্রাব হাতে দিল শান্তনু। কাগজে তখনই আবাব পেনসিল ছোঁযাল সে।

কেমন হযেছে কিনা টাকটা' দেখো, ভালো কবে দেখো। আসলে কিন্তু লোকটাকে আমাব ভালো লেগেছে। যাই বলো আমাদেব সেই ছবিটা সম্বন্ধে ভদ্রলোকেব খুব আগ্রহ। আব পোশাকও নিশ্চয লক্ষ্য কবেছো। সেকালেব ক্রিশ্চান সন্ন্যাসীদেব মতো। আচ্ছা ভদ্রলোক কি সন্ন্যাসী, না ক্রিশ্চান পাদবী?

প্রবীব সাণ্ডেলেব স্কেচটা দেখল মিত্রা। এটা যদি স্মৃতি থেকে এঁকে থাকে, সেটাই সম্ভব, শান্তনু তা হলে কত নিবিষ্টভাবেই না দেখে। এটা যে প্রবীব সাণ্ডেলেব সুন্দব ক্যাবিকেচাব তাতে সন্দেহ নেই।

কিংবা এইটে দেখো। এই বলে শান্তনু হাতেব কাগজটা এগিযে দিল মিত্রাকে।

কেমন, যে চুলেব স্টাইলটা বিদায কবেছো আজ স্নানেব সমযে, এটা তাব তুলনায কেমন হবে? কপাল, ভ্রু, ঠোঁট সবই তোমাব, শুধু চুলটা নয। ওটাই নতুন, তাই নয?

খুশীতে হাসল শান্তনু। তা ছাড়া তোমাকে খুব সুখী দেখাচ্ছে এখন জানো। ববং একটা সিগাবেট নাও।

সিগাবেট ধবাল শান্তনু। সিগাবেট ধবানোব পবে মিত্রাকে কথা বলতে দিতে যতটুকু সময লাগে ততটুকু অপেক্ষা কবে শান্তনু বলল, আসল কথা কী জানো, ববং চলো ড্রাই মার্টিনিব কাছে, ছবিটাকে একেবাবে একা বেখে আসা হয নি?

না, না, ছবিব বাজ্যে তোব ছবিটা সঙ্গহীন হবে কেন?

তা হলে চলো তোমাব স্টাডিতে। তোমাব হেযাবড্রেসাব সেই ডবোথি তবমুজওযালীব কথা

পড়ে শোনাবে। তার স্কেচটা আঁকা যায় কি না তার ফটো থেকে দেখা যাক।

হেস্টিংস ম্যানশনের দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতেই শব্দটা এল। ঠুং ঠুং করে কেউ যেন কাজ করছে। আন্দাজে বোঝা যায় শব্দটা শান্তনুর স্টুডিও থেকে আসছে।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি নাকি?

না। ফ্রেম বাঁধাইওয়ালা।

মিত্রা এখনই আজ লিখতে বসছে না ধরে নেয়া যায়। শান্তনু বলল, এসো দেখি কী হচ্ছে।

তেমন কিছু অবশ্যই সেখানে হচ্ছে না। একজন বুড়ো কাঠের মিস্ত্রি একটা মস্ত ক্যানভাসকে, প্রায় নফুট-বাই-চারফুট হবে, কাঠের ফ্রেমে লাগাচ্ছে। ফলত স্টুডিওর মেঝে টুকরো কাঠের ও করাতের গুঁড়োয় নোংরা।

মিত্রা বলল, অতবড় ক্যানভাস।

শান্তনু বলল, ছবিটা বড় করবারই ইচ্ছা।

কী ছবি হবে তা কি ভেবেছিস?

কতকটা কতকটা। মিস্ত্রি, কাজ হলে ডেকো। আমরা পাশের ঘরে আছি।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে তারা মিত্রার স্টাডির দিকে চলল।

আসল কথা, দেখো, ছবিটার ফ্রেম যখন করিয়ে নিলাম, বুঝতেই পারছো, ফিগারগুলোর আকারটা আমার মনে আছে। প্রকৃতপক্ষে দুটো ছবি করা যায় এই মাপে। শায়িতা রতি দেবী কিংবা স্নানার্থিনী তিন কন্যা।

বটে? শায়িতা রতি দেবীর দুখানা বিশ্ববিখ্যাত ছবি আছে কিন্তু। আর স্নানার্থিনী কন্যা বা একত্রে কয়েকটি কন্যার মুখ যেন গগ্যাঁর ছবিতে আছে।

শান্তনু তার সিগারেটে জোরে জোরে টান দিল।

তুমি নিশ্চয় জানো। শায়িতা রতি দেবীর দুখানা ছবি প্রায় ক্ল্যাসিক মর্যাদা পায়। সেই গাউন পরা এবং গাউন ছাড়া ছবি দুখানা। আমি তার থেকে একেবারেই পৃথক কিছু করতে চাই না। চালাকি করে ডান দিকের ফিরানো মুখ বাঁ দিকেও আনতে চাই না। দেখো, আসল কথা এমন হতে পারে ছবিগুলোর আদি রং এখন, মানে আমাদের এই যুগে, আর নেই। কিংবা হয়তো আমি অন্য রকম রং দিতে চাই। আর গগ্যাঁর যে ছবি বলছো, তাও মনে আছে। কোন আধুনিক কবি যখন কবিতা লেখে তখন কি তার মনে অন্য কোন কবি উপস্থিত থাকে না। দেখো, গগ্যাঁর ছবির পলিনেশিয়ান আদলের বদলে এবং এশিয়ান আদল বসাবো। তাই নয়? হয়তো তিন কন্যার বদলে একই কন্যার তিন ভঙ্গী আঁকবো। আসল ছবি যেটা আমাকে টানছে, যদি এই কম্পোজিশনেই আঁকি লাইল্যাক, নীল এবং সিপিয়া এই রং তিনটিই থাকে চাই।

মিত্রার স্টাডিতে বসল তারা। ড্রাই মার্টিনি বলে হাসল মিত্রা। কিন্তু তার ভ্রূতে কি কিছু চিন্তার কাজল? অর্থাৎ যে কালো কোমলতা বাড়ায়?

কিন্তু তুই ভুল করতে চলেছিস যেন। মিত্রা বলল দুজনের গ্লাস ভরে নিয়ে। তার জন্য অবশ্য বেল বাজিয়ে প্যানট্রি থেকে ঝিকে ডেকে গ্লাস আনতে হল বাড়তি একটা।

কী ভুল বলো?

ওই কম্পোজিশন কিংবা শায়িতা ভিনাস একটা অনুকরণের ব্যাপার হবে না?

শান্তনু তার গ্লাসটা শেষ করল। গ্লাসের মদের বিন্দুগুলো যেন ফোঁটা ফোঁটা করে অনুভব করল। কিংবা সেটা তার চিন্তা-মন্থরতা।

নতুন করে সিগারেট ধরাল। তখন তখনই আবার সেটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে নিবিয়ে দিল। উঠে পায়চারি করল। মিত্রার বাঁদিকে বসেছিল। ঘুরে গিয়ে ডানদিকে বসল। যেন বা আলোর

পরিবর্তন হওয়াতে তাকে ফ্যাকাশে দেখাল।

মিত্রা জিজ্ঞাসা করল, শরীব খারাপ লাগছে না কি রে? না কি এই সিগারেটটা?

শান্তনু বলল, দেখ, আমি জানি শায়িতা রতি দেবীর ন্যুড ছবি আছে। আর তা বিশ্ববিখ্যাতও বটে। কিন্তু সেটাই যদি আমি আঁকতে চাই তার কারণ, আমি সেই মহান চিত্রীর সঙ্গে আমার পার্থক্য দেখাতে চাই। একই ছবি দুজনে আঁকলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয় না? তুমি বিশ্বাস করো, আমার চোখ আর সেই চিত্রীর চোখ পৃথক এটা প্রমাণ করাব দুঃসাহস হচ্ছে আমাব। জানো, সেই ছবিদুটোকে দেখে আমাব মনে হয়েছে রং যেন অন্য রকম করলে আরও ভালো হতো?

আচ্ছা তুই ববং এ্যালবামটা দেখ। যদি ডবোথির স্কেচটা করা যায়?

তা যাবে। তা যাবে। তুমি বলতে পারো, যদি বং মন থেকে তুলিতে না আসে তবে খুব মার খাবো, বিশ্রী রকমে হেরে যাবো। আমাব কালটাই সেই চিত্রীর কালের কাছে হেরে যাবে, কিন্তু তাই বলে আগেই হার মানতে বলো? কিংবা, আমি আজই মন স্থিব করছি না, এখনও কিছুদিন স্কেচ করবো। ন্যুড ভিনাস এবং ন্যুড স্নানার্থিনীদের অনেক সম্ভাব্য স্কেচ করবো। পলিনেশিয়ান ফিচার-মুখ চোখ নাক-ছাড়া স্নানার্থিনীদের তেমন কম্পোজিশন হয় কি না, সবই দেখতে হবে।

কিন্তু তুই যে যাবি আবার একজিবিশনে, তোর ক্যানভাস তো তখন তৈবি হবে না। তা ছাড়া আজ নতুন গাউনটা ট্রায়াল দিতে যেতে হবে।

ক্যানভাসওয়ালাকে আমি এখনই বিদায় কবে দিচ্ছি। বাকি কাজ কাল এসে কববে। আব গাউন, তোমার কি পুবনো গাউন নেই, প্রাইমা ডোনা?

তা বলে রোদ থাকতে এখনই তো বেবোন যায় না।

কী যে বলো, বরং বোদেই তো ভালো। বরং ছাতা নিয়ে চল। গাড়িতে খানিকটা দূব গিযে তারপব ময়দানেব গাছগুলোব নিচে নিচে জাণিকাটা বোদে হেঁটে হেঁটে গেলে ভালো হয না?

বেশ, প্যারাসল নিয়েই বোদে বেরোন যাবে। কিন্তু ঠিক এক ঘণ্টা আমাকে লিখতে দে। ততক্ষণ না হয় তোর ক্যানভাসওয়ালার কাজের তদাবক কর।

শান্তনু মিত্রার স্টাডি থেকে নিজেব স্টুডিওতে ফিরল। ক্যানভাসটার কথা তো তার মনেও ছিল। এক ঘণ্টা পবে বোদের ঝাঁজও কমবে। কিছুক্ষণ বসে সে ছুতোবেব কাজ দেখল। ছুতোর ফ্রেমটাকে জুড়ে পালিশ করছে।

কিন্তু অল্প বযেসেই চিত্রী হিসাবে প্রবীর সাণ্ডেলেব কাছে সমাদর পেলেই দুষ্টুমি করার মতো চঞ্চলতা চলে গেছে বলা যায না। কিছু সময় শান্তনু এঘর ওঘর উপরে নিচে ঘুবে বেড়াল। তাবপর কী মনে করে মিত্রার ওয়াড্রোবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যেন সে মিত্রার হযে গাউন পছন্দ করার কাজটা শেষ করবে। যাতে মিত্রা সেই সুযোগে দেবি করতে না পাবে। এটা অবশ্যই স্টেট একজিবিশনে ছবি পাঠিয়ে যে উত্তেজনা তার ফলই হবে। হলুদ সিল্কেব একটা গাউন যেন তাব পছন্দ হল। গাউনটা নিয়ে মিত্রার স্টাডিতে পৌঁছে দেবে এরকম মনোভাব নিযে চলতে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে মিত্রাব ছাতাগুলোকে দেখতে পেল। কমলালেবুর রঙের একটা ছাতাও নিল সে পছন্দ করে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই তার মাথায় দুষ্টুমি খেলল যেন। মিত্রার স্টাডিতে না গিয়ে নিজের স্টুডিওতে ঢুকল। তাড়াতাড়ি শুকোয় এমন একটা সাদা রং নিয়ে ছাতটার কাপড়ে সে নক্সা কাটতে বসল। লম্বা লম্বা টানে যেন জাপানী অক্ষরে লেখা হচ্ছে। ছাতাটাকে চিত্র-বিচিত্র করা শেষ হলে সে আপন মনে বলল, আচ্ছা, ও আচ্ছা। হ্যাঙ্গার সমেতই গাউনটাকে এনেছিল, ঝুলিয়েও দিয়েছিল। নইলে ভাঁজ পড়ে যেতে পারে। তুলি নিয়ে এবার সে গাউনটাতেও দাগ টেনে দিতে লাগল। রঙের দাগের এই এক কৌতুক, তার সংখ্যায় একাধিক হলেই নিজেবাই যেন চলতে পারে। এক ঘণ্টার অনেকটাই কেটে গেল শান্তনুব। বরং বেশি। কেননা মিত্রাই এল।

বলল, আমি ভাবলাম তোর পোশাক পরা হয়ে গিয়েছে।

শান্তনু বলল, আমার পোশাক না পরলেও চলবে। তোমার পোশাক নিয়ে বসে আছি। এই গাউনটা পরে এসো।

গাউনটার হাত বলতে কিছু নেই গলার দিকেও অনেকটা দুঃসাহসী তা হলেও একটু সাদামাটাই, বরং ফ্যাশনের হিসাবে বছর পাঁচেকের পুরনো। সেজন্যই যেন মিত্রা এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ব্যবহার করে। আর এখনও যেন সেজন্যই রাজি হল। মিত্রা কি একেবারে বেশি আধুনিক কিছু পরতে আপত্তি করতো শান্তনুর সঙ্গে বেরোতে?

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ঝি এসে শান্তনুকে খবর দিল মিত্রা তাকে ডাকছে।

শান্তনুর মনে হল মিত্রা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছে। ড্রেসিং টেবলের আয়নায় তার মুখটা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

এটা কী করেছিস?

কোনটা? ও গাউনটা?

হ্যাঁ। মিত্রা হেসে উঠল। পাগল আর কাকে বলে?

পাগল? মানে নিজের আয়নায় দেখে যেমন হাসছ লোকে তেমন হাসবে তোমাকে দেখে? দাঁড়াও দেখে নি। আচ্ছা তুমি পোশাক পরার আয়নাটার সামনে যাও, সোজা দাঁড়াও। গাউনের পুরোটা তোমার চোখে পড়ুক, সাদা সোয়েডের পাম্প পরো আর সাদা ব্যাগ নাও হাতে।

তাই বলে এটা পরে বেরোন যায়? তুই কি সত্যি ভেবেছিলি?

বেশ বাজি ধরো। মনে করো ট্যাক্সি ড্রাইভার। তার ভ্রূ যদি কোচকায় তা হলে গেট থেকে ফিরে তুমি গাউনের বদলে না হয় শাড়ি পরো। কিংবা মনে করো তোমার ঝি তাকে ডাকো। সে মুচকি মুচকি হাসে কিনা দেখো, অথবা আমার ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বল। দেখো, সে ভয় পেয়ে প্যারাসলের কেউ মনে করে রাম নাম করে কিনা।

একটু থেমে আবার বলল শান্তনু, আচ্ছা বসো, প্যারাসলটা আনি। এই বলে সে স্টুডিওতে সেই ছবি আঁকা ছাতাটাকে আনতে গেল।

আর এই অবসরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিত্রা ঠিক করল, মন্দ হয় না যদি সে গাউনটা পরেই যায়। শান্তনুর মতো ছেলেমানুষ হয়, কিন্তু ফ্যান্সিড্রেস বলেও আবহাওয়াও যেন। বরং জুয়েল বক্স থেকে পছন্দ করে অ্যাম্বারের মালা বের করে আয়নার সামনে গলায় ধরে দেখল মেলে কি না সেটা এই পোশাকে।

শান্তনু ফিরে এসে বলল, বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো মনটা।

মিত্রা হেসে বলল, এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না।

ফ্যান্সিড্রেসের তরঙ্গ তা কি দেখা দিল মিত্রার মনে।

রূপসী পাঠিকা, আপনার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে মিত্রার ঝি এবং শান্তনুর ছুতোর তাদের দেখেছিল কি না। শান্তনুর ছুতোর চীনা। সে সহিষ্ণু, এবং সে জানে মনের ভাব মুখের কথায় বলা দূরে থাক, মুখের পেশী নড়া চড়াতেও প্রকাশ করা বিপজ্জনক। কারণ তুমি কি বলতে পারো কোন মনোভাবটা ঠিক স্বদেশের পার্টিলাইনের? ঝি দরজার কাছে ডান হাতটা পেটের আড়াআড়ি, বাঁ হাত ডান হাতের উপরে লম্বের মতো এমন করে রেখেছে যাতে বাঁ হাতের মুঠি বাঁ গাল স্পর্শ করে। এই ভঙ্গিতেই সে দাঁড়ায়। সদর দরজার কাছে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কলকেতার ক্যাবি (যদিও এখনও ট্যাক্সিকে ক্যাব বলা গেল না) অনেক-দেখা লোক। তার ঝোপরা ভ্রূর নিচে চোখের কোণের কোঁচকানি দেখে কি তার মত জানা যায়? সে দরজা খুলে দিল, মিত্রা এবং শান্তনু উঠলে দরজা বন্ধ করল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিত্রার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল কোথায় যেতে হবে। সাধারণত

ক্যাবিবা এবকম কবে না। সওযাবি উঠলে স্টার্ট দিযে ঘাড ঘুবিযে বিডবিড কবে, তাতেই সওযাবি বলে দেয গন্তব্যেব ঠিকানা।

শান্তনু বলল, আমবা পুবনো টার্ফক্লাব ছাডিযে এলাম।

মিত্রা বলল, এখান থেকে হাঁটবি বলছিস?

বেশ, গাছেব ফাঁকে ওই যে ঘোডাদুটো ওব কাছাকাছি ট্যাক্সি ছাডি। তুমি আন্দাজ কবো, মযদানটা পাব হলে গ্র্যাফিক একজিবিশনেব বাডি।

ট্যাক্সি ছেডে দিযে মযদানটাকে, যাকে এখনও কেউ কেউ ব্রিগেডপ্যাবেড গ্রাউণ্ড বলে, আডাআডি পাব হতে লাগল তাবা। কোথাও ছেলেবা খেলছে, কোথাও ফিবিওযালা, কোথাও বা গাডিতে বসানো ফুচকা আব ঝাল চাটেব দোকান। কলকেতা আছে সেই কলকেতাতেই? মযদানটাকে পাব হতে অসুবিধাও নেই কাবণ সেকালেব সেই শহীদ মিনাব যাকে এখন পাযবাচাক বলা যায মৌচাকেব অনুকবণে, সেটাকে লক্ষ্য কবে চললেই হল। মিত্রা বোদেব জন্য প্যাবাসল খুলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে গাছেব জালিকাটা ছাযাও। সুতবাং প্যাবাসলটা ববং কাঁধেব উপবে।

খানিকটা দূব গিযে শান্তনু বলল, আমবা কি এখনই ছবি সম্বন্ধে আলাপ কবব?

ক্ষতি কী?

কিংবা।

কী কিংবা?

আমবা কি একজিবিশনেব স্টলে চা খাবো? অথবা পাশেব কোন হোটেলে?

মিত্রা হেসে বলল, কিংবা ওই গাডি দোকানেব কাছে চল। ফুচকা কিংবা মশলা বডা আছে কিনা দেখা যাক।

শান্তনু হো হো কবে হেসে উঠল। কিন্তু তখনই গম্ভীব হল।

ফুচকাব গাডি দোকানটাব পাশে দুজন সুবেশ যুবক।

শান্তনু বলল, কী মুস্কিল, আমবা একেবাবে কাছে এসে পডেছি। আব ওবা হযতো ডিটেকটিভ।

ডিটেকটিভ?

নইলে অমন চেহাবাব ফিটফাট দুজন যুবক অমন কবে ফুচকা খায?

ফুচকা খাওযাটা ছল? না, পোশাকটা ছদ্মবেশ? মিত্রা হেসে বলল, আমাব কি মনে হচ্ছে জানিস? এবা হযতো সাংবাদিক।

ফুচকা সংবাদ?

আবে না, না। ক্যালকাটা নোট বুক, মযদানেব কাছেই এমন সব ছবি আব নোটস বাব হয না কাগজে? বোধ হয তাই সংগ্রহ কবছে।

মযদানেব কাছেই তো একটা উপন্যাসেব নাম।

মিত্রা বিনবিন কবে হেসে উঠল।

কিন্তু সর্বত্র হাসিটা নিবাপদ নয।

মিত্রাব হাসি ডিটেকটিভপ্রতিম সাংবাদিক কিংবা সাংবাদিকবৎ ডিটেকটিভ দুজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবল।

একটু যেন আলাপ কবল তাবা গোপন পবামর্শ কবাব ভঙ্গিতে। ফ্যালফ্যাল কবে মিত্রা ও শান্তনুকে দেখতে লাগল। তাবপব পাযে পাযে তাদেব দিকে এগিযে এল।

খানিকটা দূব কোণাকুণি চলে তাবা মিত্রাবা যে পাযে পাযে চলা পথটা ধবেছিল, তাব কাছে ববং এগিযে এল।

একজন অতঃপব সাহস কবে বলল, ম্যাডাম্ শুনছেন?

মিত্রা দাঁড়াল। কাছে একটা শিশু বট। তার উপরে যথেষ্ট অত্যাচার হয় সুতরাং ডালপালা কম। একটা হাতটাক বেড়ের 'ব' আছে। ডাল থেকে ঝুলে পড়া কয়েকটা জটা। কাজেই জালিকাটা রোদই বরং। মিত্রার হঠাৎ থেমে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে তার হাতে, মুখে, প্যারাসলে জালিকাটা রোদ পড়েছে।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বলছেন?

কিছু যদি মনে না করেন, দীনস্বরে তাদের একজন বলল, আমরা ম্যাডামের একটা ছবি নিতে চাই।

ছবি? ছবি দিয়ে কী হবে? মিত্রা জিজ্ঞাসা করল মুখ উঁচু করে।

মানে ছবি, ছবিই, মানে—

শান্তনু তার পরনে শর্টস এবং হাতকাটা গেঞ্জি। পায়ের গোছা ও চওড়া কব্জি চোখে পড়ছে। সে ইংরেজি কায়দায় বলল, কাম, কাম।

কিন্তু তখনই বেশ স্পষ্ট ক্লিক শব্দ হল।

মিত্রার ভ্রূ কুঁচকে গেল কিন্তু কিছু বলার আগেই সেই সুবেশ যুবক দুজন ময়দানের আড়াআড়ি অত্যন্ত জোরে দৌড়তে শুরু করেছে।

শান্তনু বলল, ছবি নিয়েছে?

খুব সম্ভব। মিত্রা হাসল।

পালাল কেন?

তোকে পাঠানিযা মনে করেছে।

শান্তনু হো হো করে হেসে উঠল।

ময়দান পার হয়ে প্রাচীনকালে যেখানে মিউজিয়াম ছিল সেই বাড়িতেই একজিবিশন।

স্বভাবতই স্টেট একজিবিশনে ভিড হযে থাকে। আজ একটু বেশী ভিড় হওয়ারই কথা। সংস্কৃতিমন্ত্রী অলীক মুখুয্যে নিজে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে দ্বারোদ্ঘাটন করতে। অনুভব হচ্ছে দ্বারোদ্ঘাটনের ব্যাপারটা মিটে গেলেও একজিবিশনের কোথাও তিনি আছেন। কারণ প্লেন ড্রেসে সিকিউরিটি পুলিশরা ইতস্তত ঘুরছে।

এ অবস্থায় মিত্রা ও শান্তনুর পক্ষে সেক্রেটারীকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। অফিসের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে তারা বরং চায়ের খোঁজে চলল।

চায়ের স্টলের দিকেও ভিড়। সেখানে বরং বেশী। একদল ফিরছে চায়ের দোকান থেকে ছবির দিকে আর একদল যাচ্ছে ছবি দেখে চায়ের দোকানে।

অবশেষে তারা চায়ের স্টলে ঢুকল। কারণ তাদের এখন অভ্যাসমতো কিছু ক্ষিদেও পেয়েছে। ভাগ্যগুণে দূরে একটা টেবলও দেখতে পেল। যার চারটে চেয়ারের মধ্যে দুটো তখনও খালি। অন্য দুটোতে দুজন অল্পবয়স্ক মানুষ। যাদের দুজনের গলাতেই সবুজ রুমাল বাঁধা। যেন ভলান্টিয়ার।

কাউন্টার থেকে চা নিয়ে শান্তনু টেবলে ফিরল। চায়ের স্টলের গোলমাল উত্তেজনা কেন যেন তার কাছে প্রীতিপ্রদ মনে হল। বোধ হয় এই উত্তাল একজিবিশনে তার ছবি আছে বলেই।

কিন্তু কখনও কখনও মানুষ যা চায় তার চাইতেও বেশী পেয়ে যায়। ঘরের সব আলাপই, হয় ছবি না হয় অলীক মুখুয্যে অর্থাৎ সংস্কৃতিমন্ত্রী কী বলেছে, তা নিয়ে হচ্ছে। শান্তনু কি আশা করছিল তার ছবি নিয়েও এরা কথা বলুক?

নিমেষে তা শুরু হল আর তা তাদের টেবলেই!

গলায় রুমাল বাঁধা একজন বলল, কিন্তু মাইরি ছবি বটে ওই স্টাডি ইন ব্লু।

ভারি সুন্দর, কিন্তু উচিত ছিল সবুজ রং করা। নীল দিয়ে যদি আঁকা যায় সবুজ কী দোষ করল?

তা হলে আমাদেব সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে মিলতো।

শান্তনু উৎকর্ণ হল। মিত্রাও মুখ তুলল। গগলসের জন্য অবশ্য তার দৃষ্টি কোন দিকে বোঝা গেল না।

প্রথম রুমাল বলল, তা না হোক। না হোক সবুজ। একখানা মেয়েমানুষ বটে মাইরি। মোহিতদা বলছিল একটা মনস্তত্ত্বেব ব্যাপার।

শান্তনু অনুভব করল তার কিছু বলা দরকার। মিত্রা মুখ নামাল।

দ্বিতীয় রুমাল অন্য টেবিলের আর এক রুমালকে ডেকে চিৎকার ক'রে বলল, মোহিতদা, তুমি নাকি মনস্তত্ত্ব বলেছো?

কী বে? তৃতীয় রুমাল বলল অন্য টেবিল থেকে। সে বোধ হয় ভলান্টিয়ারদের মধ্যে বড়ো।

ওই সেই মেয়েমানুষেব ছবিটা।

হ্যাঁ। ডক্টর পাঁজাও তাই বলেছেন দেখে।

শান্তনু চায়ের কাপটা মুখ থেকে সরাল। কিন্তু মিত্রা গোপনে শান্তনুর হাতের পিঠে হাত বেখে তাকে নিরস্ত কবল।

প্রথম রুমাল বলল, যাই বলিস আর একবার দেখতে হবে রাতেব আলোতে বাসায় ফেরাব আগে। মাইরি সেকালের সোফিয়া লোরেনের ক্লান্তিতে বোতাম খুলে যাওয়া ব্লাউজই হোক, আব গীতা পাবকবেব দস্যুদের হাতে টানাটানিতে ছিঁড়ে যাওযা টি শার্টই হোক, এমন একখানা বুক দেখা যায না মাইবি।

কালো গগলস সত্ত্বেও মিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠল।

সেই ভাগ্য কখনও কখনও বিড়ম্বনার চেহারা নিয়ে আসে।

গাঁক গাঁক করে মাইক বেজে উঠল। মন্ত্রে যেন স্টলেব উৎসাহী মানুষগুলোর গলার স্বব নেমে এল। সংস্কৃতি মন্ত্রী দ্বারোদ্ঘাটনেব সময়ে যা বলেছে এখন প্রতি এক ঘণ্টা পব পর তাব বেকর্ড শোনানো হবে।

মাইক বলল · জনপ্রিয়, সহজ, বাস্তবধর্মী, জনগণের পক্ষে উপযুক্ত শিল্পকলাই আমাদেব এই সবুজবিপ্লবের দিনেব একমাত্র শিল্পকলা হতে পারে। যে সবুজবিপ্লব ইতিমধ্যে সমাজবাদেব দিকে ধেযে চলেছে। সুতরাং এই একজিবিশনে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফলস্বরূপ আপনাবা সবুজ ও সোনালি রঙেব প্রাচুর্য দেখতে পাবেন। বলা বাহুল্য তা শস্যক্ষেত্রেব সবুজ এবং ফসলের সোনা। দেখতে পাবেন, কৃষক দম্পতিদেব কালো মেটে রং কারণ তাবা মাটির কাছাকাছি আছে, তাদের উঠোনের হাঁসমুবগীব প্রাচুর্য। সেই সব হাঁসমুবগী সবুজ ও সোনালি বঙের মধ্যে ফুটে ওঠা লাল নীল খয়েরি নানা রঙের ফুলঝুরি। আমাদের বিরোধী পক্ষের মানুষদেরও আমরা আহ্বান করবো এই সংস্কৃতি উৎসবে, যদিও তাঁরা অ্যাসেমব্লিতে বিরোধীপক্ষ হওয়াব মতো ভোট পান নি।

মিত্রা আস্তে আস্তে বলল, চা খাওযা হয়েছে? বোধ হয় আমাদের বাড়ি যাওয়া উচিত।

শান্তনু তেমনি স্বর নিচু করে বলল, অন্য সময়ে এদিকে আসা যাবে, কী বলো।

রূপসী পাঠিকা, স্টেট গ্রাফিক একজিবিশন সুরু হওয়ার চার-পাঁচদিন পরেব এক বিকেলের কথা এখন বলতে পারি। এতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি নেই কেননা এটা তো রোজনামচা নয় মিত্রার। অবশ্য অন্য এক উপায়ে আমরা এই চার-পাঁচদিনের ফাঁকটাকে ভরে তুলতে পারি, প্রবীর সাণ্ডেল কিংবা বাজেনের খোঁজ খবব নিতে পারি আবার, কিংবা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বহির্গামী গাড়িগুলোতে যে ভিড় হচ্ছে তা লক্ষ্য করতে পারি। এখন ভিড় বাড়বে কারণ স্টেট গ্রাফিক একজিবিশনের আরম্ভ দেখে যাত্রা করা আর সেকালের কলকেতার ষষ্ঠীতিথিতে দুর্গোৎসবের বোধন দেখে যাত্রা

করার মধ্যে অন্তর্নির্হিত মিল আছে।

প্রবীরকে হঠাৎ একটা কাজের ভার নিতে হয়েছে। আমরা কারো কাছে না শুনলেও অনুমান করতে পারি, ব্যাপারটার মূলে বেলা সোম কোন এক পর্যায়ে জড়িত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একস্টেনশন লেকচার হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সম্বন্ধে। সেখানে প্রবীরকে বক্তৃতা দিতে হবে। ফলে প্রবীরকে স্বর্গীয় শরৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে সুরু করে সৈয়দ মুজতবা আলির যুগ পর্যন্ত পড়তে হচ্ছে বিশেষ মন দিয়ে। এবং প্রবীর কি সুখী? প্রবীরের মনোভাব বরং একটা প্রবন্ধ লেখার কাছাকাছি। যে প্রবন্ধের নাম হতে পারে অপ্রিয় মানসিক শ্রম। আজ সকালে সত্তর দশকের একজন শক্তিমান লেখককে অবলম্বন করেছিল সে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি যখন ফ্রয়েডের জন্ম শতবার্ষিকী পালন হচ্ছে তখন এই লেখক তাতে মোহিত হয়ে (প্রমাণ এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ) গল্প লিখতে শুরু করেন। তার একটা গল্পের নমুনা প্রবীর পড়েছে। রামবাবু তার মেয়েকে আপাতদৃষ্টিতে অন্য সব পিতার মতো ভালোবাসেন, একটু হয়তো বেশি আদর করেন। মেয়ের মাসীমা এসে মেয়ের মাকে আভাসে ইঙ্গিতে নয় প্রায় বৈজ্ঞানিক শব্দে বুঝিয়ে দিল পিতার মনে অন্য কিছু আছে। তারপরে এক রাতে মেয়ের ঘরে কান্নার শব্দ। মা দৌড়ে গেলেন এবং পিতাকে তিরস্কার করলেন। না ঠিক ইনসেস্ট নয়। ধোঁযাটে ভাব। হো হো করে হেসে উঠে প্রবীর গ্রন্থখানিকে (গল্প-সংগ্রহ) কাঠের বাক্সটায় ফেলে দিল, যে বাক্সে প্যাক করে এমন সব অমূল্য গ্রন্থরাজি পাঠিয়েছে তার বইয়ের দোকানদার। অবশেষে ঈজিপসিয়ান তরমুজ-পোলাও নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে। তরমুজ কাটো তার মধ্যে সুসিদ্ধ সুপক্ক সুঘ্রাণ বিরিয়ানি। প্রবীর সিগারেট ধরাল আবার , অ্যাশট্রেতে যে একটা জ্বলছে তা ভুলে গিয়ে। হ্যাঁ, সেই বিরিয়ানির একটা আরবী নামও আছে। কেয়াবাৎ! সুরথ কাছে থাকলে চুরুটধরা মাথা বাঁকিয়ে বলতো, কেমন কি না। প্রবীর ভাবল, খাদ্যাভাব হয়েছিল নাকি গোটা দেশের তখন? না, না, এমন করলে তার লেকচারের নোটস তৈরি হবে না। বরং এক ভিখারী নারীকে এক ভিখারী পিঠে করে নিয়ে গেল, যেমন নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিতো বলে ধারণা, যদিও প্রমাণ নেই যে রমণীরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মতো প্রেমিকা ছিল। প্রবীর চশমা খুলল। তার ইচ্ছা হল বেলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে কল্যাণীর কর্তৃপক্ষকে সে কোন সূত্রে এমন একটা ব্যাপারে রাজি করাল।

রাজেন টেলিফোনটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে ডেস্কে বসে কলমের ডগায় দৃষ্টি স্থির করল। এতক্ষণ সে প্রচুর হাসছিল। তার হাসির কারণ কি মাধবী? এই প্রশ্ন, পৃথিবীখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে কে কে হাসতেন?

টেলিফোনটা সমবার্ষিক সুতরাং টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর মুখ করতে হল রাজেনকে। যেন সে টেলিফোনের পাশে অপেক্ষারত অন্য লোকটিকে বলবে, আমি দুঃখিত।

কিন্তু টেলিফোন থেকে নিজের ঘরে আসার মধ্যে যে সময় এবং স্থানের ব্যবধান সেটুকু একটা অনুভূতিতে ভরে উঠেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করলে এই রকম হয় . আচ্ছা, রাজেন, তুমি তো একজন রিসার্চকারী দর্শনছাত্র, এই প্রকাণ্ড ফুলের গোছাটাকে নিয়ে তুমি কী করতে পারো? আপনার মনে পড়বে, রূপসী পাঠিকা, এর আগেও রাজেনের এমন অনুভূতি হয়েছিল, যেদিন সে এবং মাধবী সুদেষ্টীতে কুস্তি দেখতে গিয়েছিল।

কলমের ডগায় দৃষ্টি স্থির করলেই মন স্থির হবে এমন কথা নয়। সে একটা ফীচার লিখছে মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে। ঠিক ঠিক যেমনটা সে চায় তা যেন হতে চাইছে না। সে নিজের মনকে বুঝতে পেরেছে। সত্তরের দশকে লেখা 'আবসাঁৎ' নামে প্রবীরের প্রবন্ধটা পড়ার ফল ভালো হয় নি। ওটা এমন একটা আদর্শ যাকে ধরা যাবে না, অথচ সব সময়েই মনে পড়ছে। ধরার চেষ্টা করেও লাভ

নেই। নকল কবা যায। প্রবীব হওয়া যায না। অনায়াসে বলবে প্রবীব, আমি মানুষ, মানুষেব কোন ব্যাপাবে আমি উদাসীন থাকি না। কিন্তু প্রায তৎক্ষণাৎ একটা হালকা মাপা পবিহাসপ্রিযতাব মধ্যে দূবে সবে যাওয়া।

একবাব, একবাবই মাত্র কেমন যেন ক্রুদ্ধ হযেছিল প্রবীব। সেই যেবাব সে ডীন সুইফটেব, নাকি গালিভার্স ট্রাভেলসেব তিনশ বাহান্নতম কিংবা তেমন খুচবো একটা জন্মতিথি পালন কবেছিল। 'এমপিবিক্যাল বিজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে সে লিখেছিল, আমাদেব জানা উচিত, অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সত্য আমবা আগে কাজে লাগাই পবে তাব তত্ত্ব বিচাব কবি। বাইবেলেব সডম অঞ্চলে সেটা পবিবাব পবিকল্পনাব ব্যবস্থাই ছিল যদিও তা মাবি স্টোপ জন্মাবাব অনেক আগে। 'সহানুভূতি' নামক প্রবন্ধে সে প্রশ্ন তুলেছিল যুদ্ধে যেখানে মানুষ মাবাব জন্য ও মবাব জন্য প্রস্তুত, সেখানে গ্যাস ব্যবহাব কবলে এক বছবেব যুদ্ধে এক কোটি লোক মবতে পাবে , কিন্তু যেখানে মানুষ জীবনবসে অভিসিঞ্চিত, এক কোমল স্নিগ্ধ অন্ধকাবে যখন তাব কোষগুলি জীবনেব আশ্বাসে নিমগ্ন, তখন তাব সেই অন্ধকাবে একটা মাত্র তীক্ষ্ণধাব, স্টেবিলাইজড ও ডাক্তাব প্রেবিত ইস্পাত প্রবেশ কবায যে মৃত্যু ঘটবে, তা বছবে পৃথিবীতে দশ লক্ষ ছাড়িযে যাবে, এবং দশ বছবে এ মৃত্যুব সংখ্যাও এক কোটি হবে, (যুদ্ধ দশ বছব পব পব হতে পাবে যদি ধবে 'নই) সে মৃত্যু কি আমাদেব সহানুভূতি বেশী আকর্ষণ কবতে পাবে? তা কবলেই বা। যুদ্ধটা ববং লাভজনক। কাবণ দুই মৃত্যু যদি আমাদেব সহানুভূতি সমান আকর্ষণ কবেও, যুদ্ধ এবং যুদ্ধেব প্রস্তুতি ছাড়া আমাদেব ইণ্ডাস্ট্রিব আব কী থাকছে এখন, যখন আফ্রিকা, সাউথ আমেবিকা এবং এশিযাতে আব আমেবিকান বা ইউবোপীযান ভোগ্যপণ্যেব বাজাব নেই? এমন কি কেনিযাতে মোটবকাব এবং সেনেগালে যখন এবোপ্লেন তৈবি হচ্ছে।

কিন্তু এগুলি তাব সেই বিখ্যাত কিন্তু 'বিনীত প্রস্তাব' যাতে সে পঞ্চাশতম জন্মদিনে প্রচুব প্রচুব ব্যাবিটুবেটস্, সন্দেশ, ফুল এবং সঙ্গীতেব মধ্যে পিতামাতাব প্রতি শেষ কর্তব্য পালন কবতে আহ্বান কবেছিল, (আহা, পিতামাতাব কী সুন্দব ঘুম, আহা, 'সম্মুখে শান্তি পাবাবাব' কিংবা 'প্রভু, কাছে আবও কাছে' বাজছে তখন বালিশেব নিচে বাখা ক্ষুদে বেডিওতে, এবং আহা লোক সংখ্যাও কমছে) সেই প্রস্তাব ছাড়া সর্বত্রই যেন সে একই সঙ্গে বলছে, আমি মানুষ, মানুষেব কোন ব্যাপাবেই আমি উদাসীন থাকি না, এবং ডাজ এনিথিং বিএয্যালি ম্যাটাব? কিছুতে কি সত্যিই কিছু যায আসে?

কিন্তু তাব নিজেব ফীচাবেব কথাই ভাবা উচিৎ। এই ফীচাবেব জন্য ভূদেব সমাদ্দাব অর্থব্যয কবছে।

বাজেন লিখতে শুরু কবেছিল এই বলে যে বেশ কিছুদিন আগে এক ইনটেলেকচুযাল গল্প লেখক বলেছিলেন ভাবতীয সাধুসন্তদেব যে অন্য জাগতিক প্রত্যয, যে ঈশ্বব অনুভূতি তা গাঁজা থেকেই আসতে পাবে। (আলডুস হাক্সলি নাকি—ঠিক মনে কবতে পাবছি না) গাঁজাব ধোঁযা মানুষকে অধিবাস্তবে সত্যে বিশ্বাস এনে দিতে পাবে।

বাজেনেব মুখ হাসি-হাসি দেখাল। হিপিবা অধিবাস্তব অনুভূতিব জন্য নানা মাদক ব্যবহাব কবছে বটে। এটা কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয? একটা তথ্যকে জেনে সেটাকে কাজে লাগানো। যেমন ধবো, জানা গেল, জনসাধাবণেব স্মৃতিশক্তি অতি ক্ষীণ। এটা আবিষ্কাব হলে সেই তত্ত্বকে কাজে লাগিযে একই বিপ্লবেব ইতিহাস তিনবাব লেখানো। বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ আধুনিক, কিংবা বলা যায, আমাদেব কালেব উপযুক্ত, মনোভঙ্গীব আবও উদাহবণ দেযা যেতে পাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক মদ খেতেন সুতবাং লিখতে বসাব আগেই মদ খেযে নেযা হযে থাকে, কেননা দেখা গেছে মদ লজিক্যাল চিন্তাব সিঁড়িগুলোকে মুছে দিতে পাবে , আব উপন্যাস কি উপন্যাস যদি তাতে লজিক্যাল চিন্তা থাকে? যেমন অভিনেতা অভিনেত্রীদেব ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ বকমে উদাব হবে অর্থাৎ সকালে পূর্ববাগ, দুপুবে বিবাহ এবং ভোব বাতে ডিভোর্স, কেননা এবকম আবিষ্কাব

হয়েছে সব চাইতে বেশি আধুনিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেব সব চাইতে বড় সংখ্যা যেখানে পাওয়া যায়, সেই হলিউডে দেখা গিয়েছে ভালো অভিনয় (দর্শকদেব ভোটে) আর এই প্রণয়কাহিনী ওতপ্রোত জড়িত।

একটা সিগারেট ধরাল রাজেন। চিন্তাকে ধারালো করবে? আচ্ছা, ও আচ্ছা। রাজেন হাসল। সিগারেটে কি চিন্তা ধারালো হয়? ব্লাড প্রেশার কমে, বলেছিল মিলিটারি অ্যাকাডেমির অমল। তা হলে? এটা কি একটা রিচুয়াল? যেমন সে কালেব রাজনৈতিকদের চরকা কাটা, যেমন সেকালের মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেয়া, যেমন সেকালের বিপ্লবীদেব কবর দিন, কবর দিন বলে চিৎকাব করা? কিংবা এই একালের লোকদেব শরৎকালে ছবির একজিবিশনে ভিড় কবা এবং হাওড়ায় ভিড় করে দেশভ্রমণে বার হওয়া? রিচুয়াল বিষয়টা কিন্তু বেশ কৌতুকের। যেমন ধরো, সেকালের বিয়েতে পুরুষের হাতে নারীর হাত রেখে মন্ত্র পড়া হতো। বেশ একটা নাটকীয় ভাব, কিছু কিছু রূপও ছিল তার, কিন্তু মূলত তা কী? হাতে হাত রেখে মন্ত্র পড়লেই কি হৃদয় এক হতো? কিন্তু তেমনটা না হলে মন ভরতো না।

তেমন, তুমি কি বলবে, গীতা পাবকরেব মারিউয়ানা সিগারেট খাওয়া। না খেলে কি সিনেমায় অভিনয় ভালো হবে না? কিম্বা সেকালেব রাজনৈতিকের চবকা কাটার মতো একালের সিনেমা অভিনেত্রীদেব মাদকসেবা তাদের আর্টের অঙ্গ হিসাবে দেখা দেবে?

আ, রাজেন, বিচুয়ালটা কী রকম ব্যাপার দেখো। তোমাব এই সিগাবেটটা কি বিচুয়াল নয়? এখন আর চিন্তা নয, শুধু অনুভূতিও তোমাকে প্রায় অন্ধের মতো সিগাবেটের দিকে ঠেলে দেয। তোমার স্নায়ু ইত্যাদি নিঃশব্দে তোমার আঙুল, ঠোঁট, গলাকে কাজে লাগায় এই সিগারেটেব ব্যাপাবে?

নতুন—কী নতুবা? মনে করা যাক, নিরঞ্জন ঘোষালের মতো একজন পরিকল্পনা-গাণিতিক, একজন বড়জাতের টেকনোক্র্যাট, তাকে বিচুয়ালসর্বস্ব ফোরম্যান মনে কবার বোধ হয যুক্তি নেই। সে কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাব ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিচার কবে নি? এটা নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায তাব একজন ব্যক্তিগত সাইকাইআট্রিস্ট আছে যে মাঝে মাঝে তার মনকে দেখে দেয। ব্যক্তিগতই বা দরকার কী? এই সব টেকনোক্র্যাটদের কাছে স্টেট মেন্টাল ক্লিনিকেব নামকরা কর্তারাই তো ব্যক্তিগত হযে দাঁড়ায়। হয়তো এমন একজন সাইকাইআট্রিস্ট নিবঞ্জনের মনোবিকলন করে (যেমন একজন সাধারণ ডাক্তার বলতে পাবে, ও কিছু নয, কয়েকটা আল্ট্রাজিন, আব কয়েকটা ট্রেটাসাইক্লিন, এতেই ঠিক হয়ে যাবে।) বলেছিল, মিস্টার ঘোষাল, এটা কিছু নয, লেস দ্যান নাথিং, আপনার মতো একজন গাণিতিকেব পক্ষে, শাড়ি ব্লাউজের পুঁটুলি, তা সে যতো স্ট্রিমলাইনড এবং সুন্দর হোক, চুড়ি-চুড় বাজানো, ম্যাস্কারা করা মহিলা মানায় না। বরং হ্যাঁ, কথাটা তাই, অবসর বিনোদনের জন্য আপনার একজন এমন সঙ্গী দরকার যাকে গ্ল্যামার বয় বলা যায়।

এই নির্ণয়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল নাকি নিরঞ্জন? ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব-সমেত দর্শনের ছাত্র আমাদের কলকেতায় কি করে সাইকাইআট্রিস্টদের প্রাদুর্ভাব হল, সে বিষযে নিশ্চয়ই জানে। সাইকাইআট্রিস্টরা ডাক্তারদের মতো মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য, এ জন্যই আসতো কলকেতায়। যেমন ইলেকট্রিসিটি ও সোস্যালিজম চিন্তা কলকেতায় আসার এক বিশেষ কারণ আছে। কলকেতা সংস্কৃতি সমন্বয়ের পীঠস্থান। সাহেবরা চলে যাওয়ার পর আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন মর্মরমূর্তিগুলোকে সরাচ্ছিল ঠিক তখনই আমরা ওদের চলন-বলন, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি অধিকার করতে থাকি। তারপর ধর্ম, ধর্ম ছাড়া সংস্কৃতি হয় না। সেকালের ব্রাহ্মরা যেমন উদাব সমন্বয়ের দৃষ্টিতে ইংলিশ চার্চ থেকে কিছু কিছু রিচুয়াল সংগ্রহ করেছিলেন, একালের আমরাও তেমন ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের কনফেশন পাপস্বীকারকে গ্রহণ করেছি। সাইকাইআট্রিস্টরাই সেকুলার ফাদার। আর এতে দোষ নেই। এমন কি ধর্মজঞ্জালমুক্ত সোভিয়েট দেশেই তো কনফেশন ঐতিহাসিক সত্য। কে

সেখানে কনফেশন করে পাপ মুক্ত হয় না? এমন কি দেখো ক্রিশ্চিয়ানদের পেনান্স, এমন কি নিজেকে চাবকে দেহবোধকে শাসনে রাখার ধারা সোভিয়েট দেশের শ্রমশিবিরগুলোতে বেশ ভালোভাবেই মানা হয। কাজেই কলকেতায় সাইকাইআট্রিস্টরা সংখ্যায় কিছু বেশি। এবং তারা বিশিষ্ট, তারা শুধু অতীতের ভুলভ্রান্তি দেখে দেয় না , তুমি তোমার মনে কোন কামনাকে দমিত করছো, করে অসুখী হচ্ছো, তাও বলে দেয়। তাতে তোমার কামনাকে আর গোপন করতে হয় না, দমন করতে হয় না। তোমার যদি ক্লেপ্টোম্যানিয়া থাকে, তাহলে তা জেনে তুমি দোকান থেকে ছোট ছোট অল্প দামের জিনিস সরিয়ে নিজের মনের সঙ্গে সন্ধির অবস্থায় পৌঁছতে পারো।

অন্যদিকে দেখো, নিরঞ্জন ঘোষাল সম্বন্ধে এই থিয়োরিটা গ্রহণ করলেও তোমাকে রিচ্যুয়াল থিয়োরি বাদ দিতে হয না। কেননা দেখো, যে কোন রিচুয়্যাল ব্যক্তির প্রয়োজন থেকে শুরু। কোন একজন রাজনৈতিক নিজের প্রয়োজনে চরকা কাটতে পারে। পরে যূথ যখন তাকে অনুকরণ করে তখন হয তা রিচ্যুয়াল। কোন একজন লেখক নিজের মনের গঠনের ফলে হযতো সমকামী, তাকে অনুকরণ করে শিল্পী সাহিত্যিক এবং তা থেকে সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত মানুষদের মধ্যে সমকামিতার রিচ্যুয়াল দেখা দিতে পারে।

কিন্তু অনেক কথা সে ভাবছে বটে, আসল কথা এই যে প্রবীরের মতো হেসে (এমন কি তা হাসিও নয, যেন বা শুধু তার টাকে আলো পড়েছে মনে হয) সরে যেতে পারছে না।

রাজেন উঠল। আবার টেলিফোনের ঘরে ফিরল। মাধবীকে পেতেই জিজ্ঞাসা করল মাধবীর ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক আছে কিনা।

মাধবী বলল, না। (মহিলাদের বেলায সাইকাইআট্রিস্ট না বলে নরম করে মনস্তাত্ত্বিক বলাই আধুনিক রীতি।

কিছু মনে করো না, তোমার সেই অতীত পুরুষ মিস্টার ঘোষালের কি ব্যক্তিগত একজন ছিল?

নিশ্চয। বড়বাজারের কাপুড়েপট্টিতে বানিশের দোকানের মধ্যে দিয়ে সেই নোংরা দোতলায় নিরোর সঙ্গে আমি অন্তত দুবার গিয়েছি। প্রাইভেট মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে সেই সুচলো সবুজ দাড়ি নাকি সব চাইতে বড।

সুচলো সবুজ দাড়ি বলছো?

চেনো নাকি?

না।

কিন্তু একথা কেন? তুমি কি আমার মনটাকে দেখিয়ে নিতে বলো?

এখন থাক, এখন থাক। সে দরকার হয আমি তোমাকে আমার অধ্যাপকের কাছে নিয়ে যাবো। কেটে দিচ্ছি।

রাজেন নিজের ঘরে ফিরে ভাবল। আজ, অন্তত এবেলা, ফাঁচার লেখা হবে না। কারণ প্রবীর। কারো স্টাইলকে আদর্শস্থানীয মনে করার এটাই বিপদ।

কিন্তু সবুজ দাড়ি শুনে কি তোমার হাসি পেল?

রাজেন ভাবল হাসনাবাদ থেকে ক্যাটল ট্রেন আসতে দেখেছো বিধাননগরের সাইডিং-এ? ওয়াগনের দরজা খুলে দিতেই ষাঁড়-বকনাবাছুরের স্রোত এলিভেটর থেকে নামা সোনালি গমের স্রোতের মতো, বসন্তের ঝড়ে ওড়া কচিপাতা ও ফুলের উচ্ছ্বাসের মতো তা ছড়িয়ে পড়ে, যেন তা মুক্তধারা আনন্দহিল্লোল, যেন জঠর-অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের পর নিজেকে খুঁজে পাওয়া , দেখো তরুণ বৃষ ঊর্ধপুচ্ছ, যেন মাটিতে অল্প, আকাশে বেশি চলেছে , দেখো সুন্দরী সুদর্শনা বকনা, যার পালকগুলি চাঁপার কলির মতো হলুদ এবং অর্ধস্ফুট। তারপর তারা অনুসরণকারী মোটর জিপগুলোর চাপে আরও গতিশীল এবং চঞ্চল। বৃষটি যেন পথ দেখায় এবং বকনা তাকে অনুসরণ

কবে। তাবপব তাবা কি কবে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে ঢোকে, বড় দবজায় মহা সমাবোহ। হঠাৎ এক সময়ে বৃষটিব শিঙে যেন লতা আটকায়। তাব বিস্ময় কাটতে না কাটতে সে দেখে সে শিঙে ঝুলছে, মাটিতে পিছন পায়েব ক্ষুবও লাগছে না, একপাক ঘুবেও গেল সে, এবং কোথায় যেন ঝুলন্ত অবস্থায় পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে, দুপাক, তিনপাক, ত্রিশ গজ, একটা কী যেন গলায় জ্বালাব মতো চিবে দিল বিদ্যুতেব মতো, আব একপাক তাব বাঙে ধাবালো কিছু অনেকটা কেটে নিল। আব সেই বকনা যাব চামড়াব সৌবভ তাকে স্ফীতশিবা উর্ধ্বপুচ্ছ কবেছিল, পাশেব বাড়িতে এতক্ষণ তাব সেই চামড়া খোলা হয়ে গিয়েছে। এক ঘণ্টা পবে একই কনভেযব বেল্টে সুন্দব সুদৃশ্য ছবি ও স্লোগান ছাপানো টিনে টিনে কনর্ড বিফগুলো হাসতে হাসতে সেই বিধাননগব সাইডিংএব দিকেই চলেছে।

হ্যাঁ মৃত্যু। বলবে সুখ বৃথা? সুখ ছাড়া আব কী আছে যাকে অনুসবণ কবা যায় মৃত্যুকে অনিবার্য জেনে? সুখী হওযাব জন্য মানুষ যা কিছু কবে তাকে বৃথা জেনেও কি তাব সম্বন্ধে উদাসীন থাকা যায়? কযেক মুহূর্তেই কি আমাদেব দৌড় শেষ হযে যাবে না?

মৃত্যুব কথা মাধবীই বলেছিল। বাগেন জানে না কাব সে মৃত্যু যা মাধবীব মন থেকে মুছে যায় নি। (আমবা অবশ্যই জানি মাধবী তাব জননীব মৃত্যুব কথাই মনে বেখেছে।)

কিন্তু রূপসী পাঠিকা, আমবা স্টেট গ্রাফিক একজিবিশনেব দ্বাবোদ্ঘাটনেব পব চতুর্থদিনেব কথা বলতে শুব কবেছিলাম।

এখন বেলা সাড়ে দশটা হবে হেস্টিংস ম্যানশনে। মিত্রাব ম্যাসাজকবনেওযালী কিছুক্ষণ আগে বিদায় নিযেছে। গাযে হালকা বাথটাওযেল চাপিযে মিত্রা তাব প্রাইভেট চেম্বাবে। দুআঙুলেব ফাঁকে সিগাবেট। চোখে গগলস দেযা হযেছে, আলট্রাভাযোলেট বে ল্যাম্পটা জ্বালানো হয নি তখনও।

আসতে পাবি? এবকম ধবনেব অভ্যাস মতো কিছু বলে মিত্রাকে বে সেবনবতা দেখে শান্তনু ফিবে যাচ্ছিল। মিত্রা বলল, আয, ব্রেকফাস্ট হযেছে?

না হযে উপায় কী বলো? তোমাব পবিচাবিকা বাজাবে যাবে, আমি নিশ্চয় জানি বাজাবেই ওব প্রণযীব সঙ্গে দেখা হয, সেজন্যই তাড়াতাড়ি শোবাব ঘবেই ব্রেকফাস্ট পৌঁছে দিয়েছে।

শোবাব ঘবে? ঝি তো বলল তুই কাল তোব স্টুডিতে দবজা জানালা সব খুলে ঘুমিযেছিলি। সেই মস্তবড় ক্যানভাসটাব সামনে।

যা গবম।

আচ্ছা? আমি তো ভাবলাম ক্যানভাসে যে ছবি ফুটবে তাব জন্য ধ্যান কবছিলি কিংবা ওবে বোধ হয ধবনা দেযা বলে।

এ?

নইলে এই সেপ্টেম্ববে এখন অত গবম কোথায যে এযাবকুলাবেও শোবাব ঘব ঠাণ্ডা হয না।

তা দেখো মিথ্যে বলো নি। কাল বাতে বংগুলো যেন আঙুল বেযে পড়ছে, নখ দিযে বেবিযে আসবে এমন মনে হতে লাগল, লাইল্যাক, ব্লু, এমন সব বং।

তা খুব ঘুমিযেছিস ক্যানভাসেব সামনে। চোখ মুখ ফুলো ফুলো। মন ভালো আছে, শান্তি আছে, নইলে বাবব্যেটুবেটস ছাড়া এমন গভীব ঘুম হয না।

তা তুমি বলতে পাবো। আমি যে খুব সুখী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভেবে দেখ, কিছু দুঃখ থাকাই উচিত। একজিবিশনে ছবিটা যে খুব সমাদব পাবে তা তো মনে হয় না। অলীক মুখুয্যেব বক্তৃতাব বেকর্ডিং শুনেছিলি। তোব ছবিতে এতটুকু সবুজ বং নেই, মাটিব কাছাকাছি থাকা মেটে বংও নেই।

তা মিথ্যা বলো নি। তবে গলায় সবুজ স্কার্ফ বাঁধা ছেলেগুলোর উত্তেজনা দেখেছিলে?

একটু বিব্রত বোধ করল মিত্রা। ছেলেগুলোকে উচ্চ প্রশংসা যেন শুনতে পেল সে। কিন্তু তখনই বলল, ওটা কি ছবি বোঝার কথা হল?

তা না হোক। ওদের মনেও ছবিটা সবুজ না হলেও ধাক্কা দিয়েছে তো। ভালো কথা, তোমার হেয়ার ড্রেসার কি আজ আসবে?

প্রকৃতপক্ষে আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

আমি বলি কি, আচ্ছা রসো, আমি বরং টেলিফোন রিসিভারটা নিয়ে আসি। ওকে নিষেধ করো আসতে।

শান্তনু উঠে গিয়ে টেলিফোন রিসিভারটা নিযে এল, টেলিফোনের তার ঘবের দেয়ালের একটা প্লাগে ঢুকিয়ে দিল বগলের পোর্টফোলিও টেবলে রেখে। বলল শান্তনু, নম্বরটা বলো। নম্বর জেনে ডায়াল করে ওপারের সাড়া পেয়ে মিত্রার হাতে ফোন দিয়ে বলল, নিষেধ করে দাও, লক্ষ্মীটি, আমাব মনে একটা আইডিয়া এসেছে।

মিত্রা হেয়ারড্রেসাবকে আজ এসো না, পরে খবর দেবো, বলে শান্তনুকে বলল, কী ব্যাপাব? হঠাৎ! এর আগে বরং অন্য বকম বলেছিলি।

তা বলেছিলাম। কিন্তু এখন এই মাত্র আমার মনে হল, তোমার এই তামাটে চুলের এলোখোপা যা থেকে হর্সটেলের ভঙ্গিতে পুচ্ছ বেবিয়ে আছে —সেটা স্কেচ করাব মতো।

তাই বলে তুমি স্কেচ করতে বসো না। বরং ছবির কথা বলো। তোমার স্টাডি ইন ব্লু সম্বন্ধে তুমি কি আর চিন্তা করছো না?

দেখো, এখন আমার এই অবস্থা যে আমার সাদা ক্যানভাসটাই তাব রঙেব পিগমেন্টের নানা স্বপ্ন নিয়ে দেখা দিচ্ছে। স্বীকার কবছি, ও ছবিটা তেমন আর আমাকে টানছে না। বাহ্। রাখো দেখি তোমার ডান পাটা যেমন এখনই রেখেছিলে ওই টিপয়টার উপরে। আসল কথা সেই স্বপ্ন যেন শান্তি হয়ে ফিরছে মনে।

ও কী, কোথায় চললি?

দাঁড়াও। পেনসিল নেই। একটু এগিয়ে দাও পা-টাকে। টি-পয়ের ঢাকনি কুঁচকে যায় যাক।

আচ্ছা তুই ভেবে দেখ, এর আগে মানে তোর সেই প্যাশন অব ক্রাইস্ট ছবিটা যাকে প্রবীর সাগুেল অত প্রশংসা কবেছে, তার জন্য কিন্তু মডেল দরকার হয় নি।

কী যে বলো, কী যে বলো। পোর্টফোলিও থেকে কাগজ পেনসিল বাব করল শান্তনু।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। চিরদিনই কি এক রকম যায়? এখন যদি মডেল দরকার হয়? আসল কথা কী জানো। ছবি দুটো যার, কোনটি হবে এখনও মনস্থির করতে পারি নি, তার বিষয় তো ইতিমধ্যে বিশ্ববিখ্যাত। আমি কি তার নকল করবো? না, কী যে বলো, অর্থাৎ আমি সেই বিশ্ববিখ্যাত থিম নিয়েই তো আঁকবো। শুধু রং আর রংএর শেডে কোথায় তাদের সঙ্গে আমাকে যুগের পার্থক্য দেখাতে চাই, তাই নয়? সেটা তো আমার মৌলিকত্ব। আর ভাবো, তারাও তো মডেল ব্যবহার করেছে। আমি যদি সেই মডেলের ছবিকে মডেল না করে নতুন মডেল করি? সেটাও নতুন। জানো, পৃথিবীতে দুটো মানুষ কখনও এক নয়। দুজন মানুষের অনুপ্রেরণাও এক হতে পারে না।

ঠিক এমন সময়ে টেলিফোন বাজল।

আহা, কী বিপদ, বলে শান্তনু টেলিফোন ধরল, আর যদি ভেবে দেখো—হ্যাঁ, কে বলছো, ও! কথা তো ছিলই। কিন্তু জানো, এমন মাথা ধরেছে। বুঝতেই পারছো কাল ককটেইল একটু। এখন চোখ চাইতে পারছি না। আমার মনে আছে। বেশ তো রাত আটটায় যাচ্ছি। আশা করছি মাথা ছেড়ে যাবে। বেশ তো হিপোড্রোমে সেই নাচই দেখবো। ভালো নাচিয়ে এসেছে? আচ্ছা এখন

ছাড়ি ফোন। দেখি বিশ্রাম করে, সারে কি না।

ফোন রেখে ফিরল শান্তনু। কাগজ পেনসিল হাতে নিল। বলল, একি পা সরাও নি তো? না আমিই এগিয়ে বসেছি। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে এবার।

কে কথা বলল? গার্টুড? আজ বোধ হয় ব্রেকফাস্টের পর তোর যাওযার কথা ছিল ওর সঙ্গে।

তা ছিল।

এটা কি ভালো হল? গার্টুড তোকে ভালোবাসে।

নিশ্চয়। কী যে বলো, মডেল, কী যে বলো। আর, শোন, একটা কথা বলি, আজ বোধ হয় ডিনার আছে তোমার সংবাদপত্রসেবীদের বাৎসরিক ভোজসভায়। একটা কথা কিন্তু মনে রেখো, চুল তো এরকম থাকবেই। আর গাউনটা।

না, না। আর পাগলামি করিস নে। একবারই যথেষ্ট।

আর একটু। চঞ্চল কোর না পা-টাকে। কেন সেবার সেই গাউনটা পরে কী ক্ষতি হয়েছিল তোমার?

তাই বলে তুই কি আব কোন গাউন পরার কথা ভাবছিস নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম শাড়ি পরে যাবো।

গেলেই হলো কি না?

কেন হবে না। আর তা ছাড়া তুই কি অভিনেত্রীদের ড্রেসার হওয়ার অভ্যাস করছিস?

হো হো করে হেসে উঠল শান্তনু। মন্দ বলো নি, মন্দ বলো নি, ফাইটাব প্লেনের ডিজাইনার থেকে মহিলাদের ড্রেস ডিজাইনার। আহ্! আসলে এইবার, বেশ এইবারই শেষ। তুমি তো কত দুঃসাহসিক পোশাকে ব্যালে করেছো আর আমাব লাইল্যাক বংটা কী দোষ করল। তোমার নীল গাউনটাকে, আকাশী নীল যেটা, সেটায় আমি লাইল্যাক রঙে ছবি এঁকেছি।

ছি ছি।

এই দেখো। বেশ শেষ কথা, এইবাবই শেষ। আসলে তোমার চিবুকেব গড়নের সঙ্গে লাইল্যাকটা মানায় কি না দেখতে চাই। যদি ধরো সেই জলের এবং তিনকন্যার তিন ভঙ্গিকেই আঁকতে চাই। আসল কথা কোন ডিজাইনার কি তেমন প্রিন্ট উদ্ভাবন করতে পারে, নাকি, দোকানে তেমন প্রিন্ট উদ্ভাবন হয়, যেমন আমি তোমার কথা মনে রেখে নতুন কিছু আঁকতে পারি? আচ্ছা, হাঁটু অবধি হয়েছে। টাওয়েলটাকে একটু গুটিয়ে তোল। হয়েছে। কেউ কি ভেবেছিল তুমি এমন রিল্যাকসড মুডে থাকবে? রোজই তো ম্যাসাজওয়ালী আসে। তা ছাড়া চলো, আজ লাঞ্চের জন্য বেরিয়ে পড়ি। কোন একটা পাঁচতারা হোটেলে চলো।

হল তো। পা ধরে যাচ্ছে।

আর একটু। ওই মাসলের সুইপটাকে ধরতে দাও কাগজে। জানো আজ ঘুম থেকে উঠে মনে হল, এতদিন তো কাজন বলেছি, আজ থেকে তোমাকে দিদি বলবো। বেশ লাগবে দিদি বলতে। কেন আপন নয় ডাকটা। যেন একই রক্তের প্রবাহে, চেতনার স্রোতে বেঁচে থাকা। ধন্যবাদ।

স্কেচের কাগজটাকে পোর্টফোলিওতে পুরে সিগারেট ধরাল শান্তনু। উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ, এই এলোখোপায় এবং শাড়ি, মেটে লাল শাড়ি পরে আজ লাঞ্চে চলো। ভালো হয় নি ব্রেকফাস্ট। বেশ ক্ষিদে পাবে। আসল কথা কী জানো, লাইল্যাক গাউনটা পরে গেলে আজকের ডিনারে ওরা অবাক হয়ে যাবে। তুমি কোথা থেকে এলে তা বুঝতে পারবে? আমার চোখ দিয়ে নতুন তোমাকে যখন ধরে দেবো তখনও কি ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে ভেবেছো? লাঞ্চের দেরি, অনেক দেরি, কিন্তু চলো বেরিয়ে পড়ি।

যেন লাঞ্চের জন্য পোশাক পরতেই শান্তনু বেরিয়ে গেল।

মিত্রার মুখে একটা হাসি ফুটল যার অর্থ করা যায় না। অভ্যাসবশে চোখে হাত দিয়ে দেখল গগলসটা আছে কি না। তারপর আলট্রাভায়োলেট ল্যাম্পটা জ্বালাল। হ্যাঁ এদিক দিয়ে তাকে অর্থাৎ তার রুচিকে কিছুটা সাবেকি বলতে হবে। মাধবী ঘোষালেব জন্য যে ম্যাসাজ মেশিন কিনে দিয়েছিল নিরঞ্জন ঘোষাল, তার সঙ্গে মিত্রাব ম্যাসাজওয়ালীর তুলনা করুন। ম্যাসাজওয়ালী নিশ্চয় ট্রেনিংপ্রাপ্তা। এবং সে ট্রেনিংএব সুযোগ তাদেরই জোটে যাবা অন্তত ফিজিওলজিতে অনার্স গ্রাজুয়েট। তা হলেও এই ম্যাসাজওয়ালী নিশ্চযই মাধবীর ফ্ল্যাটের ম্যাসাজ-মেসিনের সমকক্ষ নয়। সে মেশিনের সিটে তুমি বসামাত্র অসংখ্য দাঁড়া, শুঁড়ো, হাতল (সবই অবশ্য ক্রোমিআম প্লেটেড স্টিলের কিন্তু যার নিউম্যাটিক প্যাডগুলোর স্পর্শ যেন শিশুব কোমল হাত) বেরিয়ে এসে তোমার শরীবটাকে আয়ত্বে নেবে, আব তোমার শরীরের বক্ররেখাগুলিকে বুঝে বুঝে নানা ধরনের চাপ দিতে থাকবে চাগ্ চাগ্ হুইর্, চাগ্ চাগ্ চাগ্, টিং, প্রভৃতি শব্দ, মৃদু শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে দোলাবে, মৃদু মৃদু ঝাঁকাবে, মাংসভাজার মেশিনের কায়দায় তোমাকে উল্টে নেবে। যে মেশিনের দাম দুখানা ভারতীয় জাগুয়ার গাড়ির চাইতে বেশি, যে মেশিনে উপবিষ্টা ম্যাসাজ-গ্রহণরতা মাধবীকে দেখে নিরঞ্জনের আনন্দের সীমা থাকতো না। এরকম একটা মেশিন মিত্রার পক্ষে কেনা খুব অসম্ভব নয়। কেনে না কেন, এই প্রশ্ন তুললেই তার মনের গঠনটাকে যেন খানিকটা বুঝতে পারা যায়। এই সাবেকি ব্যাপারে প্রীতি, অন্তত আধুনিককে গ্রহণ কবলেও অত্যাধুনিককে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে কী নাম দেখা যায? আমরা লক্ষ্য করেছি মাধবীর হাউসকীপার সুরঙ্গমারও এরকম একটা ঝোঁক আছে মনের, যার জন্য অত্যাধুনিককে গ্রহণ করার ব্যাপারে তাব মনে দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই সাবেকি প্রীতির ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যালেরিনা মিত্রার নিশ্চয়ই তেমন অর্থাভাব নেই যাব জন্য তাকে দ্বিধা করতে হবে, যেমন নাকি হাউসকীপাব সুরঙ্গমাকে করতে হয়। ম্যাসাজেব প্রয়োজন হলে, আর তা হয়ই, সুবঙ্গমা ববং ট্রাম কোম্পানির ডেন্টাল হসপিট্যাল সংলগ্ন ম্যাসাজ হলে যেতে পারে। তা হলে এই মনোভাব যাকে সাবেকি প্রীতি বলেছি যা নিবঞ্জন ঘোষালের মতো টেকনোক্র্যাট ও নানা প্রতিষ্ঠানেব ফোবম্যান শ্রেণীর, সুপারভাইজার শ্রেণীর মানুষদের দ্বিধায় ফেলে না, তাকে কি মিত্রার বেলায় আভিজাত্য এবং সুবঙ্গমার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত আদর্শবাদ বলবো?

এ ব্যাপারটা উল্লেখ করার এই এক যুক্তি আছে যে মিত্রার চিন্তা অস্পষ্টভাবে এরকম একটা অনুভূতিকে ভাষা দিতে চেষ্টা করছিল। অনুভূতিকে ভাষা কদাচিৎ ধরতে পারে। ভাষায় দাঁড় করালে তার চিন্তা কতকটা এরকম হয : এই হেস্টিংস ম্যানশন একটু সেকেলে। এবং তার সঙ্গে মানিয়ে এখানে যারা আছে এবং থাকে অর্থাৎ সে নিজে, শান্তনু ও শাশাঙ্কা একটু সেকেলে নাকি? এই তিনজনে একটা পারিবারিক বাঁধনের মতো কিছু আছে তাই নয়। সোসাইটিতে মিশলেও কোথাও যেন একটু পৃথক তাই নয়। এটা কি সুরঞ্জিতের স্মৃতিতে?

কিন্তু তখনই টেলিফোনটা আবার বাজল। মিত্রা সাড়া দিয়ে জানল তাকেই চাইছে, ওয়্যারলেস্ ফোনে ব্যাডেন ব্যাডেন থেকে।

কথা বলছে শাশাঙ্কা।

মিত্রা বলল, তুমি ওখানে কবে গেলে? জর্মানী নাকি?

তোমার ভূগোলটা প্রায় ঠিকই আছে। এখন, অন্তত এবার, ব্যাডেন ব্যাডেনেই সব চাইতে ভালো আবহাওয়া।

মিত্রা হেসে বলল, বেশ, বেশ এবার খবর কী বলো, শশী।

মিত্রা, তুমি কি আমার গত সপ্তাহের চিঠিটা পেয়েছো?

না। হয়তো এসেছে, আজকের ডাক দেখি নি।

জানো, মিত্রা, আজ দুপুরে কির্কেগার্দ চার্চে আমি বিয়ে করছি।

বিয়ে?

বিয়েই।

অ্যাঁ, ও, তা, উঁ, হ্যাঁ, তা আমাদের এই স্টেপফাদার সম্বন্ধে আগে থেকে তো কিছুই জানি না। কী রকম দেখতে, বয়স কতো, কী করেন? বাহ আমবা ইন্টারেস্টেড না হয়ে পারি!

তুমি তো হাসছো।

বাহ্ শশী, তোমার সেন্টিমেন্টাল হওয়া উচিত নয়। আমি তোমাকে অন্তত দশবার অভিনন্দন জানাচ্ছি, মাম : এটা তো আনন্দেব ব্যাপারই। বলো, তুমি যখন আমাদের নতুন স্টেপফাদার নিয়ে আসবে তখন আমরা যদি মুখ গম্ভীর করে সেরিমোনিয়াল পোশাক পরে দাঁড়াই, লক্ষ্মী মেয়ের মতো তা কি ভালো হবে? বরং হেসে, কথা বলে, নানাভাবে হৈ চৈ করে তাকে পরিবারের একজন করে নেয়া উচিত হবে না?

ধন্যবাদ, মিত্রা, ধন্যবাদ।

কিন্তু খবব দাও। কী করেন ভদ্রলোক, কত বয়েস, হবি কী, কী খেতে ভালোবাসেন ও দেখতে কী রকম, এসব বলো।

বছর ত্রিশেক বয়স হবে। তুমি ভেবো না ধনাঢ্য ও বিপত্নীক বলে বিয়ে করছি। বয়সে কিছু ছোট হল আমাব চাইতে। আমরা গালে গাল লাগিয়ে ফটো তুলেছি। সেটার কপি পাঠাব। তোমাব মতো আমাব বন্ধু কে? তোমাকে বলি, ব্লাডগ্রুপ টেস্ট প্রভৃতিও করিয়েছি. সাইকাইআট্রিস্টাকে দিয়েও কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে।

মিত্রা আবার হেসে ফেলল। আ, মাম, এ বয়সে, তোমার বয়স এবার বোধ হয় আটচল্লিশ হল, ব্লাডগ্রুপ টেস্ট করানো দরকাব ছিল না। ওটা দবকার ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলের জন্য।

কিন্তু, মিত্রা, সাইকাইআট্রিস্ট, মানে হ্যারল্ড, তোমাদের নতুন স্টেপফাদারের তাই নাম, হ্যারল্ডের নিজের সাইকাইআট্রিক রেকর্ড খুবই কাজে লেগেছে। তার জীবনের আনন্দের শান্তির সুখের জন্য আমার মতো, আমাব বয়সেবই বলতে পারো, স্ত্রীই দরকার ছিল। আচ্ছা, এখন ছাড়ি। তোমাকে ফটো পাঠাচ্ছি। যেটা গালে গাল লাগিয়ে তোলা হয়েছে তারই একটা কালার্ডপ্রিন্ট। (শাশাঙ্কা হাসতে হাসতে ফোন ছেড়ে দিল।)

মিত্রার স্বভাবতই ডাকের কথা মনে হল। ডিসিপ্লিন তাকে যেন অস্ফুটস্বরে স্মরণ করিয়ে দিল ডাক দেখার সময় এটা নয়। তারপর তাব মনে হল শশীর এটা পাঁচ নম্বর বিয়ে হচ্ছে। তার মুখে কি একটা হাসির ভাব দেখা দিচ্ছিল? গগলসে চোখ ঢাকা থাকায় বোঝা গেল না। সে ভাবল, ছি, কারো ব্যক্তিগত রুচি বা ব্যাপার নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়। চার নম্বর স্বামীর মৃত্যুর পর শশী অনেকদিন অপেক্ষা করেছে। প্রায় ছ সাত বছর। আর এটায় বরং শশীব আভিজাত্যই আছে। দেখো, এখন তোমার বিয়ে না কবলেও চলে। শশী বিয়ে না করেও ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে টুর করে বেড়াতে পারতো। অন্তত সেকেলে ভঙ্গীটা শশীর। প্রবীর যাকে ফোরম্যানিটির আধুনিকতা বলে ঠিক তা নয়।

কিন্তু, মিত্রা এবার নিঃশব্দে হাসল, তাব রঙীন সুগঠিত ঠোঁট দুটিতে ঢেউ উঠল, তাই বলে ব্লাডগ্রুপ টেস্ট করানো? যেন বংশধরকে নিয়ে বিব্রত হওয়ার বয়স তার আছে? কিংবা শশীকে মানায়। যাকে বলে কাজটাকে সঠিক পদ্ধতিতে করার প্রবণতা। অন্যভাবে বলতে পারো বিয়েই যখন তখন ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করিয়ে নেয়াই বা হবে না কেন? ওটাকে অন্তত বিয়ের রিচ্যুয়ালের অঙ্গ বলতে হবে। লক্ষ্য করো কির্কেগার্দ চার্চে বিয়ে। আধুনিক ফ্যাশন নিশ্চয়। ও! আচ্ছা। কির্কেগার্দ

তো সেই ক্রিশ্চিয়ান একসিস্টেনশিয়ালিস্টের নাম।

কিন্তু, মিত্রা প্রকৃতপক্ষে মনের মধ্যে এবারেব সিঅফ করার সময়ে শাশাঙ্কাকে যেমন দেখিয়েছিল তেমন দেখতে পেল। স্ট্রাইপড ম্যাক্সি পরা, গলায় কালো জেডের মালা, মাথায় চুলের সুবিন্যস্ত এলোমেলোর মধ্যে রুপোর রং এর স্পষ্ট আভাস, লাল করা ঠোঁট, সুগঠিত বহু মূল্যের দাঁত যাকে একেবারে অকৃত্রিম মনে হয়।

এবং গালে গাল লাগিয়ে ফটো তোলার মধ্যেও শাশাঙ্কার যে কোন কাজ যথাযথ করার অভ্যাসটাই আছে।

কিন্তু সাইকাইআট্রিস্ট কেন? মনের মিল হবে কি না তা বুঝতে? ত্রিশ বছরের যুবক যখন আটচল্লিশ বছরের একজনকে স্ত্রী করতে রাজি হয় তখন মনের মিল হয়েছে বুঝে নিতে হবে।

হঠাৎ যেন ডান পাটা শিরশির করে উঠল মিত্রাব। না, সে কেন সাইকাইআট্রিস্ট সম্বন্ধে আপত্তি কববে? ভয়ের কি আছে মনস্তত্ত্বে? মিত্রা নিজের ডান পাটাকে লক্ষ্য কবল। আবার সেটাকে কখন টিপয়ের উপবে বেখেছে সে! না। আচ্ছা, মনে কবো, শশীর এই বিযেব বেলায কী বলেছে মনস্তাত্ত্বিক? আসলে টিপযের উপবে পা-কে ওবকম কবে রাখতেই শিবশির করে উঠেছিল। নিজেব অজ্ঞাতসারে একটা বিশেষ জ্যামিতিক দূরত্ব আছে টিপয়টা, (প্রায় অ্যাকসিডেন্টাল ব্যাপার নয়?) আর তাব উপবে কিছু না ভেবে পা-টা তুলে দেয়ায যে পোজটা হয় সেটাই কারো স্কেচ কবাব মতো মনে হতে পারে। আব পোজ যদি বলো ব্যালে তো পোজেব জন্যই মূল্যবান। না, প্রকৃতপক্ষে ভয় পেতে হবে কেন সাইকাইআট্রিস্টকে? মনে কবো শশীর বেলায়—(কী বলেছে মনস্তাত্ত্বিক?) সে কি বলেছে, কোন কমপ্লেকসের থেকে মুক্তির জন্য শশীর মতো কাউকে বিয়ে করলে ভালো হয়? কিংবা অনিবার্যভাবে তাই করতে হবে শশীব এই শেষ স্বামীকে যদিও প্রকৃতপক্ষে শশীর ছেলের বয়সী এই পুরুষটি, অর্থাৎ প্রায় আঠাবো বছবের ছোট; আব কিছুদিন আগেও, অন্তত শশীব জেনাবেশনে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইউরোপে স্কুলের মেয়েদের মা হয়ে যাওয়ার একটা রেয়াজ ছিল। না, বরং হয়তো সেই মনস্তাত্ত্বিক বলেছে—(টিপয়টাকে পায়ের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিল মিত্রা)—আসলে শশী ও তার নতুন স্বামী হ্যারল্ডে ঠিক এক প্রজন্মেব তফাৎ। কাবো কারো মন এমন রোমান্টিক থাকে যে সে পুবনো হারিয়ে যাওয়া দূরকে খোঁজে, সেখানে পৌঁছে সুস্থ বোধ করে। হযতো হ্যারল্ডের মন শশীব মনে সেই সুদূবকে পেযে সুখী হযেছে। কোন কমপ্লেক্সেব কথা না বলে এমন করেও তো বলতে পারে মনস্তাত্ত্বিক।

আরে, এখনও তুমি এমন করে বসে? বলতে বলতে শান্তনু ঢুকল।

ইতিমধ্যে সে পোশাক বদলেছে। সেকেলে বেলবটম কায়দার ট্রাউজার্স, তার উপরে ইংলিশ শার্টের মতো কলার যুক্ত পাঞ্জাবী, পিঠের উপর ভিনাইলের বোঝা বইবার নীলরঙের পাহাড়ী ঝাঁকা। সেকালে দার্জিলিং-এর পথে সে দেশের কুলিদের পিঠে যেমন বেত ও বাঁশের তৈবি ঝাঁকা দেখা যেতো, এটাও তেমন ; শুধু আকারে ছোট আর নীল জমিতে নেপালি মোটিফের নক্সা কাটা।

মিত্রা বলল, তোমাকে যথেষ্ট রকমে খুশি মনে হচ্ছে।

তা তুমি আবার বলতে পারো। তোমার মনে পড়বে, দিদি, পদ্মবিভূষণ সম্মান পাওয়ার পর সল্টেড কাজুবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে তুমি কদাচিৎ রাস্তা চলেছো। আজ তেমন একটা দিন, যখন তুমি বহুদিন পরে তা করতে চলেছ।

কিন্তু একটা খবর আগে শুনে নাও, মিত্রা পোশাক পরতে যাওয়ার আগে বলল, শশী মানে শাশাঙ্কা আলেকজাণ্ড্রোবনা, আমাদের মম, আজ আবার পারিবারিক সংবাদের মাথায়। তুমি কি জানো এই মাত্র টেলিফোনে কী খবর পেয়েছি? আজ দুপুরে ব্যাডেন ব্যাডেনের কির্কেগার্দ চার্চে হ্যারল্ডের সঙ্গে শশীর বিয়ে।

এঃ? বলো কি? তা হলে তো আজ আমাদের এটাকেই সেলিব্রেট করতে হয়। এতক্ষণ ভাবছিলাম আজ আমাদের ছবিটাকে সেলিব্রেট করা উচিত। আমি ঠিক করেছি কিছুক্ষণ আগে, ছবিটা হবে জল, আকাশ আর তিন অবযব। যাও যাও, আর দেরি নয়। খুব ভালো করে পোশাক করো! সুপার মার্কেটে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আমরা আবার হাঁটতে পারি, কোন ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডে বসতে চাও যদি টাটকা ছেঁচা আপেলের রস খেতে, তার পরে আমরা লাঞ্চ লোভাতুরদের প্রথম স্রোতেই ঢুকে পড়তে পারবো পাঁচতারা হোটেলেব যেটা তোমার পছন্দ সেটাতেই।

প্রকৃতপক্ষে যেন একটা আনন্দেব ছোঁয়াচই লেগেছে মিত্রা এবং শান্তনুর চলায়। যেন সত্যই পারিবাবিক আনন্দের দিনই তৈরি করেছে শশীর এই পাঁচ নম্বর বিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে সুপার মার্কেটে একতলার কাউন্টাবে সত্যি সল্টেড কাজুবাদাম কিনল শান্তনু। আর তা চিবোতে চিবোতে তারা নানা ডিপার্টমেন্ট ঢুঁড়তে শুরু করল। একবাব তুলি আর রঙেব মহল্লায় ঢুকতে পেরে তাদেব প্রায় আধঘন্টা কেটে গেল। ইতিমধ্যে শান্তনুর পিঠেব বাস্কেটে কী না জমা হয়েছে! সেই ভালো আপেল ও পিচফল যা শুধু এই সুপাব মার্কেটেই পাওয়া যায়। বেশ কয়েক মিটার রঙীন সিল্ক, কিছু ক্যামেরাব ফিল্ম। শুধু শান্তনু নয় কেনার ব্যাপারে মিত্রার উৎসাহও দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে; রুমাল, চুলের ক্লিপ, জুতোর ফিতে এসবও তো দরকারী জিনিস। বাস্তবিক, এই সুপার মার্কেটের বাড়িব সঙ্গে কেউ কি সেকালের জগুবাবুব বাজারের সঙ্গে তুলনা দেবে? ফাইবাব গ্যাস, পোর্সিলেন, ক্রোমিযাম প্লেট এখানে ওখানে নিওমডার্নিস্ট আর্টের ভাস্কর্য দেয়ালে। কোন মিউজিয়ামই কি এত আকর্ষণীয় হতে পাবে? প্রতিফলিত আলো, উজ্জ্বল স্টিল, ক্রোমিয়াম এবং নানাবিধ কৌটো, কার্টন, টিউবের নানা রঙের সমাহার।

অবশেষে তারা যখন পাঁচতাবা অশোকের দরজায় পৌঁছাল তখন লাঞ্চ-অন্বেষী মানুষের প্রথম জোয়ার ফুটপাত-রাস্তা ছাপিয়ে লাল কার্পেটের উপবে উঠে পড়েছে।

শান্তনু বলল, আমরা কি একটা ককটেইল দিয়ে শুরু করতে পারি। মিত্রা কিছু ভাবছিল। একটু চমকে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

পরে নিজেই হেসে বলল, আমাদেব মম্, মাম্মী, মাদ্দ্ব শাশার বিয়েব সেলিব্রেশন? না তোমাব ছবিব?

দুটোই, যদি আপত্তি না থাকে। কিন্তু গগলস খোল, চোখ ও ভ্রূ দেখতে দাও। আজকের লাঞ্চের খরচ আমার, সুতরাং মেনু নিয়ে যা খুশি কিংবা যত উদ্ভট—এমন কি হাঙ্গরেব শুকনো পাখা এবং হিপোর সারলযেন অথবা মশলাধোসা দহিবড়া—যা তোমার খুশি অর্ডার দিয়ে দাও।

তারা ইতিমধ্যে সব চাইতে ভালো অবস্থিত একটা টেবলে বসেছে। একটু পরেই লাঞ্চ দেয়া শুরু হবে। বিয়ার চেয়ে নিযেছে তাবা।

এই অবসরে আমরা ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি। সর্বাধিক প্রচলিত আর্টের কৌশলে লং শট ও ক্লোজ আপ বর্ণনা করা যায়। ইতিমধ্যে হলের প্রায় আধখানা ভরে উঠেছে। এই ভরে ওঠার ব্যাপারটাকে বেশ একটা চিন্তার বিষয় করা যায়। যে যার পছন্দমতো জায়গা বেছে নিয়েছে এখন। এ টেবল ও টেবল এবং অবশ্যই রিজার্ভড টেবলগুলোকে বাদ দিয়ে। নানা রঙের পোশাক পরা নানা রঙের পুরুষ এবং স্ত্রী। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে পুরুষরাই ইদানীং গাঢ় রং পছন্দ করছে এবং স্ত্রীয়েরা বরং হালকা। শিশুদের সংখ্যা খুবই কম। এবং তা স্বাভাবিকই কারণ তারা হয় কিণ্ডারগার্টেন কিংবা স্কুলে। কতরকমে বা কাটা হয় চুল, আর কত রকমে তার খোপা। কত বিচিত্র চশমার ফ্রেম আর কত রঙেরই বা হ্যাণ্ডব্যাগ। এখন তো ডিনার নয় যে ক্যাবারে নাচের মঞ্চের দিকের টেবলগুলো আগে ভরবে। এই তো এখনই তিনজন পুরুষ একসঙ্গে এসে যে টেবলটায় বসল তাকে স্টেজ থেকে সব চাইতে দূরের বলা যায়। তাদের পিছন পিছন একজন বৃদ্ধর হাত

ধরে একজন যুবতী, নব-উদ্ভিন্না না হলেও এখনও তাব পঁচিশ জন্মদিন পার হয় নি, মিত্রা এবং শান্তনুর পাশের টেবলটায় বসলে, মুখোমুখি নয় পাশাপাশি। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখলে হঠাৎ কারো কোন ইনটেলেকচুয়াল লেখককে মনে পড়তে পারে। তেমনি শুকনো ঘাড়ের উপরে টাক-ধরা সাদা চুলের মস্ত মাথা, পুরু পরকলার গোল চশমা কালো ফ্রেমেব। সঙ্গিনীর পোশাক মহা মূল্যবান, এবং তার শাড়ি কোমরের নিচে ইঞ্চি তিনেক ঝোঁকা, তেজী ঘোটকীর মতো চাল।

লাঞ্চ শুরু হলে শান্তনু বলল, দেখো, দিদি, আমার তেমন খিদে নেই। নিজের প্লেট থেকে বরং আরও কিছু খাবার তুলে দিয়ে শান্তনুর প্লেটে মিত্রা বলল, তোর ব্রেকফাস্ট ভালো হয় নি বলেই তো এত তাড়াতাড়ি লাঞ্চে আসা।

শান্তনু কিছু বলতে গেল, কিন্তু বলতে না পেরে মৃদু কেশে গলা সাফ করল।

একটু পরে বলল, জানো, আমার মনে হয় এখন আমার দু-এক টুকরো আপেলের বেশি কিছু খাওয়া উচিত নয়। মানে এটাকে তুমি সুপাবস্টিশনই বলতে পারো, কিন্তু এখন আমার টেবলের সামনে মনে হচ্ছে...

শরীর খারাপ লাগছে, বোদ লেগেছে তা হলে। খাবার টেবল থেকে চোখ তুলে এদিক ওদিকে দেখো। ধীরে ধীরে খাও।

কথাটা তোমাকে বলি, বলে স্বর নামিয়ে আনল শান্তনু, একেবারে সেকেলে কথা। ওই ছবিটা আঁকাব সঙ্গে জড়িত। কেন যেন মনে হচ্ছে না খেয়ে থেকেই, সেটাই প্রথম ধাপ, শুরু করতে হবে।

সংযম বলা হতো আগে।

হতো? তা না হলেও মনে হয় নিজের চোখকে, কব্জিব পেশীকে, স্নায়ুকে, সবগুলোকে লাগাম পরিয়ে এমন করে রাখতে হবে যেন তাবা টগবগে ঘোড়ার মতো শীশ-পা তুলেও সামনে থাকে, কার আবার? আমারই। কিংবা বলতে পারলাম না কথাটা।

আচ্ছা এখন তো খা।

না না ভেবে দেখো। কথাটা ইংবেজি, অর্থাৎ ফ্লেশকে ফেড আউট কবতে হবে নতুবা আমার কব্জি দিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে কি কবে রংগুলো চুঁইয়ে আসবে বলো? ছবিটাকে আজই শুরু করতে চাই। অলিম্পিক স্প্রিন্টার নাকি না খেয়ে শরীর হাল্কা রাখে?

লাঞ্চ চলছে আমরা এই অবসবে আবার হলের বর্ণনা করতে পারি। রূপসী পাঠিকা, এই আবার এক কৌতুকের ব্যাপার ঘটল। সেই ইনটেলেকচুয়াল সাহিত্যিক বৃদ্ধ যার সাদা চুলে টাক-সমেত মাথাটা যেন ঘাড়ের উপরে ঈষৎ টকটক করে নড়ছে, সে অবশ্যই যুবতী সঙ্গিনীর উন্মুক্ত কটিদেশকে সমাদর জানাচ্ছে। মিত্রাদের এবং তাদের সারির কয়েকটি টেবল থেকেই তা দেখতে পাওয়া গিয়ে থাকবে। কিন্তু তা কৌতুকের নয়। কৌতুকের এই যে মিত্রা এবং শান্তনু এদের চিনতে না পারলেও আমি আপনাকে এদের চিনিয়ে দিতে পারি। আপনি, রূপসী পাঠিকা, যদি বলেন এট' বেশি কথা নয়, কারণ যে সমাজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমি এই কথা লিখছি, আমি তাদের বিশেষ ভালোভাবেই চিনে থাকব, যে কয়েকজন লোকের কথা এই নিউ ক্যালকাটান হিসাবে বলছি তাদের চাইতেও অনেক বেশি সংখ্যক ক্যালকাটানের চরিত্র আমি বাধ্য হয়ে চিনেছি, এবং নোটসে নথিভুক্ত করেছি— তা হলে আমি অস্বীকার করতে পারবো না। বলছিলাম, মিত্রা তার অদূরস্থিত টেবলের বৃদ্ধ ইনটেলেকচুয়ালকে (যার ঘাড় কাঁপছে এবং চোখে অন্তত মোটা পরকলার চশমা) চিনতে পারল না, কিন্তু আমরা চিনি কারণ সে মিত্রার জনক এবং সে জন্যই একথা লিখবার আগে তার খোঁজ খবর নিয়েছি। এবং সেও বোধ হয় আজ মিত্রাকে চিনতে পারছে না। হ্যাঁ, সে-ই সুরঞ্জিত তলাপাত্রের স্ত্রীর সেই বন্ধু, ওয়াকিবহাল মহল যাকে মিত্রার জনক বলে জানে।

মিত্রা বলল, শান্তনু, তুই কি সেকালের ক্রিশ্চিয়ানদের মতো ফ্লেশকে দমন করতে নিজেকেও চাবকাবি?

তুমি ঠাট্টা করো না। আমি ঠিক বলতে পারছি না আমার মনে কী ভাব হচ্ছে। বেশি খেলে লাঞ্চের পরে ঘুম পাবে। তুমি বাড়ি ফিরে ঘুমাতে পারো। কিন্তু আমি লাঞ্চের পরে চারকোল নিয়ে ক্যানভাসে দাগ দিতে চাই।

কিন্তু হঠাৎ যেন মিত্রা চমকে উঠল, একটু তাড়াতাড়ি, চোখে পড়ে এমন করে, মুখ ঘুরাল।

শান্তনু, ফিসফিস করে বলল সে, ওই লোক তিনটিকে লক্ষ্য করেছো? ওরা একই সঙ্গে ঢুকছিল। ওদের মধ্যে ওই চওড়ামুখো লোকটিকে দেখো। কালো গগলসের দুটো বল যেন জ্বলছে। কী খাঁড়া মার্কা নাক।

আঁকতে বলছো?

আমার মনে হচ্ছে, আচ্ছা, তোর কি মনে হয় ও একটা মনস্তাত্ত্বিক নয় তো?

শান্তনু হাসল। বসো, কাগজ বার করি। ও যেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, ওকে ওর ছবি এঁকে উপহার দিলে বোধ হয় খুশি হবে।

না, না। মিত্রা রুমাল বার করে নিজের দু হাতের পিঠ মুছল, যেন সে ঘামছে।

হলই বা সাইকাইআট্রিস্ট। এবং হয়তো কোন খাঁটি ইহুদি মনস্তাত্ত্বিকই, তাতে তুমি ভয় পাবে কেন?

ভয় পাবো কেন? কিন্তু তা হলেও দেখ মনে হয় না মানব ভিতরে ওর চোখ দুটো ঢুকে পড়ে।

শান্তনু গলা নিচু করে বলল হেসে, কিংবা ও হয়তো একজন স্পাই। এটা তো ঠিক কথাই আমাদের ফাইটার কারখানার একজন ডিজাইনারকে হিসাবে মিলানো যাচ্ছে না। না, আমার কথা, আমাদের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না যদিও তোমার মনে হল আমি খুব জোরে বলেছি কথাটা। বুকের ঢিপঢিপ, শব্দ সত্যি সত্যি দূর থেকে কেন পাশে বসেও শোনা যায় না।

ওয়েটার এসে দ্বিতীয় প্লেটগুলো দিতে দাঁড়াল।

স্টেট গ্র্যাফিক একজিবিশনের তখন সাতদিন হয়েছে। অর্থাৎ মিত্রার লাঞ্চের পরে তিনদিন হল। এখন দুপুর হতে চলেছে প্রবীর সাণ্ডেলের ঘরে। দুপুর অবশ্য ঘড়িতে। কেন না কয়েকদিন যে সূর্যের আলো ছিল যা একদিন শান্তনু মিত্রাকে কাজুবাদাম চিবিয়ে রাস্তা হাটতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল আজ দুদিন আবার তারই অভাব হয়েছে। স্মগ চোয়ানো যে ম্যাটম্যাটে আলো তা অপ্রচুর। সুতরাং ডেস্কের উপরে আলো জ্বলছে। আর তার সামনে প্রবীর তার টাকসমেত মাথার বেশ স্পষ্ট একটা ছায়া ফেলেছে তার পিছনের দেয়ালে।

প্রবীর পাঠরত। এমন একটা ভঙ্গী, যে ঠিক এখনই যদি বেলা সোম তাকে দেখতো, তার পিঠে হাত রেখে প্রায় সস্নেহ ভঙ্গীতে বলতো, লক্ষ্মী ছেলে। আমি এখনই কফি করে আনছি।

বস্তুত পড়তে পড়তে বেলা সোমের কথা প্রবীরের ইতিমধ্যে কয়েকবার মনে হয়েছে। একবার প্রায় টেলিফোন (এবং তা ফোশন যন্ত্রে) করতে উঠেছিল যেন অন্যমনস্ক ভাবে।

আর তা অস্বাভাবিক হচ্ছে না। বেলা সোমের কথা মনে হতে পারে তার। নানা সামাজিক ফাংশন বেলার, যার কোন কোন শুঁড়ো অদৃশ্যভাবে প্রবীরকে জড়িয়ে রেখেছে, যা অধিকাংশ সময়ে প্রবীরের মনে থাকছে না আজকাল, এবং কোন কোন সময়ে প্রবীর জানেও না। হয়তো যেমন, এখনই বেলা নিজেই ফোন করে বলতে পারে, হাসনাবাদের মধু কেনার জন্য যে দুপুরে নিউমার্কেট যাওয়ার কথা ছিল তা কি মনে আছে, অথবা আজ হয়তো সেই দিনই যখন ফ্যাশনেবল সমাজের বাজার বসবে আর সেখানে যে তার সঙ্গী হতে হবে, তা আগে বলতে বেলার মনেই নেই।

এ ব্যাপারটায় এ সব বিষয়ের চাইতেও তীক্ষ্ণভাবে প্রবীরের মনে বেলা সোমের ছায়া পড়ছে, মনে কেন, বইয়ের পৃষ্ঠার উপরে (যেন তা সম্ভব হতে পারে) বেলার নাক ও ঠোঁট, কখনও কখনও চোখ দুটি অথবা কপালের উপরে পড়া চুলের ঢেউ যেন রঙ-সমেত ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আসল কথা, এই সাহিত্যপাঠে বেলাই তাকে নিযুক্ত করেছে বলা যায়।

সুতরাং, সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, চোখের নিচে ম্যাগনিফাইং গ্লাস রেখে, (চোখে অবশ্য অভ্যস্ত চশমাই) সে গল্পটাকে পড়ল আবার। একজন অবস্থাপন্ন লোকের সুন্দরী স্ত্রী। কুকুর আছে, নেপালি চাকর আছে। ভাবে মনে হয় স্ত্রীর একনিষ্ঠা সম্বন্ধে স্বামী কিছু চিন্তা করে থাকে ইতস্তত। একদিন স্ত্রীর বিছানায় সেই নেপালি চাকর বাহাদুরের তাবিজ পাওয়া গেল ছেঁড়া অবস্থায়। বাহ্, বেশ কথা। কী হল গল্পটা? ডেকামেরনে অনেক বিছানার কথা আছে, আরব্য উপন্যাসে অনেক কাফ্রী ক্রীতদাসের, তা থেকে নতুন নয়। তবে নতুন ভাবে পুরনো তথ্যকে দেখানো? আর্ট? অর্থাৎ রূপসৃষ্টি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, এটা, এক বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত লেখা, তা হলে তত্ত্বের কথা? পুরো-জানোয়ার কুকুর, আধা-জানোয়ার বাহাদুরের মতো মানুষ প্রকৃতপক্ষে জানোয়ার তা প্রমাণ ক'রে দেখানো।

হো হো করে হেসে উঠে প্রবীর চেয়ার ছাড়ল।

কিন্তু তাকে হাসি থামাতে হল। বইটাকে মুড়ে সে পাশের কাঠের ক্রেটটার গর্ভে ছুঁড়ে দিল। কিছু কিছু বই যা সে পড়েছে তা সেখানে ইতিমধ্যে জমা হয়েছে। হায়, অবস্থাভেদে তুমি হাসতে পারো না। তোমাকে আবার পড়তে হবে এমন বেশ কয়েকখানি বই। ইতিমধ্যে কয়েকজন অতি যৌন দিদি, বউদি, মাসীর গল্প পড়ে সে নোটিস দিয়েছে। না, বেলাকে ডেকে বলে লাভ নেই। ফোশনের অন্যপ্রান্তে এখন লাঞ্চের জন্য ব্যস্ত এপ্রন-বাঁধা বেলা যদি আসে কথা বলতে, তুমি দেখবে প্রবীর, তার চোখের পাতা একটু অসহিষ্ণুভাবে কাঁপল, কিন্তু হেসে সহিষ্ণু গলায় বলবে, আ, প্রবীর, তার জন্য তুমি ভাবছো কেন? মানুষ নিজের পক্ষে উপযুক্ত সাহিত্যই পেয়ে থাকে। এ বইগুলোকে যদি তারা সাহিত্য বলে থাকে তখন এখন তুমি বলবে না, তা কি আর হয়?

না, এবার বেলা তাকে বেশ শক্ত প্যাঁচে ধরেছে। পীযুষের জন্য সিনারিও লিখে দেয়ার প্রস্তাব নয়। প্রস্তাবটা এমন সুন্দরভাবে এনেছিল যে প্রবীর ফাঁদে দুপা দিয়ে ফেলেছে এক সঙ্গে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং তার জন্য অর্থপ্রাপ্তি, এই দুই প্রলোভনে তার এক এক পা বাঁধা পড়েছে। এখন আর পিছলে যাওয়ারও উপায় নেই। আ, বেলা, আবাল্য সখ্যের এই প্রতিদান।

ঘরের অন্যদিকে যেখানে টেবলের উপরে বেশ কয়েকদিনের পত্রিকা জমে আছে সেখানে গিয়ে ইজিচেয়ারটাকে দখল করল। বেশ সুবোধ বালকের মতোই সে সামনে যে কাগজটাকে পেল তাকেই তুলে নিল। এটা বোধ হয় অভ্যস্ত রিফ্লেকস, যে প্রথম পাতা যাতে তাবড় তাবড় অক্ষরে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও মন্ত্রী মহোদয়ের সংবাদ থাকবে, তা না দেখে বরং উল্টে পিছনদিকটাকে চোখের সামনে মেলে ধরল। ক্যালকাটা সংবাদ। টুকরো টুকরো অমূল্যবান খবর সেখানে। পার্কের লোহার রেলিং ভেঙ্গে ব্যবসা, এই বিয়ার এবং কাশীপুরী ভদকার কলকেতাতে এখনও যে আখের রস বিক্রী হয় ময়দানে সে সম্বন্ধে মন্তব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ প্রবীরকে আকৃষ্ট করল। ও, বাঃ, এ ছবিটাতে মন্দ নয়? একটা মেয়ের ফটো ; মাথায় ছাতা, মুখে ও বুকে পাতার ছায়া, পায়ের কাছে পাতার ছায়া, ছবিটার নাম দিয়েছে প্যারাসল। বাহ্, বেশ তৃপ্তিদায়ক তো ছবিটা! কোন কোন সময়ে যেমন হয়, ছবিটা যেন মনের ভিতরে তার সৌন্দর্য নিয়ে প্রবেশ করল। একটু চেনা চেনা মনে হল নাকি?

কিন্তু সাহিত্য এমন বিষয়, হায়, যা তোমাকে জঘন্য করে। তুমি যে সাধারণ মানুষের মতো প্রকৃতি বা নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করবে, তা হয় না। সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে সেই সৌন্দর্য

উপলব্ধি কাগজে কলমে ফুটিয়ে তোলার পরিশ্রমে ব্যস্ত হতে হয়। এই ছবিটাই যেন প্রবীরকে আবার তার সাহিত্যপাঠে নিয়োজিত করল। বিশেষ যখন এগ্রিমেন্টে সই করেছে।

কী তা হলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য? প্রমাণ করা যে দিদি, পিসি, মাসি, বউদি এরা মূলত ভ্যাম্পাযার? অর্থাৎ সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাদের তুলনা রক্তশোষক বাদুড়? তোমার অজাগ্রত অবস্থায় যে তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে তোমার রক্ত চুষে খায়? অবশ্য সে নানাভাবে তোমাকে ভুলিয়ে রাখে, এক্ষেত্রে যেন স্নেহ ভালোবাসা সৌহার্দ্য এ সবই ভুলিয়ে রাখার কৌশল। সেই সব রুনিবউদি, মেমমাসি, অতসীবউদিদের সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায়?

তারপরই সেই মহৎ সৃষ্টিগুলোকে হিসাবে আনতে হবে যেখানে মা হঠাৎ আবিষ্কার করে কন্যার প্রতি পিতার স্নেহে অন্য কিছু থাকে, স্ত্রীর পাতিব্রত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিছানায় পড়ে থাকা বাহাদুর চাকরের তাবিজে। অর্থাৎ যেন প্রমাণিত যে মানুষের ধোপদুরস্ত চেহারার নিচে সে পশু থেকে পৃথক নয়! যেন চার্লস ডারউইন অনেকটা বলেনি! যেন বায়োলজিস্টরা কিছু বলতে বাকি রেখেছে? প্রবীর স্থির করল, রসো রসো এদের একটা নাম দিতে পারলে আলোচনায় সুবিধা হয়। এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে একসময়ে এরা অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাসিক, গল্পলেখক বলে বিখ্যাত ছিল। বইয়ের বাজার গরম রেখেছিল এবং দু-দুটো ঢাউস সাপ্তাহিক এরাই কাঁধে করে বছরের পর বছর বহন করেছিল।

প্রবীর উঠে তার লিখবার টেবলে গেল এবং আর একজন লেখক যে ওয়াগন ব্রেকারদের সম্বন্ধে এবং সমাজের পাপ-গহ্বর সম্বন্ধে লিখে অনেক টাকা করেছিল, তার বইগুলোকে গুছিয়ে নিল। নাকি ভদ্রলোককে একসিস্টেনশিয়ালিস্ট বলা হতো। প্রায় চল্লিশ মিনিট সোজা হয়ে বসে সাহিত্যপাঠ করল প্রবীর।

কিন্তু, না তাকে আবার উঠতেই হল। খুব বিশ্রী রকমের চোরা সর্দিতে যেমন হয় তেমন ভার বোধ হল তার মাথাটা। সে উঠল। যেন টলতে এমন ভাবে হেঁটে আবার ইজিচেয়ারটার কাছে গেল। কিছুক্ষণ সেখানে বসতেই অনুভব করল কী যেন একটা তাকে খুশি করেছিল যা সে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু তার মন তখন কাজ করছিল বলে একটু হাতড়েই সে সেই স্নিগ্ধতাকে স্পর্শ করল। বসো, এটা সেই প্যারাসল লেখা ছবিটা। আশ্চর্য ছবি তো! সংবাদপত্রটাকে চোখের সামনে তুলে নিতে আর কতক্ষণ লাগে। এটা একটা চান্স যে এমন আলোছায়ায় এমন স্ন্যাপ ফটো উঠেছে। রসো, রসো, কী আশ্চর্য, এটা কি মিত্রা? মানে ব্যালেরিনা মিত্রা বাসু? কিন্তু বয়স অন্তত দশ বছর কম। তা হলে কি দশ বছর আগেকার তোলা ফটো? তা সম্ভব নয়। সে রকম চুরি ধরা পড়লে যে কেলেঙ্কারি হয় তার ভয়েই কোন সাংবাদিক তেমন পুরনো ছবি ছাপতে দেবে না।

প্রবীর উঠে তার ফোশন যন্ত্রের কাছে গেল। বেলার নম্বর ডায়াল করল, ছবির নবটাও ঘুরিয়ে দিল। বেলা সাড়া দিতেই টেলিফোন সংলগ্ন পর্দায় বেলাকে দেখা গেল, স্নানের পর পিঠে চুল ছড়িয়ে ঢিলেঢালা শাড়িতে, বই হাতে।

আ, বেলা, বললো প্রবীর।

প্রবীর, আচ্ছা, প্রবীর তুমি বরং পোশাক পরে এখানে এসো।

আমি? তুমি কী করছো বেলা?

শাশাঙ্কার সেই বইটা, বার্ডস, র‍্যাটস, অ্যাণ্ড ফিশেস পড়ছি। তুমি এসো না লাঞ্চে।

দেখো, বেলা, সব সময়েই একজন মানুষ অকেজো থাকে না। যদি মনে করো, কল্যাণীর সেই বক্তৃতামালা নাকি বক্তৃতালহরী তো হাতের কাছেই আছে। শোন, এখনকার সমস্যাটা বলি। মিত্রা মানে মিত্রা বাসু যে আত্মজীবনী লিখছে, সেই বিদায়ভোগী ব্যালেরিনার কি ছোট বোন আছে?

দেখেছো নাকি? বিয়ে করবে?

আ, বেলা।

না, মিত্রার বোন আছে বলে শুনি নি।

ও, আচ্ছা। কিন্তু, বেলা, মিত্রাব বোন মানে সুবঞ্জিতেব স্ত্রীর মেযে নয। তুমি কি মিত্রার প্রকৃত জনক অর্থাৎ সুরঞ্জিতের স্ত্রীর সেই বন্ধুকে চেনো?

তাকে খুঁজে বার করা কঠিন নয়। তুমি কি মিত্রার মতো দেখতে সেই ভদ্রলোকের মেযেকে দেখেছো। লাঞ্চে এসো, কথা বলছি। আমার তো মনে হয় ডাইরেকটরিতে সেই ভদ্রলোকের অর্থাৎ সুরঞ্জিতের দ্বিতীয় স্ত্রীর সেই বন্ধুর ঠিকানাও আমরা খুঁজে বার কবতে পারবো। যদিও নামটা জানি না।

না, বেলা, না, ওর জন্য ব্যস্ত হযো না। অন্তত আজ নয। ছাড়ছি।

প্রবীর ফোশন রিসিভাব নামিযে সবে এল।

এটাও কিন্তু কৌতুহলের ব্যাপার, তাই নয়? রাসেল নামে এক ভদ্রলোক সম্বন্ধেও এবকম একটা গল্প আছে যা সুরঞ্জিত-পরিবাবে ঘটেছে। মিত্রা সুরঞ্জিতেব স্ত্রীর মেয়ে কিন্তু সুরঞ্জিতেব নয়, ববং তার বন্ধুর। কেন এমনটা ঘটেছিল? এটা কি সাহিত্যের প্রবলেমে কিছু আলো ফেলতে পাবে?

এক্ষেত্রে মিত্রাব মা, সুরঞ্জিত, এবং মিত্রার মাযের বন্ধু তিনটি চবিত্র। বেলার কথা শুনে বোঝা যায়, সুরঞ্জিত ব্যাপাবটা জানতো. মিত্রার মা গোপন করে নি। এটাকে কীভাবে দেখবে? স্ত্রীজাতীযার স্বাধীনতা? প্রেমের ব্যাপাবে যখন যাকে ইচ্ছা ভালোবাসবে, কিংবা একজনকে জীবনেব মূলসুবেব মতো ধবে বেখে অন্য সুব লাগাবে কখনও কখন জীবনে ; বায়োলজির দৃষ্টিতে, যে পুরুষকে যখন পছন্দ তাব সাহায্য নেবে সন্তানের জন্য। নারী পশুকে স্বাধীনতা দেযা। গাভীর যে স্বাধীনতা, না, না, এখন পশু অর্থে খাবাপ কিছু বলা হচ্ছে না। বায়োলজিব কথা বলা হচ্ছে। এটা কি সুরঞ্জিতেব বৈজ্ঞানিক মনের উদ্দাবতা না আর একটা পবীক্ষা? কিন্তু (প্রবীর মৃদু মৃদু হাসল) তার জন্য এরকম একটা সামাজিক গল্প তৈরি করার দবকার ছিল কি? শাশাঙ্কার বার্ডস, র‍্যাটস ও ফিশেস পড়ে দেখো। দেখবে, স্টার্লিং পাখিগুলো সমাজে বাস করে, কিন্তু কীভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বক্ষা করে; দেখবে, মেঠো ইঁদুরেরা—একই জাতের একই আকারের মেঠো ইঁদুর, তা যদি ভিন্ন ভিন্ন মাঠ থেকে আনা হয়, তবে স্বদেশপ্রেমেব তাড়নায় তারা কি করে পরস্পরকে হত্যা করে; সামুদ্রিক মাছের ঝাঁকেব সিউডোপডের বিপ্লবের মধ্যে মানুষের বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ইত্যাদি ঘটানোর প্রবণতা দেখতে পাবে। এগুলো জান্তবতা নয় মানবিক গুণ, সেই অর্থে গাভী-স্বাধীনতায় মানবিক বৈশিষ্টের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

কিংবা এর একটা অন্য অর্থ দেয়া যেতে পারে। সুরঞ্জিতের স্ত্রী ও সুরঞ্জিত কি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতো যে মানসিক শান্তির পক্ষে গোপন অভিলাষকে গোপন না রেখে যতদূর সম্ভব তার তৃপ্তিবিধান কবাই ভালো। হ্যাঁ, এরকম মত আছে, ভালোবাসা, জল ও বাতাস ও আলোর মতো সহজ হলে মানুষ সুখী হবে। শরৎ চট্টোপাধ্যায মশায় তাঁর এক উপন্যাসে এবকম কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন সেকালে। এবং একালে ফোরম্যানিটি তাদের ডিভোর্স ও জুডিশিয়াল সেপারেশনেব বাহুল্যে প্রমাণ করছে যেন শান্তির খোঁজেই তারা ভ্রমণ করছে, আহা!

এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। এই ডিভোর্স কোর্টের ভিড় প্রমাণ করে যে মানুষের ভালোবাসা যতই জল ও বাতাসেব মতো সহজ, ততই তা অসহিষ্ণু। অসহিষ্ণু হওয়াটাই মানুষের ভালোবাসার স্বরূপ। সে প্রেমাস্পদাকে অধিকার করতে চায়, অধিকারে রাখতে চায়। এবং এটা জেনেই ফোরম্যানিস্ট সম্প্রদায়ের নারীরা কদাচিৎ মিত্রার মায়ের (আহা বার বার কি তাঁর কথা বলা উচিত, তিনি মৃতা) মতো সাহসিকা হয়ে থাকে, বরং তারা ডাক্তারের সাহায্য নেয়।

তাহলে সুরঞ্জিত কি করে এ ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিল? তার কি অধিকারের ইচ্ছা ছিল না? জাগ্রত মনে বৈজ্ঞানিক উদারতা থাকতে পারে কিন্তু অন্তরের অতল অংশে সে কি অন্য সব

পুরুষের মতো আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করতো না? সচেতন বৈজ্ঞানিক মনের তলে পিছনে কি অবচেতন ছিল না?

প্রবীর সাণ্ডেল নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে ইজিচেয়ারটায় বসল। হঠাৎ যেন হাসির মতো হয়ে কথাটা মনে এল তার। কিছুদিন আগে একটা থিয়োরী ছিল, পুরুষ মাত্রেই ভালো ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে পছন্দ করে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে ভ্রষ্টা, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভালো, এমন একটা নারী যেন রোম্যান্টিক আকর্ষণের উৎস হয়। ইংরেজিতে যাদের গুড ব্যাড উইমেন বলে। অর্থাৎ সুরঞ্জিত কি তার স্ত্রীর মধ্যে এমন এক রমণীর দেখা পেয়েছিল!

প্রবীর একটু গভীরভাবে ব্যাপারটাকে দেখতে চেষ্টা করল। না, এই গুড ব্যাড উম্যান ঠিক তারা নয় যাদের শয্যায় বাহাদুর চাকরের তাবিজ পাওয়া যায়। তেমন স্ত্রীলোক এবং সেই তৃষিতা বউদি, মেম, পিসী, অতসী দিদি বরং ভ্যাম্পায়ার গোত্রের অর্থাৎ ব্যাড গুড উম্যান—যারা দেখায় ভালো মূলত এবং অন্তরে অন্তরে কুৎসিত। না, বাংলা সাহিত্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরে ব্যাড গুড উম্যানের জীবনী লেখাই হয়েছে। চিন্তা কোনদিকে যাবে তা বলা যায় না। প্রবীরের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ আলোকিত হল। কথাটা হঠাৎ মনে এল তার। আমাদের এই দেশে শরৎবাবুই কি তেমন নায়িকাকে প্রথম এনেছেন যাদের ভালো ভ্রষ্টা নারী বলা হবে, কয়েকটি নায়িকার চারিদিকে প্রবীরের মন ঘুরল। তা বলা যায় বটে, কমল, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি সকলেই তাই।

একটু ভাবতেই প্রবীরের মন একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করে ফেলল

কিন্তু এটাই শরৎবাবুর বিশিষ্টতা যে এদের প্রত্যেকের আধুনিকতা এরা প্রমাণ করেছে কঠিন সংযমের মধ্যে, যাকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় আত্মপীড়ন বলা যেতে পারে। প্রথম পরিচয়ের সেই কামনা-পুতুলগুলি যত দিন যায় তত যেন নিজেদের শরীরগুলোকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে চলে ভালোবাসা নামক এক সৌরভ ছড়াতে চায়। শরৎবাবু যেন প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কঠিন সংযম ও আত্মপীড়নই নারীত্বের সঙ্গে স্ত্রী-পশুর পার্থক্য। যাকে প্রেম বলা হবে তা নারীত্বের সঙ্গেই জড়ানো। যদিও এ ধারণাটা মনস্তাত্ত্বিকদের মতে শান্তিবিঘ্নকারী হতে পারে।

প্রবীর ঘড়ি দেখল। লাঞ্চের এখনও দুঘণ্টা বাকি। সকালেই স্নান হয় বলে এখন লেখাপড়া ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না। আর এখন সে বেরোতেও পারে না ন্যায়সঙ্গত ভাবে। তুমি যখন কথা দিয়েছ প্রবীর, তোমাকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একস্টেনশন লেকচার দিতেই হবে। সুতরাং তার জন্য প্রস্তুত হতেই হবে।

অতএব আবার খবরের কাগজটাকে হাতে করল প্রবীর। কর্তব্যই তাকে বাংলাসাহিত্য ছড়ানো ডেস্ক থেকে দূরে যেতে দিচ্ছে না। ছবিটাতে চোখ পড়ল আবার। এক মিনিট সে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর পৃষ্ঠা উলটাল। যেমন হয় সংবাদের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার চোখ সংবাদের মতো সংবাদ খুঁজতে লাগল। না, এটা, গালের তিলটা পর্যন্ত, মিত্রারই দশ বছর আগেকার ছবি, নতুবা বলতে হয় মিত্রার বোনের গালেও ঠিক একই রকমের তিল আছে , এটা ঠকানো ব্যাপারই ফটোগ্রাফারের, নতুবা বলতে হয় প্রাক্তন ব্যালেরিনা মিত্রার হেয়ারড্রেসার, ড্রেসমেকার ইত্যাদি মিলে তাকে এমন সাজিয়ে দিয়েছে যে চোখের দৃষ্টিও দশ বছর তরুণতর হয়ে গিয়েছে। এরকম ভাবতে ভাবতে চোখ এগিয়ে চলেছিল কাগজের উপর দিয়ে। তখন চোখ পড়ল স্টেট গ্রাফিক একজিবিশানের সংবাদে। চোখ সেখান থেকেও সরল। কিন্তু হঠাৎ কৌতুক বোধ করে যেন পিছন ফিরল।

সংবাদটার উপরে কোটেশন। বোধ হয় অলীক মুখুজ্যের বিবৃতি থেকে। অনেক ছবি এসেছে। অনেক নাম। আধকলম জুড়ে সাফল্যের পূর্বাভাস। কলমের শেষে সব চাইতে ওঁছা ছবি সম্বন্ধে মন্তব্য। প্রবীরের মুখে একটা চাপা হাসি দেখা দিল। হ্যাঁ, এই মতামত সম্বন্ধে এটাই তার মন্তব্য হয়ে থাকে—যে মানুষ আছে মাটির কাছাকাছি, সমাজসচেতনতা ইত্যাদি—যখন মতামতে দেখা দেয়।

আরে, বলে প্রবীর ইজিচেয়ারে উঠে বসল। 'এ স্টাডি ইন ব্লু' নামে গেরি স্যান্টায়ানা নামক এক গেস্ট আর্টিস্টের ছবিকেই এবারে চূড়ান্ত বিঅ্যাকশনারী ছবি বলা যায়। এমন কি পিছনে রঙের পিগমেন্ট গাঢ় হয়ে যেন আলোর বিন্যাসে ক্রসের আভাস তৈরি করেছে। মন্ত্রীমহোদয় পেডেরাস্ট বলে চেঁচাননি। কিন্তু মুখ ঘুবিয়ে নিয়েছিলেন। আপনারা সেকেলে সোফিয়া লোরেনের ব্লাউজ খোলা ক্লান্ত বুক দেখেছেন, এ যেন তারই অনুকৃতি, কিন্তু মনে হবে যেন সেকেলে কোন ক্রিশ্চান মার্টার যার পুত্র মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় রোম্যান অ্যামফিথিয়েটারে। নইলে চোখের কান্না বুকে ছায়া ফেলে না। হরিবল।

প্রবীর ধীবে ধীরে উঠে দাঁড়াল। গেরি স্যান্টায়ানা না নামটা? সে যে দারুণ রকমে চমকে গিয়েছে তা তার অতিরিক্ত দৃঢ়ভাবে চলার ভঙ্গিতেই ধরা পড়ছে। যেন নার্ভসগুলোকে সে ছড়িয়ে পড়তে দেবে না। দেখো কাণ্ড, গেরি স্যান্টায়ানা! প্রবীরের ঘবে প্যাশন অব ক্রাইস্ট নামে শান্তনুর ছবিটা কি করে এসেছে, রূপসী পাঠিকা, তা আপনাব মনে পড়বে। মনের এমন এক অবস্থা হল প্রবীরের যে সে ছবিটার সামনে গিয়ে সাদা রঙে লেখা চিত্রকবের স্বাক্ষরটাকে যাচাই কবে দেখল। শান্তনুই গেরি এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

এরপর মনস্থির করতে সময় লাগল না প্রবীরেব। পোশাক পবতে পরতেই ব্লকের নিচতলায় মেকানিকদেব ফোনে ডেকে তার প্রিয় সিঁদুরে লাল বুইকটার কথা বলে দিল। চেকবইটা পকেটে নেবে কি না এই দ্বিধা করে সেটাকে নিল না, ববং যেটা প্রায়ই ব্যবহার হয না সেই খুব বাহাবেব সিল্ক হ্যাট্‌টাকে পছন্দ করে মাথায় চড়াল। আয়নার সামনে গিয়ে আব একবার দাঁডাল সে। আ, প্রবীর, আ, এটা বসন্ত ঋতু এবং তোমাব বযস এক দশক কম হলে মানাতো!

বুইকটা তাব অভ্যস্ত দশ কি মি. ঘণ্টায় চলেছে। কিন্তু সোজা পাড়ি দিচ্ছে তো। চোখ দুটো বাস্তায়। দেখতে না দেখতে ক্যালকাটান প্রবীর একটা গাড়ির আলগা স্রোতে জায়গা করে নিলো।

কিছু যেন খুব উঁচুদরের যা তার মনে পাক খাচ্ছে। তা আর্ট, প্রবীর ভাবল, একেবারে বস্তু-ঘেঁষা হয় না, হয় কি? নানাভাবে পার্থক্য এনে ফেলতে হয়। যেমন ধরো মবি ডিক নামে উপন্যাস। গল্পটা তো তিমিশিকারের। তিমিশিকারের গল্পও রাখতে হবে আবার আহাব নামে যে তিমিশিকারের নেতা তাকে সেকালের মতো ট্র্যাজিক হিরোও করতে হবে। কী করা যায়? যখনই আহাবের কথা তখনই ভাষাটাকে কবিত্বপূর্ণ করা হল। যখন তিমিশিকারের খুঁটিনাটি বর্ণনা তখন ভাষাকে সাধারণ রাখা হল। এই হচ্ছে ঔপন্যাসিক মেলভিলেব কৌশল। ভাষার পার্থক্যই আহাবকে তিমিশিকারের মতো বস্তুতান্ত্রিক গল্পের মধ্যেও সেকালের ট্র্যাজিক হিরোর মতো অনির্বচনীয় মহৎ করে তুলতে পারল। আর ওটাও কৌশল শরৎবাবুর। গুড ব্যাড উম্যানকে সংযমের ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে অসম্ভব রকমে মধুর এবং কাব্যময় এক পরিণতিতে পৌঁছে দিলেন। বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীর এক নাচওয়ালী কেমন যেন এক মহৎ প্রেমের প্রতীক হল। নাকি প্রেম যে সংযমের মধ্যেই তা প্রমাণ করল। আর সে জন্যই যেন শরৎবাবুর রচনাকে (নতুন এই আবিষ্কারের ফলেই) সাহিত্য বলে মনে হয়।

আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোর সামনে, কিন্তু তারপর? ভিড় হওয়ার কথাই কিন্তু এক কিলোমিটার দূর থেকে ট্র্যাফিকজ্যাম হবে, তা কে আশা করেছে বলো। মুহূর্তে মনস্থির করতে হবে। এখনও এক কিলোমিটার পথ গেলে স্টেট গ্রাফিক একজিবিশনের বাড়ি। কিন্তু প্রবীরের মন দ্রুতগতিতে পরপর যেন যুবক, স্কুলের বালক হয়ে অতীতের সব অভিজ্ঞতার মধ্যে পথ খুঁজতে লাগল। তার মনে পড়ে গেল, যেমন চূড়ান্ত বিপদে হয়, যেমন একবার ট্র্যাফিক আইন ভেঙ্গে স্কুলের ছাত্র হিসাব করেছিল সে, তেমন করে আর্মি নেভির দোকানের কাছাকাছি, যেন জ্যাম কিনবে কিংবা চুরুট, এমন ভঙ্গিতে নেমে পড়ল। হনহন করে দোকানে ঢুকে জেন্টস টয়েলেটের পাশের করিডর দিয়ে বাড়িটার ব্যাক ইয়ার্ডে পৌঁছে এদিক ওদিক চেয়ে তারের বেড়া টপকে গলিটায় পড়ল। হ্যাঁ, এখন

সে পাকা ক্যালক্যাটানদের ভঙ্গিতে যেতে পারে স্টেট গ্রাফিক একজিবিশনের বাড়িতে। তার হাতে সিল্কের ছাতা যার প্রয়োজন নেই কিন্তু পোশাককে যা স্টাইলযুক্ত করে ; তার মাথাব চওড়া রিবনযুক্ত উঁচু সিল্ক হ্যাট, পবনে অত্যন্ত লম্বা ঝুলের ফ্রককোট। যেন আয়েসী এবং পোশাকবিলাসী এক আধুনিক চার্চ-ফাদার লাঞ্চের আগে নীরব এবং প্রায় জনশূন্য গলিতে ভগবানেব নাম জপ করতে এসেছে।

গেটের কিউতে টিকেট ও ক্যাটালগ কিনে প্রবীর নিজেকে উৎসবমুখব, আনন্দতরঙ্গিত এক ফোরম্যানিটিব স্রোতে ভাসিয়ে দিল। নানা বর্ণের, নানা প্রিন্টের সেই বিচিত্র স্রোতে তাকে দূর থেকে চিনে নেয়া যায় বটে তখনও, কিন্তু তার ভাসা দেখে মনে হয় না, তার মনে বিশেষ কোন কবিডবে আগে যাওয়ার তাগিদ আছে।

সবুজ শস্যক্ষেত্র, মেটে রঙেব মাটির কাছাকাছি থাকা নরনারী, লাল, নীল, হলুদ, জবদা রঙেব পোল্ট্রির ছবি দেখতে দেখতে দু একবার চাপা হাই তুলল সে। অবশেষে— সে যা চেয়েছিল।

ছবিটাকে সে কি পনরো মিনিট ধরে দেখতে চেয়েছিল? তা হলে বলতে হয় তাকে, আধঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। সে অবশেষে স্বগতোক্তি করল, বাহ্ ওরা তো ঠিকই বলেছে। চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে যেন আকুল স্নেহ হয়ে স্তনে ঝবে পড়ছে, যেন চোখেব দীর্ঘ পক্ষ্মগুলোব ছায়াই ; যেন কোন হরিণশিশু এখনই স্তন্যচ্যুত হয়েছে : নাকি যারা সীমান্তেব এ অনিশ্চয় পৃথিবীতে বেবিয়ে পড়েছে সেই অগ্রগামীদের মাঝেব উৎকণ্ঠা? কিন্তু তাই কি? একি এক অবর্ণনীয় নীল নয়?

ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ছাতাটা দোলাতে দোলাতে থামল প্রবীর সাণ্ডেল। কিছু যেন তার মনে আসছিল। সে আবাব ফিরে ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং সাদা রঙে লেখা গেরি স্যান্টায়ানা সইটাকে পড়ল। তাবপর সে স্বগতোক্তি কবল, দূর কবো, তা কেন? সইটা তো প্রথমেই যাচাই করেছে সে। সে তার ডান হাতেব প্রথম তিন আঙুলে গোটিটাকে চেপে ধরল। আচ্ছা, এ যে মিত্রাই, মিত্রা বাসু, মঞ্চপরিত্যাগী ব্যালেরিনা মিত্রা।

প্রবীর ইনফরমেশন ব্যুরোতে গেল ৮ ১২পর। সেখানে ভিড়ে অপেক্ষা করে যখন কর্তাস্থানীযদেব একজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখন সে গেবি স্যান্টানায়াব ছবিটাব দাম সম্বন্ধে জানতে চাইল। অবাক হয়ে দেখল তাকে ইনফরমেশন ব্যুরোব কং । তারপর বোধ হয় তাব মনে পড়ল, এখানে তাকে বস্তুতান্ত্রিক হতে হবে। সে বলল, একজনই মাত্র দর্শক, সে বোধ হয় একজিবিশনিস্ট, একশো টাকা দাম করেছে। প্রবীর বলল, আপনাকে কি একটা অনুরোধ করতে পারি? আপনারা তো ছবিব সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে চিত্রকরের সংযোগ কবে দেন এবং চিত্রকরের হয়ে কে কী দাম দিতে চায় তা জেনে রাখেন। আমি সাধারণ মানুষ। আমি দুহাজার দিতে তৈরি আছি স্টাডি ইন ব্লু নামে ছবিটার জন্যে। অনুগ্রহ করে আমার নামটা লিখে নিন। না, না চিত্রকরকে বলতে চাই না, তার ঠিকানাও চাই না। ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্তা স্থির করল, এই একটা ধর্মের আফিং খাওয়া চার্চেব লোকই হবে যে নাকি সমাজের চাপে প্রায় ব্যুবোক্র্যাটদের মতো পোশাক পরে। সে একটা কাগজে লিখে নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল এ ছবিতে কি আপনার ম্যাডোনাব কাজ চলবে? প্রবীর কিছু ভাবছিল। সে বলল, দেখুন, খুচরো খুচরো দাম করে লাভ হয় না। ছবিটার জন্য পাঁচ হাজার টাকা আমার দাম বলা রইল। আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আমার কার্ডটা রাখুন। কেউ যদি পাঁচ হাজাবের বেশী দিতে চায়, অনুগ্রহ করে আমাকে যদি জানান কৃতজ্ঞ থাকবো। এবার ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্তা চিন্তা করল এটা তাহলে কোন ছদ্মবেশী, বিকৃতরুচি, টেকনোক্র্যাট যে পার্টির নির্দেশকে গোপনে ভাঙতে চায়। নাম ও ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে। যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া যাবে।

একজিবিশন থেকে বেরিয়ে প্রবীর বেশ চনচনে ক্ষুধা অনুভব করল। কিন্তু তাকে লাঞ্চে যেতে হলে আর্মি নেভি স্টোরে ফিরতে হবে। নির্জন গলিটায় এসে প্রবীরের মনে হল, এ গলিটাব নাম

হওয়া উচিত স্বপ্ন সরণি কিংবা আধুনিক ড্রিম লেন। যতই নির্জন হোক, কলকেতার দিনের আলোয় দেখা একটা সাধারণ গলিকে কেন সে এমন নাম দিতে চাচ্ছে, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাল না।

পৃথিবী অবশ্যই বস্তুময়। ড্রিম লেনেব শেষে তারের বেড়া। প্রবীর চারিদিকে চাইল। টুপি না খুইয়ে, প্যান্ট ও কোট না ছিঁড়ে, কি কবে পাব হবে, এই সমস্যার শেষে জেন্টস টয়েলেটের প্রগাঢ়গন্ধের স্যাতসেঁতে করিডরটাকে দেখতে পেল কল্পনায়।

প্রবীর স্থির করল আর্মি নেভি স্টোরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সে এক বাক্স চুরুট কিনবে। স্টোরের টয়লেট, করিডর, ব্যাকইয়ার্ড এবং তারের বেড়া যে সাহায্য করেছে তাকে তার প্রতিদান হিসাবে।

কাউন্টাবে চুরুটের বাক্স চেয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীর ভাবল, অ, দেখো ব্যাপার, একজন কল্পনাও করতে পাবে না যে ছবিটা মিত্রাব।

লক্ষ্য করলে দেখা যেতো, কাউন্টারের উপরে প্রবীরের দুহাতের আঙুলগুলো কোন সুরের তালে নিঃশব্দে আঘাত করছে! আ, তুমি বলতেও পারো না, মিত্রা অমন একটা স্টাডি হতে পাবে, কেমন কি না? আর যদি সেই প্যারাসল নামক ফটোর কথা ভাবো, যা দেখে তুমি মিত্রার এক দশক আগেকার ছবি দেখেছো বলে স্থির করেছিলে (এখন মত বদলাতে পাবো), কেমন কি না? ফটো নিশ্চয় রূপ আবিষ্কার। নাকি তা স্কেচ? তোমার চোখে পড়ে নি প্রবীব। তুমি ধারণা করতে পারো, ফটোটায় হেয়ারড্রেসার এবং ড্রেসমেকাবের কৌশল অনেক কয়েকটি বৎসর সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আ, প্রবীব, যদি তুমি জানতে শান্তনুর মতো, যে মিত্রাব মধ্যে এমন একটা স্টাডি ইন ব্লু থাকতে পারে, অর্থাৎ তোমাব যদি শান্তনুর মতো চোখ থাকতো রঙ দেখাব, তবে যৌবনে যামিনী রাযের চেলা হতে আরম্ভ করে রঙ এর বদলে শব্দ নেবে কেন বেছে?

চুরুটের বাক্স নিয়ে প্রবীর হাঁটতে শুরু করল। সে অনুভব কবল, কাছাকাছি একটা ভালো হোটেল খুঁজে বাব করা দবকার। দারুণ চনচনে খিধে পেযেছে। আব মনে হচ্ছে জিহ্বা নানা রকমেব স্বাদ নিতে চায। এমন কি নানা রকম জন্তুব নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যা বিভীষিকাপূর্ণ নামে মানুষের পেটে গিয়ে থাকে এবং যা নিয়ে, প্রবীব কল্পনা করে, মানুষ লাঞ্চ বা ডিনারের পরে দু চার পাঁচ ঘণ্টা দুর্ভাবনায় কাটায তেমন সব বিভীষিকাকে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, সে তাব সিঁদুর রঙের বুইকটাকে স্টার্ট দিয়ে সৈয়দ চাচার হোটেলের এদিককার ব্রাঞ্চেব দিকে চলল। সে আজ সাহস করে ঈজিপসীয়ান খরমুজা বিরিয়ানি আর সরষে ইলিশ সাহস করে একই সঙ্গে উদরে নেবে। সে স্বগতোক্তি করল, ধন্যবাদ মিত্রা।

আমরা ধরে নিতে পারি, তার পরদিনও প্রবীর আবার ঠিক লাঞ্চের আগেই স্টেট গ্র্যাফিক একজিবিশনে যাবে। আব এ বিষয়ে শাশাঙ্কার লেখা বার্ডস, র‍্যাটস ও ফিশেস না পড়েও বলা যায় যে হরিণ যখন লোনামাটি আস্বাদ কবতে এমন কি জল খেতে যায় তখন সে একই পথে যাওয়া আসা করবে। প্রবীর পরদিনও যখন ছবি দেখা শেষ করে (সে খোঁজ নিয়ে খুশি হয়েছে এখনও ছবিটার জন্য কেউ তার পাঁচ হাজারের ডাককে ছাড়িয়ে যায় নি) সে আর্মি নেভিব সামনে তার সিঁদুরে বুইকটায় চড়ছে হঠাৎ তাকে থমকে দাঁড়াতে হল।

শান্তনু বলল, হেলো ফাদার।

গার্ট্রুড বলল, হেলো, হেলো।

মিত্রা বলল, এদিকে যে? নতুবা আর্মি নেভির কোন কোন জিনিস ভালো?

পর পর তিনজনকে সম্ভাষণ করে প্রবীর বলল, এখন কিন্তু আমরা লাঞ্চে যেতে পারি, যদি অনুমতি করো মিত্রা।

মিত্রা বলল, আমরা লাঞ্চের জন্য এখনও কোন জায়গা স্থির করি নি। রোদ লাগানোই আসল কথা। এরা তো ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাওয়ার কথা ভাবছে।

মিত্রার কথায় চোখ তুলে হর্সটেইল চুল, অর্ধমুক্তাঙ্গ স্বাস্থ্যধন্যা গার্ট্রুডকে দেখে ঘোটকীর চিত্রটাই যেন মানানসই মনে হল প্রবীরের।

তা ভালো, নিশ্চয়ই ভালো। আজই গাবনার্স প্লেট নাকি?

মিত্রা একটু ভাবল, সেই ভালো, ট্রুডি, তুমি আর স্যান্টায়ানা কোথাও লাঞ্চ সেরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাও। আমরা বুড়োরা ববং একটা কোয়ায়েট লাঞ্চের খোঁজ করে নেই।

গার্ট্রুড যেন এই ইঙ্গিতেরই অপেক্ষা করছিল। তার হর্সটেইল দুলল, তার ম্যাসকারা করা চোখ গগলসের বড় ফাঁদের নিচে চঞ্চল হল ; চোখের ভুল হতে পারে কিন্তু মনে হল একটা তেজী ঘোটকীর মতো তার নিতম্বের পেশী কাঁপল। কিন্তু মানুষের কিছু ফর্ম্যালিটির অভ্যাস থাকে। দুচার মিনিট এটা ওটা আলোচনায় এল, আর মিত্রা সেই সুযোগে মাঠের কোন স্ট্যাণ্ডটা ভালো, এখানকার বুকিদের সব চাইতে প্রকট কৌশল সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিল শান্তনুকে। দুএকবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী বলো, ফাদার? ওরা, কিন্তু, এই প্রথম এখানকার ঘোড়দৌড় মাঠে যাচ্ছে। প্রবীর একবার আর্মিনেভিতে ঢুকে এক বোতল বিয়ার এনে দিল।

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর লাগল। ওরা ট্যাকসিতে রাস্তা পার হচ্ছে আর সিঁদুরে-লাল বুইকটার পাশে দাঁড়িয়ে মিত্রা আর প্রবীর হাত নাড়ছে। অনুভব করা যায়, কিছু না থেকে কিছু এক তৈরি হচ্ছে, চারিদিকের ছুটন্ত গাড়ির ম্যাটমেটে আলোর রাস্তার উপরে।

ওদের ট্যাক্সি দূরে যেতেই মিত্রা বলল, হেলো, ফাদার।

প্রবীরের চোখ দুটো চকচক করল, বলল, একে কি লাইল্যাক বলে, এই গাউনকে?

মিত্রার গালে হঠাৎ কোথা থেকে অনেক রং এসে জড়ো হল। প্রবীর তার চোখের দৃষ্টির অকৃত্রিম মুগ্ধতা কিছু মাত্র গোপন করতে পারেনি। প্রবীর বলল, মিত্রা, আমাকে বলতে দাও, এমন লাইল্যাক রঙের প্রিন্ট তোমাকে মানায় বটে।

মিত্রা এবার হাসল রির্নন্দন করে। বলল, আসুন, আসুন, আমরা একটা হোটেল খুঁজে নিই।

প্রবীর তার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গাড়ি চলতেই মিত্রা বলল, কেমন, ফাদার, ওদের দুটিকে মানায় না? সেকালে একটা কথা ছিল মাণিকযোটক।

এমন কথা ছিল না।

তবে?

বোধ হয় রাজযোটক আর মাণিকজোড় বলে দুটো কথা ছিল। কিন্তু তুমি কি শান্তনু আর গার্ট্রুডের বিয়ের কথা ভাবছো?

কেমন মানায় না ওদের সব দিক দিয়ে?

সুখী হবে বলছো?

ফাদার, এ বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাইতে পারি?

লাঞ্চের জন্য মিত্রা এবং প্রবীর একটা সাদামাটা হোটেলে ঢুকেছিল।

সেখানে বসেই মিত্রা আবার বলল, জানো, আমার মনে হয় ট্রুডি শান্তনুকে ভালোবাসে, খুবই ভালোবাসে।

কিন্তু তুমি কি সত্যি চাও শান্তনু এখনই বিয়ে করুক? ভাবো, সবদিক ভেবে দেখো।

লাঞ্চ আসতে শুরু করেছে। প্রবীর মিটমিট করে হাসল।

হাসছো ফাদার?

দেখো নিজের বোকামিতে হাসার সাহস থাকা ভালো। আমি তোমার চোখকে উজ্জ্বল দেখে কনট্যাক্ট লেনসের কথা ভেবেছিলাম। অথচ আসলে তা এই লাইল্যাক রঙের প্রভাব।

ধন্যবাদ, ফাদার।

দেখো, মিত্রা, লাঞ্চ-সঙ্গিনীর রূপের প্রশংসা লাঞ্চকে সুস্বাদু করে থাকে, এই সাধারণ চলিত সত্যেরও বেশি কিছু বলতে চাই।

বলা হল?

হ্যাঁ। এবার বিয়ের কথা বলো। তুমি কি সত্যি শান্তনুর বিয়ের কথা ভাবছো? তা তোমাকে ভাবতেও হবে কারণ তুমিই হয়তো এ ব্যাপারে তার অভিভাবক। কিন্তু..

ওদের যদি মানায়, আর ট্রুডি যদি একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসে তবে আর কিন্তু কী?

মানে শান্তনু তো আর্টিস্ট। হ্যাঁ। তার স্টাডি ইন ব্লু দেখার পর আমি জেনেছি সে আর্টিস্ট, ফ্রিক নয়। সে আসছে। এবং আমরা তার সমসাময়িক বলে পরিচিত হবো।

বিয়ের সঙ্গে তা কি বেমানান?

আর্টিস্ট তো কথাটা? দেখো, আর্টিস্টের বিয়ে হয় না। আর্টিস্ট বলো কিংবা সাহিত্যিক, তাদের কদাচিৎ বিয়ে হয়ে থাকে। যা দেখো তা একসঙ্গে থাকা। না, মিত্রা, আর্ট বড় হিংসুটে মেয়ে। আর মেয়েরা হিংসুটে না হলেও নিজের পুরুষকে অন্য কারো কাছে যেতে দেবে না, অশান্তি সৃষ্টি করবে।

তুমি কি মডেলের কথা বলছো আর্টিস্টের? ট্রুডি যথেষ্ট সুন্দরী মডেল হতে পারবে।

মডেল? না, না, আর্টই যথেষ্ট হিংসুটে, যথেষ্ট স্ত্রীলোক। না, মিত্রা, তুমি যদি পারো, শান্তনুকে ট্রুডির দুবাহুর মধ্যে ঠেলে দিও না।

এই লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগে একটা কৌতুকের ঘটনা ঘটেছিল। প্রবীরের বাহুর উপরে হাত রাখল মিত্রা।

কিছু বলবে?

অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে প্রবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এমনভাবে তর্জনীকে সল্টসেলারের উপর দিয়ে বাড়িয়ে মিত্রা দু তিনখানা টেবলের পরে কোণের টেবিলটাকে দেখিয়ে দিল।

সেখানে অত্যন্ত ফরসা ফ্যাকাশে চেহারার একজন লাঞ্চকারী। এমন করে গলায় ন্যাপকিন বাঁধা যে মনে হবে দশজনের খাবার সে একাই খাবে। কিন্তু তার টেবলের অধিকাংশই প্লেটমুক্ত। বরং একটা পুরো বোতল ফুলদানীকে আড়াল ফেলেছে। খাওয়ার বদলে সে বরং কাগজ পেনসিল নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু চোরা চোখে যা সে করছে তাই মিত্রা ও প্রবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যেন সে সি আই ডি কিংবা সি বি আইয়ের কোন লোক। অন্তত তেমন বোকাবোকা করে দেখছে সে মিত্রাকে।

মিত্রার মনে আবার সাইকাইআট্রিস্ট শব্দটাই যেন উঠে এল। কিন্তু এখন যেন বেশ জোরের সঙ্গে ভাবল, কথাটা বাসি। খুবই বাসি।

প্রবীর বলল মৃদুস্বরে, আ, মিত্রা, লোকটি ভগবানকেই সাহায্য করছে। ভগবান পুরুষদের চোখ দিয়েছেন লাইল্যাক পরিহিতাদের দেখতেই।

কিন্তু বারবার চোখে চোখ পড়ে গেলে মুস্কিল হয়। ন্যাপকিন-বাঁধা লোকটির সঙ্গে দু-তিনবার প্রবীরের এবং একবার মিত্রার চোখাচোখি হতেই লোকটি অনুভব করল, একটা কিছু না করলে ভদ্রতার সীমা থাকছে না। সে ন্যাপকিন খুলে চেয়ারে রেখে বোতলটাকে হাতে করে উঠে এল প্রবীরদের টেবলে।

যদি কিছু মনে না করেন—

না, না তেমন কী—

এখানে একটা চেয়ার খালি আছে। আপনি নিশ্চয় প্রবীর সাণ্ডেল।

বসুন। সেই নিওব্যারোক একজিবিশনে, মিত্রা, ইনি ভূদেব সমাদ্দার, মনে পড়ছে তোমার?

তাই তো, তাই তো, ইনি তো মিত্রাই বটেন। বোতলটাকে টেবলে রাখল ভূদেব।

মিত্রা বলল, কিন্তু আমাদেব তো লাঞ্চ হয়ে গিয়েছে...
ওদিকে ভূদেবের ওয়েটার ভূদেবের খোঁজে এই টেবলে এসেছিল।
ভূদেব বলল তিনটে গ্লাসে আইস আনতে।

স্টেট গ্র্যাফিক একজিবিশনের প্রাইজ দেয়া হবে আগামী সপ্তাহে। কিন্তু ইতিমধ্যে কোন চিত্রকবের কোন ছবি কত পয়েন্ট পেয়ে উৎকর্ষের বিচারে কোন স্থান লাভ করেছে, প্রায় সব খববেব কাগজে তা ছাপা হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রী অলীক মুখোপাধ্যায়, তাব সমাবর্তন ভাষণই প্রমাণ, এবারকার চিত্রকরদের দক্ষতায় বিশেষ খুশি হয়েছে। তার সেই সমাবর্তন ভাষণ তো লোকেব মতে এবার অনন্যসাধারণ হয়েছে। এখন সেখানে ছবি বিক্রিব মেলা। একজিবিশন কর্তৃপক্ষের সহায়তায়, ইনফরমেশন ব্যুরোর উদ্যোগে এই সবুজ-সচেতন চিত্রগুলি হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। বেশ ভিড়ই সেখানে।

বলা বাহুল্য গেরি স্যান্টায়ানার স্টাডি ইন ব্লু হাস্যকর রকমে কম পয়েন্ট পেয়েছে। ছবিটার সামনে যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল। কম্পুটারেব হিসাব গড়ে প্রতিঘণ্টায় পনেরজন দর্শক দেখেছে ছবিটাকে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের ধারণা এই একটি ছবি অশ্লীলতায় গড়ে ঘণ্টায় দশজন যুবকের মনে কুপ্রভাব বিস্তার করেছে। অলীক মুখোপাধ্যায়ের মনেও ছবিটা ছাপ ফেলেছিল, তার প্রমাণ সমাবর্তন ভাষণের তিনটি লাইন এই স্টাডি ইন ব্লু সম্বন্ধে ব্যয় কবা হয়েছে। অলীক মুখোপাধ্যায় বলেছে, যদি শেয়াল এবং হায়েনা তুলি ধরতো, যদি শুয়োর ছবি আঁকতো তা হলে এমন ছবিই তৈরি হতে পাবে।

শান্তনু, গার্ট্রুড ও মিত্রা বেলা দশটায় আজ স্টেট একজিবিশনে গিয়েছিল। খানিকটা যেন দুঃসাহসিকতাই বলতে হবে। উদ্দেশ্য ছবিটাকে ফিরিয়ে আনা। দেয়াল থেকে কর্মকর্তাদের, কর্মীদেব দুজনেব সাহায্যে নামিয়ে ছবিটাকে ব্রাউন পেপারে প্যাক করা হলে ইনফবমেশন ব্যুরোতে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিল শান্তনু। সেখানে সে জানতে পারল, প্রবীব সাণ্ডেল নামে একজন চার্চের লোক ছবিটার জন্য পাঁচ হাজাব টাকা পর্যন্ত দাম দিতে রাজি আছে।

সংবাদটা আনন্দেব।

শুনে মিত্রা ভাবল, কী অদ্ভুত বকমে চাপা ভদ্রলোক, সেদিনই দেখা হল কিন্তু কিছু বলেন নি ছবি সম্বন্ধে।

গার্ট্রুড বলল, তা হলে অন্তত একজন ভদ্রলোক আছেন যিনি ছবিটাকে টাকা দিয়ে কেনাব কথা মনে করেছেন।

শান্তনু বলল, কিন্তু ছবিটা তো তিনি নিয়ে গেলেন না, আমরাই বা টাকাটা নেব কি করে?

সে যাই হোক, ব্রাউন পেপারে মোড়া ক্যানভাসটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে শান্তনু যখন একপাশে গার্ট্রুড, অন্যপাশে মিত্রাকে নিয়ে স্টেট একজিবিশনেব তোরণ দিয়ে বেরিয়ে এল, তখন কলকেতার পথে রোদটা বেশ খটখটে। তাদের দেখে ছবি কিনেছে, এবং তা কিনতে পেরে খুশি এমন একটি নাগরিকের দল বলেই মনে হল। এমন কি পথের ধারেব একটা স্টল থেকে ডালমুট কিনে আনল গার্ট্রুড।

এখান একটা কৌতুকের কথা না বলে পারা যাচ্ছে না। একই মানুষ, যখন সে নাগবিক এবং যখন সে গৃহী অর্থাৎ নিজের পারিবারিক পরিবেশে, এই দুই অবস্থায় কি অনুভূতির পার্থক্য হয়? যেন তাই হল, দেখা যাচ্ছে। কিছুদূর যেতে না যেতেই এই তিনজনের হাসি, কথা ও চালচলনে মনে হতে পারে তারা এক ট্রফিবিজয়ী হিরোর দল। যেন বা প্রথম, দ্বিতীয় না হোক অন্তত তৃতীয়

স্থান লাভ করেছে শান্তনুর ছবি। বেশ একটা সাফল্যের কবোষ্ণতায় তারা যেন উজ্জ্বল। অথচ নাগরি[redacted] হিসাবে অলীক মুখোপাধ্যায় এবং জন সাধারণের বিঅ্যাকশন দেখে চূড়ান্ত অসাফল্যের কথাই বুঝ[redacted] হবে। সে বিচাবে শান্তনুর মাথা সূর্যেব আলোয় চকচক না করে লজ্জায় সামনের দিকে ঝুঁকে প[redacted] উচিত ছিল। বিড়ম্বনায মিত্রার এবং বিব্রত গার্ট্রুডেব মুখ লজ্জালাল হওয়া উচিত ছিল। [redacted] রিঅ্যাকশনারী মনের স্বজনপোষণ প্রবৃত্তি কিংবা নিতান্ত মধ্যশ্রেণীর মনেব উৎকর্ষ ও অপ[redacted]র পার্থক্য করতে না পারা?

গার্ট্রুড বলল, আ, ডার্লিং, আমি আব তুমি সাণ্ডেলের বাড়িতে ছবিটা পৌঁছে দেবো। [redacted]সেই টাকায় একটা ভালো ডিনার হবে।

তাও ভালো। আমি ভেবেছিলাম তোমরা খুব বড এক প্যাকেট ডালমুট কিনতে চ[redacted]। মিত্রা হাসল।

রূপসী পাঠিকা, এটাকে কি এক রকমের অনুভূতিহীনতাব প্রমাণ বলে নেয়া হ[redacted]স্টাডি ইন ব্লু তিরস্কৃত হওয়াতে তার মডেল মিত্রাব কি তিবস্কৃত বোধ কবা উচিত হয় না? [redacted]তার শাড়িব বঙে, নখের রঙে, ঠোঁটের রঙে কোথাও কি কুণ্ঠা আছে! গার্ট্রুড অবশ্যই জা[redacted]স্টাডি ইন ব্লু তাকে সামনে রেখে আঁকা, তা সত্ত্বেও মিত্রাব পদক্ষেপে এতটুকু দ্বিধা নেই[redacted]

মিত্রা বলল, কিন্তু আমরা কি পায়ে হেঁটে চলবো?

শান্তনু হঠাৎ থেমে দাঁড়াল। সে সামনে চেযেই চলছিল। কথা বলতে[redacted]তে চললেও কিছু দেখছিল নিবিষ্ট মনে। মিত্রাব কথায যেন সম্বিত পেয়ে বলল, দেখো, [redacted] এগিযে এসো। কী সুন্দর স্কাই-লাইন!

ফুটপাতেব উপরে মাথা কাছাকাছি এনে তিনজন টুরিস্টেব মতে[redacted]ারা দাঁড়িয়ে পডল।

কেমন, সুন্দর নয়?

উচ্ছ্বসিত গার্ট্রুড বলল, চার্মিং।

মিত্রা বলল, আমাদেব কলকেতা কিন্তু কখনও কখনও সত্যি স[redacted] যেন স্কাইলাইনের সৌন্দর্য তার মুখে প্রতিফলিত হল।।

রূপসী পাঠিকা, এবার আবার মন্তব্য করা প্রয়োজন বোধ ক[redacted] মন্ত্রীর এবং জনতার কলকেতা ছাড়াও কি একটা কলকেতা আছে যাকে পরাজিত, জনতা থে[redacted]চ্ছিন্ন, একটি সংখ্যালঘুদল আপন মনে করতে পারে? যদি তা করে তবে কি তা এক নি[redacted]বীরত্ব?

কিন্তু ট্যাক্সি নিতে বলল মিত্রা। ট্যাক্সি একটু দাঁড়াতে[redacted]াওয়া গেল। শান্তনু আর গার্ট্রুড়কে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে মিত্রা বলল, ট্রুডি, আজ আমাদের[redacted]নেই লাঞ্চ করবে। তোমরা যাও, আমি আর্মি নেভি থেকে চিজ নিয়ে যাবো।

শান্তনু হেসে বলল, বাড়ির কর্ত্রীর কর্তব্য।

মিত্রা হাসতে হাসতে আর্মি নেভির দিকে [redacted]লল।

সে কি এখন কিছু ভাববে অর্থাৎ নিজের ম[redacted]ধ্যে ঘুরে বেড়াবে, কিংবা শেষ সেপ্টেম্বরের রোদে লাঞ্চের বেলার আগেকার কলকেতার এই ঈষৎ শ্লথগতি জনতাকে লক্ষ্য করবে। এ দুটো, অবশ্য, এমন নয় যে মিশিয়ে নেয়া যায় না। একটা প্রক্রিয়া আছে মনের যার ফলে এই রোদে ঝলকানো জনতা থেকে কিছু কিছু অংশ মনের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়। তখন ভাবনা নানা ফ্যান্টাসি তৈরি করতে থাকে।

এক কিলোমিটার দূরে আর্মি নেভি স্টোর। শশাওয়ালাটা তার ঝাঁকার উপরে কখনও ঝুঁকে কখনও দাঁড়িয়ে কুস্তির পাঁয়তারা কষছে। স্টাডি ইন ব্লু ছবিটা প্রবীর দেখেছে। তার ঘরের দেয়ালে ছবিটা টাঙানো হলে প্রবীর সাণ্ডেল নিশ্চয়ই কোন-না-কোন সময়ে ছবিটাতে একটা পরিচিত মুখের আদল

দেখতে পাবে। এটা একটা স্থায়ী জানাজানি হল না যে ছবিটার মডেল মিত্রা? সাদা লম্বা মোটর গাড়িটা যেন এই গলির পক্ষে বেশী চওড়া। তাই বলে, মিত্রা ফুটপাতের উপরে উঠে এল, লজ্জায় রঙীন হয়ে ওঠার কিছু নেই। কারণ সে নিজে কিন্তু যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে চলে, আব প্রকৃতপক্ষে শান্তনু অনেক ছোট বয়সে। অনেক ছোট। তুমি ভাবতেই পাবো না, ফুটপাতের হকারেব এই কমালগুলো দেখতে যতো ভালো আসলে কি ঠিক তেমন কেনার উপযুক্ত ভালো ; ভাবতেই পাবো না যে একদিন হঠাৎ কেমন আদুরে গলায় শান্তনু দিদি বলেছিল ছবিটা আঁকতে আঁকতে—গাড়িটা, সেটাই নাকি, তেমনই সাদা বটে—আব তখন (এখন তো কেউ শুনছে না) ব্লাউজের বোতাম খুলে স্কেচ কবছিল। নাকি গড়নটা ভালো। তা, সে নিজে নিশ্চযই অভিজ্ঞা। আব গাম্ভীর্য তাকে মানায়ও। দেখো, এই তো অনায়াসে চিজ কিনতে একটা পবিবারের কর্ত্রীর মতো সে আর্মি নেভির দিকে চলেছে। তুমি বলতে পারো, শান্তনু (কেই বা ইদানীং?) অনভিজ্ঞ নয়। এই গার্ট্রুড তাকে ভালোবেসে ফেলেছে —গাড়িটা বোধ হয তার হাঁটা দেখে ভাবছে, তার ট্যাক্সি দবকাব, এই এখনই একবাব যেন তাব গা ঘেঁষে গেল, অনেক লোকই তো হাঁটছে? কি কবে গাড়িওয়ালা ভাবছে ট্যাক্সিটা তাবই দবকার? তার হাঁটা কি দৃষ্টি আকর্ষণ কবছে? মিত্রাব মুখটা উজ্জ্বল হল --নাকি গডনটা ভালো, আঁকার মতো। সামনে আর্মি নেভিব হোর্ডিং দোতলায গাযে। আরে গাডিটা—রাস্তা থেকে সরে ফুটপাতের যে দিকে দেযাল সেদিকে সবে এল মিত্রা। আব শান্তনু টুডিকে বিয়ে করে, তা আমি চাই, সত্যি চাই। প্রবীর অবশ্য একটা থিয়োরির কথা বলেছে। আর্টিস্ট নাকি সাধারণেব মতো স্ত্রী পেযে তৃপ্ত হয না। আরে, সাদা গাড়িটা বকবাজদের শিসেব মতো হর্ণ বাজাচ্ছে। বিশ্বাস কবো, বেশ কথা, ছবিটাব কথাই ধরো, তুমি কি রং দেখে এমন ভুল কববে যে দুবাহু বাড়ালেই কন্যাটিকে ধরা যাবে? যদিও অত জীবন্ত? আবেগে মথিত? না, কোন চোখের দৃষ্টি, সবুজ দাড়িব সুচলো ডগা কিংবা আঙুলেব খোঁচাও, ছবিতে যা আছে তার চাইতে গভীর কিছু আবিষ্কাব করতে পাববে না , বড় জোব আঙুলটা ক্যানভাস ফুটো কবে যেতে পাবে। সামনেব গলিটা পাব হলেই আর্মি নেভিব স্টোব। হাসিতে উজ্জ্বল হল মিত্রার মুখ। ছবিটাব লাবণ্য তুমি হাত বুলিযে বুলিয়ে ছুঁতে পাবো না, কাচেব বাক্সে ঘুমন্ত মোমের পুতুল যেমন, বড় জোব বং এব পিগমেন্টগুলো খসখস কবে তোমাব হাতে। হ্যাঁ, কাচের বাক্সের মতো শীতল আব কঠিন, অথচ কত নবম তুমি ভাবতে পাবো না।

গলিটা পার হতে সাদাটে ফুটপাত থেকে কালো ম্যাকাডামে পা রেখেছিল মিত্রা, ভোঁৎ করে হর্নে রকবাজী শিস দিযে, রোক বোক কবতে করতে সাদা গাড়িটা গলিতে ঢুকে পড়ল, যেন ডাইনেব সামনেব চাকা মিত্রার এগিযে যাওযা বাঁ পাযেব উপব দিযে চলে যাবে। অস্বাভাবিক চিৎকাব, হল্লা, গাড়ি থেকে যারা নেমেছিল সেই তিন চাবজনেব মধ্যেই যেন ধাক্কাধাক্কি, তর্ক-বিতর্ক। মিত্রা পাশ কাটিয়ে গাড়িটাব সামনে দিয়ে পার হতে চেষ্টা করল। অন্তত ছখানা হাত তাকে পাঁজাকোলা কবে তুলে গাড়ির পিছন সিটে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মিত্রা পুলিশ পুলিশ বলে নিশ্চয়ই চিৎকাব করল। একজন তার মুখেব উপবে হাত চেপে ধবল, রসুন ও ঘামের গন্ধে এবং কী এক অজানা ভয়ে মিত্রাও ঘেমে উঠল। একজন বলল, আমবাই পুলিশ।

আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হল? ওয়ারেন্টটা কোথায়? সভ্য মানুষেব সমাজের উপযুক্ত প্রশ্ন করল মিত্রা।

আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই। তা ছাড়া জেনে রাখুন, ভায়োলেন্ট হওয়াব চেষ্টা করবেন না। আমাদের ভায়োলেন্ট হতে বাধ্য করবেন না।

মিত্রার নিমজ্জমান মস্তিষ্ক একবার ভাবল, কেমন অদ্ভুত না কলকেতার পথ থেকে বেলা এগারোটার রোদে একটি স্ত্রীলোকের লোপ পেয়ে যাওয়া।

এই ঘরখানা কি ঠিক তেমন একটা ঘরই যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং প্রথম শ্রেণীর অপরাধীদের প্রশ্ন করা হয়? কী বৈশিষ্ট্য এই ঘরটার? সাদা, রঙ না-দেয়া, চুনকাম করা দেয়াল। চারদিকে চার দরজা হলুদ রঙের। একটা মাত্র গবাদ-ছাড়া জানালা। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টুল। টুলের সামনে একটা টেবল। টেবলের ওপারে দুখানা সোজা পিঠের চেয়ার। দরজার মাথায় টিউব লাইট। দেয়াল ঘেঁষে পুরনো হয়ে যাওয়া, ছিটের ঢাকনা-দেয়া কয়েক টুকরো সোফা। এটা কি একটা বর্ণনা হল? নাকি যেখানে পুলিশের সব চাইতে ওস্তাদ প্রশ্নকারীরা প্রথম শ্রেণীর অপরাধীদের প্রশ্নের ছুরিতে ছিন্নভিন্ন করে, সেরকম ঘরের বর্ণনা এই রকমই হয়ে থাকে। বাসি চা-তলানি, পুরনো সিগারেট, ধোঁয়া, রসুন আর উগ্র ঘামের গন্ধ। ওদিকের ওই গবাদ-ছাড়া জানালাটা খোলা। এই ঘরটা চারতলায়। লিফটে তাই আন্দাজ করেছিল মিত্রা।

যেন সে পোড়খাওয়া অপরাধীদের মতো সিঁড়ির ভাঁজ গুণে গুণে মনে রাখবে। কী রকম হয় পোড়খাওয়া অপরাধীরা? না, একটা কথাও আর উচ্চারণ করে নি মিত্রা এ ঘরে এসে টুলটায় বসার পর থেকে। কী জানি, পোড়খাওয়া অপরাধীদের মনে ও মনের চারিদিকে একটা অদৃশ্য কিন্তু শক্ত খোলা থাকে, যে যতই শাণিত করো প্রশ্ন, এমন কি সব রকম থার্ড ডিগ্রি পদ্ধতিতেও মনকে সে কেবলই খোলার মধ্যে গুটিয়ে নেয়। আর তার প্রশ্নকারীরাও একটা কথাও বলেনি। যেন অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে, যেন এই নিঃশব্দতা মিত্রার মনের চারিদিকে তৈরি মনের খোলসটাকে ভাঙতে পারে কি না।

কী আশ্চর্য! এরা কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন একটি কথাও বলেনি যা থেকে তুমি আন্দাজ করতে পারো, মিত্রার কী অপরাধ, কিংবা মিত্রার অপরাধগুলোর মধ্যে কোনটিকে এরা তদন্ত করতে চায়। সবাই দেয়াল-ঘেঁষা সোফার টুকরোগুলোতে পৃথক পৃথক বসেছে। যেন রোদে ঘুরে ক্লান্ত। যেন যে যার মতো ছবির বই দেখতে ব্যস্ত। অথচ ওদের বাইসেপগুলো দেখো। যেন তৈরি হয়ে আছে। চার দরজার যে কোন একটির দিকে তদন্ত-অধীন অপরাধী ঝাঁপিয়ে পড়া মাত্র সাঁড়াশির মতো বাইসেপে চেপে ধরবে।

গরাদ-ছাড়া জানালাটা একটা সাদা স্কোয়ার। আর ওর নিচেই ফুটপাত। চারতলা যত উঁচু হয়, ফুটপাত ওই জানালার ঠিক ততটা নিচে। মাঝখানে সাদা শূন্যতা। যদি শূন্যতা ছাড়া কিছু থাকে, তবে অদৃশ্য সাদা বাষ্প যা গরম ফুটপাত থেকে উঠতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্ত কি কোন অপরাধী জানালা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে পেরেছে? জানালার কাছে ওই লোকটার তামাটে রঙের বাইসেপটার শিরাটাও কী রকম মোটা, দেখো। কিন্তু কী শূন্যতা জানালাটার নিচে! একটা কিছু যেন গলা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। অদৃশ্যভাবে ঠোঁট ফাঁক করে বাতাস নিল মিত্রা।

তার কোন অপরাধে এরা তাকে অ্যারেস্ট করেছে, তা সে জানে না। সে কথা বলে নি। নড়ে নি। একবার মাথা নেড়েছিল। না, সেবার নয়, যখন একজন নতুন প্রশ্নকারী তার হ্যাণ্ডব্যাগটা এনে টেবলে রেখে বলেছিল, এটা আপনারই হ্যাণ্ডব্যাগ বোধ হয় ; বরং সেবার যখন একজন (উঁচু দরের প্রশ্নকারীই হবে সে, যেন বা সেক্রেটারী পর্যায়ের কেউ) এসে বলেছিল, আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু ভালো, মিত্রা প্রায় অদৃশ্যভাবে অসহিষ্ণুতা জানিয়ে মাথা দুলিয়েছিল। আর লোকটা উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ঘরটার এ মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে গিয়েছিল যেন মেঝেতে এক অদৃশ্য যোগ চিহ্ন তৈরি করে। কিন্তু লোকটা যতই চিন্তিত হোক, বার বার যে সে মিত্রার মুখটাকে দেখছিল এবং বাস্টকে, তা মিত্রা তার নিচু করা চোখেও ধরতে পেয়েছিল।

কট কট কটাং করে মাথার উপর একটা পুরনো ফ্যান ঘুরছে, ঘুরছে। যেন ওই শব্দটাই ফ্যানটাকে চালাচ্ছে।

কিন্তু এখন মিত্রার এই লাইল্যাক গাউন যা শান্তনুর পছন্দ বটে তার হুক কিন্তু সামনে খোলে না, বরং পিছনে শক্ত ক্ল্যাম্পে আটকানো। তা ছাড়া ফ্যানটা আদৌ নীল নয়। বরং সবুজ, সবজে-কালো রং।

মিত্রা জানতো ফড়িং ধরা অপরাধ। কিন্তু সবজে স্বচ্ছ-ডানার সেই ফড়িংটাকে সে ধরেছিল পার্কে। বাড়ি পর্যন্ত এনেছিল। স্কুলের টিফিন বাক্সে লুকিয়ে রেখেছিল। হ্যাঁ, অপরাধই তো। ফড়িংটা আর উড়তে পারছিল না। তখনও শান্তনু জন্মায় নি। শশী শাশা শাশাঙ্কা তাদের মাম হয়ে আসে নি।

কিন্তু সেটা পরে, বোধ হয় ফড়িংটা ধরার দুবছর পরে। মিত্রার নিজের মা তখন বেঁচে। অসুস্থ ছিলেন। হেস্টিংস প্যালেসের বড় ঘরটায় শুয়ে থাকতেন, কখনও কখনও ড্রয়িংরুমে আসতেন আধঘণ্টার জন্যে। একবার স্কুলের বন্ধ তখন, মিত্রার অভ্যাস হয়েছিল মায়ের বিছানার পাশে বসে খেলার ' ড্রেসিং এর গন্ধে কেমন যেন গা গুলিয়ে আসতো মিত্রার, তবু মিত্রার পুতুলখেলা দেখে মায়ের চোখ দুটি চকচক করতো। একদিন মা ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই সুযোগে শিওরের ছোট্ট ট্রিঙ্কেটের বাক্সটা থেকে সরু চেনে বাঁধা লকেটটাকে সরিয়েছিল মিত্রা। পুতুলের গলার লকেট হার করে দিয়েছিল। খোঁজ খোঁজ, কী খোঁজাখুঁজি সেই লকেটটাকে নিয়ে। দাস দাসীরা তটস্থ। একজন তো বলেই ফেলল মিত্রা ছাড়া, তখন অবশ্য মিত্রা হয়নি নাম, কেই বা একা-একা থাকে কর্ত্রীর ঘরে। বাবা এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কেউ যেন তারে কঠিন তিরস্কার করেছিল। চোখে জল ভরে এসেছিল। না, তবু লকেটের কথা সে বলে নি, বোধহয় মিত্রার গভার্নেসই ধরে ফেলেছিল ব্যাপারটা, আর বলেছিল, মা হয়তো বেশি দিন বাঁচবেন না, কেন তাঁকে মিথ্যা বলে কষ্ট দাও? (মিত্রার চোখে এখন কি জল ভরে আসছে?) মা বাঁচেন নি। মিত্রা চেষ্টা করছিল, খুবই চেষ্টা করছিল লকেটটাকে ফিরিয়ে দিতে মায়ের হাতে, কিন্তু তার অনুতাপ প্রকৃত হতে, মনকে শক্ত করতে একটু বেশি সময় নিচ্ছিল। আর মা যে অত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন তা কি কেউ ভেবেছিল। কিছুই কি বুঝতে পেরেছিল সে? ভাসা ভাসা কতগুলো কথা। সার্কিনোমা, নাকি ক্যানসার অব দি ব্রেস্ট, মেয়েদেরই হয়। চল্লিশের পরেই মেয়েদের নাকি হতে পারে। মার কি একটু আগেই হয়েছিল? না, অবশ্য এই গাউনটার পিছন দিকে ক্ল্যাম্প, সামনের দিকে ব্লাউজের মতো হুক নয়। আর এ ঘরটাও নীল নয়।

পরে সে জেনেছিল লকেটটা মা একজনকে দিতে চেয়েছিল। যার নামের 'পি' এই ইংরেজি অক্ষর বুচি হীরেতে আঁকা ছিল লকেটের পিছনে। আর লকেট খুলে তাতে এক গাছি চুল দেখেছিল মিত্রা। মায়ের মাথার চুলের মতোই।

বছর দুয়েক পরে মিত্রা লকেটটা হাতে করে মায়ের ক .রে গিয়েছিল। ঠিক তখন পার্ক সার্কাসের কবরখানায় নতুন করে মার্বেলের আর্ন তৈরি করা, তাতে ভস্মাবশেষ রাখা কিংবা সেনোটাফ তুলে তাতে দেহ রাখবার ফ্যাশন হয়েছিল আমাদের ক্যালক্যাটানদের। লকেটটা পকেটে নিয়ে স্কুল ফেরত বাড়িতে না এসে সে এক সাহসিক মিত্রা মায়ের কবরের কাছে গিয়েছিল। বাড়ি থেকে অতদূরে একা, তা হোক। বাড়িতে সবাই দেরিতে ভাবতে শুরু করেছে, তা হোক। মিত্রা স্থির করেছিল, মায়ের কবরের যে দিকে মায়ের মাথা সেখানে মাথা রেখে, সেই শীতল মার্বেলে মাথা রেখে সে লকেটটার কথা বলবে। বলবে, সবাই হৈ চৈ না করলে লকেট-পরা পুতুলটা নিয়েই মায়ের বিছানায় খেলতে যেতো সে, তাতেই মা বুঝতে পারতেন লকেটটা কোথায়।

কান্নাগুলো কথা হয়ে যাচ্ছিল। ছোট ছোট প্রায়-অনুচ্চারিত শব্দ। কিন্তু কাঁদতে পারে নি মিত্রা। কতই বা তার বয়স। পনরো কি না কে জানে। সেই প্রথম ব্রেসিয়ার পরেছিল। তার যেন হঠাৎ মনে পড়েছিল কয়েকদিন আগে জানা (কেউ কি এসব ইচ্ছা করে জানায়, কিন্তু গোপনও থাকে

না) ব্যাপারটা। লকেটটা মা দিতে চেয়েছিলেন মিত্রার প্রকৃত জনককে।

না, না, মাকে সে ঘৃণা করে নি। কিন্তু সেদিন থেকেই মাকে তার পরিচিত বন্ধু, সমকক্ষা একজন মনে হয়েছে। আর একজন নারী বলে মনে হয়েছে।

কট কটটাং, ফ্যানটা ঘুরছে ঘুরছে।

আর সেখানেই সেই কবরখানাতেই জীবন বায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। কে জীবন রায়? জীবনে তার সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার দেখা হয় নি। হয়তো সে এখন ট্রাম কোম্পানির কিংবা অন্য কোন এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ফোরম্যান। ষোল সতের বছরের রোগাটে ফর্সা একটা ছোকরা, পার্ক-কবরখানাব গোধুলিতে কান্নার ব্যথাব পাতাছড়ানো কবরগুলির মধ্যেকার গলিতে চলতে চলতে যে প্রথম মিত্রার নিতম্বে হাত রেখেছিল। গলার কাছে স্কুলফ্রকের ক্ল্যাম্প খুলতে চেষ্টা করেছিল। অনুভূতিটা এখন মনে আছে যেন। অপরাধ যদি বলো..

ফ্যানটা ঘুরছে। আর ওরাও কথা বলছে না। এটাই বোধ হয় সহিষ্ণুতা ভেঙে ফেলাব কৌশল ওদেব। কট কট কটাং, এক সেকেণ্ডে তিনবার শব্দ হলে মিনিটে একশো আশি বার, আধঘণ্টায় পাঁচ হাজার চারশো বার। কী যেন ঘুরে যাচ্ছে মিত্রার মাথার মধ্যে। না, না, তোমরা বরং কথা বলো। নতুবা, বলা যায় না তো, আমি হয়তো গরাদ-ছাড়া জানালাটার দিকে ছুটে যেতে পারি। এ কথার সুরটা ছিল বুঝিয়ে বলার মতো, কিন্তু পরক্ষণেই কিছু যেন একটা গর্জন করে উঠল মিত্রার মনে : চালাকি পেয়েছো? আমি এক স্বাধীন দেশের নাগরিক নই? হতে পারি আমি অপরাধী, তাই বলে তোমবা এই থার্ড ডিগ্রী কৌশল অন্তহীন কাল পর্যন্ত চালাতে পারো না।

ফডিংটা ঘুরছে দেখো। তোমরা জানো যে আমি মুখ খুলবো না। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয় দাবি করবো আমার উকিলের সামনে ছাডা তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো না। কারণ এখনও তো তোমরা আমাকে চার্জ করতেই সাহস পাচ্ছ না। এটাই একমাত্র এবং আসল কথা যে তোমবা এখনও কেউ বলতে পারছো না, কেন আমাকে বিনা ওয়ারেন্টে রাস্তায় অ্যারেস্ট করা হল।

কট কটটাং, কট কটটাং। না, ওটাকে আমি আদি পাপ মনে করি না। তারপবে তার অনেক পরে ভালোবাসা কাকে বলে যখন জানলাম, তখনও মাকে পাপী মনে করি নি, যদি তোমরা জানতে চাও। আর আমার দ্বিতীয় স্বামীর অর্থাৎ বেলা সোমের ছোট ভাই ফরেন সার্ভিসেব মধু সেনেব মৃত্যুর জন্যও দায়ী নই। তোমরা বলবে, সেটা হয়তো তার আত্মহত্যা ছিল। নতুবা অত চওড়া কজওয়ে থেকে একটা নতুন দামী গাড়ি আরোহী-সমেত তেমন করে জলে পড়ে না। কিন্তু মিত্রা মোটামুটি সুখেই ছিল মধু সেনের ভালোবাসায়। বিয়ের আগেও সে অস্বীকার করে নি। প্রথম স্বামী জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, তোমাকে ডিটেকটিভ লাগিযে ডিভোর্সের প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে না। তোমার টাকা চাই না। মধু সেন আমাকে প্রায় এক বছব থেকে ভালোবাসছে। সেই ভালোবাসা বিয়ের পর শুকিয়ে গিয়েছিল, মনে করা উচিত হবে না। মধু সেনের মৃত্যু সংবাদ যখন এসেছিল, তখন মিত্রা নাকি গলার অ্যাম্বারের হারটা বুড়ো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলেছিল শেষ হল? তাতে কী প্রমাণ হয়? একথায় কি তার অপরাধ প্রমাণ হয়? তাদের ভালোবাসাটা, হতে পারে, আগের মতো হালকা ছিল না। হয়তো তার আর দেবদূতের মতো পাখা ছিল না। তাই বলে মিত্রা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যা অনুভব করেছিল, তা যে একটা মুক্তির স্বাদ তা কেউই কোনদিন প্রমাণ করতে পারে? হয়তো সে প্রেমের আর পাখা ছিল না, হয়তো মধু সেনের কোথাও একটা ক্লান্তি জমে ছিল সব পেয়েও দুহাত ভরে পেয়েও, কিন্তু সে অনুভূতিকে মনের মধ্যেও ভাষা দেয় নি মিত্রা, তোমরা কি ভেবেছো তার ভয়ে সে সাইকাইআট্রিস্টদের থেকে দূরে থাকে?

ফড়িংটা ডাণ্ডাটাকে কামড়ে ধরে ঘুরছে। এইবার নিয়ে বোধ হয় একুশ হাজার বার হল। যেন মাথাটা ঘুরছে। যেন কিছু একটা পাক দিয়ে দিয়ে মনের তলাটাকে ঘুঁটে দিচ্ছে। এখন কি লাঞ্চের

সময় নয়? না, না না, কখনই কোন কথা বলবে না মিত্রা। হার্ডেন্ড ক্রিমিন্যাল যদি বলো, তবে তাই। কিন্তু কী ক্ষুধাই পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি অপরাধ করে থাকে সে, তবে এক অশ্লীল চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা। সে বিষয়ে তোমরা জেরা করতে পারো, কিন্তু উকিলেব সামনে। সুরথ সোমকে খবর দিতে হবে। না, তুলির টানের মতো হালকা ছিল না মধু সেনেব প্রেম আব।

একজন বলল (যেন সবাই একসঙ্গে ঘড়ি দেখল কথাটা বলার আগে) ম্যাডাম, আপনাকে একটু চা এনে দেব?

চা? ও হো! না, না। ধন্যবাদ! বলল মিত্রা।

কী সাংঘাতিক! এরা কি সবাই মনস্তাত্ত্বিক! লাঞ্চের জন্য তার ক্ষুধার কথা যেই মাত্র ভেবেছে অমনি চায়ের কথা বলল! কী সাংঘাতিক! কখনই এদের দেয়া চা খাওয়ার মতো ছোট হতে পারে না সে। তাছাড়া হয়তো চায়ে এমন কিছু দেবে, হয়তো সোডিয়াম পেন্টোথাল একস কী তেমন কিছু যাব ফলে সে বকবক কবতে সুরু করবে।

আসলে সে একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। দূর করো, এরা কি আদি পাপের হিসাব নিতে বসেছে?

সোজা হয়ে বসল মিত্রা। তাব চুলগুলো ধস্তাধস্তিতে আলগা হয়ে বুকের উপরে। না মাথার জং ধরা ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে। ওরা যখন চা খাওয়ার কথা বলেছে তা হলে সিগারেট খাওয়া যায়। তার হ্যাণ্ডব্যাগটা তো সামনেই, টেনে নিয়ে খবরর করে জিপ টেনে হ্যাণ্ডব্যাগ খুলল। সিগারেটের প্যাকেট আব দেশলাইটা ঠিকই আছে। সিগাবেট ধবাল সে। খুব জোরে টান দিয়ে দুনাক দিযেই অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে যেন সুস্থ বোধ করল। তার নিজের পরিচিত ব্র্যাণ্ডেব গন্ধ যেন তাকে অভয় দিল। আর তার ফলেই, হ্যাণ্ডব্যাগ খুলতে সিগারেট দেশলাই বাব করতে যা বোঝা যায় নি, সে দেখতে পেল তার কব্জিব নিচে সাদা চামড়ায় লাল, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা নখেব আঁচড়। কব্জিটায় অসহ্য ব্যথা অনুভব কবল, তারপর লক্ষ্য করল সেটা যেন ফুলেছে। নীল হয়ে আছে। তাব চোখ জ্বলে উঠল। এতক্ষণে যেন তার মাথার ঘুম ভেঙেছে। ওদের একজন বলল, ম্যাডাম, ওদিকেব পর্দার পিছনে বাথরুম। আপনি ওখানে নাকে পাউডার দিতে পাবেন।

খুশি হল মিত্রা। হ্যাঁ, এতক্ষণে কুকুরবা কুকুরের মতো কথা বলেছে। কিন্তু চোখ সে গোপন রাখবে। গগলসটাকে ঠিক কবে বসাতে গিয়ে তাকে খুব মৃদু হলেও উঃ শব্দটা করতে হল। ব্রিজে বোধ হয় ছড়ে গিয়েছে নাক।

অপরাধ? মনে মনে হাসল মিত্রা, একটা অশ্লীল ছবিব সঙ্গে সে সংযুক্ত, তাই? ঠোঁট কামড়ে ধরল, যেন সিগারেটের একটা ফ্লেকে জ্বালা করছে ঠোঁট।

কিন্তু কী ভাবে, কখন তোমার মুক্তি হবে, তা কি তুমি জানো? রূপসী পাঠিকা, সেই অবস্থায় আপনার ম্যাজিকের কথা মনে হতো। ঘবের পুলিশবা একই সঙ্গে ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে একজন ভদ্রগোছের মানুষ সেই ঘরে এল। মিত্রা চোখ ঘুরিয়ে রেখেছিল কাজেই প্রবেশকারী কেউ এসে তার সামনের টেবলের পাশে দাঁড়াল। যেন ভয়ঙ্কর রকমে অবাক হল। একটু সলজ্জ হেসে বলল, আপনি, মিসেস বাসু এখানে?

মিত্রা যেন তবু চিনতে পারবে না।

আগন্তুক বলল এবার অভ্যস্ত মধুর গলায়, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি আপনার বাড়িতে এই তো কয়েক দিন আগে ডিনারে অতিথি ছিলাম। এবার মিত্রা চোখ তুলল। নিজের মোচড়ানো কব্জি দেখল, জুতোব চাপে ময়লা নিজের সাদা কিড পাম্পকে লক্ষ্য করল, বলল, আপনি আমাদের সম্মানিত সংস্কৃতি-মন্ত্রী অলীক মুখোপাধ্যায়?

তারপর মিত্রার চোখের কোণ জ্বালা করতে সুরু করল। সুস্থ বাঁ হাত তুলে গগলসটাকে সোজা

করল। বলল, কিন্তু আর কিছু বলার আগে আমি আমার ল-ইয়ার সুরথ সোমকে এখানে চাই।

কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! এঁকে এখানে বসিয়েছো কেন? আর তোমাদের বুদ্ধি হবে না। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। ব্যাগটা আমাকে দিন। তোমরা যাও। এই পাশের ঘরটাই আমার চেম্বার।

প্রশ্নকারীদের ঘর আর মন্ত্রীর ঘরে নিশ্চয়ই তফাৎ থাকে। মেঝের কার্পেট, আসবাবের পালিশ, জানালার পর্দা, টেবলেব উপরে রাখা পেপার-ওয়েট ইত্যাদির সৌন্দর্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেটা যদি আবার সংস্কৃতি-মন্ত্রীব হয় তবে আধুনিক সংস্কৃতির চিহ্ন তাতে ভুরিভুরি থাকবে!

অলীক বলল, বসুন, মিসেস বাসু, বসুন। কিংবা আপনি তো আর কখনও এ ঘরে আসেন নি, আপনার পাশের জানালাটায় দেখুন, এমন সুন্দর স্কাইলাইন আর কোথাও দেখতে পাবেন না।

এগিয়ে এসে জানালার পর্দা সবিয়ে ধবল অলীক।

স্কাইলাইন দেখা শেষ হলে সৌন্দর্যপ্রিয় সংস্কৃতিমন্ত্রী বলল বাহ্, লাভলি, আপনার দুই বুকের উপরে লুটিয়ে পড়া কার্ল দুটো কী অনির্বচনীয় ভাবে সুন্দব।

মিত্রা কঠিন মুখে বলল, ধন্যবাদ।

বসুন, বসুন। তারপরে কথা বলি। চেয়ার টেনে দিল অলীক। মিত্রার কোমরে, কোমরের চেয়ে বরং নিচে, হাত রেখে বলল, বসুন।

মিত্রা বসলে অলীক ঘুরে গিয়ে তার চেয়ারে বসল। বলল, আমার ব্রাণ্ডেব সিগাবেটটা দেখবেন একবাব।

ধন্যবাদ। আমারটাতেই আমি অভ্যস্ত।

না, আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার এই লাইল্যাক গাউনে আপনাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। আমার মনে হল আজ আপনাকে একজিবিশনে দেখেছিলাম। তখন চুল খোলা ছিল না। কিন্তু কী সুন্দর দেখায় আপনাকে!

দেখুন, একজিবিশন সম্বন্ধে কিছু বলাব আগে আমি আমার ল-ইয়ারকে চাই।

আমি আপনার ল-ইয়ার হতে পাবি। কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে আপনাব লাঞ্চ হয় নি।

ধন্যবাদ। কিন্তু সে কথা এখন ভাবছি না।

আমরা এখনই কোথাও লাঞ্চে যেতে পারি। কিন্তু অন্তত একটা স্টিফ ড্রিংক আপনাকে অফার করি, কেমন। হুইস্কি-সোডা।

হুইস্কি-সোডা দিল মন্ত্রীমহোদয় নিজের হাতে। আর মিত্রা অক্ষত বাঁ হাতে গ্লাস তুলে প্রায় এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটাকে শেষ করে নামাল টেবলে, একটু যেন শব্দই হল গ্লাসের। মিত্রাকে কি দোষ দেয়া যাবে? তার পক্ষে সত্যি তৃষ্ণার্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। উপরন্তু সে হয়তো নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চাইছিল।

মিত্রা বলল, এখন আমরা কথা বলতে পারি।

বলুন।

আচ্ছা, দেখুন কোন ছবি যদি অশ্লীল হয় তবে কি তা অপরাধও? অর্থাৎ তা কি শাস্তিযোগ্য দোষ?

অলীক একটু ভাবল। ভেবে তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর গলায় বলল, অশ্লীলতা তো অপরাধই। মনে করুন, এবারের একজিবিশনে একটা ছবি ছিল যা অশ্লীল উপরন্তু ধর্মভাবযুক্ত। এমন ছবি নিশ্চয়ই ক্ষতিকর। অ্যাডালটারেশন যেমন ক্ষতিকর এসব ছবিও তেমনি। আপনি কি একজিবিশনে স্টাডি ইন ব্লু ছবিটা দেখেছেন? তাহলে বুঝতেন।

কিন্তু কে বিচার করে যে ছবিটা অশ্লীল?

এক্ষেত্রে মনে করুন আমিই করি। আর তা করি জনসাধারণের উপবে তাব প্রভাব দেখে।

কমপিউটারে সত্যি ধবা পড়ে?

পড়ে বই কি। দর্শকদের উক্তি টেপ-রেকর্ডে ধরা পড়ে। টেপ-রেকর্ড থেকে কমপিউটার বলে দিতে পারে দর্শকদের মনে কীরকম কুৎসিত প্রভাব পড়েছে।

যাদের উক্তি থেকে কমপিউটার হিসাব করে তাদেব মন মনস্তাত্ত্বিককে দিযে দেখালে হয় না?

অলীক হেসে বলল, সে তো আরও মাবাত্মক হবে। জাগ্রত অবস্থায দশজনেব সামনে যে উক্তি করেছে তারা, সাইকাইআট্রিস্ট মনের ঢাকনা খুলে দিলে সেসব চিন্তা এতটা কুৎসিত হবে যে কানে আঙুল দিতে হবে।

অভ্যাসবশেই যেন মিত্রা খালি হুইস্কি-গ্লাসটা ধরতে হাত বাডাল। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যথা পেযে ঠোঁট কামড়াল, হাতটা সরিয়ে নিল, আব এসবই যেন মন্ত্রীমহোদয় দেখতে না পায এমন ভাবে।

তারপর মিত্রা নিঃশব্দে হাসল নিজেব মনের মধ্যে। প্রাইমা ব্যালেবিনা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে শিখেছিল, পুরুষ যখন রূপ-বিহ্বল তখন তার চোখের চাওযায় তা ধবা পড়ে। মিত্রা বলল, আর তেমন কোন অশ্লীল ছবির সঙ্গে যে যুক্ত, সেও নিশ্চয় অশ্লীল। মন্ত্রীমহোদয় বিচক্ষণ ভাবে কাশল। বলল, এসব কথা বলছেনই বা কেন। মানুষ কখনও অশ্লীল হয়? মানুষ তো একটা বাস্তব সত্য! সত্য কখনও অশ্লীল হয়? কিন্তু এখন কি লাঞ্চের সময নয? আমার মনে হচ্ছে আপনাব খুব খিধে পেয়ে থাকবে।

মিত্রা বলল (সে যেন চেয়াবটায় একটু শক্ত হয়ে বসল), না বিষযটা আমাদের পবিষ্কাব কবে নেয়া উচিত। মনে করুন একটা ভযঙ্কব বকমে অশ্লীল, ধর্মভাবযুক্ত, এবং বিঅ্যাকশনারী ছবির যে মডেল হযেছে সেও কি নোংরা নয়?

আপনি কি তার প্রেমেব কথা বলছেন? হাসল মন্ত্রীমহোদয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রেমেব চোখে সেই হযতো সব চাইতে কামনাব বিষয় হতে পারে। কিন্তু আপনাব কি লাঞ্চেব কথা মনে হচ্ছে না? আর আপনাব লাঞ্চেব ব্যবস্থা না কবাই আমার অপবাধ হচ্ছে।

মিত্রা বলল, যখন সুযোগ পাওয়া গিযেছে আমার মনে হয (একজন সংস্কৃতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপেব এই সুযোগ), ভবিষ্যতে যাই হোক জেনে নেয়া ভ [illegible]।

কিন্তু তার চাইতেও কি একটা ভালো হোটেলের ভালো লাঞ্চ এখন দরকার নয় আমাদের? এমন হোটেল একটা আছে যার প্রেসিডেন্ট-সুইটা আমরা এখনই লাঞ্চের জন্য পেতে পারি। আপনার অভিজ্ঞতাগুলো ঠিক ভালো হয় নি। এ অবস্থায় হোটেলের হলে লাঞ্চ আপনার ভালে না লাগতে পারে। মন্ত্রীমহোদয় ঝিরঝির কবে হাসল।

কিন্তু আমি তো আণ্ডাব-অ্যারেস্ট হযতো ইতিম[illegible] আণ্ডার-ট্রায়াল, বিচাবাধীন বন্দী!

ও, আচ্ছা আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে গিযেছে। অ্যাবেস্ট? ববং আপনি এই মুহূর্ত থেকে নিজেকে আমার ডেট মনে করুন। বিশেষ মিষ্টি করে হাসল মন্ত্রীমহোদয।

আমাকে অ্যারেস্ট করা হয় নি?

দেখুন, মিসেস বাসু, আমি, মানে সরকার, আপনার, শান্তনু তলাপাত্র এবং গেরি স্যান্টায়ানা তিনজনেরই ব্যাক গ্রাউন্ড জানি। জেনেই আপনার বন্ধু হতে চাই। আপনি অনাযাসে এখান থেকে উঠে পাশের চেম্বার পার হয়ে লিফটে নেমে কলকেতাব রাজপথে চলে যেতে পারেন। আপনি এখনই আপনার স্বাধীনতাকে প্রমাণ করতে পাবেন।

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এরা কি তবে পুলিশ নয়? ভযঙ্কর রকমে তিতো কিছু যেন মিত্রা অনুভব করল নিজের ঠোঁটে, যা কখনই তার নিজের ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের ফ্লেক হতে পারে না।

মন্ত্রীমহোদয় বলল, দেখুন আমাদের দেশ ঠিক সেই সব দেশের মতো নয় যেখানে পুলিশ

জনসাধারণের ছদ্মবেশে পার্কে বা রাজপথে, ভুল কবেছে এমন চিত্রকব ও সাহিত্যিককে আক্রমণ করবে, অপমান করবে, মারপিট করবে অপমান কবাব উদ্দেশ্যে, যাতে জনসাধারণ বুঝবে, তাদের ছবি কিংবা সাহিত্য এত ঘৃণ্য এবং রাষ্ট্র এবং পার্টির চিন্তা-বিরোধী, যে জনসাধারণই বিরক্ত হতে হতে অবশেষে এই ভাবে ঘৃণা প্রকাশ করল। না, অনেক ভেবে এইভাবে পুলিশ নিয়োগ করা আমবা বাদ দিয়েছি। কারণ এটা তো আমাদেব গণতন্ত্র। এখানে ববং উল্টো। এখানে এরা সত্যি জনসাধাবণ, পার্টিক্যাডার যাবা পুলিশেব ছদ্মবেশে ছদ্মবেশী পুলিশের মতো রাষ্ট্রের হযে কাজ করে।

তা হলে আমাকে পুলিশ অ্যারেস্ট কবে নি। মিত্রা যেন চেয়াব ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে।

মন্ত্রীমহোদয় বলল, না। আপনি বরং এখন আমাদের লাঞ্চটাব কথা ভাবুন। জানেন সেই প্রেসিডেন্ট সুইটে আমবা এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাতে পারি। আর আমি জানি তার এমন একটা বৈশিষ্ট্য যে কলকেতার এমন এক স্কাইলাইন দেখা যায় যা বিকেলের কমে আসা উত্তাপ, ধূসর হযে আসা আলোব, রাত্রির তাবা-ভরা শ্যাম্পেনেব চাইতেও মধুব।

মিত্রা উঠে দাঁড়াল। বলল, ধন্যবাদ।

সে পর্দা তুলে যেন ঘব থেকে বাব হবে। কিন্তু পর্দা তুলে দবজার উপরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল।

মন্ত্রীমহোদয় অবশ্যই মন্ত্রীমহোদয। তিনি অবশ্যই মিত্রার ভয়টাকে বুঝতে পাবলেন। হেসে সুতরাং মন্ত্রীমহোদয় বললেন, বেশ, তা হলে ববং চলুন আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।

না, না। আমি পাববো যেতে।

মন্ত্রীমহোদয় উঠে এল। মিত্রাব পাশে দাঁড়াল। তার চওড়া মোটা আঙুলে হাত রাখল মিত্রার কোমবেব অনেকখানি জুড়ে। বলল, আপনাকে ঠিক এখনই একলা যেতে দেয়া উচিত হবে না। ববং আমাব গাড়িতে যান।

মন্ত্রীমহোদয়েব সাদা লম্বা গাড়িতে (লিভারি পবা যার শোফাব) মিত্রা হেস্টিংস ম্যানশনে ফিবে এল। এখন লাঞ্চেব সময অনেকক্ষণ পাব হয়েছে। শান্তনু ও গার্ট্রুড (জানা গেল পরিচারিকাব মুখে) অনেক অপেক্ষা করে লাঞ্চ শেষ কবে গার্ট্রুডের ফ্ল্যাটে গিযেছে। নিউ আলিপুবেব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সরিয়ে আনা পুরনো সেই লাটসাহেব হেস্টিংসের বাড়ি (যা বৈজ্ঞানিক ও মানবিকী সংস্কৃতির সংযুক্ত প্রতীক হতে পারে) এখন এমন ফাঁকা যে কথা বললে তার প্রতিধ্বনি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াবে। আর যেন কেমন একটা কোবাল্টব্লু অন্ধকার। যেন কোন অ্যাসিড অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে ধোঁয়া ছাড়তে পারে তেমন।

পরিচারিকাকে বলল মিত্রা একটা হুইস্কি ও সোডা দিতে। কিন্তু তাব আগে বলে দিল, দারোয়ানেব সাহায্য নিয়ে একতলার সবগুলো দরজা বন্ধ করা চাই এখনই। হতে পারে এই হেস্টিংস ম্যানশনের দরজাগুলো পুরু এবং ভারি, এমন কি নতুন যেগুলো বদলানো হয়েছে তাও তেমন ভারি করেই করানো হয়েছিল, তা হলেও কোলাপসিবল গেটগুলোকেও যেন টেনে দেয়া হয়। যেন কেউ ঢুকতে না পারে, কেউ না, মিত্রা নিজে অনুমতি না দিলে।

হুইস্কি এবং সোডা দুগ্লাস শেষ কবে মিত্রা অবশেষে বসল। সে অনুভব করল, এবার সে নিজেকে দেখবে। শুধু ডান হাতের কব্জি নয়। বোধ হয় ভারি জুতোর চাপে পায়ের পাতার হাড়ও জখম হয়েছে। পরিচারিকা এসে জানাল সব দরজা বন্ধ হয়েছে। সে যে অবাক হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী?

মিত্রা অনুভব করল, এবার সে দম নেবে।

কিন্তু টেলিফোনটা (যা ইতিপূর্বে বেজেছে দুএকবার অনাদবে) আবার বাজল। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ধরল মিত্রা।

অলীক মুখোপাধ্যায় বলল, আপনি নিরাপদে পৌঁছেছেন কিনা জানতে চাইছি।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। মিত্রা ফোন রাখতে গিয়ে শুনতে পেল মন্ত্রীমহোদয় কিছু বলছে।

হেলো।

বলুন।

আজ রাত শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। আমি কি আপনার কাছে ডেট পেতে পারি আজ?

আমাকে একটু ভাবতে দিন।

আবার ফোন করবো বিকেলে।

না। আমাকে একটু ভাবতে দিন। তিনচার দিন সময় দিন।

ওপারে অলীক মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ড অনুশীলিত কায়দায় (কিংবা তা যদি হাবার্ড কিংবা সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়েরও হয়, আমার পক্ষে স্বীকার করছি, ঠিকঠাক বলা কঠিন) হ হ হ করে হাসল · প্রকৃতির বিধান আমাদের মানতেই হবে। আমি দুঃখিত কিন্তু প্রকৃতিকে না মেনে...মিত্রা তাড়াতাড়ি রিসিভারটা নামিয়ে দেয়ায় হাসিটা কেটে গেল।

কী করবে মিত্রা? মনে হল গগলসের ব্রিজে যেখানটা ছড়ে গিয়েছে সেখানেই খুব জ্বালা করছে।

একটু পরে সে টেলিফোন করল বেলাকে। তোমাকে দরকার। এখনই দরকার। সুরথ সোমকে নিয়ে কি তুমি আসতে পারো না? হ্যাঁ, খুব বিপন্ন বোধ করছি।

এই ঘটনাগুলোর চারপাঁচদিন পরে প্রবীর সাণ্ডেলের ফ্ল্যাটে তখন রাত আটটা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি আছে।

সাড়ে সাতটায় প্রবীরের মাথা ধরেছিল। এবং ধরা-মাথা তাকে চেয়ার ত্যাগে বাধ্য করেছিল। যথারীতি বেলাকে তার জীবনের নানা দুঃখের উৎস হিসাবে অনুভব করছিল সে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালযের বক্তৃতার নোটস তৈরি করতে করতে। আজ বিকেলের দিকে সে একটা সূত্র আবিষ্কার করেছে যাকে সে বিনোদিনীপুত্রী বলতে চাচ্ছে। অন্তত আবিষ্কারের পরপরই হো হো করে সে যখন হেসে উঠেছিল তখন সে যে বেশ উত্তেজিত তা বোঝা যাচ্ছিল। (রূপসী পাঠিকা, এখানে বেশ পরিষ্কার করে বলে নেয়া ভালো, প্রবীর সাণ্ডেলের মাথা ধরার জন্য যেমন আপনি বা আমি দায়ী নই, তেমন তার মতামতের জন্যও আমরা দায়ী নই। প্রকৃতপক্ষে আপনার সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়ে আমি কি সে সময়ের নানা মানুষের মতামতের সম্পাদনা করছি না?) প্রবীর আবিষ্কার করেছে আমাদের এত যে অতসী বউদি, রুনি মাসী, মেম দিদি, এ সবই বিনোদিনী বউদি-নামা চক্ষুরোগগ্রস্তা এক সুন্দরীর বংশধর। বিনোদিনী বউদিকেই ঠাকুরমা বলা যায়। কিন্তু কী লাভ হয়েছে? সাহিত্যে কেন বিনোদিনী বউঠাকরুণ অথবা শ্যামা বউঠাকরুণ স্থান পাবে? দয়ার্দ্রচিত্ততা? নীতিপিষ্ট, (অথবা পরে যা সামাজিক পরিস্থিতিপিষ্ট) এই সব রমণীর পক্ষ হয়ে কিছু বলা? আরে বাস, তা হলে তো ফিরে সেই বিদ্যাসাগরকেই তার বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্য সাহিত্যের মৃত্যু-উত্তর নোবেল প্রাইজ দিতে হয়। তবে কি নতুন আবিষ্কার? অর্থাৎ কেউ বিধবা হলেই তার শরীরের গ্ল্যাণ্ডগুলো মরে না? সাবাস! কিংবা অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রেমপ্রবৃত্তি স্বামীতে তৃপ্ত থাকে না, এটাই আবিষ্কার করা হল? তার জন্য ডিভোর্স আইনটাকে আর একটু উদার করার আন্দোলন করলে বোধ হয় বিদ্যাসাগরের মতো নাম রাখা যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবতে প্রবীর হাওয়ার জন্যে ঝুল-বারান্দায় এসেছিল (হায় কলকেতা, হাওয়ায় এত ধুলো!) এবং এই মনে হচ্ছিল তার যে সে লাঙ্গল নিয়ে দীঘার সমুদ্রবেলায় নেমেছে।

ঠিক তখনই তার মনে হল (মন ঠিক প্যারাগ্রাফ করে ভাবে না), একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে আর ঠিক সেই পাঁচ হাজার টাকাই সে গেরির ছবিটার

জন্যে দিতে চেয়েছে। এই চিন্তাটাই তাকে খুশি করে তুলল। তবু যা হোক তার এই লাঙ্গল চালানোর একটা সুফল আছে।

মনের এই খুশি হওয়া অবস্থায় সে পথেব দিকে চাইল। পথে জনস্রোত। সুসজ্জিত উল্লসিত। আলাপ ও হাস্যমুখর। অনেক লম্বা ঢঙের, অনেক বঙের গাড়িও। প্রবীর ভাবল, আসল কথা, কৌশলের কথাই। যেমন ধরো রামায়ণ মহাভারতের লেখকবৃন্দ। তারা জানতো তাদের উপন্যাসের কৌশল সূক্ষ্ম ফুলদারী কাজ হলে চলবে না। অতিশয়োক্তি, আরও অতিশয়োক্তি অর্থাৎ এক তীরে কুবেরের ভাঁড়ার থেকে স্বর্ণচাঁপার প্লাবন নামিয়ে আনা, সূর্যকে বগলে রাখা, শালগাছ তুলে পিটিয়ে হাতিকে ছাতু করা, এ সবই কৌশল , ওর সাহায্যে ওই চরিত্র কয়েকটির অনন্যসাধারণ মনুষ্যত্ব, যে মনুষ্যত্ব কয়েক হাজাব বছর ধরে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল, ফুটিয়ে তোলা যায়। এই সব অতিশয়োক্তির বাহ্বাস্ফোট যখন তোমার ইনটেলেকটকে ল্যাজে বেঁধে শত সমুদ্রের জলে নাকানি-চোবানি দিয়ে একেবারে মিইয়ে দিয়েছে, শুধুমাত্র অনুভূতিই তোমার একমাত্র–তখন বিদেহ-কন্যা বলে, তোমার গায়ের ছায়াই সবিশেষ ; কিংবা রামচন্দ্র বলে, সে দেশ কোথায় যেখানে ভাই ফিরে পাবো। চড়া, গভীর রঙই কৌশল বলতে পারো।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নকে ঠেকানোর পরই সেই সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে পারো যার জন্য ছবি আঁকাব কিংবা বই লেখার পরিশ্রম সহ্য করা যায়। যেমন ধবো শরৎচন্দ্র-কল্পিত রাজলক্ষ্মীব সংযম। বিশ্বাস করো? তা কি বাস্তব? কিন্তু শরৎবাবু এই অতিশয়োক্তিকে প্রযোগ করেই সেই সৌন্দর্যকে ধরতে চেষ্টা কবেছেন যাতে রাজলক্ষ্মী নর্তকী (গ্যালেটিয়া যেমন পাথর থেকে মানবী) অনিন্দিতা প্রেয়সী হল।

এই অবস্থায় মাথা ধবা ছেড়ে গিয়ে সুস্থ বোধ কবল প্রবীব। প্রমাণস্বরূপ বলতে পাবি, সে ঘরে ফিরে ইন্টারকমে ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকারকে ডেকে বলে দিল যে সে আজ ডিনাবে বাইরে যাবে না, আটটাতেই ডিনার, হালকা সুস্বাদু কিছু, যার একটা পদ যেন বিশেষ হয়।

আবার বাইরে এসে দাঁড়াল সে ঝুল বারান্দায়। বেশ লাগছে এই জনস্রোতের, এরাও ডিনাবে চলেছে এই ফোরম্যানিটির স্রোত, যেন আজই এক সঙ্গে ওভারটাইম বিল এবং বোনাসের টাকা পেয়েছে। নৃত্যন্তি কেচিৎ হসন্তি কেচিৎ। বাহ্ বেশ। একে কি এইলান বলে? এইলানেব বাংলা কি জীবনানন্দ? তার জীবনেও কি এক সময এরকম আনন্দ আসতে পাবে?

আপাতত পাঁচ হাজার টাকা বক্তৃতার বদলে, পাঁচ হাজার টাকার বদলে একখানা ছবি। মনে হল প্রবীরের টাকটা চকচক করে উঠল।

কিন্তু কথাটা গ্যালেটিয়া। এটা এক আশ্চর্য গল্প। শ্বেতপাথর হোক, ভাস্করের হাতে তা নমনীয় হোক, তা তো পাথরই। তারপব সেই মর্মর-নারী কথা বলে উঠল। তুমি সেই প্যারাসল নামে ছবিটার কথা ভাবো মিত্রার, কিংবা মিত্রাকে যেমন দেখিয়েছিল আর্মি নেভি স্টোরের সামনে লাইল্যাক গাউনে। ভূদেব সমাদ্দার বার্গাণ্ডির পুরো বোতল হাতে উঠে এসেছিল দুজনের লাঞ্চ টেবিলে তৃতীয়জন হতে। দরকার হলে বোধ হয় মিত্রার চোখে পড়ার জন্য সে শীর্ষাসন দেখাতেও প্রস্তুত ছিল সেই লাঞ্চের ঘরে। অথচ ভূদেব সমাদ্দার, হুজহু যদি সত্য হয়, তবে কেউকেটা নয়, দুঁদে সাংবাদিক, সংবাদ সিণ্ডিকেটের অধিকাংশ শেয়ারের মালিক। এটা কৌশলই নাকি যার ফলে মিত্রা তার বয়সের দশ বছর ফেলে দিল। না শুধু পোশাক নয় কখনই। এককালের প্রাইমা ডোনা ব্যালের, তার কত ড্রেস-মেকার এবং হেয়ার ড্রেসারই তো ছিল, কিন্তু এমন করে কি তারা মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি বদলাতে পেরেছিল?

প্রবীর হাসল আপন মনে। এখন ঠিক মাথায় আসছে না ব্যাপারটা। এই পরিবর্তনই কি গ্যালেটিয়া হওয়া, নাকি ছবিটাই মিত্রার মনের এই পরিবর্তন ঘটাল, যা তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে পর্যন্ত ধরা

পড়ছে। যদি পরেরটা হয়, তবে বুঝতে হবে শান্তনু সেই পুরনো অতিশয়োক্তির কৌশলটাই ধরেছে। রঙ রঙ রঙ ; কী নীল আর কত শেড। হতে পারে, এটা পিকাসোর ব্লু পর্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত কিছু, পার্থক্যও আছে। আর সেই পার্থক্যই যেন শান্তনুর ব্যক্তিত্ব।

নিচে উদ্বেল ফোরম্যানিটির স্রোত। তা তুমি বলতে পারো, প্রবীর, যে তুমি খুশি। এবং তার কারণ কলকেতায় শান্তনু দু-দুখানা ছবি এঁকে ফেলেছে। আব (স্মৃতি হাতড়ে) সেটাও, কিছু কম হলেও, আনন্দের বিষয় যে মিত্রা তার জীবনস্মৃতি লিখছে। বেশ স্টাইল মেয়েটাব।

কিন্তু জীবনে কি অবিচ্ছেদ সুখ থাকে! ঘরের মধ্যে এই তৃতীয়বার টেলিফোনে বাজল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রবীর ফোন ধরল।

হেলো, কে? বেলা, মাই...

শোনো প্রবীর আজ ডিনারে—

সে আর হয় না, বেলা, আমি গলায় ন্যাপকিন বেঁধেছি বলতে পাবো।

না, প্রবীর, না। লক্ষ্মীটি তুমি পোশাক পবো। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি।

না, না, বেলা, শোন।

বেশ তো তোমার কোন হোটেল ভালো না লাগে, তোমার ক্লাব রিঙ্কোতেই।

আচ্ছা, বেলা, নিজেকে তুমি কী মনে করো বলো তো? তুমি কি এমন আকাজো যে তোমাকে একজন হতভাগ্য ব্যাচেলারের সন্ধ্যাকে পূর্ণ করে তুলতে সঙ্গ দিতে হবে?

না, না প্রবীব, সে কিছু নয়। তুমি ভেবে দেখো. আজকেব এই বেলা সোমকে নিয়ে ইলোপ কবে তুমি একটা হোটেলেব ঘরকে তোমার প্রথম যৌবনের দুর্গ বানাতে চেয়েছিলে।

ভুলে যাও, ডার্লিং ভুলে যাও। আমি দুঃখিত, কেমন কিনা।

না, প্রবীব না, তুমি ন্যাপকিন বাঁধলেও ডিনার খেয়ো না। তুমি শার্ট পরতে পরতে আমি এসে যাবো। তা ছাড়া কত কথা আছে আমার। তুমি দেখো।

ফলত আধঘণ্টা বাদে (ফ্ল্যাটের ডিনার নিষেধ করা কিছু উল্লেখযোগ্য নয়) বেলা প্রবীরকে নিয়ে বেবিয়ে পড়ল।

সেদিন ডিনারে তারা কী খেয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল ডিনারের পরে ঘুবতে, এ সব সংবাদ মূল্যবান বটে কিন্তু তত মূল্যবান নয়। ডিনারে বসেই তারা টের পেয়েছিল দিনটা (কিংবা তিথিটা বলাই ভালো) পুরনো দিনের হিসাবে মহালয়া। না, এখন আর মোড়ে মোড়ে প্রতিমা এনে পূজা হয় না। সব বিষয়ের মতো এই নতুন দিন আসারও একটু ইতিহাস আছে। কারো কারো মতে এটা মানুষের চিত্তের মুক্তির সূচনা করে। একটু দেরি করে হলেও আমাদেব এই অঞ্চলেব তৎকালীন অনগ্রসর মানুষেরাও বুঝতে পেরেছিল, ধর্ম আফিমের চাইতে খারাপ—আফিম তুমি নিজে খাও, ধর্ম এমন আফিম যা শোষণকারীরা তোমাকে খাওয়ায। কারো কারো মত এটা ফল, কারণ নয়। কাবণ এটাও নয় যে পাইপগান পর্যন্ত ব্যবহার করেও যখন চাঁদা আদায় আব বিগ বিজনেস থাকল না, বরং ওয়্যাগন ব্রেকারের চাইতে কম মর্যাদা পেতে সুরু করল চাঁদা আদায়কাবীরা, তখনই পুজোটা উঠে যেতে সুরু করে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য এক মত আছে! তারা একটা দুর্ঘটনাকেই এর কারণ বলে থাকে। কাগজের প্রতিমা, সাপের চামড়ার প্রতিমা ইত্যাদি আধুনিকতা যখন প্রায় তুঙ্গে উঠেছে তখন কসবা থেকে সংগ্রহ কবা কাঁচা গোচামড়ার প্রতিমা তৈরির আধুনিকতা নাকি শুরু হয়েছিল দক্ষিণ কলকেতায় কোন একদল শিল্পী, সাংবাদিক, সংবাদসাহিত্যিকের ক্রান্তিকারী অনুপ্রেরণায়। বেশ চলছিল পুজো! উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কলকেতার সেই সব ছাপোষা মানুষ যারা মুখ বুজে চাঁদা দেয়, এবং মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত রাতে ঘুমোত না, দিনে কানে তুলো দিয়ে রাখতো বলে প্রবাদ, তাদের অর্থাৎ চল্লিশ বয়োগোষ্ঠীর মানুষের একদল (যৌবনের চাপে এরা

এতদিন কোণঠাসা ছিল), কোথা থেকে বেবিয়ে পড়ে, সেই গো-চর্ম মন্দিরে গিয়ে উদ্যোক্তাদের পাঁচ-ছয় জনকে গুলি করে মারে এবং সেই বহু প্রশংসিত প্রতিমা-নির্মাণকারীকে চাবকাতে চাবকাতে রসা রোডের মোড়ে এনে সেখানে এক লাইট পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়। তারপর থেকে কলকেতায় আর পুজো হয় না।

কথাটা আজই শুনেছে প্রবীর এবং বেলা, ভডেভিলের সেই বক্তার কাছে যাকে এদেশের গ্রাউচো বলা হয়। বেলা সোম বলেছিল হাসতে হাসতে, সাপের চামড়ার প্রতিমা হলে গোরুর চামড়া কী দোষ করল।

কিন্তু এখন রাত বারোটা বাজল। বেলা সোম আর প্রবীর, প্রবীরের ব্লকের গোড়ায় নামল। হাঁটা দেখে সন্দেহ হয় একটু বেশি মদ খেয়েছে তারা। অসমান পডছে পা। হাই বলে, বেলা নিজের পোশাক সম্বন্ধে কিছু উদাসীন হলেও, তাদের নেশা হয়েছে বলা উচিত হবে না।

প্রবীব বলল, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এ রকম কথা এর আগেও শুনেছি। পথে কী রকম ভিড় দেখছো।

এখনও সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয নি বলতে চাও। আ, বেলা, তুমি মহালয়ার আনন্দ করলে বটে।

আদৌ নয়। ঘরে চলো, কাজের কথা আছে।

প্রবীরের ঘরে ঢুকে সরাসবি বিছানায় গিয়ে বসল বেলা। মাথা একবাব ঝাঁকাতে একরাশ চুল খুলে পিঠময় লুটিয়ে পডল তার। খসে যাওয়া কাঁটা হাতব্যাগে রেখে বেলা সোজা হয়ে বসল। দুহাত বুকের কাছে আড়াআড়ি বাখা। কাউকে কাউকে এমন অবস্থায় বিশেষ ভীষণ দেখায়। অন্তত, প্রবীরেব মনে হল, বেলার নাক এমন টিকলো এবং চোখ এমন উজ্জ্বল খুব কমই দেখেছে সে। টিকলো ধারালো নাকের ব্রিজে যেন আলো পর্যন্ত দাঁড়াতে পারছে না।

বসো প্রবীর, বলল বেলা।

প্রবীর কাছাকাছি একটা চেয়াব টেনে নিল।

আচ্ছা, প্রবীব, তুমি তো অনেকদিন ব্যাচেলর থাকলে, যতদিন উচিত তার চাইতে বেশি।

তাই তো দেখছি। কিন্তু বেলা, যদি কিছু মনে না কর, রাত হল।

শোন, প্রবীর, ভেবে দেখো এক সময়ে এই বেলা সোমকে নিয়ে তুমি পালিয়েছিলে।

তখন তুমি সোম ছিলে না বোধ হয়।

ওটা কাজের পয়েন্ট নয। একটা বিয়ে করো এবার।

বিযে? কে?

তুমি বিযে করো, তাই বলছি।

লক্ষ্মী, বেলা, শোন লক্ষ্মী, তুমি আমার অনেকদিনের বন্ধু, কিন্তু আমি বলি কি—

প্রবীর, আমি আশা করি সে জন্যেই যে তুমি আমার অনুরোধ রাখবে।

দেখো বেলা, ভুল যা হয়েছে হয়েছেই, এবার আর শোধরানো যায় না।

আমার অনুবোধ—

আচ্ছা বেলা, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি এর পরের জন্মে এমন ভুল আর হবে না।

প্রবীর আমাকে আঘাত দিতে কি তোমার এতটুকু কষ্ট হয় না?

আমি কথা দিচ্ছি, বেলা, কথা দিচ্ছি। এর পরের জন্মে শুধু ইলোপ নয়। সাড়ে ছফিট শরীর আর কুড়ি আলমারি-ঠাসা আইনের নজির নিয়ে সুরথ তোমার চোখে পড়ার আগেই আমি করিৎকর্মা হবো। একটু অপেক্ষা করো, বেলা।

বিরক্ত বেলা মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু সে জানে এসব পুরুষের সঙ্গে লেগে না থাকলে অর্থাৎ অধৈর্য

হলে কাজ হয় না। বলল, আচ্ছা প্রবীর, মিত্রাকে কি তুমি সুন্দরী বলো না! নিজের বুকের মধ্যে চেয়ে বলো।

নিশ্চয়। তার মত সুন্দরী আপাতত আমার চোখে কেউ নেই।

ঠিক বলছো?

হলপ করে বলতে পারি।

আচ্ছা! মিত্রাকে বিয়ে করবে?

প্রবীর চেয়ার থেকে উঠল। একবার পায়চারি করল। বেলার সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা আঙুল তার চোখের সামনে ধরে বলল, আচ্ছা, বেলা, দেখো তো লক্ষ্মীটি, কটা আঙুল আছে এখানে।

তুমি কি মনে করো প্রবীর আমি, আচ্ছা কী মনে করো আমাকে?

বেলা, সময় বয়ে যাচ্ছে। তুমি এখনও যদি একটা আঙুলকে একটা আঙুলই দেখে থাকো নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিতে পারবে।

আমি যদি বলি মিত্রা বিয়ে করতে চায়।

আমি বলবো তা তার করা উচিত নয়।

কেন, তোমরা পুরুষরা তার অনধিকৃত রূপকে প্রশংসা করার সুযোগ পাবে, ডেট চাইতে পারবে সে জন্যে?

আ, বেলা। প্রবীর একটু পায়চারি করে এল। একটু বেশি হচ্ছে না দু-বোতল শ্যাম্পেনের পক্ষে। না মিত্রার বিয়ে করা উচিত নয়।

আর আমি যদি বলি, মিত্রা তোমাকেই পছন্দ করেছে। এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়েটা চুকে যাক তাই চায়।

না, বেলা তুমি যদি কিছু বুঝতে, হয়তো এ জন্মেই সুরথকে সুযোগ দিতাম না। তুমি কি বোঝ না, মিত্রা যে জীবনস্মৃতি লিখছে সে বিয়ে করছে এটা জানলে তার উপর মানুষের আগ্রহ থাকবে না? উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ জানলে মাঝখানের পরিচ্ছেদগুলো কে আর পড়ে বলো? এবং তুমি জানবে, মিত্রা যা লিখছে তার মূল্য আছে।

প্রবীরের মনে পড়ল, এর আগে কবে ে ন কাকে আর্টের অসুবিধা হবে বলে বিয়ে করতে সে নিষেধ করেছে। সে স্বগতোক্তি করল, এমন বোকা হয় কেন। সে এই বিয়ের আগ্রহে বেশ বিরক্তই হল। বলল, বেলা, মিত্রা কি আমার ব্যাকগ্রাউ জানে? আমি যে কখনও কখনও খুব বিরক্ত হতে পারি তা কি শুনেছে?

দেখো, প্রবীর, তুমি একটু সিয়ারিয়াস হতে শেখো।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। রাত বারোটার পর তোমার প্রস্তাব শুনছি বসে, কিংবা তাই কেন, তোমার কথায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় রাজি হই নি?

তা হলে, শোন, মিত্রা তোমার মতো একজন ফাদার'কেই বিয়ে করতে চাইছে।

প্রবীর হো হো করে হেসে উঠল।

হাসছো?

দেখো, কেউ লম্বা ঝুলের কোট পছন্দ করে বলেই কিংবা তার মাংসপিঠের উপরে লোভ আছে বলে তার বন্ধুরা তাকে ফাদার টাক বলে বলেই সে ক্রিশ্চিয়ান হয় না। ফাদার বলা দূরে থাক।

কিন্তু সেই ভঙ্গিটাই পছন্দ মিত্রার। শোন, সে শুধু স্বামী চায় না তার ছেলের জন্যও ফাদার চায় এবং কে এমন ফাদার তোমার মতো?

মিত্রার ছেলে? মিত্রার ছেলে আছে নাকি?

শান্তনু, তোমার প্রিয় চিত্রকর গেবি। তুমি নাকি তার একখানা ছবি কিনেছো পাঁচ হাজার টাকায়।

আ, বেলা, একটু কম কথা বলো তো। তুমি না বলেছিলে, শাস্তনু মিত্রার ভাই? যদিও হয়তো দুজনের এক বাপও নয়, এক মাও নয়।

প্রবীর, ঠিকই বলেছি তোমাকে। আর এটাও ঠিক, মিত্রা বেশ স্পষ্ট করে আমাকে বলেছে শান্তনুকে সে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাডপ্ট করতে চায় দত্তকের আইন অনুসারে।

কেন? কেন?

মিত্রা আমাকে বলেছে এটা প্রয়োজনের, সুরঞ্জিতের রয়্যালটির এখন তিনভাগ হয়, এরপর আরও টুকরো হয়ে যেতে পারে। শান্তনুকে সে যদি অ্যাডপ্ট করে দত্তকপুত্র করে নেয় তা হলে তিন ভাগের দুভাগ একত্র থেকে একটা শক্তি হিসাবে দাঁড়ায় না?

প্রবীর চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। গোটিতে হাত চেপে পায়চারি করল। সে ভাবল, আশ্চর্য, নাকি এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর মিত্রার নিজেও হয়তো এই ধারণা যে এজনাই সে প্রকৃতপক্ষে শান্তনুকে দত্তকপুত্র করতে চাইছে।

কিন্তু বেলা একটু নড়ে বসলেও তখনই আবার বলল, তুমি মিত্রাকে মনে মনে দেখো, দেখবে এর চাইতে ভালো ম্যাচ হয় না।

প্রবীর নিশ্চয়ই ভাবছিল, তার মুখে স্মিত হাসিও ছিল। গোটির পাশে চিন্তাও ছিল। কিন্তু এবার সে হো হো করে হেসে উঠল, বেলা, একটু সিয়ারিয়াস হতে শেখো। একটু ভাবো না, ক্ষতি কী?

বেলা ভ্রু কোঁচকালো। সে বলল, প্রবীর তুমি, তুমি কি পুরুষ?

লেখককে যদি তা বলতে তোমার আপত্তি না থাকে।

আজকালকার ক্যালকাট্যানদের মধ্যে এমন পুরুষ একজনও নেই যে একজন বিপন্ন নারীর ভার নিতে পারে?

দেখো, বেলা, মিত্রা কি নিজেকে বিপন্না মনে করছে?

প্রবীর আবার পায়চারি করল। বিপন্না নাকি কথাটা? প্রবীর ভাবল কোথায় যেন আমাদের ত্বক আর গ্ল্যাণ্ডগুলো আমাদের এবং আমাদের পার্টের মধ্যে দাঁড়ায়।

বেলা বলল, এত সিয়ারিয়াস আমি কোনদিনই হই নি, প্রবীর। মিত্রার বিপদের কথা, তুমি রাজি হলে, মিত্রাই তোমাকে বলবে ভেবেছিলাম। তুমি জানো, শান্তনু একটা নিতান্ত অশ্লীল ছবি এঁকেছে আর সেটা ধর্মভাবযুক্ত হওয়ায় দারুণ রকমে এসকেপিস্ট। যার ফলে বহু যুবক ও কিশোরের মন ইতিমধ্যে বিষাক্ত। ছবি দেখে তাদের যে সব উক্তি তা টেপ রেকর্ডেড। পুলিশের ছদ্মবেশে পার্টি ক্যাডাররা ইতিমধ্যে রাস্তা-ঘাটে-পার্কে হয়তো চিত্রকরকে মারধোর করতে প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যে তারা ছবিটার মডেলকে অ্যারেস্ট করেছিল। প্রমাণ মিত্রার প্ল্যাস্টার বাঁধা ডান হাতের কব্জি এবং ডান পায়ের পাতা।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, কী বললে?

মনে হল প্রবীরের বুক ওঠানামা করছে তার ডিনার শার্টের নিচে।

তা ছাড়া মন্ত্রীমহোদয় মিত্রাকে মুক্তি দিয়ে তার বদলে ডেট চেয়েছে।

ডেট! প্রবীর যেন অট্টহাস্য করবে।

তুমি জানো, সাণ্ডেল, মন্ত্রীমহোদয় কিশোরও নয়, যুবকও নয় যে ডেট বলতে অর্থহীন মিষ্টি কথার বকবকানি বুঝবে।

প্রবীরের ভুরুটা কালো দেখাল।

সাণ্ডেল, সকলের একটা অতীত থাকে। শান্তনু মিত্রারও আছে। আর সে অতীত যে মন্ত্রী মহোদয় জেনে ফেলেছে তা সে নিজেই বলেছে মিত্রাকে।

কথাটা কি ব্ল্যাকমেইল, বেলা?

হয়তো ডেটে রাজি করানো। কিন্তু শান্তনু তো আমাদের এয়ার ফোর্সের কনস্ট্রাকশান বিভাগের ডিজাইনার ছিল। ধরো, সে তো আমাদের নতুন মডেলের ফাইটারের ডিজাইন সম্বন্ধে গোপন খবর রাখতে পারে। তোমার কি মনে পড়ছে মিত্রার বাড়ির ডিনারে শান্তনু এয়ার ফোর্সের গল্প করেছিল? শান্তনু কি এখন আইনের চোখে পলাতক নয়?

কখনও কখনও কথা না বলাই ভাল। প্রবীর পায়চারি করতে শুরু করল আবার। ধীরে ভেবে ভেবে সে চলছে। ঘরটা এমন নিঃশব্দ যে একটা ঘড়ির চিক চিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। অভ্যাসমতো, অন্যমনস্কভাবে প্রবীর ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়ে দিল। যেন তাতে চিন্তার সুবিধা হয়। ছায়া-ছায়া আলোর মধ্যে একই রেখায় পায়চারি করছে প্রবীর। হ্যাঁ, বিপন্না বটে মিত্রা।

কিন্তু টিং টিং করে দুটো শব্দ হল। রাত দুটো। সম্বিত পেল যেন প্রবীর। ঘরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বালাল কট করে। বিছানার উপরে বসে বেলাও ভাবছিল। তবে তার চোখদুটি আলোর অনুজ্জ্বলতার সুযোগে ঘুমে ছোট হয়ে এসেছে।

আলো জ্বালতে বেলা নড়ে উঠে হাই তুলল।

দেখো, বেলা।

তুমি কি এবার আমার প্রস্তাবে রাজি হবে? মিত্রা নিজেই বলেছে। একজন পুরুষ সে চায় যে তাকে অধিকার করবে।

তাই তো, তাই তো। চেয়ার টেনে বসল প্রবীর টেবলের সামনে। একটু ড্রিঙ্ক দেবো, বেলা?

তুমি কি ভেবেছো আমার কথা?

হঠাৎ আলো দেখার মতো প্রবীর নড়ে উঠল। হ্যাঁ, বেলা, তোমার সঙ্গে আমি একমত যে মিত্রার স্বামী দরকার। কিন্তু বলো তো সব চাইতে এলিজিবল ব্যাচেলার কে? মানে সব চাইতে, দাঁড়াও হুজহুতে পাবো।

তুমি কি এর পরও হালকা ভাবেই নেবে?

বেলা, হুজহু পড়াটা আমার একটা হবি। ক্যালক্যাটানদের সম্বন্ধে জানতে—তা হুজহু না দেখলে—আমিই তোমাকে বলি কলকেতার এখনকার সব চাইতে এলিজিবল ব্যাচেলার ভূদেব সমাদ্দার। সে একটা সংবাদ সিণ্ডিকেটের একক মালিক। সুপুরুষ, সুন্দর চেহারা, বয়স চল্লিশ। মদ একটু বেশি খায়।

আ, প্রবীর—

শোন, তুমি এর মধ্যে কিছু বলার চেষ্টা করো না, বেলা।

সে রাজি হবে কেন?

কোন পুরুষ যদি কোন সুন্দরীকে দেখে এক হলঘব বোঝাই লাঞ্চ-প্রার্থী নরনারীর সামনে শীর্ষাসন করে তবে তুমি কী বলবে?

শীর্ষাসন বলছো?

সেটা হয়তো বাড়িয়ে বলা, কিন্তু দুজনের লাঞ্চ-টেবলে একজন বয়স্ক মানুষ যদি সেধে তৃতীয় হয়, এবং এত বড় এক বোতল বার্গাণ্ডি নিয়ে উপস্থিত হয় তবে তাকে সুন্দরীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু বলা যায়?

ভূদেব সমাদ্দার, যে নাকি শোনা যায় মন্ত্রীমহোদয় অলীক মুখুজ্যের বিশেষ শয্যাকণ্টক। খবরের কাগজে নানা সংবাদ যে বেরোচ্ছে তার মূলে নাকি সে।

সে জন্যই, সেরকম আন্দাজ শুনেছি বলেই নামটা তাড়াতাড়ি মনে পড়ল।

সে না হয় মিত্রাকে দেখে একটু বিচলিত হয়েছিল।

আমি যদি সাহিত্যিক হয়ে থাকি তবে বলি শোন, সেই চোখের দৃষ্টিটা সাধারণ ক্ষুধা নয়।

রাজি হবে বলছো?

মিত্রা রাজি হলে হয়। তবে এই সব সাংবাদিকদের কেউ কেউ এমন হয় যে তুমি তাদের ছাতু করে দিতে পারো, কিন্তু তাদের সাহস মুছে দিতে পারো না।

প্রবীর হাই তুলল।

রাত দুটো পার হয়েছে বেলা। চলো তোমাকে পৌঁছে দি।

চলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রবীর বলল, বেলা, তোমার কাজ হবে কালকেই একটা ডিনার দেয়া এবং মিত্রা এবং ভূদেবকে সেই ডিনারে ডাকা। বাকিটুকু তোমাব হাতযশ। হ্যাঁ। এ বিষয়ে আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।

গাড়িতে বসে বলল প্রবীর, অনেকদিন কারো জন্য এমন করে ভাবতে হয় নি। মিত্রা সত্যি বিপন্ন। ওদের বিয়ের পব মিত্রা যদি শান্তনুকে দত্তকপুত্র করে, আমি ঠিক জানি না রিচ্যুয়ালটা, আমি উৎসবে শান্তনুর গডফাদার না হয় হবো।

এই ঘটনাগুলোর সাতদিন পরে আমাদেব এখন হাওডা স্টেশনে যেতে হবে। আমরা ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছি। মহালয়ার পরেও সাতদিন গত। এখন একবার হাওড়ায় না গেলেই নয়। হাওড়া? অন্য সময়ে আপনার মনে কি হয় জানি না। বিরাটাকার ট্যাঙ্কার দেখে যেমন সৌন্দর্যের বদলে প্রয়োজনের কথা মনে পড়ে, হয়তো হাওড়াকে মনে মনে একটা কর্মব্যস্ত ট্যাঙ্কার বলে মনে হতে পারে যা কি করে বা সমুদ্র থেকে এতটা উজিয়ে কলকেতাব বুকে লেগেছে। এখন? দূর থেকেই আপনার নন্দালিগুলো চোখে পড়বে। নন্দালি কথাটা কী একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কি কবে মানুষ শব্দ তৈরি করে তার আলোচনার জন্য নাকি বিজ্ঞান আছে। সে দিকে না ঝুঁকে আমরা বরং নন্দালির বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ কবি। মার্বেল হেন পর্সিলিন, ভিনাইল প্যাস্টিক, ফাইবার গ্লাস, অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি বাড়িব প্রবেশ দ্বারে খড়ের বাড়ির ছাদ, কলাগাছ, আল্পনারতা কন্যা, এককথায় একটুকরো রোমান্টিক কৃষকবাড়ি যদি বাতারাতি এসে লেগে যায়, তবে বুঝতে হবে নন্দালি করা হয়েছে। কথাটা অবশ্যই নন্দলাল বসু থেকে পাওয়া। এ বিশেষ উপায়ে গেট তৈবি কবা আর উৎসবের বাড়ি সাজানো নাকি এককালের সেই প্রখ্যাত শিল্পীরই উদ্ভাবন। এখন এই সাজানোর পদ্ধতিকেই, দু-একজনে কলকেতা-স্টাইল বললেও, অধিকাংশ লোক নন্দালি বলে থাকে। নন্দালি করা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে, এমন কি দুটো অর্থাৎ এক নম্বর দু নম্বব হাওড়া ব্রিজেই। তা করা হবে নাই বা কেন? এই আমাদের বৈশিষ্ট্য যে পুরো ইউরোপীয় পোশাক পরে যে বর বিয়ে করতে যাচ্ছে (এখনও অন্তত বিয়ের রাতে তাকে বরই বলা হয়) তার গালে দুএকটা চন্দনের ফোঁটা আর কপালে দইয়ের ফোঁটা থাকে। এটাব মূলে দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তিও আছে। সংস্কৃতিই কথাটা। সংস্কৃতির যতই অগ্রগতি হোক, তার মধ্যে কোথাও বহুদূর থেকে ঐতিহ্যবাহিত কিন্তু কৌম স্বকীয়তা থাকা দরকার, নতুবা সংস্কৃতি মনের ক্ষুধা মিটাতে পারে না। মনের ক্ষুধার সঙ্গে ফাঁকি চলে না, নন্দালির ইতিহাসই প্রমাণ। সেই যেবার চল্লিশ বয়ঃগোষ্ঠীর কয়েকজন (যারা বাড়িতে স্ত্রীর আধুনিকতা, অফিসে উপরওয়ালার কর্তালি, অন্য সময়ে এবং সর্বত্র যৌবন দ্বারা কোণঠাসা, যারা ডিসপেপটিক, রক্তহীন এবং বোকাচোখের, তারাই) হঠাৎ খেপে উঠে সাপখোপের চামড়ায় তৈরি প্রতিমার উদ্যোক্তাদের গুলি করে মেরে শিল্পীকে প্রকাশ্য দিবালোকে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দিয়েছিল, প্রতিমার মুখে যারা সুপ্রিয়া চিত্রনটীদের মুখ বসাচ্ছিল তাদের গোবেড়েন বেড়িয়েছিল (প্রকৃতপক্ষে কয়েকজনমাত্র মানুষ যদি সত্য সত্য খেপে যায় তারা কী না করতে পারে), সেবারই নাকি তারা পথে যত নন্দালি

পেয়েছিল তাতে আগুন দিয়ে দেয়! কিন্তু নন্দালি ফিরেছে, প্রতিমা তুলে পুজো না ফিরলেও। এটাই প্রমাণ, নন্দালি আমাদের বুকের মত গভীরের জিনিস। কিংবা যাকে আপাতদৃষ্টিতে ক্যালক্যাটানরা বাদ দিয়েছে, সেই পুজোর কথাই ধরা যাক। তা কি বাদ গিয়েছে? মহালয়ার সেই উল্লাসমুখর জনস্রোত যা দেখে প্রবীরের মনে 'এইলান' শব্দটা দেখা দিয়েছিল, এই যে মহালয়ার দিন সমস্ত সংবাদপত্রের প্রচণ্ড প্রকাণ্ড চেহারার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, এই যে মহালয়ার দিনের কাছাকাছি বোনাস নিয়ে আলোচনা, আন্দোলন এবং শেষে তা হাতে পেয়ে আনন্দ, এ সবই তো এখনও আছে। সুতরাং নন্দালিকৃত হাওড়ায়, রূপসী পাঠিকা, এখন আমাদের যাওয়া উচিত, বেলা নটা হল। যার এঞ্জিন ফুলপাতায় সাজানো, যার বগিগুলোর গায়ে নানা বিচিত্র ফেস্টুন, সেই স্পেশাল কালকা ফাস্ট প্যাসেঞ্জার কিছুক্ষণ বাদেই ছাড়বে।

রূপসী পাঠিকা, আমি কি এবারও আপনাকে ফাঁকি দিচ্ছি? অর্থাৎ আপনার দৃষ্টি যেখানে দরকার তা থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছি? আদৌ নয়। আদৌ নয়। আমাদের মনে আছে বেলা ও প্রবীরকে গাড়িতে উঠতে দেখেছিলাম। তারপর কী হল তা বলা হয় নি, এই তো অনুযোগ?

বেলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রবীর হেঁটে চলল। ট্যাক্সির অভাব ছিল না। মনে রাখতে হবে, সেটা ছিল বোনাস পাওয়ার রাত এবং নিশ্চয়ই হয়তো অনেক প্রতিষ্ঠানই ওভারটাইম অ্যালাউন্সের বিলগুলো দিয়েছিল। কাজেই বরং ট্যাক্সি বেশি ছিল পথে. প্রাণচাঞ্চল্যই ছিল শহরের সর্বত্র। প্রবীর হেঁটে যেতে চাইল বোধ হয একটু চিন্তা করার জন্য। স্টাডি ইন ব্লু ছবিটার একটা পরিণতি থাকার কথা, খুব তাড়াতাড়ি সেই পরিণতিটা এসে যাচ্ছে নাকি? কিংবা এখন যা সব ঘটছে, ভবিষ্যতে তা এই ছবিটার সঙ্গে জড়ানো গাল-গল্প হিসাবেই মাত্র থাকবে। ভবিষ্যতে ছবিটা যখন নীলামদারদের ঘরে হাত বদলাবে তখন এখানকার ঘটনাগুলোকে কেউ অলসভাবে বলবে?

বেলার কথাও বলতে পারি। সে নিজের শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল। কিছু গরম জল পেল। বেশ ভালো করে হাত-পা ধুয়ে শাড়ি পালটে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল সুরথের ঘরের স্কাইলাইটে সাদা সাদা আলো। সে নিজের বিছানা থেকে বালিশজোড়া নিয়ে সুরথের ঘরে নক করল।

দরজা খুলল সুরথ। কিন্তু সে অনুভব করল এখনও তার চায়ের সময় হয় নি। সে বিছানায় গিয়ে বরং মাথার বালিশ জড়িয়ে ধরে চোখ বুজল। বেলা বলল, একটু সরো, বালিশ রাখি। কটা বাজে?

সতিনটে হবে। সুরথের নাকের শব্দ হয়. যদিও মৃদু। পাশে শুয়ে বেলা বলল, শুনছো। উঁ। কাল সকালে আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হতে পাবে। তুমি কিন্তু ঠাকুর, চাকর, ঝি কাউকে ছুটি দিও না। উঁ। কাল ডিনারের ঘরটাই যেন ওরা সকালে হাতে নেয়। বেলা হাত পা টান করে বিছানায় প্রথম গা ঢেলে দেয়ার আরামটা উপভোগ করল। তা বলতে দোষ নেই মেরুদণ্ড ও কোমর যেখানে যুক্ত, আজকাল বিছানায় গা পাতলে সেখানে বয়সটা বোঝা যায়। সে বলল, শুনছো। কাল ডিনারে মিত্রা আর ভূদেব সমাদ্দারকে বলছি। প্রবীর অবশ্যই থাকবে। কিন্তু ততক্ষণ আবার সুরথের নাক মৃদু মৃদু ডাকছে। বেলা ভাবল, কী শান্তি মানুষটার প্রাণে।

এই উদ্যোগপর্বের পরেই আমরা বলতে পারি বেলার দৌত্য ষোল-আনা সফল হয়েছে। ভূদেব সমাদ্দার এবং মিত্রা বাসু ঠিক সাতদিনের মাথায় এক অনাড়ম্বর কিন্তু সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত প্রথায় বিবাহিত হয়েছে। এখানেই ফাঁকির প্রশ্নটা উঠতে পারে। যাদের সম্বন্ধে এত কথা বলা, তাদের জীবনের সব চাইতে মূল্যবান ব্যাপারটাকে কিছু না বলে সেরে দেয়া কেন? ফাঁকি নয়, আদৌ নয় তা। বিয়েটাই এমন ভাবে হল, এত তাড়াতাড়ি, যে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বর্তমান লেখকও

ঘটনার দ্রুতগতির সঙ্গে ছুটতে পারে নি। এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল ব্যাপারটা যে পরে এ সম্বন্ধে গার্ট্রুড, শশী শাশাঙ্কা, ভূধর সেন প্রভৃতি মিত্রা ভূদেবের আপনজনরাও অপ্রসন্ন মন্তব্য করেছিল। যেমন শাশাঙ্কা বলেছিল, পরস্পরের কাছে আসবার আগে আর একটু সময় নিলে কি শোভন হতো না! হতে পারে মিত্রা ও ভূদেবের সে বয়স নয় যখন তারা পায়রাদের মতো পাশাপাশি বসে দিনের পর দিন বক বকম করবে। গার্ট্রুড বলেছিল সহজ কথায়, এটাকে একটা প্রয়োজন মেটানো ছাড়া কিছুই বলা যায় না। না, ভালোবাসার না হোক, পূর্বরাগের, কোর্টশিপের একটা পোশাক তো গায়ে দেয়া উচিত ছিল। ভূধর সেন বলেছিল তার বন্ধুকে, আ ভূদেব, তুমি তো বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রায়োগিক মেলের লোক, এটা কী করলে? বৈজ্ঞানিক বিবাহ? ভূধর জানতো না বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে যে ডিনার (প্রবীবের এই মতকে মূল্য দেয়া হয়েছে যে বিয়ের কথাটা কাগজে প্রকাশ পেলে বা সোসাইটি সংবাদদাতাদের নজরে পড়লে মিত্রার 'জীবনস্মৃতির' উপরে পাঠকের আগ্রহ কমে যাবে) সুতরাং, ডিনারটা সাদামাটা না হলেও প্রায় গোপন ডিনার বলা চলে। সেই ডিনারে প্রবীর তাব নিজেব স্টাইলে বলেছিল, অন্যদিকে এটাকেই আমি এ যুগের প্রথম বিবাহ বলতে চাই। সব চাইতে বিজ্ঞান-সমর্থিত। পুরুষ কী চায়? রূপলাবণ্য কখনও অভিজ্ঞতা। আমার ধারণা মিত্রা বাসুর, আই মিন সমাদ্দারের মতো রূপবতী আমাদের এই কলকেতায় আর কেউ নেই। দু একজন সুন্দরী থাকতে পারেন, কিন্তু রূপ? সুতরাং যদি ভূদেব সমাদ্দার তাকে দেখে শীর্ষাসন করেই ক্ষান্ত থাকতো, সোজা লাইনে তার দিকে না দৌড়তো তবে তাকে বুদ্ধিমান বলা যেতো কি? অন্যদিকে নারী কী চায় দেখুন। অবশ্যই তা এমন একজন পুরুষ যে তাকে এবং তার সন্তানকে বক্ষা কবতে পারবে, অন্তত প্রতিপক্ষকে লড়াই দেবে ; আর ভূদেব সমাদ্দার ঠিক তেমনই একজন পুরুষ। মিত্রাকে তার পছন্দের জন্য বুদ্ধিমতীই বলবো। হযতো ভূদেবের মাথায টাকাটা বেশ বড়ো, হয়তো সে একটু বেশি খায় মদ, হয়তো ইলেকট্রনিকস নিয়ে খুট্‌খাট্‌ করার একটা প্রবণতা আছে তার যা কখনও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু ভূদেব যে রূপকে পেল তার জন্য সে কৃতজ্ঞ হবে, মিত্রা যে লড়াইবাজকে পেল তার জন্য কৃতজ্ঞ ; কৃতজ্ঞতা এসব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা মিশানো ভালোবাসায় রূপান্তিত হতে পাবে। আমেন।

প্রবীরের আমেনকে অনেকে প্রতিধ্বনিত করেছিল।

এককথায় এই পূর্বরাগ অনুরাগের স্তরে স্তরে বর্ণনা না করার কাবণ বর্তমান লেখকের ক্লান্তি নয়। বরং আমাদের এখনই ছুটতে হবে। আর পনেরো মিনিটও নেই কালকা স্পেশ্যাল ফাস্ট-প্যাসেঞ্জাব যা মাথায় শিঙে শিঙে ফুল-পাতা-জড়ানো ধাড়ী হবিণের মতো হাঁপাচ্ছে, এখনই ছেড়ে যাবে। আর এখনই যদি কলকেতাকে চিনে না নেয়া যায় তবে আর তা কবে হবে?

রূপসী পাঠিকা, আমরা হাওড়া স্টেশনে এসেছি। এখন সমস্যা এই, আমরা চোখ কিংবা কান কোনটা ব্যবহার করবো। সন্দেহ করি দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয়। চোখ ব্যবহাব করলে মনে হবে, আপনি সমুদ্র সৈকতেব একটা স্টিল কারখানার পাশে এসেছেন। তেমন শব্দের ঢেউ, মূর্ছনা, ধ্বনি, প্রতিধ্বনির উতরোল কোলাহল। কান ব্যবহার করলে মনে হবে, রঙীন সিনেমার প্রজেকটরে কেউ রীলগুলোকে তিনগুণ গতিতে ঘুরিয়ে দিয়েছে যার ফলে পর্দায় রঙীন একটানা নক্সার বেশি কিছু চোখে পড়ছে না।

হৈ হৈ, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, জলভরা কুঁজো, পত্রিকাগুলো নিয়েছো, বাইজোব, টেন্ থ্রি ফোর্থ পার্সেন্ট, আরে পিন্টে কোথায় গেল, ঘর্ ঘর্ ঠাং, চায় গ্রাম্, পান ব্রি, মাইরি শ্লা, তোমার আর কিছুতেই শেষ হয় না, ওঠো ওঠো, চায গ্রাম,....এই চা গরম এই পানবিড়ির হকাররা একটা বৈশিষ্ট্য ; অন্যদিনের মতো আজও স্লটে পয়সা দিলে সিগারেট পাওয়া যায়, আজও স্লটে পয়সা দিয়ে নব টেপা মাত্র চা ভরতি প্লাস্টিকের কাপ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসবে ; সেদিক দিয়ে চাগ্রাম্

ও পানব্রি অবশ্য পুরনো মিউজিয়ামে রাখার উপযুক্ত মনে করতে হবে। কিন্তু ঠিক এই টুর-সিজনের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য যে পনেরো দিনের জন্য আবার চাগ্রাম পানব্রির হকারদের স্টেশনে আসতে দেয়া হয। এটা সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থা, অলীক মুখুয্যের নিজেব খাস দপ্তর, যা রেলওয়ে মন্ত্রক মেনে নিয়েছে যদিও পানের পিকের দাগ তুলতে পবে তাদের বেশ কিছু টাকা খবচ হয়। সংস্কৃতি দপ্তরের এই ব্যবস্থা কেন? উত্তরে বলা যায়, একই ব্যাপার, যেজন্য হাওড়া ব্রিজদুটোব গাযে, স্টেশনের কোলাপ্সিবল গেটে বিশাল বিপুল করে, এমন কি রেল কামরার দরজায় ছোট কবে নন্দালি করা হয়েছে, ঠিক সেজন্যই পানব্রি চাগ্রামকে পনের দিনের জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়ে থাকে। কেননা মানুষ যেমন তার অন্তরের অবচেতন কামনাকে তৃপ্তি না দিলে কখনই পরিতৃপ্তি পায় না, তেমন বৈজ্ঞানিক বিস্তারে সংস্কৃতিকে ফাঁপা মনে হবে যদি না সুদূরাগত এই পুরোনো ব্যাপারগুলিকে কোথাও কোথাও সঞ্জীবিত না করা হয়।

আর চোখে দেখার কথা বললে তো রঙে চোখ ডুবিয়ে নেয়াব কথাই বলতে হবে চওড়া, ছড়ানো বেলবটম পরা পুরুষ, গায়ের জামায় (যার নাম ইউনিসেকস বা সমলিঙ্গ অর্থাৎ কে পরবে জামা স্ত্রী না পুরুষ তা বোঝা যায় না) স্ট্রাইপ, নক্সা, দুঃসাহসিক নগ্নিকা ও যক্ষমিথুন, কাঁধ পর্যন্ত চুল, ন্যাড়া করা মাথা। মেয়েদের হাঁটুর কাছে তুলে পরা শাড়ি, প্ল্যাটফর্ম-ঝাঁট দেয়া ম্যাক্সি (চলন্ত অবস্থায় মনে হয় স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নাচছে), উরু-সংযোগ প্রদর্শক প্যান্টিব সঙ্গে মিনি, মুখের আধখানা সোনালি, লাল, কালোয় ম্যাসকারা করা, ছুটছে, হাঁটছে, দুলছে, মাথা পিছনে ফেলে হাসছে, কোমর জাপটে ধরছে, নগ্ন কাঁধ বেষ্টন কবছে। এমন কি হুইল চেয়ারেও গড গড করে গড়িযে ছুটছে ; মোট-ঘাট-বাক্স-প্যাঁটরা যাতে হাজারো এরোপ্লেন কোম্পানীর ছাপ, ঝাঁকামুটের লাইন, তার সঙ্গে পত্রিকাব হকাবরা কামরায কামরায় যেন বিনি পয়সায়, ঢাউস ঢাউস অক্টোবর সংখ্যা বিলিয়ে চলেছে।

এই একটা কম্পার্টমেন্টের গায়ে নীল বনাতের উপবে সাদা তুলোয় ইউরো কেমিক্যাল লেখা। বোধ হয় ইউরো কেমিক্যাল কোম্পানি তার শ্রমিকদের ভ্রমণেব জন্য কম্পার্টমেন্ট বিজার্ভ করেছে।

গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই। চোখ আর কানকে আর আলাদা কবেও লাভ হচ্ছে না। চোখের সামনে সেই রঙিন সিনেমার তিনগুণ জোরে রীল ঘুরানো মতো হয়ে উঠছে দৃশ্যটা। ব্যস্ততার মতো হয়ে উঠছে দৃশ্যটা। ব্যস্ততার চূড়ান্ততায় ভ্রমণকারীরা চিৎকার-কবেও বোধ হয কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না।

কিন্তু আর একটু পা চালিয়ে অবশেষে প্রবীর, সুরথ এবং বেলাকে প্লাটফর্মে দেখা গেল। কুপেটার জানালায় মিত্রাকে দেখা গেল। তার পিছনে ভূদেবকে।

বেলা বলল, মিত্রা এবার গুছিয়ে নিয়ে বসো। আমবা যাই। এরপবে যে ভিড় হবে, আধঘণ্টাতেও গাড়ির জট খোলা যাবে না।

ভূদেব বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই।

সুরথ বলল, বঁ ভোয়াজ।

তারা হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মিত্রা ও ভূদেব কুলু উপত্যকায় যাচ্ছে হানিমুনে। বেলা সুরথের বাহু ধরেছে। সুরথের মুখে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা একটা চুরুট। সাডে ছ ফুট মানুষটাকে বেলা নিখুঁত করে সাজিয়ে নিয়েছে আজ। বেলার অন্য পাশে প্রবীর। মাথায় বেশ চওড়া রিবন (গেরুয়া রঙের) বাঁধা টপহ্যাট। হাতে লাঠিব মতো সরু সিল্কের ছাতা।

ট্রেন ছাড়তে এক মিনিট বোধ হয় বাকি। প্রবীরদের চেনার কথা নয়, কিন্তু আমরা আর একটি পরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছি। মাধবী ঘোষালের হাউসকিপার সুরঙ্গমা। পোশাকে একটু তাবতম্য

হয়েছে। উৎসবের ভাবই। তার পাশে লম্বা, বদখৎ নাকের, খাকি প্যান্ট এবং সাদা শার্ট পরা একজন পুরুষ। এই তা হলে সুরঙ্গমার স্বামী যে ট্রাম শ্রমিকদের ইউনিয়ানের একজন কর্তাও বটে। একটি ফুটফুটে মেয়ে, আধুনিক পরিচ্ছদে নিশ্চয়ই, চঞ্চল গতিতে এসে সুরঙ্গমাকে প্রণাম করল। সুরঙ্গমা তাকে জড়িয়ে ধরল, এক হাতে চিবুক তুলে ধরে কথা বলতে গেল। সুরঙ্গমা একটু আবেগপ্রবণই। মেয়ে তো ভ্রমণেই যাচ্ছে তবু যেন তার চোখ সজল হল। ট্রাম ইউনিয়ানের নেতা অন্যদিকে মুখ ঘুরাল। সেই সুযোগে সুবঙ্গমা গলা নিচু করে বলল, দেখো, মা, পিলগুলোকে ভুলো না। সুরঙ্গমার মনে হল, না, না, ওটা ভালো নয়, ডাক্তারদের হাতের সেই স্টেরিলাইজড স্টিল, যদিও হাজারেও একটা বিপদ হয় না। হয়তো একটু সেকেলে সে, কিন্তু নিরুপায়, ভয় কাটাতে পারছে না।

ট্রেন বরাবর হাঁটছিল প্রবীররা।

একটা কূপের দরজা হঠাৎ খুলল। এক মিনিটও তো সময় নেই। প্রবীরকে দেখে একজন যুবক এবং তার পিছনে একজন যুবতী তাড়াতাড়ি নেমে এল। প্রবীর লক্ষ্য করে নি। কিন্তু সুরথ দেখেছিল।

সে বলল · আচ্ছা, মাধবী! মাধবী নয়?

সেকেলে ঢঙে শাড়ি পরা মাধবীকে চিনতে কি একটু অসুবিধা হল?

হেসে রাজেন প্রবীরকে বলল, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। আপনার শুভেচ্ছা চাই।

ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। বলল প্রবীব।

মাধবী বলল, ফাদার, বেড়িয়ে এসে কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করবো। প্রকৃতপক্ষে আপনাদের থিয়েটারে একটা পার্ট চাই।

ধন্যবাদ, বলল সুরথ। চুরুট থেকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে।

বেলা বলল, গার্ড সবুজ নিশান নাডছে, গাড়িতে ওঠো মাধবী।

প্রবীরের দল এগিয়ে চলল, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছে তারা।

মাধবী রাজেন তাদের কূপেতে বসতে না বসতে (এঞ্জিনটা অবশ্যই ইলেকট্রিক শক্তিতাড়িত কিন্তু সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় খোলসটা সেকেলে কানাডিয়ান ডব্লু ডি এঞ্জিনের মত। সুতরাং ট্রিংলে টাং, সাঁ, সাঁত, ঝাঁ ঝনাৎ শব্দে) গাড়িটা ছেড়ে দিল।

মাধবী-রাজেনের বেলাতেও কিন্তু তাড়াতাড়ি কবা হয় নি। আমবা ইতিপূর্বে তাদেব যেখানে দেখেছিলাম, তারপরে দুতিন দিনের মধ্যে দেখা গেল, রাজেনের আর বাইরে ডিনার খাওয়া হয় না। হয বিকেলে এসে ডিনার শেষ করে যেতে হয় নতুবা ডিনারের আগেই তাকে আসতে হয়। একদিন সময়ে না আসার ফলে তাই, লাইব্রেরীর টেলিফোনে মাধবীর গলা শোনা গিয়েছিল। তুমি আসবে না তা আগে বললেই হতো। কুপিতা ভামিনী কী তা রাজেনের জানা ছিল না। রাজেন মনে করল মাধবীর ফোঁপানো কান্না শোনা গেল। সে ভেবেছিল, মাধবীর মির্জা গালিবের ফ্ল্যাটে গিয়ে মাধবীর সজল চোখ দেখতে পাবে। একেবারে বিপরীত। মাধবীকে দেখে তার সেই সন্ধ্যায় আর একবার মনে হয়েছিল, ইতিপূর্বে রমণীর রূপ সম্বন্ধে যে ফিচার সে লিখেছে তা যে মুলত মাধবীর রূপের বর্ণনা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন ঝকঝকে তীক্ষ্ণ মাধবীকে সে কোনদিনই দেখে নি আগে।

সে মাধবীদের ছবির অ্যালবাম দেখছিল। এখন সে ফটোগুলোকে চিনতে পারে, (ব্রাহ্মণবেশী বলবে নাকি বঙ্কিমী কায়দায়) পুরুষবেশে তোলা মাধবীর ফটো প্রায় প্রতি পাতায়। সে কি হাসছিল?

মাধবী বলল, হাসছো যে? কী ভাবছো?

তেমন আর কী?

আমাকে নিয়ে বেড়াতে চলো।

মানে তোমার বেড়ানোর সঙ্গী হতে হবে?

দোষ কী?

না। তবে একটু দেরি হবে।

কেন?

কিছু টাকা চাই।

কেন আমার টাকাকে কি...

আদৌ না। টাকার কোন গন্ধ নেই। টাকা টাকাই। যদি যেতে চাও একটু দেরি করতে হবে। ভূদেব সমাদ্দার কিছু আগাম টাকা দেয় কি না দেখতে হবে।

কেন, কেন? মাথা ঝাঁকাল অস্থির ঘোটকীর মতো মাধবী।

এই জন্যে যে যদি তোমার সর্দি হয় তখন তোমার টাকা নিয়ে তবে ডাক্তারের খোঁজে যেতে পারবো না। যদি তোমার কাছে থেকে তোমাকে নিযে পালাতে হয় তবে অন্তত দুটো সিট রিজার্ভ করার টাকা চাই।

তারপর তারা আগ্রা দেখতে চলেছে। আগ্রায় তো তাজমহল।

স্টেশনের কোলাপসিবল গেটের কাছে এসে বেলা বলল, আমাদের বোধ হয় এখন কিছুটা শক্তগোষ্ঠি হয়ে থাকতে হবে।

শক্তগোষ্ঠি? হ্যাঁ, তাই, কেমন কি না। সুরথ বলল।

প্রবীর তার গোটিতে হাত রেখেছিল। কিন্তু চারিদিকে লোক মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি হাত নামিযে নিল। ডান হাতেব ছাতাটা বরং মৃদুমন্দ দোলাতে লাগল। চারিদিকের এই ভিড়ের মধ্যে তুমি নিশ্চয়ই ইচ্ছা মতো ছাতা ঘোরাতে পারো না।

এখন কলকেতায় ডিসেম্বর এসেছে। পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ায়। অকসিজেনে কিছু তারতম্য হয়েছে। শীতের আকাশ যেমন হয়, যেন একটু নিচে নেমেছে। বাতাসটা ভাবি যেন। সেজন্য ধোঁয়া এবং সুতবাং স্মগ বেশি। যেন আকাশে আলো কম। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে সময়টা বরণীয়। সম্পূর্ণ সুন্দরবন এলাকা মৌচাকের মতো কর্মমুখর। ফসল ওঠার কাল। জলদি ধান, জলদি কোফি, জলদি আলু। কলকেতার বাজারেব অবস্থা দেখে মনে হয়, এখন কবি বলতে পারে, ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী, অন্ন যেতেছে লুটিয়া। আর এখন পোলট্রিও যেন সুস্বাদু হয়। এক একটা চপ প্রায় দুশো গ্রাম ওজনের। একটা মোরগেব ঠ্যাং শেষ করতে একখানা পুরো রাধাবল্লবী খরচ। আর যদি তুমি একেবারে পুরো নিরামিষ খেতে চাও তোমাব রুটির এক পিঠে পোয়াইঞ্চি মাখন অন্য পিঠে পোয়াইঞ্চি মধু মাখিযে নিতে পারো। এক একটা বাঁধাকোফি পাঁচ-সাত কেজি। একটা আর্লি-স্নোবল আট ন কেজি। আর হবেই বা না কেন, হলদিয়া প্রকল্পের ইউরিয়া শুধু সুন্দরবন কেন, গোটা পূর্ব ভাবতকে সুজলা সুফলা কবে তুলেছে। যাবা হাওড়ায় গাড়ি চড়েছিল, তারা ফিরেছে। আর ফিরে আসাটাও কম হুল্লোড়ের ব্যাপার নয়। এমন কি নভেম্বরে যারা ফিরেছে, তারাও গাড়ি যত হাওড়ার কাছে ততই যেন কী এক সুগন্ধে দিশেহারা। গাড়ি থেকে নামতে তর সয় না। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যবানেরা হাওড়া মার্কেটেই আর্লি-স্নোবল কোফির জলদি ভ্যারাইটি কিনে কলকেতায় ঢোকে। এক কথায় তখন কলকেতা-ত্যাগে যেমন আনন্দ, এখন কলকেতা ফেরায় তেমন। পথে পথে আরও কোফি খান, আরও মাটন খান, আরও ইউরিয়া ব্যবহার করুন লেখা প্ল্যাকার্ডগুলো কৃষিদপ্তরের জয় ঘোষণা করে।

ফলত ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়, আবহাওয়া রোদের রঙে, আকাশের রঙে পরিবর্তিত হয়েছে, পথঘাট যানবাহন লোকজনের উল্লাস মুখরতা বদলায় নি। মনে হতে পারে (কারণ পশমের পোশাকের রঙ কখনও অন্য পোশাকের মত উজ্জ্বল হয় না এখন যা পরছে জনসাধারণ), যেন

সেই লোকগুলিই লাঞ্চের পর এখন পোশাক বদলাচ্ছে। কেউ যদি চিন্তাশীল হয় (তার কথা স্বতন্ত্র), তার মনে হতে পারে যে স্টেজে এতক্ষণ আনন্দের উজ্জ্বল নাটকীয়তা ছিল, এখন কয়েকটা আলোর কারচুপিতে আলোর রঙ, আকাশের রঙ, পাত্রপাত্রীর পোশাকের রঙ বদলে গভীর গম্ভীর দুঃখজনক প্রসঙ্গ অবতারণা করা হবে।

যাক সে কথা, ইতিমধ্যে অক্টোবর নভেম্বরে কী হয়েছে তা বলা যেতে পারে।

প্রবীর অক্টোবরে তার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শেষ করেছে। এবং চেকটা পাওয়ার পরই (যেন সে জন্যই সে দেরি করেছিল) নিউ আলিপুরের হেস্টিংস ম্যানশনে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে সংবাদ না দিয়ে গিয়েও শান্তনুর দেখা পেয়েছিল। স্টাডি ইন ব্লু ছবিটার জন্য চেক সই করে দিয়ে বেশ অনেকটা সময় শান্তনুর সঙ্গে গল্প করেছিল প্রবীর। গার্ট্রুড ছিল সেই বাড়িতে, দু চার মিনিটের মধ্যে খবর পেয়ে সেও এসেছিল। অবেলায় কফি ডালমুটের ব্যবস্থা করেছিল। প্রবীরের আপত্তি শোনে নি। বলেছিল, ক্রেতা আমাদের লক্ষ্মী, ভেবে দেখুন আপনি আমাদের সংসারে প্রথম ক্রেতা। ছবি নিয়ে আলাপ হয় নি। ছবি তো প্যাক করে রাখা হযেছে নেবার জন্যই। আবহাওয়া, খাদ্য, পোশাক, গাড়ি, ইত্যাদি নিয়ে আলাপ হয়েছিল যাতে হাসাহাসি করা যায়, পরস্পরের বিশেষ পরিচিত হওয়া যায়। এখন যে কোন জায়গায় শান্তনু প্রবীর দেখা হলেই আলাপ করতে পারবে।

নভেম্বরের গোড়ায় মাধবী-রাজেন ভ্রমণ থেকে ফিরেছে। ইতিমধ্যে ক্ল্যাসিকে মহলা শুরু কবেছে মাধবী। ভ্রমণের অনেক স্মৃতির মধ্যে একটা, গল্পের মতো হয়ে এসেছিল রাজেনের ঘবে। আধঘণ্টা চেষ্টা করেও একটা মাকড়সা পাওয়া যায় নি মাধবীর বিছানার ধারে কাছে। কিন্তু মাধবীর ভয় কিছুতেই যেন যাবে না। রাজেন বুঝতে পেরেছিল বোগা-বোগা গড়নের ঈষৎ দীঘল এই মেয়েটি অঘটন ঘটাতে পটু আর তার ধারে কাছে যারা থাকবে তাদের শেষ পর্যন্ত তাকে মেনে নিতে হবেই।

পুরো নভেম্বর ক্ল্যাসিকে রিহার্স্যাল হচ্ছে। হ্যামলেট নামে শেক্সপীয়াবের নাটকটাই তবে হ্যামলেট-প্রেমিকা ওফেলিয়ার পার্ট না নিয়ে মাধবী হ্যামলেটেব দ্বিচারিণী মা এবং রাণীব পার্টটা নিয়েছে। ভালো অভিনয় করবে বোঝা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাকে নিয়ে তর্ক হয়েছে। হ্যামলেটের সামনে যখনই সে অভিনয় করে, মুখের কথা যাই হোক, হ্যামলেট বা অন্য চরিত্র যাই বলুক, মাধবী ঘোষালের চোখে একটা নীরব অপত্যস্নেহ যেন হ্যামলেটের প্রতি পদক্ষেপ, প্রতিটি ভঙ্গিকে অনুসরণ করে। কর্তাব্যক্তিদের একদল বলছে, এটাই মাধবীর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হবে। অন্য দল বলেছে, তা হলেও এরকম অপত্যস্নেহের নীরব প্রকাশ সেক্সপীয়বের অভিপ্রায় ছিল কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আতিশয্য করছে মাধবী। অভিনয় বলে অভিনয়। যেন প্রাণ দেয়া যাবে। কিছুদিন আগে অভিনয়ের মহলা দিতে দিতে মাথা ঘুরে, লেডিস টয়লেটে গিয়ে বমি করে। ভয় পেয়ে রাজেন, রাজেন বলে চিৎকার করে এক কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল মাধবী। রাজেনের যে কথা ছিল, তোমার সর্দি হলে তোমার টাকার জন্য অপেক্ষা না করে ডাক্তার ডাকা চাই, তা যেন পূর্ণ হয়েছে। ডাক্তার বলেছিল, ইমোশন্যাল আপসেট। পরে লাঞ্চেব হিসাব নিয়ে বলেছিল, ভেটকির ফ্রাই খাওয়া উচিত হবে না। ওটায বোধ হয় অ্যালার্জি।

ডাক্তারের কথায় ডাক্তারের কথা মনে হতে পারে। মাধবীকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে রাজেন তাব বন্ধু মিলিটারি ড়াক্তার অমলের খোঁজে গিয়েছিল। অমল ছিল না সুতরাং তার জন্য অপেক্ষা করতে বিলিয়ার্ড খেলতে সুরু করেছিল। বিলিয়ার্ড বল মারতে লাঠি বরাবর মনঃসংযোগ করতে হয়। মনঃসংযোগ করলে দর্শনের ছাত্রের যা হতে পারে তাই হল। চিন্তা করার সুযোগ জুটে গেল। বল, টেবল, লাঠি, নিয়ম, সবই কৃত্রিম, কিন্তু কী আশ্চর্যভাবে সে একটা জীবন্ত মানুষ অথচ যেন এ কৃত্রিম ব্যাপারগুলোর অংশ হয়ে আনন্দ পাচ্ছে। যেমন হয়ে থাকে, তার মুখে হাসির রেখা পড়ল। আমাদের জীবনটাই কি এমন কৃত্রিম বিষয়ের সমাহার? মনের কাছে নিরঞ্জন ঘোষালের ব্যাপারটা

ছিল। কৃত্রিম উপায়ে মাধবীকে রূপান্তরিত করে সে কি জীবনের শান্তিবিন্দু খুঁজে পাচ্ছিল, যেমন এই বিলিয়ার্ড নিয়ে সে সময় কাটাচ্ছে! তুলনাটা হয়তো ঠিক হল না, কারণ বিলিয়ার্ড সে সব সময়ে খেলে না, কিন্তু পুরুষের পোশাকে মাধবী অনেক সময়েই নিরঞ্জনেব চোখের সামনে থাকতো। এটাকে কি, এই কৃত্রিমতা-প্রীতিকে কি জীবনে বিজ্ঞান-সংযুক্তির ফল বলবে? বর্ণসঙ্কর প্রাণী, গাছপালা তৈরি করা, প্ল্যাস্টিক সার্জারীর সাহায্যে নাক-মুখের চেহারা বদলানো ইত্যাদি ইত্যাদির আর এক ধাপ ; অথবা একি অন্যভাবেও বিজ্ঞান-সংযুক্তি যে নিজের মনের সুপ্ত কামনাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জেনে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে সুস্থ করা! অবশ্য ভালোবাসাও তো এক অর্থে কৃত্রিম। ওটা কি সত্যি কোথাও আছে? নাকি একটা প্রত্যয় মাত্র, যাকে কল্পনা করে নিলে মানুষ পশু থেকে নিজেকে আলাদা করে? কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষ কোন কোন কৃত্রিমতাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কৃত্রিমতাকে আঁকড়ে ধরে।

তখন অমল এসে পড়ায় রাজেন ঠিক করল, পরে ঠিক এই জায়গা থেকে ভাববে জীবন সম্বন্ধে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি মিত্রা-ভূদেব তাদের হনিমুন থেকে ফিরেছে। এসেই ডিনার দিয়েছে। প্রবীব, সুরথ, বেলা, ভূদেবের বন্ধু ভূধর স্যান, গার্ট্রুড। শান্তনু ছিল না। ডিনারে কেউ অনুপস্থিত থাকলে কদাচিৎ কে অনুপস্থিত, কেন অনুপস্থিত তা আলোচনা করা হয। ডিনারে মিত্রা-ভূদেবকে অভিনন্দন জানানোই আসল কথা। ভূদেবের চেহারা পবিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যে তাকে একটু কম ফ্যাকাশে এবং বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে। ভূধর জিজ্ঞাসা কবেছিল, ইতিমধ্যে ভূদেবের মদের ব্র্যাণ্ডগুলো বদলেছে কি না। সুরথ বলেছিল, মিত্রাদেব পাল্লায় পড়লে অনেককেই তা করতে হয। ভূদেব বলেছিল, শেষ পর্যন্ত এ বছরটার কী নাম রাখবে স্যানমশাই? ভূধর টকাস করে উত্তর দিয়েছিল, যে বছর হুজহুর একটা পাতা নতুন করে ছাপাতে হল। আলাপটার গতিপ্রকৃতি এটাই ছিল। একবাব ভূধব আর্ট ও সমাজ নিয়ে কী বলতে শুরু করেছিল, প্রবীবেব ধারণা কথাটা শুনেই ভূদেব লড়াকুর ঢঙে গোঁফ চুমরে ছিল। ধারণাটা কী ঠিক? হয়তো অবচেতনার ধাক্কায় ভূদেবের দু আঙুল ঠোঁটেব কোণে উঠে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূদেবের কোনকালেই গোঁফ নেই। সেই ডিনারে নীল শিফন পরেছিল মিত্রা। এখন নিশ্চয়ই মিত্রার চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল ; লুকিয়ে লুকিয়ে, নীল শিফনের টানেই, প্রবীর মিত্রাকে বিশেষ কবে মিত্রার চোখ দুটিকে লক্ষ্য করেছিল। যেন তা স্নেহে উদাস, যেন বা স্নেহে কিছু বিষণ্ন, উজ্জ্বল কিন্তু উদাসও। এটা অবশ্যই প্রবীরের ভুল হতে পারে। এই বিষণ্ন ও উদাস শব্দদুটি হয়তো এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না, কেননা সে কবে সদ্যবিবাহিতা এক সুন্দরী নারীর চোখ দেখার সুযোগ পেয়েছে এর আগে, যে মিত্রার দৃষ্টিকে সঠিক বর্ণনা করবে।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে প্রবীর নিজের অজ্ঞাতসারে গ্যালেটিয়ার গল্পটাকে মনে মনে আলোচনা করেছিল। সেদিনই পরে এক সময়ে সে অনুভব করল, পিগম্যালিঅন গ্যালেটিয়ার গল্পটা হয়তো তার ঠিক মনে নেই। গ্যালেটিয়া পাষাণমূর্তি থেকে মানবী হল প্রাণ পেয়ে কিংবা পিগম্যালিঅনই প্রাণ আবিষ্কার করল তার। পবে পিগম্যালিঅন কিংবা গ্যালেটিয়া কারো ভুলে কি গ্যালেটিয়া হয়তো পায়ের আঙুল, কিংবা বাহু কিংবা চিবুক থেকে শুরু করে আবার শ্বেতপাথর হয়ে গিয়েছিল? শ্বেতপাথর মূল্যবান হলেও তো পাথরই।

আজ ঠিক-ঠাক দোসরা ডিসেম্বর। সকালে ব্রেকফাস্টের পর প্রবীর ঘরেই ছিল। তারপর যা সে করল, তাতে তাকে রাক্ষস না বললেও পেটুক বলতেই হবে।

ব্রেকফাস্টের পরে সিগারেট ধরিয়েই প্রবীব চিবুকের তলায় দুহাত রেখে ভাবতে বসেছিল, প্যাশন অব ক্রাইস্ট ছবিটা যে দেওয়ালে আছে, স্টাডি ইন ব্লু ছবিটা ঠিক সেখানেই রাখা হবে কি না ; কিংবা একটা ঘরের পক্ষে এমন একটা ছবিই যথেষ্ট।

ছবিটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, প্লাস্টার বাঁধা মিত্রার ডান কব্জি, প্লাস্টারের

খাপে মিত্রার ডান পা। তাব মনে পড়ল সংস্কৃতিমন্ত্রী এবং তার ডেট চাওয়ার আড়ম্বর। না, এটা ভোলা দরকার।

তখন তার মনে পড়ল সবুজ রঙ। সে অনুভব করল তার ব্রেকফাস্টটা আজ ভয়ঙ্কর রকমে ভারি হয়েছে। যেন ঢেকুর উঠবে। খাওয়ার পরে ঢেকুর। যেন গা গুলিয়ে উঠবে। বোধ হয় আজ সেই মাটন ব্যবহার করেছে কেয়ারটেকাব, যা থেকে দুশো গ্রাম ওজনের চপ হয়। যার দুচারটে অনায়াসে প্রচুর সসের সঙ্গে গলাধঃকরণ কবে হো হো করে হাসতে থাকে এই নিউ ক্যালকাটার অধিবাসীবা। আর বোধ হয় আট-ন কেজির ওজনের সেই সব কোফিও একটা ব্যবহার করেছিল কেয়ারটেকার। আঃ, ইউরিয়ার স্বাদে গন্ধে পাকস্থলী থেকে বুক পর্যন্ত ভরে উঠল প্রবীরের।

প্রবীর তাড়াতাড়ি পোশাক পরল। তেমন তাড়াতাড়ি তার সেই প্রিয় সিঁদুরে বুইকটাকে ব্লকের মেকানিকদের রাস্তায় বাখতে বলল।

গাড়িতে বসে সে স্থির কবল, হ্যাঁ সে জানে, নিশ্চয় জানে, কোথায় পাওয়া যায়, যাতে ইউরিয়া নেই আব যা দুশো গ্রাম ওজনের চপ নয়। অত সবুজ রঙ আর অলীক মুখুয্যে, দুশো গ্রাম চপ আর আর্লি-স্নোবলের জলদি ভ্যারাইটি। না, সে ইউরিয়া সহ্য করতে পারছে না।

আকাশটা নীল হয়ে নিচে নেমে এসেছে। এখানে ওখানে ফ্যাক্টরির ধোঁয়া বটে, কিন্তু এখনও স্মগ সত্ত্বেও নীলের আভাস আছে। আর আলো কম থাকাতে বোধ হয় তার সিঁদুরে গাডিটার রঙ লাইল্যাক মনে হচ্ছে।

হুঁ হুঁ, মনে মনে হাসল প্রবীব। সে জানে তাকে একেবারে কলকেতার মানে আসল কলকেতার বাইরে দমদমের নাগের বাজাবে যেতে হবে। আর সেখানে কোফি পাওয়া যায় যা রোগা, নিতান্ত রোগা, অপুষ্ট ফ্যাকাশে, সাদা, আর সেকেলে গোময়েব সারে তৈরি। হযতো ভিটামিন কম, হযতো হয়তো। দেখো এ সেকেলে পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিক চাষের কোফি দেখতেও উটকো আব ফ্যাকাশে, কিন্তু আশা কবেছে প্রবীর, তা পাওয়া যাবে হয়তো নাগের বাজারে।

মোড় নিল তার গাড়ি। আ, প্রবীর এ জন্যই তোমার সাইকাইআট্রিস্টের কাছে যাওয়া উচিত। তুমি জানো, আমাদের যে লোকসংখ্যা তাতে প্রত্যেকের মুখে কোফি এবং মাটন পৌঁছে দিতে হলে ইউরিযা ও বৈজ্ঞানিক চাষ দরকার। এটা তোমাব বাস্তবজ্ঞান ও বুদ্ধি তোমাকে বলবে। অথচ তুমি—তোমার অবচেতন মনে সবুজ ছবি, অলীক মুখুয্যে, আর্লি-স্নোবল আর হাসনাবাদের ইউরিয়া-পুষ্ট মাটনে কী ঘৃণা! তুমি কি নিজেকে দেশের ও দশের হিতাকাঙ্ক্ষী বলতে পারো? তুমি জানো যে আনন্দ উল্লাসমুখরিত জনস্রোত চাইছে, তার জন্য রুটির একপিঠে পোয়াইঞ্চি মধু, অন্যপিঠে অনুরূপ মাখন দরকার, অথচ তোমার অবচেতন মনে সেকেলে গোবর সারের মিস্টিক সুগন্ধযুক্ত কোফির উপরে কী লোভ! হতে পারে, গোবর সারের কোফিতেই কোফির স্বাদগন্ধ থাকে কিন্তু তা কি জনগণের পার্টি-ক্যাডারদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা যায়? তুমি বিজ্ঞানের কল্যাণ থেকে সরে স্বার্থপর কার্পণ্যব দিকে যাচ্ছ না? কী ভয়ঙ্কর পশ্চাদগামী তুমি!

আর একটা মোচড় ঘুরল প্রবীরের গাড়ি। অ্যাকসিলেরেটরে বরং চাপ দিল তার পা। দেখো, কী করা যাবে? বুঝছোই তো, আমি সেজন্য সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যাই না। কেমন যেন আমার মনে হয় যে তারপরে তুমি শুকনো মাছ হতে থাকো যার, আঁত-অন্তর কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে! না, সরু অপুষ্ট কোফিই আজ লাঞ্চে খেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে অলীক মুখুয্যেরা এবং ইউরিয়া-পুষ্ট কোফি, ইত্যাদিতে তার রুচি নেই।

পেটুক প্রবীর উইণ্ডস্ক্রিনেব সামনে নাগের বাজারের উটকো, ফ্যাকাশে সাদা কোফি ঝুলিয়ে তার মির্জা গালিবের ফ্ল্যাটের দিকে ফিরে এল।

বেলা তখন সাড়ে বারোটা পার হচ্ছে। কেয়ারটেকারকে, যে নাকি এককালে এক নামকরা হোটেলের স্টুয়ার্ড ছিল এবং এখন আত্মজীবনী লেখে, ডাকাডাকি করে হাজির করিয়ে প্রবীর বলে দিল, আজ লাঞ্চেই কোফিভাজা চাই।

হেসে প্রবীর বলল, হ্যাঁ, এক টুকরো বাদামী করে ভাজা। জীবনেও এমনও দরকার, তাই নয়।

কেয়ারটেকার বলল, হ্যাঁ, সার, ফার অফ থিংস।

আচ্ছা আচ্ছা, বলে হাসি উপহার দিয়ে কোয়ারটেকারের স্টুয়ার্ডসুলভ স্মৃতিরোমন্থনকে উঠতি-পথে বিদায় দিল প্রবীর।

কিন্তু কেয়ারটেকারের দায়িত্বও আছে। যেন হঠাৎ মনে পড়ল এই রকম ভাবে (এটাই তার ম্যানারিজম) সে বলল, আপনি যখন ছিলেন না, সার, একজন মহিলা ফোন করেছিল। কেয়ারটেকারের চোখ চকচক করল। প্রবীর তার অভিজ্ঞতা থেকে জানে, মহিলা শুনলেই কেয়ারটেকারের প্রেমের কথা মনে হয়।

ও আচ্ছা। বলল প্রবীর।

আমি নম্বরটা লিখে রেখেছি। এই বলে কেয়ারটেকার ডাইরি বার করে ফোন নম্বরটা পড়ে শোনাল।

একটা ছুঁকছুঁক করা অনুসন্ধিৎসা আছে কেয়ারটেকারের। প্রবীর জানে, এটাই কেয়ারটেকারের সাহিত্যবোধ।

ও আচ্ছা, বলে প্রবীর বিদায় দিল তাকে।

পোশাক পালটাল প্রবীর, ঢিলেঢালা পোশাক পরল, সিগারেট ধরিয়ে বসল সে তার ইজিয়েচারে। এতক্ষণে তার মন শান্ত হয়েছে।

সিগারেট শেষ করে সেই মহিলার ফোন নম্বরটা মনে এল তার।

ডায়াল করল প্রবীর।

কে, হেলো, মিত্রা?

মিত্রাই তো, কিন্তু গলাটা খুব চাপা আর ধীর শোনাচ্ছে। অর্থাৎ যে কবোষ্ণ ঈষৎ-ভারি মিত্রার স্বরের বৈশিষ্ট্য তা নয়।

ফাদার, এর আগেই তোমাকে বলা উচিত ছিল

এখন বলো।

শান্তনুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোথাও হয়তো গিয়েছে।

আমিও তাই ভেবেছিলাম, ও তো আমাদের হেস্টিংস ম্যানশনেই থাকতো। আমাদের সেই ডিনারের পরে ওকে দুদিন পেয়েছিলাম। স্টুডিওতে ছবির চিন্তায় দেখেছিলাম। তৃতীয়বার থেকে আর ওকে পাচ্ছি না। বাড়ির ঝি-চাকর দারোয়ানরা বলল, একমাস হল আর আসে না।

গার্টুড নিশ্চয় খবর রাখে।

ভেবেছিলাম। কাল তার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। সেও শান্তনুকে খুঁজে পাচ্ছে না। আমাকে সে অপমানজনক কথাবার্তা বলেছে।

তুমি কি ভূদেবকে বলেছো?

হ্যাঁ। তিনি খোঁজ করছেন।

তোমার কি মনে হয় তাকে...

যেন কেঁদে উঠল মিত্রার স্বর, না, না, ফাদার, তা বলো না। বরং খুঁজে দেখো না।

ধীরে ধীরে রিসিভারটা রেখে দিল প্রবীর।

কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল এই গল্পের কি এখানেই শেষ?

ডিসেম্বরের আকাশ। আলো নিশ্চয়ই কম। লোকের পোশাক-পরিচ্ছদেও পশমের বাহুল্য যার রঙ তেমন উজ্জ্বল হয় না, অন্যান্য কাপড়ের পোশাকে যেমন হতে পারে। এসব থেকেই, যেমন আমরা আগে বলেছি, প্রবীরেব অনুভব হল যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে কলকেতা।

কিন্তু পৃথিবীর কবিতা কি কখনও মৃত? কোকিলেব কুহু মুছে গেলে কি হেমন্তে মশার করুণ শোকগীতি শোনা যায় না? আলোচনাটাকে উদ্ভট শোনালেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এটা এক প্রসিদ্ধ কবিরই উক্তি।

বস্তুত এটা এখন কলকেতাতেই প্রমাণ করা যায়। ছবি দেখার মরশুম, ভ্রমণের মরশুমের পর এটা এখন ক্রীড়া মরশুম। এথলেটিকস, স্পোর্টস, টেনিস, ক্রিকেট। যেন দুশো-গ্রামী মাটন চপ এবং কোফি, পালং (যার এক একটা পাতা পোয়া-ইঞ্চি পুরু এবং লম্বায় দেড়-ফুট) ইত্যাদির সাহায্যে কলকেতার শিরায় যে ভিটামিন-উজ্জীবিত রক্তপ্রবাহ তা এ খেলাধুলার মরশুমকে প্রমাণিত করছে। আপনার সুদেহী নামক কুস্তি আখড়ার কথা মনে থাকবে। তেমন সব আখডায় এখন সত্যিকারের কুস্তি হচ্ছে। অনেক সময়ে আগে থেকে সিট বিজার্ভ করতে হচ্ছে। বক্সিং-এর রিং আপনি কলকেতার চারপ্রান্তে অন্তত চাবটি পারেন যেখানে এবার বিলি ব্যাটলশিপের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কীলার আসছে। কীলার বলা হয় আদর করে। বিলি এ পর্যন্ত তিনজন প্রতিপক্ষকে পৃথিবী থেকেই নক আউট কবেছে। পাড়ায় পাড়ায় ইনডোর টেনিস। আব ক্লাবে ক্লাবে এথলেটিকস। আর সর্বোপরি ক্রিকেট। বিগত সেই দিন, যখন মুষ্টিমেয়ের সুবিধা ভোগ ছিল ক্রিকেট। বিগত সেই দিন, যখন ব্যর্থ ভারাক্রান্ত চিত্তে টিকেট না পেয়ে ফিরতো কলকেতার মানুষেরা। ইডেনের স্টেডিয়াম তো বটেই, কিন্তু তাকে হিসাব আনি না, বিধাননগবের সেই স্টেডিয়াম যাতে এক সঙ্গে পঁচিশ লক্ষ লোক ক্রিকেট দেখতে পারে তাও ক্যালক্যাটানরা শেষ করেছে সত্যি সত্যি। আব এ সত্ত্বেও যদি ক্রিকেট দেখা না হয় কাবো, ঘবে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে ফুটপাতে টেলিভিশন আছে। হ্যাঁ, ফুটপাতেও টেলিভিশন। শোনা যায়, একসময়ে খেলার মবশুমে পাড়ার ছেলেরা গলিগুলোতে খাড়া করা ইটের উইকেটে ক্রিকেট খেলতো। এখন রাস্তায় টেবলে টেলিভিশন বসিয়ে খেলা দেখে, উত্তেজনায় শট শট বলে চেঁচায়, ব্যাট হাঁকডায়, পেট্রোলের টিন পিটিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্যালিপসো বাজায়। হাস্যমুখর, আনন্দ-হিল্লোলিত সে পরিতৃপ্ত স্টেডিয়ামগামী জনস্রোতকে দেখলে বাজেনের ভাষায় বলা যেতে পারে এটাই রিচুয়াল, তেমন এক ব্রতপালন যা রহস্যজনকভাবে জীবনের ফাঁকগুলোকে ভরে তোলে।

রিচুয়ালের কথায় মনে আনতে হবে, এটা সেই সময় যখন প্রতিটি সকালই বড়দিনের উৎসবের দিকে ছুটে চলেছে। পবম কারুণিক সেই ক্রাইস্টের জন্মতিথি। এখনই তেমন প্রকাশ্যে না হলেও, কৌশলে তোমার আকর্ষণ বাড়াতে কাগজে কাগজে রাস্তায় ঝোলানো হোর্ডিঙে কোথায় কী কী প্রাণী এসেছে, কত শূয়োর, কত তিতির, কত টার্কি, টার্কিগুলোর উচ্চতা কত, কত ওজন পাখিগুলোর, কত নরম সে সব মাংস ইত্যাদি খবর প্রকাশ পাচ্ছে। এক পাঁচতারা হোটেলের মাথায় আলোর সাহায্যে সন্ধ্যার দিকে শুয়োর, ভেড়া, তিতির, মোরগ, টার্কির প্রসেশন দেখানো হচ্ছে। আর মদও বটে। সেই বিশেষ তিথির জন্যে কত ধরনেব মদ কোন কোন বন্দর থেকে রওনা হচ্ছে, সে সংবাদ টেকনোক্র্যাটদের কাগজে প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রবীরের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তা বলাই কি ঠিক হবে? প্রবীর যা করছে তাও কি একটা কবিতাই নয় যদিও হযতো তার সুর কিছু গম্ভীর এবং খাদের?

কী করছে প্রবীর? গত কয়েক বছর থেকেই এ সময়টা সে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। বছরের অন্য সময়ে যে চিন্তা করে তা থেকে এ চিন্তা পৃথক। অনেক সময়েই তো সে স্বাদহীন জীবন

নিয়ে, অনূঢ়া নিয়ে, অনেক হয়েছে বাঁচা—এমন বিরক্তি নিয়ে চলে। যখন কিছু বলে তখন তা হয় কষযুক্ত, ধারালো। সে সব কথা যেন, যা তার স্টাইল, নিজেকে গোপন রেখে প্রবীর নামে এক লেখকের পোজ। কিন্তু অভ্যাসের ফলে এই সময়টা, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই, বড়দিনের দিকে মুখ করে সে যেন তার পোজহীন মনকে নিয়ে চিন্তা করতে বসে। জীবন নিয়ে চিন্তা। জীবন কী, এই প্রশ্ন তোলে সে। কী হয়? শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চে বড়দিনের রাতের বাজনা শুনে ভোর রাতে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যায়। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তার এই সব চিন্তাভাবনার যেন একটা মাত্র উদ্দেশ্যই আছে, তা সেই ক্যাথলিক চার্চের ক্ল্যাসিক মাস্টারদের বাজনা শোনার জন্যে মনকে প্রস্তুত করা। পরের দিন সকাল থেকেই তো আবার সেই বিরক্তি। এটা কি একটা কবিতায় ছাড়া সচরাচর ঘটে! অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের ভাবনাটা যেন একটু গভীর। কদিন থেকেই সে ভাবছিল। আজ তো একেবারে বড়দিনের কাছেই এসে পড়েছে সে।

জীবন কী, এই প্রশ্ন। এটা তো নতুন নয়। তা না জানলে, প্রবীর তুমি সাহিত্যিক, তোমার সাহিত্য করা বৃথা। জীবন কি ছবি দেখা, ভ্রমণ এবং তারপরে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার রিচুয়াল পালন? অথবা জীবন কি এই গতির আনন্দে ভেসে যাওয়া এক রিচুয়াল থেকে অন্য রিচুয়ালে? অথবা জীবন কি এক দণ্ডভোগ, কোন আদিজননী জননী হতে চেয়েছিল বলে? তা হলে তো জীবন অলীক মুখুয্যের চাইতে অনেক বড় এক অলীক মুখুয্যের ভ্রুকুটি মেনে চলা। অথবা জীবন কি এক বোঝা, আজ যে ঘাড়ে চেপে বসে কিন্তু কখনই নামে না, যাব নাম কামনা তার তাড়নায় উর্ধ্বশ্বাসে কোথায় যাচ্ছি না জেনে ছুটে চলা?

আমরা গোড়াতেই বলেছি, প্রবীব সাণ্ডেল আমাদের স্বজাতি বলে তার প্রতি পক্ষপাত আছে। কিন্তু তাই বলে আমরা যে তাব মতামতের জন্য দায়ী হবো এমন নয়, সে কথাও বলা হয়েছে। আমরা যে তাকে স্বজাতি বলেছি, রূপসী পাঠিকা, এটাও লক্ষ্য করুন। সে আমাদেব স্বজাতি, সুতরাং ভুলত্রুটিপূর্ণ মানুষ আমাদের মতোই। আসলে সে এক গ্যালেটিয়ার গল্প আবিষ্কার করেছে, সেটাকে তাব জীবন সম্বন্ধে প্রশ্নের কোন এক জায়গায় বসাতে চাচ্ছে। কিন্তু সেই নীল বিষণ্ণতা (এখন তো শান্তনুর খবর পাওযাব পব বিষণ্ণই) ঠিক কোথায় বসালে জীবন এক গভীর মধুর খাদের সুর হয়, তা খুঁজে পাচ্ছে না।

সে বরং রাত দশটায় ক্যাথলিক চার্চের দিকে রওনা হল। অন্ধকার নয় তেমন পথ। বরং এখানে ওখানে বাড়ির আলোও রাস্তায় এসে পড়েছে। চার্চের গাছগুলোর কাছে গেলে অন্ধকার পাবে, যে স্নিগ্ধ অন্ধকার তুমি চাও। সে কোন বিশেষ সঙ্গীত আশা করছে না, আশা করছে মোৎসার্ট, বাখ এবং তাদের চাইতে কম প্রসিদ্ধ যারই হোক, কিছু বাজানো হবে। ক্যাথলিক চার্চের আজকের বাজনা ভালো হয়। লোকপ্রসিদ্ধি এই, কলকেতার শ্রেষ্ঠ বাজনদারদের অনেকেই পাঁচতারা হোটেলগুলো থেকে সুযোগ করে, পালিয়ে হোক, এখানে এসে বাজিযে যায়। যেন একটা অন্ধবিশ্বাস যা এই বিজ্ঞানপ্রদীপ্ত কালেও যাচ্ছে না।

প্রবীর ভাবল, এটাও কম কৌতুকেব নয়। ধর্ম কে মানে? কে মানতো? কার কানে পৌঁছেছে পরম কারুণিক ক্রাইস্টের কথা? তাঁকে তো বরং শোষণকারীদের সুবিধার জন্য, অনেক কৌশল করে বিলনো ঘুমের বিষ মনে করা হয়। কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য করে যে সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে গিয়েছে। কেমন যেন হৃৎপিণ্ডকে অধিকার করে সেই সঙ্গীত, সেই অপূর্ব ত্রুটিহীন সৌন্দর্য।

অন্যদিকে ঠিক এই সময়েই আর এক কৌতুক ঘটে চলেছে। প্রবীর যখন চার্চের ছায়াওয়ালা গাছগুলোর কাছাকাছি তখন তারই মতো আর একজন জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে চার্চের দিকেই আসছিল। বয়সে সে যুবক, তার কালো সার্জের স্যুট চার্চের উপযুক্ত পরিপাটি, সুন্দর। কিন্তু তার বাইরের আকৃতির সঙ্গে তার মনের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আগন্তুক চার্চের গেটের সামনে

আসতেই তাকে রাজেন বলে চেনা গেল। কৌতুক এই, সেও জীবন সম্বন্ধে ভাবছে।

বলা বাহুল্য সে চিন্তা করছে দার্শনিকের মতো, প্রবীরেব মতো অনুভূতির সাহায্যে নয়। ইতিপূর্বে তাকে আমরা বিলিয়ার্ড টেবলে চিন্তা করতে দেখেছি। সে তখন ভাবছিল, টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষাল তার মানসিক তৃপ্তির জন্য মাধবীকে পুরুষোচিত পোশাক পরাতো, এটা তার মনের বৈজ্ঞানিক প্রবণতার ফল হতে পারে। তারপব সে ভেবেছিল, ভেবে দেখতে গেলে প্রেমের ধারণাটাই কৃত্রিম। যা এক সময়ে প্রজাতিবিস্তার মাত্র ছিল, মানুষ তাকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে চলেছে এখনও, যেমন দহনক্রিয়া থেকে আলো আবিষ্কার করে আলোকেই ক্রমশ প্রাধান্য দেওয়া। তা হলেও, মানুষের মন কোথায় এক কৃত্রিমতা থেকে অন্য কৃত্রিমতাকে পৃথক করে? নিরঞ্জনের আবিষ্কাবের থেকে মাধবী নিজের আবিষ্কারকে বেশি পছন্দ করে।

দ্বিতীয় প্যাবাগ্রাফে সে চিন্তা করল, কিন্তু এরকম পছন্দের কী কারণ আছে? নিরঞ্জন ঘোষালের সেটাকেও যদি ভালোবাসা বলো তবে তাব মধ্যে সৌন্দর্য অনুভূতির দিকটাই কি প্রবল ছিল না? সৌন্দর্য অনুভূতি—যাকে জীবনের নিছক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর বাইরের কিছু বলা যায়। নিবঞ্জন মাধবীর কাছে সন্তান চেয়ে নিজের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। আর মাধবীব এই ভালোবাসা যা তাকে অঘটনঘটনপটু করেছে তা কি জীবনের মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত? মূল বিষয়? কী মূল বিষয়? বাজেন আজ হাসতে পারছে না নিজের চিন্তার ছুটোছুটি দেখে। কে যেন এক নাট্যকার জীবনশক্তি বলে একটা কথা বলেছে। সে জীবনশক্তির একটা রূপ চোখে পড়ে যখন নাবী নিজের প্রয়োজনে পুরুষকে বশ করে ফেলে। এই জীবনশক্তির জন্যই কি মাধবীব ভালোবাসা নিরঞ্জনের কান্তি-অনুভূতির পথে না গিযে (কান্তি-অনুভূতি তার ক্ষেত্রে অভিনয়ের ব্যাপার) জীবন বিস্তাবেব পথে এসেছে।

এখানে কিন্তু সেই নাট্যকারের জীবনশক্তির কথা খাটে না।

রাজেনের চোখ চঞ্চল হয়ে চার্চের ছায়াওয়ালা গাছের কাছাকাছি যেন প্রবীরকে খুঁজল। সে কেন এসেছে এখানে? তা কি প্রবীব চার্চেব বাজনা শুনতে আসে এই জেনে, তা শুনতে কেমন লাগে তা পরীক্ষা করতে? প্রবীবের স্টাইল তার কাছে প্রিয়, সেজন্যই কি তার জীবনটাকেও দেখতে চায়? অথবা প্রবীরের সেই স্টাইলিস্ট প্রবন্ধটাই তাকে প্রবীবেব সম্ভাব্য সান্নিধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

এই প্রবন্ধের কথা আমরা আগেও বলেছি। যে প্রবন্ধে প্রবীর খুব বাঁকা, ধারালো ঝকঝকে হাসির সাহায্যে এই প্রশ্নটা তুলেছিল · দশ বছর পর পর যুদ্ধ বাধিয়ে মৃত্যুর জন্য যাদের কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি, মানুষ সম্বন্ধে যাদের অনেকটা অবিশ্বাস আছে, তেমন এক কোটি সৈন্যের ইউনিফর্ম পরে মানুষ মারা ভালো, না মাতৃগর্ভের কোমল অন্ধকার যেখানে পরম বিশ্বাস সেখানে আচমকা মৃত্যু ঘটানো ভালো? যেন সে এই প্রশ্নের সমাধান প্রবীরের মুখে শুনতে চায়। প্রবীর যেন এক বড় ভাই, যার কাছে শোনা যেতে পারে।

হ্যাঁ, সেই জীবনশক্তির কথা যার জন্য নারী তাব রূপ, কোমলতা, সেবা নিয়ে একটা পুরুষকে বশ করতে পারে, তা এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মিথ্যা করে দেয়া যায় যেন। সুরঙ্গমা হাউসকীপার। সে কিন্তু মায়ের মতো সস্নেহ বুদ্ধি নিয়ে কথা বলেছে। বলেছিল, বাছা, মনে রাখতে হবে এটা জুডিশিয়াল সেপারেশন। নিরঞ্জন জানতে পারলে মাসোহারা বন্ধ করে দিতে পারে। তা ছাড়া এটা তো ন্যায়নীতির প্রশ্ন নয়। পার্লামেন্টে নারীর এই অধিকার মানা হয়েছে। নিছক সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন। তা ছাড়া তোমার নিজের অভিনয়-শিল্পের কথাও ভাবতে হবে যার জন্য নিরঞ্জনের বেলায় তোমার আপত্তি ছিল। তা ছাড়া বিপদও নেই।

রাজেন অনুভব করল, এই জন্যই সে এসেছে চার্চে। যদি বাজনা শুনতে শুনতে তার মন শান্ত হয়, যদি সে মনস্থির করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুরঙ্গমা, যেমন সেই পারে, বলেছে, কী যে বলো,

বাছা, জানুয়ারীর আগে প্রাণই হবে না। পাপ কোথায়?

চার্চের শেষ লাইনে যেখানে অন্ধকার সেখানে সেই কোমল অন্ধকারে বসে রাজেন দেখতে পেল সামনের লাইনে যেন প্রবীরের টাক চকচক করছে। যেন তা সম্ভব এখনও, এমন করে হঠাৎ জানা, প্রায় মুখস্থ একটা বাক্যবন্ধের অনুবাদ করে রাজেন তার চিন্তাকে রূপ দিল, কোথা যাও মানুষের পুত্র!

রাত তখন প্রায় শেষ হচ্ছে, প্রবীর উঠে দাঁড়াল। এখন কিছুক্ষণ বিরতি তারপর আবার ভজন শুরু হবে। এই সুযোগে আবার ডিং ডং করে ঘণ্টা বাজছে। চোখ দুটো লাল, ঘুমের ভাবও আসছে শরীরে কিন্তু প্রবীরের মুখে এমন তৃপ্তি আর দেখা যায় নি। যেন সে নতুন কেউ যার কোন স্টাইল নেই, যেন এখন সে হাসলে তাতে কিছুমাত্র ধার থাকবে না। মাথার উপরের ডোমের যে আলো তার গোটিতে পড়েছে মনে হচ্ছে তা গোটিতে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে সে সরে গেলেও গোটিতে আলোটা থেকে যাবে।

এখন অবশ্যই সে তার ফ্ল্যাটে ফিরবে।

দরজার কাছে রাজেনের সঙ্গে দেখা হল।

বাজনা শুনলে রাজেন? খুব ভালো, তাই নয়?

রাজেন জানল সে একমত এ বিষয়ে।

এটা কিন্তু বেশ কৌতুকের, রাজেন, সৌন্দর্যসৃষ্টিটা এমন জিনিস যে তার যেন একটা আলাদা প্রাণ আছে। যে উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তা মুছে গেলেও সৌন্দর্য থেকে যায়!

যেমন ধরুন ভিনাসের মূর্তি। সেটা তো পুজো করার জন্যই ভক্তবা তৈরি করিয়েছিল, পেগান ভক্তবা ; কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানদের চোখেও সে মূর্তির সৌন্দর্য তুলনাহীন।

ভালো উদাহরণ, খুব ভালো উদাহরণ। তুমি কি থাকবে?

প্রার্থনাটা একটু শুনি।

প্রবীর হাঁটতে শুরু কবে একবাব বলল, মন্দ নয় তো প্রার্থনার দিকে এই ঝোঁক। বোধ হয কিছু বুঝতে চায় প্রার্থনা সম্বন্ধে ; হয়তো দেখতে চায় যারা প্রার্থনা করে তারা কিছু লাভ করে নাকি।

খানিকটা দূরে গিয়ে প্রবীর ভাবল, ভালো উদাহরণ দিয়েছে ছোকরা, ইউরোপের বিখ্যাত ছবিগুলোর সামনে, ক্রিশ্চিয়ানরাও, উদ্দেশ্য বিলোপেব পরে বেঁচে আছে যে সৌন্দর্য, তা অনুভব করতে পারে। আচ্ছা, মানুষের জীবন সম্বন্ধেও কি তা বলা যায় নাকি? কী বা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্যই তো বিলুপ্ত। তা সত্ত্বেও কি মানুষের জীবন সুন্দর হতে পাবে না?

কথাটা বেশ মনে ধরল যেন। এটা ভাবতে ভাবতে প্রবীর এগিয়ে চলল। সে স্থির কবল এটাকে সে ভেবে দেখবে। মনে করো, প্রত্যেকের জীবন, যদি ঘটনাগুলোকে পর পর লেখা যায়, একটা গল্প তো। যার জীবন সে কোন না কোন উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটছে। কিন্তু ঘটনা পরম্পবা (উদ্দেশ্যে সে পৌঁছাল কিনা তা বড় কথা নয়) বেশ যাকে আর্টিস্টিক বলে তা হতে পারে। আমরা হয়তো ঘটনাগুলোর পিছনের যুক্তি সবটুকু জানতে পারি না।

কিংবা অন্য রকমও হয়, যেমন হল। প্রথম কথাতেই তো যুক্তিটা বোঝা গেল। তা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রবীরের মনে ব্যাপারটা যেন রহস্যময় হয়ে ঘুরতে লাগল, যার কারণ হয়তো অনেকক্ষণ ধরে চার্চে কাটানো। নতুবা এখন যে মির‍্যাকল কিছু ঘটবে তা প্রবীরের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

ফ্ল্যাটের দরজায় যে ম্লান আলো তাতেই দেখা গেল কে একজন সেই দরজায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। একটু নিচু হয়ে প্রবীর অবাক হয়ে গেল। চেনা যায় না যেন এত ময়লা পোশাক,

এত রোগা, গায়ের রং এমন পুড়ে যাওয়া।

প্রবীর ধীরে ধীবে লোকটির কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, শান্তনু নাকি, শুনছো, তুমি কি শান্তনু?

লোকটি উঠে দাঁড়াল, চোখ পিটপিট করল, বলল, ফাদার? হ্যাঁ, আমি শান্তনু। আমি আপনার কাছে কনফেস করতে এসেছি ফাদার।

যুক্তিটা তো বোঝাই গেল শান্তনুর, কিন্তু কেমন যুক্তিই বা সেটা?

চাবি ঘুরিয়ে ঘর খুলে প্রবীর একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বলল, বসো শান্তনু।

বাইরের ম্লান আলোতে যা বোঝা গিয়েছিল এখন ঘরের আলোতে তা আরও স্পষ্ট হল। ছেঁড়া প্যান্ট, ময়লা ছেঁড়া শার্ট, জুতোব মাথা ফাটা, নখে ময়লা, হাঁটুব কাছে একটা, পায়ের আঙুলে আর একটা ময়লা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ।

প্রবীর আবার বলল, বসো শান্তনু।

সে টুপি রাখল, ছাতা রাখল, কোট খুলল। সিগারেট আনল, নিজে সিগারেট ধরাতে গিয়ে আর একটা শান্তনুকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সিগারেট খাও শান্তনু।

সিগারেট শেষ হওয়ার আগে প্রবীর পায়চারি থামিয়ে শান্তনুর সামনে এসে একবার ঝুঁকে দাঁড়াল, নিজের কোমরে হাত রেখে বলল হেসে, বযস হয়েছে তো, বসে থেকে কোমর ধরেছে। তা তুমি বোধ হয় ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েছো। তা হলেও একটা ড্রিংক দরকার, তাই নয়?

প্রভিশনের আলমাবি খুলল প্রবীর। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে দুই গ্লাসে ঢালল।

শান্তনু কিছু বলতে গেলে বলল, দবকার, শান্তনু দরকার।

ব্র্যাণ্ডি অর্ধেকটা শেষ হতেই গ্লাস হাতে প্রবীব একবার তার স্নানেব ঘবটা ঘুরে এল। আবাব বসল শান্তনুর মুখোমুখি, এখন একটু শীত, তাই নয়? আব একটা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু তা নয় শান্তনু। ভোর হয়ে আসছে। দেখলাম ইতিমধ্যে জলটাকে ওরা কিছুটা তাতিয়ে ফেলেছে। আমার মনে হয় তোমার একটা স্নান দরকাব। নতুন পায়জামা, শার্ট বাব করে দিচ্ছি, কিছু মনে করো না। শুনবো, তোমাব কনফেশন নিশ্চযই শুনবো।

ব্র্যাণ্ডি শেষ হল। যেমন বলেছিল তেমন কবে স্নান কবে নতুন, পবিষ্কার, পাযজামা-শার্ট পরে শান্তনু ফিরে আসার আগে ফ্রিজিডেয়ার থেকে খাবার বার করে দুটো প্লেটে সাজাল প্রবীর। শান্তনু ফিরলে তাব গাযে নিজের একটা পশমি ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে বলল সে, দাঁড়াও একটু। আমারও অনেক সময়ে শেষ রাতে ক্ষিধে পায়। কিছু না খেয়ে নিলে ঘুম হয় না। কিন্তু তার আগে তোমার পায়ের ঘাগুলোকে দেখে নেয়া দরকার।

নতুন করে দুটো ব্যাণ্ডেজ বাঁধল প্রবীর।

শান্তনু যে ক্ষুধার্ত তা কি তার চোখ দেখেই বোঝা গেল?

প্রবীর বলল, স্নানের পর এই শীতে একটা ড্রিংক ভালোই হবে। কিন্তু কিছু খেতে খেতে আরও ... খেতে খেতে তোমার গল্পও শুনবো। এসো শান্তনু।

... বেশি নয়। শেষ হতেই আবার ব্র্যাণ্ডি আনল প্রবীর।

... গ্লাসে ঢেলে বলল, বলো এবার তোমার গল্প।

... কি অবাক লাগছিল কিংবা সে কি নিজের চিন্তা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে তার শরীরটাকে ... নিচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি ছিল না?

...লল, ফাদার, ... আপনার কাছে আমার পাপ স্বীকার করতে এসেছিলাম।

... বলল, কী খে... সস্তা মদ, না হাশিশ, নাকি এল এস ডি?

... নয়।

তবে কী?

ফাদার, আমি পলাতক, ডেজার্টার।

আস্তে শান্তনু, আস্তে।

ফাদার, আমি আমাদের এয়ার ফোর্সে ডিজাইন বিভাগে ছিলাম। ছুটি নিয়ে এসে আব যাই নি। জানেন রেখা দিয়েই তো ডিজাইন। রেখা আঁকতে আঁকতে মনে হতো এই রেখাগুলোর উদ্দেশ্য শব্দের গতিতে অতিক্রম করা। তা চেষ্টা করলে এই রেখাগুলোকেও তো অতিক্রম করা যায়। বঙ দিয়েই তা করা যায়। সেটাই হল আমার দুর্বুদ্ধি।

বলো শুনছি।

আপনি আমাকে কী বলবেন?

প্রবীর শান্তনুকে দেখতে লাগল। সে ভাবল, একালের সাইকাইআট্রিস্টবা এবং সেকালের ফাদাররা কি প্রশ্ন করতো? প্রশ্ন করার একটা অদম্য ইচ্ছা আছে দেখছি মানুষের, কিন্তু এ অবস্থায় তা কি নিয়ম? চোখেব চারিদিকে গোল হয়ে কালিমা, তাব মধ্যে চোখদুটি লাল। যেন স্নান, পরিচ্ছন্ন পোশাক, এবং ব্র্যাণ্ডির আদবে ইতিমধ্যে ঘুম এসে যাচ্ছে। দু এক মাসে মানুষ রোগা হতে পারে, কিন্তু তার গায়ের রং কি এমন পুড়ে যায়?

শান্তনু বলল, কিংবা এটা কাজের কথা নয়। আমি প্রস্তুতও। বরং তা আমার ভালোহ লাগবে। ফায়ারিং স্কোয়াডের কথা বলছি। এযাবফোর্স থেকে পালানোর জন্য ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত। আমি ঋণী থাকতে চাই না। অপরাধ করেছি, শাস্তি নেবো। কারণ শাস্তিতে *অপরাধ মুছে যায়।*

শান্তনু, ওব জন্য ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয় বলে আমি জানি না।

বলছিলাম ওটা মূল্যবান ব্যাপারই নয়। গোড়াতেই ভুল। স্কুলের ব্যাগ পিঠে বেঁধে পথের যে কোন নুড়িকে বল করে জুতোব ডগায় সেটাকে কিক করতে কবতে যখন স্কুলে যেতাম, তখন আকাশে শব্দের চাইতে বেশি গতির ফাইটাবগুলোকে দেখে মনে হতো ওই নীলের মধ্যে সব কিছু ডিঙিয়ে যাওয়াব সুবিধে আছে। ক্রমে ওই নীল আকাশ আর গতির সাহায্যে বাঁধন পেবিয়ে যাওয়া মন জুড়ে বসল। সুতরাং ধীরে ধীরে এয়ার ফোর্সের ডিজাইন বিভাগে। সেখানেই তো ক্রমাগত ডিঙিয়ে যাওয়ার, সীমাকে পার হওয়াব চেষ্টা করার সুবিধা। তারপর কিন্তু মনে হল, রেখাই তো সীমা আর রেখা পার হওয়ার উপায় রঙ।

হাই তুলল শান্তনু।

আমার মনে হয়, শান্তনু, এখন তোমার একটা ঘুম দরকার, হযতো কনফেশন নয়। আর এটা ব্যাচেলারের ফ্ল্যাট হলেও তোমাকে বাড়তি বালিশ আব যথেষ্ট বাগ দিতে পারবো। আর এখন রাত শেষ হচ্ছে। আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে নিতে পারি। কাল সকালে একটু দেরীতে, ধরো দশটায়, ব্রেকফাস্টে বসে শুনবো।

শান্তনু হাসল। নিজের মনের গভীরে কিছু দেখল যেন। বলল, আসলে, ফাদার আপনি নিশ্চয় জানেন, ভগবান সব কিছুই রেখা দিযে, সীমা দিয়ে, সৃষ্টি কবেছিল। সে এক অদ্ভুত ক্ষমতা, সেই রেখাগুলো।

কিন্তু, শান্তনু, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

এটা তো একটা অপরাধ। ফাদার, আমার অন্য অপরাধও আছে।

প্রবীর উঠল। আলমারি খুলে বাড়তি বালিশ ও রাগ বাব কবল।

শান্তনু বলল, ফাদার, ওই ভাবে লোভ দেখালে আমি আব জেগে থাকতে পারছি না।

দরকার নেই, সকাল হয়ে আসছে। আগেই বলেছি, আমরা দশটা অবধি ঘুমিয়ে নিতে পারি।

প্রবীর চওড়া সোফাটায় সব চাইতে নরম রাগ বিছিয়ে, বালিশ পেতে বলল, এসো, শান্তনু, তুমি ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত আমি তোমার হাত ধরে থাকবো।

শান্তনু শুয়ে পড়ল। তাব গায়ে আরও নবম বাগ চাপা দিয়ে তার ধারগুলো গুঁজে দিল প্রবীর।

শান্তনু বলল, ফাদার, ঘুম চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি ক্লান্ত খুবই, কিন্তু, জানেন, ফাদার, ফাদার, ফাদার...

বলো, শুনছি।

ফাদার, সে যে কী হিংসা, কিংবা তাকে কি হিংসা বলে? তা বোধ হয় বলে না। আমি একটা ছবি আঁকছিলাম। জল আকাশ ও তিন কন্যা। জল আর আকাশেব মতো অনাবৃত, গভীর তিন কন্যা, কিংবা একই কন্যাকে তিন দিক থেকে দেখা। লাইল্যাক আর নীল আব মেরুন, নীলে ঢাকা লাইল্যাক। মনে হচ্ছিল ফাদার, আঙুলের ডগায়, ঠোঁটের পাশে রঙগুলো উপচে পড়ছে। কিন্তু ক্রমশ যেন রঙগুলো শুকিয়ে গেল। আব আমার তখন মনে হতে লাগল ক্রমশ, আমি যেন ভূদেবকে হিংসা করি।

প্রবীর বিছানায় বসল, বলল, আমিও শুচ্ছি দেখো, শান্তনু, আমি বুঝতে পারছি তারপব তুমি রঙগুলোকে ধবার জন্য তেতো মদ, মারিউয়ানা, এল এস ডি এই সব! শরীবকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে . (হাই তুলল প্রবীব) তা নতুন কী, এরও আগে কে একজন বলেছিল এই আসনে শবীর শুকিয়ে যাক, ত্বক, অস্থি মাংস ধ্বংস হোক. .

প্রবীর উঠে বসল। তার মনে হল ঘুমের প্রথম শ্বাসেই পাখি পালিয়েছে। সে স্লিপার পায়ে দিল, উঠে, বিছানা থেকে নেমে। না, সে ববং জানালাব গোড়ায় বসবে। শান্তনু ঘুমিয়ে পড়েছে।

প্রবীর নিঃশব্দে চেয়ার টেনে জানলার গোড়ায় বসল। ঘড়ি দেখল। ছটা প্রায় বাজে। সে হাসল বাইরেব ঈষৎ রঙীন কালো আকাশের দিকে চেয়ে। না, প্রবীর, তুমি জানো না, প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের ঘুম কখন ভাঙে। ব্যাচেলাব তো!

সাড়ে ছটায় প্রবীর স্থির করল, এই সময়ে বহুদিন পরে তুমি পৃথিবীর মুখ দেখছো, কিন্তু এমারজেন্সিতে বোধ হয় সাধাবণ নিয়ম না মানলেও চলে।

সে টেলিফোনের কাছে উঠে গিয়ে ডায়াল করল। দ্বিতীয়বারে সাড়া পেয়ে কথা বলল গলা নামিয়ে, প্রায় ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে। হেলো, আমি প্রবীর সাণ্ডেল, আচ্ছা, তোমার সেই লাইল্যাক গাউনটা, যেটা দেখে ভূদেব শীর্ষাসন কবেছিল, সেটা পরে আমার ফ্ল্যাটে আসতে কত সময় লাগবে? এখন প্রকৃতপক্ষে ছটা আটাশ, সাড়ে ছটাই বলতে পারো। হ্যাঁ, আমার ফ্ল্যাটে, মির্জা গালিবের মাথায়। কাউকে কিছু বলতে হবে কেন?

আধঘণ্টা পরে ফ্ল্যাটের দরজায় নক হতেই প্রবীর নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। নিচু হয়ে বাউ করে প্রবীর বলল, কিছু নয, কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনজনের জন্য একটা ব্রেকফাস্ট করতে হবে। এখনই নয়। দশটা নাগাদ হলেই হবে, মিত্রা; নাগের বাজার থেকে আনা সরু ফ্যাকাশে কোফি আছে, দেখো কিছু করা যায় কি না। বোধ হয় ক্রিস্টমাস টার্কির অনেকটাই আছে। মাঝে মাঝে আমি পছন্দ মতো উপকরণ দিই আমার কেয়ারটেকারকে। তিনজনের ব্রেকফাস্ট, আমি, তুমি, শান্তনু।

মনে হলো মিত্রার মূর্ছা হবে। প্রবীর হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, আরে এ কিছু নয়। কিছু নয়ের চাইতেও কম। তুমি লাইল্যাক গাউনটা পরো নি দেখছি। ভিতরে এসো। ভিতরে এসো। (প্রবীর হাসল) ভেবে দেখো, তুমি প্রস্তাব করেছিলে, আমি যদি সাহসী হতাম তাহলে বাকি জীবন ফাদার, শান্তনু আর তোমার নিজের জন্য ব্রেকফাস্ট করতে হতো।

মিত্রাকে এনে শান্তনুর সোফা-বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসিয়ে দিল প্রবীর। মিত্রার পরনে সবুজে সাদা ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ দেয়া গাউন। প্রবীরের মনে অর্ধোস্ফুটভাবে পৃথিবী শব্দটা আসতে গেল। কিন্তু তার সময় দিল না সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

স্নানের ঘরে সে রুমালে নাক ঝাড়ছে বোঝা গেল।

ব্রেকফাস্ট দশটাতেই হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই ঘুম ভেঙেছিল শান্তনুব। উঠে বসে পাশের চেয়ারে মিত্রাকে দেখে শান্তনু একটু চোখ পিটপিট করলই। কিন্তু তারপরে বলল, একটা সিগারেট দাও, দিদি।

কিন্তু এসবের আগে একবার প্রবীর ও মিত্রা পাশাপাশি বসেছিল।

বেশ শীত না, এই বলে শুরু করল।

সে বলল, মিত্রা তোমাব নিশ্চয়ই একটা রুটিন আছে। মনে মনে তৈরি করা। সকালে ওঠা থেকে রাতে ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত। তুমি ব্রেকফাস্টের পরে কী করো?

ম্যাসাজার আসে, কোনদিন হেয়াবড্রেসার, আলট্রাভায়োলেট হয়।

তারপর?

এখন ঠিক আগের মতো নেই একটু বদলেছে। এখন ভূদেবের পোশাকেব তদ্বির করতে হয়।

আ, ভাগ্য! আমার জামার বোতাম আর এ জন্মে কেউ লাগিয়ে দিল না। বেশ তুমি তো আগে হেস্টিংস ম্যানশনেই আলট্রাভায়োলেট লাগাতে। তোমার সেলাইয়েব ঝুড়ি-সমেত ব্রেকফাস্টের পরে হেস্টিংস ম্যানশনে যেতে পারো। গাড়িতেই তো যাবে। সেলাইয়ের ঝুড়ি ব্যাক সীটে রেখে গাড়ি চালাতে নিশ্চয় তোমার অসুবিধা হবে না।

তা হবে কেন? মিত্রা হাসল।

তবেই তো তবেই তো। দেখো, আমি জেনেছি ব্রেকফাস্টের পরেই শান্তনু ছবি আঁকে। স্টাডি ইন ব্লু আনতে গিয়ে ওর অভ্যাস, ছবি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ হয়েছিল। তবেই তো, দেখো, তুমি সেলায়েব ঝুড়ি নিয়েও কয়েকটা সিটিং দিতে পাবো। এটা অসম্ভব হয় না যদি তুমি কষ্ট কবে ব্রেকফাস্টেব পব তোমাব মাসাজারকেও হেস্টিংস ম্যানশনে যেতে বলে দাও।

মনে হল মিত্রার চোখ দিয়ে দু তিন ফোটা জল পড়ল।

প্রবীর তা ভ্রুক্ষেপ কবল না, কেন না মহিলাদের স্বাধীনতায় সে বিশ্বাস করে।

সে বলল, আব আজকের প্রোগ্রাম এই, তুমি ব্রেকফাস্টের পর এখান থেকেই ভূদেবকে জানিয়ে দেবে যে হেস্টিংস ম্যানশনে যাচ্ছো। আমি গোটা বারো নাগাদ শান্তনুকে নিয়ে সেখানে পৌঁছবো। মানে, কিছু মনে কবো না। দশটার পর পর ক্যাথলিক চার্চে একটা সার্বিস আছে। ভালো বাজায়, কেমন কি না।

নতুন বছর এসেছে কয়েক দিন হল কলকেতায়। ক্যালক্যাটানরা বছরে দুটো নতুন বছর পালন করে। মাঝখানে কিছুদিন 'টেট' নামে এক নতুন বছর পালন করার বেওয়াজ হয়েছিল। রূপসী পাঠিকা, আপনার সেকালের ইতিহাস জানা থাকলে মনে পড়বে টেট শব্দটা ভিয়েটনাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এখন দুটো নববর্ষই আছে। একটা পয়লা বৈশাখে, অন্যটি পয়লা জানুয়ারী। আমরা পয়লা জানুয়ারীকেই পছন্দ করি। খুব দোষ দেওয়া যায় না ক্যালক্যাটানদের। এটা এক অদ্ভুত রুচি যে পয়লা বৈশাখের সব সেরা আনন্দ হবে দোকানদারের নতুন খাতা লেখা। যেন আমরা ইংরেজদের চাইতেও ব্যবসা ভালো বুঝি। এই রুচিবিকৃতিই ক্রমশ কলকেতায় মন পয়লা বৈশাখ থেকে সরিয়ে পয়লা জানুয়ারীতে স্থির করেছে। তা ভালোই হয়েছে। পয়লা জানুয়ারীতেই বান্ধবীকে নিয়ে হোটেলে যাওয়া যায়, বান্ধবীর হাত ধরে হালখাতা করতে কে যায় বলো? তা ছাড়া পয়লা জানুয়ারী শুরু

হয় ডিংডং ঘণ্টার শব্দে, শেষ হয় মদের প্রপাতে যা যেন নবধারাজল। ফলত এখনও নববর্ষের দু-তিন দিন পরেও বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুর প্রভৃতি অঞ্চল যা সেকালেই আধুনিক ছিল, এবং কাশীপুর-বরানগর অঞ্চল যা সেকালেই প্রাগগ্রসর ছিল আজও যেন সবুজ হ্যাঙোভাবে আচ্ছন্ন যদিও এই দুই অঞ্চলে সম্পূর্ণ দুজাতের মদ চালু আছে। আর এটাই স্বাভাবিক সুরাকসিন যে অভাবনীয় বাণিজ্য এনেছে, এবং সবুজ বিপ্লব যে অভাবনীয় হৃষ্টতা যোগায়, তাতে যে কোন সুযোগেই আনন্দে মুখর হওয়া স্বাভাবিক হচ্ছে। এই তো জীবন।

কিন্তু জীবন সম্বন্ধে রাজেন আর কত ভাববে? সে তো প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না যে প্রার্থনীয় কিছু পাবে সে। চিন্তা ছাড়া উপায় নেই তার। সেই নাট্যকারের জীবনশক্তি থিয়োরী এখন কি আর প্রয়োগ করা যায়? এ যদি জীবনশক্তির খেলা হয় তবে তা এমন এক শক্তি যাকে সুইচ টিপে অফ অন করা যায়। শখ হয়েছিল হিটার জ্বালার, ভালো লাগছে না তাই নিবিয়ে দিচ্ছে মাধবী। মাধবী জানে না, সে জ্বালাতেও পারে নিভাতেও পারে। তা হলেও কি জীবনশক্তিকে এমন কিছু মনে করা যাবে যা একই সঙ্গে মাধবী এবং রাজেনকে চালিত করবে?

কেন তার এবং মাধবীকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছাতে হল? (হায়, কোথায় গেল রাজেনের ভাইটানুবা পত্রিকা সম্বন্ধে নতুন বছরের পরিকল্পনা।) আশ্চর্য নয়? এটা কি তবে সেই অপবিত্র ভালো নারীর থিয়োরী যা প্রবীর তার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় বলেছে। কী ভালো মাধবীর মধ্যে? অভিনয় শিল্পের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ? যার জন্য সিনেমার অর্থকরী হাঁকডাক থেকে ববং আর্ট থিয়েটারের বঞ্চনাকে মেনে নিয়েছে? এটা কি তার মনে শান্তি অনুভূতির যে শক্তি আছে তার একটা দিক মাত্র?

এটা না হয় রাজেনের আকর্ষণের কারণ হল। মাধবীর আকর্ষণের মূলে কী আছে? রাজেন তো নিরঞ্জন ঘোষালের মতো টেকনোক্র্যাট নয় যে মাধবীর অতুল রূপের যথাযোগ্য মূল্য দিতে পারবে। ভাবো, এখনও কিভাবে মাধবীর ফ্ল্যাট সাজানো। কিংবা সে তো প্রবীরও নয়। (প্রবীর, সে যেন একা থাকতে পছন্দ করে, গায়ে শুকনো কাদার দাগ—এমন এক হাতী, যে এখন একা, কিন্তু যার পিছনে দাঁড়ালে, অনায়াসে একটা গোটা দলকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে।) এটা কি এই অপবিত্র ভালো নারীদের বৈশিষ্ট্য যে তারা এক অসাধারণ লোককে বেছে নেবে? আর তারই সাহায্যে সে সাধারণ জীবনের চাইতে ভালো একটা জীবনকে অধিকার করবে, যে জীবনে নাটক আছে, রূপ আছে?

নতুবা রাজেন তার নিজের কামরায় বসে চিন্তা করল, সেই পুরনো গল্পের কথা বলতে হয়, যেন মাধবীর তাবৎ দর্শক ও ফ্যান যারা তার ক্যাবারে নাচের দিন থেকে কমপিউটার-সিনেমার দিন পর্যন্ত হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে, তারা এবং পরে নিরঞ্জন যেভাবে তাকে দেখতে চেয়েছে, এদুটোর বাইরেও আর এক রকম দেখা আছে যা রাজেনই দেখেছে বলে মাধবীর ধারণা।

কিন্তু এমন করে কিছু বলা যায় না। তার চাইতে কি, রাজেন চিন্তা করল, মানুষটাকে দেখা ভালো? ক্রিস্টমাস সন্ধ্যায় হ্যামলেট অভিনয়ে তার রানীর পার্ট শেষ পর্যন্ত যত ভালো হবে আশা করা হয়েছিল তার চাইতেও ভালো হয়েছে। ক্ল্যাসিকের ডাইরেক্টরবোর্ডের যারা মুখ খুলেছে তাদের একজন বলেছে, প্রতি ইঞ্চি রানী। দুজন বলেছে, এবং বলো প্রতি ইঞ্চি মা।

অভিনয় শেষে রাজেন প্রস্তাব করেছিল মাধবী ফ্ল্যাটে যাক, সে একটু ঘুরতে বেরোবে। মাধবী ছাড়ে নি। হাত ধরে বলেছিল, এত লোকের সামনে ঢলাঢলি করো না, উঠে এসো গাড়িতে।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে মাধবীর সে এক রূপ। যা কোনদিনই করে না তেমন করে সুরঙ্গমাকে ডেকে বলেছিল, জুতোটা খুলে দাও। সুরঙ্গমা জুতো খুলে দিয়েছিল, মাধবীর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে। রাজেনকে বলেছিল কোট খুলে দিতে। রাজেন কোট খুলে হ্যাঙ্গারে রাখলে মাধবী শোবার

ঘরে গিয়েছিল। সেখান থেকে ডেকেছিল, প্রায় যেন হুকুমের সুরে। বাজেন গিয়ে দেখেছিল, মাধবী পোশাক পরেই বিছানায় শুয়েছে। রাজেনকে বলেছিল, মাথার কাছে বসো তো। বাজেন বসলে কিছুক্ষণ যেন হাত পা ছড়িয়ে ক্লান্তি দূর করল মাধবী। তারপর বলেছিল, সারা বার্নাড়ের জীবনী কি বাংলার পাওয়া যায়? আমাকে এনে দিও।

সারা বার্নাড।

হ্যাঁ, অভিনেত্রী সারা বার্নাড। যার পায়ের কাছে ইউরোপের কত রাজমুকুট লুটিয়েছে।

এতক্ষণে যেন তার আজকের ভঙ্গীটা বোঝা গেল। কেমন যেন দর্পিতা। গাড়িতে ওঠা, জুতো খোলা, কোট খোলা, এ সবই যেন তাই বোঝায়। যেন তা অভিনয়ের প্রশংসা নয়, যেন বা অভিনয় সার্থক ভাবে করতে পেরে তৃপ্তি। কিংবা দর্পর চাইতে বেশি লাগসই শব্দ বোধ হয় গুমোর। যেন নিজেব ভিতরে কিছু অনুভব করে নিজেকে সারা বার্নাডের সমকক্ষ মনে করছে। তা কি একটা অভিনয়ে সাফল্য (তাও ক্লাসিকের মতো সাধারণ মঞ্চে) থেকে হতে পারে? তা করার চাইতে বেশি মঞ্চ-অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে মাধবীর।

তখনও বোধ হয় সে নিজে, বাজেন ভাবল, কিছু ভাবছিল। হয়তো চিন্তাকুল দেখাচ্ছিল তাকে। দর্পিতার মতোই উঠে বসেছিল মাধবী। বলেছিল, পার্লামেন্ট আমাকে যে অধিকার দিয়েছে তা কী ভাবে বাখতে হয় তার ভাবনা তুমি না করলে, রাজেন। না সে বিষয়ে আমি তোমাকে কিংবা সুবঙ্গমাকে জড়াতে চাই না।

কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই টেলিফোনে ডেকেছিল মাধবী। আজ সে ডাক্তাবের কাছে যেতে চায়। বলেছে, দেখো, এমন কোথাও যেতে হবে, যেখানে আমাকে কেউ চিনতে না পারে। ওই যে কাগজে বাব হয় কোন সিনেমা অভিনেত্রীর কোন দাঁতটা তোলা হয়েছে, কোনটাকে ফিল ইন করা হয়েছে, কোন দোকানে অভিনেত্রী কান গলা নাক দেখাল, এ সব যে জনতা খোঁজ করে তা থেকে দূবে থাকতে চাই।

প্রায় যন্ত্রচালিতেব মতো (সে তো এ যুগেরই যুবক, যুগের বাইরে সশরীরে যাওয়া কি প্রযোজনের) বাজেন বলেছিল, মির্জা গালিবেই কোথাও হতে পারে। কারণ এ রাস্তায় তোমরা এত জন আছো যে একঘেয়ে বলে তোমাদেব সিনেমা ফ্যানেবা আসে না।

কিন্তু এখন বাজেনকে যেতে হবে।

মাধবীব ফ্ল্যাটে পৌঁছাতেই বাজি হল। যেন কিছু হয় নি এমন করে খবরের কাগজ পড়ছিল মাধবী। পোশাক না বদলে খবরের কাগজ হাতে মাধবী রাজেনেব সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসল।

সারাটা পথ মাধবী একটা কথাও বলল না। যেন খববের কাগজের চওড়া পৃষ্ঠাই আজ তাব মুখের আড়াল।

ক্লিনিকটা পেতে খুব কষ্ট হল না। রিসেপশনিস্টেব ঘর পার হয়ে মাঝারি সাইজের ওয়েটিং হলে পৌঁছাতে আধঘন্টা। মাধবী তবু খবরের কাগজেই কিছু দেখছে। যেন সেখানেই সে আশ্রয় পাবে। ইতিমধ্যে ডাক্তারেব সঙ্গে আলাপ করে এল রাজেন।

তারপর ডাক্তার এল। বেশ সহাস্যমুখ স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়েসী ডাক্তার।

মাধবীদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কিছুনার চাইতে কম কিছু এটা। একটুও নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। এখন এটা রাশ পিরিয়াড, সে জন্য আপনাকে একটু দেরি করতে হবে। আপনি নিজের নাম গোপন কবে ছদ্মনামেও আসতে পারেন। ব্যাপারটাই যখন আইনসঙ্গত তখন ছদ্মনামে কোন দোষ নেই।

এ সবই যেন মুখস্থ, সেই হাস্যবদন সুবেশ ডাক্তার যা বলল। তারপর যেন রাজেনের নার্বসকে

শান্ত করতে তাকে লক্ষ্য করে বলল, প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণের মরশুমের পর আমাদের আর সাইকাইআট্রিস্টের একটু কাজের চাপ পড়ে। শুনেছি ইউরোপে সামার সী বীচিং এর পরেও তাই হয়। তবে ওদের সাইকাইআট্রিস্টরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে, সাবা বছরই মনের জট খোলে।

মাধবী খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলল। এই প্রথম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার হর্সটেইলে বাঁধা লাল চুলের গোছা আবার অসহিষ্ণু ঘোটকীর কথা মনে করিয়ে দিল।

ভ্রু কুঁচকিয়ে মাধবী বলল, এ আমাকে কোথায় এনেছো, রাজেন! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি আমার স্বামী? আমি তোমাকে ডেন্টিস্টের কথা বলেছিলাম।

পার্স থেকে কয়েকখানা নোট ডাক্তারের হাতে দিয়ে, থ্যাঙ্কু ডক্টর বলে, রাজেনের হাত এক হাতে, অন্য হাতে কাগজ-সমেত ব্যাগ ধরে বলল মাধবী, এসো এসো।

একেবারে রাস্তায় ফুটপাতে এসে বলল মাধবী হাঁপাতে হাঁপাতে, কী বুদ্ধি!

রাজেন হাসতে গেল। কিন্তু লক্ষ্য করল যে হাতে মাধবী তার হাত ধরেছে, সে হাতের গাঁট দিয়ে যেন রক্ত বেরোবে চাপের চোটে।

রাজেন বলল, কিন্তু মাধবী...

মাধবী বলল, রাজেন, তুমি ভেবে দেখো, আমরা প্রায় পুরো ডিসেম্বর মাসটা হাঁটি নি পাশাপাশি। এসো, হাঁটি। দেখো দেখি কোথাও কাছে বেশ ঝাল ঝাল ডালমুট পাওয়া যায় কি না।

মাধবী হাঁটতে সুরু করল।

রাজেন বলল, কিন্তু মাধবী, তুমি কি নিরঞ্জন ঘোষালের কথা ভেবেছো?

রাজেন, সে তো একজন ইকোনমিস্ট, প্ল্যান-গাণিতিক। আমার এ বিষয়টা দর্শনের আওতায় পড়ে।

সুরঙ্গমা বলেছিল...

সে যদি মামলা করে, দেখো, মোটামুটি পৃথিবীতে লডাকু বলতে দার্শনিকদেরই বোঝায়, কারণ তারা যখন লড়াইয়ে নামে গোঁয়াবের মতো নিজের নীতি ছাড়া আর সব ভালোমন্দর হিসাব ভুলে যায়। বাহ্, কী সুন্দর! ওই ডালমুটগুলো কেনো তো।

কিন্তু এখন তো রোদ উঠে পড়ছে।

দরকার হলে খবরের কাগজ দিয়ে মুখ আড়াল করে হাঁটবো।

কিন্তু, মাধবী, তোমার অভিনয়...

আচ্ছা, তুমি আমাকে কবে বিয়ে করবে তা ভাবো না হাঁটতে হাঁটতে।

অভিনয়ের জন্য এব আগে নিরঞ্জনের সঙ্গে..

রাজেন, দার্শনিকরা, বোধ হয় কম দেখতে পায়। এসো, আমরা নাটকের গল্প করি। আচ্ছা, তোমাদের পৃথিবীতে কি এমন নাটক নেই, যাতে মা, মাসি, বউদি, এমন সব পার্ট থাকে। আছে, তুমি জানো। মনে করো, অয়দিপাউস অভিনয় হবে, কিংবা এই হ্যামলেটই। এসবেও তো মায়ের পার্ট আছে।

তা আছে।

মনে কর, যদি আমি অয়দিপাউসের মা, হ্যামলেটের মা, অথবা ধরো মিত্রার পার্টই করতে চাই, আমাকে জানতে হবে না—মা হওয়া কাকে বলে?

রাজেন উত্তর খুঁজে না পেয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে যেন কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্যই বলল, মিত্রা? মিত্রা আবার কোন নাটক?

হাঁটতে হাঁটতে মাধবী বলল, ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, এ বামুনের আবার খবরের কাগজ পড়লে

র‍্যাশেস বেরোয়। আজকের কাগজ নিশ্চয় পড়োনি। প্রথম দুপাতা জোড়া খবর, মিত্রা আর তার চিত্রকর গেরি স্যান্টায়ানার।

গেরি স্যান্টায়ানাব নামটা কি অস্পষ্টভাবে অপরিচিত বোধ হল রাজেনের?

খবরের কাগজের খবর বলছো।

হ্যাঁ, ছোট বড় মাঝারি হেডিং দুকলমে, দুজনের ছবি, হেস্টিংস ম্যানশন নামে একটা বাড়িব ছবি।

হাঁটতে হাটতে বলল রাজেন, ব্যাগটা আমাকে দাও, আর গল্পটা বলো।

তুমি নিজে পড়ো না কেন? আমি যদি গল্পটা বলতে পারতাম, তবে তো আমি নাট্যকার হতাম নটী না হয়ে।

আমার পড়তে হলে একটা পার্ক, অন্ততঃ একটা ছায়া-গাছের নিচে একটা বেঞ্চ চাই। কাজেই গল্পটা তুমি বলে যাও মিত্রার, মিত্রাই তো নাম বললে, যার রোলে অভিনয় করতে তোমাব ঝোঁক।

দেখো, বাজেন, তুমি এখনই... জানো, আজকাল বেশি হাঁটলে ক্লান্ত লাগে। কিন্তু মনে হয় ওটা ভুল ধারণা, মনে হয় (শুনলে তুমি হাসবে) অন্য একজন যে খুব কচি আব মোটেই বোদ লাগায় নি গায়ে, তার ক্লান্তি লাগছে না তো।

বাজেন লাগসই কথা খুঁজে পেল না।

কযেক পা গিয়ে বলল, তোমার সেই চিত্রকব (চিত্রকরই তো বলছো?), তাব কী হল?

কী হল আবাব। তার ছবিব জন্য তাকে অ্যাবেস্ট কবেছে কাল দুপুরে পুলিশ, তবে লকআপে বাখে নি। কী যেন সেই মনের হাসপাতাল, সেখানে বেখেছে।

আচ্ছা, মাধবী, আমবা কি এখন ফিরে যাবো তোমাব ফ্ল্যাটে?

এখনই? কেন? বরং কোথাও যেতে পাবি এমন একটা জায়গা খুঁজে বার কবো।

এটা একটা এমন বাস্তা যার সবটা ঘুবে এলেও কোন ইনডোর স্পোর্টস, কোন মিউজিয়াম, কোন চিত্রশালা, এক কথায যাওয়ার মতো কোন জাযগাই নেই।

কোথায় যাওয়া যায ভাবতে ভাবতে বাজেন হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ যেন স্মৃতিতে সে খুঁজে পেল। বলল কী নাম যেন বললে চিত্রকরেব? গেবি স্যান্টাযানা না? তুমি কি তার ছবি কখনও দেখেছো?

আমি কী বলবো —আমার সৌভাগ্য হয় নি!

না, তা তোমাকে বলতে হবে না। .. কিন্তু কোথাও এসবাব জায়গা নেই। আমরা কি কোন বেস্তোরাঁয বিয়ারের জন্য ঢুকে বিশ্রাম কবে নেবো। আচ্ছা, কি করে তোমরা থাকো এই পথে, একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত নেই। এখানে সবাই তো তোমরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, লেখক।

তেমন দবকাব হলে এ ওব ফ্ল্যাটে যাই। তোমার এই ডালমুটগুলো বড্ড ঝাল।

জানো, মাধবী, এখন আমার মনে পডল, যে চিত্রকরেব কথা বললে তার একখানা ছবি এই পথেই আছে। কেমন, কৌতূহল হয়?

কোথায আছে? যাঃ, তুমি ফাঁকি দিচ্ছ।

যদি যে ব্যবস্থা হবে বলে কথা ছিল, তা মাঝপথে বদলে না থাকে, আর প্রবীর সাণ্ডেল যদি ফ্ল্যাট বদলে না থাকে, তবে চিত্রকরের একটা ভালো ছবি এই পথেই আছে। আচ্ছা, তোমাদের নিয়ম কী, যখন তোমরা এ ওর বাড়িতে যাও তখন কি আগে থেকেই তা ঠিক করা থাকে?

ফাদার মানে প্রবীর সাণ্ডেল ফ্ল্যাট বদলায় নি। এই পথেই একটা ব্লকে তার ফ্ল্যাট। (হঠাৎ হাততালি দেবে যেন এমন ভঙ্গি করল মাধবী) তুমি যাওয়ার জায়গা খুঁজছিলে, দার্শনিক, আমরা ফাদারের কাছে যেতে পারি। ফাদার অবিশ্যি তুমি বলো না, ওটা ডাক নাম, যা আমরা নটনটীরা নিজেদের মধ্যে বলি। এতক্ষণে নিশ্চয় তার ব্রেকফাস্ট হয়েছে। আর আমরা যখন একে অন্যের বাড়ি যাই

এই পথে, তখন ব্রেকফাস্টের পরেই তা যাই।

কয়েক পা গিয়ে মাধবী হেসে বলল, ভারি মজার কথা। কয়েকদিন আগে হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল সব সমস্যারই সমাধান হয়, যদি ফাদার তোমার হাতে আমাকে সমর্পণ করেন। একজন কেউ তো থাকবে যে কন্যাদান করবে।

বটে, বটে! রাজেন হাসল। তা হলে তো ফাদারের কাছে যেতেই হয়, বলতে হয়, কন্যাটিকে আমার হাতে এবার দিন। কিন্তু...

এর মধ্যে আর কিন্তু কী? বিয়ের সময়ে রেজিস্ট্রি অফিসে যদি কেউ থাকে তবে প্রবীর সাণ্ডেলের মতো একজন হলেই ভালো হয় না?

হয়, হয়, কিন্তু তিনি কী আমাকে যৌতুক দেবেন?

মাধবী কম যায় না। একটু ভেবে নিয়েই বলল, বেশ, বেশ, পৃথিবীতে তোমার তো একটা বিষয়েই অভাব বোধ আছে বুঝেছি। আমি না হয় ফাদারকে বলবো তাঁব স্টাইলটা তোমাকে যৌতুক দেবেন।

হাসতে হাসতে আরও কিছু দূর হাঁটল তারা।

রাজেন বলল, স্যান্টায়ানাব ছবিটা দেখবে, কন্যে? সত্যি কিন্তু ভালো। নাম বোধহয় প্যাশন অব ক্রাইস্ট। তোমাব কথা শুনে আমারই আবার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এখন তো ব্রেকফাস্ট পার হয়ে যাওয়ার সময় এবং এই মির্জা গালিবের নিয়ম অনুসারে একে অন্যের ফ্ল্যাটে যদি কেউ যায় তার সময়, সুতবাং তারা প্রবীবের ফ্ল্যাটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

রূপসী পাঠিকা, এখন আবাব আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকাব, শান্তনুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, স্টেট মেন্টাল হসপিটালে স্থানান্তরিত কবেছে, এ সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ পাওয়াব আগেই আপনাকে জানানো উচিত ছিল আমার। অন্তত মাধবী রাজেন আলোচনা করাব আগেই ; কিন্তু পরে সব জানলেও, পুলিশ পয়লা জানুযাবীর ভোরবেলার অন্ধকারে হেস্টিংস ম্যানশনের ছবি আঁকাব ঘব থেকে ঘুমন্ত শান্তনুকে যখন নিয়ে গেল, তারপর থেকে খবরের কাগজে সংবাদটা ছেপে বার হওয়ার আগে পর্যন্ত পুলিশ কী করবে তা কিছুমাত্র জানা যায় নি। এমন কি সে বাড়ির ঝি চাকবেবাও পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে বেরোতে পারে নি, এমন কি তারা যে টেলিফোনে মিত্রাকে তার নতুন ফ্ল্যাটে কিংবা শশী শাশাঙ্কাকে তার হোটেলে যেখানে সে নতুন স্বামীকে নিযে থাকছে, খবর দিতে পারে নি।

এখন আমরা অন্যদিকটা বলতে পাবি যা এখনও কোন খবরের কাগজে বাব হয় নি।

ব্রেকফাস্টের পরে অর্থাৎ যখন মাধবী, রাজেন প্রবীরের ফ্ল্যাটের দিকে চলেছে, প্রবীর সাণ্ডেলের ফ্ল্যাটেই একটা সভা বসেছে। কারণ, এটাই এরকম সভার পক্ষে এখন পর্যন্ত নিবাপদ। মিত্রার ফ্ল্যাট এবং সুরথ সোমের বাড়ির চারিদিকে তো সাংবাদিকরা ছোঁক ছোঁক করেই বেড়াচ্ছে।

এটাকে পরামর্শ-সভা বলাই সঙ্গত। সুরথ-বেলা, ভূদেব-মিত্রা, ভূধর স্যান, শাশাঙ্কা, গার্ট্রুড এরা সকলেই সমবেত, এবং অবশ্যই প্রবীর সাণ্ডেল। শান্তনুব বিপদ এবং এখন সে বিষয়ে কী করা উচিত তা আলোচনা করার জন্যই এরা এখানে সমবেত। কিন্তু দেখাচ্ছে যেন একটা আদালত। এটা এদের বসার বিশেষ ভঙ্গির জন্য হতে পারে। সুরথ সোম একা এবং দূরে। যেন সেই বিচারক। তার একপাশে প্রবীর, অন্য পাশে বেলা, যেন সহায়ক বিচারক। বাঁ দিকে একটা ডিভানে একা মিত্রা, মিত্রার বিপরীত দিকে সোফায় গার্ট্রুড এবং শাশাঙ্কা। এদের থেকে একটু দূরে সুরথের বিপরীত দিকে পাশাপাশি ভূদেব সমাদ্দার ও ভূধর স্যান। গার্ট্রুড এবং শাশাঙ্কা যেন সাক্ষী, ভূদেব ভূধর উভয় পক্ষের উকীল। আসামী অবশ্যই মিত্রা। আজ তার পরনে সেই সবুজে ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপ সাদামাটা গাউন—এটাই কি কয়েদীর পোশাক কিংবা জেলের লম্বা লোহার শিকগুলোকে মনে

আনছে? তার দুই বাহু নিরাবরণ ; তার তামাটে রেশমি চুল মাঝখানে সরু সিঁথিতে চেরা, পিছনে এলোখোপায় জড়ানো। একটা যেন পাথরের মতো ভঙ্গী তার বসায়। মাধবী রাজেন ঢুকে হকচকিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রবীর দেখে ফেলে মাথা নেড়ে খালি চেয়ারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করায় তারা বেরিয়ে যেতেও পারল না। ভূদেব-ভূধরের পিছনে বসল, আদালতে যেমন দর্শকরা থাকে।

বসতে বসতে রাজেন সুরথের পিছনে দেয়ালে প্যাশন অব ক্রাইস্ট ছবিটাকে দেখে মাধবী গোপনে ইঙ্গিত করল সেদিকে, কিন্তু এই বয়স্কদের এমন সভায় মাধবী যেন নিজের বয়সের কথা মনে করে রাজেনকে কথা না বলতে ইঙ্গিত করল। রাজেনও একটু অসুবিধায় পড়ল, কারণ সুরথ-প্রবীরদের বাঁ দিকের দেয়ালে নীল মার্বেলের মতো ক্যানভাসটা তার চোখে পড়ে যেন তাকে বিব্রত করে তুলল।

মাধবী রাজেন যখন ঢুকল তখন গার্ট্রুড কথা বলছে। উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু. অনুমান করি, আরও আগে থেকে বলা দরকার। তখনও প্রবীরের ব্রেকফাস্ট শেষ হয় নি। সেই প্রাক্তন হোটেল স্টুয়ার্ড কেয়ারটেকার টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক টুকিটাকি অর্থাৎ ক্যাবারে নাচুনের কথা এবং ইংবেজি কবিদের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবীবের আহারের রুচিবৃদ্ধি করছিল (তার নিজেব ধারণার মতো)। তখন সতর্ক কাশি ও মৃদু কড়া নাড়ার শব্দে প্রবীবের নির্দেশে দবজা খুলে ভূদেব সমাদ্দার ও ভূধর স্যানকে বসিয়েছিল কেযারটেকার।

তারাই প্রথম এসেছিল। তাবা দুজনেই মুখোমুখি চেয়াবে বসে নীরবে যে যার সিগাবেট ধবিয়েছিল। আমরা আগে যেমন দেখেছিলাম, তেমন করে ঢাউস খবরের কাগজের পাতার আড়ালে আত্মগোপনের সুবিধা ছিল না ভূধর স্যানের এখানে। সিগারেটের ধোঁযা তেমন ক্যামুফ্লাজ নয।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই ভূধর বলল, আ, ভূদেব, যদি তুমি, কেমন তাই না?

ভূদেব খুব মেপে মেপে কথা বলল, নিচু গলায়, প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু উচ্চারণ কবে কবে। দেখো, স্যানমশাই, তোমার সাইকাইআট্রিস্টের যুক্তিটা মনে আসছে মনে হয়, বন্ধুত্বে কখনই আর এমন তীব্র বিদ্বেষ ঢোকে নি। এখন আমাদের উচিত সত্যিকারেব স্টিলের ফয়েল নিয়ে পবস্পবকে মোকাবিলা করা। তারপব যদি বিদ্বেষ যায়।

আ, ভূদেব, আ।

তুমি টেলিফোন করো। দেখো কোন অস্ত্রবিক্রেতা আমাদের জন্য এখানে সত্যিকারের তরোযাল পাঠাতে পারে কি না।

ভূদেব, তুমি কি একটু ভেবে দেখবে? আজ তোমার নার্ভস কি সত্যি ফয়েল নিযে অলিম্পিক-নির্ধারিত আইন অনুসারে তোমাকে খেলতে দেবে? আমার তো মনে হয়, তুমি প্রথম সুযোগেই রক্ত বাব কববে।

যেন তার কারণ নেই? ভূদেব হাসল। শূন্যকণ্ঠে হাসা বোধ হয় একেই বলে। বলল আবার, যখন স্কুলে সেকস অবশ্যপাঠ্য, যখন হসপিটাল, স্কুল, বাস, ট্রাম, সব জায়গায় পরিবারেব পবিকল্পনার অনুরোধ, তখনও যেন সত্যি অশ্লীল শব্দটা থাকতে পাবে কোথাও?

ভূধর বলল, সমাদ্দার, তুমি বিচলিত।

ভূদেব বলল, তুমি কি মন্ত্রীমহোদয়ের মধুচক্রের কথা পড়ছো না? তুমিই তো সবকার পক্ষ থেকে খোঁজ নিচ্ছিলে সে বিষযে।

আমার সন্দেহ নেই আর, যে তুমিই তার পিছনে। কিন্তু তোমাকে বলি, তাতে কিছু এসে যায় না। এখন আর সে দিন নেই যখন কলগার্লদের ব্যাপারে মন্ত্রীব চাকরি যাবে। অমন যে ছুঁতমার্গী ইংল্যাণ্ড, সেখানেও এখন মন্ত্রীদের মানুষ, পতনশীল মানুষ মনে করা হয়।

কিন্তু, স্যানমশাই, তুমি মনে রেখো তোমার মন্ত্রীমহোদয়ের আরও কেলেঙ্কারী আমার জানা

থাকতে পারে।

কী? ইলেকশনে কারচুপি, না ইলেকশন ফাণ্ডের টাকায় নিজের বাড়ি করা? ওতেও চাকরি যায় না। এখন এসব ভেবে উত্তেজিত না হওয়াই ভালো। তুমি বিশ্বাস করো, শান্তনু সম্বন্ধে যা করা হচ্ছে তার ফল সমাজের পক্ষে ভালোই হবে।

আর যদি বলি, তোমার সংস্কৃতিমন্ত্রীমহোদয় ক্লেপ্টোম্যানিয়াক? দোকান থেকে এখনও নেকটাই সরায়, এমন প্রমাণ আমার আছে। না, ভূধব, না, তুমি মনে রেখো, আমি আমার স্ত্রীর সম্মানের জন্য যুদ্ধ করছি।

ভূধর স্যানকে ভাবতে হল। সে কি একটু নরম হল? কিন্তু সে কিছু বলার আগে দুজন লোকের সঙ্গে মিত্রা এসেছিল। লোক দুটি সকলেব অলক্ষ্যে ভূধর স্যানকে খুব সামান্য মাথা নুইয়ে কি নমস্কার জানাল? মিত্রাব পোশাকের কথা আমরা আগেই বলেছি। পোশাক পরতে দেরি হবে বলেই ভূদেব-ভূধর আগে বেরিযেছিল, আর মিত্রাকে এবা দুজন এসকর্ট করে এনেছে যেন বা জনমতের ও সাংবাদিকের চাপ থেকে বাঁচাতেই। তারপর প্রবীর এসেছিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুতিনখানা মোটরের হর্ন ও পরে লিফটের গোঁ গোঁ শব্দের মধ্যেই যেন সুরথ-বেলা, গার্ট্রুড এবং শশী পৌঁছে গেল।

যখন মাধবী রাজেন পৌঁছাল তখন তো সভা (যাকে একাধিকবার বিচারসভা বলে ভুল হচ্ছে) বসে গিয়েছে। গার্ট্রুড কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় দাঁড়িযে উঠে কিছু বলছে।

গার্ট্রুড বলল (তার জর্মান ত্বক একেবারে শ্বেতপাথরের মতো রক্তহীন), আমি কী বলবো, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে। লোকের কাছে বলতেন, আমরাও শুনেছি, শান্তনু আমার স্বামী হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভ্যাম্পাযাব, ভ্যাম্পায়াব, সেই সব স্ত্রীলোকদেব একজন, যারা গোপনে পুরুষদেব রক্ত চুযে খায়। মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষ বুঝতেও পাবে না কী সর্বনাশ তাব হচ্ছে। সে জন্যই আমাদের, আমার এবং শান্তনুর, সম্মিলিত জীবনের সেই বিকেলবেলাগুলোতে প্রতিবারেই মনে হতো, শান্তনু যেন একটা বিড়ালছানা যাকে ঝুঁটি ধরে জলের টাবে ফেলে দেয়া হযেছে, কোন রকমে সাঁতরে উঠতে পারলেই বাঁচে। আপনারা সেকালের বাংলা সাহিত্য পড়েছেন। এ যেন সেই রুনি পিসি, হাসি বৌদি, মেম মাসীদের একজন যাদের,...

কঠোর স্বরে ভূদেব বলল, আমি জানি গার্ট্রুড বাংলা ভাষা শেখার ছলেই কলকেতায় আছে। তা বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান তার নির্ভুলই বলা যায়। কিন্তু রুনি বউদি মেম পিসীদের স্বামী ছিল না। অথবা গ্রন্থকাবদেব সহায়তায় তারা অন্তর্হিত ছিল ; কিন্তু আমি আপনাদের স্মরণ করতে বলি এক্ষেত্রে একজন স্বামী আছে।

সুরথ বলল, তুমি কী বলতে চাও গার্ট্রুড?

বসবার আগে গার্ট্রুড বলল, তার চোখে জল, শান্তনু চিকিৎসায় সুস্থ সবল হয়ে ফিরে আসুক।

গার্ট্রুর্ডের পরে শাশাঙ্কা। গাঢ় সিপিয়া রঙের পোশাক। সাদা চুলগুলো খোপায় বাঁধা। গলার কাছে জেডের হার, সেকালের জপের মালার মতো।

সে বলল, আহা, মিত্রা, মিত্রাকে আমি স্নেহ করি। অত্যন্ত নিয়ম মেনে চলা মেয়ে এই মিত্রা। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ব্যালের প্রাইমা ডোনা, প্রধানা নর্তকী হতে হলে কতটা ডিসিপ্লিনড হতে হয়। আপনারা যদি তার প্রত্যেক দিনের জীবন খোঁজ করেন দেখবেন, শয্যাত্যাগ থেকে ঘুমানো পর্যন্ত এখনও কতটা নিয়ম সংযমের মধ্যে দিয়ে চলে সে তার স্বাস্থ্য ও রূপকে অটুট রেখেছে। হ্যাঁ, তাদের সম্বন্ধে বিচার করতে হলে একথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

খবরের কাগজে মিত্রার ডেইজি গাউন এবং লাইল্যাক গাউন নিয়ে হৈ-চৈ করা হয়েছে। দি প্যারাসল নামে যে ফটোটা কোন এক পত্রিকার ক্যালকাটা নোটসে ছাপা হয়েছিল এবং যাকে স্টেট

একজিবিট করা হবে নতুন ছবির পেনসিল এবং চারকোল স্কেচগুলোর মতোই, আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যালেরিনা মিত্রার ইতিপূর্বেও অনেক ড্রেসডিজাইনার ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক ভঙ্গি হবে ব্যালের তা দেখার জন্য নিজেও সে ইতিপূর্বে নাচের ভঙ্গির অনেক স্কেচ করিয়েছে। যদি তার ডেইজি গাউন, অথবা লাইল্যাক গাউন (যা বলা হচ্ছে) দোকানে কেনা কোন কাপড়ের নয়, বরং সেসব ডিজাইন শান্তনুর রঙের ব্রাশে তৈরি, তা হলে সেগুলো পরা কি তার খুব অন্যায় হতো? তার মধ্যে শান্তনুর কোন ভুলকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে বলে কি মনে করতে হবে? এখনও দেখুন, এই যে মিত্রা বসে আছে, যদি আপনাদের মনে হয় সবুজ মার্বেলের উপরে সাদা আলোর দাগ পড়েছে এমন একটা পাথরই আপনাদের সামনে, সে কি কোন ড্রেসমেকারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বলবেন?

তা ছাড়া আমাদের স্মরণ করতে হবে মিত্রা সুরঞ্জিতের স্ত্রীর বটে, সুরঞ্জিতের মেয়ে নয়, এবং শান্তনুর দিদিও নয়, কারণ শান্তনু আমার পুত্র বটে, সুরঞ্জিতের নয়। এমন কি আমার কোন স্বামীরও নয় যে নীতির দিক দিয়ে মিত্রার সৎভাই হবে। না সে আমার কোন বন্ধুরও নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমি যে কোন আদালতে বলতে পারি যা, এখানেও তা বলতে পারি, শান্তনুর জনক আমাকে কোনদিনই চোখে দেখে নি। কারণ আমার সাইকাইআট্রিস্টরা বলেছিল তখন, আমি তেমন একজন যে সন্তান চায়, কিন্তু স্বামী নয়। আহা যদি, যেমন আমি মিত্রাকে অনেকবার অনুরোধ করেছিলাম, সে যদি মনস্তাত্ত্বিকদের সাহায্য নিতো। আমাদের অবচেতন মন আমাদের কোনদিকে নিয়ে যেতে পারে, তা জেনে নিলে অনেক অনর্থ এড়ানো যায়।

শাশাঙ্কা তার গলার কালো জেডের হারটাকে আঙুল দিয়ে জড়াতে জড়াতে সোফায় বসল।

মাধবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। রাজেন ইতিমধ্যে দেয়ালে টাঙানো নীল ছবিটাকে এবং তার পরিচিত সেই চুরাশি নম্বর ছবি যার নাম প্যাশন অব ক্রাইস্ট সেটাকেও দেখছিল। চুরাশি নম্বর ছবিতে সে আর একবার গর্ভিনী ক্রিওল রমণীর মুখে মিত্রার মুখের আদল দেখতে পেল, কিন্তু আজ যেন সে মুখকে খুব বিষণ্ণ মনে হল। নীল ছবিতে সে মিত্রার মুখ আরও স্পষ্ট চিনতে পারল। কিন্তু সেই স্বচ্ছ নীলের নির্মোকে দেখা মিত্রা আর আজ ডিভানের উপরে একা স্থির হয়ে বসে থাকা মিত্রা? (যার চোখের পলক যেন পড়ছে না সোনালি ফ্রেমের চশমার পিছনে, যার সরু সিঁথিতে বিভক্ত তামাটে রেশমি চুল মস্ত এলোখোপায় জড়ানো, যার সবুজে সাদা স্ট্রাইপ গাউন যেন ঠিক আজকের এই সভার জন্যই তৈরি, সে যেন সবুজ মার্বেল।) প্রবীর ভাবল এই সবুজ মার্বেলকে কে অমন নীল আলো করেছিল?

সুরথের পাশ থেকে বেলা বলল, আমরা গোটাকয়েক প্রশ্ন আছে। মিত্রা কলকেতায় ফিরে (যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে) তখন শান্তনুকে নিজের কাজিন হিসাবে অললায়নস সেই ডিনারে উপস্থিত করেছিল তা কি কলকেতার সমাজে তাকে তুলে ধরতে? মিত্রা কেন গার্ট্রুডকে উৎসাহ দিচ্ছিল শান্তনুকে ভালোবাসতে, যার পরিণতি হতে পারে তাদের বিবাহ? শেষ পর্যন্ত মিত্রা শান্তনুকে সে বিষয়ে নিরুৎসাহ দেখে কেন নিজেই বিবাহ করল? শেষ প্রশ্ন এই, কেনই বা মিত্রা শান্তনুকে দত্তকপুত্র নিতে চেয়েছিল?

ভূধর স্যান (তার কি প্রকৃতপক্ষে সরকারপক্ষের বক্তব্যর সঙ্গে সংযোগ ছিল?) বলল, প্রশ্ন কয়েকটির উত্তর খুব সহজেই দেয়া যায়। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে উঁচুতে তুলে ধরলে তার মঙ্গল হোক না হোক নিজের তৃপ্তি হয়। এ ক্ষেত্রে এই সমাজে শান্তনুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ঠিক হিসাবের ব্যাপার নয়, আবেগের। একজন এয়ার ফোর্সের লোককে বরং নিঃশব্দে তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে দেয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে কথা এখন থাক। মুখ্যমন্ত্রী দুএকদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে আমাদের দেশের সিকিউরিটির প্রশ্ন কতখানি জড়িত সে সম্বন্ধে বিবৃতি দেবেন। মিত্রা তার নিজের

ও শান্তনুর প্রাকৃতিক ও নৈতিক সম্বন্ধে ব্যাপারে কতটুকু জানতো, তাও এখানে প্রয়োজনের নয়। শ্রীমতী সোমের প্রশ্ন শুনে মনে হয় মিত্রার মন সাদা ও স্বাভাবিক ছিল বলেই সে প্রথমে শান্তনুকে বিবাহ দিতে চেয়েছিল। শান্তনুকে নিরুৎসাহ দেখে নিজে বিবাহ করেছিল। এ দুটো বরং শ্রীমতী সোম যে ইঙ্গিত করেছেন, তার উল্টো হতে পারে। তখন মিত্রার মনের দুই অংশে দ্বন্দ্ব ছিল। সে চেষ্টা করেছিল স্বাভাবিক হওয়া যায় কিনা। এ দ্বন্দ্বই কি প্রমাণ করে না মিত্রার মনের অনেক অংশেই তখন বিষের মতো কিছু (যার স্বাদ হয়তো মধুর) ছড়িয়ে গিয়েছে যা তাকে ভালো না বেসে, আলাপ পরিচয়ের যথেষ্ট সময় না দিয়ে ঠিক সাত দিনের মাথায় বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল। আর দত্তক নেয়া? ব্যাপারটা সম্বন্ধে শুনেছি যে সেটা সুরঞ্জিতের রয়্যালটির সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ প্রচুর ধনসম্পদকে স্থিতি দেয়াই উদ্দেশ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে সেই স্ফীতপদ অয়দিপাউস রাজার জননী রাজ্যের স্থিতির জন্যই পুত্রকে বিবাহ করেছিল। যদিও সে জানতো না বলে, মানুষের ভাগ্য সেই ট্রাজেডির ওপরে মেঘের মতো সব সময় সব কিছুকে কালো রেখে থাকে। আর মিত্রা নিজের মনকে সবটুকু না জেনে (ধনসম্পদের স্থিতির অজুহাত দিচ্ছিল তার যুক্তিবাদী জাগ্রত মন) শান্তনুকে পুত্র হিসেবেও পেতে চাচ্ছিল।

কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করুন, গার্ট্রুড বলেছে, স্টেট মেন্টাল হসপিট্যালে ভালো চিকিৎসা পেয়ে শান্তনু সুস্থ হয় এটাই কাম্য। লক্ষ্য করুন শাশাঙ্কাও বলেছেন, মিত্রার উচিত ছিল সাইকাইআট্রিস্টকে দেখানো। আমাদের কি উচিত হবে এমন কিছু করা যা হয়তো শান্তনুর স্বাভাবিক উপায়ে একজন বড় শিল্পী হওয়ার পথে বাধা হবে?

মনে হল সেই প্রথম মিত্রা কিছু বলবে। কিন্তু বেলা সোম তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে নিরস্ত করল। বলল বেলা, কিন্তু সে কি একটা জীবন্ত প্রাণীকে সেন্ট্রিফিউগ যন্ত্রে চাপিয়ে অণু অণু করে দেয়া নয়? সেই মেন্টাল হসপিটালে রোগীদের মধ্যে একজন সুস্থ মানুষকে রাখলে সেও কি পাগল হয়ে যায় না? এটা কি একটা মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটানোর কৌশল নয়?

বেলা থামল।

প্রবীর বলল, বেশ তো, ধরে নেয়া গেল, আমাদের ভূধর স্যান হয়তো চান না শান্তনুর মস্তিষ্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। কিন্তু চেতন ও অবচেতন মন নিয়েই তো ব্যক্তিত্ব। অবচেতন কামনা কোন জায়গায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে প্রতিভা হয় তা কিন্তু এখনও কেউ বলতে পারে নি। এটা কি একটা ব্যক্তিত্বকে বদলে ফেলা হয় না? ব্যক্তিত্ব গেলে মানুষের থাকেই বা কী?

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না।

সুরথ হাতঘড়ি দেখল। কিন্তু এখন বোধ হয় আমাদের উঠতে হয়। লাঞ্চের সময় হল। এখনও আমাদের অনেক চিন্তা করতে হবে। কারণ আমাদের দেখতে হবে শান্তনুর প্রকৃত বিপদটা কী, আর কী ভাবেই বা তাকে রক্ষা করা যায়। এখনও আমরা ছবিটার কথা আলোচনা করিনি। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ, কেন তাকে অশ্লীল, রুগ্নমানস এবং ক্ষতিকর বলা হবে? মিস্টার স্যান, আমি কিন্তু এখনও মনে করি, যাদের রিঅ্যাকশন বিবেচনা করে ছবিটাকে অশ্লীল, রুগ্নমানস ইত্যাদি বলা হয়েছে, তাদের মনটাকে মনস্তাত্ত্বিককে দিয়ে বিশ্লেষণ করানো দরকার, যদিও আপনি বলেছেন তাতে বরং তাদের মনে ছবিটার প্রভাব আরও ভয়ঙ্কর রকমে ক্ষতিকর, তাই প্রমাণ হবে। কারণ মুখে যতটুকু বলা যায়, মন তার চাইতে অশ্লীল চিন্তা করতে পারে। এসব বিষয়েও আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমি বলি, আমার বাড়িতেই সবাই লাঞ্চে আসুন, কেমন? বেলা, তুমি বরং তোমার লোকজনকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে বলে দাও ফোনে। আমাদের বিশেষ করে জানতে হবে ভূদেব সমাদ্দার তাঁর স্ত্রী ডিফেন্সের জন্য কী চিন্তা করছেন। এসব চিন্তা করার পরই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারবো প্রকাশ্য আদালতে বিচার চাইবো কি না। তাই নয়?

বেলা ফোন করল নিজের বাড়িতে।

সেই সময়ে সবাই প্রায় (মিত্রা ও মাধবী-রাজেন ছাড়া) সিগারেট ধরিয়ে সুবথের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। গার্ট্রুড বলল, আমাকে মাপ করবেন, আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে। আমি লাঞ্চটাকে স্কিপ করতে চাই।

গার্ট্রুড চলে গেল।

প্রবীর বলল, আমি প্রস্তাব করছি, মিত্রা আর আমি এখানে আমার ফ্ল্যাটে লাঞ্চ সেরে বরং সুবথের বাড়িতে যাই। তাতে মিত্রার একটু বিশ্রাম হবে।

সুবথের কাছে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডিভানের উপরে মিত্রা, খালি চেয়ারের শেষ সারিতে মাধবী, রাজেন এবং ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো প্রবীর ছাড়া আর কেউ রইল না।

প্রবীর মৃদু কেশে গলা সাফ না করে জিভ-টাকরায় শব্দ করল। বলল, মিত্রা, ঘণ্টাখানেক দেরি আছে লাঞ্চের। তুমি শোবার ঘরে একটু গড়িয়ে নাও। তারপর আমি আর তুমি একসঙ্গে লাঞ্চে বসবো। আমার কেয়ারটেকার রান্না ভালো করে। তুমি ভেবে দেখো মিত্রা, আমি যদি একটু সাহসী হতাম বাকি জীবনটা কি আমরা মুখোমুখি বসে লাঞ্চ করতাম না? না, না, আমার সাহসী হওয়া উচিত ছিল বোধ হয়।

মিত্রা উঠে দাঁড়াল।

প্রবীর বলল, বিকেলে আমরা মেন্টাল হসপিট্যালে ঢুকে পড়বো, বুঝলে। আর তার আগে তোমার লাইল্যাক গাউন আনিয়ে নেবো। শান্তনু আমাকে আর সকলের দেখাদেখি ফাদার বলেছে, কেমন কি না।

মিত্রা পাশের ঘরে গেল ধীরে ধীরে।

তারপর প্রবীর মাধবী-রাজেনের দিকে ফিরল। কিন্তু সে কিছু বলার আগে দুই ব্যক্তি দরজায় দেখা দিল।

প্রবীর বলল, আসুন।

তাদের পরনে সাদা শার্ট কিন্তু চুল দেখে বোঝা যায় অন্য সময়ে তা হেলমেটে চাপা থাকে।

তাদের একজন বলল, আপনি প্রবীর সাণ্ডেল, সার? আপনার এখানে মিত্রা সমাদ্দারের একটা পোর্ট্রেট আছে এখনি জানতে পারলাম।

থাকলে কী হবে?

আমরা মানে সিজ করবো কিন্তু আপনাকে জিম্মা দিয়ে যাবো। আছে সার পোর্ট্রেট?

আপনারা কি জনমত, না পুলিশ।

আমরা পুলিশ। কার্ড দেখবেন?

দরকার নেই। আপনারা কি মিত্রাকে দেখেছেন?

আমরাই তো তাকে এসকর্ট করে এনেছি। এসকর্ট করে নিয়ে যাবো।

ও, আচ্ছা, আচ্ছা। প্রবীর চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। কী যেন ভাবল। হাসল মনে মনে। বলল, এই ছবিটা দেখুন না হয়।

পুলিশের লোকদুটি দেয়ালে টাঙানো ছবিটা দেখল।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, এটা?

আপনাদের কী মনে হয়?

এটাকেও ওর যদি পোর্ট্রেট বলতে হয় তবে মিত্রা সমাদ্দারকে আমরা দেখেছি কি না সন্দেহ। আপনি কি বলছেন, সার, এটাই সেই ছবি?

কোন স্ত্রীলোকের পোর্ট্রেটের কাছাকাছি যেতে পাবে এমন ছবি আমার এখানে আপাতত একটাই।

লোক দুটি কী ভাবল। বলল, আপনি কি এটাকে সিজ করতে বলেন, সার?

চাকরির ব্যাপারে আপনাদের অসুবিধা হয়, তা চাই না।

আপনি তো আছেন, সার। আমরা একটু পরামর্শ করে আসি।

তা আসুন। লাঞ্চ সেবে আমরা সুরথ সোম অ্যাটর্নির বাড়ি যাবো, তখন, যদি আপনাদের ইনস্ট্রাকশন থাকে, আমাদেব এসকর্ট করতে পাবেন।

পুলিশেব লোক দুটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিগাবেট টানল প্রবীর।

পবে বলল, তোমাদেব সঙ্গে কথাই বলতে পাবছি না। এসো, এদিকে এগিয়ে এসে বসো। অভিনেত্রী মাধবী আমার প্রতিবেশী। এই প্রথম এসেছে আমার ফ্ল্যাটে। একটু ড্রিংক দিই।

না, সাব, বলল রাজেন। আমবা হঠাৎ এসে পড়েছি। সময়টা একদিক দিয়ে যেমন আমাদের দুর্ভাগ্য সূচনা করে, অন্যদিকে, না এ অবস্থায় সৌভাগ্য শব্দটা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ধন্যবাদ, রাজেন, তোমার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ।

সিগারেট টানল প্রবীর। একবার সে পাযচারি করল। অভ্যাসবশে গোটিতে হাত রাখল। লজ্জা পেয়ে যেন হাত নামাল। তাবপরে হাসল আস্তে আস্তে। বলল, সরল পুলিশের লোকদেব বোকা বানানো উচিত হয় নি। ওটা ভালো রসিকতা নয়। কিন্তু দেখো তুমি, রাজেন এই স্টাডি ইন ব্লু।

পুলিশের লোকেবা ঠিকই বলেছে। আমার ছবিটা দেখে একটা গল্প মনে পডছিল।

গল্প? গ্যালেটিয়াব গল্প নয় তো?

গ্যালেটিয়া। ও হ্যাঁ, গ্যালেটিয়া। রাজেন বলল, আমি তা মনে কবি নি। এখন মনে হচ্ছে আপনার গল্পটাই ঠিক। এটা একটা তেমন পবিবর্তন বটে। গ্যালেটিয়া বোধ হয় সেই মার্বেলেব মূর্তি, মাধবী, যে মানবী হয়েছিল। এক্ষেত্রে বোধ হয় একটু তফাৎ, মাধবী, একজন মানবী যেন প্রাণ পেয়েছে। কেমন তাই নয, স্যার? যদিও মানবীব প্রাণ থাকে না তা বলা খুবই বিপজ্জনক।

আর একটা সিগারেট ধবাল প্রবীব। কেসটা বাজেনেব সামনে ধরল। রাজেন সিগাবেট ধরালে বলল, আচ্ছা, গল্পটা কি মনে আছে তোমার ঠিকঠাক? পরে কি আবার গ্যালেটিয়া শ্বেতপাথব হযে গিযেছিল?

তাই কি? ঠিক মনে কবতে পারছি না। কিন্তু..

তাও বুঝি, তাও বুঝি। তুমি বলবে ডিভানে একা মিত্রাকে বসে থাকতে দেখে তোমার মনে হচ্ছিল যেন একজন মহিলা চোখের সামনে হয়তো হাত, হয়তো পায়ের আঙুল থেকে সুরু কবে সবুজ মার্বেল হয়ে যাচ্ছে। তা হোক, বলো তোমাদেব কথা।

রাজেন ভাবল, এখানে স্টাইল যৌতুক চাওয়ার কথা বলা এমন বোকামি হবে যে তার পরে কথা বলাব উপায় থাকবে না।

প্রবীরই বলল আবাব, তোমার সঙ্গে ভোর রাতে চার্চে কথা হয়েছিল একদিন মনে পড়ে? ভারি সুন্দর উপমা দিযেছিলে। ভিনাস মূর্তি পেগান গ্রীকরা তৈরি করতো পুজোর জন্য, এখন সে উদ্দেশ্য নেই, হাত ভেঙে গিয়েছে, তবু কিন্তু সৌন্দর্য থেকে গিযেছে। আচ্ছা, বলো দেখি, একটু বদলাও তুলনাটা, মানুষেব জীবনেব পিছনে লুকিয়ে গোপনে তার কোন আশা-আকাঙ্খা তাকে চালাল, তা যদি আমবা না জানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনে পর পর কী ঘটল, কী সে করল, তা যদি সুন্দর হয়, তবে সে সৌন্দর্যের কি মূল্য নেই?

আপনি কি চরিত্রের উপাদানের কথা বলছেন? নাটকে অন্তত একজন ব্যক্তি কী বলে কী করে, তাই তার চরিত্র। কী হলে কী তার করা উচিত ছিল, তা চরিত্র নয়।

প্রবীর ভাবল।

একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, বলো মাধবী, কী খবর তোমার। হ্যাঁ, বলে রাখি আমি খবর রাখি। ক্ল্যাসিকে তোমার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে।

রাজেন বলল, আমাদের এখানে আসার সময়ে মাধবী বলছিল অভিনয়ের কথা।

হুঁ? প্রবীর হেসে মাধবীর দিকে চাইল।

এখন এখানে বলা ঠিক উচিত নয়। কিন্তু—বলল রাজেন, কথাটা কি বলবো মাধবী?

আমিই বলতে পারি, মাধবী বলল, এখনও আমার মত বদলায় নি। আমি রাজেনকে বলেছিলাম, আপনি যদি মিত্রাকে নিয়ে নাটক লেখেন আমি মিত্রার পার্টটা করবো। এখন বলছি সেটা পেলে আমি প্রাণপণ করবো সেই চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে।

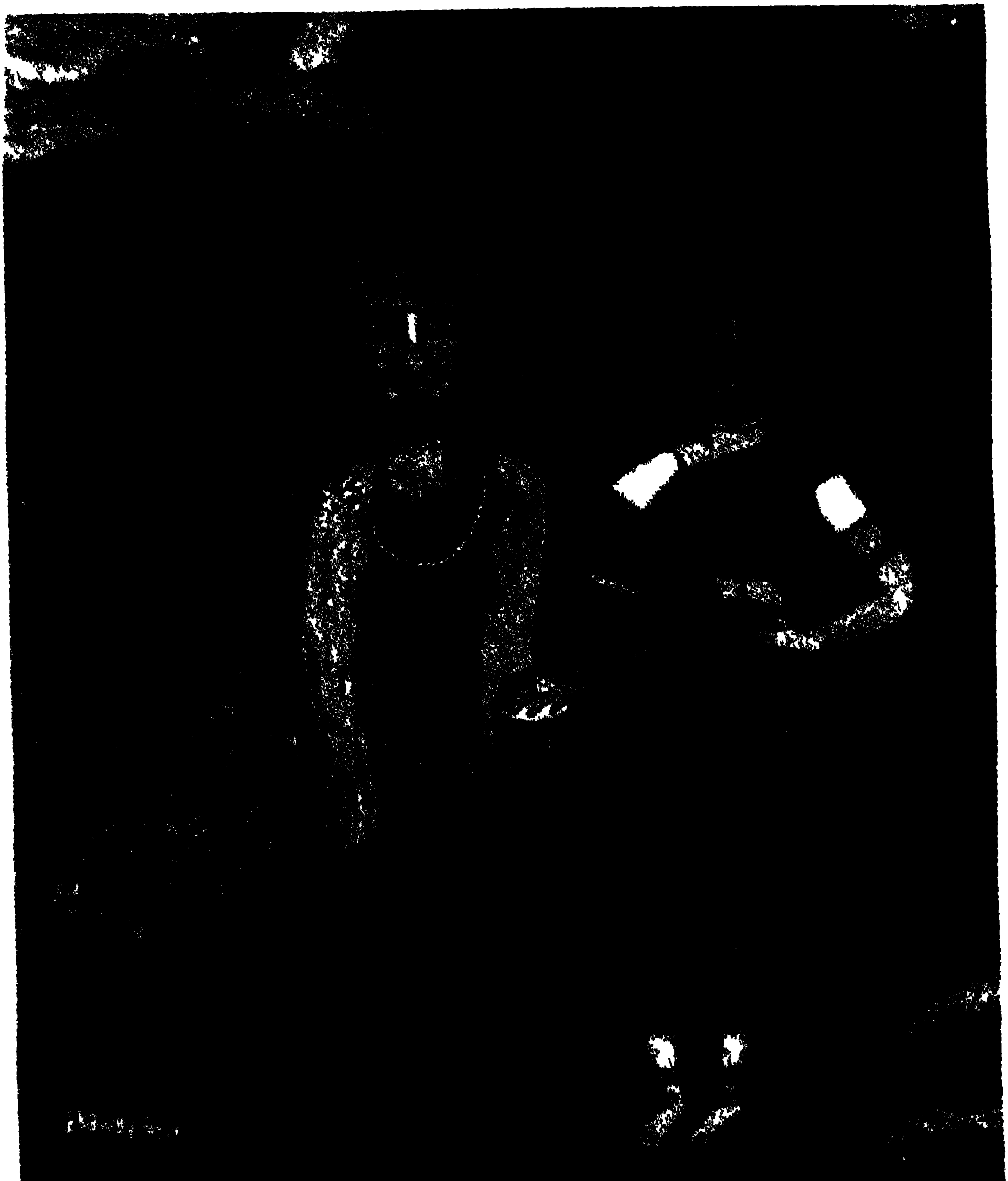
ধন্যবাদ, লিটল গার্ল।

কিন্তু আমরা এখন উঠি। রাজেন মাধবী উঠে দাঁড়াল, আবার একদিন আসবো।

কিন্তু তারা যাওয়ার আগেই দরজায় ছায়া পড়ল যেন। তারা দেখল, সকলেই দেখল, দরজায় মিত্রা দাঁড়িয়ে। তার সবুজে সাদা ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপের গাউনে তাকে অদ্ভুত রকমে স্থির দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে শুধু ঠোঁটদুটো নড়ছে।

মিত্রা অবশেষে বলল, ফাদার, ফাদার, ওরা যখন, সাইকাইআট্রিস্টরা যখন, মনকে পরীক্ষা করে তখন কি খুবই মানসিক যন্ত্রণা হয়? কেউ কি হাহাকার করে পালাতে চায় নিজের মনের কাছ থেকে? নিজেকে অভিসম্পাত দেয়, নিজের ছবিগুলোকে অভিসম্পাত দেয়? কেউ কি নিজের রঙ দেখা চোখকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায়?

প্রবীর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।



[redacted]

বাউল-বাউলানী

ডম অ্যান্টনিও

আমি কি অনুরোধ করবো—হে প্রিয় পাঠিকা, যাঁরা পড়বেন তাঁরা সবটুকু পড়বেন, বাদ দিয়ে পড়বেন না? আমি কি অনুগ্রহ ভিক্ষা কববো, আমি যা কিছু বলে যাচ্ছি তা নীরস হোক, অন্তঃসারহীন হোক, যা বলছি তা ঘটনা হোক-না-হোক সবই আপনি দয়া করে পড়বেন? কিন্তু তা হযতো হাসির ব্যাপার হবে—কেন না আমি তো নিজেই জানি না কোথায় কখন কেন এই জবানবন্দী, কি করে বা এটা নথি হবে।

ডাক্তারের জবানবন্দী

যেন দু হাতের তেলোয় চোখ ঘষে দেখবো, যেমন নাকি অসম্ভব ব্যাপাব প্রত্যক্ষ করে উপন্যাসে নাযকবা করে থাকে। ওটা হয়তো ঔপন্যাসিক-প্রসিদ্ধি যাতে পাঠককে বোঝানো যায় কাণ্ডটায় কতটা বিস্ময আছে, যেন লেখক বলবে—দেখো দেখি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত খানাখন্দে আঁধাবে আলোয় যাবা সব চাইতে বিশ্বস্ত সেই চোখদুটিব উপবেও বিশ্বাস নেই।

এবকম অন্য এক উদাহবণও শুনেছি' বেস্টোবেশন নাট্যমঞ্চে নায়ক অবাক হযেছে বোঝাতে গেলে নাকি দুহাত শূন্যে তুলে এক ধাপ পিছিয়ে যেতো প্রায় অভিনেতা নির্বিশেষেই। অবশ্যই নাট্যমঞ্চেব সুবিধা উপন্যাসে নেই।

থমকে দাঁড়িয়েছিলুম বটে, দুহাতে চোখ ঘষলে ব্যাপারটা নতুন কিছু হতো না। বরং খানিকটা মিথ্যা বলা হতো নিজেকে। সত্যি কি ভেবেছিলাম, বেওয়ারিশ মুলোব জমি থেকে কিছু শাক সংগ্রহ কবে ফিবে এসে দেখবো সে নেই? যেন এক শিকলকাটা পোষা পাখিব মতো আবাব নিজেব দাঁড়েই উড়ে গিয়েছে। কিংবা বনের বিড়াল যেন, যে বিস্কুট আর দুধেব লোভে এসেছিল। আবার বনে ফিরে গিয়েছে।

দূর থেকেই দেখতে পেয়েছি সাদা ছাতাটার তলে কাঠেব বাক্সগুলোর একটি উপরে সে বসে আছে, যেন এই এত ব্যস্ত পৃথিবীর মানুষই নয় যেমন দেখে হলুম ছাতার তলা থেকে বাইরে যাওযার সময়ে। আজও অবাক লাগল বটে দূব থেকে দেখতে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তো আমাব মনে, সুতরাং, প্রায় সঙ্গেই ছিল। কয়েকদিন আগে কিন্তু বিস্ময ও ভয় চূড়ান্ত রকমেই হয়েছিল। আজ তাব স্মৃতিটাই মনে এসে থাকবে। নতুবা এটা এখন আব ভয়ের নয়।

কয়েকদিন আগে বটে, কিন্তু কবে—তখন বেলা নটা হবে। নদীর ধার থেকে মাছ পাওযাব চেষ্টা শেষ করে ফিবছিলুম। ব্যাণ্ডেজ গজেব কাপড জুড়ে জাল কেমন, এক উদ্ভাবনই কিনা? আট-নটি মাছ পেয়েছিলুম বিভিন্ন জাতের, যাদের সব চাইতে বড়টি হাঁঞ্চ পাঁচেক, ঘণ্টা তিনেকেব চেষ্টায়। ধীর পায়ে, তাড়াতাড়ি কবার কীই বা আছে, আমার টিলা-প্রাসাদের দিকে তখন এগোচ্ছি। হঠাৎ মুখ তুলে সেই অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলুম। চমকে উঠেছিলুম নিশ্চয়। বিস্ময় তো বটেই যেমন রবিনসন ক্রুসোর, তার গুহায় নাকি ফ্রাইডেকে বসে থাকতে দেখে।

(পরে আমাকে সেই বলেছে, রবিনসন তার গুহায় যাকে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয় সেটা একটা বিড়াল। ফ্রাইডেকে নাকি অন্য সময়ে অন্য ভাবে রবিনসন প্রথম দেখেছিল। তা ছাড়া আমার নাকি সে রকম মনে হওয়ার কারণ, তাব সাদা পোশাক, সাদা পায়জামা, সাদা শার্ট। হয়তো আমাব সাদা বিড়াল সম্বন্ধে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে যা স্মৃতিতে ছিল না কিন্তু মনে ছিল।

হ্যাঁ, এটা জোব কবেই বলতে হবে, মুলোব শাক অন্যেব পবিত্যক্ত জমি থেকে তুলে এই যে এখন ফিবছি—এখন ভয় বা বিস্ময়েব কোন কাবণই নেই, কেননা সে তো আমাব মনে ছিলই, চোখেব সম্মুখে না থাকলেও। সে যে আমাব সঙ্গে মুলোব শাক তুলতে যায় নি (মুলো নয়, যেহেতু অযত্নে সেগুলো শিকড় হয়ে গিয়েছে), তাব একমাত্র কাবণ, তাব ঘুষঘুষে জ্ববটা এবং তাব সঙ্গে কাশিটা বেড়েছে। আমি লক্ষ্য বাখছি, সে ব্যান্ডেজেব গজেব একটা থাবায় মুখ গুঁজে গযাব ত্যাগ কবে, কখনও কাবো চোখে পড়বে এমন কোন জায়গায়, ঘাসে বা মাটিতে নয়। এমন কি (আমি হাসতে পাবি) এই যে এখনই বললেম, বেস্টোবেশন নাট্যমঞ্চেব নায়কেব বিস্ময়ে হাত তুলে নিয়মমতো একধাপ পিছিয়ে যাওয়াব সংবাদ, এটা ওই আমাকে বলেছে, সুবতই, কাল বাতে। এমনকি উপন্যাস আব মেলোড্রামা নিয়ে আলাপ কবতে চাইছিল, হয়তো কবতো যদি না ওকে একটু কড়া সুবে আমায় ঘুমে ব্যাঘাত না কবতে বলতুম।

আলাপ তৈবি কবাব একটা সহজ দক্ষতা আছে সুবতেব। এলোপাথাবি কথা, তা সাময়িক বাজনীতি কিংবা আবহাওয়া হোক, তা থেকে দুমিনিটে একটা ঠাসা বুনোটেব গল্পেব আবহাওয়ায় নিয়ে যেতে পাবে, সে সময়ে ঠোঁটদুটো ফুবফুব কবে, কথা বলাব সময়ে যেন হাসছে মনে মনে, অথবা ছোট বয়সে ভাবি কথা বলাব লজ্জাই সেটা।

কাল, হ্যাঁ, কালই বটে। তখন বাত আটটা হবে। বৃষ্টি সুরু হল। আমাদেব সেই ছাতাব নিচে অপাবেশন টেবলেব উপবে আমি, আব ব্যান্ডেজ প্রভৃতিব কাঠেব ক্রেটেব উপবে সুবত। মোমবাতি একটা আছে। হলুদ হয়ে কাঁপছে। ছাতাব বাপড়ে চড়বড় শব্দ হচ্ছে বৃষ্টিব। জল গড়িয়ে যাওয়াব কাঁপন যেন বাতাসে।

আমি বললুম, জল লাগছে না তো?

তেমন নয়।

উঠে কালো পলিথিনেব শিটটা ওব গায়েব উপবে বিছিয়ে দিলুম।

বললুম, ছাতাটা ঠিক পড়ে যাওয়াব মতো নয়। কাবণ খুঁটিটাব চাবিদিকে যেভাবে ক্রেটগুলো ঠেসে বাখা। তা ছাড়া টিলাব উপবে বলে জল ভিতবেব দিকে গড়িয়ে এসে ভিতবে কাদা কববে না।

সুবত হাসল, যদি না পাঁচফুটেবও বেশি জল জমে।

তুমি বলবে, আমাব এই টিলা পাঁচফুট উঁচু চাবদিকেব জমি থেকে।

না, যেখানে জল জমতে পাবে, থাকে থাকে ওবকম নিচেই নেমেছে জমি।

তাহলেও এখন ভয়েব কিছু নেই। তুমি কিন্তু প্রথম দিনে আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে। হয়তো ভয় নয়, বিস্ময়ই সেটা।

সেই যে নিজেব হাতেব তেলোয় চোখ ঘষাব অবস্থা?

তা বলতে পাবো।

প্রকৃতপক্ষে ওটা কিছু নয়। একটা ধবতাই।

তাই বলবে?

সুবত হাসল। বলল বেস্টোবেশন নাট্যমঞ্চে নায়ক চেয়াব ছেড়ে উঠে দুহাত তুলে এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ কবতো। সেদিনও এক নাটকে একজন কপালেব উপবে ভুরু ববাবব হাত বেখে তাব তলা দিয়ে চেয়ে, অত বাতেও দর্শকদেব বুঝিয়ে দিল, খোলা আকাশেব নিচে বহুদূবেব কিছু একটাকে সে লক্ষ্যে আনাব চেষ্টা কবছে।

এগুলো হয়তো খুব অসাধাবণ আলাপ নয়। কিন্তু আমাব কাছে কিছু নতুন লাগে। মেলোড্রামা আব ভালো নাটকে কী তফাৎ, তা একদিন চা খেতে খেতে বলছিল। তখনই বলেছিল, সিনেমাব

শতকরা নব্বুইটাই হয় সেন্টিমেটাল কিংবা মেলোড্রামা। তা মানলে বলতে হবে, এতদিন মেলোড্রামাকে ভালো লেগেছে। স্বীকার করলে দোষ নেই। মানুষের শরীরেরকোন অংশ চিন্তা করে তা জানি বটে। মানুষ কেন ক্ষুধার্ত হয়, কেন পুরুষ নারী পরস্পরকে কামনা করে, তার হর্মোন-অধিকৃত কারণ সম্বন্ধে সাধারণ একটা ধারণাও আছে। কিন্তু এখনও সন্দেহ: কামনা করবে বলেই হর্মোন গ্ল্যান্ড অথবা, হর্মোন গ্ল্যান্ড বলেই কামনা। কিন্তু ক্ষুধা ও কামনা নিয়ে কখন নাটক মেলোড্রামা হয় (ওর কথায় ওটা প্রায় তিরস্কার), তা না জেনেও এতদিন সিনেমা-নাটক দেখেছি; যদিও এটা নিশ্চয় সম্ভব, যারা সাহিত্যটাহিত্য করে তারা এসব বিষয়ে আমার চাইতে বেশি জানবে। পরন্তু সুরত একটু বেশি জানে। সনতারিখ সমেত।

রেস্টোরেশন শুনে আমি প্রশ্ন করলুম, ওটা কী হল? ইংল্যান্ডের ইতিহাসের কথা বুঝতে পারছি। সেই এক রাজাকে বধ করে তার ছেলেকে রাজা করা, তাই নয়?

সুরত বললে :

আমরা যা আলোচনা করছিলুম তা হচ্ছে রেস্টোরেশন ড্রামা। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ থেকেই অর্থাৎ চার্লস দা সেকেন্ডের রাজা হওয়ার বছর থেকে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মেরির রাজত্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত যে নাটকগুলো লেখা হয়েছে তার একটা সাধারণ নাম।

হঠাৎ সে কাশতে শুরু করল।

পলিথিন শিটটা ওর গায়ের উপরে দিতে গিয়ে ওর হাতের পিঠে আমার হাত লেগেছিল। বেশ গরম, ১০৩ ডিগ্রি হবেই কম করেও। কী অদ্ভুত, সন্দেহ হচ্ছিলই। মানে, জ্বরটা চলছিলই গোড়া থেকে। কী অদ্ভুত সহ্যশক্তি। একটা কাতরোক্তি নয়, ক্লান্তিটাও যেন গিলে ফেলতে পারে। তখনই ঠিক করেছিলুম—না, কাল একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে ওষুধ দিতে হবে। অ্যানাসিনে যাওয়ার নয়। শুধুমাত্র ঠাণ্ডা লাগা নয় বিষয়টা।

কাশি থামতেই সুরত বলল আবার—ভারি ইন্ট্রেস্টিং কিন্তু এই পিয়াবিথেডের ড্রামা।

বললুম—ও থাক, আমি বুঝি না। আগে তুমি বলেছিলে, আমার মনে বিড়ালের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, ক্রুসোর গল্প আধ-ভোলা অবস্থায় মনে ছিল, তা থেকে গুহার মধ্যে ফ্রাইডে দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম। তাকে কি মনস্তত্ত্ব বলে? সেটাও কঠিন বিষয় ছিল। এখন ঘুমাও।

পাশ ফিরল বোধ হয়। খুব মৃদু আঃ করে কি কাতরোক্তি করল? কতই বা বয়স! স্বাভাবিক দিন হলে বাপমায়ের কাছে থাকতো। হয়তো বড় বোন অথবা মা এসময়ে ওর শিয়রের কাছাকাছি থাকতো। হ্যাঁ, তা, সময়টা তো অস্বাভাবিকই বলতে হবে। যদিও এখানে এই লালখামারে তা তেমন কিছু নয়।

শেষ পর্যন্ত আমাকে বেশ গম্ভীর গলাতেই বলতে হল—বেড টাইম, আমাকে ঘুমাতে দাও।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বৃষ্টির শব্দ ছাতার উপরে, একটু একটু জলের ছাঁটও আসছে। দেখছি এই তিনমাসে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তা হলেও কিছু সময় লেগেছিল ঘুমাতে। এখন আর এমন ভয় করে না, কেউ এসে মাঝরাতে ছাতার তলে ঢুকবে, ছুরি বসিয়ে দেবে, যা কিছু আছে নিয়ে যাবে। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে একটু ঘন ঘন। একটু ট্রাবলড ব্রিদিং। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কতই বা বয়স হবে। কোথায় ইংল্যান্ড আর কোথায় আমরা, আশ্চর্য লাগে না ভাবতে! সে দেশের তিনশো বছরের পুরনো, আজকাল অচল, এমন নাটক নিয়ে এখানে বসে ওর কী মাথা ব্যথা! এই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম যে এটা অন্তত বুঝতে পারা যাচ্ছে, সুরত ঠিক ট্রাম্প নয়, অর্থাৎ পথে পথে ঘুরে বেড়ায়নি চিরকাল।

ঠিক একথাগুলো এবং এই চিন্তাগুলোই কাল রাতের তা বলা যায় না। দেখছি একেবারে হুবহু মনে থাকে না কোন কিছুই।

আসল কথা নাইলনের মোজাটা যাকে মাছের খালুই করে বেল্টে গুঁজে রেখেছি তার মধ্যে অন্তত দুটো মাছ এখনও নড়াচড়া করছে। সে দুটো ল্যাটা হবে। মুলোর শাকের গোছা হাতে। আর আমি ভাবছিলুম, মেডিসিন আর প্রাণীবিদ্যা এক নয়। প্রাণীবিদ্যা, জীবনাঙ্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি ভাসাভাসা রকমেই জানি। ডক্টর খোরানা অবশ্য—

ঠিক এই সময়ে খোরানা সম্বন্ধে কাগজের কাটিংটা মনে আসছিল। তখন চোখ তুলে ওকে দেখে নতুন করে চমকে উঠেছি, নতুবা সুব্রত তার রেস্টোবেশন ড্রামা নিয়ে মনের মধ্যেই ছিল।

আর সুরত এখনও আমার চোখেব সামনেই। মাঝখানে চেরা, ঢেউ খেলানো রুক্ষ চুল, মেয়েলি কপাল, কিন্তু হালকা বাদামি জুলফি দাড়িতে মুখ ঢাকা। ফরসা, এত ফরসা যে মনে হয় নিদারুণ অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। চোখদুটি টানা, মণিদুটি যেমন কালো তেমন তীক্ষ্ণ। ঠোঁটদুটি (অথবা বোধ হয় উপরের ঠোঁটই ফুরফুর করছে।

কেউ যেন কথা বলল!

নাঃ, এটা আমি বন্ধ করতে পারছি না, আমার নিজেব ছাতাব নিচেও না। কথা বলার আগে--যে দিনকালের অবস্থা–আমার অনুমান, জানিয়ে দিযে কথা বলাটাই উচিত। ওকে ভয় বলতে না পারো, কিন্তু মেঘেব স্তবে এবোপ্লেন দোল খেলে বুকেব নিচে, আমার তো মনে হয় ডায়াফ্রামের কাছে, স্প্রিং-এর মতো যে অ্যাকশন হয়, তেমনি একটা অনুভূতি।

অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন একভাবে। কারো পাযের ছাপ না কি?

আমি তখন হাসলুম। সুরতই তবে কথা বলেছে। হ্যাঁ সুবতই তো।

পায়ের ছাপ? ও গড্, তুমি ফ্রাইডের কথা মনে কবে বসে আছো?

সুবত যে নোঙব-ছেঁড়া এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, আব তা হযতো দিনকাল খাবাপ হওয়ার আগে থেকেই। কিন্তু এই উনিশ কুড়ি বছব বয়সে।

মাছ পেলেন?

মুলোব শাক আনলুম।

সুরতেব সঙ্গে তার বয়স নিয়ে কথা হয় নি। কিন্তু মুখ, সাধারণ ভাবে শরীরের গড়ন দেখে বযস যদি না বলা যায়, তবে এতদিন যে সব সার্টিফিকেট দেযা হয়েছে সবই ভুল।

সুরত হাসল- লঙ্কার খোঁজেও যাবেন নাকি? এটা ভাবতে অবাক লাগে, নয়? যে মাইল দু-এক ঘুবে এলে শাকসবজির বাজাব হযে যায়! মাছ–মোরগও কপালে থাকলে জুটে যায়।

ছাতার তলেই সংসার। বললুম–তুমি চা খেয়েছো সুবত?

না, এই কবি। আপনিও খাবেন।

তোমাকে কবতে হবে না। আজ আমি করি। গন্ধটা কিসের সুরত?

কড়া অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ পেলাম যেন কাউকে এখনই ড্রেস করানো হয়েছে।

কিন্তু এভাবেও হয় না আমার জবানবন্দী। কাবণ দিনকালটা তো খুব স্বাভাবিক নয়। হয়তো তেমন অস্বাভাবিক নয় যেমন কোন কোন দেশেব আখবর ছাপছে। তা হলেও পূব-উত্তরে দু-এক মাইল দূরে ভাঙা সাঁকোটার (লোহা আর কাঠের সেটা ছিল) নিচে থেকে যে নালা কাটা, তা দেখে মনে হয় ধানখেতে জল আনার জন্য কাটা; তার কোথাও কোথাও কোথাও বাঁশের মাচায় ঢাকা, এখনও বাঁশের মাচার উপবে চাপড়া মাটি বসানো যাতে বর্ষা পেয়ে ঘাস লতা এমন বেড়েছে, যে নিচে না নামলে বাঁশের মাচা তা বোঝা যায় না। নাকি ই পি আর বাঙ্কার–পূর্বপাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর ভূগর্ভ-দুর্গ। অর্থাৎ সেই সেবকম মাটির তলে ফেরো-কংক্রিটের ব্যাপার নয়। কিছুই নয় এবং সেকেলে, বড় জোর থ্রিনটথ্রি-ওয়ালাদের কাজে লাগতে পারে। এখানে বড় কিছু দূরে থাক মাওএর ফ্লুটও বাজানো যায় না। মাওএর ফ্লুট নাকি খুব ছোট রকেট লঞ্চার যা নিয়ে ট্যাঙ্কের সামনে

দাঁড়ানো যায়। তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, মোট কথা। কিন্তু সাঁকো থেকে দুশো গজ উত্তরে—দূর থেকে দেখে বুঝতে হয় যেন শ্যাওলা কচুরি, একটু রঙীন—রং দেখে কী ওটা বুঝতে গিয়ে দেখলুম ভাগাড় হবে। শেয়ালের মতো রোঁ-ওঠা কয়েকটা নতুন ধরনের কুকুর (যেন বুলডগ কিন্তু আবার টেরিয়ার, মুখটা বুলডগের মতো ভাঁজ-পড়া) কী টানছে ছিঁড়ছে, সেজন্য শকুনগুলো খালের ওপারের ঢালে নেমে গিয়েছে। হ্যাঁ শাড়ি (দামি নয়, যেমন গ্রামের মেয়েরা পরে তাই বেশি), দু একটা সালোয়াব কামিজ (যা একটু দামি) এবং গলিত এক-স্তনযুক্ত এক কঙ্কাল, এবং অন্য একটির গলিতমাংস সমেত রুমালে বাঁধা কব্জি, এবং একটি গলিত, পোকা-বিলবিলে উরুদেশ, বেশিব ভাগই মাটি-চাপা, বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে যা বেরিয়েছে এবং কয়েকটা ঠোঁটহীন চোখহীন দীর্ঘচুল-সংযুক্ত করোটি। কিছু একটা ঘটে থাকবে। আর তা খুব বেশি দিন আগেও নয়।

সুতরাং জবানবন্দী লিখে রাখা যায় না ডায়েরির মতো করে। এ অবস্থায় নিজের আশেপাশে, সে বাক্সে ব্যাগে বিছানার তলায় যেখানেই হোক, পেপারস রাখা যায় না বোধ হয়। এটা ভয়ের ব্যাপার নয়; নিছক প্রুডেন্স। (যাক, এ শব্দটারও বাংলা জানি না দেখলুম; এবং এটা—এই অনেক কথা ছোটবেলা থেকে ইংরিজিতে জেনে এবং বাংলায় না জেনে—এখন কাজেই লাগছে, কেমন কি না?) নাকি বিমৃষ্যকারিতা, আগ-পাছ দেখে চলা।

জবানবন্দী আর একরকম হয়। ভেইনে অ্যামিটল এক্স ইনজেকশন দিয়ে চেস্টে ট্রুথ রেকর্ডার গ্রাফের নব লাগিয়ে, মুখের সামনে টেপ রেকর্ডারের মাউথপিস। এটা নাকি, ডক্টর ইসমাইল ম্যাকনটন বলতো, একেবারে ফুলপ্রুফ। তবে আমেরিকায় সুপ্রিম কোর্ট এই টেপ বেকর্ডারের সাক্ষ্যকে ইনডিউসড বলতে চায়, সব সময়ে সচেতন অবস্থায় দেয়া হয়েছে বলে মানতে দ্বিধা-দ্বিধা করে। অথচ ডক্টর ম্যাকনটন, যাঁর বাড়ি পূর্বে ফরিদপুর পাংশায় ছিল, একটু খেদ করে বলেন, রাশায় কিন্তু কোর্ট অতটা স্কুইমিশ নয়। না, এরকম এখানে হবে, সেরকম মনে করার যুক্তি নেই। এখন আমার এই প্রত্যয়টা স্বচ্ছ হয়েছে, যে স্বপ্নটা (ঘামটা হয়তো গুমোটের জন্যই হয়েছিল আমার) প্রকৃতপক্ষে জবানবন্দী সম্বন্ধে নয়, এক সময়েব শিক্ষক, প্রায়-মুরুব্বী ইসমাইল ম্যাকনটন সম্বন্ধেই ছিল।

জবানবন্দী অন্য একরকম হতে পারে। যেমন হয়েছে, যদিও কেউ রেকর্ড করেছে কি না কে জানে? আমার তো মনে হয় তা তারা কেউ করে নি' লুঙ্গির কোমর থেকে স্টেনগান টেনে বাব করলেই কারো বয়স কুড়ি পার হয় না, মুখে যতই বিটকেলে বিড়ির গন্ধ থাক। এখন বরং হাসিই পাচ্ছে ভাবতে। তখন বিকেল। আমি ছাতার তলায় কাঠের ক্রেটে বসে একটা পুরনো রিডারস ডাইজেস্ট পড়ছি। হঠাৎ, অ্যাডভেঞ্চার সিনেমায় যেমন কয়েকজন একজনকে ঘিরে ফেলে, যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল, তেমন করে সেই গেঁয়ো অসুস্থ লোকগুলো যেন ঘিরে ফেলল। রিডারস ডাইজেস্টেই চোখ রাখলুম এবং সেখানেই যেন স্পষ্ট পড়তে পারলুম, পালানোর পথ নেই। উঠতে চেষ্টা করা আর মরা একই হবে। ডাকুর দল বুঝতে অসুবিধা হয় না কিছুমাত্র। বললুম, টেক সিটস জেন্টলমেন।

তুমি তো দেখেছো, সুরত, সময় আর মধুমতী একই রকম। তুমি যদি মধুমতীর খোঁজ খবর নাও, সব সময়ে সে তোমাকে সুখী করে না ; সাঁতার বলো, নৌকা বলো, কষ্ট আছেই, ব্যর্থতাও আছে। যদি খোঁজ না নিয়ে দূরে থাকো মধুমতী বয়ে যাবে, তোমাকে নাকানিচুবানি খেতে হয় না।

কবে? হয়তো পক্ষকাল। সুরত আসার আগে। সেই যে ভালো পোশাক-পরা এক সৈন্যদল ব্রেনস্টেন রাইফেল ছুঁড়তে ছুঁড়তে উত্তরপুবের দিগন্তের দিকে দৌড়ে দিগন্তের ধার থেকে লাফিয়ে নামল।

অতঃপর তারা আমার জবানবন্দী নিম্নপ্রকারে নিয়েছিল।

তোমার নাম কী?

এ কে এম বিশ্বাস।

পিতার নাম কী?

কে এ বিশ্বাস।

বাড়ি কোথায়?

বললুম বাড়ি কোথায়।

এখানে এই লালখামারে কেন?

একেবারে নিছক যোগাযোগ। নৌকার তলা ফেঁসে যাওয়া।

নৌকাটা কোথায়, কী অবস্থায়?

আধ মাইল উজিয়ে মরাখালের নতুন বাঁকে। তলা ফেঁসেছে কিন্তু এতদিনে ডাঙ্গায় উঠেছে। কেননা মরাখালের নতুন বাঁকে যে জল সেটা বন্যার ছিল। প্রকৃতপক্ষে ও খাতে এখন জল আর এক হাঁটুও নয়।

এদিকে কেন এসেছিলে? কতদিন আছ?

বন্যাত্রাণের কাজে। তখন থেকেই।

খাঁ শালারপোরা খোঁজ নেয় না? নৌকাব তো নম্বর আছে।

আপনারা নিশ্চয় বুঝছেন, নৌকা যেমন জলে ভাসে তেমন জলেও ডোবে। এত খাল-খাঁড়ি নদীনালায় বন্যা এবং এমনভাবে লোকজন বেরিয়ে পড়েছিল যে সকলের হিসাব মিলিয়ে অডিট এখনও শেষ হয় নি।

শালার পোয়েরা বোট পেয়েছিল বন্যাত্রাণ করতে এখন সেগুলোতে সৈন্য আনছে।

এরকম আরও পনেরো মিনিটের পর ওদের দলের একজন তার ডান পায়ের উপর থেকে লুঙ্গি সরাল কিংবা অন্য একজনই বোধ হয় তাকে সরাতে সাহায্য করল। এবার তার দিকে চাইলাম। কালো, বোগা, একমুখ খোঁচাখোঁচা দাড়ি এক যুবক। (সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিচয়।) পাটা একটা নোংরা ব্যান্ডেজে বাঁধা, ফুলে টাঁই, ব্যান্ডেজে পুবনো রক্ত। নাড়ি দেখতে গিয়ে বুঝলাম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

তখন আমি কাশলুম। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালুম, কেননা ভাবতে হবে। এটা মুদ্রাদোষের মধ্যে পড়ে। গা মোড়ামুড়ি করে উঠলুম। বললুম, ধরাধরি করে ওই স্টিলের পাতটার উপরে শুইয়ে দিন। দুফুট উঁচু ফোল্ডিং পায়ার উপরে ছয়-বাই-আড়াই স্টিলের পাতলা পাত। এটাই সম্ভাব্য অপারেশন টেবল—যার কথা আগেই বলেছি, যার উপরে শুয়ে রাত কাটাই। (আর একটা অপারেশন টেবল যোগাড় হয়েছে বটে; তার কথা কিন্তু এখন নয়। আগের কথা আগে।)

জল গরম থেকে সুরু করে ইনজেকশন ইত্যাদি দিতে, নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধা পর্যন্ত আধ ঘণ্টা তো বটে।

কথায় কথায় মনে পড়ছে ওদের টিটেনাসের খুব ভয় ধরেছে। গ্যাংগ্রিন বোধ হয় চাক্ষুষ হয়নি। কেননা যখন বললুম, হসপিটালে রাখা দরকার, এ ব্যথা এ পি সিতে যায় না, হাড়টা ভেঙেছে, গুলিটা ভিতরে আছে। হঠাৎ দারুণ ব্লিডিং হতে পারে, গ্যাংগ্রিনও ; ওরা বলল, ধনুষ্টঙ্কার হবে না তো?

ওরা বিদায় হল। এবার লক্ষ্য করলুম, কীভাবে ওরা যায। চারজনে কাপড়ের ডুলিতে আহত লোকটিকে বসিয়ে অন্য সকলের সামনে রেখে আলের উপর দিয়ে দিগন্ত বরাবর গিয়ে দৃষ্টির নিচে টুপটুপ করে ডুবল। তা, সে ডুলির রোগী আর আসে নি। আর একদল এসেছিল আর একদিন।

আমাশার দল। কথায় কথায় সে রোগীটির কথা জিজ্ঞাসা করতেই দলপতি তেড়ে উঠল, স্টেনগান এগিয়ে এল পাঞ্জাবির তলা থেকে, কিন্তু দলের একজন ফিসফিস করে কী বলল তাকে।

দলপতি বললে, অ।

সেই একজন বলল—সেই রাতেই কিলড ইন অ্যাকশন।

বললুম—সে কী? অ্যাকশন? পায়ের ওই অবস্থায়?

—সেই সুবিধা। চরে গর্ত করে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে রইল লঞ্চ থেকে গ্রামে আসার পথে। হঠাৎ ভয় পেলেও পালানোর পথ নেই। শুধু খাওয়ার জল আর একটা এল এম জি। এ সবই কুদ্দুসের ইচ্ছাতেই করা হয়েছিল। কবর দিতে কষ্ট করতে হয় নি। ওদের বড় দলটা দল বেঁধে নামার আগেই কুদ্দুস চারজনকে খতম করেছিল। শালাদের লঞ্চে ছোট কামানও থাকে। তার গোলাতেই বালির ঢিবি কবর দিল।

জবানবন্দী সাইকাইআট্রিস্টরাও নিয়ে থাকে। ইসমাইল ম্যাকনটন বলেছিল ওদের ধর্মে (নাকি ক্যাথলিক ওঁরা) কনফেশন আছে। কেউ কেউ বলে, তাতে নাকি মন শান্ত হতো। এদিকের এই ব্রাগাঞ্জা পরিবার রোমান ক্যাথলিক বলেই মনে হয়। এখন যারা ফাদারকে গোপন কথা বলা ততটা আধুনিক মনে করে না, তারা সাইকাইআট্রিস্টদের কাছে যায়।

না, আপাতত তেমন হতে পারে না। এখানে ইসমাইল ম্যাকনটন কোথায়?

এটা সহজ করে বলাই ভালো, লালখামারে আসাটা একটা যোগাযোগই। যদিও আমার মনে পড়েছিল যে এখানে আসার কয়েকদিন পরে জাহাজের ডাক্তারি ছেড়ে ডম অ্যান্টনিও একটা খামার করেছিল বটে, যার নাম লালখামার। পরে তার খামার সরকারি কৃষি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পোলট্রির উন্নতিসাধন অনেকেই করতে পারে। কিন্তু এটা ইসমাইল ম্যাকনটনই বলেছিল, ডম অ্যান্টনিও এমন কিছু করছে যাতে শেষ পর্যন্ত দেশের লাভই হবে। ভালো কাগজে ছাপা একটা লম্বাটে ধরনের ব্রশুর পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু সেটা পড়েছিলুম বললে মিথ্যা বলা হবে। সব ব্রশুরই কি হাতে পেলেই আমরা পড়ি? মানুষের ডাক্তার ডম অ্যান্টনিও (ম্যাকনটন যেমন বলে) শেষ পর্যন্ত দু-এক মিশ্র জাতের কুকুর, কিছু বর্ণসঙ্কর গাভী যাদের দশ-পনেরো সের দুধ হবে ও কিছুটা উন্নত ধরনের বিফ ও ভিল তৈরি করতে আত্মনিবেশ করবে, এটা ভাবা যায় নি, কিন্তু তার খামার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সে কিছু মোটা সাবসিডি পাবে কারণ তার কাজটা শুধু কৃত্রিম বীজ সংযোজন নয়, জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে জার্সির সমকক্ষ গাভী তৈরি করাও বটে। কিন্তু ডম অ্যান্টনিও জীবিত আছে এবং তার লালখামারেই আটকে আছে, সরকারি অথবা অন্য কোন দেশের কোন খামারে চাকরি নিয়ে কোথাও চলে যায় নি কিংবা জাহাজের অথবা আর্মির ডাক্তার হয়ে চলে যায় নি, এ বিষয়ে ম্যাকনটন বলেছিল বোধ হয় ঢাকা-রমনার সেই চায়ের দোকানে অথবা আমেরিকান ভাইস কনসালের ঘরে বসে। আর কথাগুলো আমার মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়তা ছিল না।

যোগাযোগই বলতে পারো। নদীটা জলোচ্ছ্বাসের ফলে তার পুরনো খাতেও বইতে সুরু করেছিল, তা এত জোরে যে প্রথমে সেই পুরনো খাতের (যাকে জোলা বলে) সব ধানজমি ডুবিয়ে, পরে পাড় ভেঙে, পারের জমিতে ফাটল ধরিয়ে, অবশেষে নতুন ও পুরনো খাতের মধ্যেকার প্রায় সবটুকু মাটি (তা হিসাবে দশ বর্গমাইল হবেও বা) ডুবিয়ে একাকার এক বন্যার দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল।

সেটা ছিল বেশ মাঝারি আকারের একটা মোটরবোট। যাতে কিছু টিনের খাবার, তার চাইতে বেশি ওষুধ ইনজেকশন, অপারেশনের সরঞ্জাম মায় অপারেশনের এক ফোল্ডিং টেবল—অর্থাৎ

দু-একজন ডাক্তার, জন দুই কম্পাউন্ডার, নার্স এবং একজন খালাসীর এক ইউনিট কাজ করতে পারে। কম পড়বে না, এমন ওষুধপত্র বোঝাই করা। এটা বেশ প্রশংসাযোগ্য যে আমেরিকানরা এসব ব্যাপারে সেলফসাফিসিয়েন্ট ক্যাপসুলের মতো করে ইউনিট সাজায়। প্যাকিং-এর কায়দায় ছোট জায়গায় জিগস পাজলের মতো কবে গোছাতে জানে।

নৌকাটা নদীব নতুন খাত বেয়ে চলেছে। এদিক ওদিকে গ্রাম বলতে যা ছিল তার ডুবন্ত ঘরবাড়ি কাদা মেখে জাগছে তখন, অর্থাৎ বন্যার তখন সেই অবস্থা যখন ডাক্তারদের দরকার সব চাইতে বেশি হয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও তো ভিড়াতে হবে। মাটিতে নামতে হবে। রোগীও মাটি না পেলে এগোচ্ছে কি করে! সুতরাং যেন সে রকম কাজে লাগবার জায়গা খুঁজে চলেছে আমাদের ডাক্তারি নৌকা। এমন সময়ে কে একজন বলল, পুরনো খাতটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। নতুন আর পুরনো খাতের মধ্যে জমি যতটা নিচু, পুরনো খাতের ডান পারে পুরনো জমি তার চাইতে উঁচু। কাজেই সেসব গ্রাম থেকে জল নেমে গিয়েছে এরকম আশা করা যুক্তিযুক্ত। কাজ আরম্ভ করতে উৎসুক থাকায় বোট সেদিকে অর্থাৎ পুরনো খাতেই চলল। জমি জেগেছে বটে। এখানেও দেখো, বন্যা থেকে জেগে ওঠা পুরনো জমি। দূরে দূবে যে গ্রামের সীমারেখা সেখানে গিয়ে তুমি বন্যাবিধ্বস্ত বাড়িঘর কুটিরের চিহ্ন দেখতে পাবে। গাছের গায়ে কাদার দাগ দেখে ধরতে পারবে কতদূব বন্যায় স্ফীত জল উঠেছিল। এদিকে অবশ্য এই কযেকহাজার বিঘা উঁচু নিচু সমতল জমির উপর দিয়ে লোনা জলেব স্রোত বয়ে গিয়েছিল। দুপুবের রোদে তোমার মনে হবে, মাটিব উপরে লবণের স্তব চকচক করে। দ্বিতীয় দিনে তো বোট থেকে বিকেলে তিনজন নেমে গেল গ্রামে কোথায় ক্যাম্প খোলা যায় দেখতে। এমন কি দূর থেকে একটা উঁচু ঘব দেখিয়ে তারা বলল (তাদের মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট টু ইনচার্জও), ওই ঘবেই ক্যাম্প হবে, দেখে নেবেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি। জলের উপবে বোটের হলুদে আলো ছাড়া সব অন্ধকাব। বোটের সামনে হেডলাইট একটা জ্বলছে বোটেব অবস্থান দেখাতে। রাত দশটায় মোটবম্যান বললে, সাব, ওবা ফিরবে না মনে হচ্ছে। আমরা বোটে তিন জন তখন। একটা টিন কেটে মাংস গবম করে নিই আর পাঁউরুটি আছে। (কাবো কারো কথা এমন মনে থাকে!) লোকটি চালাক চতুরও বটে। বোটের ছাতেব আলো এবং হেডলাইট জ্বলছে যে ছোট্ট ডায়নামোতে তাব সাহায্যেই সে কি করে ছোট্ট একটা হিটার জ্বালাল। (একটা বড় ক্রেটের উপরেই এসব করা হয় একটা কাঠেব ছোট পাটাতন বিছিয়ে নিয়ে।) কেন যেন বেশ ঘুম পাচ্ছিল। বললুম, খাবার হলে ডেকো।

বোধহয় মাঝরাত হবে, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হল বোটটা পূর্ণ গতিতে চলছে কিন্তু তা অন্ধকারে। চিৎকার করে মোটরম্যানকে ডাকলুম। কোন সাড়া নেই। এবং প্রায় তখন তখনই বোটটা প্রচণ্ড শব্দ করে মাটির উপরে উঠে গেল। ঝাঁকিতে ছিটকে পড়লুম। পড়তে গিয়ে গুঁতো খেলাম মাথায় এবং জলকাদায় পড়ে গিয়ে, তা কোমবে।

বোট ফেঁসেছে। কিন্তু অন্ধকারে বন্যার জলের গভীরতায় (যার আন্দাজ করা যাচ্ছে না) সাঁতার কাটার চেষ্টার চাইতে হাতড়ে হাতড়ে বোটটাকে খুঁজে পাওয়া ভালো। বোটটাকে অন্ধকারে ঠাহর কবে নিজেকে তার উপর টেনে তুললুম। এবং দীর্ঘতম রাত্রি শেষ হওয়ার আগে ফিকে চাঁদ উঠে সাহায্য কবেছিল। বোট কাদামাটিতে বাবো আনা। বোটের যে অংশটা জলে সেখানে মৃদু কুলুকুলু শব্দ আছে বটে। বোট ডুববে না।

সেদিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে দেখতে পেলাম বোটের শেষ প্রান্তে একটা দেহ। হাতদুটো বোটের বাইরে জল ছুঁয়ে ঝুলছে। এগিয়ে একখানা হাত তুলে নাড়ী ধরতে চেষ্টা করলুম। আর তারপরেই কী ভুল করলুম! মৃতদেহটাকে ওভাবে বোট থেকে জলে ফেলে দেয়া বোধ হয় উচিত হয় নি।

আর তারপর আমি প্রকৃতই রবিনসন ক্রুসো হলুম।

আমি এখন বুঝি সেটা পাকস্থলীর ব্যাপার নয়, কারণ রাতটা কেটেছে অনাহারে এবং তা সত্ত্বেও গা গুলিয়ে উঠছে। ভোর হতে হতেই নিজের চারিদিকে দেখলুম। একটা মাঝারি চওড়া খালের মাঝখানে একটা চরে বোট উঠে পড়েছে। চরটা বরং খালের ডান পারের দিকে। অর্থাৎ চর এবং ডানপারের মধ্যে যে জলের ব্যবধান, চর এবং বাঁ পারের মধ্যে সে ব্যবধানটা অনেকটা বেশি। উঠতে কোমরে ব্যথা লাগল এবং মাথার ব্যথাও টের পেলুম।

যাই হোক এখন নৌকা থেকে নেমে যেতে হয়। কী হয়েছে তা জনি না। কিছু তো হয়েছে। অনুমান করছি, যে গ্রামে ক্যাম্প খোলার জায়গা দেখতে আমার সঙ্গীরা নেমে গিয়েছিল তা থেকে এখন আমি অনেক দূরে। ঘণ্টায় পনেবো মাইল গতিতেও যদি বোট ভাঁটার টানে এবং মোটরের ধাক্কায় চলে থাকে এবং রাত দশটা থেকে রাত চারটে (আমার হাত ঘড়িব কাচ ফেটে ঘড়িটা বন্ধ রাত চারটেতেই) প্রায় ছ ঘণ্টায় নব্বুই মাইল চলে এসেছে। কোনদিকে? এবং এটা হয়তো সেই পুরনো খালও নয়। ম্যাপটায় কোথায় তা ঠিক বুঝতে পাবছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে নদীর নতুন খাত এবং পুরনো খাতগুলো (যাকে খাল বলে) তার সঙ্গে এখানে ওখানে অনেক খাল এসে মিশেছে বর্ষায়, যাতে অনেক সময়ে ডিঙ্গি-ডোঙ্গা চালানোর মত জল হয়। এই উচ্ছ্বাসে তাতে লোনাজল ঢোকাও বিচিত্র নয়। আর হয়তো বোট তেমন কোন খাতেই চলে এসেছে।

মানুষ কখন কী করে তা বলা যায় না। সকালের আলোয় বোটের পিছন দিকের স্বল্পপরিসর পাটাতনের উপরে রক্তের প্রচুব দাগ দেখতে পেলুম। বমি আসছে আবাব তেড়ে। ইতিমধ্যে মাছ-মাংসের দোকানেব মতো গন্ধ বেবিয়েছে। পলিথিনেব বালতি পেলাম একটা যাতে মোটর বোটের ৭২২ নম্বর লেখা (আমেরিকানরা কেমন গোছানো দেখো, যেন এই বোটটা একটা জাহাজ যে এর জল তোলার বালতিতেও বোটের নাম-নম্বর দেখতে পাওয়া যাবে)। ট্রাউজার্স গুটিয়ে নিলুম হাঁটু অবধি। মাথার ডানদিকটা খুবই ব্যথা কিন্তু ঘড়ির মতো বন্ধ হয়ে যায় নি, কাজ করছে। আধঘণ্টা জল তুলে এবং বোট ধোওয়ার স্ক্রাবিং ব্রাশ (যাব কাঠের উপবেও বোটের ৭২২ নম্বর সাদা পেইন্টে লেখা) ঘষে রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে ফেল্‌লুম। কী হয়েছে কাল রাতে?

বোট ছাড়তে আরও আধঘণ্টা। পিঠে ঝুলিয়ে যাওয়া চলে (কতকটা স্কুলের ছেলেদের স্যাচেলের মতো এবং এটা আমার উদ্ভাবন) এমন একটা পলিথিনের ব্যাগে আমার এক প্রস্থ গেঞ্জি, শর্টস, আন্ডারউয়্যার, কয়েকটি বিশেষ ইনজেকশনের বালব, অ্যান্টিবায়োটিকসেব কয়েক ধরনের পাতা তা প্রত্যেকটা প্রায় একশো ক্যাপসুল করে যা টিনফয়েলে গাঁথা, স্টেথেস্কোপ, সিরিঞ্জ, স্পিরিট, ফার্স্ট এইডের উপযুক্ত ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দিয়ে কাল দিনের বেলাতেই ঠিক করা ছিল। এমনকি ববারের হাল্কা শু, নিজের জন্য কিছু বিস্কুট, এক টিন কুইক কুকি সসেজ। এখন তাতে আর এক প্রস্থ শার্ট, কাদায় চলার মতো ভারি রবারের ওভার-শু ভরতে চেষ্টা কবলাম। তা যায় না। তখন ভারি ওভার-শু এবং এমনকি চামডার শু, এমনকি নরম মাটিতে চলার রবার-শু তিন জোড়া তিন রকমের জুতো গলায় ঝুলিয়ে—হুস।

হ্যাঁ, হুস বলেই মোটর বোটকে বিদায় অভিনন্দন জানালুম। মনে পড়ল, কাল রাতে কেউ আমার জন্য টিনের কৌটোর খাবার গরম করতে বসেছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি না. দেহটা মোটরম্যানের ছিল কি না। সেটা তো উপুড় হয়েই ছিল। আমিও তার মুখের দিকে তাকাই নি। আসল কথা, সুরত—আমি ডাক্তার তা তুমি জানো এবং তোমার কাছে গোপন করে লাভ নেই—আমি পোস্টমর্টেম করেছি, ছাত্র অবস্থায় মৃতদেহ কেটেছি। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাষা জীবিত অবস্থায় আমরা ধরতে পারি না, লক্ষ্য করলে মনে হবে—কখনও কোলাহল, কখনও বুঝি না এমন এক সুরসঙ্গতি ; কিন্তু মৃতদেহর স্থির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের পৃথক পৃথক শেষ সুর—নতুন সুর বা স্বর তো

আর লাগে না—একটানা বাজাতে থাকে। সেজন্য, তোমাকে বলবো কি? লোহার সাঁকোটার নিচে শাড়ি, সালোয়ার, গলিত কঙ্কালগুলোর দীর্ঘ চুল ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করেছো কি? সেই সব গলিত, পোকা-বিলবিলে উরু ইত্যাদি দেখা মাত্র গা গুলিয়ে ওঠে না? পোস্ট মর্টেমে—আমাকে একবার মাটি-দেয়া এক গৃহস্থ বধুর পাকস্থলী পরীক্ষা করতেও হয়েছে, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে–সিদ্ধহস্ত আমারও, নাকে কাপড় বাঁধা সত্ত্বেও, বমি আসে। কিন্তু বিবর্ণ হয়ে আসা নাড়ীর একটা নীল অংশ কিম্বা মুখের একটা অংশ? তখন গলার বদলে চোখে জল আসে।

এখানে আসল কথা তিনটে। ১নং, পায়ের দাগ যাকে ক্রিমিনোলজিতে ফুট প্রিন্ট বলে; ২নং, অ্যামনেশিয়া—স্মৃতিবিভ্রংশ নাকি কথাটা— আগেকার সব কথা, এমন কি নিজের পরিচয় ভুলে যাওয়া কিংবা হারিয়ে ফেলা; ৩নং, আর্জ টু লিব। বাঁচার একটা অহেতুক অযৌক্তিক তাগাদা। অর্থহীন বলে কি তাকে অ্যাবসার্ড বলবে?

বোট থেকে নেমে জল এক হাঁটু। প্রায় পনের গজ গিয়ে তীর। জল কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক কোমর। মানুষ সোজা তীরে উঠতে, জল যেখানে কম,তা দেখে চলে। তেমন ভাবে দেখে দেখে বোট থেকে বেশি দূরে না গিয়ে তীরে উঠলুম। সেখানে বেশ চটচটে কাদা যা দিনের রোদে শুকাবে। ভালো ফুটপ্রিন্ট ধরার মতো মাটি বলা যায়। প্রথমে ভারি ওভার-শু পরে লম্বা লম্বা পায়ে কিছুক্ষণ, তা দশ মিনিট হবে, অর্ধ-চক্রাকারে বোট থেকে ঘুরে আবার বোটের দিকে চলে বেড়ালুম। তারপর ববারেব শু পরে ওভাব-শুর প্রিন্টের পাশে পাশে প্রিন্ট ফেলে (কখনও বা একটু দূবে গিয়ে) চলে বেড়ালুম। সব শেষে নিজেব সখের চামড়াব বুট পরে নিজের পায়ের দুপ্রস্থ ছাপকে কিছু দূরে থেকে অনুসরণ করলুম। তা প্রায় সিকি-মাইল ব্যাসার্ধের একটা মোটামুটি অর্ধচন্দ্র ফুটপ্রিন্টগুলিতে ভোরেব কালো কাদায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বোট তো স্থায়ীভাবে আটকেছে। তিন প্রস্থ পায়ের ছাপ অতঃপর কী করল? এখনও ভোবের আলো (যদিও সূর্যোদয় হবে হবে)। আরও কিছুক্ষণ পবিষ্কাব ছাপ ফেলে আর তিন প্রস্থ পায়ের ছাপ আর একটা লুপ তৈবি করে আবও কিছু উজানে জলেব ধাবে গিয়ে থামল। মাথাটা খুব ব্যথা করছে, কোমর (না, বড়জোর ডিজলোকেশন) সোজা করতে যেন হার্টেও স্ট্রেইন পড়ছে। জল ভেঙ্গে বোটে উঠে জুতোর কাদাছাপ পরিষ্কার পাটাতনে যাওয়া উচিত, সবগুলোর না হোক অন্তত একটার। এবং তখনই লক্ষ্য কবলুম, কী আশ্চর্য যেন ভাঁটার টান লাগছে, বোটটার একদিকে গলুই আরও উঁচু হচ্ছে, এবং বোট এবং এ ধারের মধ্যেকার জলও যেন তিরতির করে কমছে। কারণ তখন দিগন্তে সূর্য দেখা দিচ্ছে। কপাল থেকে নাক বেয়ে ঘাম আসছে। হাতের তেলোয় ঘাম মুছতে গিয়ে ব্যথা লাগল। যা সন্দেহ করেছিলাম, ঘামটায় বাসি রক্ত গলেছে। আবার যেন বমি আসবে। কিন্তু সূর্যের আলো লাল, আর সেই লাল যেখানে মাটিতে নেমেছে, মনে হল যেন কুমীব, পায়ের ছাপের দ্বিতীয় লুপের জল-ছোঁয়া প্রান্তটার হাত দশেক দূরে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো সেটা ছিল একটা ডুবে-যাওয়া ডিঙ্গি। যা এসব দিকের নদী-খালের ধারে দু-মাইল হাঁটলে ভাসমান, ডুবন্ত, ভালো বা পবিত্যক্ত কোন-না-কোন অবস্থায় পাওয়া যাবেই। এটা অবশ্য কাছেই ছিল। খুব জোর ব্যথা কিংবা স্ট্রেইন লেগেছিল, একবার তো পা হড়কে জলে গিয়ে পড়েছিলুম আব কি। কোমরে আবার চোট লাগল। কারণ ডিঙ্গিটা কাদায় ডিঙ্গি-ভাসানোর মসৃণ দাগ রেখে জলে গিয়ে নামবে এমন সুস্থ ভাসমান অবস্থায় ছিল না। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে, এদিকে ওদিকে টেনে ভাঁটার-টান-লাগা জলে ভাসিয়ে দিলুম প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায়। সেটা কতদূর ভেসে গেল তা দেখা অপ্রয়োজনের। যদি মূল-খালে একশ গজ গিয়েও ডুবে যায় কিম্বা কাদায় পুঁতে যায়, লোকসান কী? তুমি তো আর নিজে ডিঙ্গিটায় উঠছ না। নদীর কাদায় ডুবে থাকা ডিঙ্গি দেখে কি হলপ করে বলতে পারো, সেটা সেই ডিঙ্গিটাই যা এখান থেকে তীরের কাদায় মসৃণ

ডিঙ্গি-ভাসানোর দাগ রেখে জুতোর ছাপগুলোর শেষ সীমা থেকে রওনা হয়েছিল? তা পারো না, কেননা যার ভাসানোর দাগ সেটা যে ডুবো ডিঙ্গিটার উপর দিয়ে তলা-ফাঁসা বোটের ধাক্কা বাঁচিয়ে আরও দক্ষিণে, আরও অনেক দক্ষিণে কিংবা দক্ষিণ-পূর্বে ভাঁটার টানে যায় নি, কে বলেছে? বাকি ছিল শুধু ডিঙ্গি ভাসানোর দাগ পর্যন্ত আবার তিন প্রস্থ ফুটপ্রিন্ট।

বেলা বোধ হয় এগাবোটা হতে চলল। আর সেই জলের মধ্যে, তাহলে, হেঁটে চলেছিলুম। ভাঁটার টানে খালের জল তীরেব কাছে কোথাও একহাঁটু, কোথাও তার ইঞ্চি দু-এক বেশি। বড় ওভার-শুটা আমার কাদা মাখা ট্রাউজার্স শার্ট সমেত বোটেব উপরে। রবারের ছোট শুটাকে আর চামড়ার জুতো জোড়াকে এক ঘণ্টা অন্তর খালের মধ্যস্রোতে এক একখানা কবে ছুঁড়ে দিয়েছি। সে হিসেবে রওনা হওয়ার পর থেকে চার ঘণ্টা হল। সূর্য ঠিক বাঁযে ছিল। এখন ডান হাতের উপরে। তাতে অনুমান হয় খালটা প্রায় অর্ধচন্দ্রের মতো দক্ষিণ থেকে দক্ষিণ-পুবে ঘুরেছে। জলটা কিছু পরিষ্কাব। জলের খাতে কোথাও কোথাও ধানগাছের দু এক গোছা, কোথাও ছোট ছোট কাদামাখা শ্যাওলা-জড়ানো ঝোপঝাড়। জল এসবের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। ভাঁটার টান আগে থেকে থাকলে ধানগাছ ঝোপ-ঝাড় খালের খাতে হতো না। বোঝা যাচ্ছে, কোন একটা বাঁধ ভেঙ্গে বা সে জাতীয় কিছু ঘটনায় জলোচ্ছ্বাস এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জল স্বচ্ছ হচ্ছে ক্রমশ, কিন্তু সাবধানে চোরা কাদা বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। বন্যাব পবে মানুষ কাদায় ডুবে যেতে পাবে। তীবে (ঢালু তীর বলে অনেক দূব দেখা যায) ভেঙ্গে পড়া কুটিব, ডগা পর্যন্ত কাদা এমন দু চারটে গাছ। একটা বাঁশঝোপ যেন জলে ডোবানো মাপেব খুঁটি--জল কতদূর উঠেছিল, কি কবে তা ধীরে ধীবে, কাদা জলেব দাগ বেখে বেখে নেমেছে বোঝা যায়।

জল তুলে মুখে দিলাম। কিন্তু এবার (ডাক্তাব তো আমি, সুরত, নিজের হার্ট যখন সত্যিই দ্রুত চলতে থাকে তখন বুঝি কখন কেন তা হচ্ছে) শেষ চেষ্টায় তীবে পৌঁছানো দরকার। আর পনের মিনিটের বেশি পারা যাবে না। এমন একটা জায়গা দরকাব যেখানে পায়ের ছাপ না রেখে তীবে ওঠা যায়। শুকনো তীর তাব নিচে কিছুটা গভীর জল। সব সময়ে তোমাব ইচ্ছা মতো সব কিছু ঘটে না। আবও দশ মিনিট --বেলা তখন বাবোটা হবে অনুমান, খালের খাতে হাঁটু জলে প্রায পাঁচ ঘণ্টা চলেছি--চলাব পবে সাঁতার দেয়াব মতো বুকজল পেলাম তীবের দিকে। অর্থাৎ খালের এটা একটা দহ।

প্রকৃতই রবিনসন। যখন জ্ঞান হল, দেখলুম পা দু'টো তখনও জলে। সাবা গায়ে কাদা, মুখের ভিতরটা বালির মতো শুকনো। অর্থাৎ, তাহলে, সাঁতারেব শেষ কয়েক গজ থেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলুম। জলও খেযেছি হয়তো। ধাবে কাছে কেউ নেই। তখন মনে পড়ল পিঠের পলিথিন ব্যাগের কথা।

নিজেকে পরিচর্যা করে—ব্র্যান্ডি থেকে শুরু, বমি, ব্র্যান্ডি, পনের মিনিট, আধখানা বিস্কুট, ব্র্যান্ডি, এই পর্যায়ের শেষে—একটা টেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল, সিটলের আযনা বেব কবে কপালের ক্ষতস্থান পরীক্ষা, ব্র্যান্ডিতে গজ ভিজিয়ে সাফ করা, স্টিকিং প্লাস্টারে ক্ষত ঢাকা (চুলের জমাটবাঁধা রক্ত ধোয়া অথবা গেঞ্জি ও আন্ডারওয়্যারের কাদা ধোয়ার মতো শক্তি তখন ছিল না।) পরিচর্যা শেষ করে–বেলা দুটো হবে অনুমান কিন্তু আকাশে মেঘ বলে সূর্য ঢেকে বিকেল যেন ইতিমধ্যে—হাঁটতে শুরু করলুম। আশ্চর্য, পায়ের দাগ পড়ছে না।

আশ্চর্য সেই বিকেলের অস্পষ্ট আলোয এক অভূতপূর্ব নিস্তব্ধ পবিত্যক্ত দেশ দিয়ে যেন হাঁটছি। লোকজন দূরে থাক, প্রাণের স্পন্দন নেই। মরা মাছেব আঁশটে গন্ধ। একবাব মনে হল, চোখের সামনে যেন একটা বিবর্ণ কাদালাগা রঙ-করা কাঠের দেয়ালের বাড়ি দেখছি; যেন চাবিদিকের ধূসব পলির উপরে সরু একফালি পায়ে চলা পথের কালো চিহ্ন জাগছে, আর তা যেন উপর থেকে

নিচে ধীরে ধীরে নামছে; মনে হল, দু-তিনটে রোঁয়া ওঠা কুকুর, বুল-টেরিয়ারের মতো ভাঁজ পড়া বীভৎস মুখ; যেন এদিকে দুষ্প্রাপ্য একটা ইউক্যালিপটাস গাছ; যেন সেই রং-করা কাঠের আধাসম্পন্ন নির্জন বাংলোর ভিতরে ঢুকেছি; কিন্তু পারছি না, আর সব ভুলে যাচ্ছি; যেন সে বাড়ি আমারই এবং সিঁড়ির ধারের (কাঠের সিঁড়ির) কাঠের রেলিং ধ'রে উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে মনে হল, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।

একথা সহজে বলা যেতে পাবে, বাত চারটেতে আঘাত পাওয়ার পর থেকে এবং মাথার ঘা থেকে অতটা রক্তক্ষরণ হওয়ার পর অত ফুটপ্রিন্ট তৈরি করার ব্যাপার, ডিঙ্গি ভাসানো, তার পর ঘণ্টা চারেক জল ঠেলে ঠেলে নদীর খাতে হাঁটা, এমন কি খালি পেটে—শুধু বিস্কুট ছাড়া ব্র্যান্ডি—এসব মিলে নানা দৃশ্য দেখিয়েছে।

কিন্তু সামনের ওই বাড়িটাব—যাব নাম কাজা—পাশে ইউক্যালিপটাস গাছটাকে দেখো! কেমন কি না? তুমি বলবে, তাই বলে নিজের বাড়িটারি বলে মনে হওয়া (যেমন পূর্বজন্মের বলে জাতিস্মররা চেনে)—এসবই ক্লান্তির ফল। কিন্তু অ্যামনেশিয়ার প্রথম আঘাতটা কি করে আসে, প্রকৃত অ্যামনেশিয়া, তা কি তুমি বলতে পারো? এখনও এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ আছে। কেমন কি না? আমাব মনে হযেছিল, ওই বুল টেরিযার দেখে, যেমন জ্বরের ঘোরে হয়, এই বর্ণসঙ্কর ব্যাপার দেখে, যে এটা লালখামাবই হয়তো যেখানে আমার পূর্বপরিচিত ডম অ্যান্টনিও গবেষণা করে। পূর্বপরিচিত কথাটা তো একটা শব্দ মাত্র নয়, উপলব্ধিও। তা থেকে মনে হওযা বিচিত্র কী যে এ বাড়িটা আমাব পূর্ব-পরিচিত, আমি অনেক ক্লান্তিতে যেন আলিঙ্গিত হচ্ছি এব হাওয়ায, দেয়ালেব স্পর্শেব শীতলতায, সুতরাং এ বাড়ি আমাব।

প্রকৃত অ্যামনেশিযা কাকে বলে, তা কি তুমি জানো সুবত? ২নং পয়েন্ট অ্যামনেশিয়া, যদি তোমাব মনে থাকে। অবিশ্যি তুমি বলতে পাবো তোমারও অ্যামনেশিয়া। তুমি সুরত বটে, কিন্তু কোথায় ছিলে, তা যেন তুমি কিছুই আর মনে করতে পারো না। যেন সময়েব যে স্রোতে তুমি ডানা মেলে রেখে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলে (আকাশগঙ্গার স্রোত বলবে?) তা হঠাৎ হাবিয়ে যেতেই এখানে ঝুপ কবে নেমে পড়েছো। দেখছো এদিক ওদিক, কিন্তু আর ডানা মেলতে তাগিদ পাচ্ছ না।

আমিও তোমাকে প্রশ্ন করছি না। আসক মি নো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ উইল বি টোলড নো লাইজ। তোমার প্রশ্ন করাব কোন কারণ নেই। তুমি ডক্টর অ্যানাসিন বলো। সেটা যে অ্যানাসিনের অথবা তেমন কোন ওষুধের বিজ্ঞাপনের ডাক্তারের সঙ্গে আমার দাড়ির মিল থেকে, সেটাও মন্দ নয।

হঠাৎ যেন আমার ঘুম ভাঙল। দেখলুম, আমি বিছানায় শুয়ে। চাদরটা পরিচ্ছন্ন, মোটামুটি নক্সাদাব। মাথায় বেশ ভার বোধ হচ্ছে। হাতড়ে বুঝলুম ব্যান্ডেজ বাঁধা। গায়ে দেখলুম, একটা পরিচ্ছন্ন স্ট্রাইপড স্লিপিং সুট। ঘরের কোণে মোমবাতি জ্বলছে। তারপরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একবার ঘুমের ঘোরে মনে হল, কাবা কথা বলছে। তারপর কেউ যেন ইনজেকশন দিল, তারপর আবাব ঘুমিযে পড়লুম।

পবদিন কিংবা একদিন এক রাত বাদ দিয়ে তারপর দিন ঘুম ভাঙল সকালে। ধীরে ধীরে উঠে বসলুম। শরীর খুবই দুর্বল। ঘরখানাকে তাকিয়ে দেখলাম। বড় লোকের বড় ঘর নয়, তা হলেও সাজানো, ফিটফাট। ছাদ পর্যন্ত র‍্যাকের সারিতে এমন করে অল্প জায়গায় অনেক জিনিস সাজানো যে মনে পড়বে যেন জাহাজের কামরা। কাঠের রং কবা সিলিংটা যেন তেমন বাঁকানো।

এখন বুঝতে পারি লঞ্চের মধ্যে ছিলুম। আড়ালে থেকে আমাকে কেউ কেউ দেখে যাচ্ছিল।

একজন পরিচারক গোছের মাঝবয়সী লোক এল। ইংরেজি করে জিজ্ঞাসা করল, (ইংরেজিটা নিতান্ত মেঠো) তখন কী রকম লাগছে। চা দেবে কি না। চা বিস্কুট আনল সেই। বলল, আবার ইংরেজি করে, আমার চা খাওয়া হলে কাউকে খবর দিতে হবে? কী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?

আমি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেল। বিড়বিড় করে ইংরেজিতে বলল, বন্যার পরে এমন দুরবস্থা, অতিথির ঠিকমতো বন্দোবস্ত হচ্ছে না।

লোকটি পরিচারক নয়। ডম অ্যাব্রোসিও ব্রাগাঞ্জা। লোকটির তিনরকম পোশাক আছে। পরে বলছি তার কথা।

চা বিস্কুট খেয়ে কেউ বল পায় না। কিছু বাদে আবার খাবার এল। এবার প্রশ্ন হল, আপনার কি মনে পড়ছে আপনি কি করে এখানে এলেন? প্রশ্নটা ইংরেজিতেই, এমন কি ভাঙ্গা উর্দুও নয়। ওরা কি আমার চেহারায় ঠাহর করেছে, আমি ইউরোপীয়ান? কিছু পবে উঠে ঘরখানাতেই ঘুবছি, এবং তখনও অবাক লাগছে, একবার টেবলে রাখা বড় আযনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছে। মাথা জুড়ে বেশ বড় ব্যান্ডেজ কিন্তু পাকা হাতে বাঁধা। একটা কৌতূহলের ব্যাপার, ঘরটা কি ডাক্তারের? কাচের সার্সির পিছনে অপারেশনের ঝকঝকে যন্ত্রপাতি। এবার চমকে উঠলুম। পিছন থেকে মিষ্টি গলায় বলল কেউ, হাঁটতে পারছেন? (ইংরেজিতে প্রশ্ন; কনভেন্টেব প্রায় শুদ্ধ উচ্চারণের ইংবেজি) কিন্তু এখন এই চেয়ারটায় বসুন। একটা ইনজেকশন দেব।

ভাবতে অবাক লাগবে, এই প্রায় গণ্ডগ্রামে এমন একজন স্ত্রীলোক এ ভাবে কোথা থেকে আসে। কিন্তু কোথাও এমেচারিশ কিছু নেই। আমাকে বসতে বলে সে ইনজেকশনের বাক্স আনল, ডাক্তার যে ভাবে সিরিঞ্জে যত্ন নিয়ে পরে ইনজেকশনেব গুঁড়োয় জল মেশায়, তেমন সব কবে আবার ডাকল,—কই আসুন। একটু কাছে গিযে দেখলাম, ইনজেকশনটা নির্দোষ পেনিসিলিন। বলল—বসুন এই চেয়াবটায়। ডেক চেয়ারটায় বসলাম। পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ইনজেকশনটা দিল।

একটু পবে আবার জিজ্ঞাসা করল—আপনার পরিচয়টা বলুন। খববাখবর কবা দরকার। আমি বোধ হয় তাকে অবাক হযে দেখছিলুম। নীলে সাদা ডুবি শাড়ি। সব রকমে অলঙ্কারবর্জিত। নিচু কাটের সাদা শিফনের ব্লাউজ। উজ্জ্বল বাদামী গাযের বং, মাঝখানে চেরা গাঢ় ধূসর বব করা চুল। চোখ দুটি নীলা। তার কথায় চমকে উঠে বললুম, আঁ।

পরের দিন, এবং তার পরের দিন। একদিন আইভি বলল (তার নাম আইভিলতা পরে জেনেছি) —আপনি তো ডাক্তার।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ঘবের (এটা দোতলার ঘর তখন বুঝতে পারছি) সামনে ঢাকা বারান্দায় বসেছিলাম, একটু দূরে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সিগারেট ধবাল। নাক দিয়ে চুল-চুল ধোঁয়া ছেড়ে বলল—আপনি ডাক্তার নন? এই যে ওষুধগুলো দিচ্ছি আপনাকে, এসবই আপনার পিঠে বাঁধা ব্যাগে পেয়েছি। এই সিগারেটও। নিন সিগারেট খান।

সে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখলুম।

বেশ লাগছিল যেন নিজেকে হারিযে দিতে।

রিচ্যুয়াল সব ধর্মেই আছে। এবং সেগুলো কার্যকরী বলেই, অনেক ক্ষেত্রে যে ধর্ম মানে না, অথবা মানে কিংবা মানে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাকেও মন দিয়ে রিচ্যুয়াল পালন করতে দেখা যায়। এক সময় ধর্ম ছিল না অর্থাৎ আমবা ঈশ্বরসংযুক্ত যে চিন্তাকে ধর্ম বলি, তখনও মানুষ ছবি এঁকে রিচ্যুয়াল অনুষ্ঠান করতো। তাতে মনে বল পেতো বলেই তো। তিনপ্রস্থ ফুটপ্রিন্ট যা একটি ডিঙ্গি ভাসিয়ে কোথায় বা অনির্দিশ্যে হারিয়ে গেল, তার মধ্যে আমার সব চাইতে সখের চামড়ার জুতোর ছাপকে আমি মনে মনে আমার ফুটপ্রিন্ট বলে ধরে নিয়েছিলুম তো। তিনজনের

দলে সেই আমি যার ফুটপ্রিন্ট, সেও তো হারিয়ে গিয়েছে। শেষের পথটুকু সাঁতরে চূড়ান্তভাবে সেই ফুটপ্রিন্টের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিঁড়ে দিয়েছি। তা না হলে বলতে হবে আমার রিচুয়াল পালন বৃথা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাব উচিত ছিল বোট থেকে নেমে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে যাওয়া, ঘটনার এজাহার দেয়া।

আইভির দিকে চাইলাম। সন্ধ্যা হয়-হয়, একটু দেরি আছে। স্ত্রী-জাতির বসার ভঙ্গিতে কোথাও একটা স্নিগ্ধতা আছে। অবাক হয়ে ভাবছিলুম, এই যে আমি হারিয়ে গেলুম এই কি অনেক দিনের জন্য স্থায়ী হয? পিঠ দিয়ে বিছানার শীতলতা খোঁজার মতো, আমি যেন সারা অস্তিত্বে শীতল কিছুকে চাইলুম সে মুহূর্তে, এক হারিয়ে যাওয়া সন্ধ্যা হয়-হয় অবস্থাতে।

আইভি আবার প্রশ্ন করল—কিছুই কি মনে পড়ে না?

আমি বললুম—আঁ?

আইভি বলল—বসুন, আপনার ব্যাগে ইনস্ট্যান্ট কফির প্যাকেট আছে, কফি করে আনি।

আর স্নিগ্ধতা কি শুধু আইভির বসার ভঙ্গিতে কিংবা তার চেরা সিঁথির তলায় তার উজ্জ্বল কপালে? সামনে দিগন্ত-প্রসারিত এক নির্জন পৃথিবী। কাছে এই ইউক্যালিপটাস গাছ সমেত রং-করা কাঠের বাড়ি (যার এই দোতলা ব্লক ছাড়া আরও অন্য কয়েকটি ঘরের গায়ে এখন বন্যাজলের দাগ)। কিছু দূবে লম্বা ধরনের বড় বড় জানলার অ্যাসবেস্টস শিটের ছাদ, ইটের দেয়ালের দোচালা ঘর যাব প্রবেশ-দরজার মাথার উপবে একটা বড় কালো ক্রস বুঝিয়ে দিচ্ছে সেটা চার্চ। চার্চের পাশে ছোট একটা ঘেবা জায়গায় ওগুলো বোধ হয কবর। দুটো পাশাপাশি। ধূসর শুকনো পলিতে ঢেকে উইটিপি, মনে হচ্ছে কিন্তু এই সন্ধ্যার পূর্বাভাসে, যেন ঘুমন্ত মানুয। যতদূর চোখ যায় জনপ্রাণী নেই। আব দিগন্তের কাছে যেন একটা নদীর বাঁক। তখনই মনে হয়েছিল এটা এক হারানো দেশ।

কতদিন আমার এই বিমূঢ় ডেজড অবস্থা ছিল, জানি না। সাতদিন হতে পারে। স্মৃতিভ্রংশ কি ইচ্ছাকৃতভাবে এনে ফেলা যায়? আর কোন রিচুয়াল কি আমাকে সাহায্য করতে পারে? (শরীবের দুর্বলতার ফলে এই যে কিছুটা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে চলেছি, এই যে অপরিচিত একটা ঘর যা অথচ এমন ভাবে সাজানো যে আমার মতো একজন ডাক্তারেরই হতে পারে, যাতে আমি ইতস্তত চলে বেড়াচ্ছি, এই যে এমন কি অন্য কারো স্লিপিং সুট যা যেন আমারই হতে পারে অথচ যার বুক পকেটে ছোট্ট মনোগ্রামে একটা ছোট গোলের মধ্যে অন্যের নামের আদ্য অক্ষরগুলো।) রিচুয়াল তো সেই বিষযই যার সামান্য অংশ বিশ্বাস, অধিকাংশ বিশ্বাস করার চেষ্টা। আমার নিজের পোশাক বলতে আন্ডারউঅ্যার এবং গেঞ্জি যা পরনে ছিল। জুতো তো খালের জলেই। ঘরে ঘুরতে ঘুবতে দেখলুম, আযনার সামনে টেবলের উপরে দুটো কব্জি ঘড়ি, তার একটা আমার। এবার ভালো করে নজবে এল চেয়ারের পিঠে একটা ট্রাউজার্স ও একটা শার্ট। এ দুটো কি আমাব ব্যাগে ছিল? পরিষ্কার বটে কিন্তু কী বিশ্রী বেইস্ত্রি। দেখলাম আমার ঘড়িটা চারটে বেজে বন্ধ, ডায়ালের কাচ ফাটা, জল লেগে বিবর্ণ, অন্য ঘড়িটা চলছে। বেশ বড় চেহারার রুপোর কেস। আমার ঘড়ি। আমার ঘড়ি নাকি? কেন রেখেছে? মনে করিয়ে দিতে আমি কে? যে ঘড়িটা চলছিল সেটা তুলে হাতে বাঁধলুম। এতক্ষণ তা হলে পাযে আমার অন্যের স্লিপার। স্লিপারের কথা একদম ভাবি নি দেখো এই সাতদিনে অথচ তা ব্যবহার করছি।

আইভি বোধ হয় লক্ষ্য করছিল। কিংবা তা যোগাযোগ। বলল (ইংরেজিতে)—এখন বোধ হয় জোর পাচ্ছেন গায়ে। লাঞ্চেব সময়ে যাবেন নিচে? না ট্রেতে আনবো? ঘড়িতে দম দিয়েছেন?

দম তো দেয়াই আছে। হাতে বাঁধা রুপোর ঘড়িটা দেখালুম। আইভি এগিয়ে এল। আমার হাতঘড়িটা একবার হাতে করল যেন বলবে, আপনার নিজের ঘড়িটার কথা বলছিলুম। কিন্তু কিছু ভেবে ঘড়িটা আবার রেখে দিল।

একটু পবে সে বলল—পোশাক পালটাতে হয।

আমি নিজেব পোশাকেব দিকে চাইলুম।

যে চেযাবটাব উপবে আমাব নিজেব জামা সেটাকে এগিযে দিল যেন। এসবই তাব চেষ্টা আমাব স্মৃতিকে ফিবিযে আনতে। আব আমি তখন এগিযে গিযে দাঁডালুম সেই আলমাবিটাব সামনে যাব কাচেব ভিতব থেকে অন্য কাবো সাজানো, ধোবাবাডি ফেবৎ পোশাক দেখা যাচ্ছে। আইভি মাথা ঝাঁকাল। আলমাবি খুলল। এক সেট সুট বাব কবল। সে কি অনুমান কবল, আমি আমাব নিজেব পোশাক চিনতে পাবছি না, উপবন্তু আলমাবিতে বাখা অন্যেব পোশাককে নিজেব ভাবছি?

ডম অ্যান্টনিওব পোশাক আমাব গাযে, হাতে তাব ঘডি, পাযে স্লিপাব , এটা কি তাব ঘবই নয, মানে তাব নিজেব লিভিংকম? এখন তো বুঝতে পাবছো ওই জাহাজী বঙেব ও জাহাজী মোটিফে তৈবি বাংলোটা যাব পর্তুগিজ নাম কাজা তা ডম অ্যান্টনিওব বটে। তখন জানতুম না। টেবলেব উপবে কাগজপত্র। দাঁডিযে দাঁডিযে উলটে উলটে দেখছি। একটা ইংবেজ শিপিং কম্পানিব পে-বুক, ডম অ্যান্টনিওব নাম ধাম কিন্তু ফটো নেই। কেউ যেন তুলে নিযেছে। আঠাব দাগ আছে। একটা পাসপোর্টও দেখছি। তা, ডম অ্যান্টনিও, যে জাহাজী ডাওাব ছিল, তাব পাসপোর্ট কাজে লাগতো। একটু অবাক হলুম। পে বুকে ডম অ্যান্টনিওব পবিচয আব পাসপোর্টে তাব পবিচযই একই। পাসপোর্টেব ছবি দেখে মনে হল কিন্তু নাম শুনে যে পূর্বপবিচিত ডম অ্যান্টনিওকে আন্দাজ কবেছিলুম, এ যেন হুবহু সে নয। কতকটা তেমন বটে কিন্তু যেন আবও কম বযসেব। পাসপোর্টটা ডম অ্যান্টনিও নামে এক ভাবতীয নাগবিকেব। কলকাতাব সেটেলমেন্টেব ঠিকানা।

ট্রেতে লাঞ্চ এনেছিল আইভি। বোধ হয দুপাঁচ মিনিট আগেই সে ঘবে ঢুকেছে এবং আমাকে লক্ষ্যও কবছিল বোধ হয। খুব মিষ্টি গলায ডাকল। (ইংবেজিব উচ্চাবণ আইভিব সুন্দব। সে যদি অল ইন্ডিযা বেডিওব ঘোষক হতো।) আব তা ছাডা এই পিকিউলিযাব কেসটা যাব সে চিকিৎসা কবছে, তাব প্রতি তাব যেন অতি স্নিগ্ধ সদযতা আছে। হার্ট কেসকে যেমন আমবা হার্টকে উত্তেজিত বা ডিপ্রেসড কবে এমন কোন অবস্থায আসতে দিতে চাই না আইভি যেন তেমন আমাব নবম হযে আসা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত কবতে চায না। নার্সেব উপযুক্ত ব্যবহাবই বটে। পবে আমি জেনেছি আইভি ডাক্তাব নয। আর্মিতে কযেক বছব নার্স ছিল নাকি। আর্মিব নার্স মোটামুটি একটা ইনজুবিব প্রাথমিক চিকিৎসা জানবেই।

আইভিলতা বলল—আসুন। খেতে দিই।

না, আমাব পক্ষে ডম অ্যান্টনিওব মুদ্রাদোষগুলি (প্রত্যেকেবই তা থাকে) নকল কবা সম্ভব নয। কাজেই খেতে বসাব আগে সে কী কবতো জামাব হাতা অথবা ন্যাপকিন নিযে, অথবা কি কবে সে কাঁটা চামচ ধবতো, তা অনুকবণ কবা আমাব বিদ্যাযালেও সম্ভব নয। আমি খাচ্ছি এবং আইভি লক্ষ্য কবছে। তাব যেন ফাঁকা সময পূর্ণ কবাও বটে আমাকে এই নিখুঁত পবিচর্যা কবা।

আইভি আমাব প্লেটে কিছু খাবাব তুলে দিযে বলল, বেডাতে ইচ্ছা কবে না?

নাঃ।

মাথায কি কষ্ট হয এখনও শক্ত জিনিস চিবুতে?

নাঃ।

আচ্ছা, মনে কিছু কববেন না, যেমন ধরুন আমি আইভি, তেমন আপনিও তো একজন কেউ।

আঁ?

আইভিব চোখে যেন বিষণ্ণতা দেখতে পেলুম।

জল খেলুম। ন্যাপকিন তুলে ঠোঁট ও গোঁফ মুছলুম ধীবে ধীবে।

আইভি খুব নিচু গলায় বলল—মনে পড়ে না, কিছুই কি মনে পড়ে না?

আঁ?

মনে পড়বে। এখন ভেবে দেখার চেষ্টা করুন। আইভি বলল।

শার্টের বুকে রুটির কুচি পড়েছিল। আঙুল দিয়ে তুলে ঝাড়লুম। তাতে শার্টের বুকে ছোট্ট একটা মনোগ্রাম চোখে পড়ল। ডম অ্যান্টনিওব মনোগ্রাম। চোখের সামনে হাত দুটো মেলে দেখলুম।

আইভি বলল—আপনাকে একা ছেড়ে দেয়া যাচ্ছে না, তা ছাড়া যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বাইরের সঙ্গে। আপনার আরও চিকিৎসা দরকাব। আপনি তো ডাক্তার?

হ্যাঁ। আমি ঘরেব বড় আলমারির দিকে চাইলাম যাতে অপারেশনের অস্ত্রগুলো ঝকঝক করছে। সম্ভাব্য, অর্থাৎ গ্রামে বসে অপারেশন করা যায় একা একজন সহকারীকে নিয়ে, সব রকমের অস্ত্রই সাজানো। ঝকঝক করছে এমন যে চোখ পড়বেই।

আইভি আনন্দিত হল। বলল—আপনাকে যে পেনিসিলিন ও টেট্রাসাইক্লিন পুশ করেছি সে সবই আপনার ব্যাগে ছিল। মনে পড়ে আপনি কে?

বললুম—ডম অ্যান্টনিও, আচ্ছা ডম অ্যান্টনিও, আঁ?

আইভি কি হাসল? যেন দুঃখের হাসি। মনে হবে সে তার ব্যবহারিক জীবনে এমন অ্যামনেশিয়ার কেস আরও দেখেছে।

এই ভাবেই ডম অ্যান্টনিও হলুম, অথবা তার আইডেন্টিটিতে আমার আইডেন্টিটি হাবিয়ে ফেলার বিচুয়াল সুরু হল।

আইভি হাল ছাড়ল না। রোগীর উপরে ডাক্তারের টান? রোগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ডাক্তারী প্রবৃত্তি? সে বোধ হয় আমাকে প্রকৃত ডম অ্যান্টনিওর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ডম অ্যান্টনিওর অভ্যাস ইত্যাদির সামনে ফেলে চমকে দেযার চেষ্টা করতে লাগল, যাতে আমার মনে আসে যে আমি ডম অ্যান্টনিও নই। তার একটা কৌশল ছিল যখন তখন পিছন থেকে ডম বলে ডাকা। এটা একটা ফ্যামিলি সিক্রেট? দু-একটা কথা বাংলায় বলা, যেমন সে নিশ্চয়ই ডমকে বলতো। এমন কি এক রাতে আমি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন সে নেগলিজি পবে রাতের প্রসাধন করে (কী সুন্দরই দেখাচ্ছিল তাকে) আমার বিছানায় এসে বসল। সে বোধ হয় ভেবেছিল, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তাকে এভাবে শুতে আসতে দেখলে ভদ্র চেতনা প্রতিবাদ করে ডমের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবে। যাকে বলে শক অব মাই লাইফ।

আইভি বলল—ডম। আদরের গলা বোধ হয় একেই বলে, যখন রুপোলি শোনায় স্ত্রীলোকের স্বর।

ধড়মড় করে উঠে বসলুম। আইভি হাসল। তার চোখ দুটো আশায় চকচক করল যেন। কী মিষ্টি, স্নিগ্ধ, আদরণীয় দেখাচ্ছে তাকে। আমি সেই সময়ে ধীরে ধীরে মাথায় হাত রাখলুম। মাথায় ব্যান্ডেজের বদলে স্টিকিং প্ল্যাস্টারের মস্ত একটা ক্রস। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ল। আমি তা অনুভব করলুম।

আইভি যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। রুগ্নের শয্যায় অভিসারিকার বেশে আসার লজ্জা? কিংবা ডাক্তার হিসাবে ভুল ওযুধ ব্যবস্থা করার অপরাধবোধ?

কিছুক্ষণ বাদে কালো গাউন পরে সে ফিরে এল, হাতে মেজার গ্লাসে ওযুধ, হেসে বলল, (ইংরেজিতে) ব্রোমাইড। তোমাকে কড়া সিডেটিব দিতে ভয় হয়। কিন্তু চোখের জল কেন?

বেশ বুঝতে পারছি তা ভান নয়। কিন্তু যে কারণেই হোক, জলটাকে আইভি যাই মনে করুক, হয়তো ব্যথার কথাই মনে হয়েছে তার, চোখের জলটা আমার পুরনো আইডেন্টিটির। এটা খুব খাঁটি কথা, আমরা কতগুলো নীতিকে সেন্টিমেন্ট দিয়ে একেবারে নিজস্ব করে নিই, অন্য কতগুলোকে বুদ্ধি দিয়ে পালন করি। পরেরগুলোকে বিপদে বদলে কিছুটা লাগসই করে নেয়া যায় পরিস্থিতির,

কিন্তু যেগুলো সেন্টিমেন্টে জড়িয়ে অনুভূতির অংশ হয়ে গিয়েছে, সেগুলোকে ত্যাগ করা সহজ নয়। আমার মনে হল, রিচুয়াল শুধু আমার একার ব্যাপার নয়। অন্য একজনকে—যে বিশ্বাসী এমন যে রোগীকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে অন্তর দিয়ে—তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। ডম অ্যান্টনিও আইভির বিদেশে থাকা স্বামী? এখন তুমি জানো, সে ভাই। তার আইডেন্টিটি নিয়ে তাকে অপমান করছি; বন্যায় এদের নিজেদেরই আহার্যের সংস্থান নেই তা সত্ত্বেও এদেব উপরে বসে এই দিন দশেক বেশ রাজসিক আহার চালাচ্ছি, এসবই আমাকে ভয়ঙ্কর পীড়িত কবে তুলেছিল। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, ওদেব আহার্যের সংস্থান ভালোই ছিল অন্য কারণে; এবং আইডেন্টিটি হারালেই মানুষ একেবারে বোধশক্তিহীন হয়ে যায় না। (এটা পরে বলছি ৩নং পয়েন্ট বলার সময়ে।)

কিন্তু তখন ভাবলুম, রিচুয়ালে এমন ঘটে, যেমন উপাসনা করতে করতে কি তোমার, যেটাকে পিছনে রেখে এসেছো তেমন কোন, টি-পার্টির লেডি পার্টনারকে মনে পড়ে না?

একদিন স্বকর্ণে শুনলুম। একতলায় দাঁড়িয়ে কেউ কাউকে বলল—হ্যাঁ, এটাকে অ্যামনেশিয়ার কেস বলেই, মনে হয়।

বুঝতে পারছে ও ডাক্তার?

হয়তো আলমারিতে অপারেশনের অস্ত্র দেখে মনে করছে যদি ঘরটা ওর হয়, তবে ও ডাক্তার।

কিন্তু দেখো, তোমার কোন ক্ষতি না করে। পাগল তো।

অ্যামনেশিযার রোগী আর পাগল এক নয়।

স্বব দুটোর একটা আইভির বটে।

আইভির চেষ্টাব বিবাম ছিল না। একদিন সে আমাকে নিয়ে নিচে নামল। আমার পরনে ডম অ্যান্টনিওর জাহাজি পোশাক, এমন কি তার জুতো। (যা একটু বড় হচ্ছে কিন্তু ইলাস্টিসাইজড বলে খুলছে না।) সুন্দর সাজপোশাক আইভির। এখন সে পায়ে নিচু হিলের জুতো পরছে, কিন্তু পিছন দিকের কাফমাসল হাইহিলেব জুতো পরতে অভ্যস্ত হলেই তেমন হয়। মুখের উপরে হাল্কা কালো ভেইল, যেন নিজের পবিচয জানতে দিতে চায না। প্রায রোজ বিকেলেই সে আমাকে নিয়ে বেড়াতে শুরু করল।

এদিকে টপোগ্রাফিটা একটু নতুন ধরনের, অন্তত খামাবের কাছে। চারিদিকের মাটি থেকে উঁচু উঁচু ছোট বড় কয়েকটি কাছিম-পিঠের মতো টিলা। তার একটিতে খামারবাড়ির দোতলা ব্লকটা। এরকম কি ভূমিক্ষয়ে হয়েছে? কিংবা মাটির নিচে কি ধ্বংসস্তূপ? বোঝা যায় দিগন্তে নদী, অনুমান হয় যেন এ গ্রামেব চারিদিকেই জল। বন্যার পলিঢাকা মাঠ। এমন কি খামার ভিটের অনেকটা দূর পর্যন্ত পলিতে ঢাকা এখনও। এখনও কিন্তু লোকজন নেই। কৃষকদের তো ফেবার কথা।

একদিন চার্চের পাশ দিয়ে, অর্থাৎ ক্রস-লাগানো সেই দোচালা লম্বা ঘরটার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। খামারের কয়েকশো একর উঁচু নিচু জমিতে কোথাও কোথাও মবা ঘাস। এখানে ওখানে দুএকটা গাছ। নুন লেগে আর সব অনুর্বর। দুএকটি কুটির ছিল যা খামারের শ্রমিকদের, তা বন্যায় নিশ্চিহ্ন। কিন্তু খামারের বাইরে গ্রাম থাকার কথা। সেখানেও বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের কুটিরগুলিতে কেউ যেন ফেরে নি। এদিকে একটা ঝিল আছে দেখছি। ঝিলের উপরে ঝুঁকে পড়া গাছগুলোও অদ্ভুত ধরনের। যেন নুয়ে পড়েছে কষ্টে। ও, মনে হল, ওগুলো উইপিং উইলো। আশ্চর্য এদেশে এই বিদেশি গাছ! অন্তত এটা তো বোটানিক্যাল গার্ডেন নয়। বলবে, চার্চের পাশে ইউক্যালিপটাসটাও তো আছে। ওটার বয়স বেশি নয়। কিন্তু উইপিং উইলোগুলোর অনেক বয়স। দুতিনশো বছর, নাকি তারও বেশি? সেই অতীতেও তা হলে কোন বিদেশি এখানে ছিল যে এই গাছগুলো লাগিয়ে থাকবে।

আইভি বলল—ডম, এবার পুরনো খাতে জল এসে মাটি ভেঙ্গে পুরনো ইট বেরিয়েছে উইলোর ঢিপিটার নিচে।

আমি চমকালুম না, আঁ করলুম না। বললুম—চলো দেখি।

আশ্চর্য লাগল, জলের স্রোত নেই। যেটা মরা ঝিল ছিল তার দুপ্রান্ত খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবারের বন্যায়। স্রোতে মাটি ভেঙেছিল। জলের ঠিক মাঝখানে যেন একটা পুরনো বাড়ির, অনেক পুরনো বাড়ির ভিত, একটা গোল থাম। আমরা দেখতে দেখতে একটা সাপ থামের গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা শুরু করল।

আইভির উদ্দেশ্য কি আমাকে গ্রামের লোকের মুখোমুখি করা? একদিন দুপুরে মনে হল বটে কেউ কেউ চলছে দূরে দূরে। এমন বন্যা হয় না, এমন সর্বস্ব খোয়ানোও হয় না। চাষ দিতে হাল বলদ বীজ লাগে। এখন সরকার ছাড়া গতি নেই। এ গ্রামের জন্য যদি সাহায্য রওনা হয়ে থাকে তা এখনও আসছে না।

এটা তখনকার কথা। এখন তো সরকারের এদিকে মন দেয়ারও সময় নেই। এটা ঠিক ফ্রনটিয়ার নয়, যুদ্ধের সীমান্ত নয়। কিন্তু যেন একটি অদৃশ্য সীমারেখার বাইরে এই ক্ষুদ্র উপদ্বীপটার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল দিয়ে কখনও নিঃশব্দে, কখনও বোধহয় গোলায় ফেটে পড়া যুদ্ধ এগিয়ে পিছিয়ে চলেছে। চিন্তাটাকে অলীক বলতে পারো, যুক্তিসম্মতও বলতে পারো, যে কোন সকালে এই খামারের (উঁচু নিচু জমির খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকা সুবিধা) মাটিতে শেষ যুদ্ধটা লেগে যেতে পারে। হয়তো এখানে ওখানে কাঁটাতারেব ব্যারিকেড তৈরি হবে, এখানে ওখানে ট্রেঞ্চ।

সেদিন বিকেলে দেখলুম আইভি চার্চের সিঁড়িতে বসে উল বুনছে। নেমে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালুম। সিঁড়ি দিযে উঠে চার্চের চারিদিকে বাবান্দা। আইভি আমাকে বাবান্দা দিয়ে চলতে দেখে পাশে উঠে এল। উল বুনতে বুনতে আমার পাশে হাঁটছে সে। বারান্দা এমন যে চার্চের ঘরটার চারপাশে ঘোরা যায়। পিছন দিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট্ট ঘেরের মধ্যে বাগান। বাগানে ফুল গাছ কিছু নেই। কাঠচাঁপাটা হবিণেব শিঙেব মতো দাঁড়িয়ে। কববদুটোব মাথায় ছোট ছোট কালো ক্রস। দোতলা থেকে দেখেছিলুম। আজ মনে হল কেউ যেন কববেব শিয়রের দিকে, অর্থাৎ ক্রসের নিচে খানিকটা পলি সরিয়েছে আর তাতেই লেখাটা পড়া যাবে। কৌশলটা একটা গ্লাসের নিচে সাদা পাথরে লেখা মৃতেব নাম, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। আইভি সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নামল। শুকনো পলির উপর দিযে হেঁটে দুজনে কবরেব কাছে গেলুম।

আর তখন আবার আঘাত পেলুম। দি শক অব মাই লাইফ। কববের ফলকে লেখা : ডম অ্যান্টনিও-বর্ন ১৯৪২ ডায়েড ১৯৭০ মে হিজ সোল রেস্ট ইন পীস।

আইভি আমাব দিকে চোখ তুলে চাইল। আমি কি আবার চোখের জল ফেলব?

আইভি বলল—ডম এসো।

এটাও আইভির শক থেরাপি, আচমকা আঘাত দিযে জট পাকানো মস্তিষ্ক, স্নায়ুকে সবল করার চিকিৎসা? ডম অ্যান্টনিওর সমাধি দেখার পর আর যাই করো তুমি আবার ডম অ্যান্টনিও এই ভান করে চলতে পারো না। পারো কি?

আমি তখন সত্যি সত্যি ভাবতে লাগলুম, কত দূরে না মন চলে গেল। আইভি আমার বাহুতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, সরি, ডম, সরি। আমি দুঃখিত অ্যান্টনি, বিশ্বাস করো।

পরে অবশ্য জেনেছিলুম (তখন আমি ডম অ্যান্টনিওর আইডেনটিটি থেকে বেরিয়ে এসেছি) কবরের ওই মেমোরিয়াল প্লাক কোন-না-কোন ভাবে ক্রিস্টোফার ফার্ডিন্যান্ড ব্রাগাঞ্জার সঙ্গে সংযুক্ত। এবং আইভি তা জানতো। তাতে অবশ্য আইভির মারাত্মক রকমের কিছু হয় না। ওটা হয়তো সেও আবিষ্কার করেছিল। আমাকে ওদিকে যেতে দেখেই ওর মনে হয় রোগীকে আর একটা শক দিয়ে দেখার কথা।

এখন আমাকে এই ছাতার নিচে দেখে এবং ডাক্তারি করতে দেখে যারা অ্যামনেশিয়া সম্বন্ধে

কিছু জানে, তাদের সন্দেহ হতে পারে এখনও আমাব সে রোগটা থাকতে পারে কি না। ডাক্তারি বিদ্যাটা যদি মনে এসে থাকে, তবে যে ডাক্তারি বিদ্যা অর্জন করেছিল তাকে কি ভুলে থাকা যায়?

প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তা তো আছেই। এটাকে কি স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা দেবে? স্বপ্নের মতো হালকা, যে কোন সময়ে টুটে যাবে এমন একটা ঘোর? তা ছাড়া বোটটার কথা চিন্তা করো। বোটটা থেকে আমি যতদূর ভেবেছিলাম নিজেকে, ঠিক ততটা দূরে নই। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যা পরে আবিষ্কার করেছিলুম। আমি যে ভোর রাত থেকে দুপুর অবধি ফুটপ্রিন্ট এড়াতে জলে জলে চলেছিলুম, তাতে বোট থেকে পনের ষোল মাইল দূরে আসার কথা, অথচ বোটটা প্রায় এক মাইলের মধ্যেই। এব একটা সহজ কারণ আছে। নদীর পুবনো খাত, যার একটা শাখা চার্চের পিছন দিকে উইপিং উইলোর নিচে এঁকে বেঁকে এমন এক বৃত্তাংশ রচনা করেছে এই খামার ঘিরে, যে চার্চ থেকে তারই এক চাপ এক মাইলের মধ্যে বোটে পৌঁছায় সোজাসুজি জমির ওপরে চললে। যেন সেকালে কেউ এই খাল কেটেছিল দুর্গরক্ষা করতে। ৭২২ নং মোটর বোটের কি খোঁজ হবে না, হলে কি পুলিস অথবা তারাই, আমার সেই সঙ্গীরা, যারা ক্যাম্প খোলার জায়গা খুঁজতে গিয়ে রাত হলেও ফেরে নি, তারা কি এদিক ওদিক খুঁজলে শুধু ফুটপ্রিন্টের ধোঁকায় (যা আমি অনেক কষ্টে তৈরি করেছিলুম) পড়েই ফিরে যাবে? (এখন বুঝতে পারি, ৭২২ নং কোন এক অ্যাকসিডেন্টে তলিয়ে যাবে এবং তার মালপত্র উধাও হবে, এটা তারা দু-তিন দিন আগেই জানতো যা আমি এবং মোটরম্যান জানতুম না।) সুতরাং যে কোন মুহূর্তে প্রকৃত ব্যাপাব প্রকাশ হওয়ার আতঙ্ক তো আছেই; কিন্তু সেই আতঙ্কই যেন নেশা। দিন কাটছে, ঘণ্টার পব ঘণ্টা, যার যে কোন একটিতে ফুটপ্রিন্টের ধোঁকায় ফিবে যায় নি, এমন কেউ হঠাৎ পিছন থেকে কথা বলতে পাবে। এমন সম্ভাবনা তো আছেই (কিংবা বলা উচিত তখন ছিলই)। যদিও বলতে পারো, দুদিন আগে যারা জেনেছিল, প্রায় বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ওষুধপত্র ইত্যাদি ইত্যাদি নিযে বোটটা ফেঁসে যাবে, তারা যেখানে বোটটা ফাঁসবে জেনেছিল, তাব চাইতে আশি নব্বুই মাইল নিচে চলে এসেছে।

সন্দেহ বা আতঙ্কর কথা যদি বলা হয় তবে সে সন্দেহ বা আতঙ্ক বরং বাড়িয়ে দিয়েছিলুম এক সময়ে। বোটের সেসব ওষুধপত্র ইত্যাদি কি ছাতার নিচে দেখছো না? এমন কি অদ্ভুত ধরনের অপারেশন টেবল পর্যন্ত যা কিনা বোটের ছোট ডেকে পেতে অপারেশনে ব্যবহার করা যেতো প্রয়োজনে? বোটে মালপত্র না থাকাই কি সন্দেহ বাড়ায় না? অবশ্য এরকম এক থিয়োরি খাড়া করা যায়, ফেঁসে যাওয়া বোট থেকে আরোহীবা পালিয়েছে, তারপর অন্য কোন সুযোগসন্ধানী দলেব হাতে সেসব ওষুধপত্র কৌটোর খাবার ইত্যাদি এতদিনে ঢাকায় গিয়ে পৌঁছেছে কিংবা অন্য কোন বড় শহরের কোন গুদামে। স্বভাবতই পুলিস ক্রাইমের ছক চিনে নিয়েছে এবং তারা ধরে নেবে একা একজন এসব সরাতে পাবে না—পারলেও ধারে কাছে থাকবে না। কিংবা এখন এটা এমন এক সময় যে এমন সব ব্যাপার, অর্থাৎ একটা বন্যাত্রাণের মোটরবোট ও তার আরোহীদের কী হল, তা নিয়ে ভাববার সময় কারো নেই।

তা হলেও, প্রতি বিন্দুতেই এরোপ্লেন পড়ে যাবে অথচ পড়ে না, কারণ গতি সেই পতনের বিন্দুকে এড়িয়ে এগিয়ে এগিয়ে যায়, সব সময়েই এরকম একটা আতঙ্ক অথবা অনিশ্চয়তার নেশা থাকেই। বলতে পারা যায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলাব নেশাকে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় নষ্ট করছে, আবার নেশা করে নেয়া হচ্ছে। যেমন সুরত করে থাকে বলে আমার বিশ্বাস। মরফিনের অ্যামপুলগুলোকে প্রায় শেষ করে আনল। এ ক'দিন আমাকে দেখেছে সেগুলোর তদ্বির করতে, যাতে সে সহজেই বুঝেছে খরচটা আমার হিসাবে মিলছে না, তা সত্ত্বেও প্রতিদিন একটা করে ইনজেকশন সে নিজেকে দিয়ে চলেছে। এখন অবশ্যই আমি দেখেও দেখি না। সুরত একা কেন, সুরতের মতো সব হিপিই নিজেকে নেশার ঘোরে হারিয়ে ফেলতে চায় না? না কি তখন সেটা

সাময়িক অ্যামনেশিয়া নয়, ইগো তখনও থাকে?

ওর নাম সুরত আলি কিংবা সুরথকুমার তা জানারও উপায় নেই। চালচলন, কথাবার্তা, তার রেস্টোরেশন নাটক চর্চা, তার ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি এসবই প্রমাণ করে সে বেশ অনেকটা দূর লেখাপড়া করেছে। এবং লেখাপড়া করার উপায় তো ছিলই, বরং সাধারণতঃ অর্থের বিনিময়ে অর্জিত বিদ্যাকে কিছু না বলে মাঝপথে পরিত্যাগ করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল। অথচ এখন কুড়িয়ে আনা মুলোর শাক (কৌটোর সুপ হলে তো রাজসিক হল) সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। গায়ের জামায় আর সেলাই চলে না। নেশামাত্র বলা হবে? মরফিনের জন্যই এত দূরে পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে চলে আসা?

পৃথিবীব শেষ প্রান্ত। দুমাস আগের সেই ঘটনাগুলোকে ছেড়ে দিলে একে কি পৃথিবীর শেষ ছাড়া আর কিছু বলা যায়? চারিদিকে খাল ও নদীর কোথাও শুকনো, কোথাও সজল বেড়ের মধ্যে এই কয়েক বর্গমাইল লোনামাটির মধ্যে এই আমার ছাতা আর ওই ইউক্যালিপটাস গাছটার নিচে, উইপিং উইলোগুলোর সামনে, খামারবাড়িতে পাঁচ কি ছজন মানুষ ছাড়া মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে না। কৃষকরা ফেরেনি যদি বন্যার আগে এখানে কৃষক থেকেও থাকে (নিশ্চয়ই ছিল, ববং বলা উচিত) কারণ—কারণ অদ্ভুতভাবে জলোচ্ছ্বাস সমস্ত মাটির ওপরে নুনের স্তর রেখে গিয়েছে। পুরনো খাতের জল যে লোনা তা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। সাঁকোর নিচের জল, এমন কি উইপিং উইলোগুলোর নিচে ঝিলের জলও লোনা হবে। খামারবাড়িব জল যেখান থেকে খাওয়াব জল সংগ্রহ হয়, সেটাও সুমিষ্ট নয়।

এখানে এসেছে সুবত। যদি সে হিপি হয়, এই অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে হিপি থাকা কি নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু বলা যাবে? অথবা নিজের ইগোব খাঁচা থেকে বেরিয়ে পালানো? ওর নাম পলাতক রাখা যায়।

কিন্তু আমাদের তিন নম্বব পয়েন্ট, আর্জ টু লিব। বাঁচাব অদম্য আকঙ্ক্ষা। এটাকে নানা উদাহরণে প্রমাণ করা যায। যার ফলে সুরতের কাছে শোনা সিসিফাসের মিথের উপপাদ্যকে মিথ বলেই মনে হচ্ছে। এটা হয়তো ঠিকই যে মানুষের যৌবনের উত্তুঙ্গতম কিছু থেকেই মানুষের বার্ধক্য সুরু। কোথায় যেন শুনেছিলুম, এক দার্শনিক সভ্যতাগুলোকে প্যাবাবোলার সঙ্গে তুলনা কবেছে। সব সভ্যতাই যখন, শুধু এথেন্সেব নয়, উত্তুঙ্গ বিন্দুতে শান্তি ও সৃষ্টিতে নিমগ্ন তখনই তার অধঃপাত শুরু। তাতে প্রমাণ হয় না, মানুষ শান্তি ও সৃষ্টিব দিকে অগ্রসর হতে চাইবে না অথবা যৌবন পার হলেই প্রায়োপবেশনে প্রাণ দেবে। না, আত্মহত্যার কথা সেই লেখকও নাকি বলেনি। এত যুক্তি আত্মহত্যার তবু তা নয় কেন? শোকে দুঃখে কাতর, যুদ্ধে ভীবণভাবে আহত, অ্যাকসিডেন্টে ভয়ঙ্কর রকমে আহত, সবাই বাঁচতে চায়এটা অন্তত ডাক্তার হিসেবে জানি। ধরো ডম অ্যামব্রোসিওর কথা। ওকে জিজ্ঞাসা করলে, অনুমান করি, ও বলবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাও ঈশ্বরকে সেবা করা। এটা হয়তো ওর অনুভূতির দিক দিযেও সত্য কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বায়োলজির দিক দিয়ে ওটা বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই।

কিন্তু এহো বাহ্য। এক্ষেত্রে বাঁচা বলতে শুধু নিঃশ্বাস নয়, খাওয়া এবং তা হজম করা নয়, কিংবা তার চাইতে আর একটু এগিযে পেটের খিদে মিটলেই যা আসে তিন অক্ষরের সে আর এক ক্ষুধাও নয়। পুরোপুরি ভাবে যখন একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব (পার্সোন্যালিটি) ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, পরিচয় (আইডেনটিটি) বলতে কিছু নেই, তখনও সে বাঁচতে অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, আমি বাঁচা বলতে সক্রিয় হৃদয় ও মস্তিষ্ক নিয়ে নতুন আইডেনটিটি গড়ে তোলার কথা বলতে চাই। দুর্গেশনন্দিনী নামক উপন্যাসে পড়েছো, বিমলা স্বামীহন্তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। অর্থাৎ তার

পুরনো ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্বে সে আত্মগোপন করেও বীরেন্দ্র সিংহের স্ত্রী, সেই স্বামীহন্তার বুকে প্রতিশোধ বিঁধিয়ে দিয়ে প্রমাণ করল, সে এমন আঘাত পায় নি যাতে তার ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই অন্য উদাহরণ নাও। গল্পের দেবলা দেবী। সে নাকি মায়ের শয্যাতেও আশ্রয় নিয়েছিল। কিংবা তার চাইতে ইতিহাস ভালো। নূরজাহাঁ। বর্ধমান থেকে দিল্লী। জাহাঙ্গীরের শয্যায় স্বামীহন্তা কর্তৃক ধর্ষিতা (ভাবি হচ্ছে কথাটা) মেহেরের মনে কি স্বামীর রক্তাক্ত দেহ ভেসে ভেসে উঠতো না? সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য কি তার, মেহেরের দেহমন, মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখতো না? সে ধর্ষণ-শয্যায় মুহ্যমানার ব্যক্তিত্বের মৃত্যুই ঘটেছিল। নিজেকে, এতদিন পর্যন্ত যাকে সে নিজ ভাবতো, তার একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু তারপর একদিন (ভালোবাসার কথা রমণীর চরিত্র না জানলে বলা যাবে না, আর তা জানা তো দেবতার অসাধ্য) জাহাঙ্গীরের পাশে আর একজনকে দেখা গেল। মেহের থেকে নূরজাঁহা। তীক্ষ্ণধী মস্তিষ্কের কথা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত আবেগের হৃদয় নিয়ে সেই নতুন জীবন, যাকে নূরজাঁহা বলা হয়, কী অদম্য আগ্রহ নিয়ে বেঁচেছে! অর্থাৎ আইডেনটিটি হারিয়ে ফেললেও মস্তিষ্ক বা হৃদয় ব্যবহার করা বন্ধ হয় না। অত দূরেই বা কেন? ভৈরবের সেই মৌলানার নতুন বিবির নামও নাকি নূরজাঁহা বেগম রাখা হয়েছিল। এটা রসিকতা কিংবা প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত রেওয়াজের সঙ্গে নিজের জীবনের ঘটনাকে যুক্ত করা, তা বলা কঠিন, কিন্তু ভৈরবের সেই অধ্যাপকের স্ত্রী বেঁচে ছিল বলেই শেষবারে জানা গিয়েছে। তার নাকি একটি কন্যাসন্তানও আছে যে হযতো, হয়তো বা, মৌলানা খালেদুদ্দিন চৌধুরীর ঔরসজাত না। সুতবাং সুরত নিজেকে ভুলতে প্রতিদিন মর্ফিয়া নিলেও, নিজের আইডেনটিটিকে হারিয়ে ফেলতে পৃথিবীর এই প্রান্তে হেঁটে এলেও, তার গরম চা ভালো লাগবে। যেমন আমি ডাক্তারি করি, খাই, ঘুমাই, হাসি, চিন্তা কবি।

কিন্তু সুরত বেচারাব জ্বর আজ খুবই বেশি। হাঁপাচ্ছে। আর ওটা যদি ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসও হয় নিজেব চিকিৎসা নিজেকে করতে দেয়া আব চলে না। বুঝতে পাবছি কযেকদিন থেকে স্ট্রেপটোপেনিসিলিন নিচ্ছে। গযাবে রক্ত কিংবা পুঁজ আসছে বোধ হয। আর নেগলেক্ট করতে দেযা যায না।

সুরতের কথা

আমি এখন কৃতনিশ্চয় যে যাকে কবিদেব হাইসিযারিযাসনেস বলা হয তা অনেকাংশেই ছেঁদো কথা। কবিতায় যদি উইটের ব্যবহার হয় তা হলে তাকে কৃত্রিম বলে মনে হতে পাবে, কিন্তু একটু ভালো করে দেখলেই দেখা যাবে আবেগটা কৃত্রিম নয়।

যেমন ধরো নিজেকে হারিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা, নিজের পুরনো পরিচয় থেকে মুক্তি। মানুষ, স্কুলের সেই ছোটবেলা থেকে ক্রমশ, এটা আমার, এটা আমার, বলে নিজের চারিদিকে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা ভালোবাসা, আকর্ষণ, অভ্যাস এবং অভ্যস্ততা, প্রতিবেশীর সঙ্গে নৈকট্য ও দূরত্ব সংগ্রহ করতে থাকে। দীর্ঘদিনের সঞ্চয়। আর তা সব এমন যে সেগুলি গেলে সে নিজেও থাকে না। অথচ সেসব ফেলে সে নিজেই একদিন হাঁটতে সুরু করে, যেন সে নিজের পদচিহ্নও মুছে দিয়ে যেতে চায। সেই যে এক প্রবাদ আছে, সিংহ তার গিরিগুহায় আত্মগোপন করার আগে লেজ দিযে পায়ের ছাপ মুছতে মুছতে এগিয়ে যায়। এসব শুনে মনে হতে পারে, পুরনো ব্যক্তিত্ব ফেলে পালানোর অত্যন্ত সিয়ারিয়াস ব্যাপারটায় (গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, সেকালের মানুষরা গৃহত্যাগ করে যে সন্ন্যাস নিতো মায়া-মমতার বাঁধন কেটে, তাব চাইতে কম নয়) তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বপরিকল্পনা

থাকে; যথা, কোথায় যাওয়া যাবে, কী ভাবে যাওয়া যাবে ইত্যাদি। কিন্তু সন্ন্যাস নেয়ার সঙ্গে পার্থক্য এই : সন্ন্যাস নিয়ে গৃহের নাম-ধাম-পরিচয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় বটে, কিন্তু নতুন করে আর এক নাম নেয় সেই পুরনো ব্যক্তিত্বই; এক্ষেত্রে গৃহের নাম-ধাম-পরিচয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পর নতুন কোন পরিকল্পনায় আর যুক্ত করা হয় না নিজেকে। প্রতিদিনই প্রতি ঘণ্টায় যেন স্মৃতির চিহ্ন মুছে মুছে বেঁচে চলা। আর এই গৃহত্যাগটাও যেন একটা আচমকা ব্যাপার। ডিমের মধ্যে ধাপের পর ধাপ পাখি হয়ে উঠে একদিন ডিম ফেটে বেরিয়ে আসা নয়। যেন এক অসম্ভব উপায়ে যে ডিমটাকে অমলেট ভাজতে নেয়া হচ্ছে, হাত থেকে পড়ে তা থেকে একটা চড়ুই পাখি ফুরুৎ করে উড়ে রান্নাঘরের টেবলে, টেবল থেকে জানালায়, জানলা থেকে আকাশে, তারপর দিগন্তেরও বাইরে। একটা অবিবেচনা আর লঘুতাই যেন, যেন সময়ের চলমান স্রোতে একটা তরঙ্গ, যে কোন একটা ঢেউ দেখেই সামনে পিছনে না তাকিয়ে ভেসে পড়া। কতকটা যেন ভাঁড়ামির মতো লঘুতা, যেন পালাতে পারি দেখো কেমন, এই কৌশল দেখানোর ছেলেমানুষী ভাব। মনে করো, (তার চাইতে সঠিক আর কী বলতে পারা যাবে) কারো মোটর বোট ফেঁসে গেল আর সে সেই সেই সুযোগ নিল পালানোর, একবারে নিজের কাছে থেকেই।

এটা আমার নিছক কল্পনাই হতে পারে। মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা অবশ্য একদিন বলেছে, আংশিক স্মৃতিভ্রংশ। সেটা হয়তো ঠিকই যে অ্যানাসিন ডাক্তার এখনও মাঝে মাঝে নিজেকে ডম অ্যান্টনিও মনে করে। কিন্তু যদি আমার কল্পনাটা সত্য হয়? বোটের কাছে গেলে তোমার মনে হবে, সঙ্গীরা যে সময়ে হয়তো কী করা উচিত এই নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তখন তাদেরই একজন হারিয়ে গেল। তারা হয়তো ভাবল, রাত্রির অন্ধকারে ভাঁটার টানে ভেসে গিয়েছে। এখন এই অনুমান যদি সত্য হয়, তা হলে মুহূর্তের ঝোঁকে এই যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, এর মধ্যে একটা লঘুচিত্ততাই আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়বে। অন্যদিকে ভাবো সে ভিতরে ভিতরে হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারে কতখানি প্রস্তুত হয়েছিল এই আত্মবিসর্জনে। কী সিয়ারিয়াসনেস অথচ কী যেন এক অব্যবস্থিতচিত্ততা।

নিজেকে হারিয়ে ফেলাই বৈ কি? চিঠি আসে না, যায় না। এই ঘুমের উপত্যকায় (স্লিপিং হলো নাম দেয়া যায় না কি?) যার উপরে ডার্কেস্ট স্মোক অব হেল (নরকের কৃষ্ণতম ধোঁয়া—অনুবাদ হতে পারে), এবং নিচে লোনা ধরা মাটির ক্যাকটাসল্যান্ড (যদিও এখানে ফণী মনসা চোখে পড়ে না কিন্তু তেমন উষর)। সেখানে কোন মানুষ অথবা রোগী নেই (গড়ে সপ্তাহে দুটো কেস), তবু সাদা একটা ছাতার তলে এক মোবাইল হসপিট্যালকে শিকড় গজাতে দিয়ে বসে। যে কোন দিন যে কেউ এসে প্রশ্ন করতে পারে, উত্তরে অ্যামনেশিয়ার কথা অবিশ্বাস করতে পারে; তারপর সেই নির্বোধ-নির্বোধ সিলি ব্যাপারটা ঘটবে যা একটা সার্ভিস পিস্তলের গুলি, ওরকম একটা সম্ভাবনা অন্তত এই ক্যাকটাসল্যাণ্ডে বেমানান হবে না। ওই ইউক্যালিপটাস গাছটাকে যদি প্রিকলি পেয়ার মনে করো তবে আমরা ওকে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছি। ওই খামারবাড়ির ওরা—প্রৌঢ় অ্যামব্রোসিও, মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা, অ্যানাসিন ডাক্তার, আমি এবং ক্রিস্টোফার এবং ডম অ্যান্টনিও। ডম অ্যান্টনিও বটে, তার পে-বুক এবং পাসপোর্টের এবং হয়তো সমাধি ফলকের সাহায্যে সে তো যে কোন সময়ে যে কোন চরিত্র বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে। মুখোস নাচ বলবে? হয়তো কারো কারো মুখে মুখোস আছে। কিন্তু সব মুখই অনুজ্জ্বল। এত অনুজ্জ্বল যে অপ্রেমও বোঝা যায় না। অথচ পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে যাকে বলে থ্রোন ইনটু ইচ আদার্স কোম্পানি, অর্থাৎ যেন পরস্পরের সংস্রবে কেন্দ্রাভিমুখী গতিতে গড়িয়ে আসা।

(যেমন সেদিন মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা এসেছিল বেজিক খেলার পার্টনার হতে আমাকে ডাকতে। বলল, শিখিয়ে দেবো। তুমি তো বালক। কত কিছুই জানো না। আমার পার্টনার হলে তোমাকে অনেক

কিছুই শিখিয়ে নিতে পারবো।)

ভাবছিলুম, কিন্তু, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে লঘুচিত্ততার কথা। যেমন নাকি কোন কোন কবিতায় লঘুচিত্ততার সুর লাগে যদিও অত্যন্ত অকৃত্রিম গভীর আবেগকেই প্রকাশ করে তা। মনে করো সেই কবিতাটা—একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে, সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে—গান হল তরী, ভাসল তা চোখের জলে, তা বাইতেও নেয়ে এল। মনে হয় না, কবি যেন পরস্পর আসঙ্গহীন বিষয়গুলোকে উইটের সাহায্যে জোর-জবরদস্তি করে মল্লবীরের উপযুক্ত কাজ করছেন? উদ্ভট। এবং একে কি ম্যাথু আর্নল্ড কবিতা বলতেন? হয়তো কোন রবীন্দ্রশিষ্য এ ভাবটা হাতের কাছে পেলে, এই নিঃসঙ্গ বেদনাকে, মরমী ভাষায় আমি একা, আমার গানের সুব, আমার কান্না, তুমি এসো ওগো দয়িত—এমন কিছু লিখতেন। কিন্তু এই কবি সে নয়। কিন্তু তাব ফলে আমরা কি এমন একটা ড্রামা পেলাম না যেখানে কবির আবেগ যত নতুন ঠিক ততই অকৃত্রিম?

যেন এ আবেগটা এভাবে ছাড়া অন্যভাবে বলা যেতো না।

অবশ্য এর চাইতে ভালো উদাহরণ আছে। আর একথা এখন দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে শেলীর চাইতে বরং ডান আমার ভালো লাগছে।

কিন্তু যদিও বলা যায় ইউক্যালিপটাসের চাবিদিকে এই যে আমাদের মেরি গো রাউন্ড তাতে কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না, তা হলেও ইংবেজি কবিতাগুলো ফুটপ্রিন্ট হয়ে থাকছে যা আমি ইতস্তত ফেলছি। হ্যাঁ, অপরাধ বিজ্ঞানের সেই পদচিহ্ন—এখানে ওখানে আমার উদ্ধৃত কবিতাব টুকরোগুলি হারিযে যাওযা কাউকে অনুসরণ কবে চলেছে। এই তো সেদিন অ্যামব্রোসিওর কাছে এক অদ্ভুত কাণ্ড কবে বসলুম। (আব অ্যানাসিন ডাক্তারেব কাছে রেস্টোবেশন ড্রামা নিযে আলাপ করাব কথাও ভাবো—অনায়াসে আমাদের দেশেব যাত্রা থেকে উদাহবণ দিয়ে বিষয়টাকে বোঝানো যেত।) আমব্রোসিও তার চার্চের বারান্দায় সিঁড়ির উপরে পা রেখে বসেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে যেন আমাদেব এই নবকের মৌসুমী নাচে সব চাইতে একা এবং স্থির ভঙ্গিতে নাচছে এবং একবকমের ব্যালান্সও রাখছে। ব্যালান্স হুইল একা একা ঘুরপাক খেয়ে গোটা মেশিনটার ছন্দ যেমন ঠিক বাখে? আমাব উদ্দেশ্য ছিল তার ডোনেশন চেস্ট থেকে যদি আমাকে দিতে পারে এমন একটা জামা-পাযজামা জোগাড় হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসেছিলাম।

হঠাৎ হপকিনসের সেই অত্যন্ত পরিচিত কবিতাটাই মনে এল। (কারণ বোধ হয় এই যে তখন ভাবছিলাম অ্যামব্রোসিও চারিদিকেব লোনা মাটি দেখে হতাশ, এবং ওকে মনে করিযে দিলে হয়—বর্ষায়, প্রচুর বর্ষা হলে নুন ধুয়ে যাবে, তেমনি যদি বন্যা হয় বর্ষায় খালগুলোর উৎসে জলের নুনও হয়তো কমবে, আর তখন আবার চাষ হবে।) কিন্তু কৌতুক (এখন তাই মনে হচ্ছে না?) দেখো, হপকিনসের কবিতাটা আবৃত্তি করলাম। বোঝা যাচ্ছে অ্যামব্রোসিও কিছু বোঝে ইংরেজি। দু-একবার দু-এক জায়গা নতুন করে শুনতে চাইল, অর্থ করতে বলল, নতুন করে আবার ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে অনুরোধ করল। আবৃত্তি করলাম। কেউ কেউ পঞ্চাশের কাছে গিয়ে, শরীরের কাঠামো যতই দোহারা রকমে মজবুত হোক, বৃদ্ধ হয়ে যায়, কিংবা কথাটা হয়তো প্রবীণ। আবৃত্তি শেষ হলে স্বগতোক্তিব মতো বলল, টাইমস ইউনাক, সময়ের নপুংসক। যেন কিছুটা প্রশ্নও বটে? মাথা ঝাঁকাল সে, যেন কথাটা বুঝতে পেরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে, প্রায় এক মিনিট তো বটেই, বলল আবার—যেন আমি সেখানে নেই, ও, অ্যামব্রোসিও কি নিজেকে টাইমস ইউনাক মনে করল? সে কি নিজেকে বলেছে এর আগে কোন দিন—পাখিরা বাসা বোনে কিন্তু নট আই বিলড। কিন্তু এসব ভালো হচ্ছে না। ফুটপ্রিন্টই বলা উচিত যদিও এটা ফ্রাইডের (অ্যানাসিনের কাছে এ তুলনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ) পদচিহ্নের মতো যার চারিদিকে সমুদ্র। এবং ফুটপ্রিন্ট অনুসরণ করে বারবার সমুদ্রের তীর পর্যন্তই যাওয়া যায় এবং বাইরের সঙ্গে সংযোগ পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমার অ্যানাসিন সাহেব তো ওগুলো মুলোর শাক নিয়ে ফিরল। আশ্চর্য, পেল কোথায়? খামার বাড়ির কোথাও কি গাছ লাগিয়েছে? বরং এটা হয়তো ঠিক, নুন পলির উপরে যেখানে বড় ঘাসও গজাচ্ছে না, মরা-মরা হলুদ রঙের দূর্বার চাপড়া কোথাও কোথাও বড় জোব, সেখানে আগেকার বছরের কোন মুলো গাছ আকস্মিক সুযোগ পেয়ে শুকনো-শুকনো সবুজ, কিন্তু মরা-মরা পাতা মেলেছে। খামার-বাড়িতে চার্চের পিছনে কবরের বাগানটায় অ্যামব্রোসিও মাঝে মাঝে খুরপি চালায় বটে। আকস্মিক সুযোগের থিয়োরি না মানলে বলতে হয়, খাবার জন্য এই মুলোর শাক কবরের বাগান থেকে এল।

অ্যানাসিন হাসিমুখে মাথা দোলাচ্ছে। কিছু ভাবছে যা বলবে না। এটা আমাদের মেরি গো রাউন্ডের এক শর্ত: আস্‌ক মি নো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ উইল বি টোল্ড নো লাইস। মুলোর শাক বেখে সে চায়েব কেটলির দিকে যাচ্ছে। হুঁ, এটা সেই মেহের-নূরজাঁহাব গল্প। তাব পরেও সেই পুরনো জীবনের শিকড় ছিঁড়ে গেলেও, তুমি বাঁচা বন্ধ কবতে পাবো না, মস্তিষ্ক ও হৃদয় ব্যবহার করা থেকে বিরত হতে পারো না। যদি বা সব ফুটপ্রিন্ট মুছেও দিতে চাও, অথবা বলপ্রয়োগে কেউ মুছেও দেয়, সতর্কতার খাতিরে মোটরবোট (যে থিয়োরি আমার অনুমান মাত্রই হতে পাবে) ও হপকিনসের কবিতা থেকে যতই দূবে থাকো।

কিন্তু আজ জ্বরটা খুব বেশি। কী যে হল? এতে কি সত্যি কিছু যায় আসে? এটা কি শেষে এমন হতে পারে, মধ্যরাত্রির বুকে নিস্পন্দ হয়ে যাওয়া বিনা বেদনায়?

সুরতের আরও কথা

আবার কবিতার কথাই মনে আসছে। উইটি হলেই কবিতা সার্থক হয় না। মনে কবা যাক কবিতায় একই শব্দ অথবা প্রায় সম-উচ্চারণের শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কবা। কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যপ্ত চবাচর/যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকব। বেশ কৌশলেই বলা হয়েছে। এমন কি, ঈশ্বর ইত্যাদিব উমদা কথাও আছে। কিন্তু তুলনা কবো

Sweare by Thyself that at my death Thy Sun
Shall shine as it shines now, and heretofore ,
And, having done that, Thou hast done
I have no more

এখানেও দেখো প্রথম লাইনের শেষে সান এবং তৃতীয় লাইনের ডান শব্দ দুটোব উপরে খেলা কবা হয়েছে। তোমার পুত্র ক্রাইস্ট আর তোমার সূর্য এই অর্থ দুটিতে সান শব্দের উচ্চারণ নিয়ে খেলা। ডান নিয়ে খেলাটা আবও চমকপ্রদ: এক অর্থে তোমার কাজ শেষ হল, অন্য অর্থে তুমি কবি ডানকে গ্রহণ করেছো। শব্দ নিয়ে যেন লঘু ভঙ্গিতে খেলাই, কিন্তু পরে মনে হয় (যদি কারো ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে যা কবি ডানেব ছিল) এর চাইতে কোন উত্তুঙ্গ/গভীর কথা দিয়ে প্রার্থনা শেষ করা যায় না।

তা বলে হপকিনসেব পবে ডান নিয়ে আব অ্যামব্রোসিওর কাছে যাচ্ছি না। রির্টান ভিজিট দিতে হবে। অ্যানাসিন বলেছে এক কৌটো শুকনো মাছ নিয়ে যেতে; যদিও সে যোগ করেছে, আমি ঠিক জানি না, এই সব কৌটোর খাদ্য আমাদের নিজেদের ব্যবহার কবা নীতিসঙ্গত কি না। (এখন ডক্টর অ্যানাসিনের এই ছাতার তলে বটে কিন্তু আসলে তো বন্যাত্রাণের মোটর বোট থেকে এসেছে।) অ্যামব্রোসিও খালি হাতে আসে নি। আমার জন্য জামা/পায়জামা নিয়ে এসেছিল। মথবলের গন্ধ। মনে হয় তার নিজেরই। কলারটা কেটে ছোট করেছে, হয়তো বা ওর সঙ্গে কোন

কারুকার্য ছিল। সাদা কাপড়ের সারপ্লিস বলে মনে হচ্ছে। বললে—কিছু মনে করো না, বন্ধু, একটু পুরনো। তোমার নাইট গাউনের কাজ দেবে। তোমার নিজের জামা-কাপড না-আসা পর্যন্ত কাজ দেবে।

ও যে কি করে চট করে অথচ কোন চেষ্টা না করেই বন্ধু শব্দটাকে উচ্চাবণ করে, তা বোঝা কঠিন। সারপ্লিসটা পরেছি। আর অ্যানাসিন তা দেখে বলে ফেলল।— আহ্, তোমাকে সেন্টের মতো দেখায়। এবং কৌতুকের এই যে আমরা এখনও এই অবাস্তব পৃথিবীতে কিংবা পরিচিত পৃথিবীর শেষ সীমান্তে এমন ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে হাসতে পারি। ডাক্তাবের ভিটামিনের জন্য মু্লাব শাক খোঁজার কথাও অন্য এক উদাহবণ এ বিষয়ে। কিংবা কাল সন্ধ্যা হয় বিকেল যায় নি এমন সময়ে, যেন কালো সিল্কের সুইশ শব্দ তুলে মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা এসেছিল আমাদের সাদা ছাতার আস্তানায়। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। বললে নিজের বাঁ বাহু দেখিয়ে—ডম, দেখো এটা কী বিশ্রী ফোড়াব মতো দেখাচ্ছে। কী হবে বলো তো? কেটে দেবে? অ্যানাসিন হাতটা দেখল দুহাতে তুলে। বলল, চেঁচাবে না তো, আইভি?

তা একটু, হাসল আইভি।

ডক্টর অ্যানাসিন, বসো, বলে উঠল। আলো জ্বালল না। তুলো, স্টিকিং প্ল্যাস্টার, একটা বেসিনে কী একটা লোশন, কী কী ওষুধেব গুঁড়ো যোগাড করল। ল্যানসেটটাকে আগাগোড়া স্পিবিটে মুছল। স্টেরিলাইজ কবাব সময় কোথায়?

দুমিনিটেব অপাবেশন। ফোড়ার মুখটা ছাড়িয়ে দিয়ে অ্যান্টিসেপটিক ছিটিযে স্টিকিং প্ল্যাস্টাবেব পটি এঁটে দেয়া।

অ্যানাসিন কিছু বলার আগে মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা বলল, ধন্যবাদ ডম।

নট অ্যাট অল, আইভি। তোমাকে কি একটু এগিয়ে দেবো?

বাপার। বরং চলো একটু বেড়াই।

অ্যানাসিন আব আইভি দুজনে আমাদেব ছাতার আস্তানা থেকে বেড়াতে বেরুল।

এটা বেশ কৌতুকেব যেন মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জাকে লতিকা বলে ডাকতে শুনেছি। অন্য আব একবার মনে হল, তাকে লিজা বলেই কেউ চুপ করে গেল, সামনে আমাদেব মতো কেউ কেউ থাকায়। অ্যানাসিন যে ডম অ্যান্টনিও নামে পরিচিত তা আগেই আমি আন্দাজ করেছি।

কিন্তু আসল কৌতুক-খেলা অন্যত্র। এ ফোড়ায় হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে শুধু ফোমেন্ট করলেই চলে। দ্বিতীয়ত মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জাব লিভিং রুমে ঘুবে যে পরিমাণে ডাক্তারি যন্ত্রপাতির সমাবেশ দেখেছি তাতে এ সামান্য ব্যাপারটার জন্য এখানে না এলেও চলতো। আসলে এই আসাটা, একজন আর একজনের কাছে যাওয়া, যেমন ব্রাগাঞ্জার সারপ্লিস-পায়জামার মধ্যে এক প্যাকেট টাটকা মাখন লুকিয়ে রেখে উপহার দেয়া, এসবই আমাদের এই গোল হয়ে হয়ে নাচাব অঙ্গ। যেমন অ্যানাসিন এবং মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জার বেড়াতে যাওয়া এখন। বেড়ানো না কাকে বলবে? বড় জোর খালের প্রান্ত পর্যন্ত, উঁচু-নিচু পলি-ঢাকা জমির উপর দিয়ে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কিন্তু এখানে ওখানে দু এক জাতের শুকনো শুকনো উদ্ভিদ তা প্রায় একহাত মতো বড়ো হয়েছে কোথাও কোথাও। এখন শুকনো চলছে। এবং নুন বরং বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে গিলে নিয়েছে। পাটকিলে রঙের ঢেউ খেলানো জমি। দুপুরের আলোয় চিকচিক করে যা তা অভ্র নয়, নুনের চাপডাই হবে হয়তো। খালের ধারেই তবু কিছু পুরনো গাছ পলিমাটির সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে সবুজ পাতা বার করার চেষ্টায় আছে।

শুধু সারপ্লিস পরা দেখে রসিকতা নয়। কৌটোর স্যামন গরম কবে তাতে মাখন দিয়ে অ্যানাসিন বললে, বাহ্ বেশ লাগছে তো খেতে। মাখনটা খুব পুরনো নয়।

যেন গরম মাখনে সুরভিত সে মুহূর্তটাকে আমরা গুণগ্রাহীর মতো উপভোগ করলাম।

বলছিলাম, উইট থাকলেই কবিতা না হতে পারে, অন্তত একটু নিচু জাতের পদ্যমাত্র হয়ে যেতে পারে তা। মনে করা যাক, কেউ যদি চড়া সুরে দেশাত্মপ্রেম নিয়ে পদ্যর মতো ব্যবহার করে, আমাদের মধ্যে কেউ।

এমন নয় যে আমাদের অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীপ্রান্তের পাঁচ-ছজনের কোন চালচলনের ছক বাঁধা আছে। বরং আমরা একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাচলেও প্রত্যেকেই যেন স্টেপগুলোকে ইম্প্রোভাইজ করবার স্বাধীনতা রাখি। এখানে কি নীতিকথা বলা যায়? বরং যেন যা করে চলেছি আমরা, সেগুলো দেখে যদি কেউ সাধারণ সূত্র হিসাবে কিছু আবিষ্কার করতে পারে, তবে তাকেই আমাদের হারিয়ে যাওয়া এই পৃথিবীর নীতি বলা যাবে।

এমনও নয় যারা পরস্পরের নৈকট্যে বাধ্য হয়ে থাকছি, প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস করার মতো চিনি। বরং এমন একটা ভাব প্রত্যেকের চাহনিতে আছে, যেন অন্য কেউ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে, প্রতারণা করতে পারে—এমন সম্ভাবনা আছে। আর তখন হয়তো এই নাচের স্টেপ থেকে এক এক করে খসে পড়তে থাকবো। এটাকে রসভঙ্গের হেতু বলে মনে হচ্ছে না। বরং যেন সেটাই ঠিক লাগসই হবে। সেই ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। সন্ধ্যার কিছু পরে হবে! সেই মিস্ট্রেস ব্রাগাঞ্জা ও অ্যানাসিনের সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলে এবং কৌটার স্যামন মাছ গরম করে মাখন দিয়ে খেতে বসার আগে হয়তো একটা পিস্তলের ক্র্যাক শোনা গেল। আর তারপর একটা রঙীন আলোর ফিতেকে আকাশে উঠতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু হল না। দিগন্তে যে আলোর চমকানি ও গোলার গুমগুম শব্দ ভেসে আসছিল সে রাত্রিতে, তার সঙ্গে সেই পিস্তলের শব্দের যোগ নাও থাকতে পারে, কেননা, মাঝে মাঝে দিগন্তের ওপারে আলোর চমকানি ও মৃদু মাটি কাঁপার গুমগুম শব্দ হয়। কিন্তু পিস্তলের সিগন্যালটা, যা নিয়ে উচ্চবাচ্য কেউ করে নি, একটা ঘটনাই।

মুস্কিল হয় যদি হঠাৎ এডগার এলান পোর রহস্যঘন কোন গল্প/কাব্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি নাচ আর নাচ না থাকে।

কিন্তু জ্বরটা কমছে না। কাশিটাও খারাপ থাকছে। শেষ পর্যন্ত অ্যানাসিনের কাছে চিকিৎসার জন্য জামা খুলতে না হয়। সব চাইতে মারাত্মক হবে যদি অ্যানাসিন বলে এটা ঠিক টিউবারকুলার ব্যাপার নয়, গাঁজা মারিউয়ানা খাওয়ার দরুণ ক্রনিক ব্রঙকাইটিসও নয়। ভরসা এই এখানে একস্-রে নেই।

কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার দেখো, কবে নাকি রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে মা বলেছিলাম। অ্যানাসিন যেমন ভাবে বলল, তাতে মনে হল সে আমার ঠ্যাং টানছে। কিন্তু কথাটা সত্যিও হতে পারে।

এখানে বৃষ্টি হোক আর না হোক, এখানকার মাটি থেকে নুন ধুয়ে নাই বা গেল, পৃথিবীর অন্য কোথাও বৃষ্টি হবে। একদিন এমন আসবে যখন এই যে নতুন পেতিবুর্জোয়ারা যারা অন্যনামে আরও নিচের পেতিবুর্জোয়াদের না পাওয়ার ক্ষোভ-বিদ্বেষকে চালিত করে; যারা পুরনো স্লোগান দিয়ে ভোট দিয়ে ভোট নিয়ে নিশ্চিত ছিল, সেই সব পুরনো বুর্জোয়া-পেতিবুর্জোয়াদের তাড়িয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পাওয়া মাত্র প্রমাণ করছে পুরনো বুর্জোয়াদের চাইতে অন্য নামের নতুন বুর্জোয়ারা আরও বেশি নির্দয়ভাবে ক্ষমতা রাখাকেই বিপ্লব বলে, এরাও লোপ পাবে। তারপরও বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে। হয়তো তখন পিতার প্রয়োজন রাষ্ট্র মিটিয়ে দেবে, হয়তো বীজ নিষেকের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতায় কেউ হাত দিতে চাইবে না, হয়তো আজকের তুলনায় তারা নীতিহীন, কিন্তু তখনও বোধ হয় 'মা' এই অনুভূতিটা থাকবে। যার হাত জ্বরে জ্বলা কপালে মুখে শীতল বোধ হবে।

কিংবা এটাকে অন্যদিক দিয়ে দেখো। রসো, ডাক্তার অ্যানাসিন, আজ তোমার ঠাট্টা তোমাকে

ফিরিয়ে দেবো। এটাও কি মেহের বিবি-নূরজাঁহা বেগমের ব্যাপার নয়? অর্থাৎ ফুটপ্রিন্ট মুছে দিয়ে আসা এই ঘুমের উপত্যকায় পৌঁছে কিন্তু মস্তিষ্ক-হৃদয় নিয়ে চললে কিছু গোলমাল হয় না? মেহের বিবি মুছে গিয়ে নূরজাঁহা। নূরজাঁহার উষ্ণস্পর্শের দেহ ছিল, ঘৃণা ও ভালোবাসার আবেগে তাতানো বুক; আর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমারের চোখ কানা করার মতো মস্তিষ্ক ছিল।

এ কথাটা আইভি/লিজাকে দেখে আমার মনে পড়েছে, এটা ঠিকই বটে। কাউকে দেখে কোন কথা মনে হলে কথাটা তার প্রতি যুক্তিসম্মতভাবে প্রযোজ্য, তা নাও হতে পারে। কিন্তু এখানে যেহেতু পুরনো পৃথিবী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন, তখন চিন্তা আর কাজের স্বাধীনতা যাচ্ছে। এটা একটা কুতর্ক হবে না, বরং উইটের কৌশল হবে, যদি বলি সুতরাং, ঘুমের ঘোরে এবং। অথবা শরীরের ভিতরের যন্ত্রণায় কেউ মা বলে যদি, তাতে অন্যায় হবে এমন কোন নীতির বিধানই কি এখানে কোথাও কেউ লিখে দিয়েছে? টাটকা মাখনের স্বাদ, মুলোর শাকের ঝাঁজ, আইভি/লিজার সিগারেটের সুগন্ধ, এসব আমরা এখানেও অনুভব করি, কেমন কিনা?

কিন্তু, এখন আমাকে অ্যামব্রোসিও ব্রাগাঞ্জার কাছে যেতে হবে। শুকনো মাছের একটা ছোট টিন নেবো। আর তার কাছে বসে ডম অ্যান্টনিওর পাণ্ডুলিপি শুনবো। এ আর এক ডম অ্যান্টনিও যার লেখা একখানা কী বই যেন বাংলা ভাষার অ্যাডভানসড ছাত্ররা উল্লেখ করে।

ডাক্তারের জবানবন্দী (২নং)

এখন আনাড়ি লোক ছাড়া কিংবা তেমন লোক যারা পার্টি-ক্যাডারের মতো যা বলবে তাই মেনে নেয়ার মতো গাল (এটা এক মুস্কিল যে বাংলা কথা সব সময়ে খুঁজে পাই না। গাল অর্থাৎ যে ঠকতে প্রবণতা অর্জন করেছে।)—তারা ছাড়া আর কেউ অ্যামনেশিয়া মেনে নেবে?

অন্যদিকে ব্যাপারটা এই যে এখন কি আর সুরত যাকে স্লিপিং হলো বলে, সেই এখানে কিছুতেই কিছু যায় আসে না? চিঠি লিখতে ভুল হলে কাটাকাটি করার মতো। প্রথম যেটা লেখা হয়েছিল অর্থাৎ যেটা ভুল, যেটাকে কাগজের উপরে থাকতে দিতে চাইছি না, তার উপরে কতগুলো কাটাকাটির দাগ দেয়া হল, তখন কিন্তু সেটা একটা নতুন কিছু হল। তারপরে আবার হয়তো আর কতগুলো দাগ টানাটানি হল। তখন প্রথম ডিজাইনটাও থাকল না, প্রথম লেখা উপরে যা ফুটে উঠেছিল। এখন আমি ডাক্তার অ্যানাসিন। সেই ভালো, খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন যা এখানে সজীব হয়ে উঠেছে যেন ম্যাজিকে। সাদা-কালোয় আঁকা, কাগজের মতো পাতলা অবাস্তব কিছু যা কিন্তু মুলোর শাকের ঝাঁজ এবং নতুন মাখনের সুগন্ধ যেন অনুভব করে। সেদিন ছোট আয়না হাতে ধরে পুরনো ডাক্তারি কাঁচি দিয়ে দাড়ি ছাঁটছিলুম। পাশে অবশ্যই অ্যানাসিনের বিজ্ঞাপন ছিল না। সুরতের কী হাসি। বললে—আপনার বিজ্ঞাপনের ছবিটা ঠিক মনে আছে দেখছি।

মোটর বোটটা এত কাছে যে যে কেউ অ্যামনেশিয়া সত্ত্বেও স্বভাবতই তার সঙ্গে আমাকে যুক্ত করতে চাইবে, সেই ৭২২ নং মোটরবোটই যার সুন্দর আমেরিকান পেইন্ট এখনও এই এতদিন পরেও-এখানে ওখানে ফাট ধরলেও, চিড় খেলেও সুন্দর আছে। বাস্তবিক আব্রাম লিঙ্কনের এই জ্ঞাতগোষ্ঠীর এটা একটা অদ্ভুত দক্ষতা যে তাদের মতো রঙের কাজ কেউ যদি আর জানতো! হ্যাঁ, বোটটা আবিষ্কার হওয়ার পরেই, প্রথম সেটা অ্যামব্রোসিও ব্রাগাঞ্জার চোখেই পড়ে থাকবে; খামারের মানুষগুলোর মনে এরকম এক থিয়োরিই দেখা দিতে পারে তখন, ডাক্তার ওই বোটেরই বটে কিন্তু মাথায় আঘাত পেয়ে এখন মনে করতে পারছে না, পরে পারবে। খুব সম্ভবতঃ কয়েক দিন থেকেই এই থিয়োরিটা অ্যামব্রোসিওর মনে তোলপাড় করছিল আমি না জানলেও, কারণ আমি

তো বোটটার অস্তিত্ব জেনেছিলুম পরে।

কিছুক্ষণ আগে সেদিন আইভি লাঞ্চ দিয়ে গিয়েছে। কফি নিয়ে এল সে। বলল হেসে (ইংরেজিতেই বলছে সে)—একটু তাড়াতাড়ি করবে ডম, আমরা একটু দূরে বেড়াতে যাবো। কফি শেষ হওয়ার আগেই সে এক প্রস্থ নতুন পোশাক নিয়ে এল। আর সেটা বোধ হয় মার্চেন্ট নেভির সেরিমোনিআল ড্রেস। এটা হয়তো ডম অ্যান্টনিওর জাহাজের প্রথা ছিল কিংবা সেই শিপিং কম্পানির, যে সেই সেরিমোনিআল ড্রেস, নীল নেভিস্যুট, উৎসবে এমনকি জাহাজের ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার সকলকেই পরতে হতো। এমন কি বারান্দা দেয়া টুপিও যার নীল গায়ে সাদা রিবনে জাহাজের নাম। আইভির চোখদুটো চকচক করছে। এইবার এই পোশাকের সামনে তার রোগী কি, তখনও কি, নিজেকে ডম অ্যান্টনিও মনে করে চলবে? কফির কাপ নামাতে না নামাতে সে হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে রাখল। আমার গায়ের জামা খুলল (এটাও কি ডম অ্যান্টনিওর অভ্যাস ছিল যে আইভি জামা পরিয়ে দিতো? অথবা মাথায়, তখনও তো স্টিকিং প্ল্যাস্টারের চওড়া পটি সেখানে, রোগী আঘাত দিয়ে ফেলে পাছে তাই ডাক্তারি সতর্কতা?) আইভি বলল, আ, আন্ডারপ্যান্ট এত ময়লা! সে আবার আলমারি খুললে এবং ধোপদুরস্ত আন্ডারপ্যান্ট এল। (ডাক্তার সঙ্কোচের চাইতে রোগীর হাইজিনকে বেশি গুরুত্ব দেয়, বিশেষ যে ডাক্তার এতদিন অচৈতন্য একজনকে শুশ্রূষা করেছে।) এখানে কৌতূহলের যা, তা কী পরিমাণে না ডম অ্যান্টনিওর পোশাক সাজানো আছে আলমারিতে! যেন মানুষটা হঠাৎ একদিন উধাও হয়েছে তার সাজানো সংসার থেকে, যে সংসারে দুচার বছরের জন্য ডুবে থাকবে বলে শহর থেকে প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগাড় করে এনেছিল।

আইভি ঘুরে এল একটা হাতে ঝোলানো ছোট ব্যাগ নিয়ে। হেসে বলল—কিছু খাবার নিলুম যদি তোমার খিদে পায় ঘুরতে ঘুরতে। আজ তোমাকে নিয়ে অনেক দূর অনেক দূর ঘুরবো, ডম। যদি আমরা বাড়িতে না ফিরে গাছতলায় রাত কাটাই?

অাঁ?

আইভি ডম অ্যান্টনিওর হাতঘড়ি বাঁধল আমার হাতে।

দুজনে পাশাপাশি বেরিয়ে পড়লুম।

চার্চের পাশ দিয়ে খানিকটা দূর গিয়ে ঠোঁটে হাত রেখে কী যেন ভাবল আইভি। রসো ডম, একটা কথা বলে আসি—এই বলে সে এক দিকে চলে গেল। তখন লক্ষ্য করলুম আজ তার পায়ে উলের সকস এবং নিচু হিলের ফিতে বাঁধা জুতো। যেন বেড়াতে গিয়ে ছোট গাছ-গাছড়ায় ঘষা লেগে পায়ের কোন ক্ষতি না হয়। তাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে এবার উইপিং উইলোগুলোকে ভালো করে দেখতে পেলুম। এমন সার্থক নাম হয় না। পাতা নয় যেন, যেন একটা কান্নায় ভেঙে পড়ার ইমপ্রেশান। আর ভাবো এই এখানে—এ দেশের গাছই তো নয়। বহুদিন আগে তা হলে এ অঞ্চলে বিদেশি গাছ লাগানোর মতো কেউ ছিল। উইপিং উইলোর তলে নিভাঁজ হয়ে ছিল। যেন ক্যামুফ্লাজ। নতুবা প্রথমেই চোখে পড়তে পারতো। (পরে আমার মনে হয়েছিল একদিন, ডম অ্যামব্রোসিওর এটা এক অর্জিত ক্ষমতা যে সে পারিপার্শ্বিকে মিশে যেতে পারে, হয়তো তার স্থিরতাই তার কৌশল।) এবার দেখলুম, খালের জলে, যেখানে অত্যন্ত পুরনো ভাঙা বাড়ির খিলান, (অথবা ওটা কি একটা সেকেলে বহু পুরনো ইটের ব্রিজ?) মাছ ধরছে অ্যাম্ব্রোসিও। পমফ্রেট বোধ হয়, পাশের মাটির উপরে চকচক করছে। কিছু বলল তাকে আইভি। অ্যামব্রোসিও কিছু ভাবল। তারপর হাত লম্বা করে কিছু দেখিয়ে দিল।

পরে বুঝেছিলুম, যেদিকে সে হাত দিয়ে দেখিয়েছিল, অর্থাৎ তার হাতই যেন রাস্তার পাশের সাইনপোস্ট যা দেখে আমরা চলতে শুরু করেছিলুম।

খানিকটা দূরে গিয়ে আইভি বলল, ডম, এটা কী দেখো। এই বলে বেল্ট-সমেত একটা বিদেশি

পিস্তল বার করল। বড় পিস্তল। রসো বলে আমার কোমরে বেঁধে দিল তার বেল্ট।

তারপর হাঁটতে শুরু করলুম।

এখন বুঝতে পারি সেটা ভয়ের কিছু। আমার চোখে কেন, এ অঞ্চলের কারো চোখেই পড়ে নি। আইভি তার দোতলার বারান্দা থেকে দেখে থাকবে আর তা হয়তো দূরবীনে—খুব শক্তিশালী দূরবীনই হয়তো ওর আছে। এটা কি অস্বাভাবিক যে জাহাজী ডাক্তার (জাহাজে শুধু দূরবীন নয়, সেকস্যান্ট প্রভৃতিও ব্যবহার হয়) তার খামারে একটা দূরবীন রাখবে? অন্য দিকে দেখো, এই অবাস্তব দেশে যেখানে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে নেমে অ্যানাসিন একটা ফোডার অপাবেশন কবে দু মিনিটে, অথবা মুলোর শাক ও টাটকা মাখনের গন্ধ উপভোগ করে, সেখানে একটা দূরবীন বা সার্ভিস পিস্তল কেমন করে যেন মানিয়ে যায়।

পাশাপাশি চলছিলুম। তখন আমাদের দেখে যে কারোরই মনে হতে পারতো দুজনে রোজকাব মতো বেড়াতেই বেরিয়েছে।

আইভি, কিছু ভাবছিল বা। আমি অনুভব করলুম এ পর্যন্ত সে আমাকে হাজার বার হয়তো ডম বলেছে, আমি একবারও তাকে কোন নামেই ডাকি নি।

দুপুরের আলো পড়তে শুরু করেছে। কয়েকটা কাদামাখা গাছ, বোধ হয়, হিজল হবে কিংবা কেয়াও হতে পারে, আমবা সেটাকে বেষ্টন করে চললুম। দূর থেকে যেন একটা খাল চোখে পড়ছে। কাব চোখে আগে পড়ল বলা যায় না। দুজনে থমকে দাঁড়ালুম। আগেই বলেছি, আব্রামাইটদেব (আমেবিকানদের ইযাংকি না বলে আব্রামাইট বলাই বোধ হয় উচিত, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং গৃহযুদ্ধই তো এ দোকানদারদের একটা ইতিহাস বলো কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছে) সেলসম্যানশিপের এটা একটা বড় উদাহরণ যে এনামেল পেইন্ট, অর্থাৎ সাধারণভাবে ফিনিশিং তারা খুব ভালো পারে। মনে পড়বে একবার সেই ১৯৬৫'টির পরে কথা উঠেছিল পেটন ট্যাঙ্কের যোগ্যতা যতখানি সেলসম্যানশিপেব বক্তৃতা, ঠিক ততটা বাস্তবের নয়। গাছের ফাঁকে রং, সাদায় লালে স্ট্রাইপ (আব্রামাইটদের জাতীয় পতাকার মোটিফ নাকি?) তারপরে বোটের গলুই চোখে পড়ল। ৭২২ নং বোট, যাকে বলে হাই অ্যান্ড ড্রাই, যেন কেউ এখনই নেমে গিয়েছে বালুতে টেনে তুলে।

আইভি ঠিক সাধারণ নয বোধ হয়। অ্যামনেশিয়ার বোগীকে নিয়ে চলার চাইতেও নিজের বুদ্ধিতে (সে তো ঠিক ডাক্তার নয়) একজন আহত অচৈতন্য মানুষের গায়ে ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করার কথাই মনে হওয়া উচিত। চ্যালেঞ্জ নিতে পারে সে।

কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসল সে, বলল ফিসফিস করে, অ্যান্টনি ডম, লুক, হাউ সে ইউ।

হয়তো আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। শক অব মাই লাইফ। হয়তো হয়তো। আইভি কি ভেবেছিল দূরবীনে যাদের সে দেখেছে (এটা আমার একটা থিয়োরি যে সে দূরবীনে দেখেছিল, যা আমি ছাড়তে চাচ্ছি না) বোটটা তাদেরই?

আইভি আমার দুই কাঁধে হাত রাখল, বলল, ডম, ডম।

আঁ?

বড় গল্পকে কেটে ছোট করে বলা যায়, বোটের চারিদিকে ঘুরে দেখল আইভি (আগেই বলেছি হাই অ্যান্ড ড্রাই, তার চারি দিকে শুকনো সাদা বালি)। পিছনের গলুইয়ের নিচে বেশ কিছু জায়গা জুড়ে প্ল্যাঙ্কগুলো খোলা, তার ভিতরে শুকনো বালি মাটি, প্রপেলার অর্ধেকের বেশি মাটির তলায়। হেডলাইটের একটা ছাতুছাতু। কিন্তু মালপত্র, ক্রেটের পর ক্রেট জিগস পাজলের মতো, তখনও এক পিসে সাজানো। জানে বটে আব্রামাইটরা কি করে প্যাকিং করতে হয়। তখন সে হাসল। বিকেল হয়ে আসছে। সে রকম হাসি মাত্র দুবারই দেখেছি। আজ সন্ধ্যার আগে যেমন হেসেছিল, সেটাকে বাদ দিলে বলতে হয় একবারই দেখেছি।

সন্ধ্যা কেন তখন আজ রাতই হয়েছে। বললুম, রাত প্রায় নটা বাজে।

খামারে ফেরার কথা বলছো ডম?

কিছু বলি নি।

তখন সে হাসল। টর্চের আলোয় আমার হাতের ঘড়ি দেখল। আমি তার হাসি দেখলুম।

সে বললে—তোমার সাদা ছাতার তলে বেশ একটা উজ্জ্বল আলো জ্বালবে। আর আমার হাতের ব্যান্ডেজটা, যদিও তার দরকার নেই, খুলে আবার ঠিক করে দেবে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় তখন বোটটাব সামনে এবার কী হবে? সেদিন আইভি দুয়ে দুয়ে চার করে থাকবে। যেন সে তার বোগীকে শকথেবাপি দেয়ার জন্যই বলল—ডম অ্যান্টনিও ব্রাগাঞ্জা।

বলেছিলুম—হ্যাঁ?

আমাব চোখ কি তখন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল? নিজের চোখের কথা কে বলতে পারে?

আইভি বলল খুব মিষ্টি করে, ডম।

আমি মাথায় হাত রাখলুম যেখানে স্টিকিং প্লাস্টাবেব পটি তখনও।

আইভি আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। কী স্নিগ্ধ তখন তার দৃষ্টি, (কিংবা তা কি রোগীর জন্য ব্যস্ততা?) আমার দু কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল। তার উরুব গড়ন, বুকের গড়ন আমার উরুতে এবং বুকে। সে বলল—চলো ডম, আমরা বোটটায় গিয়ে বসি।

সে রাত প্রকৃতপক্ষে আমাদের বোটের উপবেই কেটেছিল। চাবিদিকে অন্ধকার কিন্তু মাথাব উপর ময়ূর পেখমের মতো আকাশ; শুধু, কোন ময়ূরের পেখমেই, যদি তা সেই ময়ূব সিংহাসনেব ময়ূর না হয়, অত ঔজ্জ্বল্য থাকে না। হীরের মতো একবাশ ঝকঝকে তাবা।

আজ সন্ধ্যায় আকাশে তারা ছিল, কিন্তু তেমন নয় নিশ্চয়ই, কিংবা শুয়ে শুয়ে না দেখলে তারাগুলোকে তেমন বড় দেখা যায় না। আইভি বলল, আকাশটা কি শয়তানের তৈরি, অন্ধকাব পৃথিবীর উপবে তাবা ভবা আকাশ?

কেন?

তুমি যদি ক্রিশ্চিয়ান হতে অ্যানাসিন, তা হলে আদিম পাপের একটা হেতু খুঁজে পেতে।

কিন্তু বলছিলুম তারপর, সেই বোটের আবিষ্কার হওয়ার পব, আব কেউ কি অ্যামনেশিয়ার কথা ভেবেছিল? ভোর হওয়ার আগে দিগন্তে আলোর ঝলকানি আর গোলার শব্দ শুরু হল সেই তো প্রথম।

নিজেকে হারিয়ে ফেলার একটা তুলনা আছে। ওদের দেশে, আব্রামাইটদের দেশে, শীতে পুকুরে কখনও কখনও হালকা বরফ জমে। দেখে কখনও মনে হয় সাদা মার্বেল পাথবের চত্বর। এমন কি যারা জানে শোনে তাদের মনে গ্রীনল্যান্ডের জমাট পুকুর মনে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কখনও কখনও তা এমন যে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ফেটে যাবে, ফুটো হয়ে জল উঠবে। এসব দেশেও এর তুলনা আছে। চুনের বাটিতে জল দিলে সর পড়ে। কাঠি দিলেই বোঝা যায় সেই ভাসা চুনের স্তর কাগজের চাইতে পাতলা, ভঙ্গুর তো বটেই। সব সময়, প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তা, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার সম্ভাবনা—এই নিজেকে হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটার বেশ গোড়ার কথা।

ওদিক থেকে তখন, যাদেরই হয়তো আইভি দেখে থাকবে তার দূরবীনে, তারা এগিয়ে আসছে। মনে হয় যেন দিগন্তে সারিসারি ইউনিফর্ম ক্যামুফ্লাজ সত্ত্বেও চোখে পড়ছে। কী বলা যাবে? ডিং ডং, ডিং ডং; কাবা এগিয়ে পিছিয়ে যুদ্ধ করছে! অর্থাৎ তখন এমন হল যেকোন দিন ওরা এসে এই খামারের আশেপাশে আশ্রয় নিতে পারে। আর তা সুবিধারই হবে কেননা এই উঁচু-নিচু মাটি স্বাভাবিকভাবে কতকটা ট্রেঞ্চের কাজ করে। অর্থাৎ তখন যেকোন মুহূর্তে পিছন থেকে পিঠে ঠাণ্ডা একটা চোং লাগিয়ে বলতে পারে হ্যান্ডস্ আপ। আর তাদের পক্ষে বোটটা আবিষ্কার করাও মোটেও

পরিশ্রমের ব্যাপার হবে না, কারণ এদিকে এলে তারা তো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, ওদের ভাষায় যাকে ফ্যান আউট করা বলে।

তারপর একদিন, (আইভি নিশ্চয় ব্রেকফাস্টের আগেই আমার অনুপস্থিতি ধরতে পেরেছিল) ট্রাউজার্স হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে তুলে বোট থেকে হালকা একটা ক্রেট পিঠে তুলে, বাঁকা হয়ে ঝুঁকে পড়ে হাঁটতে হচ্ছিল, এখন যেখানে আমার ছাতা সেই পর্যন্ত নিয়ে এলুম। পরিশ্রম, এবং জামা কাপড় ময়লা করা ব্যাপার। সেই প্রথম, আর প্রথম দিনে কে বেশি করে?

ঘরে, খামারের দোতলার সেই ঘর ছাড়া আর ঘর কোথায়, এসে বসলে ব্রেকফাস্ট আনল আইভি। আমার ধুলো লাগা জামা, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো ট্রাউজার্স, নখে লাগা মাটি লক্ষ্য করল সে। হয়তো সে কোন জানালায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে আমার সেই প্রথম ক্রেট বয়ে আনা দেখছিল আর অবাক হচ্ছিল। হয়তো সে বুঝতে চেষ্টা করছিল তার ডম অ্যান্টনিও অর্থাৎ অ্যামনেশিয়ার কেসটার এটা কী ডেভেলপমেন্ট।

তখনই, তাকে তখন বারুদের ধোঁয়া ঢাকা আকাশই বলা যায়, সুরত। দিনের পর দিন ক্রেটের পর ক্রেট, নানা মাপের, আনতে পারলুম বোট থেকে। সেগুলো জমা হতে শুরু করল এখন যেখানে আমাদের সাদা ছাতা মেলা, তখন অবশ্য ছাতাটা মেলা হয় নি। সে এমন ব্যাপার, এমন কাপড় চোপড়ের চেহারা, দাড়ি গোঁফ এমন অযত্নে রাখা (তখন অবশ্যই এমন অ্যানাসিন ডাক্তারের মতো কাট ছিল না চিবুক দাড়ির) যে তখন সুরত এলে, ও যা রসিক, হয়তো অ্যানাসিন না বলে আমাকে রবিনসন ক্রুসোই বলতো।

ভাবি কৌতুকের হয়ে উঠল অন্যদিকটাও। তুমি কি, ডম অ্যান্টনিও, ক্রেটগুলোকে নিজের সম্পত্তি বলে চিনতে পারছো? তা পারলে কি তুমি ডম অ্যান্টনিও থেকে যাও? না কি এটা একটা ম্যানিয়ার মতো ব্যাপার যা তোমার এই অ্যামনেশিয়ার অবস্থায় দেখা দিয়েছে? মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তা অসম্ভব নাও হতে পারে কারণ মানুষের স্মৃতি আর মানুষের সংগ্রহপ্রবৃত্তি পরস্পর সংযুক্ত নাও হতে পারে।

তখন কিছুদিন আইভি হাত ধুইয়ে দিতো, জামা পালটে দিতো, ক্রেট বওয়ার কাজ শেষ করে ব্রেকফাস্টে বসতে গেলে। একদিন তাকে তো বললুমই, ওআর্ক স্যুট দাও। ওআর্ক স্যুট? সাধারণত ছেঁড়া ময়লা যে ট্রাউজার্স আর শার্ট পরে আমি রবিনসন ক্রুসো হই। একটা পরিবর্তন তখন, তখনকার মতো সেটাই, দেখা দিল; শরীরে শক্তি হয়েছে রোগীর নতুবা ওই ক্রেটগুলো কি করে একবারে না হোক দু বারের চেষ্টায় এতদূরে আনছে? কাজেই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ট্রেতে করে না এনে আইভি পাশের একটা ঘরে টেবলে দিতে সুরু করল। এবং নিজেও টেবলে বসতে লাগল।

তারপর কীট থেকে গুটি, গুটি থেকে মথের মতো (না প্রকৃতপক্ষে এ তুলনাটা যার সম্বন্ধে দিতে চাইছিলুম সে আইভি) এখন আমি, অ্যানাসিন। অনিশ্চয়তাই বৈকি। প্রকৃতপক্ষে এই যে ছাতা অর্থাৎ পনেরো ফুট ব্যাসের তাবু একটা, যা একটা ক্রেট ভাঙতে (অন্যগুলোতে যেমন ওষুধ, ইনজেকশন, টিনের খাবার—আব্রামাইটরা বাস্তবিক কি সাজানো গোছানো!) আমাকে অবাক করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর তাই যেন আমাকে পথ দেখাল।

তারপর অবশ্য ডম অ্যান্টনিও কিছুটা দূরে গেল। অনিশ্চয়তা আরও কাছে এল। কারণ অ্যামনেশিয়ায় যদিবা ক্রেট টানা যায়, চিকিৎসা করা যায় না। তা হলে বরং অ্যানাসিন হওয়া ভালো।

আর তারপরে তো এখন এমন অবস্থা যখন কিছুতেই কিছু এসে যায় কি? মনে করো, একটা সনখ পেল্লায় থাবা, উদ্যত থাবাই এবং নখও চোখে পড়বে উপরে চাইলে, যে কোন সময়ে নেমে আসতে পারে যা। তার তলে এই র‍্যাটরেস। বিড়াল জাতীয় সেই থাবার অধিকারী যদি আকারযুক্ত

হয়, তা হলে এখানে মানায় না। কিন্তু যদি স্বচ্ছ রকমে সাদা হয়, অদৃশ্য প্রায় হয়, কিংবা যদি তা মাত্র সময়ের অনুভূতি হয়। অথবা সেটাই, সেই অনিশ্চয়তাই যা এই নিজেকে হারানোর নিজস্বতা।

কিন্তু আইভির কথা থেকেই মনে আসছিল। কারণ সে আজ সন্ধ্যায় সেই ফোড়ায় ছুরি দেয়ার পরে বেড়াতে বেরুলে মিষ্টি করে ডম বলেছে অনেকবার (ডম তো ক্রিস এবং অ্যামব্রোসিওর নামের আগেও, লক্ষ্য করো, আইভি ডম বলে শুধু আমাকেই। যেন এখনও আমি অ্যামনেশিয়াগ্রস্ত পথিক যে পথ হারিয়েছে, মনে হচ্ছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে পাশাপাশি চলতে, পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে, এটা সেই এক মেহেরবিবি-নূরজাঁহার গল্প হতে পারে একেবারে আমাদের অজানা অনিশ্চয় পরিস্থিতিতে, কিংবা আরও ভালো, যেন গুটি থেকে মথ বেরুতে চেষ্টা করছে,

মথ কি গুটি অবস্থার কথা মনে রাখে? কিংবা মথের নিজের নতুন জীবনের হালকা অনুভূতির বেশি কিছু তার স্মৃতিতে থাকে না?

তা মানতে গেলে, অবশ্য এই বলতে হয়, আইভির ভিতরে একটা অ্যামনেশিয়া এলে ভালো হতো। কেননা তার খামার থেকে আমার এই ছাতায় আসার মধ্যে ফুটপ্রিন্টের ধোঁকা তৈরি করার, অথবা পায়ের ছাপ মুছে মুছে চলার সুযোগ নেই। এটা হয়তো আমার নিছক থিয়োরি। কিন্তু এটা খুবই সত্যি বাইরে থেকে বোঝা দূরের কথা, ভিতরে নিজেও বোঝা যায় না যে প্রায় দুঃসহ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছে চাপ। সেই চাপ যার ফলে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাও। কিছুতেই কেন লুকিয়ে পড়তে হবে তা যেমন লজিক দিয়ে বোঝানো শক্ত, তেমন বলা যায় না কখন সুযোগটাকে চূড়ান্ত এবং না ধরলে হারিয়ে গেল, এমন মনে হবে। (এমন কি লজিক দিয়ে দেখতে গেলে তা সুযোগই নয়।) ৭২২ নম্বরের ফেঁসে যাওয়া যদি ঘুমের ঘোরে না হতো?

পাশাপাশি হাঁটলুম, সন্ধ্যা, রাত্রি। একবার বললে আইভি, ডম, ডম, তুমি কেন ডম নও? (অবশ্য এটা সেই তত্ত্ব হতে পারে যে এই স্লিপিং হলোতে প্রতিটি মুহূর্তই অনিশ্চয়, সুতরাং মুহূর্তের চাইতে বেশি স্থায়ী কোন প্ল্যান করাও যায় না এবং কোন নীতি থেকে চালচলন নিয়ন্ত্রিত হয় না। তুমি কি তার পরেও নীতির কথা বলবে, যখন চারিদিক থেকে এক নোনাখাঁড়ি বেষ্টন করে রেখেছে এবং সাঁকোর নিচে সেই আধ-পচা উরু, স্তন, কঙ্কাল, চুল ও শাড়ির রঙ দেখেছো?) যেন সে কোন পুরনো কবিতা আবৃত্তি করল। এটা, এই পুরুষের গায়ের গন্ধ নাকে লাগা আইভির (যদি তাই হয়ে থাকে) তবে তা অনেকদিন পরে আগুনে গলা টাটকা মাখনের স্বাদের মতো, যা অনুভব করতে কোন নীতি মানতে হয় না।

রাত্রি নটা হল। আবার ছাতার তলে ফিরে নিজেই চেয়ার টেনে বসল আইভি। আলো জ্বাললুম (এটা খুব কমই জ্বালি এই পেট্রোম্যাক্স, তেল পাওয়া কঠিন। আমাদের এই স্লিপিং হলোতে অভাবও আছে তো)। উজ্জ্বল আলো। অনেক দূর থেকেই চোখে পড়বে। খামার থেকে হয়তো আলোর পাশে মানুষগুলোকে আন্দাজ করা যাবে, আইভির বব-করা চুলের মাথা, অ্যানাসিনের বিশেষ রকমে কাটা দাড়ি। আইভি হেসে বলল,—মনে রেখেছো দেখছি ডম, তাই বলে হাতের ব্যান্ডেজ খুলো না। বাহুটা ধরতে চাও, ধরো হাতে। বরং কফি আছে নাকি অ্যানাসিন? কফি করো, খাই।

কফি করলুম। বেশ লাগল গরম কফি। সুরত তো উষ্ণতাকে অনুভব করার জন্য গরম কাপটাকে কপালেও ছোঁয়াল থেকে থেকে। একবার আঃ বলে তৃপ্তির শব্দও করল। হেসে বললুম—তুমি ভাই, সুরত, স্বভাব থেকে এপিকিওর।

যাওয়ার সময় যেন আলোটা সে জন্যই দরকার। আইভি বলল, ভুল হয়েছে কিন্তু অন্ধকারে নাটকীয়ও হতো। ওদিকে চাও।

সুরতের দিকে ফিরে বসলুম। আইভি স্কার্টের ভিতর থেকে ডম অ্যান্টনির সেই মস্ত পিস্তলটা বার করে অপারেশন টেবলে রাখল। চামড়ার মাঝারি আকারের গুলির পাউচ।

আমি তার দিকে ফিরলে বলল, ঠিক মনে পড়ছে না কিন্তু, কী যেন কত নম্বর বোর এই পিস্তলের, সব গুলি খাপ খায় না।

আইভি চলে গেল। আমার কখনও কখনও মনে হয়, এই যে স্লিপিং হলো এখানে ক্যারেক্টাব জন্মায় না। প্রতি মুহূর্তের জন্য ভাবলে তা হয় না, কেন না ক্যারেক্টার যদি অন্যের লেখা বা অলেখা সমাজের নীতি নাও মানে, নিজের তৈরি নীতি নিয়ে কিছুটা কনজিস্টেন্ট। অর্থাৎ ক্যারেক্টার প্রতি মুহূর্তে যেমন/যদি বা নতুন হতে পারে তার ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে যা পুরনো। এই স্লিপিং হলোতে বলা খুব বিপজ্জনক, ভুল হতেই পারে, যে আইভি অসাধারণ; কিন্তু মনে হয় যেন চ্যালেঞ্জ নিতে সাহস আছে এমন কেউ একজন সে।

কিন্তু ভাবো এই পেল্লায় নীল ইস্পাতের ভারি সার্ভিস পিস্তলটার কথা। যেন এখনও আমি ডম অ্যান্টনিওর সেবিমোনিআল পোশাক পরি, যে ওটা মানাবে। কিংবা যেন সে তাদের দূরবীনে কিছু দেখে যেন শঙ্কিত। কিন্তু এখানে এখনও আত্মরক্ষা এই শব্দটার কোন অর্থ থাকতে পারে।

আলোটা এইমাত্র নিবিয়ে দিলুম। আজকের ইনজেকশন কি কিছুটা কাজ করেছে? সুরত যেন কম হাঁপাচ্ছে জ্বরে। মনে হলো সুরত বেশ মজা পেয়েছে আইভির ব্যাপারে।

ডম অ্যামব্রোসিওর গল্প অথবা ডম অ্যান্টনিওর পাণ্ডুলিপি

এটা আমার শোনা কথা যে কসাক কিংবা তেমন কোন খণ্ডজাতির এক সুন্দর লোকনৃত্য আছে—পুরুষদের নাচ যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়ামও বটে—যার এক পর্যায়ে লাফিয়ে উঠে শূন্যে থাকতে থাকতে বেশ কয়েকবার দুপায়ের সাহায্যে ঢেরা কাটতে হয়। এইসব লোকনৃত্যে নর্তকদের কোমরে পিতলের বুলটি বসানো বেল্ট যেমন থাকে তেমনই থাকে পিঠে রাইফেল। (আমার তো ধারণা দুপাঁচ বছর আগে যে রাইফেল থাকত আর এখন যে অটোমেটিক রাইফেল থাকে তাতে তফাৎ আছে। আর এতো সবাই জানে রাশার বিখ্যাত ব্যালেতে এই লাফিয়ে উঠে শূন্যে ঢেরা কাটার মুদ্রাটা নেয়া হয়েছে, কিন্তু তখন সেই নর্তকের পিঠে রাইফেল থাকে না, কোমরেও বেল্ট নয়।) এখন, এই লোকনৃত্য কতদিনের পুরনো কে বলতে পারে? খুবই সম্ভব যে অটোমেটিক আধুনিক রাইফেল দূরের কথা, যখন রাইফেলের কথা ভাবা যায়নি, তখনও এই নৃত্য ছিলো, নতুবা লোকনৃত্য বলেছে কেন, এবং তখন রাইফেলের বদলে তরোয়াল বাঁধা থাকত হয়তো কোমরে। এবং তখনও উপভোগ্যই ছিল, এখনও যেমন উপভোগ্য অটোমেটিক রাইফেলের আধুনিকতা যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

তেমনি যেন আমাদের এই মেরি গো রাউন্ডে একেবারে চূড়ান্ত রকমে আধুনিকতা যুক্ত হয়ে যেতে পারে কোথাও।

উইপিং উইলো গাছগুলোর নিচে ডম অ্যামব্রোসিওর তালগাছের গুঁড়ির ডোঙা যা মুহূর্তের চেষ্টায় খাঁড়ির জলে ডুবিয়ে দেয়া যায় এবং তখন তা একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। (এখনও গায়ে লেগে থাকা বড় বড় পাতা ও শিকড়ের শ্যাওলার দরুন একটা পুরনো সাঁকোর অংশমাত্র মনে হয় যাকে।) অথবা অ্যামব্রোসিওর চার্চের পশ্চিম দিকের রং-করা ছবি-আঁকা কাচের বড় জানালাটা যা অন্য কোন চার্চের ধ্বংসাবশেষ থেকে তুলে এনে বসানো মনে হয়, কারণ চিত্রকর হয়তো পর্তুগালের কোন চার্চের জানালার অনুকরণই করেছে এবং তখন বিভিন্ন দেশে পাঠানোর জন্য এমন অনেক কাচে ছবি আঁকা হতো হয়তো প্রায় লাভজনক কুটিরশিল্পের ভিত্তিতে; তা হলেও অনুকরণটা প্রায় তিন-চারশো বছরের চাইতে কম পুরনো হবে কি? আজই প্রথম জানালাটাকে দেখে প্রায় পাঁচ মিনিট অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। অথবা অ্যামব্রোসিওর গায়ে (যেটুকু তার

আলখিল্লার বাইরে অর্থাৎ কনুই থেকে কব্জি, হাঁটু থেকে পায়ের পাতা) যে লাল লাল দাগ লম্বা এবং ফোসকাব মতো (কালসিটে পড়ে নি তখনও, যা থেকে মনে হয় সেগুলি সদ্য) এবং যা নিজেকে নিজে ধর্মীয় পদ্ধতিতে চাবকালেই হতে পারে বলে আমাব ধাবণা।

এসবই যেন নাচের সঙ্গীব নতুন পোশাক বলে মনে হচ্ছিল হয়তো, যদি নাচের তুলনাটাকে ছেড়ে না দাও, সেই ইউক্যালিপটাসটাকে মাঝখানে বেখে ঘুবে ঘুরে নাচার। কেননা কে বলেছে তোমাকে, নাচুনেদের মধ্যে কাবো টপহ্যাট বালতিব মতো হতে পাবে না? অথবা কে বলেছে, লম্বা সেকেলে টেইল কোট পরা, হাতে পাকানো ছাতা সমেত একজন একা সকলের সঙ্গে সঙ্গেই, নাচেব মৃদুগতিতে অবিশ্বাস্য বকমে দীর্ঘছন্দেব, যেন যা ধবা পড়ে নি? নতুবা অ্যামব্রোসিওর এসব ব্যাপাব ঝাল মুলোব পাতাব ঝাঁজেব চাইতে ঝাঁজালো মনে হওয়া উচিত হয়।

আসলে এটাই প্রমাণ হচ্ছে অ্যামব্রোসিওর ও ব্যাপারটা একটা বড় রকমের ঝাঁকি দিয়েছে। যেন উইপিং উইলোব আড়ালে বাখা ডোঙা; সিমেন্টেব সাধারণ সোজা দেয়ালে গাঁথা খুব সেকেলে একটা রং-করা জানালা; এমন কি অ্যামব্রোসিওর নিজের গায়ে বসানো কয়েকটা চাবকানোর দাগ (তা, অ্যানাসিনেব ধাবণা যে আমার পায়জামা তুললে উরুতে অনেক মরফিন ফোটানোব দাগ দেখা যাবে)—এসবই যেন সেই থিয়োবিতে মিলছিল, যে চিন্তা ও অনুভূতিকে সর্টিং করাব জন্য এখানে কোন নীতির যোগ না থাকলেও চিন্তা ও অনুভূতিকে বাদ দিয়ে চলতে হবে এমন কথা নেই। শুধু সেগুলোকে জমা কবে বাখলে তা ভযঙ্কব বকমে বাসি হয়ে যায়।

কিন্তু সাঁকোটাব নিচে (সাঁকোটা, তা ভাঙা লোহা ও কাঠেব তৈরি হলেও একটা যোগাযোগই ছিল অন্য এক পৃথিবীর সঙ্গে। এখন আব নয়, ডোঙা রাখল ডম অ্যামব্রোসিও। বললে- তুমি এখানে একটু থাকো।

সে নেমে গেল। তাব পবনে খৃষ্ট সন্ন্যাসীদের মতোই সারপ্লিস। শুধু আস্তিন গুটিযে তোলা বলে কয়েকটা কালসিটেব দাগসমেত কনুই পর্যন্ত, শক্ত, মজবুত কৃযকেব মতো কর্মদক্ষ বাদামি বাহু অনাবৃত, জুতো-মোজা না থাকায় হাঁটু পর্যন্ত পবিপুষ্ট, ভেবিকোজ ভেইনযুক্ত বাদামি রঙেব দুখানা পা। সে ডোঙা থেকে কোদাল তুলে নিল এবং নেমে গেল।

সে অন্যবকম আশা কবলেও আমি সবই দেখলুম। এখন শুধু কঙ্কালই আছে, কুকুর এবং শকুনও পবিত্যাগ করেছে, কিন্তু আহা যেন লম্বা চুলের ঢেউগুলি আছে যাতে ফিতে বাঁধা হতো, আহা যেন মাটিতে পড়ে থেকেও নীল-নীল শাড়িগুলিতে তখনও সেই ডৌল আছে যা নিতম্বেবই। এখন শুধু কঙ্কালই, আব কালো হযে যাওযা চামড়া, যা বীভৎসমুখ কুকুবটাও স্পর্শ কবছে না বরং অবাক হয়ে দেখছে, এবং শকুনগুলো ক্রমেই বিন্দুর মতো ছোট হযে পাক খাচ্ছে।

কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঝপাঝপ ফেলল অ্যামব্রোসিও। বেশ শক্ত অভ্যস্ত হাত। কঙ্কালগুলোকে ঢাকল সে আধ ঘণ্টাব চেষ্টায়। তারপব সেই নতুন মাটির বাদামি ঢিপিটার দিকে দুহাত পাশাপাশি বাড়িয়ে কিছু বলল, তারপর দুহাত নিজের কোলের কাছে গুটিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাদামি মুখ এমন কি মাথার উপরের ছোট্ট বাদামি টাকটা, যা এবার চোখে পডল, ঘামে চকচক করছে। আহ্, ডম অ্যামব্রোসিও, বাঃ, ওটা তোমার চোখের জলই যা দুগাল বেয়ে হু হু করে নামছে। তুমি জানো না, এই কঙ্কালগুলো কোন ধর্মের মেয়েদের, হিন্দু, মুসলিম অথবা খৃষ্টান, তার কিছুই জানো না। হাউ সিলি!

এবং এ জন্যই তখন মনে হল এটা এক অদ্ভুত রকমের কিছু হল এবং কিছুক্ষণ ধরে মনে হতে থাকল সব চাইতে দুর্ধর্ষ উইটের কবিতাতেও এমন কিছু বেসুরো বাজে। এটা এমন সিলি এবং আধুনিক, এমন রাইফেল ও বারুদে জড়ানো যে মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নতুন উপলব্ধি (পুরনো অর্থাৎ আগের মুহূর্তের যেটা সেটাকে জমা না করে) নেয়ার মতো মস্তিষ্ক ও হৃদয়ও একে নিতে

চায় না। যেন এই মাত্র অন্য নাচিয়েদের অবাক করে দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, অ্যামব্রোসিও শূন্যে ঢেরা কেটে নামল।

ডম অ্যামব্রোসিও বুঝল আমি সবই দেখছি। বলল—এই যে এখানে ওখানে বাঁশের চাটাইয়েব উপরে ঘাসে ঢাকা খাল, একে কি বাঙ্কার বলবে? সিলি। এখানে ওরা হদ্দমুদ্দ চল্লিশ জনই ছিল। দিন পনেরো। তাতেই, এই পাঁচ-ছটি স্ত্রীলোককে খেয়েছে। হাউ সিলি! না খেয়েই যেন পারল না। সিলি, সিলি! একেই কি তুমি বাঙালিনীর গর্ভে গর্ভে লাহোরী বীজ রাখা বলবে?

এসব আমি অর্থাৎ অ্যানাসিন ডাক্তারে পরিণত রবিন্সন ক্রুসোর সেই সাদা বিড়াল এখানে আসার আগেই ঘটে গিয়েছে। তখন হয়তো আমাদের অ্যানাসিন ক্রুসোর মতো জোয়ার-ভাঁটা বুঝে বোট থেকে ক্রেট সংগ্রহ করার পর্যায়ে। আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু ধাক্কা লাগল। হ্যাঁ, সিলি, এবং রাইফেলি আধুনিকতায় উৎকট। এই এক অন্য পৃথিবী থেকে এসে পড়া ব্যাপার। কিন্তু অদ্ভুত নয় অ্যামব্রোসিওর ব্যাখ্যা : বাঙালিদের গর্ভে রাখা লাহোরী বীজ। এই খামারে যেমন হতো বলে জেনেছি—এ দেশের গাভীর গর্ভে জার্সি ষাঁড়ের বীজ রাখা হতো।

আসলে এটা একটা ধাক্কা। এবং এখন এই তো, পনের মিনিট বাদেই, ধরে নিতে হবে এই নাচে, একঘেয়ে সেই নাচের কথাই, কেউ কেউ পিঠে রাইফেল বাঁধবে। এবং এটাই ঠিক, যদি একটু স্থির হয়ে ভাবা যায় যে এই অবিশ্বাস্য রকমের ঢিলে গতির ঘূর্ণিতে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে যার কৃষক স্থূল অবয়ব কিন্তু হাতে জপের মালা এবং দৃষ্টি আকাশে, এবং এমন অন্য কেউও যে বো ও ডিনার জ্যাকেটে, ডিমে উর্বরতা যোগ করার আগে, ধাড়ি পেঙ্গুইনের মতো এবং হয়তো যার হাতে উঁচু করে ধরা ওয়াইন গ্লাস।

আর তা যদি হয়, তবে পায়ে স্লিপার, আস্তিন গুটানো অ্যামব্রোসিও, যে এখন একহাত পরিমাণ এক বৈঠা দিয়ে নিপুণ হাতে জল কেটে ডোঙাটাকে সামান্যমাত্র ডাইনে বাঁয়ে দুলতে দিয়ে বেয়ে চলছে তাকেই রোজারি জপমালা-হাতে, আকাশের দিকে চোখ, নাচের পার্টনার বলতে হয়।

আর খালটাও এখানে এমন যে যেন আমাদের যা কিছু পরিচিত জগৎ, তাকে প্রদক্ষিণ করছে। রোদ উঠেছে, তীরে বেশির ভাগ জায়গাতেই মরামরা দূর্বা, জটপড়া চুলের মতো ধূসর, কোথাও ঝোপঝাড় আর কাদামাখা পাতাগুলো এখন ঝরে গিয়ে ডাঁট-সার, উঁচু নিচু জমিতে দূরে দূরে নুন চিকচিক করছে, আর ডোঙা ঘুরে ঘুরে চলেছে, অ্যানাসিন ডাক্তারের তাঁবুকেই যেন অনেক দূরে অবস্থিত কেন্দ্র মনে হয়। কিংবা যেন সূর্যটাই মধ্যবিন্দু আর আমরা ঘুরছি খাল বেয়ে বেয়ে। দূরবীন। গেঞ্জি গায়ে অ্যানাসিন। গেঞ্জির গায়ে ৭২২ না USA?

জলে হাত দিলাম। ছোট ছোট মাছ, চকচকে পমফ্রেটের বাচ্চাই, চমকে চমকে শ্যাওলায় ডুবছে। বয়ে যাওয়া জলে, জল তো প্রায় স্থিরই, ডোঙার গতির জন্য জল বইছে, কতদিন হাত দিই নি। হঠাৎ কী মধুর লাগল। যেন জল আর রক্তস্রোতে আদান-প্রদান হচ্ছে। মুঠ মুঠ করে জল ধরলাম আর অ্যামব্রোসিও তা দেখে বলল, ভালো লাগছে, না?

খুব।

আমিও তোমাকে না বলে স্যান্ডেল সমেত একটা পা নামিয়েছিলাম। উপরের জলটা একটু গরম, নিচের জল কিন্তু কী সুন্দর ঠাণ্ডা। হাত ঝুলিয়ে দাও, দেখো।

হাত ঝুলিয়ে অ্যামব্রোসিও যা বলেছিল তা অনুভব করলুম।

ঘড়িও নেই, ঘড়ির গতির জন্য তাগাদাও নেই। ঠাহর করে কৌতুক বোধ হল ঘড়ি চলে বাঁ থেকে ডান আর আমরা এখন ডান থেকে বাঁয়ের দিকে। বললুম তাই। অ্যামব্রোসিও হাসল। তার দাঁতে একটু লালচে দাগ বয়সের জন্য।

ডোঙাটার গতিও বেশ কৌতুকের। যেন বড় একটা মাছ যার গায়ে শ্যাওলা পড়েছে, ডানা

নেড়ে, একটু নড়ে, আবার থেমে শ্যাওলা খাচ্ছে, একটু এগিয়ে পিছিয়ে যেন নড়া, তখন আর বোঝা যায় না, তারপর আবার নড়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বললুম তাই। অ্যামব্রোসিও খুশি হল।

বললুম—সেদিন মাখনটা টাটকা ছিল, খুব টাটকা, রীতিমত ভালো গন্ধ দিল গরম হতেই।

অ্যামব্রোসিও বলল হঠাৎ—দেখো আমরা কত অল্পে সুখী, কত অল্পে সুখী।

আর খানিকটা গিয়ে অ্যামব্রোসিও বলল—জানো?

গল্পও তো ভালো। গল্প শুনেও সুখ। আর অল্পে যে সব সুখ তার মধ্যে গল্পও।

অ্যামব্রোসিও এদিক ওদিক চাইল, বলল হাসিমুখে—কেমন এই খাল মানুষের কাটা বলে মনে হয় না? প্রায় বৃত্তের পরিধি যেন। শুকনো ছিল। চাষ হতো বর্ষার জল নেমে গেলে। তা বোধ হয় নদীর পুরনো খাত শুকিয়ে যাওয়াতে সম্ভব ছিল, এবারে নদী খানিকটা পুরনো খাতে ফিরেছে। দেখো, এখনও এখানে জল। আর যেদিকে আমরা যাচ্ছি, উইপিং উইলোগুলোর কাছে এবার একটা *ঢিপি ভেঙে, ভাঙনে একটা পুরনো ইমারতের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে।* আর দেখো এখানে ওখানে কেমন কাছিমপিঠের মতো জমি উঁচু। হয়তো এমন হতে পারে চার-পাঁচ হাত খুঁড়লে পুরনো ছোট ইটের ভিত বেরোবে। বেরোয়। তা আমি জানি। এখানে ওখানে জমি করতে গিয়ে দেখেছিও।

ডম অ্যামব্রোসিও ব্রাগাঞ্জা হাসল, তার সামনের দুটো দাঁত বেশ বড় এবং মসৃণ হলদেটে সেজন্যই বোধ হয় তার মুখটাকে কৃষকের মতো দেখাল এখন। বলল, সে—কেমন, মনে হয় না এ কারো *একটা পুরনো গড় থাকতে পারে এখানে? নৌকাওয়ালাদের গড়, সুতরাং কিছুটা অস্থায়ী, দেয়াল হয়তো কাঠের বা কাঁচা, মেঝে পাকা, তা সত্ত্বেও গড়, শক্ত সমর্থ, খাল ঘিরে নৌবহরের পাহারা।* আমি স্বপ্নে এক ডম অ্যান্টনিওর কথা শুনেছি। বলল সে, আমার কথা কেউ বলে না, তুমি লেখো, আমি তো রাজার ছেলে।

এই বলে ডম অ্যামব্রোসিও আবার হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চাইল। যেন স্বপ্নের ব্যাপারটা বলে সে লজ্জিত। (কিংবা আমার তো জানা নেই, সেই সব পুঁথি যা স্বপ্নে পাওয়া বলে কবিরা শুরু করতো, তারাও তাদের গল্পের মুখবন্ধে স্বপ্নের ব্যাপারটা শেষ করে এমন করেই হয়তো চাইতো।) কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ডম অ্যান্টনিওর গল্প বলতে হলে সেকেলে কায়দায় বলনে ভালোই হয় হয়তো।

আমরা উইপিং উইলোগুলোর কাছে এসেছিলুম। ডোঙাটায় এবার লগি ব্যবহার করল অ্যামব্রোসিও। উইপিং উইলোগুলো যেখানে প্রায় জল ছোঁবে সে রকম এক আধো অন্ধকার জায়গায় ডোঙাটা ঠেলে লগি কাদায় পুঁতে ডোঙাটা বাঁধল সে। আর সেখানে আমরা গল্প বলার আর শোনার [illegible]লাম। মাঝে মাঝে অদূরে জলের মধ্যে জেগে ওঠা খিলানটা চোখে পড়ছে আর [illegible] বলা গল্পে কখনও সেটা শোবার ঘরের জানালা, কখনও সদর দরজা, [illegible]রে কেউ তরোয়াল হাতে অন্য অ[illegible] রুখতে পেরেছিল। [illegible]য়ে থাকবে।

[illegible] শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায়, উইপিং উইলোর অদ্ভুত স্নিগ্ধ ছায়ায়, উইপিং [illegible]নের দিকে চেয়ে। গল্প বলতে কী ছেলেমানুষের মতোই না দু-একবার [illegible]রোসিও।

[illegible]মিয়ে যে[illegible] মুহূর্তের সুখ অনুভব করতে (কিংবা কত কমে আমরা তখন [illegible]আবার [illegible] করতে) সে সারপ্লিসের পকেট থেকে একটা কর্নড বিফের [illegible]ে হাত ধুয়ে সেই ঠাণ্ডা মাংস আমার হাতে দিতে লাগল, নিজেও [illegible] স্বাদটাকে জমাতে জিভে টাকরায় শব্দ করছি আমরা। অ্যামব্রোসিও

তার গল্প বলে চলল।

সেই এক রাজপুত্র যে শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হয়েছিল। যার আসল নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে আমরা প্রথম ডম অ্যান্টনিও বলবো। জোর করে তাকে খৃষ্টান করা হয়েছিল। হয়তো মনে মনে সেও প্রস্তুত হচ্ছিল। তার নিজের রাজপরিবারের অনেক অনাচাব দেখে নতুন ধর্মে মানুষ হয়ে ওঠার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু খৃষ্টান হয়ে যখন তার নাম পালটে গেল তখন তার চোখে জল এসেছিল। পুরনো জমি, পুরনো মাটি, পুরনো জামার মতোই তো পুরনো ধর্ম। কিন্তু ধর্মযাজক, যার নাম পেড্রো ছিল বলে অ্যামব্রোসিওর মত, সে ঈশ্বরের কী অপার করুণা বলে গাঁক গাঁক করে হেসে উঠেছিল। তাতে করে রাজকুমারের পিতার রাজ্য রক্ষা হল না, এমন কি তার পিতা যে নিজের হারেমের এক-আধজন মহিলাকে মাঝে মাঝে সেই ক্যাথলিক খৃষ্টানদের কাছে দিনের অন্ধকারে হস্তান্তর করে চলেছিলেন, তাতেও না।

এমন নয় যে রাজহারেমের সব মহিলাই জাহাজে করে চালান হয়ে যাচ্ছিল। বরং একটা বড় জাতের খোঁয়াড় তৈরি হয়েছিল। এবং কোন কোন হারেমের মহিলা সেখানে থাকতে পাওয়ার সুযোগ পেল। এবং সেসব খোঁয়াড়ে যেমন নাকি এখানকার মাটিতে উইপিং উইলোর মতো, লিসবনের সন্তানরা একে দুয়ে দেখা দিতে থাকায় এটা কী অপূর্ব নতুন ধর্মপ্রচার বলে, ধর্মযাজকরা ঠাট্টা করে হেসে পুনবায় নতুন উৎসাহে উর্বরতা সঞ্চারে ব্যস্ত রইল।

গল্পটা একটু থেমে থেমে বলছে অ্যামব্রোসিও। কৌতুকের এই, তার চোখের দৃষ্টিতে গল্প বলাব সুখের সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন দূরে কিছু দেখার ভাবও এসেছে। যেন কিছুক্ষণ আগে বলা অ্যামব্রোসিওর আর একটি কথা এই প্রাচীন প্রথম ডম অ্যান্টনিওর গল্প থেকে প্রমাণ হচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এই সংক্ষেপে ঠিক জায়গায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে সহজ সুরে দারুণ কথা বলাটা শুধু স্বপ্নে দেখার ব্যাপার নয়। যেন অজ্ঞাতে, আমার চোখে পড়ছে না এমন ভাবে, তার হাতে রোজারি-জপমালা ঘুরছে। এবং এই বিষাদের গভীর অনুত্তেজিত সুর যেন কোন বইয়ের। আমাব এরকম মনে হল এটা যেন তার ওল্ড টেস্টামেন্ট অনেকবার পড়ার ফল। যেন এখনই বলবে অ্যামব্রোসিও, যা হয়েছিল তাই চিরাদিন হবে। সূর্যের নিচে নতুন কিছুই হয় না। ঘুরছি আমরা, ঘুরতেই থাকব; এগোনোব উপায় কী?

অ্যামব্রোসিও বলল, আমাদের রাজপুত্র ডম অ্যান্টনিও তখন একলেজিঅ্যাস্টেসের হোয়াট হ্যাথ বিন শ্যাল এভার বি, শেষ করে, এমন কি লেট কেইন গো ফর হি বিলংস টু গড (কেইন জানো তো কে? যেমন অ্যাডাম প্রথম পিতা, তেমন কেইন প্রথম খুনী। প্রথম খনটা অ্যাডাম থেকে খুব বেশি দূরে নয় কিন্তু।) এ সব কথাও বলতে শিখেছে। রুপোর ক্রুস এগিয়ে ধরে আশীর্বাদ করতো নিজের এই ছোট্ট দ্বীপের স্বল্পসংখ্যক প্রজাপুঞ্জকে। এবং খোঁয়াড়ের ব্যাপারগুলো জেনে প্রজাদের হাত ফুটো করে বেঁধে জাহাজে তুললে বলতে শিখেছে, রেজিস্ট নট দি ডেভিল (এগুলো অবশ্য ইংরেজিতে বলছি, সে কিন্তু লাটিনে বলতো।) একদিন সে যখন এই নতুন ধর্ম, যা তার পুরনো ধর্মের চাইতে তার কাছে অবশ্যই অনেক ভালো, নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে ভাবছে হয়তো এমন করেই মানুষ নতুন হয়ে ওঠে, তখনই সে দেখতে পেল একজন যেন পরিচিত মহিলা পথের ধারে কাঁদছেন। যেন সহমরণে যাচ্ছেন এমন প্রস্তুতি। কাছে গিয়ে সে বুঝতে পারে মহিলা তার পরিচিতই বটে এবং তাদের একজন যাদের নিজের হারেম থেকে পর্তুগীজ ধার্মিকদের কাছে উপহার দিয়েছিলেন তার পিতা। (তাতে পিতার দোষ ছিল না কেননা তারা তো ডম অ্যান্টনিওব পিতার মন্দির-দাসী, কী ব্যবহারে লাগবে?) অনুসন্ধানে জানা গেল, মহিলাটিব প্রাপ্তবয়স্ক পু[illegible] খোঁয়াড়ে প্রবেশ করেছে, এবং যা ঘটেছে তার পর অগ্নিদগ্ধ হওয়াই ভালো।

আমি বললাম—এসব কি পয়ারে লেখা হবে?

ডম অ্যাম্‌ব্রোসিও হেসে বলল— না, ভায়া কতকটা এরকম: সব শ্রবণে ডম অ্যান্টনিওর মনে এরূপ করুণা হইতে থাকে যে সে বলে এভাবে আত্মঘাতী হওয়া ভালো নয়, যাহারা কুকুরের মতো বর্ণসঙ্করতার ফল তাহারা কুকুরই হইবে ইহাও সত্য, কিন্তু তোমাকেও, মা, মরিতেই হয়। এই আমি ক্রুস প্রসারিত করিয়া বলি, তুমি ডাইনী। সুতরাং আমার প্রজাগণ তোমাকে দাহ করুক।

বললাম—ডম অ্যামব্রোসিও, এগুলো তো প্রমাণিত সত্য নয়, গল্প। এখানে ওখানে একটু নরম করা যায় না?

অ্যামব্রোসিও আমার দিকে চাইল। তার চোখের দৃষ্টি যেন বিকেলের মতো ম্লান। সে বলল—অতঃপর চিতা লেলিহান হইলে ডম বলিল, হা ঈশ্বর, যাহারা পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়াছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাপ করিয়াছে কারণ লুঠেরামাত্রই পৃথিবী ভাগ করে, ঈশ্বর নহেন।

অনুমান করে বললুম— এটা কি পোপের পৃথিবী ভাগ? এদিকটা স্পেনের ও দিকটা পর্তুগালের।

অ্যামব্রোসিও বলল—আর এক দিন আর এক নতুন ধর্মের গল্প বলা যাবে। তুমি কি দেখেছিলে ওই বীভৎস-মুখ কুকুরগুলোকে? শুনেছি ওগুলো নাকি তিব্বতী ম্যাস্টিফ আর অ্যামেরিকান বুলটেরিয়ারের সঙ্কর। এই খামারে তৈরি। এখন কিন্তু ওদের কথা আর কেউ মনে রাখছে না। ওরা দেখতে বীভৎস কিন্তু শুনেছি যেমন শক্ত তেমন প্রভুভক্ত।

নানা রকমের কুকুর তৈরি করা হয়ে থাকে। আর তার চাহিদাও আছে।

নানা জাতের গাভীও এই খামারে হয়েছে। কিন্তু মানুষ? নতুন মানুষ হয় ওভাবে, যতই তুমি চেষ্টা করো? পুরনো সেই মরণ আসে না প্রাণের অঙ্কুরের সঙ্গে?

(আসলে ডাক্তার কাল থেকে যে ইনজেকশন দিচ্ছে—হায় কেন যে দেয়—তার একটা জ্বালা আছে। যেন রক্তের মধ্যে কতগুলো ছুটে ছুটে চলা জ্বালার মতো ওষুধটা ছড়িয়ে পড়ে। আর তা মাঝে মাঝে বেড়ে ওঠে, যেন নতুন নতুন কোষকে, যারা রোগের আশ্রয় আক্রমণ করে, বিদ্ধ করে। যেন বা নতুন নতুন শত্রুর ঘাঁটি দখল—এখন বোধ হয় তেমন কিছু হচ্ছে এই মুহূর্তে। হয়তো আমার মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়। কিছু একটা হয়ই, নতুবা ডাক্তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো না বসে। হয়তো এখনও তেমন ঘেমে উঠছে কপাল।)

এতো বোঝাই যাচ্ছে অ্যামব্রোসিওর এই স্বপ্ন নিজের মনকে নিজের কাছে পরিচ্ছন্ন করে নেয়ার চেষ্টাই। এক সংস্কৃতির উপর অন্য সংস্কৃতির চাপ, এক ধর্মের উপর অন্য ধর্মের চাপ—এখন যা সে দেখছে সেটাকে অতীতে রেখে দেখতে চাচ্ছে কী ফল এই বিরোধের—কতখানি বা এই রাজনীতির ক্ষুধার্ততা। কিংবা এই নোনাদ্বীপের এখানে ওখানে খুঁড়লে কি এক পুরনো কলোনির ভিত বেরুবে, যে কলোনির কারো লাগানো ওই উইলো? যে কলোনির এক স্তম্ভ জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আর যে কলোনি প্রমাণ করে কিছুই নতুন হয় না।

বললে অ্যামব্রোসিও—তোমার শরীর খারাপ করেছে, সুব্রত?

না। নতুন ধর্মের গল্পটা বলুন।

আবার স্বপ্ন দেখি যদি বলব, এই বলে সে হাসল।

বললাম, কিন্তু এই খালের বৃত্তে ঘেরা নোনা মাটির তলায় যদি ডম অ্যান্টনির পুরনো গড়ের ভিত থাকেও তারা সেই কতদিন আগে তাদের ভুল ভ্রান্তি, উত্তপ্ত আবেগ, আর শীতল ক্রূরতা নিয়ে, সেই কতদিন আগে, তারা মৃত; তারা কি এখন শান্তিতে ঘুমানোর অধিকারী নয়?

আমেন, আমেন।

মানুষ তার মৃতগুলির সঙ্গে আর যুদ্ধ করে না।

আমেন।

ডিসেন্টলি বেরিড বলে একটা কথা আছে না?

ভালো বলেছো, আমেন।

অ্যামব্রোসিও হাসল। তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে রইল। আমি শুধু কৃষকদের মুখেই এই ভাবটা দেখেছি যাকে শহরের আমরা বোকার চিহ্ন বলবো। কিন্তু আসলে এরকম একটা ধারণা হয়েছে আমার, ওটা ওদের বিস্ময়ের চিহ্ন। পুরনো মাটিতে নতুন ফসল উঠতে দেখে যে বিস্ময়।

একটু পরে সে বলল—ভারি মজা, জানো, সুরত। পুরনো ধর্মে ইভের পাপ আমাদের রক্তে, নতুন ধর্মেও রোগের বীজাণু আমাদের রক্তে। নিজেকে পুরনোর থেকে ছিঁড়ে আনতে পারো না। অনেক সময়ে খামারের নতুন প্রাণীগুলোতে পুরনো প্রাণী দুটোর, কিংবা তার পিছনে একের পর এক ক্রমশ দূরে ছায়ার চাইতেও ক্ষীণ ছায়া হয়ে যাওয়া, অনেক জোড়া প্রাণীর দুর্বলতা দেখা দিতো। এসব আমাদের আইভিও জানে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, আইভিও এই সব পুরনো থেকে নতুন হওয়ার ব্যাপার চিন্তা করে। খামারটা যখন ছিল, এবং আবার হয়তো হবে যদি এখানে চরবার জমি জাগে, আইভিকে গ্লাবস পরে সিরিঞ্জ হাতে পশুগুলোর মধ্যে বেশ একসপার্টের মতো ঘুরতে দেখা যেতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তুমি পুরনো থেকে নতুনকে ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে নতুন করে পাবো না। সাঁকোর ধারে কুকুরগুলোর গায়ে ঘা দেখো নি, রোঁয়া ওঠা, যেমন এ দেশি, একেবারে এ দেশি এবং পুরনো স্টকের কুকুরে দেখবে তুমি, শহরের মিষ্টির দোকানের আস্তাকুঁড়ের কাছে? কারণ, এ সবেরই একটা কারণ আছে—

আমাদের, আমার আর অ্যানাসিনের সেই মেহের-নূরজাঁহা থিয়োরিতে কি গরম শিশাকে খাপ খাওয়ানো যায়? কিংবা পুরনোকে ভুলে যে নতুন ব্যক্তিত্ব তার উপলব্ধিতেও এমন তীব্র উত্তাপ এক সময়ে আসবে যে তাই স্বাভাবিক। মনে করো, যখন নূরজাঁহা কোন বাদশাজাদার চোখ উপড়ে দিতে হুকুম দিয়ে ঘরে বসে নার্গিসগুচ্ছ হাতে ফুলগুলোর উপরে ফুলের মতো নরম আর সুন্দর হাত বুলাচ্ছে।

কিন্তু ডম অ্যামব্রোসিও বলল হেসে - তুমি কি জানো অ্যামনেশিয়া কাকে বলে? অ্যাকসিডেন্টে হয়। সবগুলোতে নয়। মাথায় গভীর ক্ষত হচ্ছে তার বাইরের লক্ষণ। যদি কারো মাথার বাঁদিকে, এরো, আশপাশের ত্বকের তুলনায় এখনও প্রায় লাল হয়ে থাকা ক্রসের মতো ক্ষতচিহ্ন থাকে, তবে এমন সম্ভাবনা আছে তার হয়তো আংশিক ভাবে স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তুমি কি মনে করো, কারো চোয়াল থেকে গলা অবধি সে রকম ক্ষতচিহ্ন থাকে, যেমন আব্রামের, (আব্রামকে দেখেছো?) তবে তারও অ্যামনেশিয়া অন্তত আংশিক হতে পারে? হয়তো, হয়তো, কিন্তু অন্য আঘাতে তাতে যদি বিদ্যুতের পোড়ার মতো জ্বালা আর ধাক্কা থাকেও তাতেও পুরনোকে ভোলা যায় না বোধ হয়।

মনে হল, হয়তো ভুল হতে পারে, অ্যামব্রোসিও নিজের কালসিটে পড়া (এখন সেগুলো পোড়া দাগের মতো দেখাচ্ছে) বাহুদুটোকে গোপনে দেখে নিল নাকি একবার! তারপর সে হাসল। এই এতক্ষণে সে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। দুষ্প্রাপ্য যেন, এমন যত্ন সে সিগারেটের। অ্যানাসিনের এই ইনজেকশনটায় কি সত্যি জ্বালা করার কথা!

এখন তো আবার ছাতার তলায় এসে বসেছি। আজকের দিনটা একটু অন্যরকমই। অ্যানাসিন একটা ইনজেকশনের বালব হাতে নিয়েছে দেখছি। আবার একটা ইনজেকশন দেবে। আমার শর্তে বাজি হয়েছে। ও আমাকে জামা খুলে পরীক্ষা করবে না। স্টেথেস্কোপ তো আছেই। ওর শর্তেও আমি রাজি হয়েছি, কাল সকাল থেকে যতক্ষণ সে মাছ ধরবে ততক্ষণ আমি স্রেফ শুয়ে শুয়ে কাটাবো। আর মাছ ধরলে, ধরবেই উইপিং উইলোর তলার দহে, চার, পাঁচ, ছয় যা হোক, সে মাছগুলোকে খেতে হবে।

দিনটায় যেন একটা কালো, কিংবা তার কোন রং নেই, জ্বালার মতো কিছু ছিল। যে জ্বালাটা

কখনও বা একটা অন্ধ সূচের ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার মতো। এখন তো ভেবে দেখছি ওটা ঠিক ইনজেকশনের ওষুধের কোষে কোষে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপার নয়। শরীরের ভিতরে ওটা, অ্যানাসিনের মতে, টকসিন। রোগ বীজাণুরা টকসিন ছড়ায়। অথচ বাইরে থেকে দেখে তুমি বুঝতে পারো না। আজকের এই দিনটার মতো।

কিন্তু তাতে কী যায় আসে বলো? ডাক্তার হয়তো এখনই বলবে, আবার হাসছো? ইনজেকশন কি হাসির জিনিস? এবার বালবে জল ভরে ঝাঁকাচ্ছে। অ্যানাসিন আমার জ্বর আর কাশিটা সারাবেই। আচ্ছা, আচ্ছা, ওর মনে কি কষ্ট হয় যখন আমি ওর ইনজেকশন দেয়া দেখে হাসি? রেগেই গিয়েছিল অ্যানাসিন, যখন আমি বললাম তুমি কিসের গন্ধ পাচ্ছ তা আমি জানি না কিন্তু একটা শর্ত যে আমি জামা খুলবো না। তখন বিড়বিড় করে অ্যানাসিন বলেছিল, যেন একটা মেয়ে। অথচ ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে কি এসব কথা কেউ ভাবে? তারপরে আমার শর্ত মেনে নিল। কারণ, এটাই ওকে মানায়ও, সব কিছুকেই হালকা হয়ে যেতে দেয়াই ওর ভঙ্গি। আর এখানে ভঙ্গিটার বেশি কিছু, অর্থাৎ চরিত্র যা ভঙ্গির পিছনে থাকে, থাকলে তো এ লোনা মাটির চরিত্রই বদলে যায়। যায় না?

তা ছাড়া দেখো, অ্যানাসিনের কপালেব বাঁ দিকে কতবড় একটা ঢেরা, কাটা ক্ষত। অ্যামব্রোসিওর থিয়োরি ঠিক হলে এটায় প্রকৃত অ্যামনেশিয়া হতে পারে। যেমনটা তার নিজের হাতের চাবুক তাকে দিতে পারে নি। (অবশ্য এটা আমার অনুমানই মাত্র।)

এখন বিকেল, সন্ধ্যা হয় হয়। এখন সন্ধ্যা নামবে, আর দূরে দূরে ছড়ানো ঢিবিগুলোকে, যেগুলো ক্রমশই বাদামী থেকে অন্ধকারের ছায়ার মতো হয়ে যাচ্ছে, দেখে তোমার ইচ্ছামতো কল্পনা করতে পারো।

বাহ্, এখন দেখো, আবার শান্ত হয়েছে ভিতরে জ্বালা থাকলেও। অ্যানাসিনও হয়তো ওষুধে আজ কিছু ট্র্যাঙ্কুইলাইজার মিশিয়েছে। এখন যদি ইচ্ছা করি, তা হলে বাদামী পোশাক পরা, স্থির হয়ে বসেছে রোজারি-জপমালা নিয়ে, এমন একজনকে কল্পনা কবা যায়। হয়তো বাইবেলের সে অংশ যাকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে, যাতে যুদ্ধ, প্রতারণা, ক্রোধের কথাও আছে এবং এক ঈশ্বরও যে এক আদিম জগতের ক্রুদ্ধ ভগবান, যে সেই জগতে একটা প্রথা, একটা বিন্যাস আনার চেষ্টা করে চলেছে। না ঠিক যিসাসের মতো ঈশ্বরপুত্র তখনও কল্পনার বাইরে কবিদের, যে বলবে, হা ঈশ্বর, এরা জানে না। সেই ওল্ড টেস্টামেন্টের একজনকেও বাদামী ঢিবিগুলোতে কল্পনা করতে পারো, যার ভিতরের জ্বালা এখন বুঝতে পাবো না, যার হাতে হয়তো জপমালা (একটু সেকেলে বেশ একটু সেকেলে, তেমন রিফাইনড নয় তো) যে বলছে একলেজিআস্টেসের পরম প্রবীণের মতো, ভ্যানিটি অব ভ্যানিটিস, অল ইজ ভ্যানিটি,—এই যে এত যা কিছু দেখছো, এত কর্মকাণ্ড, সব শূন্যি, কারণ, দেয়ার ইজ নাথিং নিউ আন্ডার দি সান।

আজ খুব সম্ভব ট্র্যাঙ্কুইলাজারই দিয়েছে অ্যানাসিন। ওষুধের জ্বালাটাও এখন নেই। বাহ্, আজকের অ্যামব্রোসিও-সমেত নতুন ধরনের দিনটা এখন যেন আমার শরীরের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে না?

এবং তা হলে অ্যামব্রোসিও আবার আকাশ-দৃষ্টি, হাতে জপমালা, সেই নাচের পার্টনারই থাকছে যে হয়তো মুখে দু-একবার হুট হুট শব্দে কিছু একটাকে দূরে রাখার চেষ্টা করে।

ডাক্তার বলল—আজকের দিনটা কিন্তু অন্য রকমের। গত কাল আর আগামী কালের মধ্যে এই আজ। আমাদের এই যে স্লিপিং হলো (ঘুমের উপত্যকা বলবে?) তাতে যখন ভোর ভোর আলো তখন বিদ্যুতের দাগ পড়ার মতো (না তুলনাটা একেবারে বাজে হল, কারণ বিদ্যুৎ উজ্জ্বল আর মেঘ কালো সেজন্য বিদ্যুৎ খুব স্পষ্ট, মেঘের মধ্যেই মেঘের চাইতে একটু বেশি ঘোর রং বিদ্যুতের হলে তুলনাটা ঠিক হয়) কিংবা বলো সন্ধ্যার বাদামি ল্যান্ডস্কেপে লাইন ধরে দ্রুত ছুটে

যাওয়া গ্যাজেলগুলোর টানা একটা দাগ; তারা এই স্লিপিং হলোর একেবারে প্রান্ত দিয়ে কিন্তু এপার থেকে ওপার সাঁকোটাকে ছাড়িয়ে ছুটে গিয়েছে। তারা দেখালো বটে স্নিগ্ধ টানের মতো, (কিন্তু তুমি তো জান) তাদের প্রত্যেককে যদি আলাদা করে দেখো, প্রত্যেকের হাতের নীল-নীল রাইফেলের ভিতরে আগুন-আগুন গলা লোহা।

অ্যানাসিন হাসল, যেন এখনই বলবে এ, পি, সির কোনটা কত হারে মিশিয়ে অ্যানাসিন তৈরি হয়। বললে—আমাকে ক্রিস্টোফার বলল যে আইভি নাকি তাদের দেখেছে দূরবীনে।

বললাম—তা হলে কি স্লিপিং হলো কিংবা ঘুমের উপত্যকা থাকছে?

অ্যানাসিন কথায় কথায় আমার হাতটা ধরেছিল, এতক্ষণে ছাড়ল, (নাড়ী ধরে ছিল, নাকি ব্লাড প্রেশারের যন্ত্রটা না থাকায় বেশিক্ষণ ধরে নাড়ী ধরে থাকতে হয়?) আস্তে আস্তে হাতটা আমার ক্রেটের উপরে পলিথিন বিছানো বিছানায় শুইয়ে দিল।

বললে- বাহ্, একদিন বিদ্যুৎ-জ্বালার মতো ওরা তোমার ল্যান্ডস্কেপের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল বলে কি ল্যান্ডস্কেপটাই বদলায়? আর তার চাইতে বড় কথা, কাল খামারে আমাদের নিমন্ত্রণ।

“এও কি মাখনের মতো করে সংগ্রহ করা হল?

না, না, বললে ডাক্তার, ‘আমার আর তোমার দুজনেরই। লাঞ্চ নাকি।

তা, হয়তো, পিঁয়াজ আর শশা দিয়ে সস্‌ থাকতে পারে। হয়তো তাতে মুলো পাতাও। শশা পাবে কোথায়? সেই ঠাণ্ডা মিষ্টি সুগন্ধের ফল!

বাহ্! বেশ তো রসুন কাঁচালঙ্কা মেথি গরম মাখনে ভাজার গন্ধ হতে পারে। এবং হয়তো দু-একটা করে রুটি, কিছু টাটকা ধরা পমফ্রেটের ভাজা। তুমি কি মনে কবো না, কোন কৌটোর মাংসকে উনুনে চাপিয়ে প্রায় টাটকাব মতো স্বাদে আনতে পারেও হয়তো আইভি। যাই হোক স্ত্রীলোক তো। আর এমন কি একটু ওয়াইন হয়তো প্রায় শেষ হওয়া ভাঁড়ার থেকে গ্লাসে এক আঙুল করে, তবু ওয়াইন তো। ক্রিস্টোফার নাকি একটা মিষ্টি জলের গর্তও খুঁজে পেয়েছে। বলো, এটা খবর নয়? আইভি বললে, বললে প্রেত্যয যাবে না একেবারে মিষ্টি ঠাণ্ডা জল।”

অ্যানাসিন দেখছি আইভির কথার সুর নকল করতে পারল। বললুম—আমরা কিন্তু পরস্পরের নৈকট্যে বাঁধা। যাকে বলে থ্রোন ইনটু ইচ আদার্স কম্পানি। তা প্রমাণ হল।

তুমি বলবে না কি জাহাজডুবির নাবিকদল? আর দারুণ রকমে অনিশ্চয়তাও।

দেখা যাক, এই বললুম আমি। আমরা কিন্তু খুব কমে খুশি। কেমন? নয়?

ডাক্তারের তৃতীয় জবানবন্দী

(অথবা যাকে সে লাস্ট সাপার বলতে চেয়েছিল)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কাউকে প্রবঞ্চনা করার লাস্ট সাপার ছিল না। বরং তাকে শেষ র‍্যাশন বণ্টন বলা যায়, কিংবা এক অভিজাতবংশের দেউলে হওয়ার আগের রাত, যদি সে অভিজাত পরিবারের তৎকালীন পরিচালক বিষম বেপরোয়া হয় এবং এমন কঠোর প্রকৃতির যে নিজেকেও বিদ্রুপ করতে ছাড়ে না। এরকম একটা ভোজের আসর কল্পনা করে নিতে পারলে তখন সহজেই বোঝা যায় যে, যারা সে ব্যবস্থা করেছে তারা যে নিদারুণ মানসিক চাপে ভুগছে, ভোজের আয়োজনটায় তা থেকে খালাস পাওয়ার উদ্দেশ্যই থাকে, যদি বা তা নিজের অজ্ঞাতেই হয়; আর চাপা জিনিস খালাস পায় যদি বিশেষ ভোজের আসরে, তা হলে শুধু যে সোডার বোতলের আর মদের গ্লাসের ছিপি উড়ে যায় তা নয়, মনের ছিপির যে মুখ সেটাও আলগা হয়ে যায়, মদ টেবিলে

আসার আগেই।

কিন্তু যারা সেই আসরে যোগ দেয় তারা সবাই কদাচিৎ চাপটার কথা স্বীকার করে। বরং উৎসবের মতো সেই ব্যাপারটার তলায় এমন কিছু আবিষ্কার করে যা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে উৎসবের কারণ বলে মনে হতে পারে। এবং একবার উত্থাপিত হলে নানা যুক্তি দিয়ে তা বোঝানো যায়। নতুবা বলতে হয় এসবই জস আব্রাম নামা এক ইয়াংকি আব্রামাইটকে সম্বর্ধনা জানাতে।

যেমন জস আব্রাম বলেছিল খাওয়ার শেষে হুইস্ট খেলতে বসে, যখন পেটে চাপ পড়ায় আমি ডম অ্যান্টনিওর সার্ভিস পিস্টলের বেল্টা কোমর থেকে খুলে হাতের উপর দিয়ে গলিয়ে বগলের নিচে রাখলুম এবং আইভিকে বলেও ফেলেছি, এটাকে এখন এভাবে রাখা যায়, কেমন? জস আব্রাম বলেছিল—ব্যালান্স অব পাউআরকে ঘড়ির ব্যালান্স হুইলের মতো মূল্যবান মনে করা উচিত। ব্যালান্স অব পাউআর না থাকলে অনেক আগেই ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে, চীন ভারতবর্ষকে, রাশিয়া চীনকে আক্রমণ করতো। অন্যদিকে হয়তো তখন ইন্দোচায়নাকে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়াকে জাপান ইত্যাদি। অথচ ব্যালান্স অব পাউয়ার থাকায় চীন, রাশিয়া ইত্যাদি ঘড়ির মতো অর্ডার মাফিক চলছে না? এবং এদিকে পাকিস্তান ভারতবর্ষে ব্যালান্স আসবেই।

জস্ আব্রাম—না এখানে কেউ কারো অতীত খুঁড়ি না। এবং এও ঠিক নয় যে হোয়েন ওয়াইন ইজ ইন অ্যান্ড উইট ইজ আউট; প্রকৃতপক্ষে মদ ছিল না। সেদিকে বরং ব্যাশনের শেষ বণ্টন যেন আক্ষরিক ভাবে সত্য। মদের বোতলগুলোর মাথায় বরং মোমবাতি বসানো হয়েছিল আলোটাকে বাড়াতে। পেট্রোম্যাক্স জ্বলবে এমন জ্বালানি কোথায় আর? না, এখানে কারো অতীত খুঁড়ে আর লাভ কি? কারণ এই হারানো দিগন্তে অতীত, অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেনের দিন থেকে গতকাল পর্যন্ত যে জীবন, তার সঙ্গে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংযোগ হওয়ার আর কী সম্ভাবনাই বা আছে? আত্মপ্রবোচিত স্মৃতিভ্রংশ যেন; যদি তা নাই হয়, হলে ভালো ছিল। মোটা কবজি, মজবুত একহারা শরীর, মাথার ছোট-করে ছাঁটা চুল সাদা হচ্ছে। এখানে আর নাপিতখানা কোথায় যে আবার ক্রুকাট করে নেয়া যাবে? বরং চুলগুলিকে আর কিছুদিনের মধ্যে কেশরের মতো পিছনে ঠেলে দিতে হবে, এবং মুখের দাড়িকে চৌকোণা রাখা যাচ্ছে না। নীল চোখ, যার চারিদিকে অনেক অভিজ্ঞতার কুঞ্চন যা সোনার ফ্রেমের চশমাতেও ঢাকে না, যেন অভিজ্ঞ, খুবই অভিজ্ঞ, দলপতি বুড়ো হাতি যেমন উঠতি যুবক হাতির তুলনায়, এবং সেজন্য মেয়ে হাতিদের বেশি টানবে এমন এক সুন্দর পুরুষ পশুর নমুনা।

এবং এই যে ব্যালান্স অব পাউআরের কথা বললে তাকে আপাতত যুক্তিসিদ্ধ মনে করাও যায়, যদিও আমি হাসলুম তখন জস আব্রামের কথায়, তাস ফেলার আগে। এবং আইভিও তাস ফেলল।

আইভির সেই বিশেষ ধরনের গুলির পাউচ সমেত ডম অ্যান্টনিওর সার্ভিস পিস্তল আমার হাতে পৌঁছে দেয়ার মধ্যে যদি নাই হয়, নিমন্ত্রণ করার সময়ে আইভি হেসে বলেছিল, পিস্তলটাকে কোমরে বেঁধো।

কে কাকে?

অথবা একি তেমন এক মরিয়া অবস্থা, যখন মানুষ অপরাধ করে যে মৃত্যু (মানসিক কিংবা আত্মিক বলো)-সেটাকে, কিছুই না করে যে মৃত্যু (একেবারে কিছু না করা মৃত্যু নয়?) তার তুলনায় ভালো মনে করে? কিন্তু কে কাকে?

আইভি কিছু দূরে দাঁড়ানো ক্রিস্টোফারকে হেসে বলেছিল, 'তাই নয়, কী বলো ক্রিস?"

তখনই ক্রিস্টোফার ব্রাগাঞ্জাকে দেখলুম এবং সেই অল্প আলোতেও আমার সন্দেহ নিরসন হল যে ডম অ্যান্টনিওর পাসপোর্টে লিখিত বয়সের তুলনায় কিছু কম বয়সী যে হাসি মুখের ফটো আছে, অন্তত সেই প্রথম এসে দেখেছিলুম যেমন, তা যেন বরং ক্রিস্টোফারেরই হবে। কিন্তু একথা

বোধ হয় এখানে আসে না এখন।

ব্যালান্স অব পাউআরের কথা ঠিক না হোক, সার্ভিস পিস্তল নেয়ার অন্য কারণও দেখানো যায়? যদিও এখানে পরের কথা আগে বলে নেয়া যেতে পারে, হুইস্টেব আসরও যখন অবশেষে ভাঙল আইভি বলেছিল, চলো ডম তোমাকে এগিয়ে দিই। ক্রিস কিছু আগেই অন্ধকারে একা বেবিয়ে গিয়েছে। যেন ছাতায় পৌঁছালে, চারদিকে যার কোন আবরণ নেই, বর্ষার বাতাস হু হু করে চাবিদিক দিয়ে বয়ে যায়, আমি নিরাপদ, মাঝখানে অন্ধকারটুকুর জন্য আইভির সঙ্গে থাকা দবকাব।) সার্ভিস পিস্তলের এই অন্য কারণটাও কম উত্তেজক ছিল না।

আলো তেমন উজ্জ্বল নয়, কয়েকটা মোমবাতি প্লেটে, অন্য কযেকটি শূন্য মদের বোতলেব গলায়। আহার্যই বা কোথা থেকে সুপ্রচুর হবে? তা হলেও সাজানোর কায়দায় বেশ ভুঁবি পরিমাণ যা থেকে মনে হয় যেন শেষ র‍্যাশন বণ্টন। কিন্তু অন্য উত্তেজক বিষয় ছিল পোশাক। আর তাতে সার্ভিস পিস্তল কোমরে বাঁধা বেমানান হয় না। এমন পোশাকের বাহাব যে এক বহু পুবনো অভিজাত পরিবারের দেউলে হওয়ার তুলনা মনে আসে। (যদিও প্রকৃতপক্ষে তা মানতে গেলে ডম অ্যামব্রোসিওর সেই গল্পকেও যা সে স্বপ্নে পেয়ে লিখতে চেষ্টা করছে এবং যা তার কাছে শুনে সুবত আমাকে বলেছে, সত্য বলে মানতে হবে, যেন সত্যি এটা ডম অ্যান্টনিওব গড এবং তাদেব সঙ্গে এরা যুক্ত এই তিন-চাবশো বছব ধবে।)

কিন্তু তুলনাটা মনে আসছিল। ডম অ্যামব্রোসিওর গলাবন্ধ সাদা সারপ্লিসেব উপবে বেশ বড একটা রুপোব ক্রস, সেকেলে বিছেহাবের মতো মোটা রুপোব হাবে যা তাব বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুলছে। তাব সারপ্লিসের উপরে প্রায় সাদা, একটা ভাঁজ করা সাটিনের চাদরই যেন।

ক্রিস্টোফার তো, এমন কি, মাথায় একটা চোঙা মার্কা উঁচু কাণা-উল্টানো টুপি পরেছে। কোমবে বেশ মোটা স্যাশ বেঁধেছে, এবং কাঁধের দুপাশে মেক্সিক্যান কায়দায় আর এক প্রস্থ চাদর, কানে কানবালা। (এসব কি সেকেলে তিন-চাব শো বছর আগে পর্তুগীজ অভিজাতদেব পোশাক ছিল বলে তার ধারণা?)

আইভিকে দেখেই কিন্তু যেন দেখার বৃত্তটা পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়। অন্য সময়ে যে নিচুগলার এবং উঁচু ঝুলের গাউন পরে তার বদলে বেশ লম্বা ঝুলের আর ঢিলে ছিটেব জামা পবেছে সে। গলায় আর হাতে সামান্য কিছু মোটা সোনার অলঙ্কার। চুলগুলোকে কি করে খোপায় জড়িয়েছে, আব তার উপরে রক্তলাল মসলিনের ভেইল। এবং, সেজন্যই বোধ হয, অদ্ভুত বকমে উঁচু মনে হচ্ছে তাব নাক। যেন সেই রাজকীয় কিছু এবং কী ভয়ঙ্কর রকমে দাম্ভিকা। এবং ক্রুরও নাকি?

এমন কি সুরত চেয়াবে বসতে কাঁধ থেকে বুক ঢাকে এমন উজ্জ্বল কমলা রঙের কিছু একটা এনে গায়ে জড়িয়ে দিল আইভি তার।

যেন এসব তোলা ছিল কোন বাক্সে, কোন এক ডিনারে এমন সব ফ্যানসি-ড্রেস পরার সুযোগের অপেক্ষায়।

সুরত হাসল। ভারি মিষ্টি করে হাসল। যেন এই অভিজাতদের মধ্যে খেতে বসে তার মন থেকে চাপ চলে গিয়েছে।

ডম অ্যামব্রোসিও বেশ গম্ভীর গলায় গ্রেস বললে: (সেটা হয়তো লাটিনই হবে যদিও আমি তার কতটুকুই বা বুঝি) এবং আমরা খেতে সুরু করলুম। সুবতের সেই রসুন মেথি কাঁচালঙ্কা নতুন মাখনে ভাজার ব্যবস্থাও হয় নি, পিঁয়াজ আর শশার টুকরো, আহা সেই ঠাণ্ডা ফল যার দাম এখন এখানে ততগুলো হীরার টুকরোই বটে—তাও ছিল না; কিন্তু ভালোই লাগল খেতে। বরং খুব প্রচুর আয়োজনই মনে হল, সেই সামান্য আয়োজনকে।

মন থেকে চাপ চলে গিয়েছিল, কারণ তুলনা যাই মনে আসুক, সত্যি তো আইভির অভিজাত

পরিবার কাল সকালেই দেউলে হবে এমন নয়। এবং আমরা যখন কথা বলতে শুরু করলুম, তখন বোঝা গেল আয়োজনটা অন্তত আজ সন্ধ্যা ও রাতের জন্য সার্থক হয়েছে, কেননা যেন মনের ছিপি-আঁটা চাপকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে; চাপ, সুতরাং, প্রাকৃতিক বিধানে হালকা হচ্ছে।

প্রথম বললে জস আব্রাম। (তার পোশাকের কথা বুঝি বলা হয় নি। সে কিছু পুরনোকে যোগাড় করতে না পারুক, অতি আধুনিক এমন কিছু সে পরেছে যে মনে হবে আমাদের সেই অভিজাতদের পুরনো আসরে সে হঠাৎ-এসে-পড়া ইয়াংকি একজন। সাটিন-হেন চকচকে খাকি রঙের প্যান্ট, তেমনি শার্ট, আস্তিনটা গুটানো যার ফলে হাতের উল্কি চোখে পড়ছে। এবং তার এই সরল আধুনিকতার জন্যই তার উপবেই সকলের দৃষ্টি পড়ছে। একবার এক নাটক দেখেছিলুম যাতে সবাই পৌরাণিক যুগের পোশাক পরা আর তাদের মধ্যে একজন, সেই নায়ক, একেবারে বিংশ শতাব্দীর পোশাকে।)

জস আব্রামকে আমার ইয়াংকি বলেই ধারণা হয়েছে। তার নীল চোখ, খয়েবি দাড়ি, কমলা রঙের ত্বকে—বেশ একজন রোদে পোড়া ইয়াংকি, যেন হার্ভার্ডেব কোন অধ্যাপক যে পরে এদেশে ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস নিয়ে এসেছে।

জস আব্রাম বললে (আব্রামাইটদের মনও কিন্তু ওদের পণ্য প্যাকিঙেব কায়দায়, যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গোছানো), চীনারা একটা অভিসম্পাত দেয়, মে ইউ লিভ ইন ইন্ট্রেস্টিং টাইমস। একথাটা কিন্তু চীনা নয়। তবে এটা যে চীনা শব্দের অনুবাদ এবং অভিসম্পাত তা ডি, ডব্লু, ব্রোগানের অথরিটিতে আমরা মেনে নিতে পারি। অথচ শুনে মনে হয় কেউ যেন আশীর্বাদ করছে, ঈশ্বর তোমাকে দেশের ইন্ট্রেস্টিং সময়ে বাঁচতে দিন। এটা চীনাদেব ধরন। ওদের ভাষা, জানেন, এমন অক্ষরে লেখা যে ক্যান্টনের একজন আর সাংহাইয়েব একজনকে একই বই পড়তে দিলে ওবা, একেবারে পৃথক দুটো ভাষাই যেন, এমন উচ্চাবণে পড়তে থাকবে। একই শব্দকে একজন পড়লো চেং আর একজন পড়লো স্বে। অর্থাৎ একটা রিডল। আমি বুঝতে পারি না রেডবুক নামে যে বই আছে তা একই সঙ্গে সব লোক পড়ে কি করে। আমাদের কি এই রিডলওয়ালাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে? যদিও তারা আমাদের প্রতি এখন বন্ধুভাবাপন্ন, খুবই বন্ধুভাবাপন্ন।

আইভি বললে, খুব ইন্টারেস্টিং তো এই ভাষাব ব্যাপার।

জস আব্রাম হাসল। ভাষার কথায় ভাষায় দিকেই লক্ষ্য যায়। দেখলুম, অন্তত মনে হল জস যে ইংরেজি বলছে এমন কি যে ভাঙাচোরা উর্দু, তাতে বেশ একটা অনুনাসিকতার টান আছে। যেন তা হার্ভাড কিংবা ওকলাহোমার টানই বা। হয়তো বা ইউরোপীয় পূর্বপুরুষের জার্মান-ডাচ ভাষার ভঙ্গি এখনও মুছে যায় নি।

সে বলল—আসলে কিন্তু এটা একটা অভিশাপই। ইংরেজিতে এটাকে বলা যায় হ্যাপি দি ক্যান্ট্রি দ্যাট হ্যাজ নো হিস্ট্রি। যে দেশের ইতিহাস নেই সেই সুখী। কারণ ইতিহাস তো সেই নাটক যাতে আমরা অংশ নেই, যা করুণ, বেদনার্ত, এক কথায় বিয়োগান্ত। খুব দুঃখের, খুবই দুঃখের। কিন্তু এই বিয়োগান্ত ঘটনাগুলি এক সময়ে জাতির ব্যথায় ভরা মহামূল্য উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়ায়। এবং এই উত্তরাধিকারই জাতিকে প্রতিবেশীর, যার এমন উত্তরাধিকার নেই, তুলনায় যেন ভাগ্যবান করে। এটা প্রেমের ব্যাপারের মতোই। যে স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ কোনদিনই ভালোবাসার বিপদে পড়ে নি, তাদের কি ভালোবেসে যারা কেঁদেছে, ব্যথা পেয়েছে, গঞ্জনা সহ্য করেছে, এমন কি টাকা পয়সার বেহিসেবী খরচায় সর্বস্বান্ত হয়েছে-তাদের তুলনায় দুর্ভাগ্য মনে হয় না! আমেরিকান গৃহযুদ্ধের কথাই মনে করুন। কী ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছে তার জন্য উত্তর এবং দক্ষিণকে, কিন্তু সেই যুদ্ধই কি আমেরিকাকে পৃথিবীর চোখে যার এক মহান অতীত আছে এমন একটা জাতিতে পরিণত করে নি? নতুবা আমেরিকাকে কি এক গৃহহীন উদ্বাস্তু ইউরোপ বলেই মনে হতো না?

ম্যাথু আর্নল্ডকে জানেন তো, সেই কবি এবং বিচক্ষণ নন্দনতত্ত্বের লেখক। তিনি বলেছেন, আমেরিকান গৃহযুদ্ধ, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট আব্রাম লিঙ্কনকে হত্যাই আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসকে ভদ্রগোছের করেছে।

সুরত বললে হ্যাঁ এ রকম একটা কথা শুনেছি বটে।

জস আব্রাম তার কলারের মধ্যে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে নিল। তখন লক্ষ্য করলুম, তার বাঁদিকের চোয়াল থেকে কান পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে বটে। মনের কথা বলা যায় না, কখন কী যে ধরে। মনে হল, একটা রসিকতার মতো, কিন্তু অ্যামনেশিয়া হওয়ার পক্ষে ওটা খুবই নিচে, বেশ নিচেই বলতে হবে।

জস বললে (বেশ অনুনাসিক টানেরই ইংরেজি), যদি ভেবে দেখেন সব পুরনো রেসপেকটেবল জাতেরই এমন একটা যুদ্ধের রক্তক্ষয়ের বেদনার ইতিহাস আছে। যেমন বা হিন্দুদের কুরুক্ষেত্র। এবং বলা যায় এই সব দারুণ দুর্ঘটনাই জাতির ইতিহাসকে মূল্যবান করে। যেমন ধরুন ফরাসীদের রেভেলুশান, জার্মানদের ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, বৃটেনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্য হারানো। আমেরিকান গৃহযুদ্ধে কত লাখ লোক মরেছিল, যুদ্ধে, অসুখে এবং তার চাইতেও কত বেশি বীভৎস রকমে অঙ্গহীন?

কিন্তু এর অন্য দিকটাও বুঝুন। সেটা কী অদ্ভুত রকমের গৃহযুদ্ধ! সে তো শুধু উত্তর আর দক্ষিণের যুদ্ধ নয়, ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতাপুত্রে। কারণ উত্তর সৈন্যদলে যেমন দক্ষিণের বাসিন্দা ভর্তি হত তেমন দক্ষিণের সৈন্যদলে উত্তরের বাসিন্দা ছিল।

কিন্তু তারপর? আব্রাম লিঙ্কন না হয় প্রাণ দিলেন আততায়ীর হাতে কিন্তু তাঁর মতো এতবড় প্রেসিডেন্ট আর কে আমেরিকার? আর সেই যুদ্ধ কি সেই গর্ব করার মতো সেনাপতিদের উপহার দেয় নি জাতিকে, সেই সব সেনাপতি যাদেব স্মৃতিতে যেকোন আমেরিকানের বুক ফুলে ওঠে, সেই লী, শেরিডান, গ্রান্ট, শের্ম্যান? এখন কি কেউ খোঁজ করে এদেব কে দক্ষিণী আর কে উত্তরের?

সুরত বলল, আপনি ঠিকই বলছেন।

লক্ষ্য করলুম, সুরতের চোখ চকচক করছে। এবং তার কাঁধের উপর যে কেপটা পরানো হয়েছে তার কমলা ছায়ায় তার মর্মর-সাদা গাল বেশ লালাভ দেখাচ্ছে।

অ্যামব্রোসিও বললে, আমাদের এই পুব-পশ্চিমের ব্যাপার? (সে বুকের ক্রসটাকে নিয়ে খেলা করল)।

জোস আব্রাম বলল, দুটো কথা। সে দুটো আঙুল তুলল, হাসল। যেন সে একজন আমেরিকান প্রফেসরই, টেলিভিসনে বক্তৃতা দেয়ার সময়ে যার সোনালী চশমায় আলো চমকে গেল।) এক: এইসব টিক্কাখান, নিয়াজি, ওমরাওখান, এমন কি এদের ওসমানি, সিদ্দিকি এরা সবই স্মৃতিতে সেই সব লী, গ্রান্ট, শের্ম্যান, শেরিডানই হবে এক সময়ে। দ্বিতীয় কথা, এই যে ইয়াহিয়া যাকে এখন একজন ছোট্ট দেশের প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল বলেই লোকে জানে, তিনি আব্রাম লিঙ্কনের মতো দেশপ্রেমিক এবং প্রথম শ্রেণীর এক রাজনীতির দার্শনিক বলে খ্যাত হবেন।

সুরত বললে, সুতরাং এ যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকানদের উৎসাহ থাকবেই।

তাই থাকে না? মানুষ মূলত মহান। সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতায় যা ভালো তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। জস আব্রাম বললে—সেজন্য আমেরিকানরা স্বভাবতই খুব গভীর ভাবে এই গৃহযুদ্ধে আগ্রহী। যেন বা তারা চায় এই যুদ্ধ তাদেব সেই গৃহযুদ্ধের মতোই রক্তক্ষয়ী ও ভয়ানক হোক, যেন ঐতিহাসিক হয়।

অ্যামব্রোসিও বললে—হয়তো তাই, হয়তো তাই। আর এই যে অন্য ব্যাপার তাতে হয়তো আমাদের অন্য' বন্ধুর এমনি আগ্রহ। তিব্বতে নাকি একটা ভালো একসপেরিমেন্ট চলছে। সেখানে

পুরুষরা লামা হয়ে থাকতো। এখন সেজন্য চীনা পুরুষ সেদেশের মেয়েদের বিয়ে করছে, বিয়ে করছে, বিয়ে করছে। ভালো গ্রাফটিং।

এ যেন ডিনারের পরের বক্তৃতা যা আগেই শুরু হয়েছে। নতুবা সেই থিয়োরির কথা বলতে হয়, যে মনের ছিপি হিসাবে যে মুখ, তা খোলার জন্য মনে এক দারুণ চাপ ছিল যা আর চেপে রাখা যাচ্ছে না।

ক্রিস্টোফার ব্রাগাঞ্জা হাসল। তার পোশাকটা সম্বন্ধে আবার আমার অসুবিধা বোধ হল। ক্রিসের পোশাকে ওটাকে তো মেকসিক্যান সমব্রেরোর মতো লাগছে, এমন কি কোমরের বেল্টটাও, যাতে কালো চামড়ায় অনেক রুপোর চোখ বসানো। এটা কি প্রকৃতপক্ষে ঠিক পোশাক হয়েছে, এই সাপাবের উপযুক্ত? দাড়িটা হয়তো কিউবান ব্যাটিস্টার মতো। কিন্তু কি মেকসিকো, কি কিউবা, তাদের সেরিমোনিআল পোশাকে কি পর্তুগীজদের বদলে স্প্যানিআর্ডদের প্রভাবই বেশি থাকে না? আমার তো ধারণা ছিল, বরং ব্রেজিলিয়ানদের সেবিমোনিআল জাতীয় পোশাকে তবু কিছু পর্তুগীজ ছাপ আছে। অবশ্য বলতে পারা যায়, নাট্যমঞ্চেও অত নিখুঁত বিচার করা হয় না পোশাকের ব্যাপারে; এবং পুরনো কাঠের বাক্সে এমন সব ঘরোয়া ফ্যান্সি ড্রেস ডিনারের জন্য যা তোলা থাকে তা তেমন সাজানো গোছানো কমপ্লিট সুট হবে এমন কথা নেই। তা না হলে, অর্থাৎ ক্রিসের এই পোশাক যদি কোন বিশেষ যুগের পর্তুগীজ ভদ্রব্যক্তিব পোশাকই হয়ে থাকে তবে মানতে হবে এক সময়ে স্প্যানিআর্ড ও পর্তুগীজদের পোশাক পবস্পবের কাছাকাছি ছিল, যেমন এখন বৃটিশ ও ফরাসী সান্ধ্য পোশাক একই রকম। এটা মানলে, আবাব সেই পুবনো কথাই মনে হবে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা অভিজাত পরিবারের সেবিমোনিয়াল বাৎসবিক সাপাব (যদি দেউলে হওয়াব কথাটাকে এখন ভুলি)।

পরিবেশনটা আইভি করছে। কিছু আগে সে কৌটোর মাংসকে নতুন ক'রে সাঁতলে কিছু মশলা মিশিয়ে ইতিমধ্যে পরিবেশন করেছে। দেখলুম শুধু অ্যামব্রোসিও নয়, সুরতও প্লেটে লেগে থাকা গ্রেভি আঙুল দিয়ে তুলে চেটে খাচ্ছে। আব তা দেখে আইভি খুব খুশি হয়ে যেন সুবতকে লক্ষ্য করছে; খানিকটা দাম্ভিক, খানিকটা খুশি; লক্ষ্য করলুম, আবার কাউকে কাউকে হাল ফ্যাশানের উঁচু ঝুলের নিচু, গলাব গাউন, যা সেকালের তুলনায় নিলাজ—যা আইভি পরে যখনই সে আর শাড়ি পরতে চায় না—তার চাইতে বরং নিচু ঝুলের উঁচু গলাব গাউন এবং লজ্জাশীলতার ভেইলে অনেক বেশি ভলাপচুযাস দেখায়। (আবাব সেই ভাষা নিয়ে গোলমাল। কী বলবো, বিশেষ অর্থে আকর্ষণীয়া?)

আইভি উঠল। বেশ উৎসবের কায়দায় একটা ঝকঝকে কাচের জাগ হাতে নিল। সামনে সাজানো তেমন সব কাচেব গ্লাসে অতি সাবধানে, যেন কত দামী বা সে মদ, সে জল ঢেলে দিল। পুরো গ্লাস নয়। বলল—এটা কিন্তু আমাদেব টিউবওয়েলের জল নয়। ক্রিস যে স্বাদু জলের গর্তটা খুঁজে পেয়েছে এটা সেই জল। দেখুন কেমন বরফের মতো ঠাণ্ডা, হীরার মত উজ্জ্বল, আর কী অসম্ভব রকমে মিষ্টি, যেন নারাঙ্গির রস।

আমরা সকলেই সে জলের স্বাদ নিলেম। অ্যামব্রোসিও বলল—ধন্যবাদ ক্রিস।

দেখলুম, একবার সেই জল ঠোঁটে লাগিয়ে গ্লাসটাকে নিজের কপালে গালে লাগিয়ে তার স্নিগ্ধতাকে যেন অনুভব করছে সুরত। এতদিন সে গরম কফি পেলেই তার কবোষ্ণতাকে কপালে ছোঁয়াতো দেখতুম।

বললুম—আহ্ সুরত।

সুরত বলল—ওয়ান্ডারফুল। একে কি কুলথ্ বলবো। কুল্ থেকে নাউন্? আইভি হাসল। ক্রিসও। কিন্তু পোশাকের জন্যই হোক বা আলোর জন্য ওর নাকটাকে তীব্রভাবে তীক্ষ্ণ মনে হল। এর আগে আমার মনে হয়েছিল যেন আইভির নাককে অভিজাত এবং উঁচু দেখাচ্ছে। আর সেই নাকের নিচে

ওর হাসি যেন ধারালো।

ক্রিস বলল—ডিং ডং, ডিং ডং, একবার এগোনো একবার পিছনো, এই যুদ্ধ যা হয়তো ঐতিহাসিক তা কিন্তু ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত করে। আমি নিছক ক্লান্তির কথা বলছি। মার্চ, মার্চ, মার্চ। এক সময়ে মানুষের মেজাজ খারাপ হয়। মনে রাখতে হবে সৈন্যরা শ্রমিকই। কৃষকদের মতোই তারা। তাদের বেশির ভাগই ক্ষেতমজুরির পেশা ছেড়ে সৈন্যদলে এসেছে। তারা একদিন ভাবে এই হাতিয়ার টেনে লাভ কী? ওদিকে গুলি-গোলাও কমতে থাকে। যুদ্ধের এই এক নেশা আছে, ওরা যতক্ষণ গুলি ছুঁড়ছে, ঘায়েল করছে, ততক্ষণ আমিও তার উত্তর দিতে থাকবো। সে সময়ে যদি গুলি-গোলায় টান পড়ে তখন একটা হতাশা আসে, নিজের সঙ্গীর মৃত্যুকে নিছক লোকসান বলে মনে হয়। শ্রমিকদের মতো সৈনিকরাও তখন ধর্মঘট করার মতো মনের অবস্থায় পৌঁছে যায়। আর তখন হঠাৎ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় সেই সব সাধারণ মানুষ যারা শুধু এই প্রথম সৈনিক হয়েছে। সেই অবস্থায় হঠাৎ তারা রাইফেল ঘুরিয়ে ধরে। শত্রুপক্ষ কাউকে, নির্বাসিত কাউকে, সেই বিশৃঙ্খলায় পাঠায় তার নিজের দেশে। সে এসে ধর্মঘটী সৈনিকদের চালনা করতে থাকে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে চটপট শান্তি স্থাপন করে নেয়। এবং এক নতুন ইতিহাসের পত্তন হয়। সেও এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। সেই শত্রুপক্ষের সঙ্গে স্বদেশের আপাত লজ্জাকর সন্ধি, সেটাকেই ধর্মঘটি সৈনিকরা একসময়ে মহত্তম বিপ্লবের ইতিহাস বলে। ভাবুন আপনারা লং মার্চের পরের কথাও। সেখানে চিয়াং এর পরাজয়ই কি প্রয়োজনের ছিল না? এই যুদ্ধ যাতে পাশাপাশি দুই দেশ জড়িয়ে পড়েছে তাতে দুই দেশেরই দুর্বলতা আসছে, আসা অনিবার্য। এই কি সুযোগ নয় পুরনোকে ভেঙে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার। দেশদ্রোহ বলবে? দেশের চাইতে কি বিপ্লব বড় নয়? তা বিশ্বাসঘাতকতা বলবে? তা হলে সব ঐতিহাসিক বিপ্লবই কি ছোট হয়ে যায় না? দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড রেভেলুশান।

ক্রিস যেমন পোশাকে তেমন যেন তার অভিনয়ে। শারাডই বরং বলা উচিত, যেমন বিদেশের বই থেকে জানা যায়, যা কখনও কখনও অভিজাতদের হলে ওরা করে। নাটকের বই নেই, কেউ প্রম্পট করে না, ফ্যান্সি পোশাক পরা অতিথি এবং গৃহস্থ মিলে কখন মূক অভিনয় করে, গান করে। সেই গান শুনে অন্য কারো বক্তৃতার কথা মনে হয়। সে বক্তৃতা থেকে অন্য কেউ অন্য বিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুপ্রেরণা পায় এ-ও যেন তাই। যেন ক্রিস কিউবান কবিদের মতো বিপ্লবের পার্ট অভিনয় করছে। তার চোখ এমন চকচক করছিল লোভে, যেন তখনই সে সেই বিপ্লবের ফলভোগ করছে। কিন্তু তা যে নয় তাও দেখাচ্ছে। যেন একজন বিপ্লবী কবি টুপ করে সাধারণ হয়ে গেল। সে তার জামা থেকে রুটির টুকরো খুঁটে খুটে ফেলে দিল। দুহাতের তেলো ঘষে হাত ঝেড়ে নিল।

এবার তা হলে কে বলবে? টেবলে যেভাবে বসেছি তাতে আমাকে বলতে হয়। কিন্তু আমার এই ডম অ্যান্টনিওর পরিত্যক্ত জামা-কাপড়ে কোমরে চকচকে নীল সার্ভিস পিস্তল বাঁধা সত্ত্বেও বড়জোর টুপি-ছাড়া একজন জাহাজের মাতাল নাবিকের মতো দেখাতে পারে। একবার ভাবলুম, সি-আই-এর কথা শুনি, ছদ্মবেশী সি আই-এ-র মতো কথা বলবো কি? কিন্তু জস আব্রামের মতো উর্দুতে কিংবা ইংরেজিতে আমেরিকান অনুনাসিক টান দেয়া কি সম্ভব হবে?

কিন্তু সুরত কথা বললে। খুব যেন কৌতুক বোধ করেছে। ওর সেই হিপি-মার্কা দাড়ি-ঢাকা মুখে কী এক অদ্ভুত আনন্দের হাসি। একবার সে জলের গ্লাসটাকে জড়িয়ে ধরল যেন আঙুলগুলোকে সে এক স্নিগ্ধতার নেশায় চুরচুর করে নিলো। কমলা কেপের সব নিচের হুক খুলে দুটো প্রান্ত দুহাতে টেনে ধরল দুপাশে, যেন বুকে কিছু গোপন রাখবে না, কোন গোপন কথা।

বলল, কিন্তু ক্রিস, এসবই হতো বিশের এবং চল্লিশের দশকে। হতে পারতো। কিন্তু এখন? এখন গুলিগোলা ফুরাবে না। পৃথিবীর যোদ্ধবাহিনীকে খাওয়াতে ও অস্ত্রে সজ্জিত রাখতে পৃথিবী এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বছরে খরচ করে। এই টাকাটা গোটা আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যর একশো ত্রিশ কোটি মানুষের সারা বছরের আয়ের চাইতে বেশি। যুদ্ধ, যুদ্ধের অস্ত্র, যোদ্ধবাহিনীর বেতন ইত্যাদিতে সারা পৃথিবীব উৎপাদনের শতকরা সাত ভাগ ব্যয় হয়ে যায়, সারা পৃথিবীর শিক্ষার জন্য ব্যয়ের যা আড়াই গুণ বেশি। যুদ্ধাস্ত্রের গবেষণায় আঠার হাজার তিনশো কোটি টাকা খরচ করা হয বছরে, আর ওষুধের গবেষণায় খরচ হয় দুহাজার নশো কুড়ি কোটি। এই যে খরচ তার পাঁচের চার ভাগ খরচ করে পৃথিবীর ছটা দেশ। যুদ্ধ, যুদ্ধসংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র তৈরির গবেষণা, যোদ্ধবাহিনী মিলে ছয় কোটি লোকের কাজের সংস্থান যা মোটামুটি ফরাসী দেশ বা বাংলাদেশের লোকসংখ্যার সমান। এ হিসাবে রাশা বা আমেরিকাব মহাশূন্য গবেষণার কথা ধরা হয় নি যার অর্ধেক উদ্দেশ্য যুদ্ধসংক্রান্ত। আহা, ক্রিস তুমি কি এই ছয় কোটি লোককে বেকার করতে চাও? তাতে কি বেকার সংখ্যা হঠাৎ এমন বেড়ে যাবে না যে যার চাপ অসহ্য হবে? আহা, ক্রিস, তুমি কি দেখো নি, এক লক্ষ জোড়া জুতোর দাম, যা এক লক্ষ লোক এক বছর অন্তত পরবে, তা দিয়ে একটা তেমন ভালো ফাইটার প্লেন হয় না। বলো, এক লক্ষ জোড়া জুতো বিদেশে চালান দেয়ার চাইতে একটা ফাইটার চালান দেয়া ভালো কি না? তুমি কি পৃথিবীর ট্রেড কমার্সের গোড়ায় আঘাত করতে চাও? না, তা তুমি চাইবে না। সুতরাং কোন যুদ্ধেই আর গোলাগুলির কমতি পড়বে না।

ঝুরঝুব করে হাসি ঝবে পড়ছে সুরতের ঠোঁট দিয়ে—আর বলো, এ ব্যবসা ছাড়া আর কোন ব্যবসা চলবে? আফ্রিকা এশিয়ার দেশগুলি, সাউথ আমেবিকাব দেশগুলিও যদি কাপড়, জুতো, এমন কি মোটর গাড়িও তৈরি করতে শিখে যায়? আগে ওরা তুলো আমদানি কবে বিশগুণ লাভে কাপড রপ্তানি করতো, এখন ওরা, হ্যাঁ, আমেরিকা, কমিকোন এবং ইউরোপীয়ান কমন মার্কেট, সাইকেল, কাপড়, জুতো ইত্যাদি সেকেলে জিনিস আমদানি কবে পঞ্চাশগুণ লাভে ফাইটার আর সাবমেরিন বপ্তানি করবে আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় সুতরাং—

ক্রিস হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। সুরত মাথা নোয়াল যেন হাততালিব অভিনন্দন কুড়াবে।

ভোজসভার পরে হুইস্ট। এবং সেখানে কেন কোমর থেকে পিস্তলের বেল্ট খুলে বেল্টটাকে কাঁধের উপরে ঝুলিয়েছিলুম যাতে পিস্তলটা বাঁ বগলের নিচে থাকে আর সেখানে জস আব্রাম ব্যালান্স অব পাউআরের কথা বলেছিল তা এর আগেই বলেছি।

সুবত ঠাণ্ডা জলটা আবার খেল। সুমিষ্ট সুস্বাদু জল যাকে প্রকৃত পক্ষে জল বলা যায়। আমারও খুব ইচ্ছা হল একটু জল চাইতে কিন্তু এই লোনা জলের দেশে তা করা অতিথির পক্ষে উচিত হবে কি? মনে পড়ল সুরতের দিকে চেয়ে জলের স্পর্শে ওব কুলথ শব্দটা মনে এসেছে। কুল, স্নিগ্ধশীতল; সেই স্নিগ্ধশীতলতার ভাব।

এই শব্দটাকে কি আমি কখনও পেয়েছি? একি এখনই সুবত বানাল? কিংবা এটা কোন কবির কথা যা হঠাৎ কোন রসজ্ঞেরই চোখে পড়ে?

হুইস্ট আর মদ শেষ হল। ক্রিস আগেই চলে গেল। অন্ধকারে। বোধ হয় সাপারের পরে সেই ওয়াক এ মাইল। মোমবাতি বদলানো দরকার হচ্ছে এমন সময়ে আমিও বিদায় চাইলুম।

আর তখন আইভি বললে—ক্রিস অন্ধকারে একা বেরিয়ে গেল। চলো তোমাকে এগিয়ে দিই।

বললুম—না, এটা খুব বাড়াবাড়ি হয় আতিথেয়তার। আমি আর সুরত যাবো। ভাবলুম, বলি আমাদের ছাতার চারিদিকে তো কাপড়ের পর্দাও নেই। কিন্তু সুরত অবাক করল। দেখলুম সে খাওয়ার ঘরের পাশের ঘরে একটা ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে আছে। এমন নিশ্চিন্তভাবে সে ঘুম যে মনে হল

সে এই ঘুমের জন্যে দু-তিন হাজার টাকা খরচ করেছে। আইভি নিঃশব্দে হাসল। ঠোঁটে আঙুল দিল। হাত দিয়ে ইশারা করল পাশের ঘরের বিছানার দিকে।

এই হিপিদের কাণ্ডকারখানাই এই রকম। কাঁধে এখনও কমলা কেপটা তেমনি আছে। আর তা দেখেই আমার মনে হল এটা কৌতুকের হবে যদি কাল সকালে ঘুম ভেঙ্গে সুব্রত তার কাঠের ক্রেটের উপরে পলিথিন বিছানো বিছানার বদলে এই সাদা ধবধবে চাদরের নরম বিছানায় নিজেকে আবিষ্কার করে। কী বলবে তখন? এবার একটা শব্দ তৈরি করবে নাকি বিছানার নরম মোলায়েম প্রাচুর্য বোঝাতে?

দুজনে মিলে কুশন বালিশ দিয়ে আর একটু আরামদায়ক করে দিলাম সুব্রতের চেয়ার। সুরত একবার চোখ মেলল, তারপর (যেন অভ্যাসমতো বিছানা পেয়ে) ঘুমিয়ে পড়ল পাশ ফেরার ভঙ্গিতে।

আইভি বললে—এসো।

—এটা খুব ভালো, এই কৌতুকের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভোজেব আসর শেষ হওয়া, বললুম আমি।

তারপর আমরা চলতে শুরু করলুম বাইরের সেই অন্ধকারের নির্জনতায়।

পরে একদিন এই ব্যাপারের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, সেটা ছিল একটা কাল্পনিক প্যাবাবোলার শীর্ষবিন্দু। আমি শুনেছিলাম, যে কোন কিছু শূন্যে ছুঁড়ে দাও, যদি বাতাসের চাপ কম থাকে তবে তা যে পথে আবার মাটিতে ফিরে আসে এবং ওঠার যে পথ, দুয়ে মিলে প্যারাবোলা তৈরি হয়। কামানের গোলাও তাই। এবং কামানেব গোলা দূর পাল্লায় ফেলতে এই তত্ত্ব নাকি কাজে লাগানো হয়। (সে রাতেও অর্থাৎ এই যে এখন ঘোর বাদামি অন্ধকারে আইভি এবং আমি পাশাপাশি হাঁটছি, দিগন্তের চাইতেও দূবে আকাশে আলোব বিন্দু ফাটছিল, তা এত দূরে যে শব্দ আসছিল না, কিংবা আমাদেব কথায় ডুবে যাচ্ছিল, যখন আদৌ আসতে পারছিল।) আগে এখানে অনেক ঘাস ও শস্য ছিল, তারপর এক নিঃসাড় ঘুমেব উপত্যকা, অবশেষে আবার সুরতের আঁকা ভ্যান গগেব ছবির মতো এক ঘাস ও ফুলের, ঘাসেব মধ্যে ক্বচিৎ ফোটা হলুদ ফুলের, উপত্যকা হয়েছিল– এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে একটা অধিবৃত্ত হিসাবে আঁকা যায় যদি, তবে মোমবাতি মদেব বোতলের গলায় বসে যাকে আলোকিত করেছিল, সেই ভোজের আসরটা ছিল উত্তুঙ্গ বিন্দু। তারপর নামতে সুরু করেছিল। (তাকে কি নামা বলা উচিত হয়, যদি এই দিগন্তে হারানো দিনগুলিকে একটা ইতিহাস মনে না করি?) সেই যে ভোজের আসর সেই শীর্ষবিন্দু, যেখানে ওঠা আর নামার বিন্দু দুটি এক হয়েছে বলে অজ্যামিতিক উপায়ে বিন্দুটা বড়, একটু বেশি সময় লাগে তাকে অতিক্রম করতে।

বিদেশি বইয়ে (যা যুদ্ধের সম্বন্ধে যারা যুদ্ধ কবেছে তাদের কাবো লেখা বলে মনে হয়) এমন সব ঘটনার কথা আছে যাতে একটা হাঁস চুরি করতে গিয়ে সৈন্যদের কয়েকজন (যারা যুদ্ধের সব ব্যাপারে ক্লান্ত কিন্তু ভীরু নয়) জলাশয়ের বাঁক, জলধারার উপর অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় রিকেটি কাঠের ব্রিজ, লতা বেয়ে উঠেছে এমন ঘুমন্ত কৃষক বাড়ি দেখতে পায়। তা থেকে সেই সৈন্যদের ব্যবহার দেখে মনে হয়, এই সরল সাধারণ জিনিসেব যে টানটা আছে সেটা যে কী রকম টান তা সে সব সরল সাধারণ জিনিস থেকে দূবে গেলেই বোঝা যায়। যেমন ইজিচেয়ার পেয়েই সুরতের ঘুমিয়ে পড়ার সরল গভীর আনন্দ।

সেই সব বইয়ে জানা যায়, তেমন কোন কৃষকবাড়ির কোন মেয়ে বা বধূ সঙ্গের জন্য ক্ষুধার্ত সৈন্যর চোখে ইঙ্গিত ঠিক ধরতে পাবে আর তা দেখে অন্যেব অজ্ঞাতে (অজ্ঞাত থাকে কি সঙ্গিনীদের কাছে? তারাও তো সঙ্গ-ক্ষুধার্ত) ঈষৎ মাথা নেড়ে জানায়, সে রাজী। না এটাকে ভালো মন্দ কোন প্রশ্ন তুলেই দেখা উচিত নয়। এটা কোন কৃষকবধূর সৈন্যদের র‍্যাশনে পাওয়া একটু ভালো মন্দ

খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হতে পারে (যা থেকে যুদ্ধের দরুন অনেকদিন সে বঞ্চিত) কিন্তু খেতে বসে একটু হাসার ইচ্ছাও বটে কারণ (হয়তো কৃষকও সে সময়ে অন্য এক ফ্রন্টে সৈনিক, এবং তার সঙ্গ না পাওয়াটার অভাববোধ, অস্বাভাবিক, কামানে তোবড়ানো, সময়ের জন্য তীব্র।) এ ব্যাপারে দাম্পত্য বিশ্বস্ততা, কৌমার্য ইত্যাদি সব যেন মূলতুবি থাকে। (যেমন সুরত বুঝতেই পারল না যে সাদা চাদর ঢাকা নরম বিছানাটা কার।)

বইয়ে পড়া এই সব ব্যাপারকে বাস্তব বলেই মনে হয় নাকি? এই ঘুমের উপত্যকায় এরকম একটা ভোজ দরকার হয়েই পড়েছিল।

বেশ বাদামি অন্ধকার। আকাশে তারা। আইভির গায়ে সেই লম্বা ঝুলের গাউন। পায়ে পায়ে মৃদু শব্দ হচ্ছে সে গাউনে। বাতাস চলছে মৃদু মৃদু। তাতে গাউন উড়ছে, মাথার ভেইল। ছাতার দিকে সোজা না গিয়ে আমরা একটু ঘুরপথে চললুম। (পরে বুঝেছি—তখন শুধু ভালোই লাগছিল—সেটা কিছুক্ষণ পর্যন্ত হাঁটার জন্যই হাঁটা ছিল।) আইভি হাসছিল। আমিও দু-একবার জোরে জোরে হেসে উঠলুম।

সে রাতে ঘুমাতে বেশ দেরি হয়েছিল। ছাতা পর্যন্ত এসে বললুম—বসবে নাকি, আইভি, কফি করি।

আছে এখনও?

অবশেষে বিনা দুধ আর চিনিতে ঈষৎ গরম কফি ঢেলে নিলুম।

তখন আইভি একবার হেসে ক্রিসের কথা তুলল।

বললুম, তোমার কি মনে হয় যুদ্ধ ওভাবে হঠাৎ থামবে?

ক্রিসের কথা!

বললুম, সুরতের গল্পটাও মন্দ নয়।

আবার বলতে পারো। যেন স্ট্যাটিসটিকসের অধ্যাপক। অথচ বয়স তো কুড়ি ছোঁয় কি না। কিন্তু যা বলেছে তা যদি সত্যি হয়—আইভি জোরে জোরে হাসল।

সত্যি হলে কী হয় তা জানতে আমাদের তেমন গরজ অবশ্যই ছিল না। কফি শেষ করে আবার দুজনেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। অবশ্যই মহিলাকে একা ছেড়ে দেয়া যায় না, এ রকম কিছুই বলেছিলুম, যদিও তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলতে পারতুম, ক্রিস একা অন্ধকারে আগেই বেরিয়েছে।

খানিকটা দূর গিয়ে অন্ধকারে এক ঢিপির উপর আমরা পাশাপাশি বসেছিলুম। যেন খুব জরুরী সব আলাপ করতে। একবার আমি হেসে বলেছিলুম—ক্রিস একা অন্ধকারে বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ, আজ অন্তত তোমার তুলনায় তাকে ধারালো লাগছিল।

আশ্চর্য, আমি ভেবেছিলুম, ক্রিস কি আমাকে হিংসা করে, বেশ হিংস্র ধরনের হিংসা কেন করবে? ডম অ্যান্টনিও বলে মনে করেছি নিজেকে, এরকম বুঝেছে নাকি। ডমকে ও ঘৃণা করবে কেন? প্রায় ভাইয়ের মত সাদৃশ্য নয় চেহারার? কিন্তু ভাবতে ভাবতেই আমরা দুজনেই চমকে উঠলুম। পিছন দিকের দিগন্তের কাছে, অন্ধকারে যতটা আন্দাজ করা যায় অবশ্য, আলোর বিন্দু ফাটল। বেশ উজ্জ্বল নতুবা পিছন থেকে আলোটার অনুভূতি হতো না। তারপর শব্দ হল।

বললুম—ওদিকেও?

তাই দেখছি। একটু কি শিউরে উঠল আইভি?

কিন্তু তখনই খামারের এক জানলায় মোমের আলো চোখে পড়ল।

একটা ছায়াও।

আর তা দেখে আইভি বলল—(যেন ও আলোটা পাছে কোন সঙ্কেত হয়ে থাকে এরকম চিন্তা থেকে বোধ হয় তার মনে হল।) জস আব্রামকে আজই দেখলে?

হ্যাঁ।

আইভি হাসল, ক্রিস ওকে স্বাদু জলের সেই গর্তের কাছে কাঠি জ্বেলে কৌটোর সুপ গরম করতে দেখেছিল। রাত্রি বলেই আলোটা চোখে পড়ে। কিন্তু পালাতেও পাবে নি। খোঁড়াচ্ছিল। নাকি বলেছিল, সারেন্ডার করছি।

বেশি রকমের আহত কিনা জিজ্ঞাসা করতে, আইভি জানাল টিঞ্চার আয়োডিন দিয়ে ক্রিস বেঁধে দিয়েছে। একটু খোঁড়ায় এখনও। জানো, ক্রিসের ধারণা ও হয়তো যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদেব চাইতে বেশি খবর রাখে, এমন কি সি-আই-এর কোন এজেন্ট যে আমাদের সাহায্য করতে পারে। ও কিন্তু কিছু লেখে লুকিয়ে। শর্টহ্যান্ড হতে পারে। বুঝি না।

সেটা বড় কথা নয়। এই বাদামি অন্ধকার। কত বাত হল তাব কোন ঠিকানা নেই, দুজনে কথা বলছি।

অবশেষে আইভির হাই উঠল।

হেসে বললুম, চলো এগিয়ে দিই খামারের দবজা পর্যন্ত।

তিথির খবর কে রাখে? মাঝরাত হল কি না তাই বা কে জানে? একটা চাঁদ উঠেছে, ইউক্যালিপটাস গাছে আটকে ঝুলছে।

যদি বলো, একেই তবে প্যারাবোলাব শীর্ষবিন্দু বলতে হয় নতুবা বিদেশি যুদ্ধ উপন্যাসের এক দৃশ্য যা যুদ্ধের দৃশ্যের মাঝখানে বেশ রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

ডাক্তারের প্যারাবোলার নিম্নগতি সুরু হল

আব তাবপব থেকেই আমরা সেই কাল্পনিক অর্ধবৃত্তর বক্রতা বেয়ে নামতে লাগলুম। কিন্তু যেহেতু তা বক্র, অনেক সময়ে অনুভব হতো তা বৃত্তব পবিধি না হোক হয়তো বা উপবৃত্ত, এবং আমরা আবাব সেই বিন্দুতেই ফিরবো। হয়তো এখন বর্ষা সুরু হবে। আকাশেব চেহারা বদলেছে, উইপিং উইলোগুলোর উপর দিয়ে স্তরে স্তবে ইউক্যালিপ্টাস গাছটার ডালপালায় আটকে যাওয়া নানা চেহারার মেঘ আকাশে। ছাতার সাদা পলিথিনের কোথাও কোথাও ফুটো হয়েছে। তা ছাড়া বাতাসের তোড়ে বৃষ্টিব ছাঁটও আসছে কখনও। সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও—তা একেবারে পুরোপুরি না হলেও বিচ্ছিন্নতা বটেই—এই স্লিপিং হলো সুরতের, যার কেন্দ্রে ইউক্যালিপটাস নামের বিদেশি গাছ, প্রকৃতপক্ষে তাও তো সূর্যকে প্রদক্ষিণ কবে এবং তা এক উপবৃত্তের পথে, যদি তাদেব কথা সত্য হয়। এর পবে বর্ষা নামবে। হয়তো যে চার-পাঁচ হাত উঁচু টিলার উপরে আমাদেব ছাতা তার চারিদিকে দু একদিনেব জন্য জলও দাঁড়াবে। অর্থাৎ এক কথায় এখানেও ঋতু পবিবর্তন হবে। সুবত, অবশ্যই, হেসে বলতে পাবে ইংল্যান্ডে আর গ্রেনাডায় একই সঙ্গে ঋতু পরিবর্তন হয়। তাই বলে গ্রেনাডায় আর ইংল্যান্ডেব আকাশ-বাতাস-পরিবেশ কি এক হয়?

সুরতকে খামারের একটা ঘরে বাখা গিয়েছে। এই বাদলা-বাদলা বাতাসেই (এখন যা বইছে বোদ থাকা সত্ত্বেও) তার বুকের পক্ষে ক্ষতিকর, বৃষ্টির ছাঁটে পলিথিন-ঢাকা ক্রেটের বিছানায় ঘুমের মধ্যে ভেজার ফল, না বললেও বোঝা যায়। প্রথম সুযোগে সে আবার ইচ্ছা করেই ভিজেছে। মেঘের ডাকে বাতাসের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সুরত? ও বলেছিল, ফাইন। বললুম, ভিজছো নাকি, সরে শোও কোথাও। জল কোথায়? বলে হেসেছিল, যেন মানুষ সত্যি সত্যি যুঁইয়ের স্তবকের মতো পিপাসার্ত হতে পারে। কিন্তু এই ঘুমের উপত্যকাতেও, দেখলুম, ডাক্তার নিজের ব্যক্তিত্বের সব কিছু ফুটপ্রিন্টের ধোঁকায় লুকিয়ে ফেললেও ডাক্তারী কবার ঝোঁক এড়াতে

পারে না। আর তার প্রমাণ তো ববিনসনীয় কাযদায় বোট থেকে (সেটা কি সত্যি প্রায় ডেজড অবস্থা ছিল?) এই ক্রেটগুলো জড়ো করাতেই পেযেছি।

নতুবা বলতে হয় এটা সেই বোট থেকে নেমে আসা কোনও ওডেসিয়ুসের গল্প। যে ওডেসিয়ুসের পাশে এক রুগ্ন টেলিমেকুসও আছে। যেমন একদিন সুরতই বলেছে হাসতে হাসতে।

সুতরাং সেই নৈশভোজের আসবের দু একদিনের মধ্যেই আইভিকে বলেছিলুম, সুরতকে খামাবের কোথাও, বৃষ্টি থেকে বাঁচে তা হলেই হল, জায়গা দেয়া যায় কি না। (সুরত তো নৈশভোজের পবের দিন সকালেই সলজ্জ মুখে ফিরে এসেছিল। হাতে একখানা খবরের কাগজ। আমি যত বারই গত রাত্রিব ওর ঘুমিযে পড়ার ব্যাপারটা বলি, ও ততই কাগজে মন দেয়। যেন এমন আগ্রহ যে সেই পুবনো কাগজটাই ওর জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু হাসছিলও বটে।) প্রস্তাবটা করাব পবদিন সকালে আইভির বদলে ক্রিস এল। (না তাব পবনে সে সব মেকসিকান, কিউবান কিছু নয়। সাদাসিদে আধুনিক পোশাক।) এবং তার হাতে কিছু টাটকা শাকসব্জি, ডাক্তার হিসাবে কৌটোর খাবারে নির্ভর মানুযেব কাছে পাতাগুলোর দাম প্রায় সোনাব পাতের সমান। তখন ক্রিসের চোখকেও ধারালো মনে হল না। (যদিও আমার একবার মনে হয়েছিল আইভির সেই কথাটা· ক্রিস একা অন্ধকাবে বেরিযেছে কিছুক্ষণ আগে।) ক্রিসই সুরতকে নিযে যাওয়ার যোগাড করেছিল, কিছুক্ষণ জেরা করার পর। তার জেরার উত্তবে আমিই বা কী বলবো? সুবতেব মতো হিপি কি নিজের পবিচয দেয়াকে ফাশন মনে কববে? (এটা তখনকার ভাবনা, এখন এটা বদলাচ্ছে।) আমিই বা কী জানি তার সম্বন্ধে? অথবা কখনও কি খোঁজ কবেছি? একটা শর্তই যেন ছিল, আস্ক মি নো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ উইল বি টোলড নো লাইস। আমি বড়জোর বলতে পারি, প্রায় তিন মাস হতে চলল সুবতের এখানে, ও অসুস্থ। তিনমাস একটা ছাতাব তলায় থাকা ওর অসুখের পক্ষে খুব ভালো ব্যাপাব হয নি।

এটাই ক্রিসের পক্ষে যথেষ্ট ছিল এবং আজ পনেরদিন হল সুরত খামাবে।

সুরতের জন্য কিন্তু একা বোধ হয়, এটা স্বীকার না করলে নিজের কাছে (অর্থাৎ যে ডাক্তার অ্যানাসিন মাত্র) তার কাছেও একটা যাচ্ছেতাই মিথ্যা বলতে হয়। অথচ কী করতো সুরত? মাঝে মাঝে কথা বলা। (সে যে গোড়ায় সেই সব ধাবমান স্বেচ্ছাসৈনিকদেরই কিংবা পুবোদস্তুর সেই সব সৈনিকদের—যাদের দেখে ময়লা সবুজে ঢাকা বুল বেইটিংয়ের আহত ষণ্ড বলেই মনে হয়—দু-একটা অপারেশনের যা আমরা করেছি, তাতে সে আনাড়ি অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো সাহায্য করেছিল, তা তার কথা ভাবতে গেলে মনে আসে না।) হ্যাঁ, তাব কথাগুলোই। দৃশ্যপট তো একই, কিন্তু তাতে আমরা যা দেখি না তা সে অনুভব করতো।

সেই খবরের কাগজটার কথাই ধরো। আমি কী এই ভয় পেয়েছিলুম যে তাতে ৭২২ নং মোটরবোট সম্বন্ধে কোন সংবাদ থাকবে? এটা সেই ফুটপ্রিন্টের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত বলেই হয়তো অস্পষ্ট অবর্ণিতভাবে জাগছিল। কিন্তু চিন্তাটা স্পষ্ট হয়েছিল অন্যভাবে, যখন বলেছিলুম, তা হলে তোমার এই স্লিপিং হলোতে কাগজ আসে, একেবারে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই। এটা আশঙ্কার অন্য রূপ।

ও আমার দিকে চেয়েছিল। বলল, এটাও হয়তো স্বাদু জলের সেই গর্তের ধারেই ছিল। এই বলে সে হাসল।

আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যাই। জস আব্রামকে আহত অবস্থায় খড়-কাঠি পুড়িয়ে কৌটোর খাবার গরম করতে যখন দেখেছিল ক্রিস তখন হয়তো এই কাগজটাও জসের সঙ্গে ছিল।

সুরত বলল, জলটা যেন এখনও জিভে গালে জড়িয়ে আছে।

তা বলতে গেলে সেই স্বল্প আয়োজনের ভোজ যা আমাদের পক্ষে ভুরি, তাও প্রমাণ কবে সে সব খাদ্য আসছে। কেউ আনছে তো বটেই। যেন সেই সব বিদেশি গল্পই, নিছক খাবার যোগাড়

করার জন্য কাঁটাতারের বেড়া, জুড়িয়ে আসা ট্রেঞ্চ পার হয়ে কারো চলা। খবরের কাগজটা যেন এটা প্রমাণ করল, খামারেও সারা বছরের খাদ্যদ্রব্যের সঞ্চয় ছিল না হয়তো।

তারপর কাগজটা সে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ের কাগজ। স্বভাবতই সব খবরে ঢাকনা পড়ানো। কিন্তু কামানে সেন্সরের সাইলেন্সার পরালেই তা একেবারে নিঃশব্দ হয় না। ট্রেঞ্চের কাতরানি শোনা না গেলেও মাটিতে শুষে যাওয়া প্রায় কালচে চটচটে কিছু মনের মধ্যে অনুভব করা যায়। খুব দূরে দূবে কারা যেন কাঁদে। বললুম, সুরত—আমাদেব দ্বীপেব বাইবে যুদ্ধটা বেশ আক্রোশেই হচ্ছে।

ও হাসল। যেন আবার সেই হাজার কোটি টাকার কথাই বলবে। ও বলল—অ্যানাসিন, সকালে যে কাণ্ড হল! সেজন্যই আসতে দেরি। বলুন, চায়েব সঙ্গে যদি খবরের কাগজ আসে সকালে? আইভি আনাল শুধু চা বিস্কুট নয়, ট্রের একপাশে খবরের কাগজও। যেন একেবারে টাটকা। আতিথেয়তার কথাই। এতদিন তো কাগজ ছিল না। কাজেই এটাই টাটকা। কাজেই অতিথিকে চায়ের সঙ্গে দেয়া উচিত।

তুমি কি খুব উপভোগ করেছো তা হলে খববগুলো?

এই দেখ। কাগজ পড়া তো একটা আরামদায়ক অভ্যাস। যেমন নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়া। অর্থাৎ জীবনে যদি মূল্যবান কিছু থাকে তবে তা এই সহজে পাওয়া আরামদায়ক অভ্যাসগুলি।

ও হাসল।

কিন্তু এই খবরের কাগজ মানে কি বাইরের সঙ্গে আমাদের সেতু নয়?

সুবত তখন আবার বলল, অতীতেব সঙ্গেও আমাদের সেতু আছে। উইপিং উইলোর তলায়। আমরা কি সেটাকে ব্যবহার করবো?

একা বোধ হয় সুরতের জন্য। পনের দিন হল খামারে। অবশ্য ডাক্তাব হিসাবে রোজ একবার যাই। পবশুদিন সে ঘুমিয়েছিল। আমিও নিঃশব্দে চলে এসেছিলুম।

কিন্তু কাল। একটা কিছু আন্দাজ করেছিলুম। জ্বর ছাড়া না দেখে। ক্রমশঃ ওর কাশি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যাকে হিপিদের গাঁজা-টাজা খাওয়ার ফল বলে ভেবেছিলুম সেটা যে এমন কিছু তা ভাবতে পারি নি। ওপক্ষের তো কোন নালিশই নেই। কী ভয়ঙ্কর বেদনা, যন্ত্রণা হওয়ার কথা, মনে যত জোরই থাক, নিছক নার্ভাস রিঅ্যাকশনে মূর্ছা হলেও স্বাভাবিক। অথচ এই প্রায় তিনমাস নালিশ করা দূরেব কথা বরং গোপন করেছে, যেন চিকিৎসা করাটাতেই আপত্তি। মরফিনের ঝোঁকে কষ্ট ভোলার চেষ্টা করেছে হয়তো (যাকে আমি হিপি-জনোচিত নেশা করা আন্দাজ করেছিলুম) এবং হয়তো এখানে শেষদিন পর্যন্ত মবফিন পাওয়া যাবে এই আশাতেই তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিল। হা ঈশ্বর!

আমি বললুম, জ্বরটা কমাতে পারছি কিন্তু ছাড়ছে না। আজ একটু তোমাকে ভালো করে পবীক্ষা করবো।

বাইরে তখন ঝিরঝির করা বৃষ্টিটা ক্রমশঃ বাড়ছে। সাদা তীরেব ফলার মতো বাঁকা হয়ে পড়তেও যেন দেখা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে ও দেখছিল। আমার কথাটাকে যেন ও বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে। জল পড়ে কোথাও কোথাও ছোট ছোট ধারা তৈরি হচ্ছে মাটিব উপরে। গড়িয়ে যাচ্ছে সে ধারা। বলল, দেখবেন?

অন্য কোন সময়ে, মনে করা যাক কোন হসপিট্যালে কি রোগীর বাড়িতে এমন হলে (আমি সখেদে চিন্তা করলুম), এটা ক্লিনিকাল স্টাডি বিষয়ে আমার অপরাধ, প্রায় অবহেলাই হতো। না, তার কম নয়।

ডান দিকেব পাঁজরায় এখনও একটা স্টিকিং প্লাস্টারের পটি। কাছে আমার আঙুল আসতেই

ওর ফ্যাকাশে ঠোঁটের উপরে ওর দাঁত চেপে গেল। ব্যথা, সুতীব্র ব্যথাই। মানুষ কি এত সহ্য করতে পারে!

নালিশ করে না, ভবিষ্যতে কী হবে তা আগে থেকে জেনে নিয়ে। যেন অবোলা কোন প্রাণী। কিংবা একি, ভারতীয় মহাদেশেই মাত্র যেমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে, কারো সজ্ঞানে নিজের দেহকে চিতার আগুনে উৎসর্গ করা? তাদের নাকি তখনও এমন হাসিই থাকে মুখে।

একটা অপাবেশন করতে হবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এটা একটা দারুণ আঘাতের ব্যাপার। একটা প্রাথমিক চিকিৎসা হযেছে। হযতো একটু এগিয়ে গিয়ে লোহার টুকরোটা বার করেও দিয়েছে কেউ কোথাও। তারপব অসুস্থ অবস্থায সেই চিকিৎসার ঘাঁটি থেকে হাঁটতে সুরু করেছে। পুলিসের ভয়ে বলবে?

কিন্তু সেটা আমার আদৌ জিজ্ঞাস্য হবে কি এখন? মনে হচ্ছে কিছু একটা প্লুরায় আটকে আছে। এটা একটা চান্স যে লাংস তখন তখনই ছিঁড়ে যায় নি। এটা একটা চান্স যে রক্তপাতে তখনই মৃত্যু হয় নি আমার এই রোগীর। কিন্তু এখনই একটা অপারেশন দরকার, কারণ আমার ক্রমশঃ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে ভাবতে গিয়ে, গুলিটা যদি বার করেও থাকে, তা হয়তো বার করেছেও, ও পাঁজরাটা ভেঙ্গেছে। তার একটা টুকরো প্লুরায় আটকে আছে। অথবা পাঁজরার ওই হাড়টার এক অংশ ফেটে যাওয়ার ফলে বেঁকে প্লুরায ঘষে যাচ্ছে। কী যন্ত্রণা, কী অসম্ভব যন্ত্রণা হওয়ার কথা। যেতো, যে জন্যই মরফিন নেয়া সুরতের। কিন্তু একবাবও তাকে একটা অস্ফুট কাতব শব্দ করতেও কি শুনেছো?

কিন্তু অপারেশন, এই ঘুমানো উপত্যকায়? কত অসহায় আমাব বিদ্যা তা এই অনুভব করছি প্রথম। যেন আমার বিদ্যা কতগুলি যন্ত্রপাতি চালানোব কায়দা। সেগুলি না থাকায বিদ্যাও নেই। এক্সরে কোথায়, অ্যানাস্থেসিয়ার তাঁবু, এমন কি ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্রই বা কোথায়!

পরে আমি ভেবে দেখেছি অপারেশনটা যে আদৌ হয়েছিল সেটা আমাদের তখনকার সেই অবস্থা বলেই। শহরে ভালো হসপিট্যালে যা কবতে নার্ভ টান-টান হয় আমাদেব, এই উপত্যকায তা যে আদৌ হয়েছিল তা যেন সেই অবস্থাতেই মাত্র সম্ভব বলে; যেন তা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে নেমে আসা একজন ডাক্তার কবেছিল বলেই সম্ভব।

কিন্তু আজ, অর্থাৎ যখনকার কথা এখন বলছি, আবার যেতে হবে সুরতকে দেখতে। তাকে বলা দরকার, মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে। তার মত নেয়া দরকার। যেন এটা আমার প্রফেশনল এথিকসই। কিন্তু ওব কি কিছু ধারণা আছে (যা আমরা আশঙ্কা করছি), ওর শরীরের ভিতরে একটা যন্ত্রে কতটা পচন ধরেছে? ভাবো তো ওকে, সরু সিঁথিতে মাঝখানে চেরা বড় বড় চুল, বড় হয়ে বেড়ে ওঠা জুলফি দাড়ি, প্রায় কাগজের মতো সাদা কপাল, প্রায় সাদা ঠোঁট যাতে হাসি যেন লেগেই আছে।

দেখা হল। বললুম, সুবত, তুমি মত দাও। অপারেশন করতে হবে।

করবেন? এই বলল সে।

যেন এই সামান্য প্রশ্নটুকুতেই তার যা উৎকণ্ঠা আশঙ্কা, সব কিছু পার হয়ে এল।

লক্ষ্য করেছিলুম ক্রিস বসে আছে। একটা খুব পুরনো ছবিব বই নিঃশব্দে উল্টাচ্ছে। রোগীর দিকেই চোখ। রোগীকে না জানিয়ে নিঃশব্দে তাকে অ্যাটেন্ড করা। তাই বলে কি ওর নাকটা তীক্ষ্ণ নয়? (কথাটা তুলনা খুঁজে খুঁজে মন যেন তখনই তৈরি করল) সেকালের জলদস্যুদের মতো। এটা কি ভদ্রতার একটা বিধি যা মানা এই অদ্ভুত মানসিক চাপের মৌসুমেও সে ত্যাগ করতে পারছে না। যেন সে বলতে পারে (বলবে না, কেন না তাতে বিধিটাই লঙ্ঘন করা হয়), বাইরে ছিল, ছিল তাই বলে যখন আমাদের পরিবারের ছাদের নিচে এবং অসুস্থও বটে, আমরা না দেখে পারি?

সুরতের এক কথার নিশ্চিন্ততা, তা তো খানিকটা যেন আমার উপরে বিশ্বাস এরকম মনে হল,

(যদিও তা হয়তো তার সেই মনোভাবই যে কিছুতেই কিছু এসে যায় না এই হারানো দিগন্তের উপত্যকায় পৌঁছে) যেন আমাকে একরাশ স্নায়ুর জটে জড়িয়ে দিল। মনে পড়ছে, কাছের চেয়ারটায় বসে পড়েছিলুম।

বললুম—কী করছো, সুরত?

—মেঘ দেখছি।

জানালাটা বন্ধ। বাতাসে এখনও ভিজে ভাব। বন্ধ থাকাই ভালো হয়েছে। এখন নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা কিছু নেই। কিন্তু একটা লাংস যার কাজ করতে চাইছে না তাকে প্রায় একটা লাংসেব ভরসায় ক্লোরোফর্মের অ্যানাস্থেশিয়া দেয়ার কথাই আমার মনে হল।

হাতে কালি কেন?

ক্রিস হেসে বলল, চারকোল স্কেচ।

ও, আচ্ছা, ছবি আঁকছো?

আমাকে ভাবতে হবে। গভীর করে সামনে পিছনে ভাবতে হবে। আমাব ছাতাব তলায আব্রামাইটের সাজানো ক্রেটগুলি খুঁজে পেতে দেখতে হবে, কী কী যন্ত্র আছে, কী কী ওষুধ, ইনজেকশন আছে, ভিটামিন দিয়ে কতটা শক্ত বাখা যাবে; গ্লুকো-স্যালাইন দিয়ে কতটা রক্তক্ষয়ের ক্ষতি পূবণ করা যায় ; হর্মোন-থেরাপির কী কী ওষুধ আছে বা সম্ভাব্য হার্ট ফেলিওর রুখতে? অস্ত্রগুলোও চাই তো। আইভিদের আলমারি সব দেখতে হবে। ছাতার নিচে যা আছে সব। আইভিকে আলাপে আনা নয় শুধু। অপারেশনে ওপন করাব পর তাব কাছে কী সাহায্য পেতে পাবি; কতটুকু; যা সে জানে না, তাকে শিখিয়ে নেয়া যায়।

ক্রিস বলল, এখন তো চায়ের সময় ডাক্তার। বসুন, চা আনাই।

সে উঠে গেল।

সুবত বলল, অদ্ভুত রকমেব ভদ্র কিন্তু। যেন, যেমন গল্প শুনেছি, মধ্যযুগের অভিজাতদেব বিনয়। কিন্তু আপনি ঘামছেন তো।

জামাব আস্তিনে ঘাম মুছে নিয়ে বললুম--পাঁচ দিন। আর পাঁচ দিন চিকিৎসা, মানে অপাবেশনের আগে যা যা দরকার করে নেবো।

ছদিনের দিন।

ওর মুখে না হোক, কপালে কি একটু ছায়া পড়ল?

বলল—ছবি আঁকা চলবে তো পাঁচ দিন?

তা চলবে।

ও হেসে বলল, আমরা অবশেষে একটা কাজ পেলাম ছদিনের।

সুরতের সাক্ষ্য

অপারেশনটা কাল হবে যদি আমার দিনের হিসাব ঠিক হয়ে থাকে। অ্যানাসিন দিনে যে কতবার আসছে তা মনে রাখাই কঠিন। এখন দেখছি ইনজেকশনগুলো দিচ্ছে আইভি। কোন কোনটা দেবার সময়ে অ্যানাসিন নিজেও থাকে। মজা মন্দ নয়, আমার দিনের হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে।

আকাশে মেঘগুলো স্তরে স্তরে জমেছে। আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় নি। কাল সারাদিন তো বটেই। রাতে তো দরজা জানালার শার্সি কাঁপিয়ে ঝনঝনা তুলে এক খেপামি! যেন কেউ বলে উঠল, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে। আমাদের এই হারানো দিগন্তের দিগন্তকে

গলিয়ে দিয়ে নিজের কোন দিগন্তকে খাড়া করবে। আর সব চাইতে মজা, কাল রাতের জল মাটি আর শুষে নিতে পারে নি (কদিন যা হল তারপর পিপাসা মেটাবই কথা), সারাদিন ছোট ছোট ধাবায় উঁচু নিচু জায়গায় বসে যাচ্ছে। আজ কিন্তু রোদের মধ্যে দূরে দূরে মাঠের দিকে চাইতে অভ্রের মতো জমা নুন চকচক করতে দেখছি না। এটা হয়তো আমার ভুল। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন, মাঠগুলোব বাদামিব উপবে সবুজ সবুজ ভাব।

অ্যানাসিন নিশ্চযই বলবে—তাই বলে মূলে কিছু বদলাচ্ছে ভেবেছো?

মেঘ দেখতে দেখতে মেঘের মধ্যেই তিনটে জেট ফাইটাব দেখতে পেলাম না। তাবপর সেই বিশেষ শব্দ। খড়খড়ি শার্সিও কেঁপে উঠল। ব্যাপারটা অ্যানাসিন থাকতে থাকতে হয়েছিল।

তা হলে বলতে হবে একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে ও গ্রেনাডায় বসন্ত আসে বলেই গ্রেনাডা ইংল্যান্ড হয না। এখানে দিগন্তেই একটা চাপ আছে। যাতে তুমি এমন কিছু ভাবো, এমন কিছু কবো, অন্য জাযগায় যা ভাবতে না।

আমাব এই ঘবটা খামার-দোতলাব সেই অংশে যেখান থেকে একই সঙ্গে চার্চটাকে আর উইপিং উইলোগুলোকে দেখা যায। চার্চের বারান্দায় অ্যামব্রোসিও, দেখছি। এখন কি প্রার্থনার সময? না, খাঁটি কৃষক চার্চের বারান্দায দাঁড়িয়ে উইপিং উইলোব তলায মাছ, অথবা জলে কতটা নুন ধুযে যাচ্ছে ইউক্যালিপট্যাসেব গোড়া থেকে, তাই দেখছে। (আমি তো বুঝতেই পাবছি, এই যে বোজ মাছ সিদ্ধ খাওয়াচ্ছে আইভি, ওবা আমাকে ডেথ-বেসিস্ট্যান্ট না কবে ছাড়বে না দেখতে পাচ্ছি, নির্দেশ বা অনুবোধ সাধাবণভাবে অ্যানাসিন দিতে পাবে, মাছটা ধবছে অ্যামব্রোসিও। তখন তাব গায়ে সারপ্লিসও হযতো থাকে না। হযতো আন্ডাবপ্যান্ট কিংবা গামছা পরেই জলে নামে জাল নিয়ে।)

অ্যামব্রোসিও বোধ হয একটু দূবে দূবে থাকছে বলে আসা-যাওয়া কম। ক্রিস এমনকি জস আব্রাম যেমন মাঝে মাঝেই ব্যস্ত হয়ে এসে বসে থাকছে, তেমন নয অ্যামব্রোসিও। তাও সে একবাব এসেছিল। যেদিন ডাক্তার বললে অপাবেশন কবতে হবে (আজ আইভি এলে খোঁজ নিতে হবে, দিনটা কবে, কালই কিনা), তাব আগেব দিনই বোধ হয় অ্যামব্রোসিও এসেছিল।

অ্যামব্রোসিওকে দেখো, এখন চৌকো চোয়ালের সাধাবণ কৃষকের মতো মনে হচ্ছে, যার গায়ের ত্বকটা কালো না হয়ে ববং বাদামি, আর মুখেব দাড়িগুলো ববং খযেরিতে সাদা মিশানো।

অ্যামব্রোসিওব চিঠিটা পড়ে কি এমন একজনেব কথা মনে হয (চিঠিটা বোধ হয় আজই অ্যানাসিনকে দিযে দেয়া উচিত হবে)?

সব চাইতে আশ্চর্য বোধ হয, কেন লিখল চিঠিটা অ্যামব্রোসিও? এটা কি মনের ওপরে দুঃসহ চাপের ফল, কিংবা বোমান ক্যাথলিক ধর্মেব (ওদের ধর্মের কথা আমি কীই বা জানি?) কোন অনুশাসন পালন করার চেষ্টা—কনফেশান জাতীয় কিছু?

একটা জিনিস বোঝা যায়, উচ্চশিক্ষিত না হলেও কিছুদূব লেখাপড়া সে করেছে, হয়তো বা গোড়ায় কোন রোমান ক্যাথলিক কনভেন্টেই। এবং ইংবেজি উপন্যাস পড়ার ঝোঁকও ছিল এক সময়ে।

অ্যামব্রোসিও এসেছিল। বলল, তোমার সেই কবিতাটা কিন্তু বড় ভালো। সেই যে বলেছে, যখন তোমাব সঙ্গে তর্ক করি, (হয়তো তুমি বঞ্চিত করেই ভালো করেছো) কিন্তু মনে হয় যারা তোমার অনুশাসন মানে না তাদেরই তুমি দুহাত ভরে দাও। আর তারপর, সেই পাখিরা বাড়ি করে, কিন্তু আমি না; সময়ের নপুংসক। আর শেষে সেই প্রার্থনা, হে ঈশ্বর আমার শিকড়ে বৃষ্টি প্রেরণ করো।

যেন কবিতা নিয়েই আলোচনা করবে। কবিতাটাকে আবার আবৃত্তি করে শোনাতে হল।

তারপর যাওয়ার সময়ে হেসে বলল, তোমাকে আর অ্যানাসিনকে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা লেফাফায় ভরা।

পড়েছি চিঠিটা। আজ সকালে আর একবার। অ্যামব্রোসিওর নিশ্চয়ই রচনায় দক্ষতা নেই। চিন্তাগুলোও পর পব আসে নি। সাজালে বোধ হয় এইরকম হয়।

সে চিঠিটা সুরু করেছে এক ইংরেজি উপন্যাসের কথা দিয়ে। ডারবাবভিলের গল্প। কৌলিক উপাধি নিয়ে ভদ্রলোক মুস্কিলে পড়ল। নিজের বংশের উপাধিটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে তাব ধারণা হল সে অত্যন্ত এক পুরনো অভিজাত বংশেব লোক। উচ্চারণে কিছু রকমফের হয়েছে। তারপর যেন সেই নামের ধাঁধাটা ধরতে পেরে তার এক উচ্চাভিলাষ দেখা দিল। তার উপাধির সঙ্গে মেলে এমন এক আধা-অভিজাত পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে তার মেয়েটিকে পাঠাল। এই ভিত্তির (এই ভুলের ভিত্তির) উপরে উপন্যাসটা। পবে মেয়েটি ধর্ষিতা হল। ধর্ষণকারীকে হত্যা করে তাব ফাঁসি হল, এমন সব ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা মূলে একটা ভুল—নিজেব বংশগত উপাধির মধ্যে আভিজাত্য খুঁজে পাওয়ার।

হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর নিজেকে চাবকাতে পারছি না। কারণ চাবুক এমন নয় যে মন স্থিব হবে, ভোলা যাবে। আমি তো অ্যানাসিনকে দেখেই বুঝছি মাথায় প্রচণ্ড ধকমেব আঘাত না পেলে ভোলা যায় না। কিন্তু মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছবে তেমন আঘাত নিজেকে নিজে দিতে আত্মহত্যা ঘটে যেতে পারে। হযতো চাষ কবতে পারলে মন স্থির হতো। কিন্তু দেখো, চাবিদিকে নুনে ঢাকা মাটি।

আমার বাবা ছোট্টখাট্ট মানুষটি ছিলেন। তাঁর তুলনায় আমার মা অনেকটা টল ছিলেন। বাবা চাষার বংশে বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। লেখাপড়া শিখেছিলেন কিছুদূর। ডম অ্যান্টনিওর মতো তিনিও জাহাজে কাজ করতেন। তিনি বোধ হয় উপন্যাসের সেই ভদ্রলোকের মতো নিজের উপাধি নিয়ে চিন্তা করতে সুরু কবেছিলেন এক সময়ে। হায়, তিনি বোধ হয় জানতেন না, অভিজাত (দীর্ঘদিনেব অভিজাত বলে যারা নিজেদের মনে করে) তারা ছোট কাজ করে না হয়তো, হয়তো সৌন্দর্যপ্রীতি থাকে তাদের, রুচি ভালো হয়, ভদ্র হয। কিন্তু ক্রূর ও নির্দয় হয না কেউ কেউ? আমাব তো মনে হয় একটু বরং একসেন্ট্রিক, পাগলাটেও হয়। হয়তো প্রতিভা, কিন্তু তা যেন না হলেও ভালো।

আমার মা এসেছিলেন গোয়া থেকে। একজন বিধবা ভদ্রমহিলাকে বাবা বিয়ে করেছিলেন। মা পর্তুগীজ বলতেন। গোয়ায় চিঠি লিখতেন সেই ভাষাতেই। আমি যে লাটিনে প্রার্থনা করি সে তাঁর কাছেই শেখা। আমরা তো অমু, অন্তু প্রভৃতি ছিলাম। কিন্তু ক্রমশ অ্যামব্রোসিও, অ্যান্টনিও হলাম। ঠিক যেন সেই উপন্যাসের নায়িকার বাবাকে যেমন, তেমন এক পাগলামিতে পেয়েছিল আমাদের পরিবারকেও। (অবশ্য একথা এর আগে এমন করে কোনদিনই মনে হয় নি।) সেদিনকার সেই স্বপ্নে দেখার ব্যাপার তোমাকে বলেছিলাম, তার মধ্যে একটু প্রাচীন আভিজাত্যের দম্ভ ছিল না? আর আজ তোমাকে বলছি, তার কারণ তুমি ভেবো না যে তোমাকে দেখে আমি ক্রাইস্ট বলে ভুল করছি। তোমার চেরা সিঁথি, মুখের হালকা দাড়ি, টানা ব্যথাভরা চোখ, (বোকা ছেলে, অসুখের কথা অ্যানাসিনকে বল না কেন?) কথা বলার সময়ে এক বিশেষ ভঙ্গি, যদি তুমি মিথ্যা সেন্ট হতে চাও, তবে এসব দিয়ে বহু লোককে ডোবাতে পারবে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যেন এখনও তুমি পাপ করার সুযোগ পাও নি।

এর মূলে কতখানি আমার বাবা, আর কতখানি তাঁর পত্নীপ্রেম, তা বলা শক্ত। নিজের স্ত্রীকে এঞ্জেল ভাবা দোষের তো নয়ই, বরং স্বাভাবিক। তাকে খুব অভিজাত কেউ মনে করলে কিছুই দোষের হয় না। হয়তো বাবা তাকে সত্যি অভিজাত পর্তুগীজ ভেবেছিলেন কিংবা সেটাও ছিল নিজের স্ত্রীকে এঞ্জেল ভাববার প্রবৃত্তি। (তাঁরা এখন নেই কাজেই সমালোচনাব বাইরে)। কিন্তু ফল

কথা, আমরা বেশ কিছুটা অভিজাত পর্তুগীজ হতে চেষ্টা করেছিলুম। আমি কিছু কম, কারণ এখানে এই জমিগুলো মায়ের টাকায় কেনার পরে চাষ করতাম আমি। অন্তু অ্যান্টনিও হল প্রায় প্রথম থেকেই। আর ক্রিসের তো বাংলা নাম হলই না। সব শেষে আইভি, কখনও লতা, কখনও সুলতা, কখনও বা আইভিলতা।

মনের নাকি বিজ্ঞান আছে। ও আমি জানি না। আব আমার ধর্মে আস্থা আর তার বিশ্বাস নিয়েই কথা। মনকে শয়তানের কিছু বলে মনে হয়। আমার কখনও কখনও মনে হয়, অ্যান্টনিওর মনে জাতিদম্ভ তৈরি হয়েছিল। এবং সেজন্যই ডাক্তারি যত না করতো, তার চাইতে বেশি মন ছিল একজাতের পশুর সংস্রবে অন্য জাতের পশুর উন্নতির দিকে। জাতিদম্ভ ছিল বৈ কি। গোয়া যখন ভারতবর্ষ নিল আমরা মনে মনে সবাই খুব চটেছিলাম। কিন্তু অন্তু যেমন মেটেবুরুজের বাসা ও ভারতীয় পাসপোর্ট চিরকালের মতো ছেড়ে আফ্রিকায় চলে গেল, তেমন আমরা করি নি। (এসব কথা তোমাকে বলে কী লাভ হবে? বরং তোমার সামনে গেলেই লজ্জায় পড়বো। যতবার দেখা হবে মনে হবে, তুমি আমার ভিতরে দেখতে পাচ্ছ। তাও বলছি। আমি কষ্টই চাইছি। অন্যভাবে কিছুতেই আমি শান্তি পাবো না।) কিন্তু এভাবে হয় না। ওর সেই পশুগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই অনুর্বর।

ক্রিস করল আরও বিপদ। সে কোনদিনই এদেশের নয়। তার মনে সব সময়েই এই এক ধারণা সে যেন এদেশে বিদেশি। সব সময়ে বিদেশের আইডিয়াকে ভালো বলার ঝোঁক। যেন তা দিয়েই এদেশের উন্নতি হবে। কিন্তু মনে মনে তার মধ্যে সে যেন এদেশকে ঘৃণা করে, এমন এক ভাব আছে।

আমার মনে হয়, সব দেশেই এমন কেউ কেউ থাকে যারা দেশের চিন্তা থেকে পৃথক (এমন কি ইউরোপের অনেক ইহুদি পণ্ডিতের কথাই মনে হয়), এবং অন্য দেশের চিন্তাকে এগিয়ে যাওয়ার নামে সমর্থন করে। কী যে করছে ক্রিস! ওর এই জস আব্রামকে আনাও আমার ভালো লাগে নি। সে কি আমাদের পরিবারকে রক্ষা করবে? সত্যি এমন সি-আই-এর অফিসার? ক্রিস কি এমন কিছু করতে চায় যাতে বিদেশি চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তা মেলে এবং এদেশকে ধাক্কা দেয়া যায়?

কিন্তু এ সবেরই মূলে, যা এতদিন বুঝি নি এই অদ্ভুত চাপে পড়ে যা মনে হচ্ছে, ঠিক তেমনই এক ভুল আভিজাত্যের ধারণা, যা সেই উপন্যাসের গোড়ার কথা।

আমি কৃষক হতে চাই, কৃষক। যেমন আমার বাবার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা ছিলেন। আমার বাবাও তো কৃষক হওয়ার জন্যই এই জমি কিনেছিলেন। আমরা সত্যি জলদস্যু নই তা তো বুঝতেই পারছো। তোমার সেই কবিতাটার কথাই মনে হচ্ছে। ও গড, সেনড মাই রুটস রেইন। হ্যাঁ আমার মনে, আমার এই জমিতে। হে ঈশ্বর বৃষ্টি দাও। অন্যভাবে আমি ভুলতে পারবো না যে আমি ডম অ্যামব্রোসিও।

আমি অবশ্য এ চিঠি অ্যানাসিনকেও দিতে পারতাম। তার ডম অ্যান্টনিও থেকে মুক্তি এবং স্বচ্ছ অ্যানাসিন হওয়াই আমাকে স্বচ্ছ হতে উসকানি দিয়েছে বলা যায়। দিও এ চিঠি তাকে। আমি তাকে মুখ দেখাতে পারবো না। সেই রাতে যতক্ষণ অ্যানাসিনরা ঘুরে বেড়িয়েছিল, পাগলের মতোই, কিন্তু খুবই স্বাভাবিক আমাদের এই বর্তমান অবস্থায়, (তুমি তো দেখছো এখন সামনে ও পিছনে দুদিকের দিগন্তেই গোলাগুলো চমকাচ্ছে) আমি তাদের অনুসরণ করেছিলাম। কী এক অদ্ভুত হিংসা। দেখো কাণ্ড, অভিজাত, এই চিন্তাতেই এমন হিংসা হয়। সত্যি অভিজাত হলে কী হতো? আইভি আমার বোন যাকে প্রায় বাপের মতো মানুষ করেছি।

চিঠিটা অ্যানাসিনকেও দিও। মন্দ কি সেও যদি তোমার মতোই আমার আর এক চাবুক হয়। আমি তো সেন্ট নই যে নিজের গায়ে নিজে চাবুক মেরে মাংসকে দমন রাখবো।

দেখলাম, অ্যামব্রোসিও আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তারপর বোধ হয় আলোর অবস্থায় নিশ্চিত হল। চার্চের সিঁড়ির নিচে থেকে জাল তুলে নিল। দেখো দেখি, কী ব্যাপার। মাছ ধরতে যাচ্ছে?

চিঠি লিখবার পর থেকে কি লজ্জায় আমাব সামনে আসছে না? রসো, কোন বইয়ে যেন পড়েছি মানুষকে চেপে বিকলাঙ্গ করলে অবশেষে তার বীভৎসতা প্রকাশ হবে। না, ঠিক হল না। ঠিক বিকলাঙ্গ বা বীভৎস নয় ব্যাপার।

কিন্তু এদিকে এই ভাবছি, ওদিকে আলাপ শুনছি যেন। অ্যানাসিন আর আইভির গলা। ফিস-ফিস করে যেন প্রণয়ীর আলাপ। আচ্ছা, আলমারি থেকে কী সব বার করে সাজাচ্ছে। অপারেশনেব অস্ত্র সব নাকি? এখনই কৌতুক কবা যায়। বলা যায়—আইভি, একটু চারকোল দেবে? ছবি আঁকবো।

ছবি,–বেশ ছবি আঁকছি যে কোন কাগজে। চারকোল পেলেই হল। যেন আমি কোনদিন ছবি আঁকতে জানতুম। ফুল আঁকতে ইচ্ছা হয়েছিল। অনেক ঘাসের মধ্যে এখানে ওখানে ফুল। কত ফুল যে এঁকেছি। পাগল হয়ে যাওয়া ফুল।

ও আচ্ছা, ফুলের কথা আর কেউ যেন বলেছে। দেখো কাণ্ড। চিঠিটার মধ্যেই তো। অ্যামব্রোসিওই, যেখানে হে ঈশ্বর আমার শিকড়ে বৃষ্টি প্রেরণ করো লিখেছে, সেইখানেই লিখেছে. কত বিদেশি ফুলের বাল্ব যে তুলে বেখেছি, বন্যা থেকে, সেগুলোই আগে, তখন দেখলে মনে হতো সেগুলোকেই চাইতেই মূল্যবান মনে করতাম যেন, আর এ সবই আমাদের এই খামারে তৈরি।

না, ওরা আজ শান্তি দেবে না দেখছি। এত নার্ভাস হচ্ছে কেন? আইভিকে কি বোঝাচ্ছে কি কবে কোন যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে? অপারেশন তা হলে কি কালই হবে? ভয় পাচ্ছে নাকি ওরা? কী হয়ে আছে বুকের মধ্যে কে জানে?

কী হয়? যদি ওরা ক্লোরোফর্ম থেকে আর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে না পারে? বলবো নাকি, একজন যখন ক্লোরোফর্ম করবে আর একজন হাত ধরে থেকো?

কী হয়? নিজেকে অ্যামব্রোসিও চিনেছে। আমি কি চিনতে পারি? কী হয় তখন, যখন আর জ্ঞান না হয়?

বৃষ্টি হচ্ছে। ঘাস হবে পাগলের মতো, তাব মধ্যে বুনো ফুল, হলুদ, কমলা, জবদা, মেঠোগন্ধ এ সবই থাকবে।

বেশ কথা, সেজন্যই, (যা হয়তো দেখতে পাব না আর –ঘাস. পাগলের মতো ঘাস, নীলে সাদা সর-ভাসা মেঘ, আর বুনো মেঠো ফুল) তাদের জনাই কি কাগজে চারকোল বুলাচ্ছি? দেখো, অ্যামব্রোসিও কী আশা ধরাল মনে ফুলের।

কিছু হয় না বোধ হয়।

ডাক্তারের আরও জবানবন্দী

অপারেশনটা হয়ে গিয়েছে। কী ভয়ই পেয়েছিলুম। দশ দিন হয়ে গেল। অপারেশনের আগের পাঁচ দিন, অপারেশনের পরেও চারদিন। মনে হচ্ছে সুরত এখন আবার কথা বলবে। ধন্যবাদ আইভি, ধন্যবাদ জস আব্রাম। আজ ইনজেকশন দেয়ার সময়ে চোখ মেলে চাইল সুরত। যেন হাসল।

সুরতের সেই থিয়োরিটায় সত্য আছে মেহেরবিবি-নূরজাঁহা বেগমের সেই গল্পে। নতুন ব্যাক্তিত্বেও আমরা (তা যদি ব্যক্তিত্বের ছায়ামাত্র বলেও মনে হয়) তীব্রভাবে অনুভব করতে পারি, যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা করতে পারি। নতুবা ভাবো, অ্যানাসিন (যে কিনা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের

ছবি মাত্র) কেন তেমন ভয় পাবে যা, আমি পেয়েছিলুম। অপারেশনের আগে এবং জ্ঞান ফিরে না আসার প্রতিটি মুহূর্ত। আমার এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এমন ভাবে আমার কপাল ও হাতের তেলোদুটো ঘেমে উঠছিল যে মনে করেছিলুম শেষ পর্যন্ত অপারেশনে হাত দেওয়াটাই মূর্খতা হবে। যন্ত্রপাতি মোটামুটি ঠিকই সাজিয়ে নিয়েছিলুম। তা হলেও শেষ পর্যন্ত একস-রে প্লান্টের অভাব (যার জন্য প্রায় অন্ধকারে হাতড়াতে হবে) এবং অকসিজেন সিলিন্ডারের অভাব (মনে রাখতে হবে একটা লাং সুরতের অপারেশনের আগেই তেমন কাজ করছিল না) আমাকে যেন বার বার আমাদের সেই কোন রকমে তৈরি করে নেয়া অপারেশন থিয়েটার থেকে ঠেলে বার করে দিচ্ছিল।

স্বভাবতই অপারেশনের আগের পাঁচদিন এবং পরের পাঁচদিন আমরা সুরত ও তার অপারেশন ছাড়া কথা বলি নি। আমার তো ধারণা, হয়তো খামারের ঘরে বসে ওরাও ওই এক বিষয়ে আলাপ করেছে। ওটাই যেন একমাত্র কিছু, এমন হয়ে উঠেছিল।

আমরা যখন ঘরে ঢুকলুম সুরত একটা লাল মলাটের বইয়ে কিছু লিখছিল। হয়তো আইভির কাছে পেনসিল চেয়ে নিয়ে থাকবে। আমরা খুব নিঃশব্দে ঢুকেছিলুম। আমি, আমার পিছনে আইভি এবং জস আব্রাম। (জস আব্রামকে ডাকতে হয়েছিল। আইভিকে কিছু শিখিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি কারণ তা অন্তত কিছুটা সম্ভব ছিল, যেহেতু আমার চিকিৎসার ব্যাপারে সে একেবারে নিজের উপরে নির্ভর করার সাহস ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের প্রমাণ এর আগেই দিয়েছে। জসকে রাখতে হয়েছিল। কিছু কিছু এগিয়ে দিতে পারবে তো। এই কয়েকদিন তাকেও বুঝিয়েছি কোনটাকে কী বলে'—কোনটা করাত, কোনটা ছুরি, কোনটা ক্ল্যাম্প।) জিনিসগুলোকে ফুটিয়ে নিয়ে সব চাইতে বড় ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে যখন আমরা ঢুকতে যাবো সেই ঘরে ক্রিসকে দেখতে পেলুম। সে বলল, ডাক্তার, তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। আমার মনটা কি কেঁপে উঠেছিল? নিঃশব্দে সোজা হয়ে ঘরে ঢুকলুম। (যেন নিজের মধ্যে সবটুকু চিন্তা ও কাজের শক্তিকে ভালো ভাবে প্রবাহিত করার জন্যই মেরুদণ্ড সোজা করা, হা হিপোক্র্যাটেস, এমন অপারেশন কি হয়!) জস ও আইভি নিঃশব্দেই রাখল সেই সরঞ্জাম-বোঝাই ট্রেটা টেবলে। (কিন্তু অস্ত্র-ইস্পাত, টিনের ট্রে এবং টেবলের কাঠ যখন একত্র হচ্ছে একটু শব্দ হলই।) সুরত চোখ ফিরাল। যেন দেখেও দেখে নি এমন ভাবে কিছু লিখল, হয়তো আর কয়েকটা শব্দ তাড়াতাড়ি লিখে নিল। তারপর বোধ হয় আমাদের উপস্থিতিটা মাথায় ঢুকল। ক্লান্ত হয়ে আসা দুহাত সেই লাল মলাটের বই এবং পেনসিল সমেত সে ধীরে ধীরে নিজের দুপাশে যেন শুইয়ে দিল।

অপারেশন থিয়েটারে একটা নেশার মতো কিছু থাকে যাকে অনন্যমনও বলা যায়। অপারেশনই একমাত্র। অপারেশন ছাড়া পৃথিবীই যেন ডুবে যায়। কোনদিকে কি তাকানোর চোখ থাকে? (হা, ধন্বন্তরি, এমন অপারেশনের কথাও কি কেউ শুনেছে?) আইভি মাথার দিকে নাড়ী ধরে। ঠিক সেই সময়ে (যদিও আমার অন্যদিকে দৃষ্টি থাকার কথা নয়, এবং ওপন করা পাঁজরা ও প্লুরাতেই চোখ, চোখ নিজের আঙুলের দিকে) তবু অবাক হলুম যেন। এমন কেউ আশা করে না, এবং হয়তো এই খামারের বাইরে আর কোনদিন হবেও না, কেননা তা শুধু মেডিক্যাল এথিকসের বিষয় নয় তার চাইতে বিপজ্জনক, দুঃসাহসী আইন লঙ্ঘন। দেখলুম, আমার আঙুলগুলোর পাশে পাশে ব্লাড ভেসলগুলোকে ঠিক যেমনটি চাই আটকে আটকে চলেছে জস। আর সেই সময়ে যেন একবার বাহুর সাদা ত্বকে উল্কিতে আঁকা জেড, এ, অক্ষর দুটিও পড়লুম। ধন্যবাদ জস। তুমি সি-আই-এর লোক হতে পারো কিন্তু তোমার এই জ্ঞান ও সাহস ফার্স্ট এইডের চাইতেও অনেক গভীর। তুমি সি-আই-এর লোক হতে পারো, তবু ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, তখন আমরা, এবং এখনও বোধ হয়, সুরত বৈ কিছু ভাবি নি। দুতিন দিন ছিল না ক্রিস। তারপর দেখা হতেই বলল—হ্যাল্লো, ডক, আচ্ছা আমাদের রোগীকে কি ফিশসুপ দেয়া যায়? একটা

মাঝারি ভেটকি ধরেছে অ্যামব্রোসিও (আহা, অ্যামব্রোসিও!) এসব ব্যাপাবে আইভি প্রথম শ্রেণীর ওস্তাদ। ও যদি চামচ দিয়ে খাওয়ায় পাশে বসে হয়তো একবারও হিক্কা উঠবে না।

তখন আমরা গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম পাশের ঘরে, আমি, ক্রিস, আইভি, জস। (জস যেন খুবই লজ্জিত সেদিনের সেই কাণ্ড করে। ক্ষতি না হলেও, আমিই তাকে বলেছি যে সেভাবে অপারেশনে আমার আঙুলের পাশে আঙুল বেখে ক্ষতি করে নি, তা হলেও সে যেন নিজেব কাজটার জন্য বিশেষ অপ্রতিভ।) ডাক্তার বলছে, আর রোগীর আত্মীয়বা শুনে নিচ্ছে এমনই একটা দৃশ্য যেন। বাইবে বৃষ্টি হচ্ছে। শার্সির গায়ে ড্রাম বাজছে যেন। (আর একদিন তো যখন আমরা সে রকম আলোচনা করছি মেঘের মধ্যে জুম জুম শব্দে এবোপ্লেন উড়ে গেল; এমন যে ঘরেব মধ্যেও তার ছায়া পড়ল।) আমরা তখনও আলোচনা করছি।

কিন্তু কী ভেবেছিল সুরত ঠিক আগের মুহূর্তে? মুখে সেই হাসি যাকে মুক্তোর ম্লানভাবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সেই পেনসিল আর লালমলাটের বই সমেত হাতদুটোকে দুপাশে শুইয়ে দেয়া।

(পরে অবশ্য ওর সেই লালমলাটের বইটা আর অ্যামব্রোসিওর চিঠি আমার হাতে এসেছিল। আর মুক্তোর সঙ্গে তার হাসির তুলনাটাও আমাব পরের চিন্তা। বইটাতে ছাপার অক্ষরের ওপর দিয়ে, কখনও ছাপা অক্ষরগুলোকে গাবিয়ে, কখনও ছাপার অক্ষবের নিচে নিচে ওয়াটাব মার্কের মতো ফুটে ওঠা পাগল তৃণশস্যের ছবি। মার্জিনে দুএকটা লেখাও। অন্যের কবিতার কোটেশনই। তার একটা এরকম: তুমি রবে নীরবে হৃদযে মম/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।/ জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,/ তব অঞ্চলছায়া মোবে রহিবে ঢাকি।/ মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন/ তুমি ভরিবে সৌবভে নিশীথিনী-সম।

কার কথা এটা? একি তার নিজেরই অনুভব? একি তার মায়েব ছায়া যা মাকে ত্যাগ করে এসেই মনে স্নিগ্ধছায়া হয়ে থেকে গিয়েছে? অথবা একি পৃথিবীকে বলা, একটা মাটির ঢিবি যার প্রতীক, কোন ছবিতে যার উপরে পাগল-ঘাস আর অসম্ভব ফুল, যে পাগল-ঘাস যেন কারো কবরেব উপবে আবার প্রাণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে? পবে, তখন, মনে হয়েছিল সুবতের মুখের সেই হাসিটা ছিল কবিতাব মতো, যেন মুক্তোর প্রায় বর্ণহীন নীলাভতা যাকে উজ্জ্বল পেলব বলা যায়।)

(কিন্তু অন্য ধরনের কবিতারও কোটেশনও পেয়েছিলুম পরে।) আমব্রোসিওর চিঠির লাফাফার মধ্যে ইংরেজিতে অ্যামব্রোসিওর জন্য এই দিনে একটা ইংরেজি সনেট লেখা। সনেটের নামের ইংবেজি অনুবাদ, রোগশয্যায় ঈশ্বরকে, আমার ঈশ্বরকে প্রার্থনা। পাশে বাংলায় নোট, কোন কবির মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর আট দিন আগে লেখা। কবিতাটা ইংরেজিতে উদ্ধৃত, পাশে পাশে বাংলায় নোট। কতকটা এই রকম: আমি আসছি তোমার পবিত্র সদনে/যেথা সন্তদের স্তুতিগানে, মিলাবো, আমারও কণ্ঠস্বর চিরদিন/আজ তাই যাব অগ্রসরি/দরজার পাশে সুর বাঁধি আমার যন্ত্রেতে/তখন বাজাব যে সুরধ্বনি এবে তাই ভাবি। যখন আমার ভিষকেরা/ভালোবেসে বেসে ভূচিত্র প্রস্তুত করে/আমি হায় শয্যায় বিস্তৃত এক ম্যাপ/যেন তারা প্রদর্শন করে ম্যাপে/ এই মোব দক্ষিণ-পশ্চিম আবিষ্কার/উত্তপ্ত জ্বরের দোহাই, যে দুস্তর স্রোতে আমি মৃত্যু উত্তরণ করি।

(অ্যামব্রোসিওর জন্য নোটস : দক্ষিণ-পশ্চিম এজন্য যে দক্ষিণ উত্তাপের দেশ এবং পশ্চিমে সূর্য অস্ত যায়। কেমন, উত্তাপ আর জীবনান্তকে ধরে নি?) আমার আনন্দ প্রভু/এ দুস্তরে আমি দেখি আমার পশ্চিম/কেননা এ স্রোত ফেরে কারো ডাকে?/আমার পশ্চিম আর কি আঘাত দেবে?/ সব চ্যাপ্টা ম্যাপে (আমি যার এক)/প্রাচ্য ও পশ্চিম এক বিন্দুতে মেলে,/তেমতি মৃত্যু স্পর্শ করে পুনর্জন্মে।)

(নোটস: রেজারেকশনকেই পুনর্জন্ম বললাম।) এ কি রসিকতা? তাই মনে হয় না? নিজেকে ম্যাপ বলে ব্যঙ্গ করা। কিন্তু রেজারেকশনের আশাও তো। এটাই কি সুরতের মনোভঙ্গি? কিংবা

অ্যামব্রোসিওকে, গোটা মানুষটাকে, সুরতের এমনি কৌতুকলঘুতা এবং গভীব বেদনার সংযুক্তি বলে মনে হয়েছিল? আহা, অ্যামব্রোসিও।

কিন্তু তখনও (অর্থাৎ যে সময়েব কথা এখন বলছি অপারেশনের আগে ও পরে যখন দিন দশেক হয়েছে) অদ্ভুতভাবে, আমি যেন লিডার যাকে সকলে মেনে চলেছে, আমি যার নাম অ্যানাসিন। যেন আমি হুকুম দিতে পারি! আমার হুকুমগুলো, হুকুম করার ভঙ্গিটা আইডেনটিটি হারানোর ব্যাপারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাও মনে থাকছে না। বেশ ব্যাপারটা কিন্তু। অন্যের জন্য গভীর করে ভাবতে শিখলে যেন নিজের আইডেনটিটি আছে কি নেই তা নিয়ে কোন সমস্যাই আর থাকে না।

কিন্তু আজ (অর্থাৎ যে দিনের কথা এখন বলছি।) মনটা একেবারে হালকা ছিল কেননা সুরত মাছের সুপ খেয়ে এখন ঘুমাচ্ছে। ইন্টারভেনাস গ্লুকোস্যালাইন ফোঁটায় ফোঁটায় যাচ্ছে ওর শরীরে। আইভি পাশে বসে লক্ষ্য রাখছে। ক্রিস এল, বলল—হ্যাল্লো, ডক, আমি একটু বসি, তোমবা বরং একটু রিল্যাকস কবো।

পথে বেবিয়ে (পথ অবশ্য পায়ে চলে চলে যে মৃদু দাগ—এবং সবিস্ময়ে দেখলুম অনেক জায়গাতে যেন বিঘত পরিমাণ ঘাস সে-সব দাগকে ঢেকে দিচ্ছে—এতদিন এ-সবেও যেন লক্ষ্য ছিল না), আইভি বলল—জানো ডম, সুরতের ঘুম একরকম। কিন্তু তা ছাড়াও মাঝে মাঝে ঘুমেব ভাব হয় সুরতের, তা থেকে যেন হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে সচেতন করে আবাব। খানিকটা টুল-টুল করে তাকিয়ে থাকে, খুব ফ্যাকাশে দেখায় তখন, তাবপরে আবার চোখ বোজে কিন্তু হাত-পা নড়া দেখে বোঝা যায় ঘুমায় না। এটা কিন্তু একটা চান্স যা তৎক্ষণাৎ মৃত্যু থেকে ওকে বাঁচিয়েছিল। নাকি তুমি মনে করো এর আগে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার অবসর ছিল না?

এটাই আশ্চর্য যে অ্যানাসিনও কাবো অতীত সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে পারে যেন সমাজের মানুযের মতো তার মধ্যে সমাজকে স্পর্শ কবাব, স্পর্শ করে নিজের সত্বাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পাবে।

ঘাসগুলোয় দেখো জল ছিল। প্যান্টেব নিচেব দিকটায় সেই জল লাগছে। আইভি বোধ হয় সুরতের অসম্ভব জীবনীশক্তির কথা বলল। তোমার কি মনে হয়, ডম, ওটা ওব কোমাকে ঝেড়ে ফেলা?

ভাবলুম, তা কি হয়? ও কি বোঝে যে সিংক করছে এবং তখনই আবার নিজেকে সজাগ করে? নিজেকে মানে নিজের মস্তিষ্ক এবং তার সাহয্যে হার্ট ইত্যাদিকে?

বললুম—দেখো আইভি, শরীরের বাইরে গড়ন দেখে বোঝা যায় না আন্তরিক জীবনীশক্তি কাব কতখানি, যেমন কারো মাথার গড়ন মেপেও বলা যায় না সত্যি তার প্রতিভা আছে কি না।

আইভি হাসল—বেশ তুলনা তো, ধাঁধার মতো।

মানে—

বুঝেছি। বুঝেছি। মস্তিষ্কের পদার্থ একই রকম, তা সত্ত্বেও কেউ প্রতিভাবান, তেমন শরীরের গঠন একইরকম, তা সত্ত্বেও কেউ একশো' বছর টিকে থাকার মতো গোপন কিছু শক্তি রাখে যা অন্যের থাকে না।

একেই রিল্যাকসড হওয়া বলে। আইভি বলল—চলো তোমাব ছাতায়। কফি খাবো।

ছাতার তলায় বসে ফিকে, বিনা-দুধে চকোলেট বার গলিয়ে দু কাপে নিয়ে বসেছিলুম। ধন্যবাদ, আব্রামাইট, তোমরা এমন কি, তোমাদের রিলিফের মোটব বোটে এক পাউন্ড চকোলেট দিতেও ভোলো নি। একটা ক্রেটে হেলান দিয়ে অন্য একটিতে বসেছে আইভি।

বলল—আগে কিন্তু উঁচু জমিগুলোতে ঘাস আর নিচু জমিগুলোতে গম হতো।

ঘাস তো কম হতো না। তোমাদের চাষের জমি আর ঘাসের জমি প্রায় সমান ছিল।

তা, দরকার ছিল। নানারকমের বেশ কিছু পশু ছিল। আ, ডম, ডম তোমার কি কিছু মনে পড়ে না?

যেন এখনও সে অ্যামনেশিয়ার দরুন আর একটা শক দেবে আমাকে, যেন এখনও সে চেষ্টা করবে কে আমি তা আমার মনে ফিরিয়ে আনতে।

হাসলুম। পরে বললুম—এত সব পশু কী হতো?

আইভিও হাসল। হেসে বলল—পরীক্ষা।

সে সিগারেট ধরাল। নাক দিয়ে সরু সরু ধোঁয়া বার হলে সে বলল আবার—অনেক পরীক্ষার ভালো ফল হতো। কোন কোনটা ব্যর্থ হয়ে যেতো। কিন্তু ডম সব সময়েই চেষ্টা করতো যাতে ভালো একটা প্রজাতি পাওয়া যায়। শেষের দিকে ডম নানাভাবে চেষ্টা করতো কি করে মিউলগুলোকে উর্বর করা যায়। বহু সময় লাগে এক-একটা পরীক্ষায়, দু তিন বছর। কখন কখনও, কুকুরের বেলায় বিশেষ করে দেখা গিয়েছে, দু-পক্ষের দুর্বলতাই যেন নতুনগুলোকে আশ্রয় করেছে। সেটাই কষ্টের ছিল যখন সেগুলোকে নীরোগ শক্তসমর্থ স্পেসিমেনগুলোর খাবারে পরিণত করতে হতো।

আমি বললুম—বাহ, এ যে দেখছি সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট।

আইভি বলল—যে যুদ্ধটা অনেকদিন ধবে হয় প্রকৃতিতে, হ্যাঁ তা বলতে পারো, অনেকদিন ধবে; যাতে যেন কালের কালো গহ্বরে ঢুকে যায় দুর্বলেরা, এখানে যেন সেই কয়েক যুগ কয়েক শতাব্দীর কালো, ডম অ্যান্টনিওব শটগানের চোং থেকে বেরিয়ে আসতো।

আইভি হাসল। আর আমার মনে হল তার চোখের কোলে যে কালি যা তাকে যেন মনোরমা করেছে, এখনই এই প্রথম চোখে পড়ল, তাও তো কালো।

আজ বোধ হয় মাথা ঘষেছে আইভি। সে মাথা ঝাঁকাল। ঈষৎ রোদ আছে। কারো কারো ত্বক অলিভ রঙের হলেও এ আলোয় সোনালি দেখায়।

আইভি বলল—সিগারেট খাও। জানো, আমাদের পরীক্ষার কথাই বলি, একবার এক সোনালি বিড়াল যোগাড় করা গিয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য প্রজাতি। কী তার গায়ের রং! কী তার তেজ! যেন ছোট একটা বাঘই। ডমের ইচ্ছা ছিল সেটাকে আমাদের চিড়িয়াখানার কাবুলী বিড়ালগুলোর সঙ্গে পরীক্ষা করবে। কিন্তু ধরবার সময়ে সেই সোনালি বিড়াল যে আঘাত পেয়েছিল সেটা সারে না, ক্রমশ বরং মেরুদণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডম ঠিক করল সে উর্বরতার রস সংগ্রহ করবে। জীবিত অবস্থায় সেটাকে না চিরে তা করা যায় না। ডম অবশ্য নির্দয় ছিল না। সে ক্লোরোফর্ম করে নিয়েছিল আমার অনুরোধে। এটা ছিল ডমের শেষ পরীক্ষা এখানে। দু পায়ে প্যারালিসিস, মেরুদণ্ডেও তাই; কিন্তু আমাদের টাব্বির কয়েকটা যা কিটন হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে অ্যান্টনি আর অ্যামব্রোসিওতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

আইভি যেন পুরনো দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনছে স্মৃতিতে। নিজেদের সুখ দুঃখের ছোট ছোট কথা মনে পড়েছে। এই ঘাসের অঙ্কুর দেখে হয়তো ফুল ও ফসল যখন ছিল তখনকার স্মৃতিও।

তা হলে তো আজ এই ঢিলেঢালা হয়ে বসার চেষ্টা সার্থক হয়েছে; সুরতকে সেবা করার মধ্যে দিয়ে যার শুরু আজ যেন তা একটা পরিপূর্ণতার ছবি নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধের চাপ, চারিদিকের দিগন্তের প্রাচীরের মধ্যে যে চাপ ক্রমশ দুঃসহ, তা থেকে আইভির মন স্বাভাবিক হতে চলেছে। *এটা তা হলে সেই সব বিদেশি যুদ্ধ-উপন্যাসের চাইতেও ভালো কিছু হচ্ছে। সেই সব বারুদের ধোঁয়ায় বাদামি পৃথিবী থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়ে দু-একজন সৈনিক যে চাঁদের*

আলোয় হাঁস চুরি করে এবং/অথবা লতা-ওঠা প্রাচীরের দরজায় কৃষকবধূকে দেখে ইশারা করে আর কৃষকবধূও মৃদু মৃদু মাথার চুল দুলিয়ে নিজের ক্ষুধার কথাও জানায়। যার সামনে পিছনে কিছু নেই, অর্থাৎ ন্যায় নীতির প্রশ্নও নয় প্রেমও নয়। তার চাইতে ভালো এক গল্প, জেনো।

আইভি বলল—অ্যামব্রোসিও বলেছিল, পশুকে কষ্ট দেওয়াও ভগবানের নীতি লঙ্ঘন করা। অ্যান্টনি বলেছিল, বাহ, ওটার তো প্যারালিসিস এগিয়ে চলেছিল। আমি বরং ওর রং, শক্তি, তেজ, এসব ওর বংশের মধ্যে ধরে রেখে প্রকৃতপক্ষে ওকেই বাঁচিয়ে রাখলুম না?

চকোলেট ও সিগারেট শেষ হয়েছিল। আইভি আমার দিকে তাকাল। সোনালি ত্বক, দেখো, চুল আজ যেন সুরতের কায়দায় মাঝখানে চেরা। হঠাৎ যেন, যেন তা ওর চোখের কোলের কালি আমার চোখে পড়েছে ভেবেই, একটা লজ্জার ভাব দেখা দিল মনে। অভিজ্ঞতায় সুখী এক রমণী যেন।

কিন্তু আইভি উঠে পড়ল। রোগীর জন্য কিছু করার কথাই মনে পড়েছে যেন।

আমার সেদিন আর একবার মনে হয়েছিল, সেই পুরনো কথাই, অন্যের জন্য ভাবতে শিখলে ক্রমশ নিজেকে নিয়ে দুর্ভাবনা কমে যায়।

ডাক্তারের নতুন জবানবন্দী

হয়তো নিজের দিকে না চেয়ে অন্যের কথা ভাবলে, হয়তো বা, যাকে আমরা ব্যক্তিত্বের সঙ্কট বলে থাকি তার সমাধানও কখনও কখনও হয়, তা কিন্তু এই ইউক্যালিপটাসের তলায় নয়, যেমন সুব্রত বলতে পারতো। হয়তো মানুষ তরুর মত সহিষ্ণু হতে পারে, শিকড়ে বৃষ্টি পাওয়া গাছ যেমন সহিষ্ণুতায় ঝড়ে ডাল ভেঙে গেলেও বাকি পল্লবগুলিকে সূর্যের আলোব দিকে মেলে দেয়, কিন্তু তা কি এখানে? ঘটনাগুলোই কি প্রমাণ করে না আমাদের ভালো পৃথিবীর কিছু হয়েছে?

পরে, যখন এই কথাগুলো বলার সময় হয়েছিল, আমার মনে হয়েছে পরিস্থিতি দেখে (নাকি আবহাওয়া কথাটা?), ঘটনাগুলোকে বুঝতে চেষ্টা না করে ঘটনাগুলোকে পরপর বলে গেলেই পরিস্থিতিটা বোঝা যেতো।

দিন পনের হল বোধ হয় অপারেশন। সুব্রত এখনও তেমন কথা বলে না। চিকিৎসা অব্যাহতই আছে। আর অ্যামব্রোসিওই নিশ্চয় তার জন্য মাছ সংগ্রহ করছে রোজ। এখন সেই ঘুমের ভাবটা (যা ঘুম নয়) যা থেকে যেন তার দেহের প্রতিভা পাক খাওয়া জল থেকে শেষ মুহূর্তে সাঁতার দেয়ার মতো নিজেকে জাগিয়ে তোলে, সেটা কমে এসেছে।

আকাশে মেঘ। জলে কিছু নুন ধুয়ে গিয়ে থাকবে। ঘাসগুলো বাড়ছে। ঘাসের মধ্যে ফুল অবশ্য চোখে পড়ে না। (না, ঘাস দেখে ভুল করাটার কোন যুক্তি ছিল না। একদিন তো মনেই হয়েছিল, সুরত যার ছবি আঁকে-সেই পাগল হয়ে যাওয়া ঘাস, যদি তা হয়ই, হবে; এই ঘাসগুলো শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেলে যদি আবার নবাঙ্কুর দেখা দেয়!)

একদিন জস আব্রাম বলেছিল : (সেদিনই কি সে দেখতে পেয়েছিল পরে যা আশঙ্কার মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক সময়ে? তা নাও হতে পারে। কিন্তু মানুষ হঠাৎ যদি নতুন কোন কথা তোলে তবে বুঝতে হবে বাইরের কোন ঘটনা যা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছুর আশঙ্কাই, কথাটাকে মনে এনে দিয়ে থাকবে। আর এটা জস আব্রামের সম্বন্ধে ভাবা যুক্তিযুক্তও হয় এজন্য যে সে সি-আই-এর লোক হোক না হোক, তাকে বারবার দেখার ফলে এখন তাকে শুধু এরল ফ্লিনের মতো এক পুরুষ-পশুর সুন্দর নমুনা বলেই মনে হয় না, বরং এমন এক এরল ফ্লিন যার চলাফেরায় অব্যক্তভাবে

মিলিটারি ড্রিলের অভ্যাস যেন ধরা পড়ে। সে হয়তো ক্লাউড ব্যাংকে এরোপ্লেন চলার এবং তাদের বিশেষ ভঙ্গিতে ভাসার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই কিছু আন্দাজ করে থাকবে, যা আমরা দেখি নি।)

দেখুন, এই যুদ্ধ। যদি দেশের খণ্ড-খণ্ড অংশ মিলে একদেশ হয়, দেশগুলো মিলে মিলে এক রাষ্ট্র হয় তবেই এসব যুদ্ধ শেষ হবে। শান্তি আসতে পারে। ক্রিস বলেছিল। (সে তখন কোথাও বেরোচ্ছে। সঙ্গে পাতলা হ্যান্ডব্যাগও। এই প্রথম এই লোনা দ্বীপে কাউকে হ্যান্ডব্যাগ হাতে করতে দেখলুম। ভেবে দেখলে বোঝা যায় ক্রিস এদিক-ওদিক বেড়ায়। অল্পবয়সী লোককে কোন আশঙ্কাই কি ঘরে বসিয়ে রাখতে পারে? নতুবা স্বাদুজলের সেই গর্ত আবিষ্কার হয় না, সেই একান্ত বিরল একখানা খবরের কাগজও বাইরের পৃথিবীর জমজমাট যুদ্ধের খবর আনতে পারে না, পুলিশ ও মিলিটাবিতে যুদ্ধ, স্লোগান তোলা ছেলেদের সঙ্গে মেসিনগান পিলবক্সের যুদ্ধ। তা হলেও এই তো প্রথম কাউকে দেখছি হ্যান্ডব্যাগ হাতে করতে। সেটা কি এক অদ্ভুত প্রতিভাশালী পর্যটকের আত্মপ্রকাশ? একটু নতুনই লাগল ক্রিসকে। কিন্তু যেন চেনাও। এক সময়ে পরে মনে হয়েছিল নতুনভাবে চুল্ আঁচড়ানোর ফলে, নতুন ভঙ্গিতে দাড়ি ছেঁটে নেয়ার ফলে ডম অ্যান্টনিওর বৃটিশ পাসপোর্টের ছবির মতো দেখাচ্ছিল তাকে, যে পাসপোর্টে ডম অ্যান্টনিওকে বৃটিশ নাগরিক ও মেটেবুরুজের বাসিন্দা বলা হয়েছে।)

দেখুন জস আব্রাম—(ক্রিস হাসলও বটে)—কথাটা যে আপনাদের আমেরিকারই কেউ বলেছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। ওয়ান ওয়ার্লড। আপনি বলতে পারেন ওটা হলিউডেব স্ক্রিপ্টরাইটারের উদ্ভাবন নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, নিজের মনে তলিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি, সেই পৃথিবী যখন এক রাষ্ট্র তখন তাব যে প্রেসিডেন্ট সে কি আপনাদের প্রেসিডেন্টেরই আরও মোটা, আরও অনেক বেশি ওজনের হয়তো বা সাতফুট উঁচু এক সংস্করণ নয়?

ডম অ্যামব্রোসিও ছিল (সবাই আমরা সুরতের রোগশয্যার চারিদিকে তখন)। ডম অ্যামব্রোসিওর পরনে ধর্মযাজকদের পোশাক। হাতে একটা কালো কাঠে রুপোর কাজ করা ক্রস, যেন সে সুরতকে চার্চেব আশীর্বাদ জানাতে এসেছিল। কিন্তু তা হলেও সে তো খামারেরই কেউ। ক্রিস তো তার কথায় একজন অতিথিকেই বেকায়দায় ফেলেছে। সুতরাং অতিথিব সাহায্যে অগ্রসর হওয়াও গৃহস্থের উচিত।

ডম অ্যামব্রোসিও বলল হেসে, কিংবা ক্রিস, অন্য কেউ তো তাকে, সেই এক পৃথিবীর কর্তাকে কলোসাসের মতো বিবাট ফার্স্ট সেক্রেটারি অথবা প্রেসিডেন্ট অব দি প্রেসিডিআম মনে করতে পারে।

আর সুরত তখন বলল, (অপারেশনের পর সেই তো প্রথম পুরো একটা বাক্য বলেছিল), অ্যানাসিন, একটা কবিতা আছে, জানো, যে ময়ূরেরা মনে করে নীল রাতের আকাশে যে তাবকাখচিত ময়ূরপুচ্ছ সেটা সেই বৃহত্তম ময়ূরের যার নাম ঈশ্বর।

রোগীর ঘর তা আমাদের মনে ছিল। সুতরাং আলাপটা অবশ্যই তর্কের স্তরে নেয়ার কথা কেউ ভাবে নি। কিন্তু সত্যি কি সেটা একটা কাল্পনিক আশঙ্কার চাইতে বেশি কিছু ছিল? প্রকৃতপক্ষে কেউ কি ক্লাউড ব্যাঙ্কে এরোপ্লেন তিনটিকে ভাসতে দেখেছিল বিশেষভাবে, যাতে ধরে নেয়া যায় প্যারাট্রুপাররা নামছে? তা কি কিছু দেখে তার থেকে অনুমান? কিংবা আশঙ্কাটাই মনের মধ্যে থেকে সেই কিছুকে রজ্জুতে সর্পভ্রম করাল?

কেউ রটিয়ে দিল যেন, এই খামারে যত লোক থাকা উচিত তার চাইতে হিসাবের বেশি কেউ আছে। আমরা যেন একত্রিত হচ্ছি পরস্পরকে দেখতে। যেন এ ওর মুখের দিকে চাইছি কে সেই বেশি বাড়তি তার খোঁজ নিতে। অথচ যেন এই সমূহ বিপদে কেউ কারো চাইতে দূরে না থাকি।

একসময় আইভি বলল, ডম, তোমার সেই সার্ভিস পিস্তলটা কিন্তু ভালো। জানো ওর রেঞ্জ

সাধারণ রিভলবারের চাইতে বেশি।

আইভি কি সত্যি ভয় পেয়েছিল যে সেই সময় এসেছে যখন পাসপোর্টের ছবি বদলে, আইডেনটিটি কারচুপি করেও আমরা একজন বেশি থেকে যাচ্ছি? অথবা কেউ কি কারো আইডেনটিটি দখল করতে চাইছি?

কিংবা এটা কি সেই কালো ভয়ই ছিল, (একেবারে কালো যদি না হয় তবে অস্বচ্ছ) যার নাম নেই, যার কোন বর্ণনা কেউ দিতে পারে না, কিংবা প্রত্যেকে নিজের মতো নিজের মনের ভিতর তৈরি করে, কিন্তু যা গম্ভীর দৃঢ় রাজকীয় পদক্ষেপে কোন এক খামারবাড়িতে পদচারণা করে।

সেদিন (এটা আমার বেশ মনে আছে, এমন কি টুকরো টুকরো আপাত অসংলগ্ন বিষয়গুলোও ভুলি নি) অনেকদিন পরে মোটরবোটের কাছে গিয়েছিলুম। যেন এরকম একটা জানতে ইচ্ছা হয়েছিল সেই ফুটপ্রিন্টের ধোঁকাগুলো বর্ষার জলে ধুয়ে গিয়েছে কি না। যেন তার উপরে একটা সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে। যেন সেই পদচিহ্নগুলো পরিস্ফুট থাকলে সেই রটনাগুলো পরিস্ফুট থাকলে সেই রটনাগুলো আর ভয়ের কারণ থাকে না।

বর্ষার জলে পদচিহ্ন অপরিস্ফুট হওয়ারই কথা। দেখলুম এখনও যেন সেগুলো অস্পষ্ট হলেও দেখা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার যা হয়েছে তা বেশ কৌতুকের, অজস্র অসংখ্য পদচিহ্ন। পাগলের মতো যেন এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। যেন একটা জনতারই। যেন বা এক শোভাযাত্রা যা অবিবেচকের মতো চলেছিল, তারই একটা অংশের পদচিহ্ন। তার মধ্যে যেন ডম অ্যান্টনিওর পদচিহ্নের পাশে যেমন আইভির, তেমন এক রবিনসন ক্রুসোরও পদচিহ্ন ধরা পড়বে। যেন সবগুলি মিশে এক শোভাযাত্রা যা থেকে পদচিহ্নগুলোকে পৃথক করা যায় না।

বোটের উপর গিয়ে বসলুম পা ঝুলিয়ে। জল অনেক দূরে। বর্ষাতেও বোটের কাছে পৌঁছায় নি। বোটে বসতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, যেন তা রবিনসন ক্রুসো যেমন পরিত্যক্ত জাহাজে হঠাৎ একদিন দেখতে পায়, একটা কালো টিনের বাক্স। না এটা আব্রামাইটদের রাখা কিছু নয়। হয়তো আমার বোটের সহযাত্রীদের কারো ব্যক্তিগত পোশাক পরিচ্ছদের বাক্স। কী আছে ওতে? কয়েকটি স্প্যানিশ মুদ্রা, একটা পিস্তল, একটা বাইবেল হয়তো বা একগাছি মুক্তোর মালা, যেমন ক্রুসোর মতো নাবিকেরা পরিত্যক্ত জাহাজে হরদম পায়। হয়তো আগেও দেখেছি এবং তখনও অপরের বিষয় ভেবে গা করি নি।

দেখলুম পদচিহ্ন থেকে কিছুদূরে, সেই অনেক জনতার পদচিহ্নে যেখানে ডম অ্যান্টনিও আর আইভির পদচিহ্ন বেরোনোর পথ করতে পারছে না যেন, একটা ছোট স্বচ্ছ জলের টুকরোয় কয়েকটি মাছ। বেশ বড় আর পরিষ্কার চেহারার সেগুলো। কায়দা করতে এগিয়ে জল শুকোতেই আটকে গিয়েছে। বোট থেকে নেমে জলের টুকরোটার কাছে গিয়ে মাছগুলো দেখলুম। জল পর্যন্ত একটা নালি কেটে দিলে মাছগুলো নদীতে গিয়ে পড়বে। একটা কাঠি দিয়ে নালি কেটে দিলুম। কয়েকটা মাছ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কী আশ্চর্য কয়েকটাকে ধরেও ফেলেছি, আর কী আশ্চর্য কত সহজে সেগুলো মরে।

ছাতার দিকে ফিরতে ফিরতে মনে হল একটা তৃপ্তি বোধ করছি। যেন বিরাট কালো কোন অন্ধকারে সেই মাছগুলো ঢুকে যাচ্ছে বলে আমার আনন্দ হচ্ছে। ও, আচ্ছা, তা হলে বিরাট কালো গহ্বরটা আমার মুখ। কিন্তু তা হলেই কি এটা সম্ভব যে মাছগুলোর মতোই কোন কালো হাঁ আমার জন্য অপেক্ষা করছে?

ছাতার দিকে আসতে অর্থাৎ দূর থেকে তা চোখে পড়তেই, মনে হল পদচিহ্নগুলো কি আমাকে শেষ পর্যন্ত ভয়ের সেই গুজবটাকে ভুলতে সাহায্য করবে? রোদ উঠেছে। দুপুর তো। আকাশে মেঘও। সেজন্য সামনের ঘাসগুলো কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও কোমল।

কিন্তু ছাতার কাছে এসে ভয়ের গুজবটাও আবার মনে ফিরল। সত্যি কি গুনতিতে আমরা কেউ বেশি হয়ে যাচ্ছি? কেউ কি আমাদের আগে একবার গুণে রেখেছিল?

দেখলুম ছাতার নিচে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ। উল্টানো হাতের তলা কপালে রেখে ছড়ানো। দূরের কিছু দেখছে রোদ থেকে চোখ বাঁচিয়ে?

কি দেখছে? আকাশ, না ঘাসের মৃদু নড়াচড়া?

পায়ের শব্দে ডম অ্যামব্রোসিও চমকে উঠেছিল।

অ্যামব্রোসিওকে তখন কেমন দেখিয়েছিল তা এখনও মনে করতে পারি। গায়ে আধ ময়লা সাদা ঢিলে গাউন (তখন নিশ্চয়ই সাবানেরও অভাব হয়েছে), আস্তিন গুটানো, গলায় একটা কাচপুঁতির মালা যাতে একটা ছোট্ট ক্রস কাচের (জপের জন্যই বোধ হয় ব্যবহার হয়), পায়ে মোটা থ্যাবড়ানো স্যান্ডাল। রোদের ঝাঁজে তামাটে মস্ত চৌকো মুখ।

বলেছিলুম—কী দেখছো? বাতাস চললে ঘাস ভাগ হলে ওরকম কোথাও ঘাসেব মধ্যে কোন কোন অংশকে গাঢ় রঙের কিছু বলে মনে হয়।

অ্যামব্রোসিও হেসে বলেছিল—না দেখছিলুম নুন ধুয়ে গিয়েছে। ঘাসগুলো বাড়ছে।

এখানে এই নতুন ধরনের ঘাস বেশ প্রচুর। বসো।

এখানে ঘাসের দরকারও ছিল।

ডম অ্যান্টনিওব পরীক্ষার দরুন?

জানো দেখছি। হ্যাঁ, ডম পরীক্ষা কবতো। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল অ্যামব্রোসিওর।) তোমার কি মনে হয় এই সব পরীক্ষা ঈশ্বরের অভিপ্রেত?

ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কিছু বলাই কঠিন। অ্যামব্রোসিওর মতো একজনকে বলা আরও কঠিন। তার চিঠিব কথাটাই মনে পড়ল আমার।

বললুম—মানুষ যুক্তি দিয়ে যা করে তা কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়?

হয়তো যায় না। কিন্তু মানুষ যদি পশুর বেলায় যা সত্য নিজের বেলাতেও তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে? আমি নারীদের অপমান, পীড়া ইত্যাদি দিকগুলোকে যদি যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি এক বর্বরতা বলেই ধরে নেই। পুরুষের মৃত্যুর মতো, কিংবা তার চাইতেও বেশি সেই নারীদের সম্ভ্রমলোপ যেহেতু তারা তো জীবিত কঙ্কাল হয়ে থাকে অথচ মরতেও পারে না। তুমি শুধু ভেবে দেখো, সেই তাদের কথা যারা একটা জাতির মধ্যে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করতে কতকগুলো নির্বোধ পশুকে উসকে দেয়? এটায় মানুষের কি যুক্তি আছে?

অ্যামব্রোসিওর মুখ কালো হয়ে উঠল যেন।

সে বলল—(যেন অনেক দূরে তাকিয়ে দেখল সে) অ্যান্টনিওর পরীক্ষায় কখনও দুই শাখার সব রকমের দুর্বলতা নিয়ে জন্মাতো নতুন প্রজাতি। তা ছাড়া মিউলগুলোকে কিছুতেই উর্বর করা যায় না।

বললুম—তুমি কি এক্ষেত্রে মানসিক উর্বরতার কথা বলছো?

তাই নয়? তারা কি জাতির গায়ে চিরদিন ক্যানসারের মতো কিছু নয়? জাতির প্রধান প্রবাহ থেকে বঞ্চিত একটা মজা জলের খাল হয়ে থাকে না? মানুষের মনে কি জোর চলে?

আবার আমার মনে এল সুরতকে লেখা অ্যামব্রোসিওর চিঠিটা। তাই কি হয়? ভাবলুম, তারা কি সব সময়েই দেশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে চলে?

বললুম—কিন্তু অ্যামব্রোসিও, এখানে অন্তত আমরা সব রকমের পরীক্ষা থেকে দূরে।

অ্যামব্রোসিওর চোখের কোলে যেন কালি জমে উঠল।

সে হঠাৎ বলল—দেখো কাণ্ড! তোমার খাওয়াই হয় নি দেখছি। রুমালে ওগুলো মাছ মনে

হচ্ছে। যে জন্যে এলাম তাও ভুলে গিয়েছি। এই নাও, এগুলো কচ্ছপের ডিম। হঠাৎ যোগাড় হল।

সে রুমালে বাঁধা কয়েকটি ডিম বার করল ঝোলা জামার পকেট থেকে। আমি সেগুলোকে নিলে বলল, তুমি আমাকে সুরতের কবিতাটা পাঠিয়েছিলে, এটা তার রিটার্ন ভিজিট হল। এখনও ট্যাঙ্কগুলো বুলডোজারের মতো আমাদের দিগন্তের প্রাচীর ভাঙে নি। তাই বলে কি মনে করো আমরা এক পাগল হয়ে যাওয়া পৃথিবীর অংশ নই?

সে উঠে দাঁড়াল। এগোতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বলল, এটা একটা পাসপোর্ট। অনেকদিন আগে রোমান ক্যাথলিক গির্জার এক বিশেষ সম্মেলন হয়েছিল গোয়ায়, সে সময়ে আমার দরকার হয়েছিল। এটা রাখো যদি কারো কাজে লাগে। সুরতকে কিন্তু তার কবিতার জন্য ধন্যবাদ। সেই ম্যাপের কবিতা আমার ভালো লেগেছে। কারণ বোধ হয় ঈশ্বর শিকড়ে এখন বৃষ্টি পাঠাবেন না।

সে হাসতে হাসতে চলে গেল। পাসপোর্টই বটে আমার হাতে, যা থেকে অ্যামব্রোসিওর ফটোটা এমন করে সরানো যাতে অন্য কারো ফটো সেখানে বসানো যায়।

এটা কী অদ্ভুত অবস্থায় এলুম আমরা। সত্যি কি একজন হিসাবে বেশি হচ্ছি আমরা? সত্যি কি এখানে অ্যামব্রোসিওর পাসপোর্টে নিজের ফটো বসানোর কারচুপিব পিছনে কারো আত্মগোপন করার দরকার হয়েছিল?

কারণ পরদিন সকালে চার্চের অল্টারের পাশে অ্যামব্রোসিওর গুলিবেঁধা শরীবটাকে পেয়েছিলুম। তখন রক্তের ধারাগুলো কালো হতে সুরু করেছে।

অথবা এটা কি একটা তেমন হতাশাই ছিল, যেমন কাহিনীতে পড়া যায়, যার চাপে পড়ে নির্জন দ্বীপে জাহাজডুবির নাবিকরা পরস্পরকে অকারণে বিদ্বেষ করে? অথবা কী সেই ভয় যা বর্ণহীন স্বচ্ছ দেহ অথচ যেন কোন খামারবাড়ির হলে দৃঢ় নিঃশব্দ রাজকীয় উপেক্ষায় পদচারণা করে, আর মানুষ শিউবে উঠে তাকে অনুসরণ করতে নিজের প্রাণ নিয়ে বসে?

অনেকদিন পরে সুরতের সেই লালমলাটের বইয়ে একটা ইংরেজিতে লেখা বাক্যসমষ্টি দেখেছিলুম। এমন কত কথাই তো লিখতো। কার সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য? এক জায়গায় লেখা ছিল: প্রতিদিন একটা সুযোগ এনে দিতো আর প্রতি সুযোগ একজন মহান নাইটকে।

ডাক্তারের ২নং নতুন জবানবন্দী

এসবই পবে ভেবে দেখেছি। ডম অ্যামব্রোসিও আত্মাকে মানতো, মনকে নয়। অর্থাৎ তার কাছে ফুলটাই সত্য ছিল, ফুলের গাছ যে অন্ধকারক্লিন্ন রসকে ক্রমশ ফুল করে তোলে তাকে বিশ্বাস করতো না, যদি বা সে কৃষক হিসাবে জানতো পুরনো আভিজাত্যে (এমন কি তার অস্তিত্বের ভানেও) রূপ, সুরুচির সঙ্গে, হয়তো বা ক্রূরতাও থাকে যা অন্যকে যেমন, তেমন নিজেকেও (কখনও নিজেকেই বেশি এক পাপবোধের দরুন) পীড়ন করে। কিংবা যে যুগে (যুগের বর্বরতা সত্ত্বেও) সেন্ট ফ্রান্সিসও হওয়া যেতো নিজেকে চাবুকে জর্জরিত করে, তা এখন চিরকালের জন্য চলে গিয়েছে। অথবা হয়তো (আমাদের অজ্ঞাতে) এ যুগে এই রকমের কিছু বিবর্ণ সেন্টই হয়ে থাকে। কারণ, যদি বা একথা সত্য, আমাদের চারিদিকে এখনও এক দিগন্তের প্রাচীর এবং ট্যাঙ্কগুলো বুলডোজারের মতো সেই দিগন্তকে ভাঙতে আসে নি, প্রকৃতপক্ষে এটা কি এক জলের খণ্ডই নয় যেখানে কয়েকটি মাছ আটকে পড়েছে?

কিন্তু এতেও যেন সব হয়নি, যেন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও দেখা দেবে এই সব আশা-হারানোর

উপত্যকাতেও। আশা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ না হারালে পদচিহ্নের ধোঁকা তৈরি করে কী লাভ? কেননা শুধু অতীতকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, প্রতি বর্তমান মুহূর্তই তো মুহূর্তান্তে অতীত।

তবু ফুল ফুটল। পাগল, পাগল, পাগল। পাগলের মতো তারা ঘাসের বনে (ঘাসের মধ্যে মানুষ যা খেয়ে বাঁচে সেই ধান-গমের ওষধিও দু-এক জায়গায় এবং তা অবশ্যই গত বছরের জমিতে পড়ে থাকা ফসলের পরিত্যক্ত দানাগুলো থেকে) আলো হয়ে আলো করে। পাগলের মতো ফুল আর ঘাস আর বিনা চাষের ধান-গমের ওষধি। সাঁকোর ধারে অ্যামব্রোসিও যেখানে সেই গলিত কঙ্কাল, নীল শাড়ি আর খুলি থেকে ক্রমশ খুলে আসা দীঘল বেণীর উপরে মাটির ঢিবি করেছিল, সেখানে সেই ঢিবিকে আচ্ছন্ন করে, যেখানে মাঠের মধ্যে ডম অ্যামব্রোসিওর শরীরের উপরে আমরা এক মাটির স্তূপ তৈরি করেছিলাম, তাকে ঢেকে পাগলের মতো ফুল ফুটেছে। যেন সেই ছবির মতোই পাগল যা সুরত তার লালমলাটের বইয়ে ছাপা অক্ষরগুলোকে ঢেকে, কোথাও বা ছাপার অক্ষরের তলায় কাগজের ওয়াটার মার্কের মতো আঁকতো, যেন সে সবই রং ছাড়া কোন এক নতুন ভ্যান গগের স্কেচ।

এক মাস হয়ে গিয়েছিল তখন মনে পড়ছে—ডম অ্যামব্রোসিওর সেই ঘটনা থেকে এবং সুরতের অপারেশনের পরেও। সুরতকে তখন আমরা মাঝে মাঝে তুলে বসাচ্ছি। আইভি একদিন তার অবিন্যস্ত চুলগুলোকে ধুয়ে শুকিয়ে মাঝখানে চিরে সিঁথি করে দিল। আর একদিন নিজেই কাঁচি ধরে (সে নিজেব কার্লিংগুলোকে যেমন করে ঠিক করে নেয় হয়তো) সুবতের মুখের দাড়িকে শাসনে নিয়ে এল।

সেদিনই সে আমাকে বলেছিল, তুমি যা বলেছিলে ডম, তা হয়তো সত্যি। প্রতিভাই। শরীরের প্রতিভা বলবে, অর্থাৎ যার বলে সাধারণ স্বাস্থ্যের একজন লোক একশ বছর বাঁচার মতো গতি খুঁজে পায়। কিংবা তুমি কি বলবে শরীর আর মস্তিষ্কের প্রতিভার একই উৎস? কেউ কেউ হয়তো সিফিলিস ও মদের গ্লাসে পড়ে, কোন কোন প্রতিভাশালী। কিন্তু দেখো লিওনার্ডো, মান, রাসেল, রবিঠাকুর।

হেসে বললুম, চ্যাপলিন, চার্চিল, আইনস্টাইন।

ও তুমি ঠাট্টা করছো! কিন্তু দেখো কী চোখ, কত টানা আর স্বপ্নে ভরা; কী রং যা অতিরিক্ত ট্যান্ড হয়েছিল এতদিন রোদ জলে, কী শক্তি, কী রঙীন! গোল্ডেন বয়!

আইভিকে যেন সুন্দর দেখাচ্ছে বর্ষাশেষে।

কিন্তু একদিন তাকে ফুলের মতোই দেখাল, উজ্জ্বল, খুশি এবং সোনালি। যেন সেই ফুলগুলি যা স্তূপগুলোর উপবে বাতাসে দোল খায়। আমার মনে হল যেন টায়রাও পরেছে আইভি। ছোট সুন্দর, মুকুটের মতো নয়, বোধ হয় চুলের সঙ্গে মিশে যায় এমন বাদামি সিল্কের ব্যান্ডের সাহায্যে বসানো কপালের বরং বাঁ দিকে, একটা চকচকে পোখরাজ-বসানো কিছু। সেকেলে অলঙ্কার হঠাৎ কেউ পরে দাঁড়ালে (হয়তো সবাই নয়) এমন অবাক হয়ে যেতে হয় বোধ হয়। সেকেলে এবং ভারি গহনাই পরেছিল আইভি। নিচু গলার ব্লাউজের উপরে উজ্জ্বল হলুদ চওড়া হারটাই যেন তাকে হলুদ এক ফুল করেছে। ছোট ছোট পিংক ফুলের ব্লাউজের উপরে এক অদ্ভুত চাঁদমালা। সরু সোনার শিকলিতে গাঁথা একের পর এক সোনার বিস্কুট। অবিকল বিস্কুট। সোনার বিস্কুট। কিন্তু তারার মালা যেন।

সুরতকে আজ ছবি আঁকতে অনুমতি দেয়া হয়েছে আবার।

পাতার রস আর হলুদ যোগাড় করে দেয়া হয়েছে। রুজ দিয়ে লালের কাজ চলবে। কাঠকয়লায় যার ছবি পাগল; রঙে তা হয়তো একেবারে নোঙর ছাড়া নৌকাই হবে।

তাই বলে বেশি নয় কিন্তু। তারপর আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। পথ কোথায়? চলতে ঘাসগুলো

দুলছে। হাঁটু ছাড়িয়ে ঘাস। বিকেলেব রোদ আছে। আইভির সোনার হার থেকে, হাসি থেকে সেই বোদ যেন খুশি, খুব খুশি হওয়ার চেষ্টায় ছিল।

আইভি বলল, চল বসি কোথাও।

চারিদিকে চেয়ে বলেছিলুম, ছাতায যেতে হয়, না হলে বোটে। নতুবা বসতে গেলে, ঘাসে ডুবে যেতে হবে। আমরা যেন তখন বসবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছি। এই সময়ে একটা ছোট কাঠের ক্রেট চোখে পড়ল বরং ছাতার দিকে যাওয়ার পথে। হেসে বসলুম, এখানে?

এটা কি তেমন একটা ক্রেট যা সেই রবিনসন ক্রুসোর দিনে বোট থেকে রিলে করতে করতে এতদূর এনেও পরে আব খেযাল করি নি ছাতায় নিতে?

আমার মনে আছে আইভি ভ্রুকুটি করেছিল। (মনে থাকা বোধ হয় এজন্যেই স্বাভাবিক যে আর কখনও কোন স্ত্রী-মানুষকে আমি তেমন বাতাসেব মতো, ফুলের মতো, সহজ ও স্বেচ্ছাধীন হতে দেখে নি। মনে যে ছিল তার প্রমাণ তো আগেই উপস্থিত কবেছি, তাব টায়রা, তাব অত্যন্ত নিচু গলাব ব্লাউজ, আব সোনা-বিস্কুটের চাঁদমালার কথায়।) ভ্রুকুটি কবে যেন সে বলবে, সিলি। ওটুকু জায়গায় দুজনের হয়! কিন্তু মনে হল সে অপ্রতিভ (যেমন কারো কারো মতে জাগ্রত সেকস-বোধ স্ত্রী-মানুষ হতে পাবে)।

আমবা হাঁটতে লাগলুম বরং। একবার তো একরাশ ফুলের মধ্যে দিয়ে হাত দুলিয়ে নিল আইভি।

বলল—আচ্ছা ডম, তোমার কি মনে হয জস আব্রাম সত্যি সি-আই-এব লোক?

তাদের সম্বন্ধে এবং জস সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিষ্কাব নয়। দেখতে পাচ্ছি যে কথাবার্তায় চালচলনে (বিশেষ, কথাব অনুনাসিক টানে) যেন আমেরিকানই বটে। হলিউডের ছবিতে যেমন তেমন ওঠাবসার কায়দা। যেন এক বযস্ক অভিজ্ঞ এবল ফ্লিনই। মানুষ-পুরুষেব এক সুন্দব নমুনা।

(আইভির মুখে কিছু রক্তের আভাস এসেছিল এক মুহূর্তের জন্য?)—তুমি আবার বলতে পারো। কিন্তু অপারেশনের সমযে তোমার আঙুলের পাশে পাশে আঙুল রেখে ঠিকঠাক কাজগুলো করে যাওয়া। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি; কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখছিলুম তুমি আশ্চর্য হলেও আপত্তি করছো না। সোজা কথা সেটা? পাঁজরা ওপন করা অপাবেশন।

বললুম, ওটা খুব অবাক করা ব্যাপারই। যা মারাত্মক হতে পারতো কিন্তু হয় নি!

আমার পবে মনে হয়েছে, ডাক্তার তো বটেই। কিন্তু ডাক্তারের তো প্রফেশনের এথিকস থাকে, যতই আত্মবিশ্বাস থাক। এ যেন একজন সার্জাবিব অধ্যাপক যে ছাত্রকে চোখেব সামনে একটা কঠিন অপারেশন কবতে দিচ্ছে এবং সেখানে যেটুকু দরকাব সাহায্যও করছে।

হেসে বললুম, তুলনাটা ভালো। কিন্তু লক্ষ্য করো কী এক তাগিদে সে তার ছদ্মবেশ থেকে নিজের অজ্ঞাতে বেরিয়ে এসেছিল। আমবা এখন বুঝতে পারছি সে একজন বিচক্ষণ অভিজ্ঞ সার্জেন যার কাছে পাঁজরা ওপন করা অপাবেশনও নতুন নয়, যদি তোমার কল্পনার মতো সে অধ্যাপক নাও হয়।

আইভি বলল, সি-আই-এতে কি এমন ডাক্তারও থাকে?

সবাই ইয়ান ফ্লেমিংএর নায়ক কে বলেছে? আমি জানি না কিন্তু তাদের মধ্যে সৌম্যদর্শন দর্শন-সাহিত্যের অধ্যাপকও থাকতে পারে। এমন কি ভয়ঙ্কর মতবাদের বিপ্লবী।

তাদের কি একটা বিশেষ মতবাদকে সাহায্য করাই কাজ নয়?

আমি তো জানিই না। কেউ কেউ বলে তারা বিপ্লবকে উস্কায়। কারণ ওসব ব্যাপার না ঘটলে (আব তা যদি গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে না আসে), তোমার সুরতের সেই স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে রসিকতা মনে নেই? যুদ্ধের এরোপ্লেন ট্যাঙ্ক ইত্যাদিকে অন্য কী ভাবে কনজিউমার্স গুডস বলে মনে হবে? মোট কথা অপারেশনের সময় সে কাঁচা কাজ করেছে, এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে।

আমরা বোটের কাছে এসেছিলুম। পা ঝুলিয়ে বসল আইভি। বলল—এখন কিন্তু কোকোকোলা ভালো লাগতো।

কিংবা সুরতের মতে স্বাদু ঠাণ্ডা জল, অর্থাৎ স্বাভাবিক জল।

আইভি বলল, তার সেই হারে আঙুল দিয়ে খেলা করতে করতে, তোমার মনে পড়ে, ডম, এখানে আমরা এক তারায় ভরা রাতে ঘুমিয়েছিলাম। দেখো, আমার কিন্তু ঘুম ভালো হয় নি। স্বীকার করছি তা ভয় যদি না হয় তবে উৎকণ্ঠা, অথচ কী অনায়াস ঘুম তোমার, যেন তোমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি নিশ্চিন্ত হলাম ওটা তোমার এক অদ্ভুত অ্যামনেশিয়াই যে তুমি ভুলে গিয়েছ, এমন কি, যে তুমি পুরুষ মানুষ।

আইভি যেন সেদিন বাতাসের মতো যে দিকে খুশি বয়ে গেল। জানো, ডক্টর অ্যানাসিন, আচ্ছা তুমি কি সেই উপন্যাসটা পড়েছো? ওই যে নেপোলিওনের সৈন্যদলের পারমা অধিকার নিয়ে যা শুরু। ফরাসী এক ক্যাপটেন পারমার এক অভিজাত গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে এরকম (প্রায় জোর করে নেয়া কিন্তু যেন ভদ্রভাবে অনুমতি নিয়ে) আশ্রয় নেয়ার ব্যাপার ঘটে। বিদেশি সৈন্যরা যখন দেশকে অধিকার করে নেয় অথচ সৈন্য রাখতেই হচ্ছে, তখন ক্যাম্প তুলে দেয় কিন্তু হোটেলই বা কোথায়? ফলে সেই অভিজাত গৃহের গৃহকর্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হলেন। এবং সেই উপন্যাসের নায়ক সেই ওঅরবেবি।

হয়তো তা হতে পারে। ভালোবাসার ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। এবং ঠিক ধর্ষণও নয়। সেই বদ্ধ আবহাওয়ায় ওটা বোধ হয় এক রকমের শারীরিক প্রয়োজন, মনকে পরিস্থিতি সহ্য করতে সাহায্য করার জন্য। এবং হয়তো এমন বিশেষ ক্ষেত্রে মায়ের মনে দ্বিধা থাকে কিন্তু কৌতূহলও থাকে, বিদ্বেষ হয়তো থাকে না। সমস্যা হয় না। আইভি বলল, জানো, তোমাকে কি কথাটা বলবো, অবশ্য তখন যেমন আমার ভয়ের সময়ে, এখনও তেমন তোমাকে ডাক্তার মনে করি। ডাক্তারকে গোপন বিষয় বলা যায় বলেই সে ডাক্তার—বৈজ্ঞানিক। আমার কিন্তু খুব ভয় হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ছিল ভয়। প্রায় দুমাসই। তারপর এখন বুঝেছি ওটা অমূলক। তুমি কি হাসিই হাসতে মনে মনে, আমাব মিথ্যা উৎকণ্ঠায়। চল ফিরি, সুরতকে একটা ইনজেকশন দেয়ার সময় হয়ে আসছে। ভালো কথা, লক্ষ্য করেছো তোমার বি ভিটামিনের বাক্স আর খুব সামান্যই আছে? কী হবে?

খামারের দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। পথের ক্লান্তি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই ক্লান্তির ফলেই যেন আবহাওয়াটাকে বরং বসন্তের মতো বোধ হচ্ছে। আর এটা এক সহজ অভিজ্ঞতা। শহরের বাইরে যে রকম বাসন্তী অনুভূতির একটা নেশা আছে।

আইভি মাথা দুলিয়ে বলল, জানো, ডম, আমি কিন্তু ভালোবেসে ফেলেছি। আর ওটা আমার একটা মিথ্যা উৎকণ্ঠাই ছিল। এখন আমি আবার পবিত্র।

যেন ফুলের উৎসবই। এই সময়ে আবার মাঠের হলুদ-হলুদ ফুল, পিংক রঙের নিচু গলার ব্লাউজ, সোনার সেকেলে নকশার হার, আইভির ম্যানিকিওর করা নখ চোখে পড়েছিল যার সঙ্গে তার কথাটা যেন ষোল আনা মিলে যায়।

বললুম, সুরতের কথা বলছো?

এমন সোনালি ছেলে তুমি দেখেছো আর?

বললুম, তাকে আমিও ভালোবাসি।

সিলি।

কিন্তু তারপর প্রথমযৌবন অতিক্রান্তা সেই সুন্দরীর গালে টোলের চারদিকে প্রেমের লৌহিত্যই দেখা দিল।

ডাক্তার অ্যানাসিনের শেষ জবানবন্দী

যেন তা সম্ভব। যেন প্রকৃতই এটা বর্ষার পরে ফুলের দেশ হতে চলেছে, যেন বর্ষাশেষের ট্যাঙ্কগুলো যদি দিগন্তের প্রাচীর গুঁড়ো করে এগিয়ে নাই আসে, নতুন জলে নুন ধুয়ে উর্বর হওয়া একটা নিজস্বতা হতে পাবে এই ঘুমের উপত্যকা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তো সেই পাগল পৃথিবীরই একটা অংশ যেখানে ফুল যদি থাকে তবে তা ক্যাকটাসের। এখানে ফুটপ্রিন্টের ধোঁকায় অতীতকে বিসর্জন দেয়া যায়ও যদি, সেই ফুটপ্রিন্টকে গাবিয়ে কিন্তু ভবিষ্যতের সঙ্গে তোমাকে যুক্ত করতে অন্য অনেক পদচিহ্ন পড়ে। আর তুমি বড়জোর জলের টুকরোর আটকে যাওয়া মাছ হও।

পরে আমার মনে হয়েছে এটা তো বাস্তবে নীতিকে ঠকিয়ে পণ্য রপ্তানিরই গল্প। সুরতের সেই স্ট্যাটিসটিকসের রসিকতা যেন যার সার অংশ। আর সেই আপাতনিষিদ্ধ পণ্যের কারবার করে, বিদেশের সঙ্গে অন্ততঃ মনের যোগ আছে (যেন তা এক কাল্পনিক রক্তের ঋণই) এমন কতগুলি মানুষই কি তার চরিত্র নয়?

হঠাৎ সুরতের স্বাস্থ্য যেন আরোগ্যের দিকে আর এগোচ্ছে না। কোথায় যেন কষ্ট হচ্ছে আবার। আর একটা কি অপারেশন দরকার হবে? কিন্তু ওষুধ কোথায়? সুরতের চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল। ঠোঁট দুটো যেন কাগজের তৈরি। যদি নড়ে তবে তা হাসির জন্যই। কিন্তু এত দিনে সে হাসি যেন আমাদের বুকের ভিতরে কিছু একটাকে মুচড়ে দেয়।

আইভি এসেছিল ছাতায়। পরামর্শ করবে বুঝি ডাক্তারের সঙ্গে। তার বুঝি ভয় হয়েছে খামারে আলাপ করলে পাছে তা রোগীর কানে যায়।

বললুম, আর একবার খোঁজ নিয়ে দেখি। সব ওষুধ একত্র করে দেখি। আইভি বসে থাকতে থাকতেই যেন তার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। গলার স্বর কোথায় যেন চিরে গেল। হতাশায় কি চোখের চারিদিকে গোল হয়ে কালি পড়ে?

সে চলে গেলে ভাবলুম (ডাক্তার তার আশু প্রয়োজনের কথাই ভাবে), আর ভাবনাটা সুরতের পুরোনো রসিকতার দিকেই এগিয়ে গেল। কেন তেমন গবেষণা হচ্ছে না যাতে অকসিজেনের জন্য সিলিন্ডার লাগে না? আব্রামাইটরা তো কত সুন্দর প্যাকিং করেছে। আমি তাদের আজ এখন অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিতুম যদি তারা গবেষণায় এমন একটা কিছু বার করতে পারতো যাতে ইনজেকশনে রক্তস্রোতে অকসিজেন দেওয়া যায়। সোজা উঠতে পারে না দৌড়ে, এমন ভারি বোমারের চাইতে তার মূল্য এখন আমার কাছে অনেক বেশি। অবশ্য এটা আমার এক রকমের হতাশাজাত অলীক চিন্তাই বোধ হয়।

ছাতার তলায় আমার রোগীর সম্ভাব্য প্রয়োজনের যত ওষুধ ছিল সব ট্রেতে সাজালুম। আইভিকে বলেছিলুম কাজেই সেও এসেছিল। কিন্তু অবাক করল। জস আব্রাম তো শুধু আইভিকে সঙ্গ দিতেই এসে থাকবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে ভুল করল। ওষুধের বালবগুলোকে, অ্যামপুলগুলোকে সেও যেন খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ল। আমার যেন মনে পড়ছে, সে একটু দূরে থেকে হতাশ ভাবেই মাথা নাড়ল। ডাক্তার তো বটেই। কিন্তু নিজেকে যে আবার ধরিয়ে দিচ্ছে—সে কি শুধু বিদ্যার প্রদর্শনকামিতা?

একা বসেছিলুম ছাতার তলায়। তখন তো সকালই: ঘাসগুলোকে দেখছিলুম আর ফুলগুলোকে। মনে হচ্ছিল, ঘাসগুলো যেন বাতাসের সঙ্গে খেলে খেলে ক্লান্ত। কিংবা যেন ওদের বয়স হয়েছে, এখনই হলুদ না হলেও। সেজন্য সেই সতেজ স্থিতিস্থাপকতা নেই। যারা নুয়ে পড়ছে, বাতাস সরে গেলেও উঠছে না। মনে হচ্ছিল, যে ফুলগুলো একেবারে ফোটায় পাপড়ি হারাচ্ছে তাদের জায়গায়

ফুটে উঠতে কলিগুলোর যথেষ্ট দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুরত আর নতুন ছবি আঁকছে না।

মনে হল যেন কেউ নিঃশব্দে কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন কিছু আত্মগোপন করে আসছে, যেন খারাপ সংবাদের মতো।

কিংবা, এখন যেমন মনে হয় (কী আশ্চর্য রকমে তীক্ষ্ণ হয়েছিল আমার দৃষ্টি যেন কিছুই তাকে এড়িয়ে যাবে না—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিংবা স্থূল) যেন দুঃসংবাদের চাইতেও কঠোর, নিঃশব্দ, অলৌকিক কিছু। এক মুহূর্তের জন্য অন্তত মনে হয়েছিল, যেমন সুরত বলতে পারত, (সে ছাড়া আর কে এমন জানতো ওদের নাটকের কথা!) যেন এলিজাবেথান নাটকের অতৃপ্ত, কঠোর, নিঃশব্দ, ব্যথিত, কিছু বা ক্রূর রকমে রসিক প্রেতাত্মার মতোই, ডম অ্যামব্রোসিও ব্রাগাঞ্জাই সে, যে লম্বা ঘাসগুলোকে প্রায় না নড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তেমন সারপ্লিস পরা, কোমরে দড়ির তেমন তিন গ্রন্থি।

কিন্তু জস আব্রাম বলল, ডাক্তার সাব, ইওর পেশেন্ট। বোধ হয় মন এই একটা কথায় একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল, নতুবা ব্যর্থ চিন্তায় পাক খেতে খেতে মন তেমন বোকা হয়ে যায়। হয়তো সেই ট্রেতে সাজানো আমাদের ওষুধের শেষ স্টকটার লেবেল পড়ে পড়ে মন হতাশায় ক্লান্ত। তখন যেন বাইরের বিষয়গুলোই তীব্র হয়ে চোখে পড়বে সেজন্যই। জস আব্রাম, সাদা সারপ্লিসে যার তিন গিরেতে জড়ানো দড়ি, দুহাত সামনে বিস্তৃত করে হাতের তালু দুটোকে মেলে যেন শূন্যতার মুদ্রাই দেখাচ্ছে; তার মুখের বাঁ দিকে ঠোঁটের কোণে একটা বাদামি জরুল, তার ডান দিকের ওপরের পাটির একটা দাঁত সোনার; তার পুষ্ট পুরোবাহুতে, যার রং গমের চাইতে বরং সাদা, রোমগুলো ঈষৎ বাদামী, তার পুরোবাহুর দুটোতেই উল্কি; বাঁয়েরটিতে জেড এ ইংরেজি বর্ণে লেখা, ডানেরটিতে যেন বাইজেন্টিয়াম মসজিদের কারুকার্য, সেই আরবী অক্ষরগুলোকে ছবির ডিজাইনে পরিণত করার কৌশল।

তারপর, অবশ্যই, উঠে দাঁড়ালুম, এবং ঘাসগুলোর ওপর দিয়ে, নেতিয়ে পড়া ঘাস, (কে জানে, খামারের যেখানে প্রজাতি উন্নয়নের নানা পরীক্ষা হতো, সেখানে স্বাভাবিক সময়ে এখন হে-টাইম কিনা—অর্থাৎ সারা বছরের জন্য ঘাস শুকিয়ে তোলার সময় কি না) আমরা অবিশ্বাস্য দ্রুত চলতে চেষ্টা করছিলুম। সামনে জস, পিছনে আমি।

আমার দুটো রঙের কথা মনে পড়ে, কালো আর সোনালি।

কালো ছিল তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, গ্রুপিং-এ; তাদের হাত মুখ এমন কি তাদের মুখের কথাও যেন কালো ছিল। আর সোনালি ছিল খামারের দোতলার কোন কোন অংশে; জানালার কাচ দিয়ে এসে পড়া আলোয়, সুরতের মুখে, আইভির গায়ের রঙে, তার সেই সোনার বিস্কুটগুলোয় এবং সোনার চওড়া সেকেলে ব্রেসলেটে।

আসলে এটা মানসিক ব্যাপারই, স্মৃতি যতই অন্যরকম বলতে চেষ্টা করুক। হয়তো আকাশে টুকরো মেঘ সাময়িকভাবে তাদের সেই গ্রুপটার ওপরে ছায়া ফেলেছিল (যা খামারের দোতলার আলোকে ঢাকে নি) হয়তো যে শূন্যগর্ভ কফিনগুলোকে তারা চার্চের পিছনের পারিবারিক কবরখানা থেকে টেনে তুলেছিল, মাটিতে থেকে সেগুলো কালোই দেখাচ্ছিল, এবং নিশ্চিতই ক্রিস সমেত তাদের সকলের পরনেই গাঢ় রঙের পোশাক ছিল, নীল-কালো ব্লেজার কিংবা টেরিলিন। কিন্তু তার জন্যই তেমন কালো হয় না যেমন স্মৃতি ধরে রেখেছে। এরা কি প্যারাট্রুপার?

একজন বলল—কোথায় আমাদের টাকা?

ক্রিস বলল—তোমরা তো ক্রেটটাও পেয়েছো আর কালো স্টিলের বাক্সটাকেও।

সে দুটো ওরা যে পেয়েছে তাতে সন্দেহ কি? বোটে দেখা সেই কালো স্টিলের বাক্স যাকে আমি কোন সহযাত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভেবেছিলুম, আর সেই ক্রেটটাই যেটায় বসারে প্রস্তাবে আইভি একটা দীর্ঘস্থায়ী কিংবা গভীর ভ্রুকুটি করেছিল।

হাসল যেন কেউ। কর্কশ মোটা হাসি। বলল কেউ, ওটা আমরা পেয়েছি। কিন্তু পঞ্চাশ লাখের হিসাব মেলে না। আর সোনা? সোনাগুলো?

অদ্ভুত অঙ্ক নয় সব? যেন সুরতেব স্ট্যাটিসটিকসের রহস্য। নতুবা যেন সরকারি ট্রেজারির খাজাঞ্চির হিসাব খাতা।

ক্রিস বলল, বিশ্বাস করো সে সবই পার্টির জন্য খরচ করা হয়েছে।

কেউ যেন চড় মারল এক কঠিন কর্কশ কালো হাতে ক্রিসের চোয়ালে।

ডুবন্ত মানুষের মতো মাথা তুলে ক্রিস বলল, সে সবই মেটেবুরুজে।

হ্যাঁ, যেন সেই কালো রংগুলো কালো বৃষ্টি হয়ে ওদের মুখ গড়িয়ে পড়েছে। (এটা খুবই স্বাভাবিক, যা এখন বুঝি, যে তারা উত্তেজনায় ঘামছিল।)

কেউ বেশ জোরে জোরে হাসল।

ক্রিস বোধ হয় ঠিক এই সময়েই সুযোগটাকে দেখতে পেয়েছিল। একটা কফিনের উপব সে উঠে দাঁড়াল। ওটা বোধ হয় তার অভ্যস্ত বক্তৃতারই ভঙ্গি, সে দুহাত সামনে উঁচু করল। বলল— তোমরা বিশ্বাস করো, এই সময়, এটাই সময়। দুদেশ এখন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসছে। ক্রমশ অবসন্ন হবে। আর সেই সুযোগে এপাবের ও ওপারের আমরা একত্র হতে পারবো। বিশ্বাস কবো, ওরাও কাজ করছে। টাকা তো কাজেব জন্যই।

অন্ধকার থেকে কে যেন (তখন প্রকৃতপক্ষে দিনই তো) চিৎকার আবার করে বলল ভীত আর্ত কণ্ঠে, আবার আবার ওকে বক্তৃতার সুযোগ দিচ্ছো!

যেন বক্তৃতা একটা মন্ত্র যা ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এটাই ভয়। অথবা বক্তৃতা এমন কিছু যে ওরা এখনই চটাপট করতালি দেবে। নিজেরাই যেন কালো স্রোতে পরিণত হবে যা ক্রিসকে অনায়াসে বহন করবে।

কে একজন সাহস করে এগোল। রিভলবারের বাঁট দিয়ে ক্রিসের চোয়ালে মারল। কালো মুখে একটা ধারা নামল। কিন্তু সোনালি রং ছিল।

খামারটায় তো জাহাজের আদরা ছিলই। কারণ ডম অ্যান্টনিও এবং তার বাবাও জাহাজে সমুদ্রে এবং উপকূলে ঘুবতো। সুতরাং যেমন দোতলার হলে (যা জাহাজের স্টেটরুমের মতোই বিশিষ্ট) উঠবার প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি ছিল, তেমন নাবিকদের চলাচলের মতো পিছন দিকের হ্যাচওয়েও ছিল। জস আব্রাম সেরকম পথেই আমাকে নিয়ে উপরে এসে থাকবে।

আর সে সি-আই-এর একজন হোক না হোক, ডাক্তার নিশ্চয়ই, হয়তো এমন একজন যে এক সময়ে ট্রেঞ্চের বিস্ফোরণের মধ্যেও অন্তত ফার্স্ট এইড দিতে অভ্যস্ত ছিল। সে-ই নিশ্চয় সুরতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে থাকবে।

সোনালি কেন তা আগেই বলেছি। কাচ দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরটায় হালকা পর্দা চুঁইয়ে। সে আলো রঙীন। আইভি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। যেন আমি যেভাবে রোগী দেখতে এসেছি সেটা তার কাছে খুব ধীরে মনে হয়েছে। সে হাত ধরে যেন আমাকে নিয়ে যাবে। আইভিকে সোনার তৈরি মনে হয়েছিল। নিরাভরণ, ক্লান্ত, অনুজ্জ্বল সোনা। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত থাকায় আলো পড়ে যাতে সোনালি রেশমের আভাস, পরনে নিমগ্নরঙ রাত্রিবাস, মৃদু অডিকোলনের সুগন্ধ, আবরণহীন বাহুর সোনালি ত্বক।

আর সুরত। সে যেন এক পথ চলায় ক্লান্ত নতুন এক সোনালি প্রজাতি মানুষের, যে ঈষৎ আতপ্ত ঘাসে ড্যাফোডিল জাতীয় কোন ফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। (এখন বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারি, বিছানায় রেশমের পর্দার নকশার ছায়া পড়ায় ঘাসের ছবি মনে এসেছিল, আর তার সহজ কারণ সুরতের নিজের আঁকা সেই লালমলাটের বইয়ের ছবিগুলি মনে ছিল। আর ফুলগুলো ছিল

বিছানায় সুরতের বালিশের কাছে ছড়িয়ে থাকা আইভির সেই সোনার বিস্কুটের হার, সেকেলে ব্রেসলেট।)

ডাক্তার সে ডাক্তারি ভুলতে পারে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার কব্জি ধরে, বুকে যন্ত্র রেখে, অবশেষে তার সেই সুখসুপ্ত মুখ দেখলুম। সোনালি একটি ছেলে, বলেছিল আইভি একদিন। প্রথমে আমি, তারপরে জস। আর তারপর জস পায়ের কাছে গুটিয়ে থাকা চাদরটা টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার মুখটাও ঢেকে দিল।

তারপর নিশ্চয়ই আইভি বিছানায় মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। আমার মনে পড়ল আইভি বলেছিল, সে ভালবেসে ফেলেছে।

আমি সে সোনার বিস্কুটের চাঁদমালাটাকে রেলিং-এর ধারে গিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। আর তারা ঠিক কালো কুকুরের মতো সেটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে লাগল। হয়তো ডম অ্যান্টনিও যেমনভাবে উর্বরতার বস সংগ্রহ হয়ে গেলে তার সেই সোনালি বিড়ালের শরীরটাকে নিচের বুল-টেরিয়ারদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে থাকবে।

কারণ তখন চিৎকারগুলো উপরেও ভেসে আসছে। আর তখন আমিও হয়তো সেই ডম অ্যান্টনিওর মতো সোনালি বিষণ্ণ স্বপ্নে আচ্ছন্ন হচ্ছিলুম। এগুলো কিন্তু স্মৃতিতে ধরে রাখা ছবি আব বিশ্লেষণের দ্বিমতের বেশি কিছু নাও হতে পারে।

আমার মনে হচ্ছিল, সেই সোনা-বিস্কুটের হারটার দিকে চেয়ে সে কি সেই সতর্কতা (যা নাকি এক বাঙালি মেয়েদেরই থাকে) যেন প্রেমিকের গায়ে সোনার আঁচড় না লাগে? কিংবা আইভি কি নিজের গলা থেকে সোনার হারটা খুলে দিয়েছিল আর একজন খেলা করবে বলে?

অন্যদিকে প্রকৃতপক্ষে ওদের চিৎকার কালো কুকুরের মতোই বেড়ে উঠছিল। কেউ বলল, ডাউন ডাউন উইথ রিভিশনিস্ট। অন্য কেউ বলল আরো চিৎকার করে, প্রতারক, মিরজাফর। কিন্তু নিমেষেব মধ্যে দলের প্রধান অংশ চিৎকার করে উঠল, আর সোনা কোথায়? হাত বাঁধো ওর পিছমোড়া কবে। তাতে লাঠি পুরে ঘোরাতে থাকো যতক্ষণ দু হাতের একটা হাড়ও আস্ত থাকবে, যতক্ষণে প্রত্যেকটা পেশীর বাঁধন ছিঁড়ে না যায়। তারপর সমস্বরে বিকট চিৎকার করে উঠল সেই কালো-কালো জন্তুর দলটি—ওর স্ত্রী অথবা বোনকে ধরে আনো। ওর সামনেই হবে। স্ত্রী এবং বোনকে। ওর চোখের সামনেই। তখন সবই স্বীকার করবে দেখো।

একটা কালো ক্ষুধার্ত, বুল-টেরিয়ারের দল, যা সাঁকোর ধারে গলিত-মাংস কঙ্কালগুলোকে আশ্রয় করেছিল; সেই গলিত স্তন ও উরুগুলিতে যাদের মহোৎসব।

নতুবা বলতে হয় ক্রিস তেমন এক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, জয়ে যে ইতিহাসের নেতা, পরাজয় হলে পশুর খাদ্য।

কিন্তু তখন আইভি উঠে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে কিন্তু আমার পর্তুগীজই যেন মনে হল। (যেন গোয়ার সেই মহিলা প্রকৃতই অভিজাত পর্তুগীজই ছিল) কিংবা ঠিক বলতে হলে, তীক্ষ্ণ ক্রূর এক আভিজাত্যই যেন। চোখে জল, কিন্তু মণি দুটি যেন ধারাল। কত টল।

আইভি বলল, ওরা কি আমার চোখ দুটোকেও বেঁধে দেবে না? সে হয়তো সবই দেখেছে, সবই শুনেছে। এবার চিৎকার উপরে উঠে আসতে যেন হুঁশ হল।—এটুকু ব্যবস্থা করে দিতে পারো, অ্যানাসিন?

বললুম, তার চাইতে তুমি সময় নাও। ডম অ্যান্টনিওর সেই সার্ভিস পিস্তলটা তাকে দিলুম।

আইভি পাশের ঘরে গিয়েছে। সেই রাত্রিবাস বদলেছে। একবার দরজার কাছে এসেছিল। সে পোশাক বদলাচ্ছে।

মনে পড়ল আইভি বলেছিল (সেই নবযৌবনকে অতিক্রান্তা সুন্দরী), সে ভালোবেসে ফেলেছে।

সেই বিকেলের কথা (যা যেন অবিশ্বাস্য ভাবেই একটা ফুলের উৎসব হয়ে উঠেছিল) যেদিন সে বাঁধনহীন বাতাসের মতো বয়ে গিয়েছিল। ভালোমন্দর হিসাব যার অনেক পিছনে পড়ে থাকে এমন এক বন্ধনহীন স্ত্রী-মানুষ তার কথায় ধরা দিচ্ছিল। সেই ওঅরবেবি নিয়ে অমূলক উৎকণ্ঠার গল্প (যাতে বিদ্বেষ বা অনুতাপ ছিল না অবশ্যই) যার পরে সে আবার পবিত্র হয়ে (যেমন পৃথিবী বর্ষায় পবিত্র যেন হয়) ভালোবাসার কথা বলেছিল।

আইভি সময় নিচ্ছে। পোশাকের খুঁটিনাটি, চুলেব কার্লগুলো ঠিক করতে তো সময় লাগেই। হয়তো সুগন্ধ বাছছে। তারপব শব্দটা হল। শেষ হল উৎকণ্ঠা।

ওরা শব্দ শুনে উঠে আসে। মৃতদেহটাকে জুতোর ডগা দিয়ে উল্টে দেয়। বুক নড়ছে না। রক্তটা এখনও জমাট বাঁধে নি।

তখন আমাদের (আমার এবং জসের) একটা কাজই করার ছিল। যেখানে উইলোগুলো তাদের কান্নায় প্রায় জল ছুঁয়েছে, সেখানে একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আইভিকে শুইয়ে দিলুম। মাটি দিয়ে একেবারে ঢেকে দেয়ার আগে আর একবার তার মুখটাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল।

একটা অদ্ভুত রকমে স্বতন্ত্র, সুন্দরদেহী, হিংস্র, দাম্ভিক, প্রতিভাশালী (এমন কি যেন কিছু পাগলামির ছিটযুক্ত) পরিবার এটা ব্রাগাঞ্জাদের। কিছু দূরে খালেব জল নেমে যাওয়ায় সেই খিলানটা, অ্যামব্রোসিওর গল্পে যার উল্লেখ ছিল, আরও স্পষ্ট করে চোখে পড়ছে। যেন তার কাহিনীকে ইতিহাস করবে এমন এক প্রমাণ।

আইভিকে এখনও সুন্দর, সোনালি এবং আত্মমগ্ন রকমে দাম্ভিকই মনে হল। যেন তার পরিবারের সব দোষত্রুটি আর গুণেব যোগফল। সে যে ডম অ্যান্টনিওর বোন তাতেও সন্দেহ নেই। যে অ্যান্টনিও বিশিষ্টতর প্রজাতির জন্য পরীক্ষা করতো। এবং তা শুধু প্রয়োজনের জন্য বেশি দুধ বা বেশি মাংসেব জন্যও নয়। সোনালি সেই বিড়ালটাকে কিংবা তার সোনালি রং ও তেজকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার কথাই ভাবো।

আইভি ভালোই বেসেছিল। ওঅরবেবি সম্বন্ধে যার বিদ্বেষ ছিল না কিন্তু পবে উৎকণ্ঠা হয়েছিল, কেননা সে ভালোবেসে ফেলেছে এবং বরং তখন তার পবিত্র হওয়া দরকার। সে কি এক সুন্দর (মন ও দেহে যার প্রতিভা) সোনালি মানুষকে অমর করার ইচ্ছা যাকে যে নিজেও ভালোবাসা বলেছে।

এ কি একটা অসহিষ্ণু তেমন ভালবাসা যা মাত্র ইচ্ছা প্রকাশের চাইতেও বেশি কিছু হতে পারে? (এখন তো আইভি একটা শীতল আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় যেন মগ্ন।) তা কি সম্ভব যে তার চিন্তা তাকে বৈজ্ঞানিকের মতো ক্রূর করেছিল? তা হলে তা কি এই নোনাধরা ঘুমের উপত্যকার আবহাওয়ার ফলেই, কিংবা সেটাই এই উপত্যকার বৈশিষ্ট্যের সব চাইতে স্পষ্ট প্রমাণ! কিন্তু তা হলে তা তো এক নতুন পুরাণই হতো। (সেই সব বড় মাপের কাটা মানুষগুলোর অদ্ভুত রকমের কাজকর্মের গল্পের মতোই কিন্তু একেবারে এই নতুন পৃথিবীতে তৈরি আর একটা গল্প।), যেসব গল্পে নীতির চাইতে একটা তত্ত্বই মূল্যবান। কিংবা ভালোবাসার প্রকৃত মূল্যই তাই।

কিন্তু হায়, এই এখন, নারী কি আর পৃথিবীর মতো আছে যে অভিজ্ঞতায় বিক্ষতদেহ হয়েও নতুন ফসলে পুরনোকে ভুলে যাবে? বরং নারীরও অতীত থাকে যা তাকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করে। আর তা না হলেও এই পৃথিবীতে কি পার্টির বিরুদ্ধাচরণের অজুহাতে গর্ভিণীকেও (যদিও সে এক সময়ের বিশ্বস্ত সহযাত্রী) গুলি করে মারা হয় না, যদিও তার জন্য স্বদেশের অনেকে এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানরাও তার সেই অবস্থায় তার দণ্ডটাকে স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছে?

আর তারপর একটা উঁচু টিলা যার উপরে ঘাস ও ফুল (ঘাসগুলো ফুটেছে) সেখানে সুরতকে শুইয়ে দিলাম। একবার মাটিতে হাতের তেলো রেখেছিলাম। তলার মাটি ঠাণ্ডাই লাগল হাতে।

শেষে ঘাস ও ফুল সমেত চাপড়াগুলো কাঁচা মাটির উপরে তুলে তুলে সাজিয়ে দিলুম।

এখন বেশ খানিকটা বেলা হয়েছে। দুপুর পার হয়েছে যেন, দূরে যেন চাপা চিৎকারের সঙ্গে একটা আর্তনাদও ভেসে এল। দুপুরে কি চার্চে ঘণ্টা বাজে? জসকেও অনেকক্ষণ দেখছি না। তা ছাড়া চার্চে একটা সান্ত্বনার আশ্বাস থাকে। যেন আবার অ্যামব্রোসিওকেই দেখলুম। তেমনি বেদীর উপরে মাথা নোয়ানো, যেমন অ্যামব্রোসিওকে দেখেছিলুম একদিন। জস আব্রামই বটে (সেই লিঙ্কনিজমের প্রবক্তা)। কিন্তু খালি পিঠ চাবুকের লাল দাগে ভরা। পাশে গিঁট দেয়া অ্যামব্রোসিওর চাবুক। সামনে কি ওটা বাইবেলও? চোখে জল নাকি? নাকি সেগুলো চাবুক চালানোর জন্য ঘাম?

এটা একটা কৌতুক, যা অনেকবার চোখে পড়েছে যে, মানুষ অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও কতগুলো অভ্যাস লুকিয়ে ফেলতে পারে না। বিশেষ যদি সে অভ্যাসটা রাখার অবিরত চেষ্টাই থেকে থাকে একসময়ে। জস আব্রামের আইডেনটিটি ডিস্ক তার গলায় চেইনে ঝোলানো ছিল, বোধ হয় চাবুকের দড়িতে লেগে,তার অজ্ঞাতেই পিঠের উপরে এসে পড়েছে। আইডেনটিটি ডিস্ক নেকস্ট টু স্কিনই পরার অভ্যাস হয় বটে।

কিন্তু তারও দরকার ছিল কি? এটাও কি একটা কৌতুক নয় মনের, যে মনে রাখবো না বলে অন্তত অল্পপরিচিতকে না চিনে থাকা যায়? জস আব্রামের সোনার দাঁতটা, তার ঠোঁটের কাছের জরুলটা, তার ডান হাতের সেই বাইজেন্টিয়াম নকশার উল্কি যা প্রকৃত পক্ষে আরবী অক্ষর, এগুলি সকলেই, এই আইডেনটিটি ডিস্ক দেখার আগেও চিনিয়ে দিতে পারতো।

বললুম, লেপটেনেন্ট কর্ণেল জাইদ আনসারী।

জস ধড়মড় করে উঠে বসল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন কোথায় একবার দেখেছে তা মনে আনতে পারছে না।

বললুম, এসো, এখন এখান থেকে যেতে হবে।

আমাদের ছাতার দিকে হাঁটতে শুরু করলুম।

সে যেতে যেতে বলেছিল—বিশ্বাস করো, ওটা ঠিক ভয় নয়। হঠাৎ যেন কেমন ঘৃণা হয়েছিল। ভয় পরে। যাই হোক সৈন্যদল থেকে ডেজার্টার হওয়া ভালো নয়। ঘৃণা আর ভয়ে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম নিজেকে।

ছাতায় এসে বসলুম। দেখলুম সুরতের লালমলাটের বইটা এনেছি। আমি পোশাক ছেড়ে আন্ডারপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরলুম। প্রকৃতপক্ষে, দেখো মজা, এটাই কি আমাব নিজস্ব বলতে একমাত্র কিছু নয় এখানে?

একটা ক্রেটে বসলুম। একটু ভাবতে ইচ্ছা হল। লালমলাটের বইটাতে কিন্তু ছবিগুলো আছে। ছাপার অক্ষরকে একেবারে ঢেকে, কোথাও কোথাও বা অস্পষ্টভাবে ঢেকে, কিংবা কাগজেব ওয়াটার মার্কের মতো ফুটে, সেই পাগল ঘাস, ফুল, তৃণের সমারোহ। মনে পড়ল সুরত ঠাণ্ডাকেও ভালো বাসতো। মাটিতে হাত দিয়ে দেখেছিলুম। ঠাণ্ডাই ছিল, তা কি সুরতের পক্ষে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়েছে? ঠাণ্ডা জলের গ্লাস (শুধু স্বাদু স্বাভাবিক জল বলেই, শুধু শীতলতার অনুভব করতে) সে গালে কপালে ঠেকিয়েছিল। আর সেখানে কি এখন নীরবতাও?

লালবইটা খুলে সেই কবিতাটা আবার দেখলুম।

জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,/ তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি/ মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন/ তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।

সে কি মা? সে কি মাটি? সে কি, অথবা, পৃথিবী, যার অঞ্চলছায়া তাকে ঢেকে রইল?

জস বললে, বসলে যে।

একটি চকোলেট খাই, রসো।

দু পেয়ালা (খামার থেকে আমাকে উপহার দিয়েছিল আইভি পেয়ালাদুটো) চকোলেট বানালাম কাঠি-খড় পুড়িয়ে। বাক্সটার তলায় গোটা দু-তিন বার ছিল আরও। সেগুলো বেশ পাতলা কাগজে কিন্তু ভালো করেই প্যাক করা। গেঞ্জির বুকের মধ্যে ফেলে দিলুম।

জস বলল, আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলে? আমার ছাত্র ছিলে? নাকি কোন সেমিনারে?

চেষ্টা করেও ঠিক জায়গাটা যখন মনে আনতে পারলুম না, বরং খুশি হলুম। ও আর একবার বলল, আর দেরি কেন? এরপর সন্ধ্যা হবে।

অ্যামব্রোসিওর পাসপোর্টটা একটা ক্রেটের উপরে ছিল। সেটা চোখে পড়ল। জসের হাতে দিয়ে বললুম, এটা রাখো, তোমার কাজে লাগতে পারে। নিজের ফটো একটা বসিয়ে নিলেই চলবে।

চকোলেট শেষ হলে রেডবুকটা হাতে (গেঞ্জির মধ্যে থেকে চকোলেট বার কয়েকটি পড়ে না যার সেজন্য গেঞ্জির শেষটা আন্ডারপ্যান্টের কোমরে গুঁজে দিলুম।)

হাঁটতে শুরু করলুম।

মনে হল কিছু দূরে গিয়ে কেউ যেন ডাকছে এ্যাই, এ্যাই বলে। ফিরে দেখলুম জস তখনও ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে। সে বোধ হয় আমার এরকম বিনে পোশাকের যাত্রাটা ধরতে পারে নি। চিৎকার করে এবার ও ডাকল, অ্যানাসিন।

তারপর দৌড়তে সুরু করল আমার পিছনে আসতে।

তখন আমার মনে পড়ল।

আবিষ্কারই করলুম যেন, জাইদ আনসারিকে আমি ক্ষমা করেছি। অপারেশনের সময়ে, ওষুধ খোঁজার সময়ে, সুরতের শেষ মুহূর্তে তাকে দেখেছি—সে তো জ্বালা নয়, আলোই। কিন্তু তার জাতিকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।

বসে পড়লুম লম্বা ঘাসের মধ্যে। কিছু পরে একটু মাথা জাগিয়ে দেখলুম যা ভেবেছিলুম তাই হয়েছে। আমি কোথায় তা বুঝতে না পেরে জাইদ আনসারি দৌড়চ্ছে, আর তার দৌড় আমার অবস্থানের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম কোণ তৈরি করলেও সে যত জোরে ছুটবে তত দূরে যাবে। ভয় কী? তুমি এখন এই খামার এবং এই ছাতার মালিক, রবিনসন ক্রুশোর মতোই।

তারপর আমি আবার হাঁটতে সুরু করলাম। আর এখানে ফুটপ্রিন্টের ধোঁকাও তৈরি করতে হবে না। এত ঘাস (যা সুরতই যেন দিয়েছে) এর মধ্যে পদচিহ্ন পড়ে না, অনুসরণ করাও যায় না। বেশ বুঝতে পারছি যে জাইদ আনসারিকে কোথায় দেখেছি তা মনে আনতে পারছি না। মাথার সেই আঘাতটা (যা সেই বোট থেকে ছিটকে পড়ার সময়ে লেগেছিল) একটা উপকার তা হলে করেছে। খুশি হয়ে উঠি।

এখন আমি যেখানে খুশি চলতেও পারি। মাথায় আঘাতের শুকনো ক্ষতচিহ্ন, যা সার্চ করলে চকোলেট বার ছাড়া কিছু পাবে না কেউ, আর হাতে এক ছবি-কবিতার লাইনে ভরা, লাল মলাটের বই—বড় জোর ভাববে গড়ঠিকানা আধপাগলা।

আমি দারুণ খুশি হয়ে উঠলুম এই ভেবে যে আমি আর কেউ নই, এবং পৃথিবীতে চলে বেড়ানোর পক্ষের উপযুক্ত।

গল্প

মিস্টার ফনটি

গাড়ির কামরায় উঠে দেখি শুধু চাটুয্যা নয়, তার কয়েকজন বন্ধুও আছেন। এরকম যোগাযোগ খুব কমই হয়, কিন্তু কি করে হল তা চাটুয্যাই শুধু বলতে পারে। স্টেশনে এক মিনিট দাঁড়াবে গাড়ি আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই পরবর্তী দু তিন ঘণ্টার মতো বসবার একটা জায়গা খুঁজতেই আমি ব্যস্ত, এমন সময়ে জানলা দিয়ে চাটুয্যা ডেকেছিল। গাড়ির কামরা বোঝাই করে যাঁরা চলেছেন তাঁরা সবাই আপনার পরিচিত। এক কথায় বাংলাদেশের তাবৎ জ্ঞানী গুণী। পণ্ডিতেরা আছেন, চিত্রকররা আছেন, আছেন সাহিত্যিকেরা। গাড়িতে উঠতেই চাটুয্যা তার পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়েছিল নতুবা হয়তো বসতেই সঙ্কোচ হত। এই সঙ্কোচটা অভিনব। কলকাতার পথে এঁদের দেখেছি, তখন চারিদিকের সুউচ্চ প্রাসাদগুলির ছায়ায়, লিমুজিন/প্যাকার্ডের ভিড়ে এঁদের অত্যন্ত খর্বাকৃতি বোধ হয়েছে, তখন এঁদের উচ্চকণ্ঠে প্রাণপণে কথা বলার চেষ্টাকে চারিদিকের প্রমোদ শিখরবাসীদের দৃষ্টির সম্মুখে হাত পা নেড়ে ভাঁড়ামি করার চেষ্টা বলে মনে হয়েছে। এখন এই স্বল্পপরিসর গাড়ির কামরায় লোকগুলিকে পর্বতপ্রমাণ বলে অনুভব হল।

এঁদের আলাপ উচ্চগ্রামে চলেছিল—আমার নাগালের বাইরে। একটা কথা বুঝতে পারছিলাম ওরা মধ্যবিত্তদের শক্তি ও দুর্দশা শুধু এ দু-দিকে চোখ রেখেই আলাপ করে যাচ্ছেন।

কিন্তু আমার লজ্জা কিছুটা দূর হল, আড়ষ্ট ভাবটাও খানিকটা কেটে গেল যেন। আমি নিজেকে বামন কল্পনা করে কষ্ট পাচ্ছিলাম কিন্তু এ যে সত্যিকারের বামন। গায়ে তেলচিটে ছিটের জামা, কানে গোঁজা বিড়ি, মাথায় চুলগুলোতে তখনও খড়মিশানো মাটি লেগে আছে। তার পায়ের কাছে তার মালপত্র—বস্তায় বাঁধা ময়লা কাঁথার মধ্যে থেকে তেলকালি মাখানো খুন্তিহাতার মাথাগুলো বেরিয়ে আছে, তেমনি উঁকি দিচ্ছে তার ধানকাটা হেঁসোর ডগা। তার টোকাটা বসানো আছে সেই বস্তার বান্ডিলটার উপরে। আমার দৈর্ঘ্য যদি সাড়ে তিনহাত হয়, তবে তার দু-হাতের বেশি কখনও নয়। (অবশ্য সে তার নিজের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাতই হয়তো হয়ে থাকবে।)

বৈচিত্র্যই নাকি আকর্ষণ। এ জন্য বামন মাত্রই আমার কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। যদিও রোগবীজাণু সংক্রমণের একটা অহেতুক ও অনির্দিষ্ট ভয় হচ্ছিল, তা সত্ত্বেও আমি বামনটিকে অনেকটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়, তার মাথার খুলিটা শরীরের তুলনায় বিসদৃশ রকমের বড়, হাতদুটোকে থাবা জাতীয় কিছু মনে হয়, লক্ষ-কোটি ফাটলযুক্ত পা দুখানা মোরগ জাতীয় কর্ষক পাখির মতো কাঠিকাঠি ও খড়খড়ে, পায়ের বুড়োআঙুলদুটি ভিতর দিকে বাঁকানো, যেন মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা থেকে হয়েছে। দেহের আয়তন অপ্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ মানুষের হলেও সে যে প্রাপ্তবয়স্ক বামন তার প্রমাণটাই তার গড়নের মধ্যে ফুটে উঠেছে। দেহের তুলনায় অনেক বড় মাথাটায় বুদ্ধি থাক বা না থাক, প্রমাণ সাইজের লাল-লাল দাঁত ছিল যা উপরের ঠোঁট দুটি ঢাকতে পারত না। আর সেই অকেজো ঠোঁটের উপরে একজোড়া বিরলরোম গোঁফ ছিল, চিবুকে আট-দশটা বড় বড় দাড়ি ছিল। মনে হয় কোন এক যন্ত্রে ফেলে একটা গোটা মানুষকে দলে তুবড়ে এমন রূপ দেয়া হয়েছে।

একটা গ্রাম্য সংস্কারের ক্ষয়িতাবশেষ যে তখনও আমার মনে রয়েছে তা বুঝতে পারলাম। বাল্যে

বামনদের তদাখ্য অবতারের ছায়া বলে মনে করতাম, দেখলেই হাতজোড় করে প্রণাম করতাম। এখন তা না করলেও কেমন একটা আশঙ্কা বোধ কবতে লাগলাম। বযসের সঙ্গে অবিশ্বাস এসে শ্রদ্ধাটাকে দূর করেছে, ভয়টা যেন কিছু পরিমাণে আছে। তার ফলে আমার ভঙ্গিটা অকরুণ হয়ে উঠল। মনে হল বলি, তুমি বাপু ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠেছ কেন?

আমি সিগারেট বড় একটা খাই না, তবু গাড়িতে ওঁরা সবাই টানছেন দেখে আমি কিনলাম তা এক স্টেশনে। বামনটিও সেই সিগারেটই কিনল একটুকরো ময়লা নেকড়ার গেরো থেকে পয়সা বার করে দিয়ে। এত দামী সিগারেট না কিনলেও চলত তার। সে যেন তার রুচিবোধের প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এই অকারণ বেহিসেবী খরচটা করল। মধ্যবিত্তদের মতোই ধরন-ধারন দেখছি। এর ফলে অবশ্য আমাদের আলাপের পথ হল। মুখে সিগারেট দিয়েই সে দেশলাই চাইল।

বললাম, 'দেশ কোথায়?'

'পূর্ব্ববঙ্গে।'

মনে হল এর পরে প্রশ্ন নিরর্থক। মিথ্যাটাই শোনাবে—পাঁচ বিঘার উপরে দোতলা বাড়ি ছিল, আম-কাঁঠালের বাগান ছিল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গোরু ইত্যাদি। যদি ও ওরই মধ্যে একটু বুদ্ধিমান হয়, হয়তো শুনিয়ে দেবে দেশের স্বাধীনতার জন্য কতবার জেল খেটেছে।

কিন্তু লোকটি সে দিক দিয়ে গেল না। সে বলল, 'বলি বটে, তা কিন্তু চোখে দেখিনি। তিনপুরুষ কলকাতায় বাস। আলিগঞ্জের ঘেড়েলদেব নিশ্চয়ই জানেন? জাহাজী কারবার। আজ্ঞে হ্যাঁ, আদি সোনার বেনে আমরা।'

বামনটি বোধ হয় তার বক্তব্যের অসঙ্গতি ধরতে পাবল না, কিংবা হয়তো অসঙ্গতি নেই, আলিগঞ্জের আদি-ঘেড়েলরা হয়তো পূর্ব্ববঙ্গ থেকেই এসে থাকবে তিনচার পুরুষ আগে।

'যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

'আজ্ঞে' লোকটি একটু লজ্জা বোধ করল যেন প্রশ্নটা শুনে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'এই ইদিগে, কামিক্ষে-ধামেব নাম শুনেছেন?'

আমার এবার বিশ্বাস হল লোকটি কলকেতার বাসিন্দাই বটে, এবং পরে সে বিশ্বাস আরও জোরদার হয়েছিল, কারণ চারপাশের লোক কেউ কিছু জানে না সেই সব জানে—এরকম একটা ভাব সব সময়েই তার কথায় ফুটে উঠছিল। কামাখ্যার নাম শুনেছি কিনা এই প্রশ্নেই তার সূত্রপাত।

বললাম, 'খুব যে একটা শুনেছি তা নয়, কী হয় সেখানে?'

'এই মন্ত্রতন্ত্র। মন্ত্রতন্ত্র বোঝেন তো, যাকে তুক বলে?'

'তুক?'

'হ্যাঁ অনেক রকম হয় সেখানে। গাছ-চালানো, বশীকরণ, উচাটন এসব হয়।' আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই মুগ্ধবিস্ময় ফুটে উঠে থাকবে। বিস্ময়ের কারণ অবশ্য এই ছিল আমার দিকে যে বামনদের চিন্তার মধ্যেও অতিলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে একটা আকর্ষণ আছে। এ বিষয়ে তারা যেন সাধারণ মানুষ। আমার বিস্ময় তাকে উৎসাহিত করেছিল এবং অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞান দেবার ভঙ্গিতে সে গাছ-চালানো বিষয়ে আমার অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করতে লাগল। রাত দুটো থেকে রাত চারটের মধ্যে কলকাতার ঘেড়েল মশায়দের কোন বাড়ির উঠান থেকে একটা গাছ কামাখ্যাব মাটি ছুঁয়ে জিরিয়ে নিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যেতে পারে। এবং সে গাছে কখনও কখনও অত্যন্ত সুন্দরীরাও সওযার হয়।

'তা হলে এসব কারণেই যাওয়া হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মানে বশীকরণের ব্যাপার।'

বামনও দেখছি অন্যের উপরে খবরদারি করার ইচ্ছা পোষণ করে। কৌতূহল হল।

'কাউকে বশে আনার ইচ্ছা আছে?'

বামনটি যেন লজ্জিত হয়ে হাসল।

ভূমিকা কিম্বা প্রথম পরিচয় হিসাবে এইটুকুই বলতে পারি, কারণ এরপর চাটুয্যা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আমি যেমন সকৌতুক সকৌতূহল আলাপ করছিলাম বামনটাকে নিয়ে। চাটুয্যাব বক্তব্য এই যে আমরা সাহিত্যিকরা ও মেধাবীরা এই বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছি যদিচ আমরা দিগম্বব এবং উপবাসী।

সে কথা যাক, আমাদের আসল গল্প উপরোক্ত ঘটনার ছ-মাস পবে শুরু, তার কথা বলি।

রাশা থেকে সার্কাস এসে দেশের বড় বড শহর কয়েকটিকে আত্মহারা করে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে। এ ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট্যও দেখা দিয়েছে। আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল, সার্কাসের লাফালাফি কলা-কসরত বালকোচিত ব্যাপার, বালক-বালিকারাই ওর থেকে আনন্দ আহবণ কবতে পাবে। আমরা পৃথিবীতে প্রাপ্তবয়স্ক জাতিগুলোর অন্যতম, চীন ও মিশরকে বাদ দিলে বয়সেব দিক দিয়ে আমরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলতে পারা যায়। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের আনন্দ হিসাবে আমরা সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। রাশানরা চলে যাওয়ার পরে আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের পাড়ার নন্দলাল তো একদা বলেই গেল, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ তত্ত্বের সঙ্গে কী রকম একটা সম্বন্ধ নাকি আছে সার্কাসের।

সেবার শীতটা আগেই পড়েছিল। শীতের বাৎসরিক মেলাটাও আমাদের এই ছোট শহরে যেন সময়ের আগেই শুরু হল। মেলায় প্রতিবারেই সার্কাস আসে, গত দশ-পনের বৎসর তারা গ্রামের লোকদের কৌতূহল মিটিয়েছে। এবার তার পরিবর্তন দেখা দিল। শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকবা দলে দলে গিয়ে সার্কাসের তাঁবু প্রতি শোতেই ভবে রাখতে লাগলেন। ক্লাবে একদিন এ নিয়ে আলাপ হচ্ছিল এবং আমি দেখলাম এক আমি ছাড়া শহরের প্রায় সবাই সার্কাস দেখে এসেছে। এরপরে আমাকে কেউ প্রগতিসম্পন্ন বলবে কিনা সন্দেহ।

সুতরাং এক রাত্রিতে সার্কাসের তাঁবুতে উপস্থিত হলাম।

পাছে জায়গা না হয় এই ভয়ে আগে-ভাগেই গিয়েছিলাম। সার্কাসের তাঁবুর সামনে দেখি সে ঘুবে বেড়াচ্ছে। প্রথমে একটু সন্দেহ যে না হয়েছিল তা নয়; কিন্তু গতবারেই লক্ষ্য করেছিলাম, তার মাথাটা শুধু দেহের তুলনায় বড় না, সেটার বাঁদিকটা একেবারেই চ্যাপ্টানো। সব বামনেরই মাথা এরকম চ্যাপ্টা হতে পারে না।

হাতে সময় ছিল। দেশলাইয়ের উপরে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে প্রশ্ন করলাম, 'তারপর কী রকম, ঘেড়েল মশায়?'

সে উদাসদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বামনরা যে এরকম উদাস দৃষ্টিতে চাইতে পারে তা আমার জানা ছিল না, শরীরটা শিরশির করে উঠল। কারণ তার সেই ঔদাস্য তার প্রকাণ্ড বেঢপ মাথায় শুরু হলেও তা যেন তার বাঁকা বাঁকা বেঁটে বেঁটে অপুষ্ট হাতে পায়ে হিল-হিল করে ছড়িয়ে গেল। ট্রেনের কামরায় যখন সে বসেছিল, তার বামনত্ব যেন একটা বিসদৃশ রূপে ধরা পড়েনি। আবার বললাম, 'গাছ-চালানোর কিছু হল?'

সে বলল, 'গাছ-চালানোর? কী সেটা?'

আমি একটু অপ্রস্তুতই হলাম। সার্কাসের তাঁবুর কাছে ঘোরা-ফেরা করছে যখন, বামন হলেও তাব প্রগতি সম্বন্ধে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সে কি আর ভূতপ্রেতে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে!

কিন্তু আমিও অত সহজে ছাড়নেওয়ালা নই, বললাম, 'সেই যে সেবার বশীকরণের কথা বলেছিলে?'

বামন তার বাঁদরের থাবার মতো ফাটলযুক্ত পাকানো পাকানো একটা হাত ঠোঁটের উপরে রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল। একপাশে দু-এক পা সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গলা নিচু করে বলল, 'এ দুনিয়ার কে কার বশ হয়?'

তার বক্তব্যটা তার সাধারণ উদাস ভঙ্গির সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে গেল।

'তা হলে কামাখ্যায় যাওয়া হয়নি?'

'গিয়েছিলাম। সবই মিথ্যা। সেই লাল কাপড়ের টুকরো আনাই ছিল ইচ্ছা। পাঁচ সিকেতে পেলামও বটে একটুকরো, কিন্তু তা নেহাৎই আলতায় রাঙানো। ওতে কি আর কোন কাজ হয় মশাই?'

'তুমি তো গাছ চালানোয় বিশ্বাস কর না, দুনিয়ার কেউ কার বশ হয় না তাও বুঝতে পেরেছ। তবে ও দিয়ে তুমি কী করবে?'

বামন চিন্তা করল এবং তা করার সঙ্গে সঙ্গে গোপন করার চেষ্টাতেই বোধ হয় তার বাঁ হাতটা তুলে নিজের মুখে উপরে রাখল আবার। তার মাথার তুলনায় হাতখানা কী অসহায় ভাবে ছোট এবং দুর্বল দেখাল।

'কী করব, তাই নয়?'

'হ্যাঁ, তাই তো জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

'ওটা সত্যি পেলে কী হয়ে যেত তা জানেন?'

'শুনতে চাচ্ছি।'

'আমি মশাই, চিরদিন এরকম ছিলাম না। হয়তো, হয়তো আবার আগের মতোই হতে পারতাম।'

কিন্তু এই জায়গায় আমাদের আলাপ বন্ধ করতে হল। ঢং ঢং করে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল সার্কাসের। এপম্যানের গানের যে নিখুঁত অনুকরণ করা সম্ভব হয়েছে 'পঞ্ছি লেলে' নামক বোম্বাই ছবিতে সেই সুরে কনসার্ট বেজে উঠল।

বামন ব্যথিত নিস্পৃহভাব সুরে বলল, 'যান ভিতরে।'

সার্কাস দেখার চোখ ছিল না। বাল্যের দেখা সেই সব সার্কাসের বুকে হাতি নেয়া, বুক ফুলিয়ে তার ছেঁড়া প্রভৃতি খেলার স্মৃতিগুলিই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। এবং এ যুগের সূক্ষ্ম কৌশলগুলির চারু সুকুমারতা ক্রমাগতই আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে গেল। সুদূর আকাশে দোলায় চড়ে যারা খেলা করল তাদের সংখ্যা অগণিত, অচিন্ত্য অকল্পনীয় তাদের পরিচ্ছদ। রূপকথার পরীদের চোখের সম্মুখে দেখবার অর্ধচেতন কামনা বয়স্ক মানুষেরও থাকে--এ যেন তারই প্রমাণ। অবশেষে পরীরা নেমে এল তারের নাচ দেখাতে। অসংখ্য তারের উপরে অগণিত ঝলমলে নগ্নিকা জাপানি ছাতা মাথায় ছুটোছুটি করে খেলা করে চলল দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে। তারপর সেই সুশোভনার দল নেমে এল একেবারে মাটিতে সাইকেলের খেলায়।

খেলাটা ওদের বিজ্ঞাপন অনুসারেই হচ্ছিল। তখন রঙ্গস্থলীতে সাইকেল-আরোহিণীর সংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র তিনজন অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে একটা ভালুক প্রবেশ করল। তার রক্ষক তার কাঁধের কাছে বগলস ধরে আছে আর সেটা তার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রঙ্গস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এসে ভালুকটা সুসভ্য মানুষের মতোই হাত নেড়ে দর্শকদের অভিনন্দন জানাল। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তার নিচের চোয়াল ঝুলে পড়েছিল। সার্কাসের কৃত্রিম আলোতে এ রকম একটা অনুভব হল যে ভালুকটা মৃদু মৃদু হাসছে।

এটাই সব চাইতে নাম করা খেলা নাকি সার্কাসের—ভালুকের সাইকেল চড়া। একটা হালকা গড়নের মোটর বাইক নিয়ে এসে দু-জন লোক ভালুকটাকে চড়িয়ে দিল বাইকে। থাবাটা আটকে দিল হাতলে, হাতলটা ইস্ক্রু দিয়ে একটা নির্দিষ্ট কোণ করে আটকে দিল। ফট ফট করে সাইকেল

ছুটছে চক্রাকার পথে আর ভালুক তাতে সওয়ার। দৃশ্যটার চমৎকারিত্ব বেড়ে উঠল যখন তিনজন সাইকেল-আরোহিণী ভালুকটার তীব্রগতির মধ্যে তাকে কেন্দ্র করে উপগ্রহেব মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। একটি জটিল জ্যামিতিক গোলকধাঁধার পথে যেন লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে। আমাব সহসা মনে হল এটা সেই বিউটি ও বিস্টের রূপকথা অভিনীত হচ্ছে। কারণ ভালুক তার দ্রুতগতির মধ্যেই নিকটতম সাইকেল আরোহিণীর দিকে তার লম্বা ছুঁচলো মুখ এগিয়ে দিচ্ছে। তার চোখে আলো পড়ে চোখদুটি জ্বলে জ্বলে উঠছে। আর তার নিচে চোয়াল আবও বেশি ঝুলে পড়ায় তার লম্বা চটচটে জিভটা লালসা-বিহ্বল শূন্যকে লেহন করছে।

খেলা শেষ হতে না হতে সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। ঠিক এই সময়েই আমার সন্দেহ হল—সার্কাসওয়ালাদের এটা একটা লোক ঠকানো কৌশল। বামনটা ঘোরাফেরা করছিল সার্কাসের দরজায়। তাকেই হয়তো ভালুকলোমের জামা পরিযে খেলাটা খাড়া করা হয়েছে। তার দেহেব আয়তন এবং তার হাত-পায়ের গড়ন ভালুক সাজার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। নতুবা যান্ত্রিক কায়দায় ভালুকের পক্ষে চক্রাকার পথে মোটর বাইকে ঘোবা সম্ভব হলেও, লোভ ও লালসার যে অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা জানোয়ারের পক্ষে অকল্পনীয়। বামনটাব জন্য একটা অনির্দিষ্ট বেদনা অনুভব করলাম।

ইন্টারভ্যালে চুরুট টানতে বাইবে এসেছিলাম। সদর দরজার বাঁয়ের দিকে খানিকটা স্বল্প-আলোকিত ফাঁকা জায়গা। ভিড়ও কম। চুরুটটাকে উপভোগ করার জন্য সেদিকটায় এগিয়ে গিয়েছিলাম। কানাতের আড়ালে মৃদু আলোয় সার্কাসের হাতিগুলোকেই বোধহয় সাজাচ্ছে। তা সাজাক। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝগড়ার সুর কানে এল আর কলহরত স্বরগুলোর একটিকে পরিচিত বলে মনে হল। লোক ভেবে চিন্তে শোনে না, কাজেই অন্যের ঝগড়া শোনা উচিত নয় এরকম একটা চিন্তার উদয় হলেও তা শোনাকে বন্ধ করতে পারল না।

'রাখ, রাখ! রোজই কি এ ভালো লাগে?'

'তোমাব ভালো না লাগে তাতে আমাব কী?' গলাটা বামনেব এবং তা বিদ্রোহের সুবে ভরা।

'তা হলে ম্যানেজারবাবুকে বলব?'

'রাখো তোমাকে ম্যানেজাববাবু। এই শহরে এমন একজন লোক আছে যে তোমাব ম্যানেজারের চাইতে বড়, আর তার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ আছে।' খুব ঝাঁজের সঙ্গে বামন বলল।

'তার সঙ্গে আলাপ করেই বুদ্ধি তোমাব এমন হয়েছে?'

'আমার কী হয়েছে না হয়েছে তাতে তোমাব কী?' বামন এই বলে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত পায়ে কিলবিল করতে করতে আমি যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে এগিযে এল।

অন্যলোকটি তার স্বরকে একটু কোমল করল 'আচ্ছা সে সব কথা থাক, সার্কাসের ভালোমন্দটা তোমাকে দেখতে হবে তো?'

'কিছুই আর দেখতে চাই না, আমার দ্বারা আর সং সাজা হবে না।'

'সকলেই খেলা দেখায়, তুমিও দেখাবে।'

'তোমাদের মত প্রবঞ্চক থাকতে খেলা? খেলার কী অবশিষ্ট রেখেছ?' বামন আক্রোশভরে বলল।

ভালুকের খেলা দেখে তার সঙ্গে বামনকে সংযুক্ত করে যে কল্পনা করেছিলাম সেটা সত্য হতে চলল। বামন তা হলে প্রকৃতপক্ষে সার্কাসের সঙ্গে সংযুক্ত। কৌতূহল ও কৌতুক দুটোই অনুভব করলাম এবং তাই বোধহয় আমাকে অসাবধান করে থাকবে। ওদের চোখে পড়ে গেলাম।

'এই যে বাবুমশাই আপনার কাছে আমার দরকার আছে। একজন ভালো উকিলের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবেন?'

'উকিল দিয়ে কি হবে এত রাত্রে?' অন্য লোকটি হাসিমুখে বলল।

'বুঝবে। সকলকেই বোঝাব।' আমার দিকে ফিরে বামন বলল, 'দেব মশাই একনম্বর ঠুকে এই সার্কাস ম্যানেজারের নামে।'

বামনের মুখে সাধারণ সংসারী লোকের মতো মামলার কথা শুনে আমার হাসি পেল। তা গোপন করতে গিয়ে চুরুটের ধোঁয়াটা আমাকে বেসামাল করে দিল।

বাইরের একজন লোকের সামনে ঘরের কথা নিয়ে তকরার করতে বোধ হয় অন্য লোকটির আপত্তি ছিল। ম্যানেজাববাবুকে পাঠিয়ে দেবাব ভয় দেখিয়ে সে চলে গেল। বললাম, 'কী হয়েছে?'

'এর বেশি আর কি হবে বলুন? সব দিক দিয়ে ঠকাচ্ছে ওরা। আমার যা গেছে তা গেছে, নতুন করে আর ক্ষতির মধ্যে যাব না।'

'কিছুক্ষণ আগে যখন সাইকেল চেপে খেলা দেখাচ্ছিলে তখন তো তোমাকে খুব স্ফূর্তিবাজ বলেই মনে হল।'

'সাইকেলের খেলা? তবে আর বলছি কী? হুম্।'

আমার মনে হল, সে জানোয়ার সেজে খেলা দেখাতে বাধ্য হয়েছে এটাই বোধ হয় তার মনকে পীড়িত করছে। কথাটা বলে ভালো হয়নি।

কিন্তু আমাদের আলাপ এগোতে পারল না। সার্কাসের সেই অন্য লোকটি আবাব ফিরে এল একজন সঙ্গী নিয়ে।

'আবার এলে তোমরা?' বলে বামন তাদের প্রতিরোধ করাব ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'মিস রানী বলল—তার পোশাক পবা হয়ে গেছে। তুমি পোশাক পবে নাও। আর তার ডান পায়েব ক্ল্যাম্পটা পাওযা যাচ্ছে না।'

'না পাওয়া গেছে, নেই গেল।'

যে নতুন এসেছিল সে বলল, 'ইন্টারভ্যাল শেষ হযে গেছে। খেলা আরম্ভ হয়েছে এবাব চল।'

'যাব না হাজার বার বলেছি।' বামন বলল।

'তা হলে আমাকে সব গোপন কথা ফাঁস কবে দিতে হবে।' সে বলল।

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'ভয় দেখানোর কী আছে? মিস রানীকে বলব তার মোজা রোজ হারায় না, তুমিই লুকিয়ে রাখ, পরে নিজের হাতে পরিয়ে দেবার জন্যে।'

'মিথ্যে কথা।'

'আর সেবার যে তুমি সার্কাস ছেড়ে পালিযেছিলে চাষী সেজে, কেন তা বলে দেব?'

'দাওগে বলে।'

'মিস রানীর উপযুক্ত হবার জন্যে তুমি তুকতাকেব খোঁজে কামাখ্যা গিয়েছিলে। বল, তা গিয়েছিলে কিনা?'

এক মুহূর্তে বামন ঘেড়েল মশায়ের ভঙ্গিতে পরিবর্তন দেখা দিল। সে হয়তো ভেবেছিল অনেক দিনের বন্ধু এরা, যত ভয়ই দেখাক কখনও তাকে বিপন্ন করবে না। সে রাগে দুঃখে কেঁদে ফেলে দিল। তার বেঁটে বেঁটে হাত দুখানা ছুঁড়ে ছুঁড়ে সে লাফাতে লাগল ক্ষুব্ধ ব্যথিত শিশুদের মতো।

ওদিকে ইন্টারভ্যালের পর খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু ওদিকের ওই আলোকোজ্জ্বল রঙ্গস্থলীর সাজানো গোছানো পূর্ব পরিকল্পিত খেলার চাইতে এই মৃদু আলোকে দেখা এই কাঁচা নাটকটাই আমাকে যেন আকৃষ্ট করল। বামন কাঁদছে। আশ্চর্য, বামনরা কাঁদে নাকি? অন্তত আমি তাদের প্রথম এই কাঁদতে দেখলাম। বামন তখনও ফোঁপাচ্ছে। এমন সময়ে টর্চের আলো ফেলে আরও দুজন লোক সেখানে এল। তাদের টর্চের আলো থেকেই বোঝা যায় তারা আলোকের জীব। আগের

লোক দুটি চাপা গলায় বলল—ম্যানেজার।

ম্যানেজারই বটে। কেতাদুরস্ত ইংরেজি পোশাকে, মুখে পাইপ, একজন গুণ্ডা টাইপের লোক। তার সঙ্গী বোধ হয় মিস রানী। তার পরনে সার্কাসরঙ্গিনীদের পরিচ্ছদ। তার পোশাকের কিছু হারিয়েছে বলে মনে হল না। বামনকে প্রলোভন দেখানোর জন্যই হয়তো ক্ল্যাম্প হারানোর গল্প তৈরি হয়ে থাকবে। ম্যানেজার বলল, 'মিস্টার ফনটি, আজ আবার কী হল?

'কী আবার হবে, আমার দ্বারা আর খেলা দেখানো হবে না।' বামন বলল।

বামনকে আলিগঞ্জের ঘেড়েল মশায় বলেই চিনেছিলাম, এখন দেখছি সে আর্টিস্টদের মতো দু-অক্ষরের নামও সেঁটেছে নিজের গায়ে।

ম্যানেজার বলল, 'তাই নাকি? মিস রানী, তা হলে খেলাটা কি বাদ দেবে?'

'তাও কি হয়?' মিস রানী বলল।

'তা হলে যা পার কর।'

মিস রানী যেন এরই জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সে হাসি-হাসি মুখে বামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খপ করে তার একখানা হাত চেপে ধরল। অন্য লোকদুটিকে কী ইশারা করল। এক মুহূর্তের মধ্যে বন্দী বামনকে তারা তিনজন মিলে চ্যাংদোলা করে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বামন একটা মাকড়সার মতো কিলবিল করে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অদৃশ্য হল।

ম্যানেজার চলে যাচ্ছিল। আমি অন্ধকারের দিকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম তবু সে আমাকে দেখতে গেল। তার বিরক্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু তার সার্কাসের একটা গোপন দৃশ্য যে দেখে ফেলেছে তাকে রুষ্ট না করাই বোধ হয় সে তার ব্যবসায়ের পক্ষে ভালো বোধ করে থাকবে। সে আবার আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'ও কিছু নয়।' সিগারেট কেস খুলে ধরে বলল, 'নিন। এ আমাদের মাঝে মাঝেই করতে হয়। লোকটিকে বাদ দেয়া যায় না, অথচ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওর মেজাজটা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।'

'ওর ক্ষোভের কারণটা কী?'

'কিছু থাকা উচিত নয়। আমার আগের যে ম্যানেজার ছিল তার সময়ে ওকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করা হত না। ভালুকের মুখোশ পরে তখন ও সাইকেল চালাত।'

'এখন?'

'এখন সত্যিকাবের ভালুকই চালায়। একথা সত্যি ওদের সেই মুখোশ দেখেই আমার এই খেলাটার কথা মনে হয়। অনেক দিনের চেষ্টায় এই মাস দু-এক থেকে সত্যিকারের ভালুককে দিয়ে খেলা দেখানো হচ্ছে।'

'এতে ওর আপত্তি নেই বোধ হয়', বললাম।

'আছে। সেই থেকেই ওর মেজাজ খারাপ। ওর একটা কাজ ছিল যেন সেটা, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার হেতু। সেটাই নাকি আমরা কেড়ে নিয়েছি।'

'এখন কী খেলা দেখায়?'

'পুরো সাহেবি পোশাকে মিস রানীর কাছে ঘোরা ফেরা করাই এখন ওর একমাত্র কাজ।'

অবাক লাগল।

ম্যানেজার বলল, 'সার্কাস চালাতে গেলে রোজই এসব লেগে আছে। পঞ্চাশটি জানোয়ার, দেড়শোটি মানুষ। কারো না-কারো মাথা ধরবেই।'

ম্যানেজার স্বাভাবিক ভাবেই হাসল।

'যান খেলা দেখুন গে। এবারই বোধ হয় মিস রানীর রাইফেল শুটিং। আসলে কী জানেন, মিস্টার ফনটি মানে এই বামনটা আর এই সার্কাসটার বিশ বছরের সম্বন্ধ। তবে সার্কাস ছেড়ে

থাকারই ওর উপায় নেই। পালিয়ে গিয়েও ফিরে ফিরে আসে। একটা টিয়ে পাখি আর একটা চিতা বাঘ নিয়ে যখন এই সার্কাস শুরু হয় তখন থেকেই ও এই সার্কাসে আছে। সার্কাসের মালিকানা অনেকবার হাত বদলেছে এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে বামনটাও হাত বদল হয়েছে। এই সার্কাসে ওর জন্ম নয়, তবে সার্কাসেই ও তৈরি। এই সার্কাসের প্রথম মালিক আমির আলি ওকে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার পরে হাঁড়ির মধ্যে পুরে রেখে বামন তৈরি করেছিল। কাজেই সার্কাস ছেড়ে ও কোথাও যাবে না।'

ম্যানেজার আর একবার হেসে চলে গেল।

খেলা দেখার মতো মন ছিলনা। বামন মিস্টার ফনটির কথা এইমাত্র যা শুনলাম তা যেন কেমন বিষণ্ণ করে দিল। এখন থেকে বিশ-পঁচিশ বছর আগে যে মায়ের কোলে স্বাভাবিক একটি শিশু ছিল বামন, সে মায়ের হাহাকার কান্না যেন শুনতে পেলাম। আমির আলির নৃসংশতায় একটি পরিবারের সমস্ত আশা ও আনন্দ হয়তো পুড়ে গিয়েছিল। অবশ্য এতদিন পরে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। ম্যানেজার অত্যন্ত সরল বলেই হয়তো এত কথা বলেছে। কিন্তু তার অতিসরলতাই যেন সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। আমির আলির অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সঙ্গে সে কি তার নৃসংশতার কিছু পায়নি উত্তরাধিকার সূত্রে?

কিন্তু তখনই বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না। ছেলেরা খেলা দেখছে, তাদের নিয়ে ফিরতে হবে। আর একবার সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকলাম।

রাইফেল হাতে মিস রানী এসে দাঁড়িয়েছে। তার ঝলমলে পোশাক, তার আশ্চর্য লক্ষ্যভেদ রঙ্গস্থলীকে পরম উৎফুল্ল করে তুলল। তার খেলার একটি পর্যায় শেষ হতেই একটি ক্লাউন প্রবেশ করল। ক্লাউন বলতে সচরাচর যা বুঝি তেমন নয়। মুখে রং নেই, পোশাকে কিম্ভূত ভাব নেই। বরং পায়ের জুতো থেকে মাথার টপহ্যাট, হাতের সুদৃশ্য ছড়ি থেকে গলার সুসঙ্গত টাই পর্যন্ত নিখুঁত ইংরেজি পোশাকে সজ্জিত একজন ভদ্রলোক। শুধু আকারে সে ছোট, বিসদৃশ ভাবে ছোট্ট, মিস রানীর পাশে একটা ক্ষুদে পুতুল। দর্শকদের হাততালির ঢেউ তীরের উপরে আছড়ে পড়ল যেন, আর তাদের হাসির শব্দ ঝড়ের মতো তার উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। হাসির কি পেল? অবাক হয়ে ভাবতে গিয়ে আমি নিজেই হেসে ফেললাম। বামন মিস্টার ফনটি যতই স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে ততই কিম্ভূত বোধ হচ্ছে তাকে। সে চলে গেল, রাইফেলের খেলা হল কিছুক্ষণ, আবার সে এল, আবার সেই হাততালি আর হাসির হুল্লোড়। বোধ হয় রঙ্গস্থলীর প্রকাশ্য আলোতেও বামন মিস্টার ফনটি রাইফেলধারিণী মিস রানীর জন্য কিছু উদ্বেগ, কিছু কোমলতা অনুভব না করে পারে না। তার মুখে সেই কোমলতার ছায়াই তাকে আরও বেশি হাস্যকর করে তুলেছে। হাততালি ও হাসির শব্দে অকস্মাৎ তাঁবুটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলাম, বামনের কোমরের কাছে একহাতে চেপে ধরে তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলীর বাইরে রেখে এল মিস রানী—কতকটা পোকামাকড় ফেলে দেবার ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ পরে সার্কাস শেষ হল।

কিন্তু প্রতি রাত্রিতেই সার্কাস হবে। আমাদের শহর থেকে অন্য শহরে গিয়েও তা চলতে থাকবে। এবং মিস্টার ফনটি সার্কাসের জন্যই তৈরি।

প্রতিক্রিয়াশীল

ডক্টর চিত্রা সেন সারাদিনের কাজ শেষ না করে নিজেব ঘরে ফিরে এসেছে। তাব কাজেব দিন, চিন্তা-তন্ময় ব্যস্ত দিন শেষ হয রাত দশটাতে। আজ এখনও বাত নটা বাজেনি। কিন্তু কাজেব ঘবে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ভযে তার বুক কাঁপছে। তাব মুখ এখনও শুকিযে আছে।

গাইড আমাকে এই রকমই বলেছিল।

কিন্তু আনুপূর্বিক বলি। তাঁবুতে কাজ ছিল না। বেলা আটটা হল, অন্য দিক দিযে যে অফিসাবেব আসবার কথা ছিল তিনি এলেন না। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে এ ভেবে খানিকটা অস্বস্তি দেখা দিচ্ছে মনে, এমন সমযে কথাটা মনে এল। ঠিক কবলুম দিনটাকে আজ ছুটি দেবো।

কদিন থেকে একটা গুজব শুনছিলাম—এদিক একটা ধ্বংসস্তূপ আছে। প্রাগৈতিহাসিক কিছু নয়, এমন কি আধুনিক রাজকীয়তাও নয়। তা সত্ত্বেও ওটার সম্বন্ধে কোন দুজন মানুষই একবকম বলছে না। এ থেকেই অনুমান হয ধ্বংসস্তূপ হিসাবে ওটা কৌলিন্য লাভ করছে।

আমার সেই বাদামি পনিটা সঙ্গী হবে স্থির ছিল। আর মাথায় কুড়ুল পরানো পাহাড়ে ওঠার লাঠিটা। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই দেখলুম পনির সেই অনাহূত সঙ্গী গেঁয়ো কুকুরটাও সঙ্গে চলেছে।

মানুষ, তার পনি এবং কুকুরকে মানুষ এবং তাব দলবল বলা যেতে পারে। যে নিঃশব্দ পথ দিয়ে চলেছিলাম তা পায়ের শব্দে এবং কণ্ঠস্বরে কলকল করে উঠল। কুকুরটা একটা কাঠবেড়ালিকে তাড়া কবতে গিযে বেশ খানিকটা লজ্জা পেল। পনি মনে করে থাকবে কুকুরকেই পথ দেখানোব দাযিত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটা কুকুরেব এলোমেলো গতিকে অনুসরণ কবল, তার বাবহারটাকে অবাধ্যতাই বলতে হবে। কিন্তু দলপতি হিসাবে গ্রাহ্যে আনিনি এমন ভঙ্গি নিলাম, একটা গানেব কলি শিস দিতে সুরু কবলুম ববং।

কিন্তু পথ বদলাল। এপথটা এখানে হঠাৎ শেষ হয়েছে পাহাড়েব কাঁধে। একশোটা পাথরের সিঁড়ি তার বদলে নিচেব দিকে নেমে গিযেছে। সিঁড়িব পাথরগুলো নড়বড়ে। সেগুলোর গাযে শুকনো মস। আন্দাজ করলুম, মানুষ চলবে বলেই সিঁড়ি, কিন্তু তা চলে না বলেই মস। আর এ-থেকেই আশ্বাস পাওযা যায় ধ্বংসাবশেষের গল্প বাজে গুজব নাও হতে পাবে।

পনিটাকে সিঁড়ির কাছে বেঁধে নিচে নেমে যখন হাঁটছি, দেখলুম কুকুবটা পনির সঙ্গে না থেকে নেমে এল। অর্থাৎ সাবাটা দিন আমাকে তার উত্তম সান্নিধ্য দিতে বদ্ধপবিকব হয়েছে।

পথ বদলানো কথাটা বোধ হয ঠিক হল না। মোড় ফিরে এপথ থেকে ওপথে যাওযার মতো ব্যাপার নয়। উপবের পথ থেকে নিচেব পথের মধ্যে ব্যবধান এই সিঁড়ি থাকার ফলে পথের প্রকৃতি কিছু বদলে গিয়েছে।

বনের পথে চলেছি, হঠাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে পাতাঝরা গাছের সারি শুরু হল। কোথাও ক্বচিৎ গাঢ় লাল পাহাড়ী মাটি আর বুনো ঘাস চোখে পড়ছে বটে, কিন্তু সারা পথটাই সিপিয়া রঙের ঝরাপাতায় ঢাকা। আমবা তখন একটা পাতাঝরা গাছের বনে ঢুকে পড়েছি। কুকুবের পাযেব তলায় পাতার পটপট শব্দ উঠছে। আমার জুতোয় এমন শব্দ হচ্ছে যে মনে হতে পারে স্কুলের ছাত্রদের মতোই শব্দ করার জন্যই পাতা মাড়িয়ে হাঁটছি। চারিদিকে পাতাঝরা গাছগুলো কিম্ভূত শিঙেব মতো ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু পায়ের তলায় পাতার শব্দ কমে এল একসময়ে। গাছের সংখ্যা কমে এল। এখানে ওখানে তামাটে কিম্বা কালো পাথরের চাঁই। পায়ের তলায় মাঝে মাঝে নুড়িগুলো হড়কে যাচ্ছে। মুখ তুলে চাইতেই আকাশের সীমায় একটা প্রকাণ্ড ফণিমনসা গাছ দেখতে পেলাম। সেটার দিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে ধ্বংসাবশেষটাও চোখে পড়ল।

এরকম ধ্বংসাবশেষ এর আগে আমি দেখি নি।

ছফুট উঁচু পাথরের প্রাচীর। তাব উপবে লোহার শিক বসানো। প্রাচীরের গায়ে লতা উঠেছে। কিম্বা উঠেছিল বলা উচিত। লতাটি শুকনো। একটা পাতা কিম্বা পল্লবও নেই। ছাই রঙের পাথরের দেওয়ালের গায়ে কালো শুকনো লতা। প্রাচীরের মধ্যে লাল ইটের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। বাড়িটাব পশ্চিম অংশে একটা বুরুজ, সেদিকটার দেয়ালেই কিছু ভাঙাচোরা। বুরুজটাতেও উপর থেকে নিচে একটা বড় ফাটল। যেন আগুন লেগেছিল এমন কালিও দেখতে পেলাম। দেওয়ালে এখানে ওখানে শুকনো লাইকেন, কোথাও বা ভিতের কাছে এক গোছা ফার্ন। একটা শুকনো, সাদা, পাতাঝরা ইউক্যালিপটাস গাছও বুরুজটার কাছে। মনে হচ্ছে, দরজায় কড়া নাড়লেই কেউ এসে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দ। কার্নিশের নিচে পাখির বাসা ছিল। কিন্তু পাখির শব্দও নেই। বাসাটা বোধ হয় পবিত্যক্ত। ডানদিকে একটু এগিয়ে ভাঙা ক্রেনেব মতো একটা যন্ত্র। তার পাশে জড়ো করে রাখা তেলেব বড়বড় ড্রাম। কুকুরটা একবার ভক ভক করে, গর গর করে রাগ দেখাল। পরমুহূর্তে কাঁই কুঁই করে আমার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

মসে ঢাকা সেই পাথরের নড়বড়ে সিঁড়ির সাবি, সেই ধূসর ঝবাপাতার বন, আর প্রায় অটুট এই প্রাচীরঘেরা নিঃশব্দ পরিত্যক্ত দুর্গ এ তিনে মিলেই আমার কৌতূহলকে বিস্ময়ের কাছে এনে দিল। কিম্বা বিস্ময় বললে কম বলা হয়, প্রথমে যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তা থেকে কিছুটা পিছিয়ে এলেম। কারণ খুঁজে পেলেন না কিন্তু ভয় করে উঠল।

ঠিক এমন সময়েই সে আত্মপ্রকাশ কবল। তাকে গাইড বলতে হবে। সব ধ্বংসস্তূপের কাছেই কেউ না কেউ থাকে। এখানে সে ছিল। সে অবশ্য বললে, তাকে সরকার থেকে পাহারা দিতে রাখা হয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে চেহারাব দিক থেকে সে মিলে গিয়েছিল এই ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে, যে তাকে গাইড ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না।

সে বলল, 'আপনার কি জলের দরকার আছে?'

বললুম, 'এখানেও গাইড আছে জানতুম না। যখন তা আছে এই ধ্বংসটার কথা বরং বলো শুনি, এখানে সিনকোনার কারখানা বসেছিল মনে হচ্ছে।'

সে বলল, 'না, সাহেব, ব্যাপারটা যে কারখানার তা আপনি ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু সিনকোনার নয়। তখন দেশে ম্যালেরিয়া আর ছিল না। এখানে মহাজাগতিক শক্তির গবেষণা হতো।'

বিস্মিত হতে হল।

যাক সে কথা। এই সময়েই গল্পটা শুনেছিলাম। গল্পটা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সে ভাবে বলতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে। সুতরাং গাইডের নিজের ভালোমন্দ, সুখদুঃখের কথা বাদ দিয়ে গাইডের বলা গল্পটা যেভাবে ঘটেছিল বলে মনে হল, তা বলি।

সেই মহাজাগতিক শক্তির গবেষণা মন্দিরের ডক্টর চিত্রা সেন হঠাৎ কাজ শেষ না করেই নিজের ঘরে ফিরে এল। রাত নটা বাজে।

তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। স্থির করল পোশাক খুলে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম মানুষকে অনেক দুর্বলতা থেকে আশ্রয় দিতে পারে।

কিন্তু দরজাগুলো কি যথেষ্ট শক্ত?

ব্লাউজটা খুলতে গিয়ে, দুটো বোতাম খুলে সে থামলে। কী কববে সে এখন?

দরজার ছিটকিনিগুলোকে পরীক্ষা করল সে। মজবুত, সাধারণ অবস্থাতে সেগুলোকে মজবুত বলা যায়। কিন্তু চিত্রা সেনেব মনে হল বাইবের ওদের পক্ষে কিছুই নয়। ঘরের কোণে লিখবার দেরাজ। সেটাকে টেনে টেনে সে একটা দরজার গায়ে খাড়া কবল। অন্য দরজাটার কাছে সরে গিয়ে কান পাতল সে; আতঙ্ক নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে চলা ফেরা করছে দরজার বাইরে। কী করবে সে এখন? চেয়ারটাকে টেনে এনে দরজাটায় ঠেকনো দেবে?

কিম্বা সে কি চিৎকার ক'বে উঠবে? কী ভাল হবে তাতে? কোন মানুষেব চিৎকাবই এই বাড়িব প্রাচীরের বাইরে পৌঁছাবে না। সে কি পালাবে এই বাড়ি থেকে? শিকলে তালাবন্ধ সদরদরজা পার হতে পারলেও প্রাচীর, এবং প্রাচীর পার হলেও লোকালয়ে পৌঁছানোর আগে দীর্ঘ বনের পথ পার হতে হবে। আর সেখানে সে ধরা পড়ে যাবে।

চিত্রা ব্লাউজটার বোতামগুলো আটকাল। তার এই প্রথম মনে হল এই বাড়িতে সে একা মেয়ে। আর সে, পালাতে চায়, এটা বুঝতে পারলেই ওরা আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে।

কান্নায় তার ঠোঁট কাঁপবে মনে হল, সে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। আতঙ্ক, আতঙ্কই পায়েব আঙ্গুলে ভর দিয়ে তার দরজাব বাইরে চলেছে। ফিসফিস শব্দটা শোনা যাচ্ছে ওদেব পরামর্শের।

কী নির্বোধ সে! এরই মধ্যে সে ঘুমবে ভেবেছিল। বরং সে কাজেব ঘরের ওভাবলটা গায়ে দিল। এটায় অন্তত সে মেযে তা ঢাকা পড়ে।

বোঝা উচিত ছিল তার, অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। তাব পিছনে দাঁড়িয়ে আভাসে ইঙ্গিতে ওরা তার সম্বন্ধেই আলাপ করছে এটা বুঝতে পেরেও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ধীবে ধীরে এটা বেড়ে উঠেছে। পরশুদিনের ব্যাপাবটার পর তার বিশ্বাস কবা উচিত হয়নি। সামান্য ব্যাপারটাকে ওরা কী বিশ্রী রকম বাড়িয়ে তুলেছিল। কী অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল হীরেনকে। আব আজ পালিয়ে আসার ঠিক আগে সেন্ট্রিফিউগের পাশে জ্যোতির চোখদুটোকে সে দেখতে পেয়েছিল। সে চোখদুটো যেন কোন জন্তুর। শিকারের উপরে লাফিয়ে পডার সাহস নেই অথচ হিংস্র লোভে তা চকচক কবছিল।

দরজার ওপারে অন্ধকারের চাপ বেড়ে উঠেছে। সে চাপ সহ্য করতে পারবে না এই দরজা। অসম্ভব, কোন দরজার পক্ষেই তা অসম্ভব।

ওরা যখন আসবে ষড়যন্ত্রীদের মতো দল বেঁধেই আসবে। আব সব চাইতে দুঃসহ হবে যখন চেনা গলায় তার নাম ধরে কেউ ডাকবে। ডেকে বলবে দবজা খুলে দিতে। তখন? যেন ওদের চাপা গরম নিঃশ্বাসের মতো। তখন হয়তো নিজের ভাগ্যের উপরে দারুণ অভিমান হবে চিত্রাব। আর তার ফলে দরজাটা সে নিজেই খুলে দেবে। শিউরে উঠল সে। না, না, ওরকম কোন অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

অথচ এই লোক কযেকটির পাশে দাঁড়িয়ে সে আজ একবছর কাজ করে যাচ্ছে। কী গভীর তন্ময়তা তাদের গবেষণায়, কী অমানুষিক পরিশ্রম। পৃথিবী থেকে, স্বাভাবিক জীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিনের পর দিন কী আত্মত্যাগী সাধনা। আর চিত্রা নিজে? তার নিজের সব আত্মীয়ের চাইতে ওদের আপন মনে কবে নি? সহকর্মী মাত্র নয়, বন্ধু নয় শুধু, ভাই বলে অনুভব করত সে।

মানুষ কত বড়ো, কত মহৎ হতে পারে, কত ঊর্ধ্বে উঠতে পারে তাবই সাধনা! মহাশূন্যে গ্রহপুঞ্জের মাঝখানে পৃথিবীর মানুষ তার নিজের নাম লিখে দেবে তারই তপস্যা।

চিত্রার মনে পড়ল কোথায় যেন সে পড়েছে--প্রকৃতিকে বঞ্চিত রাখলে একদিন সে তার দাবী কর্কশ ভাবে আদায় করে নেয়।

কিন্তু ভুল করেছে সে নিজের ঘরে ফিরে। এখানে তাকে খুঁজে বার করা ওদের পক্ষে সব চাইতে সহজ। খোঁজারও দরকার দরকার করে না। এটাই যে তার ঘর, তার আশ্রয়, এ তাদের সকলেরই জানা। কী ভুলই না করেছে সে! কেউ ডাকল? বুকের ভিতরে টিপটিপ করে উঠল চিত্রার।

শেষবারের মতো সে তার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে স্থির করল। ঘরের আলোটাকে নিবিয়ে দিল সে। দরজাটারে ছিটকিনি খুলে দিল, বাইরে থেকে হাত দিলেই খুলে যাবে। তার ফলে ওদের ধারণা হবে ঘরে আসেনি সে।

আর যদি আসেও তারা, সেই অন্ধকারে আলো আনবে না। মানুষ যখন ষড়যন্ত্র করে তখন সে আলোকে ভয় পায়। সেই সুযোগে সে পালাবে। এই বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকা কি যাবে না?

পরশুদিনই তার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। সেই সামান্য আঙুল কাটার ব্যাপারটাকে ওরা যখন তেমনভাবে বাড়িয়ে তুলল। গবেষণা করতে কবতে মেশিনেব নিকেলের ঢাকনায় লেগে আঙুলটা কেটে গিয়েছিল চিত্রার। ওরা হৈ হৈ করে উঠেছিল। অতটুকু কাটায় কেউ কখনও অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন নেয় না। কিন্তু ওরা তো বললই, এমন কি ডাক্তাবও সমর্থন করল। আর সেই ইনজেকশনটা কী যন্ত্রণাই না সৃষ্টি করেছিল তার শরীরে। সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণাকে বর্ণনা করতে হলে বলতে হবে তাব প্রতিটি রক্তকণার যেন দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, প্রতিটি কোষ যেন বাতাসের অভাবে হাহাকার করে উঠেছিল। কেউ যেন তাদের শ্বাসরোধের চেষ্টা করছে। পরে সে যন্ত্রণা কমেছিল বটে কিন্তু আতঙ্কের মতো কিছু একটা অবসন্ন করে রেখেছিল। সেটা কি অ্যান্টিটিটেনাস ইনজেকশন?

কী চায় ওরা? আশ্চর্য! কী ওদেব কামনা?

ডাকছে কেউ? কেউ যেন ডাকতে ডাকতে সবে গেল।

দরজাটাকে একটু ফাঁক কবল চিত্রা। পদশব্দ এবার পরিষ্কাব শোনা যাচ্ছে। বাইরেও অন্ধকার। আলো নিবিয়ে দিয়েছে ওরা। তাই স্বাভাবিক, এ অবস্থায় হয়তো ওরা দবজাটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কিম্বা ওরা কৌশলটা ধরে ফেলেছে, কিছু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ঘর থেকে তার বেবোনোব অপেক্ষায়।

চিত্রাব নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আতঙ্ক এবার তার হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরেছে। অথচ এমন ছিল না।

মহাকাশে পাঠানো সেই গোলকটা ভেঙে পড়ল। আর সেটাকে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা কবতে গিয়ে বিশ্রীভাবে হাত কেটে গিয়েছিল ডক্টর সমাজপতির। অসুস্থ হযে পড়লেন তিনি। এখনও সুস্থ হতে পাবেন নি। ডাক্তার বলেছে, আজকালের মধ্যেই হয়তো তিনি তার ঘর থেকে বেরবেন। সেপসিস নয়, নতুন কোন অজ্ঞাত ভাইরাস তাঁর রক্তে মিশে গিয়েছিল। খুব সম্ভব সেই ভেঙে পড়া গোলকটাই সেই ভাইরাস নিয়ে এসেছিল মহাজগৎ থেকে। এই ঘটনার কিছু পরে থেকেই শুরু। ডাক্তাব বলেছিল সেপসিস নয়। চেষ্টা করে দেখছি অটোভ্যাকসিনে কিছু হয় কিনা। কয়েকদিন ডাক্তারকে দেখাই গেল না। সে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়ল তারপরে। এ সময়ে একদিনই চিত্রার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। বিবর্ণ মুখ, চোখের কোণে কালি। বলেছিল, কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তা বলে—। কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে হেসেছিল।

সময়ের দিক থেকে এই ঘটনার পরই অন্য অনেক ঘটনা ঘটেছে। এরপর, সুতরাং এই হেতু—ডক্টর চিত্রা সেন জানে এমন চিন্তা করা অবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু সত্যি কি কিছু যোগ থাকতে পারে এই ফিসফিস কানাকানিব, এই ষড়যন্ত্রের বিভীষিকার

সঙ্গে ওই ভাইরাসের ঘটনার? তখন থেকে শুরু।

দরজার ফাঁকে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে ঘরের অন্ধকাব থেকে করিডরের অস্পষ্ট অন্ধকারের ছায়ায় ঢাকা আলোতে এসে দাঁড়াল চিত্রা। দেয়ালের গায়ে গা মিশিয়ে সে সরে যাবে ঘরের থেকে। এ বাড়িতে অনেক ঘর। অনেক করিডর। অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত সেগুলো। লুকোতে হবে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। হয়তো ওরা এতক্ষণে অন্যদিকে তাকে খুঁজছে। কিম্বা মাছ ধরার জাল যেমন ক্রমশ ছোট করে আনা হয়, ওরাও হয়তো তেমনি বিভিন্ন করিডর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ওকি! পায়ের শব্দ? পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। চিত্রা ছুটল।

কিন্তু সে কি ওদের সঙ্গে ছুটে পারবে? ওরা পুরুষ। লুকোতে হবে তাকে। এ কবিডব থেকে অন্য করিডর, তাবপর অন্য কোন কবিডরে। সব আলো নিবে যাচ্ছে না?

কথাটা হঠাৎ মনে হল আর ফলে কিছুক্ষণ মন জুড়ে রইল সেটা। আজ ল্যাবরেটরিতেও আলো জ্বলছে না।

কিন্তু পায়ের শব্দ তাকে তাড়া করে আসছে। প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে। দূরত্ব কমে আসছে প্রতি পদক্ষেপে। ছুটতে ছুটতে আর একটি করিডরে ঢুকে পড়ল চিত্রা। দিনের আলো পর্যন্ত ব্যবধান রেখে চলতে হবে। হয়তো দিনের আলোয় ওরা লজ্জিত হবে, হয়তো থামবে।

এক মুহূর্তের জন্য থামল চিত্রা। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। এ করিডরটা যেন গ্যাসে ভবা, নিঃশ্বাস নিতে এমন কষ্ট হচ্ছে তার। আবার যেন কান্নার জন্য তাব ঠোঁট কাঁপল।

আশ্চর্য এই পবিবর্তন! আদর্শপ্রাণ একদল বৈজ্ঞানিকেব এই পবিণতি! তাবা মানুষের অগ্রগতিকে তুরীয়ান ও মহীয়ান কবতে চেয়েছিল। তারা মানুষকে পবিপূর্ণ কবার সাধনায বসেছিল। সেই ঊর্ধ্বগতিব কক্ষচ্যুতি হয়েছে। সাধারণ মানুষের চাইতে বরং নিচে জন্তুর কাছে এসেছে ওবা।

কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করবেই।

এ কবিডবটাব মাথায দেয়ালেব গায়ে ম্লান একটা দেযালগিবি জ্বলছে। ওটা কি ডক্টর সমাজপতির ঘব? সে কি তা হলে তাঁর ঘবের দিকেই এসে পড়েছে। নিজের অজ্ঞাতে?

চিত্রার মনে ডক্টর সমাজপতির চেহারাটা ফুটে উঠল। আইনস্টাইনেব সঙ্গে মিলেব কথা বলে তাঁর শিষ্যেরা। তেমনি এক মাথা পাকা চুল। চোখ দুটি তেমনি সস্নেহ ঔদার্যে ভবা। কোন সমস্যাই তাঁর কাছে যথেষ্ট সমস্যা নয়। পাছে এই বৈজ্ঞানিক পরিবেশে সেটা বেশি নরম শোনায় তাই চিত্রা মুখে কখনও বলে নি, কিন্তু মনে মনে সে স্মরণ না করে পারে না যে ডক্টব সমাজপতিকে তার বাবাব মতো দেখায়। হায়, আজ ডক্টর সমাজপতি সুস্থ নেই।

কিন্তু চমকে উঠল চিত্রা। হাসল যেন কেউ? ওরা কি এবার তাকে দেখে ফেলেছে? একটা চাপা আর্তশব্দ করে আবাব ছুটল চিত্রা।

কিন্তু এ করিডরে কি তেল ঢেলে রেখেছে, তেল কিম্বা গ্রিজ? পিছলে যাচ্ছে পা। কে একজন একেবারে কাছে এসে পড়েছে মনে হ'ল।

জোরে ছুটতে গেল চিত্রা, সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে পড়ে গেল। কিছু একটা ভেঙ্গে গেল তার শরীরে। দুর্বিসহ ব্যথায় সে যেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন তাব পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

এটাই ফাঁদ। ফাঁদে ধরা পড়েছে সে। ফাঁদে ধরা শিকারের মতোই একটা পা মচকে গিয়েছে তার। এখন? ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই। নিজের ভাগ্যের উপরে তীব্র অভিমানে তার দুচোখ জলে ভরে এল। জীবনের শেষ প্রতিরোধ নিবে গিয়েছে। কিন্তু ওদের পায়ের শব্দ? তাও যেন থেমে গিয়েছে। ওরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে তাদের ছুটোছুটির আর

দরকার নেই। ওদের হরিণী ফাঁদে পড়ে পালানোর শক্তি হারিয়েছে।

দেয়ালে ভর দিয়ে চিত্রা উঠে দাঁড়াল। এবার সে নিজের ঘরেই ফিরে যাবে। সেখানেই ঘটুক ভাগ্যে তার যা আছে ঘটার। অন্তত সে ঘরটাকে সে নিজস্ব বলে চিনেছে এতদিন। অবচেতন মনে স্নেহের জন্য কামনা দেখা দিল। মানুষ নয়, তার সাহচর্য নয়, একটা অর্ধ-আলোকিত গুহা যেখানে সে তাব ক্লান্ত দেহকে কিছুটা বিশ্রাম দিতে পাবে—তারপর তার এই দেহটাকে—

চিন্তাটাকে শেষ করার সাহস সে পেল না। সেই অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।

তার ঘরে একটা আলো জ্বলছে।

তাহলে? ওরা তার ঘরে এসেছিল। সবকিছু তছনচ করে খুঁজেছে। আলো জ্বালিয়ে রেখে চলে গিয়েছে। আলো জ্বালাতেও লজ্জা হয়নি, এমন করে সব শোভনতার ধারণাকে বিসর্জন দিয়েছে ওরা।

দরজার প্রায় পাশে এসে থমকে দাঁড়াল চিত্রা। আব ঠিক সেই মুহূর্তেই আশা ফিরে এল তার মনে। সে কি স্বপ্ন দেখছে? তা হলে সে হয়তো রক্ষাও পাবে। রক্ষা পাবে, রক্ষা পাবে।

বিজ্ঞানের পরীক্ষার আগে সেবার একটা হতাশায় কষ্ট পাচ্ছিল। তখন তার বাবা এসে বসেছিলেন তার ঘরে, তার বিছানায়। সব হতাশা মুছে গিয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে! ঠিক তেমন করেই তেমন ভঙ্গিতেই তার বিছানায় বসে আছেন ডক্টর সমাজপতি। অস্ফুটস্বরে কিছু বলল চিত্রা। যেন সে, অবিশ্বাস্য হলেও বাবা বলে ডাকল।

তখনকাব মতো ব্যথাটাও যেন সে ভুলে গেল। এগিয়ে গিয়ে বিছানার পাশে মেঝেতে বসে পড়ল সে। ডক্টর সমাজপতি কোলে মাথা বেখে কেঁদে ফেলল।

ডক্টর সমাজপতি চিত্রার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'কী ভয় তোমার, চিত্রা?'

এই স্নেহের আশ্বাসে চিত্রা মুখ তুলতে গেল, আর ঠিক তখনই সে দেখতে পেলো, ডক্টর সমাজপতির হাতে রুপোলি কাচেব ঝকঝকে ভয়ংকর সেই হাইপোডার্মিক সিবিঞ্জটাকে। আর্তস্বরে না না বলে প্রতিবাদ জানাল সে।

ডক্টর সমাজপতি হেসে বললেন, 'এ কিছুই নয়। এই, এই ইনজেকশনটাই, অ্যান্টিটিটেনাসের নামে তোমাকে প্রথম ইনজেকশনটা দেওয়া হয়েছিল। তোমাব ভিতবে কিছু আছে চিত্রা, যা প্রতিক্রিয়াশীল, প্রতিরোধ করে প্রতিরোধের জন্যই, সেজন্যই দেরি হচ্ছে। কিন্তু এটা, এটার পরেই তুমি আমাদের মতো হবে। দেখে নিও।

অদ্ভুত এই আশ্বাসের সুরেই যেন বিস্মিত হয়ে মুগ্ধেব মতো চাইল চিত্রা। যেন সমাজপতিব সঙ্গে একমত হচ্ছে। কিম্বা এ কি তার অভিমান? যে অভিমানে সে নিজেকে ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দেবে ভয় হয়েছিল? চিত্রা হাত তুলে বাধা দিতে গেল।

গাইডের গল্পের এই জায়গায় আবার আমাদের আলোচনা হয়েছিল। একটা কেটে নেওয়া গাছেব স্টাম্পে বসে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে জানতে চাইলুম, সেই গভীর রাত্রির ঘটনা কি করে সে জেনেছে। কিন্তু এ রকম প্রশ্ন করা তাকে গাইড বলে অস্বীকার করার সামিল। গাইড কিছুটা তামাক চাইলে। দেখলুম তারও একটা পাইপ আছে যদিও তা পুরনো এবং ফাটা। তামাক পেয়ে সে খুশি হল।

তখন তাকে বললুম, 'সব ধ্বংসস্তূপের গল্পেই কি করে ধ্বংসটা এল তা বলা হয়ে থাকে। তোমার গল্পে তা বলা হয় নি। বুঝতে পারছি চিত্রাকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। সে ইনজেকশনে হয়তো ডক্টর সমাজপতি কিম্বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিকের ভাইরাস-দূষিত রক্তের সিরাম ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে এই দুর্গের মতো বাড়িটার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার ঘটনার কী যোগ আছে? তা ছাড়া

এ বাড়িটাকে ধ্বংসস্তূপ বলে ঠিক মনেও হয় না।'

গাইড বললে, 'আপনি যেখানে বসেছেন তার কাছাকাছি ওই বাঁধানো চত্বরটার উপরেই সে পড়েছিল। কিছু গোলমাল হয়েছিল তার হিসাবে। কিম্বা এমন সব ব্যাপারে একটু থেকে অনেকটা তফাৎ হয়ে যায়। সেদিন তার পাহারাওয়ালাও একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকবে।'

সময়টা তখন দুপুরের দিকে হবে। সাড়াটা হঠাৎ উঠল বাড়ির মধ্যে। চিত্রাকে তার রোগশয্যায় দেখা যাচ্ছে না। প্রায় অজ্ঞানের মতো যে আজ দুমাস হল বিছানায় পড়ে আছে তাকেই হঠাৎ দেখা যাচ্ছে না। কোথায় ছিল তার ঘরের দরজার আর্দালি যে পাহারা দিচ্ছে? খুঁজে দেখো, খুঁজে দেখো। শুকিয়ে শুকিয়ে সে কাঠির মত হয়ে গিয়েছে, যেমনি নাকি মরফিয়ার বদভ্যাসে হয়ে থাকে। আর, অন্তত চারটে ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয়েছে। এখন অবশ্য একটা ইনজেকশনের প্রভাব প্রায় এক সপ্তাহ থাকে। চোখের চাহনিতে এই নতুনত্ব নিঃসন্দেহে দেখা দেয়। কিন্তু হঠাৎ কখনও কখনও তার পিছন থেকে পুরনো দিনের তার সেই কালো মণিদুটো ঝকঝক করে ওঠে, দু-এক মুহূর্তের জন্য তার প্রতিক্রিয়াশীলতাব এই চিত্র, অভ্রান্ত প্রমাণই বলা যেতে পারে, প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে জন্যই এটাও ডক্টর সমাজপতির গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। তার এই প্রতিক্রিয়াশীলতা।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এদিক, ওদিক এঘর, ওঘর—সব ঘর, সব করিডর খুঁজল তারা। আশ্চর্য কোথায় গেল চিত্রা?

তারপর ছাদে উঠল তারা। ছাদেই ছিল চিত্রা। শুকিয়ে কাঠি হযে গিয়েছে সে। রুক্ষ্ম চুল উড়ছে মুখের কাছে। চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক তীব্র? কিছু ঘোর লাগা যেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলছে? কিম্বা স্বপ্নের মতো কোন অতীতকে দেখতে চেষ্টা করছে?

সিঁড়ির দরজা দিয়ে ওবা এক এক করে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে তাব পিছনে। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দে চিত্রার চিন্তাটা ছিঁড়ে গেল। পিছন ফিরে ওদের দেখতে পেয়ে সে চাপা আর্তশব্দ করে সামনের দিকে ছুটে গেল। বোঝা যাচ্ছে এইটুকু ছুটতেই কত কষ্ট হল তার।

বুরুজটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। একবার যেন চোখের জল মুছল। ওদের থেকে আর একটু দূরে থাকার জন্যই যেন সে বুরুজটার উপরে গিয়ে উঠল। এটুকুতেই সে হাঁপাচ্ছে।

ওদের মধ্যে জ্যোতি বয়সে বড়। চিত্রার সঙ্গে তার গবেষণাব পার্টনারশিপও ছিল, তাকে বন্ধুত্ব বলা যায়।

জ্যোতি বলল, 'এটা কী রসিকতা, চিত্রা? নেমে এসো। তোমার শরীর ভালো নেই।'

চিত্রা যেন কিছু ভাবছিল। চমকে উঠল সে। বুরুজ থেকে সে আলসের উপরে গিয়ে দাঁড়াল। পা শিরশিব করা সেই একহাত চওড়া আলসের উপবে দাঁড়িয়ে সে নিচের দিকে চাইল।

'নেমে এসো, নেমে এসো চিত্রা।'

চিত্রা বলল, 'তোমরা যদি একপাও এগিয়ে আসো আমি নিচে লাফিযে পড়বো।' এপর্যন্ত অনেকবার ইনজেকশন হয়েছে তার। প্রতিবারেই প্রতিটি রক্তকণিকাকে সে তার দেহের মধ্যে মরে যেতে অনুভব করেছে। এখন আর আগের মতো নেই। তার রক্তকণিকা এখন ইনজেকশনের পরে ছ-সাত দিন ধরে ধীরে ধীরে অন্যের রক্তকণিকার মতো হযে যায়। প্রতিরোধ যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে তা মুছে যেতে থাকে, কারণ প্রতিরোধের শক্তি আর আগের মতো নেই তার। কিন্তু ওরই মধ্যে আবার একটি দুটি কবে রক্তকণা—নতুন রক্তকণা যেন তার দেহে জন্মলাভ করে, ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইনজেকশনের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চায় তারা।

হাঁ করে করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে চিত্রা এখন।

'নেমে এসো, চিত্রা, একী পাগলামি।' ওরা বলল।

আলসে থেকে কার্নিশে নামল চিত্রা।

পালাতে চায় নাকি সে? পালানো কি সম্ভব? দেয়াল বেয়ে বেয়ে নিচে নামা যদি সম্ভবও হয়, প্রাচীরটা আছে। প্রাচীরের কাছে পাহারাওয়ালা। আর তা ছাড়া প্রাচীরের পরেই বন, সে বন পার হতে পারবে সে?

চিত্রা হিসাব করছে কার্নিশে দাঁড়িয়ে। দোতালার জানালার উপরে সরু একটা খিলানের ঢাকনা আছে। যদি সে কার্নিশ থেকে ঝুলে সেটায় পৌঁছতে পারে তবে তা থেকে একতলার আলসেতে লাফিয়ে পড়াও সম্ভব। আর সেখান থেকে আরও নিচে।

খুব কম সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে। ওরাও যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর এক সঙ্গে কথা বলে উঠল। বলল, 'পড়ে যাবে, চিত্রা। আর কী করছ তুমি, চিত্রা? আমরা ফিরে যাচ্ছি, তুমি ঘরে এস। আর তোমাকে ইনজেকশন দেওয়া হবে না। অনেক হয়েছে। নেমে এসো।'

প্রথম রাত্রিতে পালানোর সময়ে যেমন চাপা আর্তশব্দ করে ছুটে পালিয়েছিল তেমন করে দুহাতে কার্নিশ ধরে সে ঝুলে পড়ল।

মনে মনে সে হিসাব করল। খুব তাড়াতাড়ি হিসাব করতে হচ্ছে তাকে। ছসাত ফুট নিচে জানালার ঢাকনাটা। পড়তে পড়তে সেটাকে ধরে ফেলতে হবে। সেখান থেকে ঝুল দিয়ে একতলার আলসে।

কার্নিস থেকে হাত ছেড়ে দিল সে। ঠিকই পড়ছে সে, ঠিকই পড়েছে সে, হিসাব মতো।

কিন্তু তার হিসাবে কি কিছু ভুল ছিল? জানালার ঢাকনাটা তার আঙুলের ডগা ছুঁয়ে গেল, কিন্তু ধরতে পারল না যেমন সে আশা করেছিল। এক ইঞ্চির সামান্য একটা অংশের ভুল হয়েছে হিসাবে। শূন্যকে চেপে ধরার চেষ্টা করল চিত্রা এক মুহূর্তের জন্য, তারপর নিচের বাঁধানো চত্বরে এসে পড়ল সে।

খস করে একটা শব্দ হল। একটা শেষ আর্ত চিৎকার।

ওরাও তাড়াতাড়ি নেমে এল। চিত্রার শরীরের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন নিচু হয়ে তার নাড়িটাকে পরীক্ষা করল। তারপর চার জনে ধরাধরি করে সেই রক্তাক্ত শরীরের তালটাকে লোহার গরাদে আঁটা শিকলতালা দেওয়া বাড়ির মধ্যেই নিয়ে গেল।

এখন দেখছি গল্পটার শেষটুকু জানা হয় নি। হয় গাইড নিজেই জানতো না, কিম্বা বলতে ভুলে গিয়েছিল। ধ্বংসস্তূপটা কেন ধ্বংসস্তূপ হল তা সে বলে নি।

মনে পড়ছে। পাইপটার ছাই ঝেড়ে উঠে পড়েছিলাম। কারণ ততক্ষণে তাঁবুতে কাজ জমে উঠেছে। এটাও গল্পটার শেষটুকু না জানার কারণ হতে পারে।

খানিকটা দূরে এসে পিছন ফিরে চাইলুম। ফণিমনসার সেই গাছটাকে আবার দেখলুম আকাশের সীমানায়।

এতদিনেও ধ্বংসাবশেষটার কথা ভুলিনি। এই গল্পই তার প্রমাণ, যদিও কখনও কখনও সন্দেহ হয়, সেটা আমার কল্পনার সৃষ্টি কিনা। আমাদের সভ্যতার কাছ থেকে খুব দূরেও নয়। মসে ঢাকা সেই নড়বড়ে পাথরের সিঁড়ি—আরও কয়েকটা ধাপ এতদিনে তার খসে গেলেও এখনও হয়তো আছে। সেই পাতা-ঝরা গাছের ধূসর বন, সেখানে হয়তো আর বসন্ত আসে নি, এখনও হয়তো তেমনি ধূসরই আছে। আর সেই বনের মধ্যে শুকনো লাইকেন আর ফার্নের দাগ লাল লাল ইটের বাড়িটাও সেখানে থাকাই সম্ভব। রাষ্ট্রের কর্তামশাই কেন এই বাড়িটা তৈরি করতে হুকুম দিয়েছিলেন তা যেমন জানা যাবে না, কী সেখানে গবেষণা হতো তাও জানা যাবে না। এমন অনেক ব্যাপার রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গোপনে করা হয়ে থাকে। মানুষকে জানতে দেওয়া হয় না। দু-পাঁচশো বছর পরে গবেষণা করে তার কিছু কিছু জানার চেষ্টা হয়ে থাকে। পাঁচশো বছর পরে তারা কী রায়

দেবে এখন বলার উপায় নেই।

কিন্তু চিত্রার ব্যাপার থেকে আমার জানতে ইচ্ছা হয়, সত্যিই স্ত্রীলোকদের রক্তকণায় একটা প্রতিরোধের শক্তি আছে কি না, অনেক ইনজেকশনের পরেও তা প্রতিক্রিয়াশীল কি না। হয়তো তাই। মাইক্রোস্কোপে বোঝা যাবে না পার্থক্য। তাদেব রক্তকণিকা যেমন সুন্দর প্রশস্ত শ্রোণী এবং উন্নত সুগঠিত স্তনকে পুষ্ট করে সন্তানেব হিতার্থে, তেমনি হযতো তার রক্তকণিকা পুবাতনের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ তাব প্রতিটি সন্তানেব কাছে ভূমিষ্ঠ হওযার মুহূর্তটাই অনাদি, কাজেই তার নিজের বক্তকেও নতুন রাখতে হয়।

চার্জ

কী শীত! কী শীত! হা ভগোয়ান!

রামচলিত্তর আহিরেব পিতার নাম দশবথ ছিল না, কিন্তু রাজা দশরথের মতোই সে পুত্র বামচলিত্তর এবং লছমনপ্রসাদকে এক সত্যেব বিপাকে ফেলে দিয়েছিল, এবং তার এই দুর্মতির মূলেও ছিল এক পরমাসুন্দরী স্বপ্ন। সে স্বপ্ন আলোকোজ্জ্বল কলকাতা নগরী। ইতিহাসটা এই· গোরখপুর জেলার ভেলবারা গ্রামের এক আহির পরিবারের ছেলে কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরানোর স্বপ্ন দেখে গ্রামের মহাজন অযোধ্যা তেওয়ারীর কাছে পৈতৃক জমিজমা বাঁধা রেখে কয়েকশো টাকা ধার করেছিল। ঋণ এবং আরো ঋণ কবে ঋণের অঙ্কটাকে সে যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলল, এদিকে তা সুদের পথেও বাড়ছিল। তারপর একদা সে কঠিন অসুখ নিয়ে দেশে ফিরল। জ্যেষ্ঠ রামচলিত্তরের বয়স তখন সতেবো আঠারো হবে, লছমনপ্রসাদ দশে পড়েছে। হাড্ডিসাব ক্ষতযুক্ত দেহ, তবু তার উপরেই প্রাণের কী মায়া! অবশেষে গ্রামের পুরোহিত, মহাজন এবং কবিরাজ অযোধ্যা তেওয়ারী নিদান দিল: বল, বল, ছেলেদের ডেকে বলে দে— তোর টাকা নেওয়ার সব হিসাব কাগজে লেখা হয় নাই, কিন্তু তোর বাস্তুভিটা বাঁধা দিলে বকেয়া ঋণের জামিন দেওয়া হবে। এই কথা শুনে রামচলিত্তর এবং লছমনপ্রসাদের সম্মুখে মৃত্যুপথযাত্রী তাদের পিতা নাকি অস্থিব হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, হাঁ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। যেন এতদিন ধরে সে এ কথাটাকেই খুঁজছিল। এরপব বালিশে মাথা চেলে নখ দিয়ে বিছানা খামচে খামচে ধরে আরও দুটো দিনের সবটুকু সময় এই শব্দদুটিকে উচ্চাবণ করেছিল সে যতক্ষণ না তার ঋণমুক্ত প্রাণ অসীমেব দিকে উড়ে গেল।

কেউ কেউ বলল বিকার। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে রামচলিত্তব পিতার সত্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ছোটভাই লছমনপ্রসাদ ভাবল—দাদা কি কম বোঝে? লোকে বলতো বটে—যদি অযোধ্যার কাছে তাব বাবার ঋণ থাকে তবে কাগজ দেখাক। এসব শুনেও রামচলিত্তব তার সম্মুখেব মন্থরগতি বলদদুটোর মতোই নির্বিকার ভঙ্গিতে লাঙ্গল ঠেলে চলতো। কিন্তু বুকের মধ্যে সময় সময় সে বর্ণহীন একটা জ্বালা অনুভব করতো।

পুবো তিনটি বছর ধরে সে চেষ্টা করল। সে কী অমানুষিক পরিশ্রম! কিন্তু না হল রুকমিনিয়ার জন্য একটা ঘর তোলা, না হল ঋণের শেষ। ঋণের আসল এবং সুদ কি করে পরস্পরকে বাড়তে সাহায্য করে তা সে জানতো না। জানে অযোধ্যা তেওয়ারী। মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল সে। এ অবস্থাতেই যুদ্ধ লেগেছিল ইউরোপে। অনেক দূরের দেশ। কিন্তু সেটা অবান্তর। আসল কথা, আশ্বাস ছিল, সে সিপাহী হলে সরকার থেকে এমন ব্যবস্থা করে দেবে যে মাসে মাসে দুকুড়ি, পঞ্চাশ টাকা আসবে তার বাড়িতে। সেই টাকায় তিনটি প্রাণীর চলে যাবে—লছমন, রুকমিনিয়া আর তাদের মা। যদি লছমন বুঝমান হয় তবে ধারও শুধতে পারবে দুপাঁচ টাকা করে।

তখন অনেক দূরে গিয়েছিল সে। তাকে ফরাসী দেশ বলে। সোমস বোধ হয় জায়গাটার নাম যেখানে যাওয়ার কথা ছিল। অনেক দিনের মধ্যে একদিন সকালের কথাই তার মনে পড়ে। তখন সকাল হচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারের বদলে বারুদের আর রক্তের আঁশটে গন্ধভরা কুয়াশা দেখা দিয়েছে। খাদের মাথার ঠিক এক হাত উপরে যেন সেই পর্দা। খাদের গা ভিজে ভিজে, পায়ের নীচে কাদা। আর শীত। হ্যাঁ জাড়ও বটে। সারা রাত কামানের গোলা চলার পর তখন এমন সুমসাম হয়েছে

যে ফড়িং-এর পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের ডানদিকের কামান চলতে শুরু করল। তারা আশা করেছিল, ওদিকের কামানের উত্তরে এদিকের কামানও চলবে। কিন্তু রাত্রির গোলায় এদিকের সব ব্যবস্থা কল্পনার অতীত রকমে ভেঙে পড়েছে। তার পর সেই আক্রমণ শুরু হল। হাতাহাতি যুদ্ধ—হাতবোমা আর বেয়োনেট। আশ্চর্য! পিছনের লোকেরা কি ধরে নিয়েছে ভারতীয় এই কম্পানিটার শেষ কজন রাত্রিতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে! জার্মানরা একশো গজের মধ্যে আসতেই কম্পানি কমান্ডার রাইফেল চালাতে হুকুম দিল। কিন্তু পঞ্চাশটা রাইফেলে পাঁচশো জার্মান সৈন্যের গতি বন্ধ করা যায় না। অবশেষে তারা পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেল। তাদের হাতবোমা খাদের মধ্যে পঞ্চাশজনের—সাত-আট জনকে শেষ করে দিল। কম্পানি কমান্ডার ঝজব সিংজী তখন হঠাৎ খাদ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল: চা র জ। অমন চিৎকার, অমন ভয়াবহ চিৎকার, মানুষের গলায় ধ্বনিত হতে পারে, এখনও, এতদিন সিপাহী থেকেও, রামচলিত্তরেব বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয। প্রায় চল্লিশজন ভারতীয় সৈনিক বেয়োনেট সম্মুখে রেখে জার্মানদের উপরে লাফিয়ে পড়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে রামচলিত্তরের এই ঘটনাটা। ঠিক তার সম্মুখে পড়েছিল মাঝবয়সী একজন অফিসার। স্পষ্ট মনে আছে তার—সেই অফিসার পিস্তল সমেত হাত তুলেছিল। চার পাঁচ হাত লাফিয়ে গিয়ে পড়েছিল রামচলিত্তর। বেয়োনেটের ফলাটা বিঁধেছিল সেই অফিসারের বুকে, বুটসমেত পায়ের লাথি ছাড়া হাড়ের ফাঁক থেকে বেযোনেট বাব করা যায় না। বেয়োনেট লক্ষ্যে বিঁধতেই লাথি মাবল রামচলিত্তব। আব ঠিক তখন, ঠিক তখনই, সেই আর্তনাদটা শুনেছিল বামচলিত্তর· যেন তার গোবখপুবি হিন্দীতেই মা বলে কেউ কেঁদে উঠল।

কী শীত! কী শীত! শীত, জাড়, বরফ কোন শব্দ দিয়েই এই শৈত্যকে বোঝানো যাবে না। সোমসেও এমন শীত ছিল না। সোমস কোথায়, সে তো ডানকার্কে। কিন্তু এক নম্বর প্লেটুনের পাথরের অগভীর এই খাদে যেন শীত থৈথৈ করছে। রাইফেলটাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। সিগ্রেট টানাবও উপায় নেই। কম্পানি কমান্ডার বলবন্তজি কাল হুকুম দিয়েছেন দিনের আলো ফুটবার আগে সিগ্রেট খেয়ো না কেউ। ওপারের পাহাড়টায় দুশমন। হাজাব-পনেরোশো গজও হবে না।

রামচলিত্তব ঘটনাটাকে পাশ কাটাতে গেল, পারল না। ওই আর্তনাদটাব ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। জার্মান অফিসর গোরখপুরি হিন্দিতে মা বলতে পারেনা, এটা সুযুক্তি হলেও তার মন তা স্বীকার করতে পারলনা। এরপরে আর একবার সে জার্মানদের মুখোমুখি হয়েছিল। ডানকার্কের শেষ পাহারাদারদের একজন ছিল সে। কিন্তু রাইফেলের হুকুম শুনে সে বারবার ঘোড়া টানতে গেল—একবারও ঘোড়াতে তার আঙুল পড়ল না। উদ্যত আঙুলটা অভ্যাস মতো ছন্দে ছন্দে চলল বটে, কিন্তু কখনও কাঠে কখনও ঘোড়ার বেড়াটার উপবে পড়তে লাগল। এ অবস্থায় যা হওয়া উচিত তাই হয়েছিল—যুদ্ধবন্দী হতে হয়েছিল তাকে।

তারপর থেকেই চিন্তাটাও চলতে চলতে হঠাৎ জাম হয়ে যায়। দুবার তা প্রমাণ হয়েছে, যদিও সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন অবস্থায় এবং চিন্তা আবার চালু হলে মনে মনে সে ভিন্ন দুটো আস্বাদ পেয়েছিল।

বন্দী অবস্থাতেই সে মুখে মুখে শুনেছিল: একদিন চোখের সম্মুখেও দেখেছিল সুবাসবাবুকে (সুভাষ বোস নামটা)। কিন্তু তিনি যখন বললেন— তোমরা আমার সঙ্গে এসো, আমরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবো, যখন তার মতো যুদ্ধবন্দীদের অনেকে সেই ডাকে পাগলের মতো এগিয়ে গেল, তখন হঠাৎ তার মন জাম খেয়ে গেল—অকেজো রাইফেলের মতো। আর কাজের সময়ে রাইফেল জাম খেলে যা হয়। জাপানিদের বন্দী, তারপরে ইংরেজের বন্দী, গোটা যুদ্ধটা বন্দী অবস্থায় কেটে যেত যদিনা ইংরেজরাই আবার আরাকানের জঙ্গলে আসতো।

তার এই ব্যাপারটা এতদিনে বোধ হয় উপরওয়ালা বুঝতে পারে। নতুবা এমন হয়? গণপতের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় রংরুট অফিসে। পাশের গ্রামের লোক গণপত, একই দিনে নাম লিখিয়েছিল

তারা। সে এখন এই দলেই আছে—সুবাদার গণপত আহির। আর এই বিশ বছর পরেও রামচলিত্তর এখনও নায়েক। বিয়াল্লিশ থেকে বাষট্টি। অবশ্য ইদানিং রামচলিত্তরের গুণ আবিষ্কার হয়েছে। রাইফেলে যদি বেয়োনেট পরানো না থাকে, আর প্রতিপক্ষ যদি সামনে না থাকে অর্থাৎ তার চোখমুখ যদি স্পষ্ট না দেখা যায় তবে সাত-আটশো গজ দূরে থেকেও রামচলিত্তর তাকে অব্যর্থ নিশানায় বিঁধে দিতে পাবে। কম্পানি কমান্ডার কখনও কখনও তাকে শুটার বলে নায়েক না বলে। স্নাইপার সে। তার প্রমাণ তার বিশেষ ধরনের বাইফেলটা।

আরে ছি ছি! ঘুমাচ্ছে না কি সে? তার এইমাত্র মনে হচ্ছিল বটে সাদা লেপ গায়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমেব ঠিক আগে যেমন ধীবে ধীবে ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে আসে তেমনি হচ্ছে তার। জোর করে, বেশ চেষ্টা করেই, চোখ মেলল সে। দেখতে পেল, ময়দার বস্তা ঝাড়লে যেমন ময়দা ওড়ে তেমন সাদা গুঁড়োয় যেন চারিদিক ঢেকে যাচ্ছে। তুষার? কিন্তু চোখে পড়ছে কেন? সকাল হয়েছে তা হলে? এক ঝটকায় নিজেকে খাড়া করে নিল সে। কী অসম্ভব ভারি লাগছে হাত-পা। হাতে থুথু ফেলে দু হাতে ঘষল সে। না, ইউরোপেও এমন শীত ছিল না। ঘুম নয় তা হলে, শীতেই সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। কথাটা মনে হতেই গায়ে শীতকাঁটা উঠল আবার। না, ঘুমানোর কথা, বিশ্রামের কোন কথাই, এখন ভাবা যায় না। কাল সারাদিন সারা রাতে এই খাদগুলো তৈরি হয়েছে। সূর্য ডোবাব সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীকে কেউ বরফের খাদে চুবিযে দিযেছিল। কিন্তু আগুন জ্বালানো যায় নি। কম্পানি কমান্ডার বলবন্ত শর্মাজি বলেছে খাদগুলোর কথা জানতে দেয়া যায় না দুশমনকে। কাল দুশমনের মর্টারের গোলায় ঘাঁটিটা চুরমার হয়ে গিযেছে। তার মন অসাড় হয়ে যাচ্ছিল, ঘুমের আগে যেমন হয়। এক ভাবতে আরেক ধরছে তার মন।

কাজটা সে ভালো করে নি। ওটাও হয়তো তার মন জাম খেয়ে যাওয়ার প্রমাণ। সেই সেদিন থেকেই তো গ্রামের লোকেরা বলেছে—ওটা তোমার বাবাব বিকার ছিল। সেটাকে মওকা মনে করেছিল তেওয়ারী। পাঁচ বছরের চেষ্টায় শোধ হয়েছে কিছু? তোমার মৃত্যুর সময়েও তোমার বিকারেও তেওয়ারী অমন কিছু তোমার ছেলেকে দিযে কবুল করাবে। শুনতে শুনতে গলা আগুনেব মতো কিছু সে অনুভব করেছে নিজের বুকে। তা সত্ত্বেও কী কবল সে!

স্বাধীন হয়েছে দেশ। লছমন এসে মনে করিয়ে দিল। সে নিজে বলেছিল—ঠিক। এখন বেআইনি কায়দা চলবে না। সেই প্রথমবার যখন চুনাও হয়, ভদ্রলোকরা গ্রামে এসেছিল। তাদের ধরে সে তেওয়ারীকে বাধ্য করেছিল ঋণের কথা কাগজ-কলমে লিখতে। সুদে-আসলে তিন হাজার। তিন হাজার হোক, হোক।

তারপর থেকে ঋণের বোঝা কাঁধে আর মাথায় দাদার সংসার নিয়ে চলেছিল লছমনপ্রসাদ। দাদা দূরে সৈন্যদলের সঙ্গে। ছাড়বে না লছমনপ্রসাদ। হটবার মতো লোক নয় সে। তেওয়ারীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বরং চলবে। তেওয়ারীব ছেলে গোবখপুরের কলেজে পড়ে। একবেলা খেয়ে থেকে লছমন দাদার ছেলে রামসুভগকে গোরখপুরের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

তা হলেও লছমন ভালো করে নাই সেনাবিভাগে এসে।

হঠাৎ যেন কৌতুকের দিকটা চোখে পড়ল রামচলিত্তরের। তেওয়ারীই সেবার তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে ছিল। আর এবার পাঠিয়েছে লছমনপ্রসাদকে।

কিন্তু কৌতুক নয়, বরং অনুতাপ। তার মনের এই জাম-খেয়ে যাওয়ার ব্যাপারই। সকলেই বলেছে বিকার, কিন্তু হঠাৎ তা মনে কবতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বাবার রোগজীর্ণ মুখটাকেই মনে পড়ে। তারই ফলে সে এবং লছমনপ্রসাদ সেনাবিভাগে এসেছে।

কিন্তু আর সকলে কোথায়? রাত্রিতে যে ধোঁয়াটে ভাব ছিল এই সাদা অন্ধকার তার চাইতেও গভীর। তার এ পাশে তার সেকসনের দুয়ারকা সিং ও পাশে ল্যান্সনায়েক সুরযপ্রসাদের থাকার

কথা। হাতড়ে হাতড়ে সে একটা ভাঁজ হয়ে যাওয়া দেহ পেল। দুয়ারকা, হেই দুয়ারকা। জামার কলার ধরে সে টেনে দুললো দুয়ারকার মুখ। তার হাতের উপরে, কাঁধের উপরে, কোমরে চাপড়াতে শুরু করল রামচলিত্তর, দুয়ারকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে চিৎকার করল। ডুবন্ত মানুষের জলের উপরে ভেসে ওঠার ভঙ্গিতে খাবি খেতে খেতে চোখ মেলল দুযারকা। বামচলিত্তর বলল—উঠ, জোয়ান। রামচলিত্তরের ভয় হল খাদের আব সব মানুষও হয়তো দুয়াবকাব মতো জ্ঞান হারিযে ফেলেছে। আর এই শীতে জ্ঞান হারানোর অর্থ—। লছমন, লছমনপ্রসাদ? তার বুকের ভিতরটাই হিম হয়ে গেল। বাঁয়ের দিকে নিচের খাদটায় তার থাকার কথা। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলেমানুষ তো! উৎকণ্ঠায় রামচলিত্তর খাদ থেকে বেরনোর জন্য প্রস্তুত হল। কাল নিজের গলার মাফলারটা সে লছমনপ্রাসাদের গলায় জড়িয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু---

ভয়টা তার অমূলক। তার এদিকে সূরযপ্রসাদ দুহাত দিয়ে আগুন আড়াল করে সিগ্রেট টানছে। তাও ভালো। কিছু একটা করাই ভালো। সূরযপ্রসাদই তাকে খাদ থেকে বেরুতে বাধা দিয়েছে তা হলে। আর তা হলে শুধু চিন্তা নয়, সে লছমনের নামও উচ্চারণ করছিল।

সূরযপ্রসাদ বলল—ওদের খাদে লেপটেনেন্ট চন্দ্রাভানজি নিজে আছেন। ডিসিপ্লিন কড়া আছে। ঘুমাবে কেন?

তা হলেও লছমন খুবই ভুল করেছে এই যুদ্ধে এসে। কারণ এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক শয়তানী আছে এখানে। সূরযপ্রসাদ বলল--ভানজি কাবিল অফ্‌সার হ্যাঁয়, দাদাজি।

সম্বোধনটাই যথেষ্ট। রামচলিত্তরের মনে পড়ল। এ কয়েকদিনই কম্পানির অনেকে তাকে দাদাজি বলতে শুরু করেছে। ছোটভাই লছমনপ্রসাদের জন্য তাব দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়াই তার কারণ। খানিকটা সম্ভ্রম খানিকটা রসিকতায় মিশানো এ সম্বোধন।

সিগ্রেট ধরাল রামচলিত্তর দু হাতে বাতিব মতো আড়াল তৈরি করে। দুশমন আলো দেখবে তা উচিত নয়। ডিসিপ্লিন? মনে মনে হাসল রামচলিত্তব। ভগবান, এমন যুদ্ধ কখনও দেখেছো? একি শীতের সঙ্গে মানুষের দেহতাপেব যুদ্ধ? কুড়ি হাজার ফিট উপরে? কীসেব উপরে? কুড়ি হাজার বছরেব বরফের নাকি? রাইফেল ধরতে হাতের চামড়া উঠে যায়।

আর হাজার গজ দূরে দুশমন। চীনা হুনদেব ঘাঁটিতে যেখানে মর্টারের আড্ডা তার কিছু পেছনে অন্তত দুটো ওয়েপন ক্যারিয়ার দেখা দিয়েছিল কাল। একি দুশমনের অসতর্কতা যে তার যুদ্ধের প্রস্তুতি দূরবীনে ধরা পড়ে? বন্ধুর বেশে নিশ্চিন্ত করে ঠগ যখন হঠাৎ ঘুমন্ত পথিকের গলায় ফাঁস টানে তখন সে অকুতোভয় হতে পারে বটে। কিম্বা কাল দুপুরে তার মর্টারেব উত্তরে যখন এদিক থেকে একটা গোলাও ছোঁড়া হয়নি, তখন সেই কাঁটাওয়ালা সাপটা মনে করেছে ভাবতের এই জওয়ান কয়টি তার থাবায় ধরা বাচ্চা হরিণ। দুশমনের ওই ওয়েপন ক্যারিয়ারই প্রমাণ করে কত দীর্ঘদিনের পরিকল্পনায় কত দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত হয়েছে, নতুবা ওখানে রাস্তা সড়ক হয়?

কিন্তু কমাণ্ডার বলবন্ত শর্মাজি জানেন এই ঘাঁটির গুরুত্ব কতখানি। এই ঘাঁটি আর দুশমন যেখানে আছে তার মধ্যে পর্বতে যেন ভাঁজ পড়েছে। পঞ্চাশগজ চওড়া একটা উপত্যকা দুশমনের আড্ডার নিচে শুরু হয়ে এই ঘাঁটির ভিতর দিয়ে পিছনে বড় উপত্যকাটায় মিশেছে। এটাই 'লা', এটাই গিরিপথ। ভারতের প্রতিরক্ষা দুর্গের আর একটি দরওয়াজা।

তার প্রমাণ দেখো এই অদ্ভুত বিন্যাসে। পেল্টেন প্রতি এক লেপটেনেন্ট, এক সুবাদার। অস্ত্রের বদলে বুদ্ধিমান মানুষ, হিংস্রতাকে রুখতে মনোবল। বর্বরতাকে রুখতে নীতি।

কাল অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় বলবন্ত মেজরজি ধ্বসে যাওয়া ঘাঁটির পিছনে তার লেপটেনেন্টদের ডেকে নিয়েছিল। বলেছিল—দুশমনদের মর্টার আছে, ভারী পার্বত্য গান আছে। আমাদের নাই।

ওদের দেশ থেকে ঘাঁটিতে অস্ত্রবাহী যানবাহনের পথ আছে, অস্ত্র এবং সৈন্য আসবে। আমাদের কনভয় যেখানে থামে সেখান থেকে উঠে আসতে হয়। একদিন পায়ে হেঁটে।

দুসরা পেলেটুনের লেপনেটেন্ট ফাড়কব বলল—আমাদের মর্টার চাই, মর্টার। খবর যাক বেসে, এয়ার কভার চাই।

হেডকোয়ার্টার পেলেটুনের লেপ্‌টেনেন্ট চন্দ্রাভানজি বলল—হাঁ, হেভি মর্টার এবং জওয়ান!

সুবাদার গণপত বলল, জি সাব।

কিন্তু হো হো করে হেসে উঠল তিসবা পেলেটুনের লেপ্‌টেনেন্ট করমবাহাদুর রাণা। বলল সে—আমাদের ছ ছটা ব্রেন আছে।

চমকে উঠে সুবাদার আনোখেলাল বলল—জি, সাব জি।

পাহাড়ের গায়ে পাথর জড়ো করে ছটা মেসিনগানের পেছনে বসেছে ভারতের ত্রিশ জওয়ান আর তাদের তিন হাবিলদার, তিন সুবাদাব। ছয় ব্রেনে ছয় দুর্গ। উত্তর দেবে তারা মর্টারের। বুঝিয়ে দেবে তারা চীনা দুশমনকে, যদি আর এক পাও এগোতে সাহস হয় তাদের।

আর কোম্পানি কমান্ডাব বলবন্ত শর্মাজি? মেশিনগানেব পোস্ট আব ঘাঁটির খাদে আলেয়ার মতো চোরা টর্চ জ্বেলে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সারা বাত এক একটা মর্টারের গোলা ফাটতেই সেই আলোটাও নিবে গিয়েছে, আর জওয়ানবা হায় হায় কবে উঠেছে। কিন্তু এমন যুদ্ধও দেখে নি রামচলিত্তর, এমন কম্পানি কমান্ডারও নয়। পবপর দুটো গোলা এসে ঘাঁটিটার দেয়াল ধসিয়ে দিল। ঘাঁটির ভিতরে কারা শেষ আর্তনাদ করে উঠল। তারপর রামচলিত্তরের খাদেই আর একজন। বিস্মিত আকুল শেষ ভয়ের আর্তনাদ শুনে মনে হয় নতুন জওয়ান, ব্যথাব কাবণটা বুঝতে পারে নাই চোট লাগার সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক সেই সময়েই তীব্র চাপা গলায় অর্ডার দিয়েছিল কেউ মাথা নিচু করতে। কোন অসতর্ক জওয়ান হয়তো আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মাথা তুলে থাকবে। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ঝুপ করে খাদে নেমেছিল বলবন্তজি। বলল—পি লেও। কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলানো চাব চাব ওয়াটার বট্‌ল। ফুটন্ত রাম-মিশানো চা। খাদের পঁচিশ জনের গলায় সেই গরমটুকুর স্পর্শ দিয়ে বলবন্তজি আবার বেরিয়ে গেল। সারা রাত মর্টার চলল, আর সারা রাত সে কখনও বরফে হামা টেনে কখনও দাঁড়িয়ে খাদে খাদে জওয়ানদের চা খাইয়েছে। পয়লা পেলেটুন, দুসরা পেলেটুন, তিসরা পেলেটুন। না, এমন কমান্ডার দেখে নি রামচলিত্তর যদিও সে ফরাসী মাটিতে লড়াই করেছে! আর আরাকানেও।

প্রথম চোটেই মর্টারকে আর ওয়েপন ক্যারিয়ারকে ওয়াটার বটলে হারিয়েছে বলবন্তজি। সাবাস।

কিন্তু এমন অন্ধকারও কি এর আগে কেউ দেখেছে? সাদা অন্ধকার। সব যেন লোপ পেয়ে গিয়েছে সেই সাদায় এক ঠান্ডা ছাড়া। ঠান্ডা, জাড়, শীত। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কাতব একটা শব্দ বার হল রামচলিত্তরের মুখ থেকে। দুবার সে মার্কটাইম করল। তাবপর সে স্থির করল আবার সে ঘুমিয়ে পড়বে যদি কিছু না ভাবতে থাকে।

অদ্ভুত এই পাহারা। না, এর কিছু তুলনা নেই। কিন্তু সাদা দেখাচ্ছে কেন? তা হলে দিন হয়েছে। দিন, অথচ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না, ঘুমই আসছে তার। ঘুম না হোক তার মতোই কিছু। ক্লান্তি তো বলা যাবে না একে।

লছমনপ্রসাদ ভেবেছিল, হয়তো অযোধ্যা তেওয়ারী ভয় পাবে। কালো বেরেট পরা, শক্ত চওড়া লোহার তৈরি চোয়াল। লছমন যার নাকি সব চাইতে বড় সাইজের মিলিটারি প্যান্ট আর কামিজ লাগে, সে রুখে দাঁড়ালে সব লোকই ভয় পায়, কিন্তু কী আশ্চর্য, এক অযোধ্যা ছাড়া। অযোধ্যা ভয় পায় না। তারও শক্তি আছে। উকিল লাগাতে জানে সে। মাস চারেক হল লছমন এই কম্পানিতে এসেছে। দাদার সঙ্গে দেখা হতেই সে রামসুভগের চিঠি দেখিয়েছিল। ঋণ আদায়ের মামলা দায়ের করেছে তেওয়ারী। নিলাম করিয়ে নেবে।

কিন্তু কী লাভ হল? বল, লছমন?

কী বোঝে লছমন লড়াইয়ের? কী জানে সে দুশমনদের শয়তানীর? এই সাদা অন্ধকারের পর্দার পিছনে এখনই দুশমন কী শয়তানি ভাঁজছে কে জানে?

কথাটা মনেই হতেই রামচলিত্তর রাইফেলটাকে চেপে ধরল। সেই হিমের স্পর্শে হাতের তেলো যেন থেঁতলে গেলে। কিন্তু হাতের দিকে মন দেয়ার সময় হল না তার। অনেক বেশি একটা তীব্র শৈত্য সে বুকের মধ্যে অনুভব করল। এই সাদা পর্দার পিছন থেকে যদি চীনারা লাফিয়ে পড়ে খাদগুলোতে? লছমনপ্রসাদ হয়তো ভরসা করেছে এ চাকরিতে দাদা আছে। হায়, হায়। তার রাইফেলে যদি গুলি না ছোটে, যদি গুলি না ছোটে? গোটা কম্পানিটাই হারবে তার অযোগ্যতায়। হায় হায়।

দু দুবার হয়েছে। সেই ডানকার্কে সে জার্মানদের উপরে গুলি ছুঁড়তে পারল না। আর সেই সেদিন ঘরের কাছেই, ঘরের কাছেই।

কে কোন ভাষায় কথা বলবে তাই নিয়েই কাজিয়া। আর তার মূলে নাকি তাদের গোরখপুরি হিন্দীতে আর সকলকে কথা বলানোর হুকুম। মারহাব্বা। হয়তো তার দরকার আছে, যারা কাগজপত্র লিখবে তাদেব জন্য। যাদেব আগে থেকেই জানা আছে ভাষাটা, এ আইনে তাদের সুবিধা হবে। যাক সে কথা। ওটা কোন কাজের কানুন নয়। তার জেলার অনেক লোক দেশ স্বাধীন হওযার আগে থেকেই বঙ্গাল মুলুকে চাকবি কবছে, ব্যবসা কবছে—ভাষাব জন্য তাদের অসুবিধা হয় নাই। আর গোরখপুরের যে বাঙ্গালি ডাক্টার ভারি ভাবি অসুখ সারায় তার হিন্দী শুনলে এদেশের কুকুর বিড়ালও হেসে উঠবে, কিন্তু যম ভড়কে যায়। রোগীর বাপ-মা বুক ভবে দম নেয়। তার চাইতেও বড কথা সেই ফবাসী মাটিতে যখন জার্মানদের কামানের উত্তরে এদিকের একটা কামানও গর্জাল না, তখন সেই ভারতের জওয়ানদের মধ্যে জাঠ ছিল, শিখ ছিল, ডোগরা ছিল--কে কার ভাষা বোঝে? কিন্তু সেই খাদ যেন ভারতের মাটি হযে গিয়েছিল—তার সম্মান রাখার ভাব ছিল কম্পানি কমান্ডাব ঝুজর সিংজীর হাতে। কোন ভাষায় এসব কথা জওয়ানদের বোঝানো হযেছিল? সাহেব-কমান্ডারদের মতো পিস্তল ফেলে দিয়ে হাত তোলে নাই সে। ঝুজর সিংজী চিৎকার করেছিল, চা-র-জ। কোন দেশি ভাষা? আর সেই জার্মান অফিসার যার আর্তনাদ গোবখপুরি ভাষায় মাকে ডেকে কেঁদে ওঠার মতো? সেই ভাষা নিয়ে দাঙ্গা। আমস-অ্যা-রেডি-ফায়ার। কাকে? তাকিয়ে দেখেছিল রামচলিওর, ভদ্রলোকের ছেলেরা হাত তুলে তুলে কী বলে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু হুকুম হুকুমই। এক, দো, তিন, ট্রা ট্রা ট্রাবা রা। বামচলিত্তরও পজিশনে রাইফেল নিয়ে ঘোড়া টানতে গেল। বার-বার সে চেষ্টা করল কিন্তু একটা গুলিও বার হল না। রাইফেলের ঘোড়াটাই খুঁজে পেল না সে। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

কিন্তু ভাষাটাষা নাকি রাজনীতি! আর রাজনীতির সে কীই-বা বোঝে? সেই প্রথম বারের চুনাওয়ের সময়ে সে রাজনীতির মুখোমুখি হয়েছিল বটে। সাদা টুপি, সবুজ টুপি, লাল টুপি, লাল ঝণ্ডা। লছমনপ্রসাদ লাল ঝণ্ডাদের একদলকে চেপে ধরল। সকলেই বলছে, ঘিউ আর আটার লেখাজোখা থাকবে না। বিনা পয়সাতেও পাওয়া যাবে।

লছমনপ্রসাদ বলল, মাথা পিছু কত ঘি পাওয়া যাবে? সেটাই বলো খুলে।

—তা, অনেক।

—কত তাই বলো। নাছোড়বান্দা লছমনপ্রসাদ।

—একসের পাঁচপও। বললো লালঝণ্ডা।

মাটিতে থাপ্পড় দিয়ে লছমনপ্রসাদ সোৎসাহে দাদাকে বলল—উঠা লো ভাইয়া, পওভর জ্যায়দা মিলা সফেদ টোপিসে।

ঝণ্ডাওয়ালারা ভাবল আচ্ছা মুরখের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু ভোটটা দেবে।

তারা চলে যেতেই লছমন দাদাকে বলেছিল—গরমেই এরকম হয়েছে। বিলকুল পাগলা হো চুকা। সাদা টুপি, লাল টুপি, লালঝণ্ডা।

রামচলিত্তর জানে রাজনীতির সে কিছু বোঝে না। কিন্তু সে জানতো, বিশ্বাস করতো নেহেরু আছে রাজনীতির হুইল ধরে। সেই নেহেরু বলতেন—শান্তি, শান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সিপাহী রোগীর সেবা করবে, বন্যায় বিপন্নদের বাঁচাবে। দেশে দেশে যাবে জওয়ানরা শান্তিকে স্থায়ী করতে। এই আশ্বাসের জোর না পেলে সে কি সৈন্যদলেই থাকতে পারতো? এমন জওয়ানের জওয়ান সে, যার হাতের রাইফেল বারবার দুবার প্রয়োজনের সময়েই জাম হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ। নিশ্চিন্তই ছিল সে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঠান্ডা মাথায় না দাগলে অমন নিশান দাগা রপ্ত হয় না তার যেমন হয়েছে। আর সেই নেহেরু নাকি—কী সুন্দর হাসিমাখা মুখ; একটা ফটো আছে তার রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারসে—সেই নেহেরু নাকি বলেছে, হটাও হুনদের। তা হলেই বোঝ কত বড় দুশমন এই চীনা হুন।

আর ঠিক এখনই, যখন শয়তানরা হয়তো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে, যদি তার রাইফেল জাম হয়ে যায়? কী অযোগ্যতা! হো ভগোয়ান। আত্মগ্লানিতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ একি? কড় কড় করে উঠল সেই সফেদ অন্ধকারের দিগন্ত। চমকে উঠে খাদের নিচে মাথা নামাল জওয়ানরা।

আরে ও কী? লাউডস্পিকারে কেউ কিছু বলছে? তাইতো। রামচলিত্তর হেসে দুয়ারকাসিংকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কা ভইল্ বাবে? শুনৎ নাহি? দুয়ারকাও শুনতে পেয়েছে। লাউডস্পিকারে বিদেশি উচ্চারণে হিন্দীতে বলছে: যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ নাই, ভাই ভাই। তোমাদের সীমায় তোমরা থাকো আমাদের সীমায় আমরা থাকবো।

রামচলিত্তর সুরযপ্রসাদকে বলল—কা ভইল্ ভাইয়া?

ল্যান্সনায়েক সুরযপ্রসাদের গোঁফ দেখার মতো বড়ো। কুচি বরফে তা শাদা হয়ে উঠেছে। গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলল, উ লোগকো ডর লাগল্বা।

তাই হবে। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নাই। এ পাশে দুয়ারকা, ও পাশে সুরযপ্রসাদ। সুরযপ্রসাদের পরে একজনের কামিজের খানিকটা চোখে পড়ছে। তার বাইরে সমস্ত পৃথিবীটা সাদা। সুরযপ্রসাদের বাড়ি ভোজপুরে।

লাউডস্পিকারে আবার শোনা গেলে, ভাই ভাই, ভাই ভাই।

তাজ্জব।

দুয়ারকা বলল—চায় চাপাটি মিলি জি?

একেবারেই ছেলেমানুষ। লছমনপ্রসাদের মতো অনভিজ্ঞ।

রামচলিত্তর হাতের আড়ালে মুখ নিয়ে হাই তুলল। এই দ্বিতীয় রাত কাটল না ঘুমিয়ে পাহারা দিয়ে।

ঠিক এমন সময়েই পাঁচ সাতটা রাইফেল একসঙ্গে ট্রা ট্রা করে উঠল।

—আরে—আরে—

আরও রাইফেল, অনেক রাইফেল হুড়মুড় করে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগল। চমকে উঠে জওয়ানদের পেশিগুলো সব আবার ইস্পাতের মতো কঠিন হল।

দাঁতে দাঁত চেপে সুবাদার আনোখেলাল হাঁকল—টেনস্যান।

কারণ বলবন্ত শর্মাজি চিন্তা করছিল। রাত্রিতে তবু ধোঁয়াটে আলো ছিল। শেষরাত থেকে কুয়াশা ছিল। শেষ রাত থেকে কুয়াশা আর তুষারে যখন তিন হাতের বেশি নজর চলছে না তখন হাতড়ে

দেখা ভালো কারণ শুধু কানের উপরে নির্ভর করে থাকা যায় না। কী করে সে বুঝবে কখন মেশিনগুলো চালাতে হবে, কি করে সে নির্দেশ দেবে জওয়ানদের, কি করে জওয়ানরা বুঝবে কে বন্ধু, কে দুশমন। সুরয, তুমি প্রকাশ হও।

ফাড়কর—সে বলল দুসরা পেলেটুনের ঘাঁটিতে,—কালো অন্ধকারে রেকেনযটার করা নিয়ম।

সার।

এখন মার্চ করা ছাড়া কী উপায়, এই সফেদ অন্ধকারে?

সার।

কিন্তু বলল জওয়ানরা—আলো হোক, আলো হোক।

বলল ফাড়কর—এমন শয়তান দুশমন দেখিনি, এমন শয়তান।

জওযানরা বলল—কুত্তীকে বাচ্চো।

দুসরা পেলেটুনের খাদ থেকে ত্রিশ জওয়ান বার হল লেপ্‌টেনেন্ট ফাডকবের পিছনে সেই সাদা অন্ধকারে বুকে হেঁটে হাতড়ে হাতড়ে। একবাব শুধু বলবন্তজির হাতের তেলোয় একটু দীর্ঘক্ষণের জন্য তাব হাত বেখেছিল ফাডকর। তার হাসিটা একটু বা বিবর্ণ দেখাল। কারণ সে জানে, সে জানে—

জওয়ানদের খাদে খাদে খবর দিল বলবন্ত শর্মা, অপেক্ষা কবো, অপেক্ষা করো। ঠিক এমন সময়েই লাউডস্পিকারে দুশমনের গলা শোনা গেল। প্রথমে বিস্ময় পরে আতঙ্ক দেখা দিল বলবন্তের মনে। দু-এক মুহূর্তেই এই ধারণাটা তার মনে নিঃসংশয় হল—এই বন্ধুত্ব ঘোষণার আবরণেই তারা এগিয়ে আসবে। বলবন্তের চোয়াল কঠিন হল। ঠোঁট কামড়ে ধবল সে দাঁতে। শীতে ফাটা ঠোঁটে রক্ত বেরিয়ে এল। খবর দিল সে: অপেক্ষা করো অপেক্ষা কবো। আর—হে সুরয তুমি প্রকাশ হও। এই প্রার্থনা করল বলবন্ত শর্মা। আশ্চর্য এই অন্ধকার। এল আলমিনের বালিতে দাঁড়িয়ে কামানের গোলা আব বোমায তৈরি মধ্যরাত্রির মৃত্যুর অন্ধকার সে দেখেছে। কিন্তু এই সফেদ শয়তানি অন্ধকার? চীনাদেব শান্তি-প্রস্তাবের মতোই। হে সুরয, তুমি প্রকাশ হও, প্রকাশ হও। ওই সামনে ওখানে এখনই কি হবে কে জানে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল: তোমার সামনে যে চড়াও করবে সে ছাই হয়ে যাক।

এরকম সময়েই লাউডস্পিকারের ঘোষণাকে বিদীর্ণ করে একশোটা বাইফেল যেন গর্জে গর্জে উঠল। মাইন? মাইন? বলবন্তজি হায় হায় করে উঠল। ফাড়কর তো মানুষ। তা হলে, তা হলে? হাতড়ে হাতড়ে চলে ফাড়কর আবিষ্কার করেছে শয়তানকে। বলবন্তজি ঠিকই ধরতে পেরেছিল দুশমনের কৌশল। কিন্তু হে সুরয, তুমি প্রকাশ হও, নতুবা একটা গুলি এসে লাগুক আমার বুকে—এই প্রার্থনা করল বলবন্ত শর্মা। এক অন্ধ কমান্ডারের কোন দরকার নাই ভাবতের।

খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইফেলের শব্দে রামচলিত্তর চমকে উঠল। আনোখেলালের হাঁক শুনে রাইফেলকে শক্ত করে চেপে ধরল সে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ। কিন্তু দেখা যায় না। অদৃশ্য শত্রু। বাইরের অদৃশ্য শত্রু। আর তার মনে নিজের উপবে অনাস্থা। এই দুই চাপে যেন তার মনটাই উল্টেপাল্টে যাবে। তার মনে প্রবল একটা আলোড়ন হচ্ছে। রাইফেল জাম হয়ে যায় ঠিক কাজের সময়ে। আর এখন এই যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তা হয়? ধাক্কা হচ্ছে তার মনের মধ্যে। কিছু একটা উল্টেপাল্টে গেল সেখানে। আর তারই ফলে যেন পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পেল। আসলে ব্যাপারটা জাম খাওয়া। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। তাই নাকি? তা যদি হয় তবে তো ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সে নিজেই চালাতে পারে। আনন্দে চোখে যেন জল এসে গেলে রামচলিত্তরের। একবার সে ভুল করেছে সেই সেবার সুবাসবাবুর ডাকে সাড়া না দিয়ে। এবার? এ সুযোগ সে হারাবে না। এবার নেহেরুজির ডাকে সে সমস্ত মন

দিয়ে সাড়া দেবে। এমন ডাক রোজ আসে না। ভাবো, তার সেই হাসি হাসি মুখের কথা—যে শিশুদের সকলের চাচা। সেই বলেছে—হটাও হুন হটাও চীন। দুশমন তার কতবড় দুশমনি করলে তবে এমন লোকও রাগে ফেটে পড়ে। জর্মান দুশমন ছিল, কিন্তু এমন হীন ছিলনা তারা। চীনা, চীনা চীনা। সুতীব্র তিরস্কারের মতো উচ্চারণ করল নায়েক রামচলিত্তর। রুমাল বার করে সে রাইফেলের চোঙটা ঘষে ঘষে গরম করল।

সূবয, তুমি উঠে পড়ো। ওঠো, ওঠো। তোমাকে ষঠের দিন আমার মা ও স্ত্রী পুজো করে। তুমি ওঠো। শত্রুকে মুখোমুখি দেখতে দাও। ওখানে একটা যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মরিয়া ফ্রিগেট শতগুণে বেশি শক্তিশালী ব্যাটলশিপেব সঙ্গে যুদ্ধ করছে এমন বর্ণনা আছে। কিন্তু উত্তর অতলান্তিকেব কুয়াশা ঢাকা কালো রাত্রিতে সেই ম্যান অব ওয়ারের গায়ে ছোট একটা ফ্রিগেটের যদি ধাক্কা লাগে? লোহার চাদবে মোড়া ব্যাটলশিপের বুকও আতঙ্কে কেঁপে ওঠে না?

হঠাৎ উঠে পড়ল সূর্য। সে যেন ভারতের জওয়ানদের তেজ। আর সেই আলোয় দৃশ্যটা দেখা গেলে। সে দৃশ্য একবার দেখলে কাবো মৃত্যু হয় না।

বলবন্তর মুখে হাসি, কিন্তু এল আলমিনে পোড়খাওয়া এই যোদ্ধার চোখে জল এসে গেলে। দুশমনদের দল ফিবে যাচ্ছে। যারা এসেছিল তারাই ফিবছে না, অনেক দুশমন পড়েছে হাল্কা তুষারে ঢাকা সেই পাহাড়ে। ফিরছে তারা। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। একজন চৌকিদারের ভয়ে যেমন দশ দশজন চোর পালায়। দুসরা পেলেট্টন, সাবাস। দুসরা পেলেট্টন লড়াই শেখাচ্ছে চীনাদের। কিন্তু। ফাড়কর, ফেরো, ফেরো। স্থান কাল ভুলে বলবন্ত শর্মা চিৎকার কবে উঠল। ওকি করছে ফাড়কর? ঠিক তাই। এই স্বপ্নেব নায়ক হিসাবে বলবন্তজি নিজেকে কল্পনা কবেছে অনেকদিন। ভারতের জওয়ানরা খাদের দিকে ফিরছে ধাপে ধাপে আর ফাডকর একা রিয়ারগার্ড অ্যাকশ্যান নিচ্ছে এল এম জি তুলে। এক, দুই, তিন, সাত, নয়। নয়জন জওয়ান ফিবে আসছে আর ফাডকরের এক এল এম জি রুখে বেখেছে চীনাদেব। দেখো হিম্মৎ!

সেই মুহূর্তের জন্য সূর্য ভারতীয় সকালের পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাব্বাস ফাড়কব।

কিন্তু যারা পালাচ্ছিল তারা নয়। তাদের সে হিম্মত ছিল না। লুকিয়ে কেউ আঘাত করল তাকে। উপব থেকে মর্টারের গোলা।

যুদ্ধক্ষেত্র কাঁদার জায়গা নয়। বলবন্তজি দু হাতে বুক চাপড়াতে লাগল।

জওয়ানরা ফিরে এল ঘাঁটিতে। ত্রিশজন গিয়েছিল বরফঝরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অদৃশ্য মায়াবী শত্রুকে রুখতে। নজন ফিরেছে তারা। ফাডকর ফেরেনি। ফেরেনি ভারতের বিশজন জওয়ান। কিন্তু দুশ চীনার সেই মায়াবী দুশমনি মুখ তারা লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু আবাব আসবে হুন। এবার তারা প্রকাশ্যে আসবে। আসবে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে। অন্ধকাবের নিশ্চিন্ত সুযোগে যা তাবা পারেনি, এবাব তা দখল করতে আসবে ক্ষুধার্ত ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে। আর মানুষের দুর্ভাগ্য এই: আখেবি হিসাবে সে বিজয়ী হলেও অনেক খণ্ডযুদ্ধে শয়তানকে জয়লাভ করতে দেখা যায়।

দিনের আলো স্পষ্ট হতেই দুশমন মর্টার দাগতে শুরু করল। দুপুর দশটার আগে দুবার তারা এগোল দু ঝাঁকে। কিন্তু ভাবতের সেই চারটি মেশিনগানের পোস্টে চার হাবিলদার তার জওয়ানদের নিয়ে শক্ত পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। দুবার জওয়ানরা চেষ্টা করেছিল ফাড়কর আর তার সঙ্গীদের কাছে স্ট্রেচার নিয়ে এগোতে—দুবাব আটজন প্রাণ দিয়েছে। ফাড়কর পথের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল সেখানে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার গোলা পড়ছে—ওটাকে একটা দুর্গ মনে করেছে দুশমন।

কিন্তু দুপুর যখন শেষ হচ্ছে, ওরা এগিয়ে এল। ফাড়করের সেই দুর্গের কাছাকাছি এসে গেল

তারা। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামছে, পাহাড়ের ভাঁজ থেকে বেরোচ্ছে তিসরা পেলেটুনের পাশ কাটিয়ে পাঁচশো চীনারা একটি ঝাঁক। ছুটে আসছে তারা জোয়ারের মতো। প্রাণহীন বুদ্ধিহীন একটা নির্বোধ আগ্নেয় জড়তার স্রোতের মতো। এবার বোধ হয় সাহসের, সহিষ্ণুতার, বীর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বে।

প্রথম খাদেই লেপ্‌টেনেন্ট করম বাহাদুর রাণা হাঁকল—আর্মস অ্যা রেডি।

কিন্তু সুবাদার পীতমচাঁদ বলল, ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক।

খল খল করে হেসে উঠল করম বাহাদুর রাণা, কিঁউ, কভি দেখা নেহি ট্যাঙ্ক?

নায়েক গুলাব সিং বলল—সাব? সাব?

করম বাহাদুরের ঈষৎ বাঁকা চোখদুটোর দৃষ্টি তার কুকরির মতো ঝকমক কবে উঠল। হাঁকল সে, ফায়ার ফায়ার।

হোক ট্যাঙ্ক। হাঁকল সে, হর হর মহাদেও। লহড়ায়ে যা, লহড়ায়ে যা।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খাদেও লাফিয়ে উঠেছিল জওয়ানরা। তারাও দেখেছে ট্যাঙ্ক। সঙ্গীদের বন্ধুদের এই বিপদে তারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হুকুম এল: অপেক্ষা কবো, অপেক্ষা করো। দ্বিতীয় খাদে লেপটেনেন্ট চন্দ্রভান যেমন, তৃতীয় খাদে বলবন্তজিও তেমন। আবেগহীন নিরুত্তাপ কাঠিন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল পয়লা পেলেটুন। সঙ্গীন পবাও রাইফেলে।

এ যেন জাহাজডুবির পরে লাইফবোটে ভাসা। সঙ্গীকে ভেসে যেতে দেখেও চূড়ান্তভাবে বোঝাই কবা বোটে তাকে তুলে নিতে না পারাব অসহায়তা।

নায়েক রামচলিত্তর এই সময়ে আবার সেই পাগলের মতো কাজটা করে বসল। সুরয দেবতা তার প্রার্থনা শুনেছে। এখন সে সব দেখতে পাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা দায়িত্বভার এসে পড়ল যেন তার উপবে! সে নিজের মনকে দুবার ধাক্কা দিয়ে নিল। না, জাম ধরতে সে দেবে না। মনে কবো, সেই একবার সুযোগ হারিয়েছো যখন সুবাসবাবু ডেকেছিল। আর এই এবার ডাক দিয়েছে তারই দোসর নেহেরুজি। ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক। হায় ভগোয়ান! ট্যাঙ্ক যে! ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে চাই বাজুকা আব অ্যান্টিট্যাঙ্ক কামান। একি, একি ভগোয়ান, আবার জাম ধরছে তার মন? নিশ্চয়ই তার যা করা উচিত তা সে করছে না, আর সে জন্যই এই ট্যাঙ্ক আসতে পেরেছে। এখন? এখন? অথচ সে নাকি একজন ভারতীয় অপসর, এন. সি. ও! হঠাৎ সে প্রচণ্ড শব্দে ফুকরে উঠল: বলো বলো পণ্ডিত নেহেরু কি--। এক মুহূর্ত।

দ্বিতীয় মুহূর্তও পার হয়ে গেল। তারপর দুটি খাদেব পঞ্চাশজন জওয়ান আকাশকে স্তম্ভিত করে বজ্রের মতো গর্জন করে উঠল—জয়।

এক নম্বর খাদের পিছনে বাঁয়ে দু নম্বর খাদ, তার পিছনে ডাইনে তিন নম্বর পয়লা পেলেটুনের।

এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল বলবন্তজি। দুশমনের এই উত্তাল জোয়ারকে রুখতে পারা যায় শুধু কলিজার জোরে। শ্রদ্ধা ভালোবাসার স্নিগ্ধতা যাকে বজ্রের চাইতেও দৃঢ়তা দিয়েছে। দুটো খাদ থেকে পঞ্চাশজন জওয়ান ছুটে বেরোল। যেন তারা পাগল, কিম্বা তারা যেন সেই সব সত্যাগ্রহী যারা চাবুকে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে গেলেও লবণের হাঁড়ি ছাড়ে নি, কিম্বা ভাবত ছাড়ো বলে রাইফেলের গুলি নিয়েছিল বুক পেতে, অথবা সেই সব জওয়ান যারা কুববানির শপথ নিয়েছিল এক নেতার মতো নেতার ডাকে। চীনা হুনদের দুপাশ থেকে গর্জন করে উঠল তারা, ভারতমাতা কি—জয়।

যত সহজ ভেবেছিল দুশমন তত সহজ নয়।

আবার খাদে ফিরে এল জওয়ানরা। আর দুশমন যেন কোথায় তাদের ভুল হয়েছে তা ভাবতে ভাবতে ফিরে গেল। হাঁ, তাদের ট্যাঙ্ক সত্ত্বেও পাহাড়ের ভাঁজটায় তারা আড়াল নিচ্ছে।

বলবন্তজি আকাশের দিকে তাকাল। ফাডকর নেই, করমবাহাদুর নেই, চন্দ্রভান নেই। একশো পঞ্চাশজনের চল্লিশজন অবশিষ্ট আছে। অদ্ভুতভাবে শূন্য হয়ে গিয়েছে তার মন। আর সেই শূন্য মনে একটা কথা ঘুরছে, আহত জওয়ানরা পড়ে আছে। তাদের কিছু করতে পারছে না সে। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল সে যেন হেলিকপ্টারের খোঁজে। সে কি এই আহত জওয়ানদের সেবা করার জন্য দু হাত তুলে এগিয়ে যাবে? কী করবে সে এখন? কেউ কি বলে দিতে পারে এখন কী তার করা উচিত? সে এক-বার ভাবল, সে যদি জেনারেল হতো তা হলে একা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেযার অভ্যাস থাকত। এ অবস্থায় কি পিছিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে না? কী গুরুভার দায়িত্ব তার? দুশমনদের কাছে হার মানার দায়িত্ব।

নায়েক সুরযপ্রসাদ বলল—আমরা পিছিয়ে যাবো। প্রস্তুত হয়ে আসব। দুশমনকে শিখলাব কি করে লড়াই করতে হয়।

সুবাদার লালতাপ্রসাদ বলল— ওযাজিব, ওয়াজিব।

সুবাদার গণপত বলল —আমরা এক কদম পিছিয়ে যাব, সে শুধু দুশমনের উপরে লাফিয়ে পড়ার জোর আনতে।

কিন্তু বলবন্ত শর্মা আকাশের দিকে তাকাল। আশা করার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেনা, কিন্তু আশা করছে একটা হেলিকপ্টার অন্তত দেখা দেবে আকাশে। এই বিকেল, তারপরে সন্ধ্যা এবং রাত্রি—তারপর হয়তো একটা পরিবর্তন আসবে। আর এক কম্পানি জওয়ান উঠে আসবে, হযতো একটা দুটো পার্বত্য বন্দুক।

বলবন্তজি তার চল্লিশজনের সৈন্যবাহিনীকে শেষবারের মত যার যার জায়গা নিতে বলল। পাথরের আড়ালে আড়ালে বুকে হেঁটে জওযানরা তাদের ধ্বসে যাওয়া ঘাঁটির পিছনে সরে গেল। যেখানে দুটি খাদ আছে। সেই খাদদুটিই শেষ খাদ। তারপরই পরাজয়। ঘাঁটি আর পরাজয়ের মাঝখানে নিজেদের দাঁড় করাল জওয়ানরা।

এখন কর গুণে গুণে ঘণ্টার হিসাব করছে বলবন্তজি। কাল সকাল পর্যন্ত কঘণ্টা হয়? সূর্য হেলে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে শীতও নামছে। বলবন্তজি বলল—তোমরা খাবে না কিছু? চাপাটি বানাও। সিগ্রেট টানছো না কেন? এখনও লড়তে হবে। লড়তে হবে। আর যাই হোক, ঘাঁটি যদি কেউ ছাড়ে সে আমরা নই। বলো, এই কম্পানি কখনও হার মেনেছে? এমন কোন খবর জানো? হার মানার প্রথম আর শেষ নজির রাখব আমরা? এই অদ্ভুত প্রশ্ন করে নিজেই সে হেসে উঠল।

অপূর্ব একটা ভাব দেখা দিয়েছে নায়েক রামচলিত্তরের মনে। তাকে শান্তি বলা যায় না যদিও তা শান্ত, কারণ সেখানে একটা কঠোরতা আছে। তাকে ঔদাস্য বলা যায় না, যদিও তা উদ্বেগহীন, কারণ সেখানে যেন কিছু উদ্ঘাত হবে। কোন তুলনাতেই তার সে মনোভাবকে ধরা যায় না।

সুবাদার গণপত যখন আহত জওয়ানদের সরিয়ে আনা যাচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করল, নায়েক রামচলিত্তর নিঃশব্দে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরল।

সিপাহী লছমনপ্রসাদ একটু ভযই পেয়েছে। লছমনপ্রসাদ তার ছোট ভাইও তো বটে। তার বেয়োনেটটা বেঁকে গিযেছে। অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য সে মনে করেছিল বেয়োনেটটাকে নষ্ট করার জন্য কেউ তাকে তিরস্কার করবে। কিন্তু এটা ব্যারাক নয়। তার প্রমাণ লালতাপ্রসাদ নিজেই তাকে একটা বেযোনেট যোগাড় করে দিয়েছে। লছমনপ্রসাদ বলছিল যখন, রামচলিত্তরের মনে শুধু এই কথাটাই ফুটল—ওটা বোকামি। ট্যাঙ্কের গায়ে বেয়োনেট বেঁধে না তা যত জোরই তোমার গাযে থাক।

খাদ থেকে উঠে দাঁড়াল রামচলিত্তর ধীরে ধীরে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। হ্যাঁ, সঙ্গীদের মৃতদেহগুলো চোখে পড়ছে। পাঁচশো গজ দূরে করমবাহাদুরের খাদ। হাঁ, ওখানে অনেক মৃতদেহ।

নিজের ঠোঁটটাকে কামড়াতে লাগল সে।

কিন্তু এদিকে দেখো বড়ো একটা পাথর। বেশ একটু আড়ালও তৈরি করেছে। পাথরটায় পিঠ দিয়ে নিজেদের খাদের দিকে মুখ রেখে বসল সে। হাঁ, কিছু তো বটেই, সুনির্দিষ্টই সেই কিছুটা কিন্তু খানিকটা অলস উদ্দেশহীনতা দিয়ে সেই মূল্যবান কিছুর মুখ আবৃত। কী সেটা? সে মনের মধ্যে খুঁজল।

একবার সে ভাবল: সে যাই হোক এটা প্রমাণ হযে গিয়েছে যে প্রয়োজনের সময়ে তাব রাইফেল জাম খেয়ে যাবে না। ট্রিগারে আঙুলে এক করতে অসুবিধা হয় নাই তার। এটাই হওযা উচিত। সে যখন মনে প্রাণে স্থির করে ফেলেছে যে সে নেহেরুব ডাকে সাড়া দেবে, তখনও রোগ তাকে বাধা দেবে এমন হয় না। আর যখন সে সাড়া দিতে পেরেছে তখন আগেকার সে সব ঘটনাকে এখন বাদ দিলেও কোন ক্ষতি নাই।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। বরং সে মুখ ঘুরিয়ে বসল। যে দিকে দুশমন সে দিকেই মুখ ফিরাল সে। আর তখন চিন্তাটা আবার হালকা অলস মেঘের মতো ভেসে গেল। চূড়ার পাশে এমন অলস মেঘকে ভাসতে দেখা যায়। আর তেমন মেঘ সেই পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকেই উঠে আসে, কারণ পাহাড় নিজেও জানে না তার বুকের ভিতর কী হচ্ছে। রামচলিত্তরের মুখে সেই সাদামেঘের ছায়াও পড়ল হাসিব মতো হয়ে। লছমনপ্রসাদ বলেছে কথাটা। সামান্য অবসব পেযেছিল, কিন্তু না বলে পারে নি: চন্দ্রভানজি ছিলেন ব্যারিস্টারেব ছেলে, ব্যারিস্টারের পোতা। তিনি বলেছেন, যে মাটিতে চীনা দাঁড়িয়ে আছে তাতে তাদেব হক নাই। তেওয়াবিব মতোই শয়তানি ওদের। লছমনপ্রসাদ ভেবেছে এই দুশমনের ব্যাপারেও রামচলিত্তর সহনশীলতার বাড়াবাড়ি কববে? তাই মনে করিয়ে দিয়েছে নাকি এখানে দুশমন আইনের প্যাঁচ লাগাবে? তেওযারি যেমন ঋণ আদায়েব মামলা রুজু করেছে।

হ্যাঁ, লছমনপ্রসাদের ওটা অনভিজ্ঞতার ফল। কিছুটা বোকামিও বটে। নতুবা সে নিজে কেন আসবে সৈন্যদলে নাম লেখাতে? না, সহিষ্ণুতা নয়, এ কথাটা যেন ফুঁপিয়ে উঠল তাব মনে। কোন কোন বোকামি আছে যা সব সেরা বাহাদুরির চাইতেও বাহাদুরি। হাঁ, হাঁ, করমবাহাদুর রাণাকে বাহাদুর ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। ট্যাঙ্কের হ্যাচওয়েব ভিতরে সে গ্রেনেড মেরেছে। সাবাস সাবাস।

হঠাৎ তার বুকের ভিতরে, যা থেকে এই অলস চিন্তাগুলো উঠে আসছে, কিছু একটা যেন নড়ে উঠল, যেন রক্ত ছলকে উঠল।

প্রায় দু মিনিট ধীরে কিছু যেন তার লক্ষ্যে আসছে। ডাইনের পাহাড়ের উপবে একটা মর্টাব বসাচ্ছে নাকি ওরা। বসাচ্ছে নয়, বসিয়েছে। তার পিছনে নড়ছে কিছু। ওটা একটা দুশমন অফসরই হবে।

রামচলিত্তব তার আতসচোঙাটা বার করল। তার রাইফেলের উপরে এই চোঙাটাকে বসানোর মতো একটা খাঁজ আছে। নিশানা দাগতে সুবিধা হয়।

ছোট টেলিস্কোপটা সে পরাল রাইফেলের মাথায়। যেখানে ওরা মর্টারটা বসিয়েছে সে জায়গাটাকে আটশোগজেব চাইতে বেশি দূর মনে হচ্ছে না। রাইফেলটাকে পাহাড়ের খাঁজে বসাল রামচলিত্তর।

তার বুকের ভিতরে কিছু একটা ধাক্কা দিচ্ছে। ঠোঁটটাকে সে এমন করে কামড়াল যেন রক্ত দেখা দেবে। কিন্তু আটশো গজ নয়? সে ছশো সাতশো গজ পর্যন্ত বুল্‌স্ আই ঠিকই বিধঁতে পারে।

শব্দটা হতেই রামচলিত্তর নিজেই চমকে উঠল। তার রাইফেলটা ছুটে গিয়েছে। ট্রিগারটা টেনেছে সে। তার রাইফেলটা ছুটে গিয়েছে। ট্রিগারটা টেনেছে সে তা হলে। আর, আর বিধেঁছে, বিধেঁছে। মর্টারের পিছনে দুশমন পাক খেয়ে পড়ে গেল। একটু যেন অবাক হয়েছে দুশমন, তাই নয়?

চীনা, চীনা, চীনা। থুঃ থুঃ থুঃ করে থুথু ফেলল রামচলিত্তর। হাঁ, করমবাহাদুর, চন্দ্রভানজি কাবিল অফসর থে। লছমনপ্রসাদই বলেছে, করমবাহাদুর ট্যাঙ্কের গা বেয়ে উঠে গ্রেনেড ফেলেছিল হ্যাচওয়ের জোড়ের মুখে।

তার আতসচোঙে ধরা পড়ছে মর্টাবের কাছে আর একজন এগোচ্ছে। ঘোরাচ্ছে মর্টারের নলটাকে। নিশান করে মর্টার দাগবে? আটশো গজের উপরেই হবে? তা হোক। গুরুর নাম করে মনে মনে কান মলল রামচলিত্তর। তার পর আবাব ট্রিগার চাপল সে। খলখল করে হেসে উঠল—পড়েছে পড়েছে। আর একটা চীনা পড়েছে।

হঠাৎ দু চোখ ভরে জল এসে গেল রামচলিত্তরের। আর এতক্ষণে মনের সেই অলসভাবটা কেটে গেল। পাথর হয়ে যাওয়া শোক, নিরুপায় ক্রোধ যেন ভাষা পেলো। শালে চীনি। রাইফেলটাকে একটু উঁচু করল রামচলিত্তর। বহুদূবে ছায়ার মতো সাঁজোয়া গাড়ি একটা এগোচ্ছে দেখো। নামল একজন গাড়ির দরজা খুলে। গর্দান আর কন্ধা চোখে পড়ছে। হা হা করে হেসে উঠল সে দুরন্ত উল্লাসে। তাবপর ঠোঁট কামড়ে ধরে পাথর হয়ে গেল আবার। এক দো তিন, মনে মনে বলল রামচলিত্তর, ট্রিগারটাকেও টানল। গিরা, গিরা, চীনা গিরা। জায়গা থেকে একটু সরে গেল সে। হ্যাঁ, তাই বলেছে তার নিশানদাগার গুরু জমাদার খুরশেদ খান। খলখল করে হেসে উঠল।

এমন সময়ে লালতাপ্রসাদ বুকে হেঁটে তার পাশে এসে বসল। তখন রামচলিত্তরের মনে হল কাজটা সে ভালো করে নাই। যুদ্ধক্ষেত্র নিজের ঘৃণা, বাগ বা বাহাদুরি দেখানোব জায়গা নয়। মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ দাঁড় করাতে চেষ্টা করল সে। খুবই রাগ হয়েছিল তার। তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভিতরে কিছু একটা ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছিল। এরকম কিছু করতে না পারলে পাথরে মাথা ঠুকতে হত তাকে।

লালতাপ্রসাদ বলল, লড়াই করো, লড়াই কবো। কমান্ডাবজি সাবাস বলেছেন। হাসতে গিয়ে রামচলিত্তর বলল—হে সুবাদাবজি, হে—

এখন বিকেল হচ্ছে। ধ্বসে যাওযা ঘাঁটিব কিছু পিছনে চল্লিশজন ভারতীয় জওয়ান শেষ খাদে যেখানে দাঁড়িয়েছে, সারাদিনের প্রচণ্ড শীত এখন সেখানে বরফের শীতলতা নিয়ে নামবে। বলবন্তজি আবার আকাশের দিকে তাকাল। ঘড়ি দেখল। কঘণ্টা আর কঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, তাই সে ভাবছে এখন। সে একবার ভাবল সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারেই খাদ থেকে বেরিয়ে পিছনে সরে যাওয়া যায়। এই চল্লিশটা প্রাণের দায়িত্ব সে আর বইতে পারছে না। পিছিয়ে যাওয়াই ঠিক নয়? মেশিনগানটার ওপর দিয়ে সে সামনের দিকে চাইল। শত্রুরা অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেন? আন্দাজ হয় সামনের মর্টারের কাছে চার-পাঁচশো অপেক্ষা করছে। ঘড়ি দেখল বলবন্তজি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার। আকাশের দিকে তাকাল সে। সেই দারুণ শীতেই যেন শিউরে উঠল একবার। হঠাৎ তার মনে পড়ল তার নিজের গ্রামেই গত শীতে একটা শিক্ষক-কলেজ হয়েছে। সেটা না হলে তার বদলে একটা দুটো হেলিকপ্টার হতে পারত। বাইনকুলারটা চোখে তুলল আবার সে। স্বগতোক্তির মতো বলল—ক্যা কিয়া যায়।

তার পিছনে লছমনপ্রসাদ চমকে উঠে বলল—জি, সাব?

বলবন্তজি কথাটা নিজেকেই বলেছিল। অনুচ্চারিত অংশটুকু এই ছিল—পিছনে হঠাৎ যখন চলতে পারো না, তখন চল্লিশজন দিয়েই চারশোকে রুখতে হবে। কিন্তু চার হাজার যদি হয়? কী করা যাবে?

লছমনপ্রসাদ তার বেয়োনেটটাকে আর একবার পরীক্ষা করল। হ্যাঁ, সে বলবন্তজির ঠিক পিছনেই থাকবে। বলবন্তজির সামনে মেশিনগান আর পিছনে সে, মৃত্যু তাঁকে ছুঁতে পারবে না। সে ভুলই করেছে, সেই গোলমালের সময়ে করমবাহাদুরজির পিছনে সে থাকলে দুশমন সুবিধা পেতো না।

মনকে এই আশুব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চয় করে সে চিন্তার সময় পেল। সে ভাবল, রামসুভগকে বলতে হবে দেশে ফিরে এই দুশমনদের কথা। এই ভয় যখন কাটিয়ে উঠেছি তেওয়ারীকেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চীনাদের অনেক শক্তি আছে তা হলেও আমরা মাটি ছাড়ছিনা। তেওয়ারিরও অনেক শক্তি আছে—তাকেও মাটি ছাড়বো না। হাঁ, লড়াই চলবে। সে নিজে না থাকলেও। রামসুভগ, তু চালিয়ে যাবি—তেওয়ারী আর তেওয়ারীর উকিলদের সঙ্গে। তেওয়ারী আর তার ছেলের সঙ্গে। শালার বেটা শালা।

দিনের শেষ আলো নিভে আসছে পাহাড়ের গায়ে। থু থু করে হাতে থুথু ফেলে, হাতদুটো ঘষে রাইফেল ধরবার জোর ফিরিয়ে আনল হাতে লছমনপ্রসাদ। বৃথাই সে আখড়ার মাটি গায়ে মেখেছে, যদি এই চীনা আর তার দোসর সেই তেওয়ারী তার জমি কেড়ে নেয়।

আক্রমণটা এল সন্ধ্যায় ঠিক আগে। দূরের মানুষ তখন অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। চারশো, পাঁচশো, হাজাব চীনা ছুটে আসছে তাদের সাব মেশিনগান আর অটোমেটিকের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

বাঁয়ের খাদ থেকে সুবাদার লালতাপ্রসাদ বলল—সাব? সাব? সে কি ভয় পেয়েছে?

আরও কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে তরঙ্গটা। সুবাদাব লালতাপ্রসাদ উৎকর্ণ হয়ে উঠল হুকুমের জন্য। দুশো গজ, দুশো গজের মধ্যে এসে গিয়েছে দুশমন।

আশ্চর্য! কোন হুকুম নেই। সুবাদাব লালতাপ্রসাদ ভাবল– এবার তাহলে আমরা ধবা দিচ্ছি!

হঠাৎ মেশিনগানটা গর্জে উঠল বলবন্তজির খাদে। লালতাপ্রসাদ ক্রুদ্ধ চাপা গলায় তার খাদকেও হুকুম দিল, ফায়ার!

আধঘণ্টা ধবে চেষ্টা করল দুশমন এই শেষ খাদদুটোকে দখল কবতে। আর আধঘণ্টা ধরে ভারতের সম্মান আব দুশমনের মাঝখানে মৃত্যুর প্রাচীর তৈরি করল জওয়ানবা। হায়! দুশমনের কি শেষ নেই, শেস নেই? খাদে এসে পড়ছে ওদের গ্রেনেড। খাদ থেকে লাফিয়ে উঠেছে জওয়ানরা, বলবন্তজির পাশে ছুটে যাবাব চেষ্টা কবছে। হ্যাঁ, এখানেই দাঁড়াবে তারা শেষবারের মতো। দশজন আসতে পেরেছে। ঘাঁটির ভাঙা দেওযালেব পাশে এখানেই তারা শেষবারের মতো দাঁড়াবে। বলবন্তজি তাদের নেতা, ভারতের প্রতীক।

দুশমনদের একজন অফিসরই বোধ হয়। তাব হাতের পিস্তলেই বলবন্তজি লুটিয়ে পড়ল। শেষবারের মতো হুকুম দিল কর্ম্পানিকে--কভার কভার। আর তাকে পড়তে দেখে ফুঁপিয়ে উঠল লছমন, অদ্ভুত একটা আর্তনাদ ফুটে বেরুল তার মুখে। স্থানকাল ভুলে গেল সে। দুশমন, দুশমন, আখেরি দুশমন তার। ছাড়বে না সে, ছাড়বে না প্রাণ গেলেও। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল বলবন্তজিকে পিছন দিকে বাঁচাবে। দুশমনেব উপরে লাফিয়ে পড়ে দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধবল লছমনপ্রসাদ। কে একজন গুলি করল। লছমনপ্রসাদ শূন্য দেখতে লাগল, শূন্য একটা খাদ বেযে যেন সে পড়ে যাচ্ছে। বিশাল বলবান দেহের শেষশক্তি দিয়ে কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরল।

পাহাড়ের ঢালু বেয়ে লছমনপ্রসাদের গুরুভার দেহের সঙ্গে দুশমন অফিসারের অর্ধচেতন দেহটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে চলে গেল।

তখন রাত হয়েছে। ঘাঁটিটা দখলে গিয়েছে দুশমনের। ভারতের পতাকা নামিয়ে ফেলেছে তারা। জওয়ানদের কম্পানিটা নিঃশেষ হয়েছে, পিছু হটে নি। তাদের দৃঢ়তায় ভগবান বিস্মিত হয়েছেন।

আজও বরফ পড়বে। হু হু করে সব উত্তাপ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই অন্ধকার যেন সূর্য নিবে যাওয়ার পরের অন্ধকার। দুশমন আগুন জ্বালছে। অনেকটা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে পাহারা দিচ্ছে তাদের সান্ত্রীরা। ওদিকে তাদের রান্নার যোগাড় হচ্ছে।

ঘাঁটির নিচেই, পঞ্চাশ গজের মধ্যে পাহাড়ের ঢালুতে অন্ধকার। এই ঢালু জায়গাটাতেই খাদ

কেটে কাল ভারতীয় জওয়ানদেব রান্নার আগুন জ্বালানো হয়েছিল। খাদটার ধারে রান্নার বাসনগুলো ছড়ানো। তিনজন সান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে এদিকে। ঢালুটার কাছাকাছি পর্যন্ত আসছে এক একবার। দু একটা অলস রাইফেলের গুলিও এসে পড়ছে সেখানে।

সেই রান্নাব খাদে নায়েক বামচলিওর স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। ছয়জন জওয়ান সেই প্রবল শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই খাদে আশ্রয় নিয়েছে। রামচলিওব একেবারে বোকা হয়ে গিয়েছে যেন। তার মনে পড়ল বলবন্তজি চিৎকার কবে বলেছিল—কভার। রামচলিত্তর যেন অর্ডারটা আবার শুনতে পেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু কবল। রামচলিত্তর ভাবল: কেউ নেই, সে ছাড়া আর কেউ নেই যে জওয়ানদেব হুকুম দিতে পাবে। সেই যা নায়েক—দু ফিতা আছে। কিন্তু কভার তো নেয়া হল, তাবপব? এই রান্নাব খাদের পরে বোধ হয় ঘাঁটির সীমাও শেষ। তা হলে?

ব্যাপারটা ঘটে গেল।

দুশমন প্রহরী একবার খাদেব কাছে এসে ভয়চকিত হয়ে ফিবে গেল। ঘাঁটিতে আগুনেব কাছে যাবা ছিল তাদের কিছু বলল। প্রায় পঞ্চাশজন দুশমন রাইফেল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল।

নায়েক রামচলিত্তরের পাশে ছিল দোয়ারকা সিং। সে বলল ফিসফিস কবে, নায়েকজি, ক্যা কিয়া যায়?

নায়েক রামচলিত্তর ভাবল, তাই তো। এখন তো আর কেউ অর্ডাব দেবে না, সে যদি না দেয়। তা হলে খাদ থেকে অন্ধকাবে গা ঢাকা দেবে তারা, যে যেদিকে পাবে? যা করতে হবে এখনই করা দবকাব। চীনারা এগোচ্ছে, সন্তর্পণে কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে এগোচ্ছে। রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ছে তারা অন্ধকারে।

এইবাব হার হল, ভাবল জওযানরা। যেন এতক্ষণ তাদের হাব হয নাই। হায, হায়, যদি বলবন্তজি থাকত। গুটিসুটি বরং বসল তারা। রাইফেলের নলগুলো তাবা বাড়িয়ে ধরল খাদের উপবে।

নায়েক রামচলিত্তর ভাবল, এইবার এতক্ষণে ভারতের মান গেল। বলবন্তজি, চন্দ্রভান, করমবাহাদুর নাই, সুবাদার গণপত, লছমনপ্রসাদও নাই। ওদিকে দুশমন এগিয়ে আসছে সতর্ক পা ফেলে ফেলে, পঞ্চাশজন দুশমন। চীনা, চীনা, ঠোঁট কামড়াতে লাগল রামচলিত্তর।

বামচলিত্তব ভাবল আবার, কী অদ্ভুত এই কম্পানি। শেষ পর্যন্ত এক নায়েকই কমান্ডার। তিন পেলেটুনেব কুড়ানো ছয় জওয়ান। কিন্তু আব পনেব গজও নাই। অত্যন্ত ক্রোধে বাঘেব চোখ যখন আগুনের মতো জ্বলতে থাকে, তখন তাব উন্মুক্ত ব্যাদান বজ্রনাদ গর্জনের ভঙ্গিতে প্রসারিত থাকে, কিন্তু চাপা একটা গরগর শব্দই শুধু শোনা যায়। চীনা, দুশমন, দুশমন, চীনা, চীনা। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে গবগব করতে লাগল এই ঘৃণ্য, জঘন্য নামটা বামচলিত্তরের গলায়।

না, বামচলিত্তর এমন যুদ্ধ আব কখনো দেখে নাই। ফ্রান্সেব সেই যুদ্ধও নয়। এমন এক কম্পানি যার কমান্ডার একজন নায়েক। কিন্তু পনের গজও নাই। ঝুজব সিং তবুও অফিসার ছিলেন। তা হলে এতক্ষণে কি ঘাঁটি ছেড়ে দিতে হবে দুশমনকে? তবে বলবন্তজি কভার নিতে হুকুম দিলেন কেন?

হঠাৎ বামচলিত্তর তার রাইফেল ধরে লাফিয়ে দাঁড়াল। সেই অন্ধকারের বিভীষিকাকে খানখান করে কম্পানির শেষ কমান্ডারের বজ্রগর্জন শোনা গেল: চা—ব—জ।

আঁ আঁ আঁ--ছয়জন ভারতের জওয়ান লাফিয়ে পড়ল দুশমনের বুকে। এই সেই বেয়োনেট চার্জ যার ভয়ালস্মৃতি ভাবতের জওয়ানদেব দুশমনবা কোনদিনই ভুলতে পারে না। চা—র—জ। চীনাদের অগ্রগামী দলকে ছিন্নভিন্ন করে আবার তারা এগোচ্ছে। লড়ছে, আবার লড়ছে তারা।

সংবাদটা গ্রামে আনল দোযারকা, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দু দিনের মধ্যে। বেল স্টেশন

থেকে তার নিজের গ্রামে যেতে রামচলিত্তরেব গ্রাম পার হয়ে যেতে হয়। সিপাহী দোয়ারকা সিং একমাস হাসপাতালে থেকে দুমাসের ছুটিতে গ্রামে যাচ্ছে। ছুটি থেকে ফিরে আবার তার স্বাস্থ্য পবীক্ষা হবে। তারপর সে আবার যাবে ঘাঁটিতে। তাদের কম্পানিটাতে আবার লোক নেয়া হচ্ছে। হাঁ. যাবে সে।

দোয়ারকা বামচলিত্তরের ঠিক পাশেই ছিল যখন নায়েকজি সেই ভয়াবহ গর্জন করে তার ছজনের কম্পানি নিয়ে দুশমনের উপরে লাফিয়ে পড়েছিল। বুঝিয়ে দিয়েছিল ঘাঁটি ছাড়ে নাই তখনও ভাবতের পাহারাদাররা, হুকুম মানতে কভাব নিয়েছিল শুধু। আর সেই পাঁচজনেব—পাঁচ বাঘের, (দোয়ারকা নিজেকে হিসাব থেকে বাদ দেয়, কাবণ সে মনে কবে রামচলিত্তর বা তাব আর চার সঙ্গীব মতো বীর শুধু স্বর্গেই আছে। পাঁচ পাঁচ জন চীনাকে বেয়োনেটে ঘায়েল করলেও সে নিজে বামচলিত্তরের জুতো সাফ করাব বেশি যোগ্যতা রাখে না।) হাঁ, সেই পাঁচ বাঘের থাবাব সেই পঞ্চাশ চীনাব বিশজন মাটিতে শুয়েছিল।

অনেক দৃশ্যই দোয়ারকাব মনে গেঁথে আছে। ফাড়করজির সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ভঙ্গী, কবমবাহাদুরজির সেই ট্যাঙ্ক দখল করা, বলবন্তজির পাথরের মতো হিমালয়েব মতো দৃঢ়তা, কিছুই ভোলার নয়। কিন্তু বিশেষ করে দু তিনটে ঘটনা তাব বোগশয্যায় বাব বাব মনে এসেছে। লছমনপ্রসাদ দুশমন অফিসারটিকে শুধু দু হাতেব কব্জিব জোবে গলা টিপে মেবে ফেলেছিল। তিসরা প্লেটুনের সুবাদাব গণপত তাব দশজনের দল নিয়ে দুশো দুশমনেব দেয়াল ভেঙে কী অমিতবিক্রমে বলবন্তজিকে বক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। আব বামচলিত্তবজি—চোখে জল এসে যায় দোয়ারকার— হাঁ, ও শেব থে। এই গ্রামে সে এই কথাই বলবে। সুবাদাব গণপত. নায়েক রামচলিত্তর আর সিপাহী লছমনপ্রসাদ এই জেলাব মাটিকেই সোনাব চাইতে মূল্যবান করেছে।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

দোয়াবকা গ্রামেব মাঝখান দিয়ে চলেছে। তার মাথাব টুপিটাকে সে কিছুক্ষণ আগে খুলে নিয়ে পকেটে পুবেছে। ডান হাতটা এখনও গলাব সঙ্গে বাঁধা। কপালেব পাশে একটা অ্যাডেসিব পট্টি। পথে সে নায়েক বামচলিত্তবেব বাড়িব কথা জিজ্ঞাসা কবেছিল, তখন থেকে আট নয় জন নানা বয়সেব গ্রামবাসী তার পিছনে হাঁটছে। গ্রামবাসীবা জানে নায়েক বামচলিত্তব আর তাব ভাই যুদ্ধে গিয়েছে। তারা গত দুমাসে শুনেছে যুদ্ধেব অনেক খবব। যাব যতটুকু ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সরকাবেব হাতে। দুশমন চীনাকে দেখে নাই তারা কিন্তু তারাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে অন্তবে অন্তরে।

ভিড় আরও ভিড়কে আকর্ষণ করে। দোয়ারকা যখন বামচলিত্তরেব বাড়িব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে, আব তার পিছনে প্রায় একশোজন গ্রামবাসীর একটা জনতা। নাবী, বৃদ্ধ, যুবক এমন কি শিশুরাও আছে।

দোয়াবকা বলল, এই কি বাড়ি?

জনতাও যেন উত্তব দিতে পারল না। এটাই বাড়ি ছিল বটে রামচলিত্তর আর লছমনপ্রসাদের। জনতা বিস্ময় বোধ করল—এই জানা ব্যাপারটাই যে হঠাৎ এমন একটা প্রহেলিকাব মতো বোধ হতে পারে তা কি তারা জানতো? হাঁ, এটা নায়েক বামচলিত্তবের বাড়ি যেখানে ছিল, সেই জমিই বটে, কিন্তু দুমাস হল অযোধ্যা তেওয়াবীর একটা গুদাম উঠছে এদিকে এখানে। গুদামের পাশে গম ভাঙানো একটা কলও বসবে। কল এসে গিয়েছে, দেখছো না? গ্রামবাসীরা এতদিন অযোধ্যার হাতফের অনেক জমির ঘটনাব মতো মনে করেছিল এ ঘটনাটাকেও। সহিষ্ণু কৃষক তারা, মেনে নেয়াই তাদের রীতি। আর এ বিষয়ে তো আদালতের হুকুম আছে। কিন্তু এখন যেন দোযারকার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মনে হচ্ছে ব্যাপারটার আইনের ডিক্রি থাকলেও কোথায় কিছু গোলমাল আছে বড় রকমের।

কিন্তু দাঁড়াও, কী বলে শোন এই সিপাহী। দেখো, ওর হাত এখনও গলায় বাঁধা। হয়তো চীনাকে দেখে এসেছে, লড়ে এসেছে তাদের সঙ্গে। একশত জনের নির্বাক দৃষ্টিতে, উচ্ছ্বসিত সাব্বাস শব্দে সেই সান্ধ্য অন্ধকারের দিগ্‌মণ্ডল থৈথৈ করছে দোয়ারকাকে ঘিরে।

দোয়ারকা বলল—মা কোথায়? বামচলিত্তরের গর্ভধারিণী?

ভিড়ের প্রান্তে দেখা গেল এক শীর্ণা বৃদ্ধাকে। তার পিছনে ময়লা শাড়িতে মুখ ঢাকা এক গ্রাম্য বধূ। আর তার পাশে সারা দিনের চাযের ধুলায় যাব মুখ ঢাকা আঠারো উনিশ বছরের এমন এক গ্রাম্য তরুণকে দেখা গেল।

দোয়ারকা আবার প্রশ্ন করল—তোমরা কি এখনও নায়েক রামচলিত্তরের আর লছমনপ্রসাদের গর্ভধারিণীকে চেনো না? অবাক করলে আমাকে।

নতুন একটি গলার স্বরে জনতা ফিরে তাকাল এবং তাদের অনেকদিনের অভ্যাস মতো আশ্বস্ত হল। হাঁ, অযোধ্যা তেওয়ারী এসে গিয়েছে। সেই বলল—আরে আগে বড় বুড়্টী।

বৃদ্ধা এক পা অগ্রসব হল। কিন্তু কেউ কি বুঝতে পারছে না তার পা দুখানা কেমন অবশ হয়ে আসছে? কেউ কি বুঝতে পারছে ময়লা শাড়িতে মুখঢাকা, বৃদ্ধার আড়ালে দাঁড়ানো, গ্রামবধূটির দৃষ্টি ইতিমধ্যে অশ্রুতে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফোঁপানি ঢাকতে পাবছে না সে আর?

বৃদ্ধা শুধু বলল—বেটা—

আর তাই শুনে সিপাহী দোয়াবকা সিং বলল—মাযী, আপকে দো বেটে শের থে। নেহি নেহি, রামচন্দ্রজির অবতার ছিলেন তাঁরা।

অতীত কাল, অতীত কাল। তবে তারা নেই? একটা গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল তাবা। পাথর হয়ে গেল রামচলিত্তরের জননী। অশ্রুধাবায় অন্ধ সেই গ্রামবধূ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল। রামসুভগ হাত বাড়িযে ধবল তাকে।

আর দোযাবকা তখন বর্ণনা কবল সেই অকুতোভয় লছমনপ্রসাদের কথা যে চীনা অফিসারকে শুধু দুহাতে গলা টিপে নিধন করেছিল। বর্ণনা করল কম্পানির সেই শেষ কমান্ডার নায়েক বামচলিত্তরের কথা। স্তব্ধ জনতা সে বর্ণনার উত্তাপে দিশেহাবা হয়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, জয়—জয়।

একমুখ হাসি হেসে অযোধ্যা তেওয়ারী বলল— তা তো হবেই, হতেই হবে। বিলকুল! এই গ্রামের মাটির গুণ আছে। আমবা কি কম করেছি? দু হাজার কম পান টাকা তুলে দিয়েছি আমরা এই গ্রাম থেকে।

জনতার মনে তখন দোয়ারকার বর্ণনা আগুনের মতো জ্বলছে, যে আগুন অশ্রুব মতো তবলও। যখন দোয়ারকা বলল, সেই দারুণ শীতে তারা ছাইয়ের খাদে কীভাবে অপেক্ষা করেছিল, দুশমন এগিযে আসতে কি করে সেই ছয়জন ভারতীয় জওয়ান নায়েক রামচলিত্তরের শেষ হুকুম 'চারজ' শুনে বেয়োনেট নিযে লাফিয়ে পড়েছিল—তখন জনতা উত্তেজনায় দুলতে লাগল। ফুঁপিয়ে উঠল কেউ।

অযোধ্যা বলল—হতেই হবে। ওদের বাপ মরলে আমার খামারেই মানুষ হয়েছে তো! আমিই ওদের মানুষ করেছি।

কিন্তু জনতার মধ্যে থেকে কে একজন তীব্র চাপা গলায় তাকে খামোশ হতে বলল।

অযোধ্যা বলল—তা, সিপাহী, আমরা গ্রামে বসে অনেক কিছু করছি।

একজন বলল—গ্রামের সুবিধার জন্যে গম কিনে মজুত করেছো, তাই পাঁচ টাকা বেশি দিতে পারো নি চাঁদা, তাই না?

কিন্তু জনতা আবার শুনতে চায় কম্পানির শেষ কমান্ডার নায়েক রামচলিত্তরের সেই শেষ অর্ডার

'চারজ' কথাটাকেই। ততক্ষণে ভিড় আরও বেড়েছে। নতুন যারা এসেছে তাদের মধ্যে থেকে অনুরোধ আসছে—আবার বলো সিপাহীজি, আবার বলো, আমাদের এই গ্রামেব রামচলিত্তর আর লছমনপ্রসাদেব কথা বলো, পাশের গাঁয়ের সুবাদার গণপতের কথা। এই অনুবোধ করতে গিয়েও আবেগে তাদের গলা ধরে আসছে। কেঁদে ফেলল কেউ।

অযোধ্যা বলল—তোমরা আমাব কথা শুনছো না।

—কে শুনতে চায় তোমাব কথা? জনতা উত্তর দিল।

—আর চীনাদের সেই সব ভাইয়ের কথা? জনতার প্রতিধ্বনি উঠল।

একজন এগিযে এল। দোয়ারকাকে সিগ্রেট দিল সে। কিন্তু হাতভাঙা দোয়ারকা সিগ্রেট ধবাবে কি করে? তা অনুভব করে আহা আহা করে উঠল জনতা। জনতাব একাংশ বলে উঠল—তাঁরা শের ছিলেন, আমাদের সম্মুখে দেখো, এই আর এক শের-ই-হিন্দ।

একজন এগিয়ে গিয়ে দোয়ারকার সিগ্রেট ধরিয়ে দিল।

তেওয়াবী বলল—কিন্তু তোমরা কিছু বুঝতে পারছো না? এই যুদ্ধের কারণ কি তা জানো না। ওই যে পয়লা দোসরা তিসরা যোজনা, তাতেই আমাদের দেশ দুবলা হযেছে।

একজন বলল—ধনী হয় নি?

অযোধ্যা হেসে বলল—ধনী যদি দুবলা হয—

একজন প্রচণ্ড চিৎকার কবে উঠল—খামোশ।

অন্য একজন বলল—দেশকে খুব ভালোবাসো, না মহাজন? সবকাব ট্রাক চেয়েছিল, আর তখন সে জন্য ট্রাকের এঞ্জিন বিগড়ে বেখেছিলে, তাই নয়?

জনতাব একাংশ ফিরে তাকাল তেওয়াবীর দিকে। অবাক বোধ করছে তারা। এই তেওয়ারী একদিন বলেছিল: সিপাহীদেব জন্য আমাদের কিছু কবার নাই। দেশ স্বতন্ত্রতা পাওয়ার পর আমবা ট্যাক্স দিযেছি, কাজ কারবার কবেছি, সিপাহীবা পনেব বছর বসে তনখা নিয়েছে, এতদিনে কাজ পড়েছে তাদেব। কাজ করুক। অবাক লাগছে জনতাব। শুকনো বৃদ্ধটাকে পাকা শয়তান মনে হচ্ছে।

একজন বক্তৃতার ঢঙে বলল—আমরা শুনবো না এই অযোধ্যা তেওয়ারীর বজ্জাতির কথা। নায়েকজির বাড়িতে গমেব গুদাম তুলতে আমরা দেবো না।

একজন বিদ্রূপ কবল—সরকাবের যোজনার চাইতে তেওয়ারীর যোজনা ভালো হলেও।

প্রথমজন বলল—আমবা যাবো সদরে। আমরা সেখান থেকে নতুন আইন আনবো। হটাও এই গমের গুদাম। দুশমন চীনা। আর দুশমন এই তেওয়াবী।

অন্ধকাবে জনতার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। স্তব্ধ জনতা। শোক তাদের ক্লান্ত করেছে কিন্তু ক্রোধও ফুটে উঠছে তাদেব মনে। আবেগে তাদেব বুক কেপে কেঁপে উঠছে। কিছু একটা তখনই করা দরকার। কিছু একটা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

হঠাৎ সেই অন্ধকাবের একটা দিক আলোকিত হয়ে উঠল। আরে আগুন আগুন। অযোধ্যা তেওয়ারীর গমের গুদামেব জন্য ভারা বাঁধা হয়েছিল, তার তলায জমা করা হয়েছিল কাঠ। সে সবই জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ কবে।

কাবা হাততালি দিল আনন্দে। কে একজন চিৎকার করে বলল—পোড়াও, পোড়াও। তেওয়ারীর চিতা ওটা।

ভিড়ের যে গাঢ় অন্ধকার যেখানে রামসুভগ ঠোঁট চেপে ধবেছে দাঁতে। কিন্তু বুকভরা হাহাকার করা কান্না সে কি করে দমন করবে? উদ্গাত অশ্রুর চাপে তার হৃৎপিণ্ড যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। আর সে কান্না যেন আগুন হযে উঠতে চায়। জ্বলতে চায়। চাচাজি লছমনপ্রসাদ—বাপ যখন যুদ্ধে, তখন এই বুড়ো ছেলেকেও কাঁধে কবে বেড়াতো চাচা। চাচাজি বলে চিৎকার কবে উঠতে যাচ্ছে

তার সমস্ত অন্তর। কান্নায় লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। আর বাবা! হাঁ, এতদিনে সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে কেমন ছিল সেই ঠাণ্ডা বিনয়ী মানুষটি। আগে জানলে সে কতবার করে প্রণাম করতে পারতো তাঁকে, যখন তিনি বাড়িতে আসতেন। পিতাজি, পিতাজি—

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে অযোধ্যা তেওয়ারীর অতিলোভকে পুড়িয়ে, যেন তা জনতার ক্রোধ। জনতার মুখে সেই আগুনের ছাপ যেন তা প্রমাণও করছে। দীর্ঘছায়া পড়েছে জনতার মানুষগুলোর, যেন তা প্রমাণ করছে এই সাধারণ মানুষগুলোর প্রকৃত আয়তন কত বিরাট হতে পারে।

সেই জনতার আড়ালে রামসুভগ বলল—মা, দাদীকে দেখো। বলতে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর নিঃশব্দে সরে এল। এবার সে কাঁদবে। সে আর দাঁড়াতেও পারছে না।

দিন হয়েছে আবার। খড়ছাদ মাটিদেয়াল বাড়িগুলোর মধ্যে মাটির পথে রোদের সঙ্গে জুলুশ ঢুকে পড়লো, সবুজ গাঁধি টোপি, লালী ঝাণ্ডা। চিৎকারে তাদের ঘুম ভাঙল, তারা অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। জানালার ফাঁকে চোখগুলো অবাক। রাতের আঁশু, এখনও চোখের কোলে দাগ।

রামসুভগ উঠে দাঁড়াল মাটি থেকে। এখনও কী অন্ধকার!

দাঁতে দাঁতে চেপে সেই আধ-অন্ধকারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপানি চাপতে চাপতে ছুটে চলেছে রামসুভগ। গোরখপুর শহর অনেকদূর। যেতে একবেলায় কুলোয় না। তার হাতে সময়ও নেই। সময় নেই, এ একথাটাই যেন ফোঁপানি হয়ে উঠে আসছে। এই অন্ধকারে সে কি একবার বাবা বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে?

মাস্টারজিরা, হরিয়াটোপি, লালী ঝাণ্ডা চিৎকারী। খুব, অনেক চিৎকার, মাহাঙ্গা ভাত্তা লেকে রহেঙ্গে। হিন্দি চীনি এক হো। চাকা বন্দ। চাকা বন্দ।

রামসুভগ চাকা বন্দের ভয়ে ছুটতে শুরু করল। সে কি উৎক্রোশ কান্নায় হাহাকার করে ডাকবে বাবাকে? দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। বুকপাট কাঁপছে থর থর করে। দুশমন দুশমন। হাঁ, সে জানে গোরখপুরের শহরে রংরুট অফিস কোথায়। সকলের প্রথম সারিতে সকলের আগে দাঁড়াবে সে। নায়েক রামচরিত্তরের রক্ত তার দেহে কান্না হয়ে ভেঙে পড়তে চাচ্ছে, কিন্তু সে কান্না আগুনের স্রোত। সে আগুন চিৎকার করে উঠছে, চা—র—জ।

চাঁ—আঁ -আঁ—র—জ।

অনির্বচনীয়া

পুটুর সঙ্গে আবার দেখা হবে তা ভাবা যায়নি, কিন্তু তা হল—স্থান এবং কালের অচিন্তনীয় দূরত্বে তো বটেই—মনের দিক থেকেও যখন সব নৈকট্য নিশ্চিহ্ন। দীর্ঘকাল তারা স্মৃতিতেও জাগেনি। এই স্মরণে আনার ব্যাপারটা নাকি খুব কৌতুকের, অন্যকথায় মনস্তত্ত্বের, বিষয়। যা দুঃখজনক অনেকেই তাকে মন থেকে বিদায় করে দেয়। এটা সত্য হলে আমি এই অনেকের দলেই আছি। পুটুদের চারিদিকে কোথাও আলো, হাসি, কিম্বা গান ছিল না, বরং কেলেঙ্কারীর স্পর্শে মলিন দারিদ্র্য, বিষণ্ণতা এবং কলহ ছিল। কিন্তু এটা তো ভাল নয়, জীবনের মলিন দিকটাকে এমন করে ভুলে যাওয়া—এই তিরস্কারের মত কথাগুলো আমার মনে এসেছিল পুটু চলে গেলে।

গোড়া থেকেই বলা যাক। দিল্লিতে তখন কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সন্নিপাত হয়েছিল। একজিবিশন, সভা ইত্যাদির পারম্পর্যে কয়েকটি দিনের জন্য মানুষ যেন সংসার এবং চাকরি সংক্রান্ত সংকীর্ণতার বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। একজিবিশনে প্রদর্শিত বিষয়, সভায় উত্থাপিত সমস্যা নিয়ে পথেঘাটে, চায়ের দোকানে, অফিসের লবিতে, বৈঠকখানায় আলোচনা হতে শোনা গেল। উদ্যোক্তাদের দৃষ্টির প্রসার প্রশংসনীয়—তারা একদিকে যেমন কারিগরি বিদ্যার উন্নতির নজির নানা যন্ত্রাদির প্রদর্শন ব্যবস্থা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমন গত দুই দশকের ভারতীয় চিত্রকলার একটা অস্থায়ী যাদুঘরও খুলেছিলেন বিজ্ঞান এবং হিউম্যানিটিজ দুইয়েরই যথোপযুক্ত সমাদর ছিল। সব মিলিয়ে মানুষ কতদূর এগিয়েছে তার নিরিখ করার চেষ্টা হয়েছিল।

চারুশিল্প সম্বন্ধে আমি চিরদিনই একটু শ্লথ-একটু রেখে, জুড়িয়ে, তারিফ করে স্বাদ নিতে চাই। এই অলসতার ফলে একজিবিশনের প্রায় সবত্র একবারের বেশি ঘোরা হয়ে গেলেও চিত্রকলার সেই জাদুঘরের দিকে যাইনি।

জনসাধারণের ঔৎসুক্য একটু থিতিয়ে এলে, স্থির করলুম, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি—তিনদিনই সকাল আটটা থেকে বিকেল তিনটে জাদুঘরে কাটিয়ে দেব। ওদিকের এক অধ্যাপক বন্ধুকে প্রথম দিনের সঙ্গী করব স্থির করলুম, কারণ লক্ষ্য করেছিলুম ইতিমধ্যে তিনি ছবির তালিকাটি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবার মতই কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন।

জাদুঘরে আয়োজনটা প্রকৃতই প্রশংসাযোগ্য হয়েছিল। টিকিটের খিড়কির পাশেই জাদুঘরের মেঝের নকশা টানিয়ে রেখে কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ছবি সাজানোর ব্যাপারে তাঁদের একটা নীতি আছে। বিভিন্ন রীতির ছবি কালের ক্রম অনুসারে সাজানোর চেষ্টা করেছেন তাঁরা, এবং লক্ষ্য করা গেল ছবির বয়সোত্তীর্ণতার যথাযোগ্য সম্মান দেবার চেষ্টাও আছে।

কিন্তু অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার বিপদ থেকে আমি মুক্ত ছিলাম না। এক সময়ে লক্ষ্য করলুম, সেই ভিড়ের মধ্যেও আমাকে তিনি একটি আলোচনায় টেনে নিয়েছেন। সে আলোচনা নিশ্চয়ই মনোজ্ঞ এবং তথ্যভূয়িষ্ঠ এবং বিভিন্ন কক্ষে সাজানো চিত্রগুলোর দোষগুণ বুঝতে তা আমাকে হয়তো সাহায্য করে থাকবে, তবু যেহেতু এটা জাদুঘরের পটভূমিকায় পুটুর কথা, চিত্রের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা চাই। কিন্তু প্রায় শেষদিকের একখানি ঘরের চিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করতেই হবে। কারণ, এ ঘরের চিত্রগুলোর মধ্যে কয়েকখানা এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে একটি আমাদের আলোচনার বিষয় হয়েছিল এবং পরে জেনেছিলুম দর্শক-সাধারণের ক্ষেত্রেও, বিতর্কিত বিষয় মাত্রই যেমন হতে

পাবে।

সে ঘবটিব দক্ষিণ দেযাল যেন অন্য তিনটি দেযাল থেকে পৃথক। পূর্ব ও পশ্চিমেব দেযাল ববাবব ছবিব সাবি প্রসাবিত হতে হতে দক্ষিণেব দেযালে পৌঁছানোব আগে হঠাৎ যেন থমকে দাঁডিযেছে। পূর্ব ও পশ্চিম দেযালেব ছবিব সাবি ও দক্ষিণ দেযালেব বিচ্ছিন্ন ছবিগুলোব মধ্যে সাদা দেযালে দু একটি অকিঞ্চিৎকব চাবকোল স্কেচ ব্যবধানটাকে পবিস্ফুট কবতে সাহায্য কবছে। আমবা প্রদক্ষিণ কবছিলুম, সে জন্যে পশ্চিম দেযালেব ছবিগুলো দেখা শেয হলে দক্ষিণেব দেযালে যাওযা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অধ্যাপক বন্ধু থেমে দাঁডালেন। আমাদেব পাশে পাশে আবও দুএকজন দর্শক চলছিল, তাবাও যেন দ্বিধায পডল। কিছু যেন তাদেব বাধা দিচ্ছে। পাশাপাশি তিনখানি সুন্দব চিত্র দক্ষিণেব দেযালে ভবে বেখেছে। এদেব কী হল' এগিযে গেলুম। আব ঠিক তখনই অধ্যাপক সলজ্জ হাসিতে ফিসফিস কবে বললেন, একটু তাডাতাডি কববেন, ছাত্র ছাত্রীবা এসে পডতে পাবে। এ কথাতেই ওদেব থমকে দাঁডানো দ্বিধাব কাবণ বুঝতে পাবলুম নিজেও সাময়িকভাবে বিব্রত বোধ কবলুম। চিত্র তিনখানি ন্যুড।

কিন্তু অভিভূত হলুম। আমাব মনে হতে লাগল এ কোন নতুন শিল্পী আত্মপ্রকাশ কবেছে আমাদেব দেশে। কী দুর্জয়, অকুণ্ঠিত আত্মপ্রত্যয। পুবাণ ও প্রাচীন কাহিনী থেকে উদ্ধৃত কোন চবিত্রেব নাম দিযে সাধাবণত ন্যুড নাবীচিত্র আঁকা হত যখন তা আঁকাব প্রচলন ছিল। এক্ষেত্রে চিত্রী সে পৌবাণিক আববণও ছুঁডে ফেলে দিযেছে। তাব ছবি আধুনিক কালেব নাবী বই কিছু নয, আব তা স্মবণ কবিযে দেযাব জন্যই ছবিগুলিকে 'ক্লান্তি', 'সম্রাজ্ঞী', 'অনির্বচনীযা' এমন নাম দেযা হযেছে। মাংসেব বাহুল্য, দেহেব এখানে ওখানে পৃথুল কোমল বর্তুলতাব আভাস, নবম বাঁক। ঠিক যেন তাই, তাব চাইতে কম নয, অথচ কিছু বেশিও, বযসেব ছাপ কোথাও, তবু হঠাৎই যেন তা সবই বিদ্যুদ্দীপ্ত।

কিন্তু মোহ, যদি তা মোহ হয, ভেঙে গেল। শুনলুম, অধ্যাপক বলছেন, তেবেসকোভাদেব যুগে বমণীব দৈহিক গঠনকে চিত্রার্পিত কবাব চেষ্টা নিতান্ত মধ্যযুগীয ব্যাপাব।

বললুম, বিস্ময বোধ কবছি।

অধ্যাপক বললেন, এটা মানুযেব মহাকাশ পবিক্রমাব যুগ। বিজ্ঞান ও কাবিগবি বিদ্যায মানুষ যতটা উন্নতি কবেছে চিত্রে এবং সাহিত্যেও তা কবতে হবে। পিকাসোব পববর্তী চিত্রী বেখাব বন্ধনে ধবা দেবে এটা আকাঙ্ক্ষিত নয।

ভযে ভযে বললুম, ক্লাসিক বীতি বলে একটা কথা আছে। কেউ যদি—

কথা কেডে নিযে অধ্যাপক বললেন, এখন কি আবাব সমিল কবিতা সম্ভব? সমাজেব বিবর্তনেব সঙ্গে বীতিও বিবর্তিত হয। পিছন ফেবা কৃত্রিম এবং বিঅ্যাকশনাবী সুতবাং পণ্ডশ্রম।

বলতে যাচ্ছিলুম—পথেব ধাবে অযত্নে ফোটা একটি মাত্র তাবাফুল নিযেই মন সব অনুভূতিব সীমা লঙ্ঘন কবতে পাবে আব তা মহাকাশেব সীমালঙ্ঘনেব তুল্যমূল্য। কিন্তু শ্রোতা হিসেবেই নিশ্চযই আমি আদর্শস্থানীয নতুবা অধ্যাপকবা আমাব বন্ধু হতেন না।

শুনতে পেলুম, অধ্যাপক সামগ্রিক অগ্রগতিব পবিপ্রে ·ি্তে স' ্জে নাবীব স্থান সম্বন্ধে কিছু বলছেন। শুনলুম, এ যুগে বমণীব দৈহিক গঠনকে চিত্রে অর্পিত কবাব চেষ্টাও স্ত্রীজাতিকে মধ্যযু ীয প্রথায অপমান কবা। ভুললে চলবে না, বমণী এখন সকল কর্মে সকল ধর্মে পুরুযেব সমান অংশীদাব। এ সমাজে এই তেবেসকোভাদেব যুগে পুরুযেব উপভোগ্যা এবং সেজন্যই মূল্যবান জীবমাত্র নয নাবী।

অধ্যাপকেব আলোচনাব সুবেব সঙ্গে উদ্যোক্তাদেব আযোজনেব সঙ্গতি ছিল অবশ্যই। আধুনিক সমাজেব অগ্রগতিব যাচাই কবা হচ্ছে এখানে। সে যাই হোক, ভাবলুম—আলোচনাটা হযে গিযেই ভাল হল, কাবণ কাল যখন একা চিত্রশালায আসব এই আলোচনাব সুযোগ থাকবে না।

পরদিন প্রায় আটটাতেই জাদুঘর পৌঁছুলাম।

একটা পরিকল্পনা করা ছিল। যে কয়েকখানি ছবি বিশেষ করে মনে ধরেছে প্রথমে সেগুলোকেই দেখব, পরে ক্রমানুসারে দেখে রীতিবিবর্তনের ধাবা এবং সেই ধারায় চিত্রীদের ব্যক্তিগত অবস্থিতি এবং প্রভাব বুঝতে চেষ্টা করা যাবে।

পরিকল্পনামতো এগিয়ে যেতে অসুবিধা হল না। সাময়িক চিত্রশালা নির্জন হয় না, তবু ভিড়টা আশানুরূপভাবে হালকা। যেখানে যতটা সময় দাঁড়ানো প্রয়োজন মনে করলুম তাতে কারো অত্যুৎসাহ বাধা হল না। ইতিপূর্বেই এই সাময়িক চিত্রশালার প্রশংসা করে ফেলেছি, এই দ্বিতীয়বারের দেখায় সে প্রশংসাকে বরং আরও যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে। এ তো আর ডেমোক্রেসি নয়, কাজেই এখানে উঁচু নিচু খুঁজে নেওয়া সহজ। অকিঞ্চিৎকরকে বাদ দিয়ে কুলেশীলে অভিজাত চিত্রগুলোকে দেখে দেখে এগিয়ে চলেছিলাম। তা সত্ত্বেও অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রগুলোর কাছে একটু বেশি সময় লেগে গেল। যন্ত্রসঙ্গীতে কথা না থাকা সত্ত্বেও তা যেমন হৃদয়কে অধিকার করে, এই অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রগুলোতে আমাদেব পরিচিত পৃথিবীর অনুকৃতি না থাকা সত্ত্বেও তেমনি তারা হৃদয়গ্রাহী। হঠাৎ মনে হল, দুপুরের আলো যেন ম্লান হয়ে আসছে। ঘড়ির কাঁটার চালের সঙ্গে মিলল না, হয়তো আকাশে মেঘ আছে। কিন্তু বেছে বেছে ছবি দেখেও কালকের চাইতে বেশি সময় লেগে গিয়েছে, তাও অস্বীকাব করা যায় না। প্রায় দুটো বাজে। আলো আরও ম্লান হবার আগে আরও কিছু ছবি দেখে নেওযা চাই, বিশেষ করে—বিশেষ ভাবতে গিযে কালকের সেই বিতর্কিত ন্যাড ছবিগুলোব মধ্যে একটির কথা মনে হচ্ছে। বিতর্কের আকর্ষণ কিনা এটা বলা শক্ত। মনে হল অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রণের যুগে যে চিত্রী সুপ্রাচীন ধাবায় নিজস্ব রীতিতে অমন দৃঢ় হাতে তুলি চালাতে পেরেছে তাকে আর একবার অনুভব করাব চেষ্টা যুক্তিযুক্ত হবে। ভাবতে গিযে মনে হল : লোকপ্রিয় চিত্রী হিসেবে যশ না পেলেও সে এখন থেকে অনেকদিন বিতর্কের কারণ হয়ে থাকবে—এবং সেটা তার ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যের পরিচয়ও বটে।

এদিকের দুখানা ঘরে খান চার-পাঁচ ছবি দেখবার পর সেই ঘরখানির দিকেই চলতে শুরু করলুম। উৎসাহিত বোধ করলুম, এজন্য যে মনে হচ্ছে আমি একাই সেদিকে চলেছি। কালকের সেই লজ্জা পাওয়ার ব্যাপারটার পুনরভিনয় হবে না—কাল দর্শকদের দ্বিধায় এবং অধ্যাপকের ছাত্রভীতিতে যা প্রকাশ পেয়েছিল। তা ছাড়াও, এখন দিনের যে আলো জানালা দিয়ে আসছে তা বিশেষভাবেই কোমল। এই আলোয় চিত্রীর রঙগুলোকে ভাল করে বুঝতে পারা যাবে।

কিন্তু প্রায় থমকে দাঁড়াতে হল আমাকে। অন্যমনস্ক ছিলুম বলে দরজার কাছে থেকেই দেখতে পাইনি। ন্যাড চিত্রটির সম্মুখে একজন স্ত্রীলোক একটি কিশোরেব হাত ধবে দাঁড়িয়ে। হয়তো অনেকদূরের কোন গ্রাম থেকে এসেছে একজিবিশনেব কথা শুনে। হয়তো অফিসের চাকুরে, অন্যসময়ে চাকরি এবং নিজের সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সাদামাটা শাড়ি পরা সাধারণ চেহারার স্ত্রীলোকটিকে দেখে আমার তাই মনে হল।

কিন্তু তখন আমার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। অনুভব করলুম, অধ্যাপকের যে লজ্জা কাল প্রত্যক্ষ কবেছিলুম সেটাই যেন আমাকে আচ্ছন্ন করছে। আর যাই হোক, একটি স্ত্রীলোকের পাশে দাঁড়িয়ে এমন একখানি ন্যাড ছবি খুঁটিয়ে দেখা যায় না। স্ত্রীলোকটিও আমার পায়ের শব্দে যেন চমকে উঠল। চুরি করে ধরা পড়ার ভঙ্গিতে সে কিশোরটির হাত ধরে যতদূর সম্ভব দ্রুত সরে গেল। দুপক্ষের লজ্জা পরস্পরকে আরও বেশি লজ্জিত করে।

অনুভব করলুম, আমার এ লজ্জা নিতান্ত বিসদৃশ এবং নিতান্ত সত্য। অথবা ইংরেজিতে যাকে প্রুড বলে আমরা প্রকৃতপক্ষে সকলেই কি কম বেশি তাই? এমন একখানি চিত্রের কাছে আসবার সময়ে অকৃত্রিম সৌন্দর্য-উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু কি মনে থাকে? একটি পুরোদিনের প্রত্যাশা

মনের মধ্যে যে রসগ্রহিষ্ণুতা সঞ্চয় করেছিল তা যেন অন্যকিছুর মিশ্রণে মূল্যহীন হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ এই চিন্তাগুলিকে গুরুভারের মত মনে বহন করলুম।

কিন্তু মনের সব অবস্থাতেই তাকে অধিকার করতে পারবে এটাও চিত্রীর দক্ষতার পরিচয়। দু'এক মুহূর্তেই চিত্রার্পিত রূপরাশি আমার মনকে ভাস্বর করে তুলল। আবার তেমনি একটি বিদ্যুদ্দীপ্তিকে অনুভব করলুম। এই বিদ্যুদ্ভাস সম্বন্ধে অন্তত বায়োলজি নিঃশব্দ। অন্তত আমার মনে হচ্ছে বায়োলজিতে এমন কথা কোথাও দেখিনি। উষা এবং আলোর মতো অকুণ্ঠিত নিরাবরণতার খানিকটা চিত্রে অর্পিত দেখলুম। সমুদ্র উর্দধি ও বনারণ্যে যে উষা তা হয়তো নয়, কিন্তু কলের ধোঁয়া আকাশে উঠবার আগে কিছুক্ষণের জন্য ক্বচিৎ-দৃশ্য যে উষা বন্দর নদীর কালো জলের উপরে দেখা যেতে পারে তেমন কিছু যেন।

অনুভব করলুম, যেন কিছু আবিষ্কার করেছি। কয়েকটি প্রবন্ধে এই বিশেষ চিত্রীর পরিচয়কে লোকজ্ঞাত করবার একটা তাগিদ জন্মাচ্ছে মনে, আর এটা আমার সৌভাগ্যই বটে অন্য কেউই এদিকে আসছে না। দর্শকের ভিড় হচ্ছে না। এই অবসরে চিত্রীর স্বাক্ষর, ছবির তারিখ প্রভৃতি লক্ষ্য করলুম। আমার মনে হল ছবিটি যেন মডেলকে উৎসর্গ করা হয়েছিল—এমন কিছু লেখা আছে। পরে যদিও তা তুলির টানে ঢেকে দেবার চেষ্টা হয়েছে।

হ্যাঁ, এখন আর দ্বিধা করবার মতো কিছু নেই আমার মনে। চিত্রের উৎকর্ষ এখন আর অবোধ্য নয়।

প্রায় আধঘণ্টা কেটেছে ছবিটার সামনে। দুএক মুহূর্তের জন্য একটা নতুন দ্যোতনা আমার কাছে প্রতিভাত হচ্ছে বলে মনে হল। মনে হতে লাগল, এই রূপ যা পুরুষমাত্রেরই কামনার স্বপ্ন হতে পারে তার যেন নিজের স্বপ্ন নেই। এত অকুণ্ঠিত আবরণ যার সে যেন অনাকৃষ্টা, নিঃসঙ্গ। এই নতুন ইশারার কথা ভাবতে ভাবতে অনুভব করলুম একটু দূরে গিয়ে বসা দরকার। কাফেটেরিয়ার গোলমালের মধ্যে সেই নির্জনতা পাওয়া যাবে, কারণ সেখানকার আয়োজন বিপরীতধর্মী বলে আমার মনকে স্বভাবতই আত্মসমাহিত হতে সাহায্য করবে। আপাতত চা বা কফির মতো কিছু চাই ব্রেকফাস্টের ওপরেই দিন শেষ হতে চলল।

কিন্তু যাবার জন্য পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালুম বিস্ময়ে। বিস্ময় বিষয়টার মূল কারণই অপ্রত্যাশা। নজরে এল চিত্রদর্শিকা সেই স্ত্রীলোকটি একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। পালানোর ভঙ্গি নয় তার, বরং যেন মন্ত্রমুগ্ধার। অন্য পাশ থেকে দেখছে ছবিটাকে? অথবা—পাগল নয় তো—মুহূর্তের জন্য এরকম একটা প্রশ্ন আমার মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল।

কিন্তু তাই কি?

স্ত্রীলোকটি দু এক পা বরং এগিয়ে এল।

ছবিটাকে নিয়ে আলাপ করতে চায় নাকি? তা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? আমার খুব ভাল লেগেছে, বিস্ময়কর দক্ষতা এবং ততোধিক প্রতিষ্ঠা করেছে চিত্রী—এমন ধরনের কথা বলাকে চিত্র নিয়ে আলাপ বলে না।

স্ত্রীলোকটি কথা বলল প্রথমে। বলল, মজুমদার দাদা যেন মনে হচ্ছে। হাসল সে। কতযুগ পরে দেখা তাই নয়?

আমার স্মৃতির কোন অংশই যেন জাগবে না। সাধারণ হলদেটে সবুজ জমির শাড়ি, হালকা হলদে উলের ব্লাউজ, হাতের উপরে সাদা শাল। কপালের উপরে কয়েকটি রুক্ষ চুল, চোখদুটি ম্লান নয়, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু পরিশ্রম করে জীবনধারণ করলে ক্লান্তির অনিবার্য ছায়া মুখে দেখা দেয়, স্ত্রীলোকটির মুখে লাবণ্যের পরিবর্তে তাই ছিল। সুখী জীবনের গোলালো গড়ন নয়, বরং যেন জ্যামিতিক।

বললুম, তুমি? তোমাকে—তুমি পুটু না?

স্ত্রীলোকটি উচ্ছ্বসিত হল না, চঞ্চল হল না। কোন কোন আনন্দের সীমিত এবং গভীর হওয়ার দিকে প্রবণতা থাকে। কিম্বা পুটুরই বৈশিষ্ট্য এই ধরনের আনন্দ। সে বলল, ছবি দেখা হয়েছে? —চলুন তাহলে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

খুবই শান্ত কণ্ঠস্বর, মনে হতে পারে নিছক ভদ্রতা, কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে এটা তা হতে পারে না, কারণ পুটু যদি আমাকে নাও চিনত তা হলেও কোন সামাজিকতা বিঘ্নিত হত না। বরং যেন আতিশয্যহীনতা সত্ত্বেও হৃদ্যতা। বলল সে, অনেক আলাপ জমে ওঠেনি? সে হাসল।

কাফেটেরিয়ায় গিয়ে কফি নিয়ে বসলুম আমরা।

কিন্তু গল্পটা কোনদিক দিয়ে শুরু হবে?

আমি যখন পুটুকে শেষ দেখেছিলুম, তখন তার বয়স বারো তেরো হবে। তারপর থেকে এখন বোধহয় পঁচিশ হল। তার জীবনে কিছু টানাপোড়েন আছে। তা সব জানা না থাকলে খুব সাধারণ প্রশ্নও তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

অবস্থাটা সহজ করে দিল সে। বলল, এখানে এক হাসপাতালে নার্সের কাজ করি। ছোট একটা বাসা পেয়েছি। তা প্রায় দু বছর হল।

সঙ্গে কেউ ছিল যেন।

চিনতে পারেননি? আমার ছোট ভাইদের সব চাইতে ছোটটি। ছোটদুটি এখনও আছে আমার কাছে। আমার পরেরটি রেলে কাজ করে। লেখাপড়া তেমন হয়নি। বাবা ওর কাছেই থাকেন। আপনার খবর বলুন। বিয়ে করেছেন? বউ কোথায়? ছেলেপুলে কটি? কতবড় হল?

সাধারণ কুশল প্রশ্ন, কিন্তু অতীত ছিল একটা এ ব্যাপারে। বললুম, আমার জীবনে মাস্টারমশাই এবং তোমার মা দুজনের কথাই ফলেছে। মাস্টারমশাই বলেছিলেন কষ্ট হবে না জীবনে। তা কষ্টের বোধটাই আমার ভোঁতা। আর তোমার মা বলেছিলেন কিছু হবে না জীবনে—তা হয়ও নি।

মনে পড়ছে, এই বলে আমি হাহা করে হেসে উঠেছিলুম। পুটুর মুখে ছায়া পড়ল, খুব সম্ভব বিড়ম্বনার।

বলবার আগে কথাটাকে গুছিয়ে নিল সে মনে মনে। তাতে সময়ও লাগল। সে বলল, আচ্ছা মজুমদার দাদা, দারিদ্রের জন্য বোধহয় অমন হতে পারে তাই নয়? মা অমন কটু কথা সকলকেই বলত। এখন তার কটু কথায় অবশ্য, আমাদের কিছু এসে যায় না। এখন কি তাকে ক্ষমা করা যায়?

আমার কথায় নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দেখলুম, আমার হাসি সত্ত্বেও পুটুর মনে লেগেছে কথাটা। বললুম, তুমি কথাটাকে ওভাবে নিও না। জীবনে কিছু একটা না হয়ে ওঠার জন্য আমার মনে তিক্ততা নেই।

—সেই ভাল। পুটু হাসল।

পট থেকে আবার কফি পরিবেশন করল সে।

বলল, কোথায় আছেন? হোটেলে? আমার বাসাতেই থাকতে বলতেম। লোকে আবার কী ভেবে বসে তাই বলব না।

আঃ পুটু, তোমার কথার দোষ আর যাবে না। বিয়ে করলেই পার, তাহলে কেউ আর কিছু ভাববে না।

কিন্তু খোলাখুলি কথা বলার এই সাহসিক সারল্য পুটুর চিরকালের স্বভাব তা মনে পড়ল। এটা রসিকতার স্থূল চেষ্টা নয়।

পুটু বলল, সে যাই হোক, আপনি কাল আমার বাসায় খাবেন। খাবার যদি পছন্দ হয় তখন

আপনার দিল্লী থাকার বাকি কয়েকটা দিনেব কথা ভাবা যাবে। অন্তত অসুখের ভয় থাকবে না।

পুটু উঠে দাঁড়াল।

এখন কোথায় যাচ্ছ?

হসপিট্যালে যাব। কাল সারাদিনেব জন্য ছুটি চেযে নেব। বাজার করব, রান্না করব। মজুমদার দাদাকে খাওয়ানো কি সহজ ব্যাপার?

হেসে ফেললুম।

তুমি চিরকালই, বোধ হয জন্ম থেকেই গিন্নীপনাব দায়িত্ব নিতে ভালবাস। কিন্তু তোমার বাসা আমি চিনি না। ঠিকানাও দাওনি।

পুটু একটু ভেবে বলল, কাল সকালে এখানে আসবেন? আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। দশটার মধ্যেই আসব।

সেই ভাল।

পুটু চলে গেল।

ব্যবস্থাটা ভাল হয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছিলুম নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে ছবি দেখার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত না ঘটে। ছবিগুলোকে শেষবাবেব মতো দেখে নিতে হবে। ছবি দেখার মাঝখানে পুটুব এসে পড়ার ব্যাপাবটা চমৎকাব একটা যতিচ্ছেদ যেন।

আর, কেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, আমাদের গ্রাম্যশহরের সেই পুটুকে রাজধানীর এই কর্মব্যস্ততাব মধ্যে আবিষ্কার কবা?

এখন সেই সব দিনগুলোর কথাও যেন মনে পডছে। আমাদেব শহরের যোগেন মাস্টারমশায়ের বাডি। যোগেন মাস্টারমশাই বারোমিশেলি মাস্টাব ছিলেন। ইংরেজির মাস্টার, অঙ্কের মাস্টার এমন সব বিশেষ পরিচয় থাকে শিক্ষকদের, এমন কি ড্রইং ও খেলাব মাস্টারেরও থাকে, কিন্তু যোগেন মাস্টারমশাইয়ের তা ছিল না। নিচের দিকেব ক্লাসগুলোতে তিনি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসাবে যখন যা দরকাব পড়াতেন। আমাদেব তখন ধারণা ছিল এটা তাঁর বিশেষ যোগ্যতার অভাবকেই প্রমাণ কবত। কিন্তু এখন যেন অন্য একটা অর্থ দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও ভেবে দেখুন, এটা হয়তো তাঁব একটা বিশেষ গুণেব অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতি। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছাড়া শিশুদের পড়ানো যায় না বছরের পর বছর। যোগেন মাস্টাবমশাইযের যে চিত্র মনে আসছে তা যেন এই ধারণাই সমর্থন কবে।

হঠাৎ একবাব শুনলুম, আমাদেব ইতিহাসেব খাতা যোগেনবাবুব কাছে গিয়েছে। নম্বর জানতে গিয়েছিলুম তাঁব বাড়িতে। দৃশ্যটা এখনও আমাব মনে আছে। তখন শীতের সকালের বেলা আটটা হবে। ভাঙাচোবা বাড়ির দেযাল। বাবান্দায় একটা ময়লা পাটির উপরে বিবর্ণ একটা র‍্যাপার গায়ে জড়িয়ে যোগেন মাস্টার। তাঁর পাশেই একটা দুতিন বছরের ছেলে কলাই-চটা বাটিতে মুড়ি খাচ্ছে। উঠোনে একফালি রোদ পড়েছে। সেখানে একটি পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে একটি পাঁচ-ছ মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িযে শীতে কাঁপছে। আমার মনে আছে, সবসমেত একটা জরাজীর্ণ দীনতার অনুভবই জন্মেছিল আমার মনে। স্কুলে মাস্টারমশাইকে এতটা দীন মনে হয় না। লজ্জা পেয়ে ফিরে যাব ভাবছিলুম। কিন্তু মাস্টারমশাই ডাকলেন। নাম বললুম, কোন ক্লাসে পড়ি বললুম। মাস্টাবমশাই উদ্দীপ্ত হলেন। বললেন, খুব ভাল রেজাল্ট হবে হে তোমাদের। তুমি বোধ হয় সব চাইতে বেশি নম্বব পেয়েছ। তারপর তিনি কাউকে ডেকে বললেন : দেখ, দেখে যাও, এই সেই ছেলে যে সব চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে। তাঁর ডাক শুনে এই সময়ে ঘরের ভিতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন। যেমন সাজসজ্জায় তেমন রূপে। সজ্জা যে খুব দামি তা নয়, তাহলেও আমার অনুভব হয়েছিল, তিনি যেন এ বাড়ির অতিথি, বেড়াতে এসেছেন, কোন ধনী আত্মীয়াই হবেন। তিনি ঠোঁট

উলটে বললেন, কিছুই হবে না জীবনে, দেখে নিও।

যোগেন মাস্টারমশাই বললেন, আহা আহা, অমন করে বলছ কেন? দেখে নিও জীবনে ওর সাফল্য লাভ হবেই।

তখন কথাটা শুনে আমি নিজেকে তিরস্কৃত বোধ করেছিলুম। এখন অবশ্য অনুভব করছি, ওটা নিছক ওদের পারিবারিক ব্যাপার ছিল। জীবন যে তিক্ততায় টৈটুম্বুর ছিল তারই কিছুটা ছলকে পড়েছিল। যোগেনমাস্টারের স্ত্রীর কাছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে অবলম্বন করে যে ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছিল তা থেকেই প্রমাণ হয়, প্রকাশ পাওয়ার জন্য অবলম্বনেব যা কিছু হলেই হল, তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ারই কথা। আর উঠোনের এক ফালি রোদে দাঁড়ানো সেই শীতার্ত মেয়েটিই পুটু। ছোটভাইকে কোলে নিয়ে হয়তো তার শীতার্ত কান্না কমাচ্ছিল।

পুটুকে তারপরেও দেখেছি। পথে ঘাটে দীনবাস, অপুষ্টদেহ একটি মেয়েকে কর্মব্যস্ত হয়ে চলতে দেখতাম।

এরই দুবছর পরে আমার একবার যোগেন মাস্টারের বাড়িতে যাবার সুযোগ হয়েছিল তাঁব খুব অসুখ চলেছিল, বোধহয় তা থেকেই তিনি ইনভ্যালিড হয়ে যান। তখন মাস্টাবমশাইরা যেমন, ছাত্রদেরও কেউ কেউ যোগেনবাবুর বাড়িতে যেত। আমিও কয়েকটি লেবু পৌঁছে দিতে গিয়েছিলুম। দারিদ্রকেই যেন আরও মলিনরূপে প্রকাশিত হতে দেখেছিলুম। অনেকবার ডাকবাব পরে পুটুই বেরিয়ে এসেছিল। তার সঙ্গে তার দুটি ছোট ভাই, কোলে একটি, পায়ে পায়ে একটি—অনাহাবজীর্ণ তিনটি শিশু।

লেবু পাঠানো হয়েছিল আমাদের বাড়ি থেকেই, সুতরাং বাড়িতে রিপোর্ট করা দরকার ছিল। মা শুনে বললেন, যোগেনবাবুর স্ত্রী বুঝি ছিলেন না? পরে একজন প্রতিবেশিকে মা বলছেন শুনলুম, আবার বোধহয় ওঁর স্ত্রী বেড়াতে গিয়েছেন।

এটা একটা 'বোধহয়' দেয়া কথা। কিন্তু পরে আমরা জানতে পেরেছিলুম, যোগেন মাস্টারমশাইযের স্ত্রীর এমন বেড়াতে যাওয়া অভ্যাস ছিল। পুটুদের রেখে তিনি কিছুদিনের জন্য তাঁর বড়লোক আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন। এটা পবে বয়স্কদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। এ কথায় যোগেন মাস্টারের স্ত্রীকে প্রথম যেমন দেখেছিলুম তা মনে পড়ে। কি চেহারা, কি পোশাকে তাঁকে যোগেন মাস্টারের বাড়ির একজন মনে হয়নি—যেন ঠিক মেশেনি, পার্থক্য রেখে চলার ভাবও একটা আছে।

কিন্তু পুটু? সে একটা আশ্চর্য ধরনের মেয়েই ছিল। যোগেন মাস্টারের দারিদ্রকে সে আশ্চর্যজনক করে তুলেছিল। বারো তেরো বছরের সেই মেয়েটি ছোট ছোট ভাইকে বুকে করে রাখত যেন। আমি তাকে রান্না করতে দেখিনি। কিন্তু তাদের বাড়ির পিছনের ডোবাব ধারে ভাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাসন মাজতে দেখেছি। ওষুধের শিশি হাতে পথে ঘাটে দেখেছি, তখনও ছোটভাইটি তার কোলে। আমার এরকম একটা ধারণা হতো ভাইদের দেখাশোনার ব্যাপারে ওদের মায়ের চাইতে পুটুর দায়িত্বই বেশি, অথবা সে ব্যাপারে সব দায়িত্বই তার। আব একবার, বোধ হয় সেটাই শেষ দেখা, পুটুকে দেখেছিলুম বাজারে। দেখে অবাক হয়েছিলুম। ভাবলুম কী করবে, বাজার করে দেয়ার মতো কেই বা আছে ওদের। আসল বিস্ময়টা তখন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখতে পেলুম, পুটু একটা ছোট দোকান দিয়েছে; কয়েকটা চালতা, গোটা দু এক মোচা এই দিয়েই দোকান। সব সমেত পঞ্চাশ পয়সা দাম হতে পারে। সেই পয়সা কয়েকটির জন্যই তার এই প্রতীক্ষা। এদিক ওদিক তাকাতেই তার ছোট ভাইদুটির বড়টিকে কাছেই দেখতে পেলুম। ছোটটিকে হয়তো রুগ্ন পিতার হেফাজতেই রেখে এসেছে।

আর ওদের মা?

কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। এখন পুটুব ভাই চাকরি করে, সে নিজেও চাকরি করছে। বলা যেতে পারে চাকরিটা এমন কিছু নয়। নার্সের চাকরির একটা অর্থ এই যে উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। একটা জীবনের সম্ভাবনায় কি সংসাব, কর্তব্যের পাথর চাপা পড়ল? এটা কি কোন নীতির ফল? আমি শুনেছি ধর্মশাস্ত্রে এবং আইনের বইয়ে সন্তানকে পালন করা এবং পিতামাতাকে সেবা করা অবশ্যকরণীয় বলে নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু নিজের শৈশব থেকেই শিশু ভাইদেব লালন করা বোধ হয় আইনে বা ধর্মশাস্ত্রে কর্তব্য বলে নির্ধারিত নয়। এক্ষেত্রে আর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল : পিতা অসুস্থ অক্ষম, সাহায্য অপেক্ষা বিব্রতই বেশি করেছে · মা তার সেই ধনবান আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়মিত বেড়াতে যাওয়া কোনদিনই বন্ধ করেনি, এবং পুটুর কাছে গত দশ বছরের কথা শুনলে হয়তো জানা যাবে, মা তাদেব পাকাপাকিভাবে ছেড়ে না গেলেও যত তাদের সঙ্গে থেকেছে তার চাইতে বেশি থেকেছে দূরে।

যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

কাল পুটু দশটার মধ্যে আসবে। আমিও সকালেই আসব স্থিব করলুম। এখন মনে হচ্ছে, দুএকখানা ছবি আর একবার দেখলেই জাদুঘবে ঘোবাব ব্যাপাবে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটা পেয়ে যাব।

পবদিন সকালে প্রায় সব দর্শকেব আগেই পৌঁছে গেলুম। অনুভব হচ্ছে, আজই প্রকৃতপক্ষে মনের সেই অবস্থায় এসেছি যখন কলাবিদ্যাকে তন্ময় হয়ে উপলব্ধি করা যায়, সংসারের কোন পিছুটান, রাষ্ট্রের কোন নির্দেশনামা যে মনের গভীরতাকে স্পর্শ কবতে পাবে না।

ছবিগুলোকে দেখলুম এ ঘর ও ঘর ঘুবে ঘুবে। পুটুর কথা দুএকবাব মনেব উপরিতলে স্পর্শ করে গেল। সে তো কিছুক্ষণ বাদেই আসবে, দরকাব হয় তখন আবার তাব কথা ভাবা যাবে। যদিও তা অলস সময়ক্ষেপের চাইতে মূল্যবান কিছু নয়।

এ অবস্থায় সময় চলে যাওয়াকে কেউ কেযাব কবে না। অবশেষে ঘড়িতে দেখলুম দশটা বেজেছে। পুটুর আসবাব সময় হল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দেয়ালের সেই বির্তর্কিত ছবিগুলোকে দেখেও এসেছি। আমি যদি বলি গংগার মতো একজন শিল্পী আবিষ্কৃত হচ্ছে, পাঠকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে এবং আমাব পক্ষে তা আবিষ্কারের দম্ভঘোষণাব মতো শোনাবে। সুতবাং এই চিত্রী সম্বন্ধে কযেকটি প্রবন্ধ লিখতে কৃতসংকল্প হয়েছি, এব চাইতে বেশি বলা উচিত হবে না।

প্রবন্ধাদি লিখতে গেলে চিত্রী সম্বন্ধে কিছু সংবাদ নিতে হবে। ক্যাটালগে যা আছে, অনেকের পক্ষেই তা যথেষ্ট নয়। শুনেছি চিত্রীর সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ না করলে চিত্রীকে সবটুকু বোঝা যায় না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোচনায় আনতে হবে, কাবণ এই চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে সমাজেব বিবর্তনেব প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে—সমাজের অগ্রগতি বোঝানোর মধ্যেই এই চিত্রশালার সার্থকতা। অধ্যাপকের বক্তব্যও স্মরণীয়।

চিত্রকবের ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চযই আছে। সে জীবনে চিত্রকর আমাদের মতোই একজন মানুষ যার জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে লাগিয়ে দেবার লোক আছে কিম্বা নেই, যে ইজেলের পাশে বিশৃঙ্খল রঙের টিউবগুলোর মধ্যে উপযুক্ত মডেলের দুষ্প্রাপ্যতার কথা চিন্তা করে ডিসপেপটিক বিবক্তিতে পরিপূর্ণ। আর সংকীর্ণ স্টুডিওর ভিতরে বাইরে দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির এবং অখ্যাতির হতাশ, বিদ্বিষ্ট কোলাহল। অন্যদিকে মডেলের ব্যক্তিজীবন আছে। সে জীবনে সে অর্থের বিনিময়ে নিজের দেহকে নিরাবরণ করে চিত্রীব সম্মুখে। এ জীবনকে আমরা নিশ্চয়ই আদর্শ জীবন বলি না। উর্বশী থেকে শুরু করে, অম্বাপালি কিম্বা আধুনিকা কোন মেরিলিনকে নিশ্চয়ই আমরা দেবী বলি না। বলি কি?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে এবং পুটুকে এই চিত্র সমভাবে আকর্ষণ করছে। অন্য অনেককেও করে থাকবে। শিল্পীর এই 'অনির্বচনীয়া' চিত্রটিকে তিন রকম আলোতে দেখেছি : প্রথম দিনের

মধ্যাহ্নের ভাস্বরতায়, কালকের সেই মেঘলা দুপুরের পাণ্ডুরতায়, আর এখনকার এই সকালের সোৎসুক আলোকে। মানুষের মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়, কখনও বয়সের দরুণ, কখনও দুঃখের অভিজ্ঞতায়। তার ফলে চোখের আলোর ঔজ্জ্বল্যে তারতম্য ঘটে থাকে , তা সত্ত্বেও, আশা করছি, বিভিন্ন আলোকে একই ব্যক্তির কাছে যেমন, একই আলোয় বিভিন্ন মনের কাছেও চিত্রের মূল আবেদন স্বীকৃত হবে। আর তারই প্রমাণ, ছবিটি আমাকে এবং পুটুকে সমান আকর্ষণ করছে। আমার জীবনে এবং পুটুর জীবনে তফাৎ আছে। পুটুর ক্লেশপাণ্ডুর জীবন আর আমার উদাসীন জীবনে তুলনা চলে না। অবশ্য আমি স্বীকার করি পুটুর জীবন সম্বন্ধে অনেকেই তপঃক্লিষ্ট বিশেষণটাকে যুক্তিযুক্ত মনে করবে। নারী জীবনের সেটা একটা আদর্শই বটে। নিজের সুখদুঃখের কথা চিন্তা না করে আশৈশব যে ভাইদুটিকে লালন করেছে, এবং তা কিছু পরিমাণে বিলাসিনী মায়ের বিপরীত দৃষ্টান্তের সম্মুখে। রমণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম মাতৃত্ব এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেবাই যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যদিও সে নিজের জীবনে নিজের দেশ থেকে সুদূরে এই শহরে নার্সের চাকরি ছাড়া আর কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। তপস্যা বই কি তার জীবন, কিন্তু তপঃক্লিষ্টতার ক্লেশ আছে, এবং সে ক্লেশেও মানুষকে পাণ্ডুর দেখায় যেমন পুটুকে দেখেছি।

কিন্তু বেলা বাড়ছে ঘড়িতে। এদিকে ওদিকে ঘুরছি কথাগুলোকে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে। পুটু কোথায়? আজ যেন মানসিক তৃপ্তি দেহকে স্বাভাবিক করেছে। ক্ষুধা বোধ করছি। মন্দ হয় না নিদেন এই অবেলায় চা সামনে নিয়ে বসে আর একটু চিন্তা করা। গেটের কাছে ঘুরে এলুম এবং সিঁড়ি কাফেটেরিয়ার কাছেও। পুটু কি ভুলে গেল? গেটের পাশে খানিকটা কাটল সময়।

পুটু কি ভুলবার মেয়ে? হয়তো নিজের আয়োজনে নিজে লজ্জিত হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। না, যোগেন মাস্টারের মেয়ে সম্বন্ধে একথাও ভাবা যায় না। আসুক সে যখন আসবে। ততক্ষণে ছবির ঘরের ঘরে নেওয়াই ভাল।

সেই অনির্বচনীয়া চিত্রের মডেলের জীবনে কিছু দুঃখ আছে কিন্তু তাকে পুটুর জীবনের ক্লেশের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। মডেল অন্তত যেন একটা স্বীকৃতি পেল। এটা কি একটা সার্থকতা নয়? তার রূপ চিত্রার্পিত হয়ে অবিনশ্বরতা পেল। দুঃখ ছিল বই কি তার জীবনে। তার প্রতিফলনও আছে চিত্রে। তার অপরিসীম রূপের মধ্যে একটা বিষণ্ণতা আছে। সেই রূপময়ী সহস্র পুরুষের চিত্তকে সঙ্গের স্বপ্নে উত্তাল করলেও নিজে নিঃসঙ্গতায় নিমগ্না। আর সেটাই তার রূপকে পরিপূর্ণ করেছে, শশকচিহ্নের যেমনটা করার সুখ্যাতি আছে। সে যে মৃত্যুহীন সার্থকতা পেল, পুটু অবশ্য তা পাবে না তপস্যা সত্ত্বেও। পুটুর জীবন যেন তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

মনে পড়ে গেল, চিত্রের নিচে মডেল সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে। পুটু আসতে দেরি করছে —এই সুযোগে লেখাটাকে, যা পরে তুলির টানে অস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, পড়ে দেখলে হয়। হয়তো আমার প্রবন্ধের পক্ষে সুবিধা হবে। হয়তো বা এটা একটা হঠাৎ আসা চিন্তা, প্রমাণ হবে মডেলই চিত্রীকে পুরাতন রীতির দিকে প্রেরিত করেছিল। তা নয়? হতে পারে মডেলের গুণ্ঠনমুক্ত রূপ হঠাৎ চিত্রীর মানসলোককে প্লাবিত করেছিল। নিজের এই চিন্তায় কৌতূহল বোধ করলুম, কিছুটা মধুর কৌতুকও। দেখা যাক কিছু পড়া যায় কিনা।

এই ভেবে দক্ষিণ দেয়ালের দিকে চললুম।

কিন্তু পুটু যে! ঘরে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। অনির্বচনীয়া সেই নগ্নিকা চিত্রটির সামনেই পুটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পায়ের শব্দে সে মুখ ফিরাল।

—পুটু যে!

—আপনাকে খুঁজছি।

—ছবিটা ভাল। নয়?

—চলুন আপনার খেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—ছবিটা ভাল খুবই ভাল। পুটুর মুখে একটা বিব্রত হওয়ার চিহ্ন ছিল তা দূর করতে এই বললুম।

চলতে চলতে পুটু আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। বলল, চিনতে পারেননি।

—কই, ঠিক—না তো।

—মায়ের ছবি।

পুটুর মা, অর্থাৎ যোগেন মাস্টারের স্ত্রীর—এত রূপ ছিল?

পাশে ক্লেশপাণ্ডুর পুটু হেঁটে চলেছে। কালকের চাইতেও আজ তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

আয়নায়

বিশেষণ প্রয়োগ করে আমরা যে শুধু সবিশেষ বলতে চাই তা নয়, যা আমরা ঠিক মতো জানি না তার সম্বন্ধেও বিশেষণ ব্যবহার করে আমরা দায় সেরে নিয়ে থাকি। আমরা যাকে পাগল বলি, প্রকৃত পক্ষে সে মতিচ্ছন্ন নাও হতে পারে, কিন্তু ও কথাটা বলেই আমরা চূড়ান্তে পৌঁছে দায় শেষ করলুম।

সুশোভন সামন্তকে আমাদেব শহবে কেউ কেউ আড়ালে আবডালে আজকাল যা বলতে শুরু কবেছে, তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে, আর সে ইঙ্গিতের দিকে মনোযোগ দিলে এ রকম ধারণা হতে পারে, সুশোভন সামন্তকে সব দিক দিয়ে আর স্বাভাবিক বলা যায় না। অথচ ভদ্রতার এবং শোভনতার খাতিরে ইঙ্গিতের চাইতে স্পষ্ট কবে উচ্চারণ কবাও সম্ভব নয়।

কিন্তু এমন ইঙ্গিত করাবই বা কী যুক্তি আছে? মঙ্গল বাবে—সাধারণত দু-সপ্তাহ আগে যে মঙ্গল ছিল তাব কথা বলা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে জুলাইএব শেষ সপ্তাহেব মঙ্গলবাবেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। ওই একটা মাত্র ঘটনাই আছে, আজ পর্যন্ত আছে, যাকে সুশোভন সম্বন্ধে আড়ালে বলার যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যায়। অন্যদিকে, তারিখের গোলমাল থেকেই বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটাব নথিপত্র খুব পরিষ্কার নয়।

কী ঘটেছিল? জুলাইএব শেষ সপ্তাহেব সেই মঙ্গলবাবে সুশোভন একটা আয়না ভেঙেছে।

সুশোভনের বাবো বছবের ছেলে বলেছে, আয়নাটা গোল ছিল, মোটা কাচের ছিল, রুপোব শিকল দিয়ে দেয়ালেব গায়ে ঝুলানো থাকতো।

সুশোভনের স্ত্রীব সাক্ষ্য একটু অন্যরকম —আয়নাটা বেলজিযান গ্লাসের না হলেও বিলেতি ; ঠিক গোল নয়, ওভাল সাইজ। দেয়ালেব গায়েই ঝোলানো থাকতো তবে রুপোর শিকল দিয়ে নয়, শিকলটা যে ধাতুবই হক ক্রোমিযাম প্লেটেড। বাড়িতে, (বাড়ি কথাটাই মুখে আসে ; বারো বছর ধরে এই ভাড়াটে বাসায় বাস করার ফলে মায়া জন্মেছে অনেকটা) আরও আয়না আছে। দাড়ি কামানোর কেসে লাগানো ছোট আয়নাটা থেকে শুরু করা যায়। বিয়ের যৌতুক ড্রেসিং টেবিলের চৌকোণা বড় আয়নাটা এবং অতিথি অভ্যাগত এলে এগিয়ে দেখা যায় এমন ভাঁজ করা মাঝারি দামের আয়নাখানাকেও হিসাবে আনতে হবে। দাড়ি কামানোর কেসে লাগানো আয়নাটা কাচের নয়, কী একটা উজ্জ্বল ধাতুর। অনেকদিন হলো কেনার পবে। দু এক জায়গায় মরচে পড়েছে। অবশ্য, এখনও দাড়ি কামানো চলে। ড্রেসিং টেবলের আয়নাটা এখন ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে থাকে। দিশি আয়নার যা হয়—কাচের পিছনের আস্তর খসে যাওয়ার ফলে ছবি হলদে এবং অস্পষ্ট দেখায়। এজন্য কাউকে দোষ দেয়ার কিছু নেই। সুশোভনকে কেউ ঠকানোব চেষ্টা করেনি। বিয়ের পরে পনের বছর পার হয়ে গেলে যৌতুকের আয়না বিবর্ণ হয়ে থাকে। অবশ্য, সুশোভনের স্ত্রী বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে পারে তার বাবা মেয়ের বিয়েতে যথাসাধ্য ভালো দেবার চেষ্টা করলেও মধ্যবিত্ত একজন ভদ্রলোকের যথাশক্তি চেষ্টা অর্থবান ব্যক্তিব সাধ্যের তুলনায় নিশ্চয়ই অকিঞ্চিৎকর। টাটা-বিড়লা কিম্বা কোন টাকার কুমীর টাইকুন তার মেয়ের বিয়ের যৌতুকে যে আয়না দেয় তা হয়তো তিনপুরুষ পরে উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য হতে পারে। আর স্বামী এবং পিতা দুদিক থেকেই

সুশোভনের স্ত্রী নিজেকে মধ্যবিত্ত বলে জানে। মধ্যবিত্ততার প্রমাণ, এই তিন কামরার ভাড়াটে বাসায় বারো বছর ধরে বাস করা। আগে তেমন মনে হতো না, এখন ছেলেমেয়ে বড়ো হওয়ায় বাড়িটাকে ছোট বলেই মনে হয়। ছেলের বয়স বারো। বাইরের দিকের ঘরটা আগে বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এখন সে ঘরেই ছেলের পড়বার টেবল এবং শোবার ছোট খাট। তার বাঁ দিকের ঘরখানা যাকে আগে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সুশোভনের স্ত্রী সেলাইয়ের ঘর এবং লাইব্রেরি বলতো, এখন সেটাকেই মেয়ের জন্য সাজিয়ে দিতে হয়েছে। মেয়ের বয়স তো এগারো হয়ে গেল। মেয়ের জন্য ঘর সাজাতে গেলে ড্রেসিং টেবল দিতে হয়। সুশোভনের যৌতুকের ড্রেসিং টেবল মেয়ের ঘরেই থাকে। এ দুখানা ঘরের পরেই সুশোভনের শোবার ঘর। অন্য ঘর দুখানায় যেমন, এ ঘরখানাতেও গালিচা বা ম্যাটিং পাতা নেই। লাল মেঝের ঘর, সে মেঝে ঝি প্রতি সকালেই একবার ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দেয়, সুশোভনের স্ত্রী প্রতি সন্ধ্যায় নিজ হাতে ঝাঁটা দেয। তা হলেও ওরই মধ্যে ঘরটা ছিমছাম করে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করে সে। ঘরটার দক্ষিণদিকের দেয়ালের কাছে শোবার খাট। উত্তরদিকের দেয়ালের কাছে একটা টেবল, একখানা চেয়ার, একটা ছোট র‍্যাক। টেবলে চিঠি লেখার প্যাড, ঝিনুকের তৈরি স্ট্যান্ডে একটা কলম। র‍্যাকে খানকয়েক উপন্যাস। এই দেয়ালেই একটা কাপড়চোপড়ের আলমারি। পশ্চিম দেয়ালের বেশির ভাগই ফাঁকা, একটা ছোট আলনায় খানকয়েক কাপড়। আর সেই দেয়ালেই একটা লোহার গোঁজ থেকে ডিম্বাকৃতি সেই বিলেতি আয়নাটা ক্রোমিযাম শিকল থেকে ঝুলতো। দাড়ি কামানোর জন্য এটাকে ব্যবহার করতো না সুশোভন। স্নান সেরে চুল আঁচড়াতে সুশোভনের স্ত্রী মেয়ের ঘরের ড্রেসিং টেবলের সামনেই গিয়ে থাকে। অফিস, বরং ব্যাঙ্কই বলতে হয়, যাওয়ার মুখে পোশাক পরে সুশোভন তার শোবার ঘরের ওভাল আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াতো, কখনও বা পাতলা হয়ে আসা খয়েরি চুলে ব্রাশ চালাতো দু-এক টান। আর সুশোভনের স্ত্রী--সুশোভনের বাড়িতে ফেরার সময় হলে চুলে কোন কোন দিন দু এক টান চিরুনি দিতো, এবং প্রতিরাত্রিতে শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে স্তিমিত আলোটা জ্বালার আগে ওই ডিম আয়নাটার সম্মুখেই দাঁড়াতো।

সেই আয়নাটাই এক মঙ্গলবারে ভেঙে গিয়েছে।

সুশোভনের স্ত্রী তখন রান্নাঘরে ছিল। শব্দটা খুব জোরেই হয়ে থাকবে। সে প্যানের দিকে নজর রেখে বলে উঠেছিল :--কী হল? তখন-তখনই এর চাইতে বেশি খোঁজ নেয়নি সে। কারণ কাঁচা লঙ্কা, রসুন মাখনে সাঁতলে সে বিশেষ ধরনের একটা সস তৈরি করছিল। কিছু পরেই অবশ্য তার মনে হয়েছিল—ব্যাপারটা সাধারণ নয়, কেউ সাড়া দিল না। এরপরে প্যানটাকে উনুন থেকে নামিয়ে শব্দটাকে আন্দাজ করে সে নিজের শোবার ঘরেই এসেছিল। প্রথমটায় সে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করেছিল--কি করে হল? শিকল থেকে আয়নার ফ্রেমটা খানিকটা কাচসমেত দেয়ালে ঝুলছে তখনও, কিছু কাচ মেঝেতে ছড়ানো। পড়ে ভাঙেনি। কেউ কিছু ছুঁড়েছিল? তা হলে ছেলে কিম্বা মেয়ে? তোরা এত অসাবধানী বলে সে গাল দিয়ে উঠেছিল প্রায়। প্রায় বললুম এজন্য যে গালটা মুখে ফুটবার আগেই সে দেখতে পেয়েছিল, (এসব ঘটতে এক লহমাও লাগে না। কোনটা আগে কোনটা পরে ঘটেছে, বলাও কঠিন) সুশোভন আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে ; আর, আর--তার হাতে চেরি কাঠের সেই লাঠিটা যা গতবার সখ করে সে নিজেই কিনেছিল সুশোভনের জন্য। (সখ মানুষের নানা রকমেরই হয। এ ক্ষেত্রে সখের একটা যুক্তি ছিল : সুশোভন এখন এই বেয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রৌঢ় হয়েছে ; সিগারেটের বদলে সিগার ধরার মতোই তার গাঢ় রঙের সুটের সঙ্গে বেরোনোর লাঠিটা মানাবে।—এই চিন্তাগুলোই সুশোভনের স্ত্রীর মনের উপরে বয়ে গেল। সকলেই জানেন এর জন্য সময় ব্যয় হয় না।) হ্যাঁ, সেই, মুখ-বাঁকানো চেরির লাঠিটা সুশোভনের হাতে আর তার সম্মুখে সেই ভাঙা আয়না। এদিক ওদিক চাইল সুশোভনের স্ত্রী। কেউ

কেউ উপায় খুঁজতে এদিক ওদিক চায়, যদিও উপায় উদ্ভাবনেব ক্ষেত্রটা একমাত্র মনের মধ্যেই অবস্থান করে। সুশোভনের স্ত্রী তখন দেখতে পেল দরজাব কাছে ছেলে আর মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তাদেব বলল—তোরা যা, তোরা যা। তারা চলে গেলে সে মুখের দিকে চাইল। কী দেখল সে? সুশোভনের গায়ের রং হলুদের ধার ঘেঁষা সাদা—মধ্যবিত্ত সুশোভনেব। ব্যাঙ্কারের অথবা ব্যাঙ্ক-এজেন্টের যেমন আশা করা যায়। এগুলো হয়তো যকৃতের কর্মদক্ষতার তারতম্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুশোভনের চোখের দৃষ্টি এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাকে সাবধানী বলা যেতে পারে। সুশোভনের স্ত্রী দেখতে পেল · সুশোভনের মুখ একেবারে মরার মতো সাদা, চোখ দুটো বিস্ফারিত, পলক পড়ছে না। কপালে পোড়ার ফোস্কার মতো একসার ঘাম। সুশোভনের স্ত্রী তখন বলল, সরে যাও, ভাঙা কাচে পা কাটবে।

সুশোভন সরে গিয়েছিল, বিছানাব উপরে গিয়ে বসেছিল ; খাটের পাশে ছোট টিপয়টাব উপরে সিগার কেস এবং দেশলাই দেখতে পেয়ে সিগাব ধবিয়েছিল। আর সুশোভনের স্ত্রী ঝাঁটা দিয়ে মেঝে থেকে কাচের টুকরোগুলোকে সরিয়ে ফেলেছিল।

এমন কি রাত্রিতে আহাবের সময়ে কোন বৈলক্ষণ লক্ষ্য করেনি সুশোভনেব স্ত্রী। যদিও এই ঘটনাটাব এক ঘণ্টার মধ্যেই সুশোভন, বোজকাব মতো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেছিল—বিশদ করে বলতে হলে সুশোভনেব স্ত্রী খাওয়াতে বসেছিল তাদের।

এই তো ঘটনা। তিন সপ্তাহ আগেকার সেই মঙ্গলবার বাত্রির পর থেকে আজ পর্যন্ত—আর একটি মঙ্গলবাব যখন এগিয়ে আসছে, খুব দ্রুতই আসছে, আব কিছুই ঘটেনি।

বুধবার সকাল থেকেই সুশোভন যথারীতি তার ব্যাঙ্কে যাচ্ছে। কিছুই কি পরিবর্তন হযেছে?

জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন, মানুষের প্রতিনিয়তই পবিবর্তন হচ্ছে। তাঁদের দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে প্রতিনিযত যদি সেই পরিবর্তনগুলোকে ধরবার অন্য আমরা সেই বিশেষ মানুষটিকে লক্ষ্য করি, পবিবর্তনগুলো আমাদের দৃষ্টিতে ধবা পড়বে না। সুশোভনের স্ত্রী আজকাল বিশেষ নজর রাখছে সুশোভনেব উপবে। তাকে চিন্তা করতেও হচ্ছে, আর তা করতে গিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদেব এসব উক্তিও তার মনে যাওযা-আসা করছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও পবিবর্তনের খুব একটা-কিছু নজির কি তার চোখে ধরা পড়েছে?

কাল সন্ধ্যাবেলার সেই ঘটনাটার? কাল ববিবার ছিল। ছেলে-মেয়েকে পড়ানোব জন্য মাস্টাব আছে। কোন কোন সন্ধ্যায়, ব্যাঙ্কে কাজ কম থাকলে, সুশোভন ছেলেমেয়েব লেখাপড়ার খোঁজখবর নেয়, অন্তত আয়নার সেই ঘটনাব আগে নিত। কাল সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে নিজে থেকে একটা বই নিযে সুশোভনের কাছে গিয়ে বসেছিল। কী একটা কবিতার সাবমর্ম কী হবে এই ছিল মেয়ের জানবার বিষয়। মেয়ে কাছে গিয়ে বসতে সুশোভনের স্ত্রী ভালোই হল ভেবে রান্নাঘবের দিকে গিয়েছিল। ভেবেছিল—এ বুদ্ধিটা ছেলেমেয়েকে সে দেবে যাতে তারা নতুন কিছু করছে এমন বুঝতে না দিয়ে, কেউ না কেউ তাদের বাবার কাছে সন্ধ্যায় বসে। তা হলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নায় মন দিতে পারে—রান্নার পরিমাণটা বেশি নয়, টুকটাকি বিষয়ে নজর রেখে সেটাকে ভালো করে তোলাই কথা। কিন্তু মেয়ে কাছে বসলেই সুশোভনের স্ত্রী নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নায় মন দিতে পারেনি। কী রকম দাঁড়াল, দেখবার জন্য প্রথমে জানালার ধারে দরজার আড়াল থেকে সে উঁকি দিয়েছিল। প্রথমটায় সে দেখল, মেয়ে বই খুলে কিছু বলে যাচ্ছে, আর সুশোভন তার স্বাভাবিক সাবধানী দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে আছে, প্রত্যেকটা শব্দই মন দিয়ে শুনছে। তারপর তার মেয়ে থামল, প্রশ্নটা তুলল আবাব। আর ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল। প্রায় দু-তিন মিনিট এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুশোভন মেয়ের দিকে, তারপরে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জানলাটার কাছে মেয়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। না, এ নিয়ে আলোচনা

করেনি সে। বরং পাছে মেয়ে কিছু মনে করে বসে, সেই ভয়ে সে মেয়ের কাছে গিয়ে বসেছিল এবং এ কথা সে কথার মাঝখানে একবাব বলেছিল –আজ রবিবার হলেও তোদের বাবাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে ; বোধ হয় গরমে।

কিন্তু এরকম কথা দিয়ে আড়াল করা যাবে. যদি সত্যি আড়াল করার মতো কিছু ঘটে থাকে? ছেলেমেয়েরা বড় হযেছে. তারা কি পরিবর্তনটা ধরতে পারবে না? অথচ. কাল সন্ধ্যাবেলার ব্যাপারটা সত্যি কি একটা ঘটনা?

কাল একটা ব্যস্ত দিনই ছিল। পরিবারের লোকেরা ছাড়াও অন্তত দুজন বাইরের লোকের সঙ্গে সুশোভন অনেকটা সময় কাটিযেছে। পাড়ার মুরুব্বি মহেন্দ্রবাবু এবং পারিবারিক চিকিৎসক রায়চৌধুরী। কোন কোন রবিবারে মহেন্দ্রবাবু এসে থাকেন। বেলা আটটায় চায়ের কাপের সামনে বসে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে অলস মেজাজে সমাজ. শহর, দেশ, রাজনীতি এসব বিষয়ে আড্ডা দেযা চলে। মহেন্দ্রবাবুব বয়স হয়েছে বলেই ঝাঁজ নেই তাঁর কথায়, সুশোভন স্বভাবতই আত্মতৃপ্ত বলেই এসব বাইবের বিষয়ে কদাচিৎ জোরালো কিছু বক্তব্য থাকে তার। আত্মতৃপ্ত হওয়াটা তার পক্ষে অযুক্তিবও না, মধ্যবিত্তর মাপে সে একরকম সুপ্রতিষ্ঠিত তো বটে। আর ডাক্তারও সব সময়ে রোগী দেখতেই আসেন না। নিছক গল্পগাছা করার জন্যও আসেন। যেমন কাল বিকেলে এসেছিলেন। কি মহেন্দ্রবাবু, কি ডাক্তার রায়চৌধুরী কিছু ঘটেছে, কিছু হযেছে বলে মনে করেন নি। অবশ্যই সুশোভনের স্ত্রী তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেনি, কারণ তা করা এখনও অন্তত আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু বাইবে জানালাব পাশে দাঁড়িয়ে, তা সে সকালে মহেন্দ্রবাবুর জন্য চা পাঠিয়ে দিয়ে যেমন, বিকেলে ডাক্তার বায়চৌধুরীব জন্য সরবৎ পাঠিযেও তেমনি, সুশোভনেব স্ত্রী আলাপে কান রেখেছিল। সুশোভন অনুচ্চস্বরে কথা বলে থাকে, তেমনি করেই সে কথা বলছিল। একবার, শুধু একবারই সুশোভনেব স্ত্রীর মনে হয়েছিল, সুশোভন কথা কম বলছে, খুবই কম বলছে, কেমন যেন কতকটা স্তব্ধ ভঙ্গি।

এই বিষয়গুলোকে চিন্তায় আনলে সন্ধ্যায় মেয়ের লেখাপড়ার সময় যা ঘটেছিল তাকে আর ঘটনা বলে মনে হয় না। আরও প্রমাণ এই, কাল সন্ধ্যার পব থেকে আজকের এই দুপুব পর্যন্ত এতটুকু অস্বাভাবিকতা কোথাও দেখা যায়নি। ব্যাঙ্কে গিয়েছে সুশোভন।

শোবার ঘরের ছোট আলনাটাকে গুছিয়ে রাখছে এখন সুশোভনের স্ত্রী। তা করতে করতে এসব চিন্তা করছে সে। চিন্তা তাকে করতেই হচ্ছে। শুধু সংসারের উপার্জনকারী নয়, শুধু ছেলেমেয়েব বাবা নয়, তার চাইতে বেশি অনেকটা—এব আগে এমন কবে ভাবে নি বলেই সুশোভনের স্ত্রী এমন স্পষ্ট করে কথাটা নিজের কাছেও বলেনি—বিবাহিত জীবনেব সর্বত্র ছড়ানো অনুভূতি এমন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ; একটা পুরুষোচিত ভাব আছে সুশোভনের মধ্যে যা তাকে খুব নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে থাকে। কথাটা যে প্রামাণিক তাতে সন্দেহ নেই। সিগারেটের চাইতে সিগার একটু বেশি পুরুষোচিত নয়? সুশোভনের সিগারেটের গন্ধ প্রিয় ছিল তার স্ত্রীর কিন্তু সুশোভনের মুখে এখন সিগারই যেন তার কাছে প্রিয়তর মনে হয়।

আলনা গোছাতে গোছাতে হঠাৎ থেমে গেল সুশোভনের স্ত্রী। আজ সকালে বিস্কুট রং এর যে কর্ডের প্যান্টটা সুশোভনের পরার জন্য সে বার করে দিয়েছিল সেটা আলনার উপরেই রয়েছে। জোড়মিলানো জিনিসের একটিকে দেখলে অন্যটির কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়। তসরের ম্যানিলা শার্টটাকে খুঁজল সুশোভনের স্ত্রী কতকটা হালকাভাবেই। প্যান্টটা যখন রয়েছে, শার্টটাও থাকবে—এতো ধরেই নেয়া যায়। আশ্চর্য, শার্টটা নেই! শার্টটা পরেছে তা হলে সুশোভন ; কিন্তু কীসের সঙ্গে। গত সপ্তাহের প্যান্টটা আলনার নিচেব দাঁড়ায় আছে। তাহলে? হাত অসাড় হয়ে গেল, গলা কাঠ হয়ে উঠল। তা হলে? হতাশ অবসন্নের মতো সে আবিষ্কার করল, গত সপ্তাহের

বাড়িতে পরার আধময়লা ধুতিটা নেই আলনার নিচের দাঁড়ায়। ভাবতে ভয় করে উঠল তার, আজ আর কারো জানতে বাকি থাকবে কি? আধময়লা ধুতির সঙ্গে তসরের ম্যানিলা পরে রাস্তায় চললে, অফিসে বেরুলে লোকে কী ভাবে?

স্বামী অফিসে বেরোবার সময়ে পোশাকটা দেখে দিলেই পারো—এমন একটা নির্দেশ যেন কেউ দিল। এটা তো উপদেশ, যা সাধারণত গুরুজনেরা নতুন গৃহিনীদের দিয়ে থাকে। কিন্তু সুশোভনের, সংসারে এটা প্রযোজ্য নয়। সুশোভন এবং তার স্ত্রী কিছুদিন আগে স্থির করেছিল আলোচনা করে—এখন ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের স্কুলে যাওয়ার সময়েই বরং তাদের কাছে মায়ের উপস্থিতির দরকার। এই উপস্থিতি স্নেহের একটি চিহ্ন হিসাবে নেবে ছেলেমেয়েরা, এবং তাতে তাদের উপকারই হবে। আর এসবই বেলা দশটার চাপ, এঘরে সুশোভনের স্ত্রী যখন মেয়ের ঠিক বেরুনোর মুখে। তা হলেও প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, দুএকদিন হয় না। আজ হয়নি।

হঠাৎ একটা অবসন্নতা বোধ করল সুশোভনের স্ত্রী। আলনার সামনে মোড়াটার উপরে সে বসে পড়ল। এতদিন—এই তিন সপ্তাহ যাকে সে বুদ্ধির সাহায্যে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছিল, সেটাই যেন তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। সব কিছুই যেন বিষাদে অবসন্ন হয়ে আসছে। বিষণ্ণ, বিষণ্ণই কথাটা। দিনের শেষে সুশোভন যখন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরবে, হাঁটতে হাঁটতেই ফেরে সে, ওতে ডিসপেপসিয়া নাকি জব্দ থাকে—ব্যাঙ্ক থেকে ফেরবার পথে তাকে কি ভয়ঙ্কর অবসন্ন দেখাবে না? আধময়লা ধুতির সঙ্গে তসরের ম্যানিলা শার্টে বেমিছিল ভাঙা মানুষের মতো দেখাবে না?

আবিষ্কারের মতো আকস্মিক হয়ে দেখা দিল প্রশ্নটা—ভাঙা মানুষ? একটা মানুষ যে চিড় খেয়ে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে। কী করবে খুঁজে পেল না সুশোভনের স্ত্রী। এখন অনেকটা সময় তাকে একা থাকতে হবে এবং দুশ্চিন্তা করতে হবে। একবার সে উঠে গেল, সেই চেরিকাঠের লাঠিটা তুলে আনল। না, লাঠিটার গায়ে এতটুকু একটা দাগ ছাড়া বড় কোন চিহ্ন নেই। এখন থেকে তিন সপ্তাহ আগে, মঙ্গলবারে রাত নটায় যা ঘটেছিল তার কোন প্রমাণই ধরে রাখেনি লাঠিটা।

কিন্তু চিহ্ন কি ওভাবে থাকে? ঘড়ির ডায়ালে যেখানে নয়ের অঙ্কটা লেখা সেখানে কি দাগ পড়েছে? কোনদিনই পড়বে না, তা সত্ত্বেও—মঙ্গলবারে রাত নটাতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। কাল আবার মঙ্গলবার। কাল রাত নটায় বা তার কাছাকাছি সময়ে কিছু কি ঘটতে পাবে না আবার?

সুশোভনের স্ত্রী উঠে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্কে যারা চাকরি করে তারা সাধারণত দেরি করেই ফেলে। রাত নটাও বাজে কোন কোন দিন ফিরতে, বিশেষ করে ব্যাঙ্কের ষান্মাসিক তামামির দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে। তা হলেও অন্য সকলের স্ত্রীর মতো সুশোভনের স্ত্রীকেও বিকেল থেকে অফিস-ফেরত পুরুষ মানুষটির জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সেদিকেই এগিয়ে গেল সে।

স্বাভাবিক সময়ে যা মনে আসে না, একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তাই উৎকণ্ঠায় বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে। আজ বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে না সুশোভনের? রাত আটটা বাজে প্রায়। কিন্তু উসখুস করে বেড়ালে চলবে না। ছেলেমেয়ের সামনে অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত হবে না। এ পর্যন্ত দুবার সে বাইরের দিকের বারান্দায় গিয়ে রাস্তাটাকে লক্ষ্য করে এসেছে, কিন্তু তা ছেলেমেয়েদের না জানিয়ে, কাজের ছুতোয়।

তিনবারের বার সুশোভনকে সে দেখতে পেল দূর থেকেই, নিজেদের গলিপথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই। আর—আধময়লা ধুতি, ম্যানিলা শার্ট, ছাতাটাও ক্লান্ত ভঙ্গিতে বগলে ধরা। একটু নুয়েও যেন পড়েছে সুশোভন। বিষণ্ণ, স্তব্ধ। বিষণ্ণতার মধ্যেও কখনও তীব্রতা থাকে, ধারও থাকে, ট্র্যাজেডির মাপা ধারালো কথার মতো, এ যেন ভোঁতা একটা ব্যথা। এমন হল কেন, বলে সুশোভনের স্ত্রীর বুকের মধ্যে তার আত্মাটাই যেন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু বাইরে তার অস্থির হলে চলবে না।

ক্ষুধার্ত মানুষ আহার্য সংগ্রহ করে বাজার থেকে ফেরে, শরীর খারাপ হলে ডাক্তার ডাকে—এ সবই স্বাভাবিক ; কিন্তু বিষণ্ন কেউ গান গেয়ে উঠছে কিম্বা আতর মাখছে, একি আগের উদাহরণ দুটোর নজিরে স্বাভাবিক বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে কেমন একটু অস্বাভাবিক নয়? সুশোভনের হাতে মিষ্টির একটা বাক্স, একঝাড় রজনীগন্ধা, বেশ মোটা প্যাকেটে একখানা বই। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রজনীগন্ধার ঝাড়টা সুশোভনের স্ত্রীব গালে হাল্কাভাবে লেগে গেল।

পাশে পাশে হেঁটে শোবার ঘরে এল তারা। স্ত্রী সুশোভনের হাত থেকে রজনীগন্ধাব ঝাড় নিয়ে ফ্লাওয়ার ভাসে সাজাল। দেয়ালের কোণে ছাতা রাখল সুশোভন। স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে বইএর প্যাকেট আর মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে টিপয়ের উপরে বাখল।

বলল, হাত মুখ ধুয়ে এসো, সরবৎ দিই।

সুশোভন বাথরুমে গেলে আলমারি থেকে ধুতি গেঞ্জি বার করল তার স্ত্রী। একটু ভেবে ধুতি গেঞ্জিতে একটু সেন্ট লাগিয়ে দিল। এখন সে বুঝতে পাবছে তার গালে যে রজনীগন্ধার ছোঁয়া লেগেছিল সেটা হয়তো হঠাৎ নয় ; তার পিছনে ইচ্ছা ছিল সুশোভনের?

ভালোই হল, খুব ভালোই হল, এ ভাবে যদি সুশোভন নিজেই প্রতিকার খুঁজে বার করে। পুরুষ তো বটে, পুরুষের মতো ভঙ্গিতে যদি সে সব ঘটনাকে অস্বীকার করে, ঝেড়ে ফেলে দেয—তাব চাইতে ভালো আর কী হতে পারে? সুশোভনের স্ত্রীর কথা বলতে ইচ্ছা হল, বক বক করা যাকে বলে, অনেক কথা ; এ কযেকদিন বাধা ছিল যেন, অনেক কথার চাপ, তাই যেন বোধ কবল সে।

সুশোভন ফিরে এলে কাপড় গেঞ্জি তুলে দিল তার হাতে। তারপর সে যতক্ষণে কাপড় গেঞ্জি পালটাল, সুশোভনের স্ত্রী সরবৎ নিয়ে এল, আব একখানা প্লেট। মিষ্টির বাক্স খুলে কিছু সাজিয়ে দিল প্লেটে। সুশোভন বসলে, একটা মোড়া সরিয়ে আনল সুশোভনেব স্ত্রী। কিন্তু বসতে পারল না। একটু চঞ্চলতাই যেন সে বোধ করছে। চুরুটের বাক্স আর দেশলাই এনে রাখল টিপয়ে। চামচ দিয়ে মিষ্টি ভেঙে ভেঙে মুখে দিল সুশোভন, সরবতেব গ্লাসটাকে হালকাভাবে ধরে ধীবে ধীবে চুমুক দিল। আর তা দেখে তার স্ত্রী স্বস্তি অনুভব করল, ঠিক আগের মতোই হচ্ছে এসব। ঠিক তখনই মনে হল সুশোভনের স্ত্রীর, এই আমেজটাকে ভেঙে দেয়া উচিত নয়। সে নিঃশব্দে বসে থাকবে, অপেক্ষা করবে। কোন ঘটনা না ঘটে সন্ধ্যাটা থেকে রাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে যাক। কথা নয়, কোন কথাই নয়। রজনীগন্ধাব ঝাড় থেকে, সুশোভনের জামা-কাপড় থেকে মৃদু সুবাস আসছে। এর পরে চুরুট ধরাবে সুশোভন। আর চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধ এই সুবাসে মিশবে। সুগন্ধের এই মিশ্রণটা সুশোভনের স্ত্রীর প্রিয়। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেক স্ত্রীলোক এবং অনেক পুরুষও সিগারের গন্ধে আপত্তি করে ; কিন্তু সুশোভনেব স্ত্রী বেশি পরিচ্ছন্ন করে তার মতামতটাকে এ বিষয়ে প্রকাশ করতে পারে, কারণ এখন এই মুহূর্তেই সে ব্যাপাবটাকে আবাব নতুন করে অনুভব করতে পারছে—এটা তার নিজের পুরুষের গন্ধ, সুশোভনেব স্ত্রীব মনে হল এই তীব্র ঝাঁজালো গন্ধটাকে গভীর কবে নিশ্বাসে টেনে নিলেই তার তৃপ্তি হয।

বইয়ের প্যাকেটটার উপরে হাত রাখল সুশোভন। আর তা দেখে প্যাকেটের সুতো কাটবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে কলমকাটা ছুরি এনে দিল তার স্ত্রী।

এটা কি দ্বিধা, সুশোভন যা করছে ছুরিটাকে হাতে নিয়ে? সুশোভনের স্ত্রী আবার একটা চঞ্চলতা অনুভব করল। না, ভয় নয় ; ভয কীসের? কেউ যেন তার মনের মধ্যে ফিসফিস করে বলল, চঞ্চলতা প্রকাশ কোরো না। বরং উঠে যাও। কাজের ছুতো করে দু-মিনিট বাইরে কাটিয়ে এসো বরং, তোমার চাঞ্চল্য আবার তেমন কিছুকে উলটে পালটে দিতে পারে। আপাতত যা দেখছ তা একটা শুভ স্বাভাবিকতার সূচনা হতে পারে, তাকে নষ্ট কোরো না।

কিন্তু সুশোভনই বলল, বলে উঠল কথাটা : কাল মঙ্গলবার।

আর কী বাকি রইল? আর কী বাকি রইল? সুশোভনের স্ত্রী উঠে দাঁড়াল। হায়! সে চঞ্চলতাকে দূরে রাখতে চাইছিল। দুটো হাতকে একত্র করে সে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল। সে কি দাঁত দিয়ে ঠোঁটও চেপে ধরবে, কিম্বা ছুটে পালাবে! বইয়ের প্যাকেট খুলতে দেরি হচ্ছে দেখেই সে ভয় পেয়েছিল, আর এখন?

অস্ফুট স্বরে আসছি বলে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

দু-মিনিট দাঁড়াল সে বাইরে। এই ভয়ই করছে সে এক সপ্তাহ ধরে, এখন সেই মঙ্গলবারটাকেই আবার মনে পড়ে গেল। জানালার গরাদ চেপে ধরল সুশোভনের স্ত্রী। এই সম্ভাবনাটাই অনির্দিষ্ট আতঙ্কের মতো তিন সপ্তাহ ধরে তার চারিদিকে কুয়াশার মতো জমছে।

খুক করে কাশল সুশোভন। ডাকল নাকি? কান পাতল সুশোভনের স্ত্রী। হ্যাঁ ডাকছেই তো— 'শুনছো' এই যেন বলল।

ঘরে ফিরল সুশোভনের স্ত্রী। ইতিমধ্যে, দেখা যাচ্ছে, বইয়ের প্যাকেটটা খুলেছে সুশোভন। মুখের সামনে বইটা মেলে ধরা বলে মুখটা দেখা গেল না। কিন্তু পায়ের শব্দে বই সরাল সুশোভন।

স্ত্রীকে দেখে বলল, শোনো।

স্ত্রী এগিয়ে গেলে সে বলল, বসো।

স্ত্রী বসল, সে বলল,--কাল আবার মঙ্গলবার।

আবার? কিংবা কথাটা ঠিক আবার নয়, একই আবর্তের আর একটি পাক। তিন সপ্তাহ আগে থেকে যে আবর্তে মন ঘুরে ঘুরে চলেছে। আর এই ফুল, এই মিষ্টির বাক্স, এই বই সেই আবর্তে ভেসে বেড়ানোর অসংলগ্নতা। কিন্তু এখন তাকে দৃঢ় হতে হবে, কঠোরতা না দেখিয়ে দৃঢ়। হাসির মতোই কিছু একটা মুখে টেনে আনতে হবে। হাসি নয়, এ বাড়ি থেকে হাসি কি মুছে যায় নি?

সুশোভনের স্ত্রী বলল, আজ সোমবার যাচ্ছে, কালতো মঙ্গলবার হবেই।

সুশোভন বলল, কাল ছুটি।

ছুটি?

জন্মাষ্টমীর।

সুশোভনের স্ত্রী উঠে দাঁড়াল, ঝোলানো অ্যালম্যানাকে তারিখটা দেখল। ছুটির দিন কয়েকটি অ্যালম্যানাকে লাল তারায় চিহ্নিত থাকে। সত্যি কাল মঙ্গলবারে ছুটি।

ফিরে এসে বসল মোড়াটায়। সত্যি ছুটি দেখছি, বলল সে।

এখান থেকেই স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু করা যেতে পাবে। সে বলল, কী বই এনেছো?

সুশোভন বলল, কাল একবার ডাক্তারকে খবর দিও তো, আসতে বলো।

—জিজ্ঞাসা করলাম কী বই।

—মনস্তত্ত্বের, না ঠিক তা নয়, মনোবিকলন সম্বন্ধে।

বইয়ের নাম সোনালি অক্ষরে ছাপা। দেখাল সুশোভন স্ত্রীকে।

—মনোবিকলন? মানে—

সুশোভন বলল, হ্যাঁ মনোব্যাধির চিকিৎসায় সাহায্য করে।

—হঠাৎ? তোমার এ হবি কি ছিল কখনও? হাসবার চেষ্টা করল সুশোভনের স্ত্রী।

—দেখি ; কৌতূহল ছাড়া আর কী বলবো? আজকাল নির্জ্ঞান মন নিয়ে খুব আলোচনা হয়ে থাকে।

—ডাক্তারকে খবর দিতে বললে—

—এমন কিছু কাজ আছে তা নয়। রায়চৌধুরী বোধ হয় সাইকাইয়াট্রির কিছু জানে না।

প্যাথোলজি, মেডসিন আর সাইকাইয়াট্রি এক নয়। তবু ডাক্তার।

—সাইকাইয়াট্রি? মানে—

—জানো—

বইএর পাতা উল্টাতে লাগল সুশোভন।

- কিছু বললে? এই বলে সুশোভনের স্ত্রী আবার আলাপে আনতে চাইল স্বামীকে।

সুশোভন চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, কিছু যেন খুঁজল।

—কী খুঁজছ?

—সিগারের বাক্সটা।

সুশোভনের স্ত্রী চমকে উঠল। সামনে অ্যাশট্রেতে সদ্য ধরানো সিগারটা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কী ভুলো মন। সামনেই তো রয়েছে, আবার হাসার চেষ্টা করল এই বলে, সুশোভনের স্ত্রী। বইখানাকে টিপয়ে রাখল, সিগারটা তুলে নিল সুশোভন।

—জানো—

—বলো।

—ব্যাপারটা নির্জ্ঞান মনের ব্যাপার নয় হয়তো আদৌ। আজ থেকে তিন সপ্তাহ আগে মঙ্গলবারে, সুশোভন বলল, তুমি কি কিছু শুনেছো? থানা পুলিশের ব্যাপার? মঙ্গলবার ব্যাঙ্কে গেলে আমাকে ওরা গল্পে গল্পে বলেছিল। না, টাকা পয়সার গোলমাল নয় যে অমন মুখ শুকিয়ে উঠবে তোমার। বাইরে মানে ব্যাঙ্কের বাইরে এই শহরেই ঘটেছে , ক্রাইম। খুন বলেছিল ওরা, কিন্তু একটু খবর নিয়েছি। খুন মানে মার্ডার নয়, নরহত্যাই যাকে ঠিক মার্ডার বলা যায় না। অর্থাৎ একেবারে খুন করে ফেলার ইচ্ছা ছিল না বলে পুলিশের ধারণা।

থামো, থামো, এসব কী বলছো? সুশোভনের স্ত্রী মনে মনে প্রায় চিৎকার করে উঠল। তোমার পায়ে পড়ি, থামো।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সুশোভন, কিন্তু তখনই আবার উঠে বসল। তার মুখে যে বিবর্ণতা দেখা দিয়েছিল তার পাশ দিয়েই স্বাভাবিক রং আবার দেখা দিল যেন।

বলল সে, ব্যাপারটা তোমাকে বরং বলি। সোমবার রাত্রির ব্যাপার, মঙ্গলবারে আর চেপে রাখা যায় নি। সেই সোমবার ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে আমার রাত হয়েছিল, মনে পড়ছে? প্রায় নটায় ফিরেছিলাম। খুনটা হয়েছে আমি যে পথে বাড়ি ফিরি সেই পথের উপরেই।

এখন? এখন কি সুশোভনের স্ত্রী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে পালাবে? কিন্তু সুশোভন বলল, তোমার মুখ একেবারে ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। ভয় পেয়েছো মনে হচ্ছে। সুশোভন বলল, কিন্তু তোমার বোঝা উচিত লিভার নিয়ে যাকে চিন্তা করতে হয় এমন একজন প্রৌঢ় ব্যাঙ্কার এমন অপরাধ ঘটাতে পারে না , যদিও আমার বাড়ি ফেরার পথের উপরেই পুকুর পারের সেই সাদা আধপুরনো বাড়িটাতেই খুনটা হয়েছে। আর তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি, খুনে আমার দায়দায়িত্ব কিছুই নেই। ওদিক দিয়ে আমি মোটেই চিন্তা করছি না।

হা ভগবান, আর কত সে সহ্য করবে? কিন্তু এ আলোচনাকে বন্ধ করা দরকার। সে কি মুখে হাতচাপা দেবে? ছেলেমেয়েরাও শুনে ফেলতে পারে। কিন্তু সে অনায়াসেই বুঝতে পারছে এখানে জোর করা যায় না। একটা উপায়ই আছে, সে উঠে যেতে পারে, সরে যেতে পারে।

উঠে দাঁড়াল সে।

যাচ্ছো?

আসছি।

কিন্তু সুশোভনের স্ত্রী আবার যখন ঘরে ফিরল তখন রাত নটা বেজে গিয়েছে। তার হিসাব

মতো সময়টা পার হয়ে গিয়েছে। পা টলে উঠলেও যাওয়ার সময়ে সে যেমন দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে, ফিরবার সময়েও তেমনি শান্ত একটা দৃঢ়তাকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতে লাগল।

অদ্ভুত নিঃশব্দ নয় ঘরটা! ঘড়ির মৃদু টিক টিক শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। সুশোভন ঘুমিয়ে আছে, চেয়ারের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটা বুকের উপরে খোলা অবস্থায় রয়েছে। তা হলে এ কয়েকদিন ধরে ঘুমও হচ্ছে না নাকি? এটা তাহলে ধরতে পারে নি সুশোভনের স্ত্রী। আর সে জন্যই কি তবে নির্জ্ঞান মানসে ডাক্তারের সাহায্যের কথা উঠেছে। নির্জ্ঞান মন -কী অদ্ভুত কথা। কত কথাই আধুনিককালে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সাইকাইয়াট্রির ধারে কাছে নয়। তার মূল ব্যাপারই হচ্ছে সব কিছু খুলে বলা। আর তা বলতে গিয়ে যদি খুনের গল্প সুরু হয় আবার?

দাঁত দিয়ে চেপে ঠোঁটের কাঁপুনি থামাল সুশোভনের স্ত্রী। চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। সুশোভন ঘুমাচ্ছে। সাদা কাগজের মতো দেখাচ্ছে, শুধু চিবুকটা যেন কিছুটা নীলাভ। কপালে অনেক ঘামের বিন্দু। আশ্চর্য এত ঘেমেছে কেন? গেঞ্জিটাও ভিজে মনে হল। যেন এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে।

মৃদু পায়ের শব্দ হয়ে থাকবে। সুশোভন চোখ খুলল, চেয়ারে উঠে বসল।

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, খেতে দেবে বুঝি এখন? চল।

সুশোভনের স্ত্রী বলল, খুব ঘাম হয়েছে। জ্বর ছাড়ার মতো যেন।

--হ্যাঁ তাই দেখছি। গুমোট হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল সুশোভন। রান্না ঘরে যেতে যেতে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল। সান্নিধ্যটাকেই যেন অনুভব করল।

গালে সেই রজনীগন্ধার ছোঁয়া, আর এখন এই কাঁধের উপরে হাত। সুশোভনের স্ত্রীর মনে পড়ল, বছর দুয়েক আগে মৃদু সানস্ট্রোকের মতো হয়েছিল। টেম্পারেচার কমতে সে যখন ঘামে ভেজা কাপড় গেঞ্জি পালটে দিয়েছিল,সুশোভন বলেছিল—আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছি, আর ভেবো না। এই ঘুমিয়ে পড়া যদি তেমন হতো।

কিন্তু কিছুই বলবে না সে। কিছু সে লক্ষ্য করেছে, কোন বিষয়ে সে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলেছে—এ কিছুতেই জানতে দেয়া চলবে না।

এটা যদি একটা আশার মতো কিছু হয়ে থাকে তবে তাকেই আঁকড়ে থাকা যাক, যদিও কাল মঙ্গলবার। কালই মঙ্গলবার একটা ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও।

চিরদিনই বিস্ময় বোধ হয়, অথচ চিরদিনই ঘটছে। শোকের উপর দিয়ে অবসন্নতার উপর দিয়ে, যে দিন কাটবে না মনে হয়েছে সে দিনটার উপর দিয়ে সময় গড়িয়ে গিয়ে আর একটা দিনে পৌঁছে যায়।

আজ মঙ্গলবার, এই মনে হল সুশোভনের স্ত্রীর মশারি তুলে মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে। দিনের আলো আসছে জানালা দিয়ে, রাতের রঙিন আলোটাও জ্বলছে। আলোটাকে নিবিয়ে দিল সে। তার পরনে টিসুসিল্কের শাড়ি। রাত্রির শাড়িগুলোর এটাও একটি। চেয়ারের উপরে ঘর থেকে বেরুনোর উপযুক্ত শাড়িটা ভাঁজ করা। শাড়ি পাল্টাল সুশোভনের স্ত্রী। মশারির ভিতরে সুশোভনকে দেখা যাচ্ছে। চিরকালই তাকে এমন আকর্ষণীয় দেখায়। আর তাকে এমন দেখায় বলেই রাতে ঘরে আলো থাকে, শুতে যাওয়ার ঠিক আগে শাড়ি পাল্টায় সুশোভনের স্ত্রী।

হঠাৎ যেন ব্যাপারটা লজ্জার মতো একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল, রজনীগন্ধার ঝাড়ের মতো এই টিসুসিল্কের শাড়ি একটা চেষ্টা, কিন্তু এসবই কদর্য হয়ে উঠবে না যদি না আজকের দিনটা ঘটনাহীনতার মধ্যে শেষ হয়?

চা করে আনল সুশোভনের স্ত্রী। বেড টি ছুটির দিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ততক্ষণ সুশোভনও বিছানা

ছেড়ে উঠেছে। শোবার ঘরের একখানা চেয়ারে বসেছে।

এর পরে কী হয়? সুশোভনের স্ত্রী অনায়াসেই মনে করতে পারে—এমন ছুটির দিন তো এই প্রথম নয়। এরপরে সুশোভন চায়ের কাপটা নিলে, সুশোভনের স্ত্রী চেয়ারের উপর থেকে টিস্যুসিল্কের শাড়িটা তুলে আলমারিতে রাখে। ঘরের জানালাগুলো খুলে দেয়। রাত থেকে দিনে অবতীর্ণ হয় তারা।

আজও হাত বাড়িয়ে চা নিল সুশোভন। পাশের আসনটা দেখিয়ে বলল, বসো।

জানালা খুলে দি?

থাক।

কাল রাত্রির সেই অনুভূতিটা ফিরে এল মনে। সেই জ্বর ছাড়ার উপমা।

ছুটির দিনে ব্রেকফাস্টের মতো কিছু ব্যবস্থা করতে হয় সকালের চা বিস্কিটের বদলে। সুশোভনের স্ত্রী রান্না ঘরে তার আয়োজন করে নিল। ডিম ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তাকে কর্মব্যস্ত হাত নিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল।

শোবার ঘর থেকে আলাপের শব্দ আসছে। দ্রুতপদে সে এগিয়ে এল। যা ভয় করেছিল তা নয়। দুজনে আলাপ করছে, একা একা কথা বলা নয়। কিন্তু তাকে আশ্চর্য হতে হল। এ যে ডাক্তার রায়চৌধুরীর গলা। ইতিমধ্যে তা হলে তাকে ফোনে খবর দিয়েছে সুশোভন, আর সেও এসে পড়েছে। কিংবা কালই অন্যমনস্কের মতো খবর দিয়ে রেখেছিল।

ডাক্তার রায়চৌধুরী দেখতে পেয়েছিল সুশোভনের স্ত্রীকে। বলল, নমস্কার, আসুন। হঠাৎ ব্রেকফাস্টের নিমন্ত্রণ করলেন, অথচ দেখতে পাচ্ছি না।

বুদ্ধিমতী সুশোভনের স্ত্রী, হাসতে পারল, বলল, বসুন, আমার হল বলে।

এটা কি একটা নিছক ঘটনাহীন দিনের পূর্বাভাস? ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করতে করতে সুশোভনের স্ত্রীর মনের অনেকটা অংশ এই ঘরের দিকেই ঝুঁকে রইল। এ কাজ ও কাজের ছুতো করে কখনও বারান্দার জানালার পাশে থেকে, কখনও পাশের ঘরের দরজার আড়ালে, দাঁড়িয়ে সে আলাপটাকে ধরতে চেষ্টা করল।

ঘরের সবগুলো জানালা খুলে দিয়েছে সুশোভন। সকাল আটটার রোদ এসে পড়েছে ঘরে। টিপয়টা সরিয়ে টেবলটাকে ঘরের মাঝখানে এনে রেখেছে সে। তারই দুপাশে সুশোভন আর ডাক্তার রায়চৌধুরী। সকাল আটটার খটখটে রোদ টেবলটায় ; তার উপরে কালকের সেই রজনীগন্ধার ঝাড়। বাসি ফুলের এবং চুরুটের কড়া গন্ধ রোদের সঙ্গে মিশে একটা সচেতন বাস্তববোধে পরিণত হচ্ছে।

ডাক্তার বলল, নার্ভস সম্বন্ধে কিছু পড়া হয়েছিল এক সময়ে?

এটাই ডাক্তারের কথা বলার ধরণ, নৈর্ব্যক্তিক ক্রিয়া প্রয়োগ।

সুশোভন বলল, সাইসাইয়াট্রি কিন্তু নার্ভস নয়।

তাও শোনা গিয়েছে। সাইকাইয়াট্রির ক্ষেত্রে এমন সব কেসেও নার্ভসকে বিশ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সুশোভন হাসল। বলল, জবরদস্ত ডাক্তার তুমি। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াকেই একমাত্র মনে করো।

আর সার্জারি। আর এই দুয়ের যা সাধ্য নয় তা কদাচিৎ আরোগ্য হয়ে থাকে।

সুশোভন চিন্তা করল। বলল, অনেক কিছুই আরোগ্যের বাইরে থাকছে না তবে?

থাকছে, এবং সে বিষয়ে কারও কিছু করারও থাকছে না।

বড্ড কঠোর তুমি রায়চৌধুরী। কিন্তু মনে করো তোমার কোন পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আয়না ভেঙে ফেলেছে, তাকে আরোগ্য করার চেষ্টা করবে না?

অবশ্যই। যদি বেশি কেটে থাকে, ডেটল আর তুলোর ব্যাণ্ডেজের চাইতেও সিরিয়াস হলে স্টিচ,

প্রয়োজন হলে ইনজেকসন সিরিঞ্জের ব্যবহার করা চলবে।

সুশোভন উঠল। পায়চারি করল। তারপরে ফিরে এসে বসল আবার। জানালার বাইরে দুমিনিট আগে রোদে দেয়া প্লেটগুলো তুলে নিয়ে যেতে যেতে সুশোভনের স্ত্রী শুনতে পেল আলাপের একটা অঙ্ক শেষ করে অন্য অঙ্কে যাচ্ছে সুশোভন। পায়চারিটাই যেন অঙ্কান্তরের সূচক।

ডাক্তার, সেই কেসটা শুনেছো, কয়েক সপ্তাহ আগে সেই হোমিসাইডের কথা?

উকিল বলছিল বটে পোস্টমর্টেমের কথা। কেউ নির্দয়ভাবে মেরেছিল সেই ছেলেটাকে। শকেই মারা গিয়েছে। চড-চাপড়, বেতের বাড়ি।

মানে অভিভাবক যেমন করতে পারে—তারই কিছু বাড়াবাড়ি?

—তাও হয়। কিম্বা ছেলেটা হয়তো, হয়তো কেন, সে সম্ভাবনাই বেশি, সে বাড়ির কোন দরিদ্র আত্মীয় যে প্রায় বালকভৃত্যের মতো ছিল, হয়তো বাজারের পয়সা কিম্বা টুকিটাকি কিছু চুরি করেছিল। ঘড়ি অথবা কলম—

—তবুও, যখন সে মার খাচ্ছিল তখন, বাবাগো, মেরে ফেললে, বাঁচাও, আমাকে ছেড়ে দাও, এমন সব চিৎকারও সে করছিল। লক্ষ্য করো, পথের ধারে বাড়ি। তার সেই চিৎকার, সাহিত্যে যাকে আর্ত চিৎকার বলে, নিশ্চয় পথের লোকের কানে গিয়েছিল।

ডাক্তার বলল, খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।

ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুশোভনের স্ত্রী এই কথাগুলোই শুনতে পেল। তার পা দুখানা অসাড় হয়ে আসছে। টেবলে খাবার রেখে সে এক মুহূর্তের জন্য টেবলের একটা পাশ চেপে ধরল। এবার? এখন কি বলবে সুশোভন সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে তার রাত হয়েছিল, আর যে পথে খুনটা হয়েছে, সে পথেই সে ফিরেছে বাড়িতে? আর ডাক্তার তা শুনে শুধু কি বিস্মিতই হবে?

কিন্তু এটা আর একটা দৃশ্যান্তর যেন যার সূচক সুশোভনের স্ত্রীর প্রবেশ। সুশোভন বলল, ধন্যবাদ, ডাক্তার, ধন্যবাদ। তুমি ব্রেকফাস্টে কম্প্যানি দিয়ে আমাদের ধন্য করেছ।

চুরুট, বাসি রজনীগন্ধা, পরিজের ধোঁয়া, রোদ, বেলা আটটার সচেতনতা।

—আপনিও বসুন, বলল, ডাক্তার।

—আপনারা শুরু করুন, টিপট আনি। বলে সুশোভনের স্ত্রী আবার রান্না ঘরে গিয়ে টিপট নিয়ে এল।

ততক্ষণে তোয়ালের ভাঁজ খুলে ট্রাউজার্সের উপরে বিছিয়ে নিয়েছে ডাক্তার, চামচ হাতে তুলেছে। সুশোভনও চেয়ারটাকে ঠিক করে সরিয়ে আরামের ব্যবস্থা করে নিল। সুশোভনের স্ত্রী বসল টেবল থেকে একটু দূরে।

টোস্ট র‍্যাক থেকে টোস্ট নিল ডাক্তার।

আর সুশোভন বলল, পথে আসতে আসতে কোন ব্যক্তি সেই আর্তচিৎকার শুনে যদি এগিয়ে যেতো, কী হয়েছে এই খোঁজ নিতো?

—তা হলে? ডাক্তার টোস্টে কামড় দিয়েছিল, তাই একটু পরে বলল, তা হলে যে বা যারা মারছিল সেই ছেলেটিকে, তারা থমকে যেতো। নার্বসের ব্যাপার। ধমকে দিতে পারলে রাগ পড়ে যায়। হয়তো আর মারতো না। আর নার্বসের কথা যখন উঠল, বলি · ছেলেটাও, হয়তো সে প্রায় অনাথ, অনাত্মীয়ের চাইতেও সুদূর সেই আত্মীয়ের বাড়িতে তার এবং তার উৎপীড়নের মধ্যে কেউ এসে দাঁড়াতে পারে এ দেখে তার কিছু সান্ত্বনা হতো, নার্বসগুলো হয়তো তেমন হতাশ হ'য়ে কোল্যাপ্স করতো না, যেমন করেছে।

কিন্তু, সুশোভন বলল, সেই আর্ত চিৎকার শুনেও যদি পথের সেই লোকটি এগিয়ে না যায়,

মানে ইন্টারফিয়ার না করে।

খুবই স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। সুশোভনের স্ত্রীকে ডাক্তার বলল, অ্যাপিটাইজিং, অর্থাৎ কি যেন বলে—ক্ষুধাউদ্রেককারী। চমৎকার। সুশোভনকে বলল, খুবই স্বাভাবিক ইন্টারফিয়ার না করা। তা করাও হয় না।

আর এক চামচ পরিজ তুলল সুশোভন, বলল, সেই আর্ত বোবা কান্নায় মেশানো চিৎকার শোনার পরও যদি কেউ সে দিকে না এগিয়ে থাকে, তাকে—কাউআর্ড, অর্থাৎ কী যেন বলে কাপুরুষ বলা হবে?

আদৌ নয়, আদৌ নয়। (ডাক্তার ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাল) দেখা যাচ্ছে ইন্টারফিয়ার করা হয় না। আরে মশায়, সমাজে এমন কত কিছু ঘটছে, জানা যাচ্ছে, চোখে পড়ছে ; কিন্তু নিজের চরকায় তেল দিতে হবে তো। (হো হো করে নিজের রসিকতায় হাসল সে) আয়না ভাঙার কী বলছিলে সে গল্পটাই বলো বরং।

ওটা বোধহয় নার্বসের ব্যাপার। তুমি ঠিকই বলেছ। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি কারো নিজেকে হঠাৎ জন্তু বলে মনে হয়, একটা কাপুরুষ জন্তু, আর সে যদি আয়নাটাকে ভাঙে, (সুশোভন টোস্ট র‍্যাকের দিকে হাত বাড়াল) তবে নার্বসের জন্য কিছু ব্রোমাইড দরকার।

ব্রোমাইড নয়, সে দেখা যাবেখন, অন্যান্য ওষুধও আছে। তবে নার্বসের ওষুধ সাধারণত যত কম ব্যবহার করা যায় ভালো। বিউটিফুল, কেমন কিনা? (ডাক্তার রোস্টের ঢাকনা খুলে শব্দ করে গন্ধ শুঁকল) দেখো, সামন্ত, আয়নার ব্যাপার ঠিক ধরা যাচ্ছে না। এই ইন্টারফিয়ার না করার ব্যাপার সমাজের শান্তির জন্যই, তা ছাড়া নিজের চরকাতেও তেল—এ সবই ব্রিটিশ জাতের কাছে শেখা হয়েছে বলা যায়, কেমন কি না? এই বলে নিজের রসিকতায় ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

বিস্মিতা

ইন্দ্র কৃষির দেবতা, তার কৃপা ছাড়া শ্রাবণের ধারা আশা করা যায় না। তা হলে ইন্দ্র যাকে স্নেহ কবেছে সে মাটি স্পর্শধন্যা না হয়ে পাষাণী হয কেন? অনেকের ধারণা, অহল্যার কাহিনী পরবর্তী কালের কোন কবির রচনা। এই কবির কালটাকে বুঝতে পারলে রূপকটা আমাদেব কাছে স্বচ্ছ হতো। অথবা, এই বুঝতে হবে যে, তার কালে সভ্যতার নবীন ও পুরাতন স্তরে সংঘাত দেখা দিয়ে থাকবে। বলা বাহুল্য স্তর দুটি একই কৃষি-সভ্যতার।

কিন্তু রূপকের স্বভাবই এই যে, তা নিয়ে দীর্ঘতর বিচার বিবেচনা রসহানি ঘটায়। বিশেষ কবে যার কথা বলতে চাইছি, এ রূপকটির কথা সে জানতো কিনা সন্দেহ। কারণ সে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক। আমাদের এই বর্তমান কালে কথাটা কেমন শোনাল না? তা সত্ত্বেও সত্যের খাতিরেই এটাকে স্বীকাব করে নিতে হবে। মূল্যহীন হয়ে গেলেও কোন কোন প্রথাকে ধরে বাখার চেষ্টা কবে থাকি আমরা। কিন্তু আমাদেব এই দুর্বলতাব অজুহাতই কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট হবে? এক সময়ে বিকৃত উচ্চারণের ইংবেজি শব্দসমষ্টি খাতির আদায় করতো, কাজেই তখন ইংবেজি সাহিত্যের অধ্যাপকদেব সামাজিক মূল্য ছিল। এই বর্তমান যুগে ভারতীয় ইংরেজি শেখাব সামাজিক মূল্য কমিয়ে আনার দিকেই ববং আমাদের ঝোঁক। কথাটা ভারতীয় ইংরেজি। সাহিত্যের রসগ্রহণ যে বলবো, এই বিশেষ ধরনের ইংরেজি শিখে একটি ইংবেজি কবিতাও কি শুদ্ধ ভাবে পড়া যায়? কাব্যের পথ তো শ্রুতিগত, উচ্চাবণই তার প্রাণ। উচ্চারণ শেখার সুযোগ আমাদের অধ্যাপকের জীবনে কোনদিনই হয়নি। এমনকি মিশনাবী কনভেন্ট, যা আমাদের দেশে এখনও দু-একটি শহরে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে ইংরেজি শব্দগুলো অন্তত খানিকটা ইংবেজির মতো উচ্চারণ করতে শেখানো হয়, সেরকম কোন কনভেন্টে পড়ার সুযোগও আমাদেব অধ্যাপকের ছিল না।

এমনকি রাজধানীর নামওয়ালা কোন কলেজে পড়ার সুযোগও কোনদিন হয়নি তাঁর। আমাদের এই অধ্যাপক মফস্বল কলেজে পড়েছেন। সে কলেজের প্রাচীনপন্থী কয়েকজন অধ্যাপক যতদূব সাধ্য তাঁকে পড়িয়েছিলেনও বটে, কিন্তু তাঁদের সাধ্যেরও সীমা ছিল কারণ তাঁরা যখন ছাত্র ছিলেন তাঁরাও মফস্বল কলেজে পড়েছিলেন, তাঁরাও তাঁদের কালের কুলীন অধ্যাপকদেব সংস্পর্শে আসতে পারেন নি। আমাদের অধ্যাপক, সুতরাং, ঘর্মাক্ত পবিশ্রম সত্ত্বেও আশানুরূপ ফললাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। সহজ কথায় (কথাটা অধ্যাপকপত্নী মীরার), জ্ঞানের আলোককে রাজধানীর দু-একটি কলেজে সীমিত রেখে তাকে শুধু অর্থবান, রাজধানীর অধিবাসী, এবং কচিৎদৃষ্ট অস্বাভাবিক মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রেখে দেশব্যাপী মনীষার অপচয় এবং স্বার্থপোষণেব একটা ব্যবস্থা আছে; (আমাদের অধ্যাপকপত্নী মীরাই বলেছিল) নাইনথ্ পেপারের নাম শুনেছো? এটা যে কেন জাতির সব চাইতে বড় কেলেঙ্কারি রূপে উদ্ঘাটিত হয় না?

এর পরে কী হতে পারতো? মফস্বল কলেজের আর একজন অখ্যাত অধ্যাপক। আমাদের অধ্যাপক কিন্তু এক ধরনের বিদ্রোহ করেছিল। বরং রাজধানী কলকাতার দু-তিনটি অর্ধখ্যাত কলেজে পার্টটাইম লেকচারের উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করল সে। যুক্তি, তার বংশে যদি কেউ জন্মায় তাকে মনীষার অপচয় থেকে রক্ষা করা যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে স্থির করল, নিজের বাড়ি একটা কলকাতার কাছেই করবে। সে নিজে যে সুবিধা থেকে একবার বঞ্চিত হয়েছে আর তা হতে দেবে না। প্রথম

এবং দ্বিতীয়ের মধ্যে আর একটি পর্যায় শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে সেটাই প্রবহমান—অধ্যাপক ইংরেজি সাহিত্যের গবেষণায় নিমগ্ন থাকার চেষ্টা করছে।

অধ্যাপক কলেজে যেসব কাব্য পড়ায় তার একটিতে এক বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। কী করেছে বৈয়াকরণ? সারাজীবন মানুষ যা কিছু চায় তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সে ব্যাকরণ সাধনা করেছে। তার সে গবেষণার ফল কৌতূহলীর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে হয়তো, কিন্তু আর সবদিক থেকে, তা নিরর্থক। ইংরেজ কবি অবশ্য একটি দার্শনিক ভঙ্গির আভাস ফুটিয়ে তুলেছে। আমাদের অধ্যাপক তার ছাত্রদের সম্মুখে কর্তব্যের খাতিরে এ ভঙ্গিটির ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে, কারণ অবশ্য পরীক্ষার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা, অধিকন্তু, (অধ্যাপকের ইংরেজি ভাষণের তর্জমাতে বলি) প্রিয় বালকগণ, জীবনেও দেখবে এমন একটি একাগ্রতার মূল্য একাগ্রতার খাতিরেই। কারণ মানুষের ব্যাপারে সিদ্ধির চাইতে সাধনাই মূল্যবান। কিন্তু তখন, অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা করার সময়ে আমাদের অধ্যাপক কি সেই বৈয়াকরণের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যও একাত্মতা অনুভব করে? তা করলে সে কি ভুল করে না? বৈয়াকরণ তবু তার বিষয়টিকে অধিগত করার সুযোগ পেয়েছিল। অধ্যাপক তার গবেষণার বিষয় তিনশ বছরের প্রাচীন সেই ইংরেজ কবিগোষ্ঠী থেকে স্থান এবং কালের দিক থেকে এত দূরস্থিত যে তাদের কাব্যের ধ্বনি কোনদিনই সে শুনতে পেয়েছে কিনা সন্দেহ। আর তার গবেষণার ফলস্বরূপ গ্রন্থটি প্রকাশ পেলে কী হবে? সেই বিকৃত উচ্চারণের ভারতীয় ইংরেজির যুগে তবু হয়তো ইংরেজি সাহিত্যের ভারতীয় গবেষণা মানাতো। তা ছাড়া ইংরেজরা কি কোনদিনই তাদের কাব্য সম্বন্ধে বিদেশির গবেষণাকে মূল্য দিয়েছে? বলা যেতে পারে কেউ মূল্য না দিলেও মূল্যবানের মূল্য হ্রাস হয় না। হায়, এটা স্বর্গের কোন যুগে হয়তো সম্ভব ছিল।

অকালে ভূমিষ্ঠ হওয়া বলে একটা কথা আছে। আমাদের অধ্যাপককে কি তাই বলা হবে?

সুধীন্দ্র টপাদার, অবশ্যই এসব চিন্তায় সময়ক্ষেপ করে না। মাছ কি জলের কথা চিন্তা করে, অথবা আমরা কি নিঃশ্বাসবায়ুর কথা? (এই কথাটাই সুধীন্দ্রর, কাল এবং তার নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্য যখন সে প্রস্তুত হচ্ছে তখন তার বাড়িতে পড়ানোর অধ্যাপকের সংখ্যা কমে দুয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তারা দুজনেই তার সকাল ও সন্ধ্যা পরিপূর্ণ করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তারা দুজনেই চার চার করে আটটি উত্তরপত্রর জন্য সুধীন্দ্রকে প্রস্তুত করে তুলছিল। সেই পরীক্ষা অবশেষে শেষ হল। কলকাতার কাছেই বাড়ি। বাড়িতে ফিরল সুধীন্দ্রনাথ। চাকর পাঠিয়ে সে তার বাবার বসবার ঘর থেকে সুন্দর মসৃণ কাগজে ছাপানো সুদৃশ্য নকসাযুক্ত একগাদা ক্যাটালগ আনিয়ে নিল। আঙুলের ফাঁকে কিম্বা ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে ক্যাটালগের পাতা উল্টে মেসিনারি, বিল্ডিং মেটিরিয়াল, ফ্যাক্টরির ক্রসসেকশনের ছবি দেখে সময় কাটতো তার।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন সুস্থদেহ নবযুবক যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত অধ্যাপকদের সহায়তায় জ্ঞানলাভ করল, তার কি অবকাশরঞ্জনের মতো বিষয়ের অভাব দেখা দিতে পারে? কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস গ্রন্থের কি অভাব হয়েছিল সে সময়ে? তা হলে সে প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্র না হয়েও ক্যাটালগ নিয়ে দিন কাটাতো কেন? এ প্রশ্নের উত্তরটা সুধীন্দ্রর ক্ষণবান্ধবী বিজয়ার ভাষায় দেয়া যেতে পারে. যোগাযোগের মধুসূদন এখন অন্যরূপ নিয়েছে। এখন সংস্কৃতির ব্যাপারেও সে উন্নাসিক বিপ্রদাসের সমকক্ষ। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসিত স্বীকৃতি পাওয়ার পক্ষে টাকাই যথেষ্ট, যেহেতু টাকা দিয়ে টিউটর রাখা যায়, এবং তাঁরা পরীক্ষার কারিগরি ব্যাপারে ছাত্রকে যথাবিহিত ওয়াকিবহাল করতে পারেন। এমন কি, কথাটা কি বলবো? (বিজয়া বলতে গিয়ে দ্বিধা করেছিল।) মধুসূদনদের পক্ষে এখন সাহিত্যের সমালোচনাগ্রন্থ

লেখাও সম্ভব, কারণ এই যে, মাইনেকরা লেখকেরা তা লিখে দেন; কারণ এই যে, সমালোচনাপুস্তক লিখতে শানদেয়া সাধারণজ্ঞানের বেশি দরকার হয় না, এবং উপযুক্ত আধার পেলে অধ্যাপকরা সাধারণ জ্ঞানকে শানিত করতে পারেন।

তবে ক্যাটালগ কেন? তার ধারণা হয়েছিল, ছাত্রাবস্থার শেষে এইবার সে জীবনে প্রবেশ করছে। এ থেকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবণতা বুঝতে পারা যায়। অর্থাৎ সে মনের প্রস্তুতিতে একজন আধুনিক যন্ত্রবিদ। যদিও হাতে-কলমে সে এখনও কোন মিল বা ফ্যাকটরি পরিচালনা করছে না।

নতুন যৌবনের পক্ষে প্রেম একটা দুর্বার আকর্ষণ। কাব্য এবং গদ্যনিবন্ধ যা তার অধ্যাপকরা দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে আলোচনা করেছে সেসব কি কিছুই তার মনে কোমলতায় ছাপ রেখে যায় নি? আমি কোন প্রেমপাত্রীর কথা বলছি না, সাধারণভাবে প্রেমপ্রবৃত্তির জাগরণের উল্লেখ করছি মাত্র।

প্রায় দুমাস বাড়িতে কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন মাস্টার অব আর্টস কলকাতায় ফিরে এসেছিল। উদ্দেশ্য দৃশ্যতঃ তাদের পারিবারিক ব্যবসাকেন্দ্রে কাজকর্ম শেখা—আজকালকার ভাষায় প্রবেশনার হওয়া। তাদের কলকাতার হেড অফিসের উপরতলার একটি ফ্ল্যাট তখন খালি ছিল। সেটাকেই সে আশ্রয় করল। কয়েকজন সহপাঠী এবং অন্তত একজন সহপাঠিনী জুটে গেল। সুধীন্দ্রর ফ্ল্যাটে আড্ডা বসতে শুরু করল। সেসব আড্ডায় উচ্চ আদর্শবাদ এবং অভিনেত্রীদের কেলেঙ্কারি সবরে আলোচিত হতো। তার সহপাঠী এবং সহপাঠিনীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাদের কারো পক্ষেই একা একটি ফ্ল্যাটে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না—তিন কামরার পুরো একটি ফ্ল্যাটে যা আসবাবপত্রে সাজানো। তাদের কেউ কেউ অনুভব করতো তাদের উচ্চ আদর্শযুক্ত একটা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য সংস্থা গড়ে ওঠা দরকার, কারণ সংস্থার উপযুক্ত এমন একটি আশ্রয়ের সুযোগ পেয়ে হারানো উচিত হবে না।

সহপাঠিনীদের মধ্যে বিজয়া এমন কি দু-একটি ক্ষেত্রে রাত এগারোটা পর্যন্ত সে ফ্ল্যাটে থেকেছে, এবং আর সকলে চলে যাওয়ার পরে সুধীন্দ্রর সঙ্গে নৈশ আহার করেছে। কিন্তু তার সাদামাটা মুখাকৃতির আড়ালে তার নিটোল স্বাস্থ্যের দেহ, এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ভূরিভূরি আলোচনার আড়ালে তার কোমল নারীমন যদি সুধীন্দ্রকে কামনা করে থাকে, তবে আড়ালগুলোর সম্মুখে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। সুতরাং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নারীদেহ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রর কোন অভিজ্ঞতা হল না। প্রায় দুমাস কাটল তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়ল সুধীন্দ্রর তার মাসোয়ারার টাকার হিসাব নেয়ার কথা। হিসাব নিয়ে সে দেখল যথেষ্ট খরচ করেও ছাত্রাবস্থার শেষে তার মাসোয়ারার উদ্বৃত্ত টাকা তার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ত্রিশ হাজারের বেশি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সে তখন স্থির করল সে ভারতভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। একজন সঙ্গিনী থাকলে মন্দ হয় না, সে হিসাবে বিজয়াকে আহ্বান করা যেতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে একজন ছাত্রর মাসোয়ারার উদ্বৃত্ত টাকার অঙ্কটা ত্রিশ হাজার দাঁড়ানো সাধারণ ব্যাপার নয়। ঠিক তাই, সুধীন্দ্রর পিতার আয় সাধারণ ছিল না, এবং প্রকাশ্য খরচ সাধারণভাবে দেখানো তাঁর পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল।

সুধীন্দ্রনাথ ভ্রমণে বেরুবে ঠিক করেছিল। কিন্তু সঙ্গী বদলে গেল। এটা আকস্মিকভাবেই হল।

কলেজের চার বছর এক ইংরেজির অধ্যাপক তার প্রাইভেট টিউটর ছিল। হঠাৎ কলকাতার চৌরঙ্গীতে তার সঙ্গে সুধীন্দ্রর দেখা। এই অধ্যাপক আমাদের পূর্বপরিচিত অধ্যাপক ছাড়া আর কেউ নয়।

চল্লিশ বছর বয়স হল অধ্যাপকের, কিন্তু কী অসম্ভব ক্লান্ত দেখাল তাকে—চল্লিশ বছর অর্থাৎ যখন জীবনের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন হওয়া উচিত।

সুধীন্দ্র বলল, 'দু বছর পরে দেখলাম আপনাকে, মনে হচ্ছে কতযুগ পরে।'

অধ্যাপক বলল, 'তা, এখন তুমি কী করবে ভেবেছো?'

'আপাতত ভারতভ্রমণ।' সুধীন্দ্র অপ্রতিভ ভাবে হাসছিল।

'সুখী যুবক, আমি তোমার সৌভাগ্যকে আশীর্বাদ করি।' ইংরেজির অধ্যাপক ইংরেজী বাগভঙ্গী ব্যবহার করল।

'মাস্টারমশাই, আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'যেন তার যথেষ্ট কারণ নেই।'

'কিছুদিন কোথাও ঘুরে এলে হয়।'

'স্বাস্থ্যোদ্ধার? প্রিয় বালক, এ বিষয়ে আমার দিলখোলা হওয়া উচিত, আমার উপায় নেই।' সুধীন্দ্র ভাবল কিছু। বলল, 'আপনি আগের ঠিকানাতেই আছেন তো?'

এর পবের দৃশ্য বোম্বে। কখনও মেরিন বীচ, কখনও ইন্ডিয়া গেট, কখনও এলিফ্যান্টা এবং অবশ্য, দুষ্প্রাপ্য অথচ সুন্দর সেই ফ্ল্যাটটায়। তিন মাসের ছুটি যোগাড় হয়েছে অধ্যাপকের। এই তিন মাসে তার গবেষণাগ্রন্থের আদ্যান্ত সংশোধন করবে সে। পুস্তক ইত্যাদি নিয়েছে সে। কিন্তু সুধীন্দ্রর এটা ভ্রমণ সুতরাং একটা ছোট ফিয়াট গাড়িও সঙ্গে এসেছে। বলা বাহুল্য ফ্ল্যাটের অধিকাংশ খরচই সুধীন্দ্রর: এটাই পূর্ব শর্ত।

ফ্ল্যাটে বসে অধ্যায়ন করে অধ্যাপক, কখনও কখনও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবন্ধশালায় যায়। এটাই স্বাভাবিক। এই গ্রন্থগুলির সন্ধানই ভ্রমণেব গন্তব্যকে নির্দিষ্ট কবেছে এক্ষেত্রে। ক্বচিৎ সে বেড়াতে যেতো সমুদ্রসৈকতে।

এই অবসরে অধ্যাপকপত্নী মীরার কথা আমবা বলে নিতে পাবি। ত্রিশ বছর বয়স হল তাব। মুখাকৃতিতে এমন কিছু বৈসাদৃশ্য ছিল না যা দর্শককে প্রতিহত করবে। ঠোঁট পাতলা, চোখদুটো বড় এবং শান্ত, দাঁত সুগঠিত এবং শুভ্র, মাথায় চুল ছিল এবং সে তার যত্ন করত। নিতম্ব ঈষৎ স্থূল হলেও সুগঠনের সীমা লুপ্ত হয় নি। গায়ের রং আধপাকা ধানের মতো।

এখন এই গায়ের রং নিয়ে কিছু বলতে গেলে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। আধুনিক কালে ত্বকের বর্ণ নিয়ে রাজনীতিতে এবং বিশ্বপরিষদের রাজনীতিতে অনেক কথা কাটাকাটি হয়ে থাকে। দৈবায়ত্বং ত্বকবর্ণং—ঐ রকম বলার দিকে যেমন ঝোঁক আছে। ত্বকবর্ণের জন্য অদৃশ্য বলার দিকেও তেমন আছে। এটা যে অনুদারতা এ বিষয়ে আমরা এক মত, তা সত্ত্বেও আমাদের কাব্যে নায়িকার বর্ণ উল্লেখযোগ্য হলেই তারা গোরি বা গৌরী। গৌরবর্ণই সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষিত মান। অন্যদিকে লক্ষণীয়, অর্থবান এবং অভিজাত পরিবারেই সুগৌর বর্ণের নরনারীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তা থেকে প্রমাণ হয় তারা গৌরবর্ণকে কাম্য মনে করে, পুষ্টিসাধন ও সংরক্ষণে যত্নবান। কী করে তা সম্ভব হয়? সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তারা সন্তানের সুন্দরী জননী সংগ্রহ করে। স্মরণীয়। মধুসূদনের পক্ষে কুমু সংগ্রহ করা অবিশ্বাসযোগ্য হয় নি।

কিন্তু মীরার দেহবর্ণ যখন সুগৌর নয় তখন আলোচনার কিছু দরকার ছিল না। কিন্তু আমাদের এ সময়টাকে বুঝতে ত্বকের গৌরতা এবং তা থেকে রুপ রুচি প্রভৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ উল্লেখ করা চাই। যেহেতু মীরার ত্বকবর্ণে কিছুটা গৌরতার মিশ্রণ আছে, আমাদের দৃষ্টিতে আবাল্য সে অসাধারণরূপে প্রশংসা পেয়েছি। আমাদের দৃষ্টির অর্থ তার কাছে গোপন থাকার কথা নয়। তার চিন্তার গঠনে এই অসাধারণত্বের বোধ খানিকটা প্রভাব রেখেছে মনে হয়। মীরার মন কখনও কখনও কঠোর হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার অব আর্টস পরীক্ষায় নাইনথ পেপারের সম্বন্ধে তার উক্তি স্মরণীয়। তার স্বামী এবং তার ফলে সে, যা প্রাপ্য তা পায় নি, এই বোধ থেকেই

এমন কঠোর উক্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সে যাই হোক, মীরা পতিগতপ্রাণা বলতে হবে। যা আমাদের চোখে পড়ে না স্বামীকে তেমন করে ভালোবাসার কথাই নয় শুধু যা প্রকাশ্য তাতেও তার গভীর একাত্মতা প্রমাণিত হয়। অধ্যাপকের জীবনের সব কিছুতেই সে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার আশা নিরাশায় সে অংশীদাব। এবং তা বাধ্য হয়ে নয় যেমন সাধারণত স্ত্রীদের হতে হয়। কারণ আশার সহগামী পবিকল্পনাগুলোকে অধিকাংশ সেই তৈরি করে থাকে। এমন কি অধ্যাপকের গবেষণার বিষয়ে তার সাহায্য করার অসাধাবণ ক্ষমতা দেখা যায়।

মীরা কি দাম্ভিকা? হয়তো তা নয়, তবে জীবনের ভ্যালুজ সম্বন্ধে সে কথা বলে থাকে।

মীরা নিঃসন্তান। সে কি বন্ধ্যা? তার প্রমাণ হয় নি। বিবাহের এই প্রায় দশ বৎসর। সহজ কথায় সে এবং অধ্যাপক চায় না গবেষণায় ব্রত উদ্‌যাপন হওয়ার আগে সন্তানপালনের ভার তারা গ্রহণ করবে। অধ্যাপকের যে আয় তাতে দুজনের সংসার চালিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। সে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে বরং তারা তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানকে এমনভাবে মানুষ করতে চায় যেমন ভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ তাদেব হয় নি। সন্তানের আগে নীড় দরকাব। এটা ভ্যালুজ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মতামতেরই ফল। অধ্যাপকের যে সময় তাতে গবেষণা চালিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। সে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় করে তাবা দুজনের সান্নিধ্য উপভোগ কবতে চায। সন্তানেব আগে প্রেম দরকার।

মনে হবে মীরা অসিধারব্রত পালন কবছে। এটা কিন্তু আধুনিক চিন্তা হল না। অবশ্যই কোন ব্রত পালন নয, বরং একটা পরিকল্পনা নিয়ে চলা। আর এ পরিকল্পনা আমাদেব এই আধুনিক যুগে এমন সাধারণ ব্যাপার যে পথেঘাটে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্কুলের ছাত্রীদেরও অভিজ্ঞ কবে তোলার ব্যবস্থা আছে।

সন্ধ্যায় মেরিন বীচে পাশাপাশি বসেছে অধ্যাপকপত্নী মীরা এবং সুধীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপকপত্নী বলল, 'দেখো ওরা কত হাসছে, তুমি তো হাসছো না?'

সুধীন্দ্র হাসিমুখে বলল, 'ওদের সবগুলিই ঠিক হাসি নয।'

'তুমি এমন গম্ভীর কথা বলতে পাবো।'

মেরিন বীচ কল্পনায় ছিল মীরার। তার চাইতেও অলৌকিক এই নরনারীব মিছিল। তাদেব পোশাক, তাদেব গাড়ি, তাদের হাসি, ঝিলিমিলি আলো। এটা কি অন্যলোক? তা কখনই নয়। পৃথিবীই বটে, এমন কি হাতের তালুতে চিমটি কেটে অনুভব কবার দবকার নেই যে জেগে আছে। অথচ এই কল্পনার অতীত বিষয়ের এত কাছে এসে গিয়েছে।

বালি থেকে উঠে সুধীন্দ্র বলল, 'চলুন একটু ঘুরে আসি।'

অধ্যাপকপত্নী সুধীন্দ্রর পাশেপাশে হেঁটে চলল।

এলিফ্যান্টায় বেড়াতে বেড়াতে অস্ফুটস্বরে অধ্যাপকপত্নী বলল, 'বলো, সুধী, একি আমারও একরকমের কৃতিত্ব নয়--তোমাব অধ্যাপককে গবেষণার ব্যাপাবে সাহায্য কবে যাচ্ছি। না, আমি সিনেমায় পর্যন্ত যাই না। উচ্চাদর্শ আমি ভালোবাসি।'

সুধীন্দ্র বলল, 'আপনারও ত্যাগ আছে, মাস্টারমশাইয়ের আদর্শেব জন্য।'

সে সময়ে মীরাকে ত্যাগগর্বে গর্বিতাই দেখা গেল কি? তার মুখে উজ্জ্বল সুখ। আর সেজন্যই যেন বিদেশিনী পর্যটিকা এবং দেশিনী চপলাদের মধ্যেও তাকে বেমানান বোধ হল না। অথবা একটু কি পরিবর্তনও চোখে পড়ছে? হয়তো বা শাড়ির হাল্কাভাবটা কিম্বা তা পবার ধরন, খোপাটাও আজ একটু আলগা হয়ে ঘাড়ের উপরে আছে বটে।

অধ্যাপককে কী অকৃত্রিম ভালোবাসেন তার পত্নী, এই ধারণা হল সুধীন্দ্রর। সকাল থেকে রাত্রি,

চোখের সম্মুখেই সে দেখতে পাচ্ছে, অধ্যাপকের প্রতিটি ব্যাপার সহায়তা করতে উন্মুখ এই মহিলা যেন নিজেকে উহ্য করে ফেলেছেন। সকালের ব্রেকফাস্টের পর থেকে বেলা এগারোটা টাইপ করেছেন অধ্যাপকের গবেষণার একটি অধ্যায়, তারই মধ্যে উঠে গিয়ে লাঞ্চের রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। লাঞ্চের পর জামার বোতাম সেলাই, বেলা দুটো থেকে অধ্যাপকের পড়বার ঘর, শোবার ঘর সাজিয়েছেন, সুধীন্দ্রর নিজের কামরাটাও তাঁর সযত্নস্পর্শ থেকে বঞ্চিত নয়। মনে হবে, অধ্যাপক যে পথে চলে, সেখানে বুক পেতে দিতে পারেন মীরা। তাঁর এই ত্রিশ বছরের সবগুলি শিখা যেন অধ্যাপককে আরতি করেই সার্থক।

মাউন্ট প্লেজ্যান্টে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অধ্যাপকপত্নী মীরা বলল, 'বলো এ সবের জন্য, এই অক্লান্ত সেবার জন্য আমাকে কি তোমরা প্রশংসা করো না?'

অধ্যাপকপত্নী কি শুধু নিজের কথাই চিন্তা করতো? তার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে সুধীন্দ্র। তার কথাও কি মনে হচ্ছে না? কিম্বা সুধীন্দ্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মানিয়ে যায় যে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা নিরর্থক মনে হয়। এই উচ্ছ্বসিত আর্থিক অজস্রতা কি তার কাছে নিঃশ্বাসবায়ুর মতোই সহজ নয়?

তা হলেও ফ্ল্যাটে ফিরে অধ্যাপককে বলল মীরা, 'তুমি কিন্তু—'

'কিছু বলছো?' অধ্যাপক বই থেকে মুখ তুলল।

'মানে, হ্যাঁ,' 'মীরা থামল, বলছিলুম লেখায় ঢিল দিও না। তিন মাসের জন্য এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া হয়েছে।'

'চেষ্টা করবো তিনমাসে লেখা শেষ করতে।'

'আমি বরং রাতের খাওয়াদাওয়ার পরও কিছুক্ষণ টাইপ করব।'

মীরা উঠে গিয়ে অধ্যাপকের পিঠের কাছে কুশনটাকে গুছিয়ে দিল। কুশনগুলো দুতিনদিন হল এসেছে। সুধীন্দ্রই আনিয়েছে। একসঙ্গে অনেকক্ষণ বসে লেখা পড়া করতে হয় যাকে তার পক্ষে এগুলো প্রয়োজনের। কুশনগুলোর আরাম এমন প্রত্যক্ষ যে তর্কের সুযোগ থাকে না।

মানে', বলল মীরা, 'কেউ না বলে, সময়টা নিরর্থক কেটেছে। অর্থাৎ..'

অন্য একদিন অধ্যাপক বলল, 'একটু কফি করো, এসো গল্প করি।'

কফি করে আনল মীরা।

অধ্যাপক বলল, 'ওর কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো?'

'তা হবে কেন?'

'আসলে,' অধ্যাপক কেশে গলা সাফ করল, 'ওরা কীরকম জীবনে অভ্যস্ত তা আমার জানার কোন সুযোগ হয়নি। ভাবো আমাদের জন্য কী রকম খরচ করছে। আমি একটা হিসাব নিয়েছিলাম মনে মনে—এ তিনমাসে ওর প্রায় ছ হাজার টাকা খরচ হবে। এই ফ্ল্যাটের ভাড়াই দেড় হাজার আগাম দিয়েছে।'

মীরা বলল, 'টাকার অঙ্কগুলো উচ্চারণ করতে কেমন লাগে না?'

সিগারেট এগিয়ে দিল মীরা।

অধ্যাপক বলল, 'তোমার সাদা চামড়ার জুতোজোড়া—বিকেলে যা পরেছিলে—বেশ লাগে দেখতে।'

মীরার গালে একটা ছায়া পড়ল যেন। সে বলল, 'ওর পাগলামিও আছে। কাল বেড়াতে গিয়ে কিছুতেই শুনল না। না কেনা পর্যন্ত মনে হল ওই নিজে কিনে বসবে। না কেনা পর্যন্ত আমরা যে ওর বদান্যতায় আছি এই পার্থক্যবোধটাই বড় হয়ে উঠছিল।'

'অর্থাৎ তোমার দ্বিধা সঙ্কোচটাকে বড় করে তুলছিল?'

কফির কাপগুলো নামিয়ে রাখল মীরা।

'সঙ্কোচ হয় না? অবশ্য তোমার গবেষণাটা শেষ হলে এ সবই সার্থক হয়ে উঠবে। সেকালের অধ্যাপকরা দান গ্রহণ করতেন।'

অধ্যাপক বলল, 'তোমার এই শিফনের শাড়িটা বেশ লাগে দেখতে। শিফন না ভয়েল?'

'সেই কবে কলকাতায় কেনা।'

'এতদিন পরো নি? অবশ্য ট্রামে বাসে এ পরে চলা শক্ত।'

মীরার মুখে আবার একটা ছায়া পড়ছে কেন। সে বলল, 'এখানে তা চলতে হচ্ছে না। তাছাড়া এই সাদা চামড়ার জুতো বা শাড়ি মধ্যবিত্তরাও ব্যবহার করে।'

সে ভাবল ফিরে গিয়ে যে ব্যবহার করবো তাই বা কে বলেছে।

অধ্যাপক ভাবল, 'তোমার যে লোভ নেই তা আমার মতো আর কে জানে।'

মীরা বলল, 'আচ্ছা, শোন, তোমার গবেষণা বইটা যদি সুধীকে উৎসর্গ করো? মানে ঋণমুক্তি বা তেমন কিছু উল্লেখ না করেই—'

মানুষ কি পাষাণ হয়ে যায়? সাহিত্যে এমন বর্ণনা পেয়েছি যে নারীকে দেখে মনে হয়েছে যে তার দেহ ও মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে। মীরার এ সবই জানা ছিল। অনুশোচনা বললে এক বিশেষ ধরনের সক্রিয় মনোভঙ্গি বোঝায়। তার মনের যে অবস্থা হয়েছিল তাকে ইংরেজিতে পাথর হয়ে যাওয়া বলে, আমরা বিমূঢ়তা বলি, কিন্তু তাতে বরং বিস্ময়ের ভাবটাই ছিল। মনের এই অবস্থাকেও বক্রোক্তিতে পাষাণ হয়ে যাওয়া বলা যেতে পারে যদি তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সকালে মীরার মনে হল একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে, আকস্মিক ও কিছু পরিমাণে শক্তিমান। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই সে আয়নায় নিজেকে দেখেছিল, চুলগুলো মুখের চারিদিকে ছড়ানো, শাড়িটা অগোছালো, চোখের কোলে কিছু যেন কালিমা। কিন্তু এগুলোকে ঝড়ের চিহ্ন বলে চেনা যায় না। অন্য যে কোনদিন ঘুম থেকে উঠলে তাকে এরকমই দেখাতো যদি তখন আয়নায় নিজেকে দেখার অভ্যাস থাকতো। তা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রর ব্রেকফাস্টের ট্রে রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসতে আসতে করিডর দিয়ে না এগিয়ে সে আবার নিজের ঘরে ঢুকল এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল আবার আয়নাটার সামনেও--যদিও ইতিমধ্যে সে টাটকা শাড়ি পড়েছে, বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলও আঁচড়ে নিয়েছে। তারপর সে তার ঘরের যে দরজা সুধীন্দ্রর কামরায় খোলে এবং এখনও খোলা আছে সেটা দিয়ে সুধীন্দ্রর কামরায় গেল।

কী কী যথেষ্ট কারণ ছিল? অধ্যাপক কলেজের কী কাজে এক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় গিয়েছে। সুধীন্দ্র এবং অধ্যাপকপত্নী এখানেই আছে। কিন্তু এটাকে কারণ বলতে হলে আরও বলতে হয় ফ্ল্যাটে অবস্থিত পাশাপাশি শোবার ঘর দুখানার মধ্যে কাল রাত্রিতে দরজাটা রোজকার মতো বন্ধ করা হয়নি। অথবা প্রথম ঘুমের আলস্যে মনের সচেতনতা শিথিল হয়ে যেতে পারে, এই তত্ত্বকে প্রামাণ্য বলে মানতে হয়। কিম্বা মন ও দেহের পরস্পরের সম্বন্ধ ও সংযোগ নিয়ে অন্য অনেক তত্ত্বও আছে।

কিন্তু তারপর? দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন? সে কি শুধু সুধীন্দ্রর কৌতূহলনিরসন? অথবা সুধীন্দ্রর অনভিজ্ঞতাকে নিছক ভালো লাগা?

সে যাই হোক, কলকাতা থেকে ফিরল অধ্যাপক। এক সপ্তাহের বদলে এক পক্ষ পরে।

সুধীন্দ্র সেদিনই বলল মীরাকে, কালই কাজের জন্যই তাকেও কলকাতায় যেতে হবে।

মীরা সৈকতে বালির দিকে চেয়ে রইল। তার পাতলা ঠোঁটদুটি গাম্ভীর্যে পুরু দেখাল। সুধীন্দ্র কথা কয়েকটিকে যেন খুঁজে খুঁজে যোগাড় করে এনেছে।

সে বলল, 'কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের এখনই কলকাতায় ফেরার দরকার নেই।'

তারপর আবার সে বলল, 'তিনমাসের আগাম ভাড়া দেয়া ছিল ফ্ল্যাটের। এখনও একমাসের উপরে এটাকে রাখা যাবে, দরকার মতো বাড়ানো যায়।'

বিকেল তখন প্রায় সন্ধ্যার কাছে এসে পড়েছে। মীরা চুপ করে রইল।

কিন্তু যেন সন্ধ্যার আকাশের রঙীন পরিবর্তনটাই তার মনকে ধবে রেখেছিল, সেখানে রং মুছে গিয়ে একরঙা স্লেটের মত রং দেখা দিতেই সে আবার নিজেব মধ্যে ফিরল।

সে বলল, 'তুমি কি হাকস্‌লি পড়েছো, সুধী? আলডুসের কথা বলছি'।

সুধীন্দ্র বালির উপরে নিজেব শরীরটাকে ছড়িয়ে দিল।

মীরার মনের মধ্যে যেন অন্য কেউ আর একবার বলল, 'কী সুঠাম শরীর।'

মীরা নিজে বলল, 'আলডুস হাকসলির সেই মহিলাটিকে তারপরে আরও উজ্জ্বল দেখাতো, আরও ঐকান্তিকতা নিয়ে সে স্বামীকে সেবা করতো।'

সুধীন্দ্র মাথার নীচে নিজের দুহাত রেখে বালিশের অভাব মিটাল।

মীরার অন্য আরেকটি মন নিজেকে বলল, 'বা, ওর চুলের মধ্যে আঙুল চালিযে চালিয়ে আদর জানালে ক্ষতি কী?'

মীরা নিজে বলল, 'আর তেমন সেবা দরকারও ছিল তার স্বামীর।'

পাশ ফিরল সুধীন্দ্র যেন সে বালির কবোষ্ণতায় অস্বস্তি বোধ করছে।

মীরা তার ভয়েলের আঁচলটাকে কাঁধের উপরে তুলে দিল। সে বলল, 'আমি তোমাব অধ্যাপককে সেবা করতে পারব, দেখো। সেটাই তো আমার আদর্শ, তা থেকে আমি সরে যাব না।'

হাসির মত দেখাল তার মুখে কিছু, সে বলল আবার, 'হাকস্‌লির কাছে সমর্থন চাইছি না। কিন্তু (মীরা ভাবল, হয়তো সুধীন্দ্র ইংরেজি উপন্যাস সব পড়ে নি) তুমি কি এর পরে আমাকে ভুলে যাবে অথবা ঘৃণা করবে?'

সুধীন্দ্র নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে উঠে বসল। মীরা ভাবল, এসব কিছু বলার দরকার ছিল না। অনেকদূর সে বলে ফেলেছে। কিন্তু ভাবল—অথবা তুমি কি আবার দাবী নিয়ে দাঁড়াবে কলকাতায় ফিরে গেলেও?

অন্যদিনের মতই সুধীন্দ্র উঠে দাঁড়াল। নিজের কোটটাকে ঝাড়ল। রুমাল দিয়ে ট্রাউজার্স থেকে বালি ঝেড়ে ফেলল। হাত বাড়িয়ে দিল মীরার হাত ধরার জন্য। এ কয়েকদিনে এটা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। সুধীন্দ্র হাত বাড়িয়ে দেয়, মীরা সেই হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়।

গাড়িটা চালাচ্ছে শোফার, রোজ যেমন চালায়। পিছনেব সিটে মীরা এবং সুধীন্দ্র, রোজ যেমন বসে।

মীরা বলল, 'তোমার অধ্যাপক বলছিলেন, গবেষণার থিসিস কলকাতায় ফিরেই সাবমিট করা যাবে।'

'এখানে আসা তাহলে সার্থক হল।'

পিছনের সিটে মাত্র দুজনেরই জায়গা হয় এমন ঘেঁষে বসল সুধীন্দ্র। পকেট থেকে একটা সাদা বন্ধ খাম বার করল কিছুক্ষণ সেটাকে হাতে নিয়ে বসে রইল। তারপর বলল, 'এটাকে রাখুন, পরে খুলে দেখবেন।'

যখন তারা গাড়ি থেকে নামবে, ঠিক তার আগে সুধীন্দ্র বলল, 'আপনাকে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো।'

ফ্ল্যাটে পৌঁছে মীরা নিজেদের শোবার ঘরের টেবলে সাদা খামখানাকে ছুঁড়ে দিল। জুতো খুলে চটি পায়ে দিল। শাড়ি পালটাল। রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল ফুটতে দিল। তারপরে সে বাথরুমে

গেল হাতে মুখে জল দিতে।

কফির জল ফুটবার অবকাশে সে শোবার ঘরে এল। সাদা মুখবন্ধ পুরু কাগজের খাম। উলটে পালটে দেখল সে। তারপর খুলল সেটাকে। সে কি একটা অনুশোচনা, বেদনা, স্মৃতির ভারাক্রান্ত চিঠির আশা করেছিল?

সুধী পাঠক, ঠিক এখনই সুধীন্দ্রর কথা কিছু বলে নেয়া দরকার। সুধীন্দ্রনাথের বয়সটাকে বয়ঃসন্ধির কাল বলতে আপত্তি থাকতে পারে, যেহেতু তার একুশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটা কি তার নবলব্ধ শক্তির আস্বাদ নেয়া, যা সে করেছে? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নবলব্ধ শক্তিব ভাষায়। সে যে কৃতজ্ঞ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, অর্থ যে শক্তি সে বিষয়েই বা সন্দেহ কোথায়?

খামটা খুলল মীরা। খামে একখানা আকাশি নীল রঙের চেক। মাস্টারমশায়ের জন্য আরও কিছু টাকা? নামটা পড়ল মীরা। সুধীন্দ্রর নিজের হাতে লেখা মীরার নামই বয়েছে চেকে। আর তারপর সে টাকার অঙ্কটা পড়ল। পঁচিশ। পঁচিশ বটে, না আশ্চর্য। পঁচিশের পরে তিনটে শূন্য। শূন্য তিনটি তার চোখের সম্মুখে যেন চাকার মতো ঘুরে গেল। পঁচিশ হাজার না? হ্যাঁ, তাই লিখেছে, টুয়েন্টিফাইভ থাউজ্যান্ডসই বটে। পা দুটো কেঁপে উঠল তার আব সেই শিরশিবে ভাবটা যেন তার মস্তিষ্কে পৌঁছে গেল। তার বুকের উপব কেউ যেন গরম ইস্ত্রিব মত কিছু রাখল। হঠাৎ যেন তার মনে কেউ তীব্র স্বরে ক্রুদ্ধ চিৎকারও কবে উঠল।

না, তা নয়, অন্য কেউই নয়। অধ্যাপকের নরম গলাটাই অমন তীব্র শুনিয়েছে। সে ডাকছে মীরাকে একটু উত্তেজিত হয়ে।

আর একবাব দেখল মীরা সেই অর্ধেক ছাপানো অর্ধেক হাতে লেখা কাগজটাকে যাব নাম চেক বলা হয়। পঁচিশ, আশ্চর্য। তারপরের শূন্য তিনটি আবার যেন দুপাক কবে ঘুরে গেল। খামে পুরল সে চেকটাকে।

পাশের ঘরে অধ্যাপক উঁচু গলায় বলল, 'শুনছো মীরা, সুধী আজই রওনা হতে চায়। মোটরে ফিরবে বলছে। আজ রাতেই রওনা হতে চায়।

এখানে আমাদের বর্তমান দিনের কথা এসে পড়ছে আবাব। দেখা যাচ্ছে সুধীন্দ্রর মাসোয়ারার জমানো টাকা ত্রিশ হাজারেব কিছু বেশি ছিল তাহলে। এখানকার ফ্ল্যাট ইত্যাদি বাবদ ছ হাজার খরচ করার পরে পঁচিশ হাজারের চেক কেটেছে সে। এবং বোঝা যাচ্ছে কলকাতায় পৌঁছুলে নিজের ফ্ল্যাটের খরচের জন্য টাকা সংগ্রহ করাকে সে কিছুই মনে করে না।

মীরা খামটাকে লুকিযে নিল ব্লাউজের বুকে। সে কি চেকটাকে ফিরিয়ে দেবে? একি দাম দেয়া, কিছুর দাম দেয়া? সে যখন অধ্যাপকের ঘরে পৌঁছুল তখন সে হাঁপাচ্ছে কিছুটা।

'তুমি আজই ফিরে যাবে? অবশ্য কাজের কথা কিছু বলছিলে মনে পড়ছে'। মীরা বলতে পাবল।

সুধীন্দ্র বলল, 'তেমনটাই ভেবেছি।

'কাল সকালে, বরং ভোর রাতে রওনা হয়ে যেয়ো।'

'তাই হবে। আমি বরং শোফারকে সে বকম বুঝিয়ে দিই।'

সুধীন্দ্র এই বলে চলে গেল।

অধ্যাপক বলল, 'তোমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে মীরা, অসুখ করেনি তো?'

মীরা ভাবল, অবশ্য ছ মাসের মধ্যে না ভাঙালে চেকটা আপনি মরে যাবে। কিন্তু, অবশ্য, তা সত্ত্বেও অচল চেকও আবার চালু হয়, সুধীন্দ্র আর একটা সই করে দিলেই তা হয়।

তার মানে সুধীন্দ্রর সঙ্গে আবার কখনও দেখা হওয়া। দেখা হলেই যদি ও—। কিন্তু পঁচিশ নয়, পঁচিশ হাজার।

অধ্যাপক বলল, 'তুমি কিছু ভাবছো?'

'ওখানে ওই তাকটার মাথায় ধুলো জমেছে দেখছি।' বলল মীরা।

অধ্যাপক বলল, 'তোমাকে আর অত দেখতে হবে না দিনরাত। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। গবেষণাটা হয়ে গেলে আবার স্বাভাবিক মানুষের মতো—বাড়ি সকলের থাকে না, আমরাও না হয় আর কিছুদিন ফ্ল্যাটেই থাকবো। দু-একটি সন্তান হোক তোমার।'

অধ্যাপককে সলজ্জ দেখাল।

মীরা বলল, কফির জল হয়ে গেল বোধহয়।'

অধ্যাপকের ঘর থেকে রান্না ঘরের দিকে চলে এল মীরা।

মীরা ভাবল, ছ মাস এখনও দূরের সময়।

ব্লাউজের বুক থেকে খামটাকে বার করে ম্যান্টলপিসের উপর রাখল সে। কফিটা ভিজিয়ে দিল। যদিও সে ভেবেছিল, আগে কফিটাকে ভিজিয়ে দিয়ে পরে খামটাকে রাখবে। এমন ম্যান্টলপিস কিন্তু তার কলকাতার বাসায় নেই।

তারপরে সে জানালা ধরে দাঁড়াল।

বিস্ময়ে সে কাঠ হয়ে গেল।

মধুরার ফ্ল্যাট এবং মিউজিয়াম

পুটু, পুটু—

ডাকছে। সে বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। কি করে বা এই ঘরের এই জানালাটার দুটো কাচ রঙীন। রাগের উপরে তাই রঙীন আলোর বৃত্তটা পড়েছে। আবার বরং চোখ বুজল সে। একটু সরে সরে রাগের আরামদায়ক উষ্ণতায় গলা পর্যন্ত ডুবে গেল।

আর গলাটা কেমন নিভাঁজ, মসৃণ আর বরং ভারি নয়? ব্যারিটোন।

দরজাটা খোলাই ছিল। আর একবার পুটু বলে ডাক দিয়ে সে ঢুকল। বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাগঢাকা কাঁধের উপরে সে হাত রাখল।

আর তখন বন্ধ চোখের রেখাগুলো, ঠোঁটের কোণদুটি হাসিতে ঝিলমিল করল।

সে বসল খাটের একপাশে। রাগসমেত কাঁধটাকে জড়িয়ে ধরে তার ঘুমন্ত গালের উপরে নিজের গাল রাখল।

"ওঠো মামণি ওঠো।"

এটুকুই সে চাইছিল বোধহয়, চোখ মেলল সে, "ও মা এতটা বেলা হয়েছে।" রাগটাকে ঠেলে দিয়ে সে গা তুলল। কনুই রাখল বালিশে, যদি তা বল— দুজনেরই এই দুজন ছাড়া আর কে আছে?

তাকাও, দেখো, কমলা রঙের ড্রেসিং গাউনটার উপর থেকে কেমন চওড়া পিঠ আর কাঁধ চোখে পড়ছে, আর কেমন দৃঢ়, কুঁদে বার করা চিবুক। আর যখন দাঁড়াবে, সজীব সতেজ একটা গাছের কথাই মনে হবে। গাছ যার ত্বক ফেটে ফুলের কুঁড়িগুলি বেরিয়ে আসে।

বিমান ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত রেখে, মাটিতে রাখা বাঁ পায়ের হাঁটুতে ডান পা তুলে বসেছে। বাঁ পা গোড়ালির উপর মৃদু মৃদু দুলছে। সাদা মোকাসিনটার ডগায় রোদ পড়েছে। তাই দেখল সে। পিঠটা একটু চওড়া করে মাথাটা পিছন দিকে নুইয়ে সে দেয়ালের গায়ে হেলানো ক্যাবিনেটের উপরে রাখা ছবিটাকে লক্ষ্য করল।

অবশ্য, এসবই পুরোনো, ছবিটা এবং ক্যাবিনেটের পালিশ, ছবিটা পিঠে স্কুল-স্যাচেল ঝোলানো ছুটন্ত বিমানের স্ন্যাপশট। সে উঠে দাঁড়াল। খাটের দিকে তাকাল মুখ নিচু করে।

মধুরা বললে, "ধর্মযাজকরা উপাসকদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তা এমন যে ধর্মযাজকদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব স্ফুরিত হতে বাধা দেয়। ঠিক তেমনই বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণপ্রকৃতি তাদেরই অর্থাৎ মানুষের সমাজের বেশ বড় একটা অংশে মানবত্ব ফুটে ওঠার পক্ষে বাধা। তাই নয়?"

বিমান হাসল আর তার নিভাঁজ মসৃণ গলায় বলল, "কিন্তু মামণি, আমি দেখে এসেছি ব্রেকফাস্টের জন্য টেবলক্লথ পাতছে সুমিতা।"

মনের মধ্যে ধোঁয়া ওঠা ডিমসিদ্ধর সাদা পর্সিলিনের বাটিটা আর পিরামিড-আকৃতি টিপটের হালকা বাষ্প দেখতে পেল মধুরা। আর সুমিতারও বিশ বছর হয়ে গেল ফ্ল্যাটে।

"ফয়ারব্যাক থেকে শুরু করে—", বিমান বলল, "কিন্তু তুমি এস।"

সে বেরিয়ে গেল। এটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ এই ব্রেকফাস্টের উপরে টান।

তিন কামরার ফ্ল্যাট। এদিকে দুটি কামরা আর ওদিকে একটি, সেটি ছোট। মাঝখানে প্রচুর কাচের জানালা বসানো চওড়া করিডর। এই করিডরে চৌকো বড় টেবিলটার পাশে পাশে চেয়ার

বসানো। টেবিলক্লথে ঢাকলে ব্রেকফাস্ট এবং ডিনারের সময়ে ডাইনিং হলের মত দেখায়: দুপুরে জানালার পাশে বোদে পিঠ দিয়ে বসে মধুরা সেলাই করে। প্রতিবেশী ফ্ল্যাট থেকে আসে যারা তারা বসে এখানেই। অনেকদিন, অনেকদিন হয়ে গেল এই ফ্ল্যাটে। এদিকের কামরাদুটোর দেয়াল ক্ষীর রংয়ের, ওদিকেরটির সবুজ, করিডরটা সাদা।

করিডর দিয়ে যেতে যেতে জানালার পর্দাটা ঠেলে দিল মধুরা, বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে সুমিতাকে বলল টেবলে ব্রেকফাস্ট আনতে।

করিডরের দেয়ালে ফটোটায় একটু বোদ চকচক করছে। এটা অবশ্য টেবলে রাখা প্লেট থেকে প্রতিফলিত আলো। নতুবা ফটোটা নিশ্চয় রোদ না পড়ে এমন মাপজোক করে বসানো।

বিমান টেবলের ধারে বসল, আর কাঁটাচামচ চোখের সামনে তুলে তুলে পরীক্ষা করতে শুরু করল। ছুরি তুলে নিয়ে সেটাকে পরখ করে টেবলক্লথে মুছে পালিশ যাচাই করল। মৃদু মৃদু শিস দিচ্ছেও সে।

আর সেই শিস শুনতে পেল মধুরা। গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে কপাল আর গাল মুছতে মুছতে। সে একটু গর্ববোধ করতে পাবে। কেমন, মানুষ করে নি সে ছেলেকে? এই শিসটাই কি সুন্দর স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়?

ততক্ষণে সুমিতা ব্রেকফাস্ট সাজিযে দিয়েছে টেবলে। এখন বরং সে এঘরে ওঘরে কাজ করে বেড়াবে, ওদিকের সবুজঘরের দরজাটা খুলল সে।

আর মধুরা টেবলে বসতে বসতে পর্দার মাথার উপব দিয়ে দেয়ালের গায়ের ফটোটা দেকতে পেল। বিপ্লব—এই শব্দটা উঠল তার মনে।

টেবলে বিমান ছুরির ডগায় মাখন তুলে নিল। টোস্ট সুমিতা একবাবে পাবফেক্ট কবে থাকে। এমন গরম রাখে যে মাখন দেয়া মাত্র ঘিয়ের চেহারা নেয। আর ঠিক তখনই জানালা দিয়ে খানিকটা ঝকঝকে মিষ্টি গবম বোদ টেবলটায এসে পড়ল।

অত্যন্ত মধুব একটা প্রত্যাশা এই ছোটহাজরির, দেখো, কী মধুর উষ্ণ আর সতেজ দেখায বিমানকে। কী চওড়া দেখো কব্জি আর আঙুলগুলো কেমন পরিপুষ্ট। রূপোলি স্টিলের ছুরিতে প্রতিফলিত আলো দেয়ালের গাযে নড়ছে। আর সেটা একবার এই করিডরের ফটোটার গায়ে ঝলমল কবে উঠল যখন মধুরার প্লেটে মাখন মাখানো শেষ করে টোস্ট রাখল বিমান। ফটোটা ক্রসবেল্ট আঁটা, বারান্দা দেযা টুপি পরা পুলিশ অফিসারের, টুপিটা শুধু মাথার পিছনদিকে রসিকতা করে ঠেলে দেয়া। আর এক মুখ হাসি।

কিন্তু, বিমান কিন্তু তার একারই তৈরি, যদি তা বল। সেই একবছর থেকে এই চব্বিশ হল। সে একাই বিমানকে এই পর্যন্ত এনেছে। কেমন, তাই নয়? আর বোধ হয় নিন্দা করতেও পারবে না। মধুরার ঠোঁটদুটোতে হাসি ফুরফুর করল। এমন কি তাব গালে টোল খেল মনের ভরাট হাসিটা।

খানিক বিনা-চিনি-দুধেব চা ঢেলে নিল পেয়ালায় মধুরা। এটা তার অভ্যাস, এই গরম খানিকটা ঠোঁটে না লাগালে সে ব্রেকফাস্টের দিকে মন দিতে পারে না। আর তা হলে তার নিজের পঁয়তাল্লিশ হল বোধ হয়। আর এ ফ্ল্যাটে পঁচিশ বছব হল। শতাব্দীর চতুর্থাংশ। বিমান ফিরে আসার আগে, তাকে ব্রেকফাস্ট বলে না, সুমিতা মধুরার বিছানার পাশেই প্রথম চায়ের কাপটা পৌঁছে দিতো সকালেব খাবার তৈরি করার আগে।

পরিজে চামচ দিয়ে বিমান বলল, "তুমি খাচ্ছ না মামণি।"

দেয়ালের গা থেকে চোখ নামাল মধুরা। পরিজের বাটি টেনে নিল। "আচ্ছা, খোকন, তুমি গোটি রাখো না কেন? আমার তো মনে হয়—আচ্ছা তুমি দুসপ্তাহ সেব না করে দেখো দেখি।"

"গোটি?"

মধুরা মনে মনে বিমানের গোটিমণ্ডিত চিবুক দেখতে চেষ্টা করল, ভালোই লাগল। অবশ্যই গোটি রাখা না-রাখা এমন কিছু নয়। এমনিতেই বিমানকে জমকালো দেখায়। তাহলেও এটা খাপছাড়া অনুবোধ হয় না মধুরার। সে কি এই জমকালো যুবকটিকে তিলতিল করে গড়ে তোলে নি এই ফ্ল্যাটে একা আর তা একটা শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ ধরে?

মধুরা বলল, "ভ্লাডিমির ইলিচের ছিল কিন্তু।" বিমান ঝিরঝির করে হাসল, "আ, মা, তোমার ছেলেকে— তোমার ছেলে কত বড় বলো তো?" "আমার ছেলে, আব কত বড?" মধুরা এক মুহূর্তে শানিত হয়ে উঠল যেন কেউ তার হাতের কাজের বেহিসাবী সমালোচনা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিপক্ষ উপস্থিত নেই। সে বরং অনুভব কবল পবিজের দুধটা ভালো। আব এই মাখনসমেত দুধ বিমানের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, নতুবা ঠোঁটদুটোতে অমন রঙেব আভাস থাকে না।

অবশ্য পার্সোনালিটি কি কবে গড়ে ওঠে তা বলা খুব সহজ নয়। বিমানের বেলাতেও তা বলা যাবে না। কিন্তু তাতে ভালোই লাগে। হঠাৎ কখনও চোখে পড়ে, অনুভবে আসে, একেবারে সবটুকু চেনা নয় বিমান। সেদিন, যেমন সেই সেবার বাসি শার্ট ধোবাকে দেয়াব আগে পকেট ঝাড়তে গিয়ে সেখানে একটা সিগারেটের বাক্স দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মধুবা, ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে জামা, প্যান্ট, জুতো সবই গুছিয়ে দিয়েছিল, রুমালটাকে ভাঁজ করে পকেটে বাখা পর্যন্ত, ছোট পার্সটা খুলে দেখে নিয়ে কতটা খুচবো পয়সা আর ছোট ছোট নোট দিতে হবে তা পর্যন্ত, কিন্তু সিগাবেটটা হিসাবের বাইরে থেকে এসে পড়েছিল। তেমনি সে ঘটনাটাও.. ব্যারিস্টার হবে বিমান, এই বলেছিল সে একদিন, যে সব উপাদান সাজিয়ে রাখছিল মধুরা তাব মধ্যে এটা ছিল না। ব্যারিস্টার? চাকরি নয়? ও, আচ্ছা, তা মন্দ কী? মন্দ নয়, বরং ভালোই লেগেছিল মধুবার।

টোস্টে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নিল মধুরা। কিম্বা ধরো নির্ভাজ মসৃণ গলায় বলা সেই কথা কয়েকটি। মামণি তোমাকে এখনও এই পঁচিশ বছর বাদেও নিরামিষ খেতে হবে কেন? মধুবা একেবার বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। এবকম প্রশ্ন কি আদৌ উঠতে পাবে? আর তা পারে ছেলেব কাছ থেকে? কিন্তু নিন্দনীয় কিছুব সামনে ধিক্কাব দিতে গিয়ে মন যেমন শক্ত হয়ে ওঠে তা তো হল না। তা যে হল না, সেটাই যেন বিস্ময়ের উপাদান। হ্যাঁ, এই পঁচিশ বছর পবে, তাইতো, সংযম না শোক?

মুখ উঁচু করল মধুরা। দেয়ালের গায়ে ছবিটায় একটা চকচকে আলোর বৃত্ত, কাচে প্রতিফলিত আলো, পরিজবউলটা সরাল মধুরা; কিছু হল না, প্লেটটা কোলের দিকে টেনে নিল, ছবিব গায়ের বৃত্তটা নড়ে দেয়ালের গায়ে পড়ল।

বলতে পাবো শোক জানানো উচিত। কথাটা ঔচিত্য।

মধুরা বলল "আচ্ছা, খোকন, যখন এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে চেপে বাখবে না, যখন মানুষের চিত্ত পরিপূর্ণ বিকশিত, তখনও কি বিপ্লব থাকবে?"

সুমিতা ওদিকের ঘরটা ঝাড়ন দিয়ে মুছছে, জানলাগুলোকে খুলে দিয়ে পর্দাগুলোকে টান করে দেবার পর। ঘরটা সবুজ।

বিমান ডিম খুলতে শুরু করল।

"বিপ্লব, তা আচ্ছা মামণি, তুমি সেদিন বলছিলে আমাদেব দেশে বিপ্লবী ছিল আগেও। ভেবে দেখলাম তাদের তা বলা যায়। কিন্তু বলতে হবে তা সবই বুর্জুয়া-বিপ্লব। বিদ্রোহ মানেই কিন্তু বিপ্লব নয়। কেমন, তাই কি না?"

মধুরা চা ঢেলে নিল।

সুমিতা ওদিকের সবুজঘরটার কাজ শেষ করে করিডর দিয়েই এদিকের ঘরে গেল কাজ সারতে। চায়ে চুমুক দিল মধুরা। কোন কোনদিন ডিমের আগে একবার চা চায় বিমান।

আর এ আলাপ এর আগেও হয়েছে। বিমান ধারণা করে থাকে, দেশের স্বাধীনতার জন্য যে বুর্জুয়া বিদ্রোহ তাকে বিপ্লব বলা চলে না। কেউ তার জন্য প্রাণ দিয়েছে তার জন্যই তাকে বিপ্লবী বলাও সঙ্গত হবে না। "ভারি সুন্দর রোদ, নয়?" বলল বিমান, "ওকি, চা ঢেলে নিলে? কিছুই খাও না।" টেবলে এদিকে ওদিক চাইল যেন আমিষ ছাড়া আর কী আছে যা মায়ের দিকে এগিয়ে দিতে পারে।

ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন আর উজ্জ্বল রোদের দিন। ভাবল মধুরা। আর এটা ভালোই বিমান সাহস কথে বলেছিল চাকবি কববে না।

বিমান বলল, "কাল থেকে একটি করে আপেল যেন থাকে।"

তা যে মধুরাব জন্যই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওদিকে মৃদু স্পষ্ট শব্দে ঘড়ির আওযাজ হল। কব্জি উল্টে বিমান দেখল হাতঘড়ি। তার ঘড়িতেও আটটা।

সাড়ে আটটাতেই বার হয় বিমান। আর এখনও তার নিজের চেম্বার হয়নি।

মধুরা বলল, "আবার, কিন্তু, জেলে যাওয়ার মতলব নেই তো?"

একটু চমকে ওঠার মতোই আচমকা বলা, বিমান হাসল।

"আ, মা, জেলে যাওয়াটা পেশা নয়। অন্তত আমাদের নয়।"

মধুরাও হাসতে পাবল, "নখগুলো কিন্তু তোমার বড় বড় হয়েছে, খোকন।"

কাঁটা চামচ প্লেটে রেখে হাত দুটো ঘষলে বিমান। বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের আঙুল বেখে নখগুলোকে লক্ষ্য করে বলল, "চা দাও।"

চাযে দুধ দিযে কাপ এগিয়ে দিতে দিতে মনে মনে একটা সুঘ্রাণ অনুভব করার মতো ভাবল মধুরা। এটা ঠিক একটা সুন্দব গাছে ফুল ফুটে ওঠার মতো। আবও সুন্দর হওয়া নয়—বিমানেব এই নিজেকে বিপ্লবের সঙ্গে জডিযে বাখা? কত গভীর নীল বিমানের আকাশ।

হ্যাঁ, এ ভালোই হয়েছে যা হযেছে। হয়তো পথটা ঘুরনো, সহজও ছিল না, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে দেখো, আর তাকে আলোক উদ্ভাসিতও বলা যায়।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বিমান দাঁড়ায় না। পোশাক পবে। তারপর নিচতলায় গ্যারাজ। সেখানে সেই পুরনো সাদা শেভ্রলে বাব করে। পঁচিশ বছরেরও পুরনো মডেল।

তখন কোন কোন দিন ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় মধুরা, সবুজঘরটার গায়েই ঝুলবারান্দা।

কিন্তু তার চাইতেও বেশী পুরনো অভ্যাস এই করিডরে বসা। সুমিতাও বসে একটা নিচু টুল টেনে নিয়ে। দুই মাগ চা তৈরি করা হয়। যতক্ষণ না সুমিতা বাজারে যায়। এটা খুবই পুরনো অভ্যাস।

আঠাবো বছরের গ্রামের মেয়ে সুমিতা এই করেই কবে চল্লিশ পার হয়ে এসেছে। এখন আর কোন রকমেই তাকে গ্রামেব মেয়ে বলা যায় না।

মধুরা চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিল, খবরের কাগজটা খুলল, পোশাক পরে এল বিমান। সুমিতা এদিকেব ঘরেব বিছানাদুটোকে গুছিয়ে ঝাড়ন নিয়ে সবুজঘরটায় গেল আবার। এবার সে ঝাড়তে শুরু করবে। তখন এই করিডরের রোদে ধুলোর কণা উড়বে।

"আজ কোথাও যাবে না তো বাইরে?" মধুরা মুখ তুলল কাগজ থেকে। বিমান ঘাড় নিচু করে সিগাবেট ধরিয়ে নিল। "না, বরং শহরেই।"

খুশি হল মধুরা। এই টকটকে লাল, ববং সরু টাইটিতে ভালো দেখায়। আর হালকা ধরনের মিশকালো গোটি যদি টাইটার ঠিক উপরেই চোখে পড়ে।

বিমান বেরিয়ে গেল। মধুরা উঠে দাঁড়াল। মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপরে আবার রোদেই বসল। কাগজটায় চোখ রাখল। ছোট অক্ষরগুলোর জন্য চশমার দরকার। সুমিতা ওদিকের ঘরটায় ঢুকেছে। মিউজিয়াম বলা যায়। মৃদুস্বরে বলল মধুরা—চশমাটা দিও। মিউজিয়াম...

মিউজিয়ামই কথাটা। বসবার ঘর আসলে। একটা টেবল, খানকয়েক চেয়ার। একটা বুকশেলফ, টেবলে পেজমার্ক দেয়া একখানা ফরেন্সিক মেডসিনের বই। তাব পাশে একটা রুপোর সিগাবেট কেস। আর দেয়ালে একটা গ্লাসকেসে সে সময়কার অপরাধীদের ছোট ছোট ফটো; সে সময়কাব মানে পঁচিশ বছর আগেকার।

সুমিতা সেলাই এর ঝুড়িটা এনে দিল। অলিভগ্রিনটাই পছন্দ বিমানের, নতুন সোয়েটাবটা তিনপোয়া বোনা হয়েছে। সাদা কাঁটা সমেত খানিকটা বোনা উল সবাতেই চশমা বার হল। সে সময়ের সে অপরাধীদেব কথা এখন কারোই মনে নেই।

মধুবা চোখ তুলল। পর্দার উপর দিয়ে ফটোটা চোখে পড়ল আবার। মিউজিয়ামই বলতে হয়, কাবো ব্যবহারের কবা জিনিসগুলো যদি পঁচিশ বছর ধরে একইভাবে সাজানো থাকে। ধুলো পড়েনি কারণ সুমিতা এখনই ঝাড়ছে দেখো আর একবার, কিন্তু রুপোর সিগাবেট কেসটা কালচে হতে শুরু কবেছে আর পলাতক অপরাধীদেব ফটোগুলো হযেছে হলদেটে। একজন পুলিশ অফিসারেব মিউজিয়াম।

আব বড়ো ফটোটাও অপরাধীরই, নতুবা এটা হাস্যকব আর অবিশ্বাস্য হবে যে একজন বিপ্লবীর ছবি অমন করে প্রাধান্য দিযে পুলিশ অফিসার রেখেছিল তার বসবার ঘবে। বিপ্লবীরাও, যাদেব ছোট ছোট ছবি গ্লাসকেসে, সেই ফেরাবী অপরাধীদের মতোই প্রতিপক্ষ ছিল অবশ্যই। কাগজে চোখ রাখল মধুরা।

সুমিতা বেবিয়ে এল। তাকে অবশ্য এদিকের ঘরগুলোকেও ঝাড়তে হবে। কিন্তু দিনটাও, এমনকি দুপুবের জন্য রান্নাঘবে যাওয়ার আগেও অনেকটা সময় পড়ে আছে।

চা আনি?

আনো। মধুরা খববের কাগজটা রাখল। সেলাই ঝুড়ি থেকে বরং কাঁটা আব উল তুলে নিল।

তা একজন পুলিশ অফিসাবেব মিউজিযাম। দুহাতে দুই মাগ চা ধরে আনল সুমিতা। এসব এমন যে এর জন্য ভাবতেও হয় না। আর এটাই একসময়ে মধুবাব ব্রেকফাস্ট ছিল। অর্থাৎ বিমান যখন মিশনারী স্কুল থেকে এই ফ্ল্যাটে ফিবতো তখনও। টেবলে বসা শুরু হযেছে বিমান আরও বড়ো হলে। আর কী কথাটা দেখো—আচ্ছা, মামণি, তোমার এই পঁচিশ বছব বাদে নিরামিষ খাওযাব কী সার্থকতা? কিন্তু এরকম একটা কথা থেকে অনেক কথা উঠতে পারে মনে।

ঠোঁটের কাছে চায়ের মাগ তুলে সুমিতা বলল, "সংসারের খরচ বেড়ে যায় নইলে—"

কথাটা কিছুদিন থেকেই সে ভেবেছে, সুমিতা আন্দাজ কবেছে ঠিকই। সেদিক থেকে না বললেও চলে, কিন্তু বলে দেয়ার সার্থকতা আছে। সুমিতা জানে অথচ না জেনে থাকার ভান করবে নতুবা। চায়ের মাগে চুমুক দিল মধুবা।

মধুরা বলল, "দুমাস আগে মানোয়ারাটা বন্ধ হয়েছে।"

হ্যাঁ, এটা একটা পবিবর্তন। পঁচিশ বছরে মস্ত একটা পবিবর্তন।

মধুরা হেসে বলল, "তা তোমাদেব ছেলে চালাচ্ছে ভালোই, কী বলো?"

সেই ব্রেকফাস্টের কথাই, এখন এই পঁচিশ বছর পরে আবার আমিষ ধরার কোন তাগিদই নেই। ওটা মানসিক ভঙ্গির প্রমাণ—আলোচনাটার সব দিকেই।

চায়ের মাগে চুমুক দিল মধুরা। সুমিতা বলল, "খোকাবাবু কি এই ফ্ল্যাটটাও ছেড়ে দেবে?"

"তাই স্বাভাবিক হয় না?" মধুরা কিছুটা প্রশ্নের মতোই করে রাখল তার সম্মতিকে।

চোখ তুলল মধুরা। করিডরে এই ছবিটার নিচে দেয়ালের গায়ে টিপটের গা থেকে আলোর একটা তেরচা লাইন পড়েছে এখন। প্রতিফলন। চা-টা শেষ হলে সুমিতা ব্রেকফাস্টের টেবল খালি করবে। এসবই সুমিতার রুটিনেব ছকে বাঁধা। অবশ্য অনেক দিনের রুটিন। অনেকদিন হয়েছে এই ফ্ল্যাটে।

সুমিতা উলের বোনা অংশটাকে হাতে তুলে নিয়ে নকশাটাকে লক্ষ্য করল, খেজুর পাতার মতো বটে কিন্তু কিছুটা তফাৎ আছে।

সুমিতা বলল, "আমি যেটা বুনছি সেটা গলা ঢাকা হবে, আর বাঁ কাঁধে দুটো বোতাম থাকবে।"

এটাও সুমিতার রুটিনের মধ্যেই পড়ে। মধুরা যদি বিমানের জন্য বোনে, সুমিতাও উল হাতে করে আর প্রাযই তা মধুরাব মতো কিছু, তফাৎও আছে। মধুরা বোনে সকালের ব্রেকফাস্টের পর কাগজ দেখতে দেখতে শুরু করে দুপুর পর্যন্ত। আর সুমিতা সন্ধ্যার পর রাতের খাওয়ার পাট মিটলে তার ঘবে গিয়ে টেবল ল্যাম্পের সামনে।

অবশ্য রুটিন পাল্টেও যায়। আর ছোটদের কত বোগই হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেট ব্যথা, পা মচকানো, এমন কি মামস। আর তখন বিশেষ খাবার তৈরী, গরম জলের ব্যাগ নিযে ছুটোছুটি। এখন বিমান সে সব আগাছা ছাড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও এই পঁচিশ বছরে এই ফ্ল্যাটে সেসব দিন কী উত্তেজনা' আর উৎকণ্ঠার কারণই না হয়েছে! আর এইসব উৎকণ্ঠা আর এইসব রুটিন নিযেই পঁচিশ বছর কেটে গেল এ ফ্ল্যাটে। বিমান গড়ে উঠল, ভালো হয়নি বিমানের গড়ে ওঠা?

মধুবা বলল, "কিন্তু রোদটা আজ কী রকম ঝকঝকে আর স্পষ্ট। আর তাপটা কেমন টাটকা।"

জানালার চওড়া কাঁচগুলো দিকে চাইল সুমিতা।

নিজেব শোবার ঘরে ফ্রককোট পরা বিমানের ছোট বেলার ছবিটাকে মনে পড়ল মধুরাব। মধুরা হেসে বলল, "বিমান এই পঁচিশ বছবের ফ্ল্যাট বদলাবে।"

সুমিতা মেঝেতে পডা রোদেব চতুর্ভুজগুলোকে লক্ষ্য করল।

তা মনে পড়বে বৈকি। মাসোযাবাটা বন্ধ হয়েছে, ফ্ল্যাটও বদলাবে, কিন্তু এই ফ্ল্যাট আর মাসোয়ারা এমন কি পুবনো মডেলের সাদা শেভ্রলেটাকেও গত পঁচিশ বছবের থেকে আলাদা করা যায় না বোধ হয়।

আর এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়ার পবে যা থাকবে তা বিমানের পৈতৃক উপাধিতেই। এখন আর কারো জন্য শোক করার কথা মনে হয় না। অথচ বিমানের উপাধিই প্রমাণ অন্য কারো ও। কথাটাও দেখো, এখনও এই পঁচিশ বছব পবে নিবামিষের কী সার্থকতা? রীতি? অর্থাৎ, অর্থাৎ স্বামী ছিলেন, নেই। না, শোক অনুভব হয না, হয় কি? অবশ্য এই নিরামিষের ব্যাপাবে কিছু রেসপন্সেবিলিটি আছে। মর্যাদা কথাটা বোধ হয়।

চা শেষ করে সুমিতা উঠে দাঁড়াল, এখন সে ব্রেকফাস্টের বাসনগুলো সরাবে, ধোবে, মুছবে, শুকিয়ে তুলে রাখবে রান্নাঘরের শেলফে। এই পঁচিশ বছরে এই ফ্ল্যাটে একটা জিনিসই বদলেছে-- বাসন ধোবার বেসিনটা। আগে ছিল না, রান্নাঘবের নালিটাকেই ব্যবহার করতে হতো। চিনেমাটির বেসিনটা আর তার গায়ে জলের ট্যাপ বসানো হল, অবশ্য তার জন্য ভাড়াও বাড়ল দশটাকা। এমন হতে পারে, ভাড়া বাড়ানোর ছুতো সেটা।

মধুবার ঠোঁটদুটো হাসি হাসি দেখাল। ফ্ল্যাটের মালিক কি করে টের পেয়েছিল ঠিক সেই বছরে মাসোয়ারার টাকাও বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা আর তা বিমানের হায়াব এডুকেশনের জন্য।

উল বুনতে শুরু করল মধুরা, পঁচিশ বছর কিন্তু কম নয়—একটা শতাব্দীর চর্তুথাংশ।

এটা কিন্তু একটু অসাধারণ তার এই ফ্ল্যাটে স্থির হয়ে থাকা। মনে হতে পারে কেউ যেন একটা অ্যানুইটি রেখে গিয়েছিল। আর তাব শর্ত এই ফ্ল্যাটে বাস করা আর পুরনো সাদা শেভ্রলেটাকে

ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই নয়। শেভ্রলেটা পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অমার্কামারা গাড়িগুলোর একটি ছিল। প্রস্তাব এসেছিল, গাড়িটা নেবে? মাসে মাসে কিস্তিতে শোধ দিও। গাড়ি? এই প্রশ্ন এবং বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই জানা গিয়েছিল, এটাও আর একটা ব্যবস্থা, উপরে কোথাও যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর এই ফ্ল্যাটের ব্যাপাবেও হয়তো ফ্ল্যাটের মালিককে সেই হাযার আপ থেকেই বলে দেয়া হয়েছিল—ডিসটার্ব কোবো না।

একজন মা ও তার একটি শিশুর পক্ষে যথেষ্ট একটা নিশ্চিত মাসোয়ারা, অ্যানুইটি রেখে যাওয়ার মতোই, এমনকি একজনেব মৃত্যুর সঙ্গেই যুক্ত; কিন্তু তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ।

সুমিতা রান্নঘরের দরজার পাশে ছোট টেবলটায় ব্রেকফাস্টের বাসনগুলো মুছে মুছে রাখছে রোদে।

আর এ সব ব্যাপারই একটা বিপ্লবেব সঙ্গে যুক্ত, একটা বিপ্লব যা ইতিহাসের অংশ হয়ে গিয়েছে। যে ইতিহাসের একটা উপাদান এখানেই পেতে পারো তুমি। এই দুটো ছবি আব ওই সবুজ বং করা বসবাব ঘরটাতে যাকে কখনও কখনও মিউজিয়াম বলে মনে হয়।

মধুরার কব্জি থেকে আঙুলের ডগা অবধি ব্যস্ত হয়ে নড়ছে উলের ডিজাইন তুলতে। নতুবা কখনও কখনও তাকে ছবিতে আঁকার মতো স্থির দেখায়। অবশ্য চোখদুটো কখনও কখনও অন্য সময়ের চাইতে বেশী টানাটানা হয়ে উঠছে।

আর মিউজিয়ামটাতে যেভাবে ছবিটা আছে, তাতে কারো মনে হতে পাবে, সে ঘবখানিতে যার স্মৃতি সে ওই ছবির লোকটিবই। আর করিডরের দেয়ালের ছবিটা—অথচ ঠিক উলটো, তাই নয়? পুলিশ অফিসাবের চোখে দেযালের ওই ছবিটি ছিল একজন অপরাধীরই। যাকে পরে বিপ্লবী বলা হয়ে থাকে। দুটি দৃষ্টিকোণ—। আর ওখানে রাখবার কারণ, বারবার দেখে এমন চিনে রাখা যাতে ছদ্মবেশেও চিনতে পারা যায়? কিম্বা পুলিশ অফিসাবের সেটা কি মানসিক ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে প্রতিপক্ষকে নিজের বসবার ঘরে চোখের সামনে বাখতে চাইতো? শিকারকে থাবার মধ্যে রাখার মনোভঙ্গির প্রমাণ? তার অসাধারণতা?

অথচ তারা শিকারের ব্যাপারে জায়গা বদলে নিল। পবে অবশ্য, না, এখন সেও আর নেই, বিপ্লবীও, আর এখানেও দেখো এই ফ্ল্যাটে ছবি রাখার ব্যাপারেও তারা জায়গা বদলে নিয়েছে। অবশ্য বলতে পারা যায, এটার কারণ এই যে মধুরা কিছুই বদলাতে চায়নি। এই ফ্ল্যাটের, সেই বিশেষ দুর্ঘটনার দিনটাতে যেখানে যেমন ছিল তা বদলানো হয়নি। তারই ফলে মনে হতে পাবে মিউজিয়ামে যার ফটো সেই এ ফ্ল্যাটে প্রধান।

সুমিতা বাজারের থলেটা হাতে করে বার হল। সুদৃশ্য থলে। হয়তো কিছুটা পুরনো। এই ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রের মতো বলা যায়। পুরনো, তা, এই পঁচিশ বছরে হয়তো একবারই বার্নিশ করা হয়েছে। সস্নেহে ধরে রাখা স্মৃতি যেমন হতে পারে।

অন্যদিকে, স্মৃতিতেও কি জায়গা বদলাতে পারে? বিপরীত প্রমাণই বেশী। সেই পঁচিশ বছরের পুরনো হারের ভাড়ায় এই ফ্ল্যাটে থাকা, পুরনো মডেলের শেভ্রলে, কিম্বা সে নিজে যে এখনও মিসেস অমুক বলে পরিচিত, তাই কি প্রমাণ নয় যে স্মৃতিতে লোকদুটির জায়গা বদলানো উচিত নয়?

মধুরার চোখের পাতা দুটো নড়ে চরে উঠল। এক হাত দিয়ে অন্য হাত স্পর্শ কবল সে। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যেন মসৃণতা আর কোমলতাকে যাচাই করল। সে কেঁদেছিল, খুবই কেঁদেছিল, সেই দুর্ঘটনার সময়ে। এক বছরের খোকনকে, তখন কেউ জানত না তার নাম বিমান হবে, বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিল মধুরা। কিন্তু খুব সম্ভব দুবছর মাপে কখনও পঁচিশ বছরের সমান হয় না। যদিও পঁচিশ বছরের আগের দুবছর মিথ্যা নয় তার প্রমাণ সে মিসেস অমুক বলে মাসোয়ারার

বিলে সই দিয়েছে।

মধুরা আবার উল বুনতে শুরু করল। না, তার আঙুলগুলো শক্ত নয়, কঠিন নয়। আসলে বিমানকে গড়ে তোলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলেই সেই জীবনেব সেই দুবছর এখন তেমন মনে পড়ে না। সে জন্যই স্মৃতিতে পুরুষদুটি একটি ঘটনার উভয়পক্ষ হিসেবে সমান দেখায়। যেন এই ফ্ল্যাটটাকে দখল করার জন্য দুটি পুরুষের দ্বন্দ্ব। তাদের পদতাড়নায়, বাহু-আক্ষেপে এখানে মাটি খুবলে গেল, ওখানে কাচ ভাঙল। তারপর জয়ী বিজয়ী দুজনেই মরে গেল। বিমানকে গড়ে তুলতে মনে এদের একজনকে খুব কাছে পেয়েছিল। পক্ষপাতিত্ব, খুবই পক্ষপাতিত্ব ছিল। তারপর অন্য পুরুষটিব সকরুণ কিছু বরণীয়তা চোখে পড়েছিল। তারপর এই ফ্ল্যাটে, নড়েচড়ে বসল মধুরা, সুমিতাকে ডাকল খোকনের খাবার তৈরী হল কিনা খোঁজ করতে।

সেটা বিপ্লবই ছিল, নতুবা অমন বদলে যেতো না মধুরার পোশাক।

একটা বিপ্লব যা এই ফ্ল্যাটে প্রায় তার কোলের কাছে ঘটে গিয়েছে। আর বিপ্লবে দুপক্ষ দরকার। আর সে জন্যই স্মৃতিতে ওই ফটোদুটো সমান হয়ে আছে।

মধুরার ঠোঁটের কোণদুটো হাসি হাসি দেখাল। কী দুরন্ত ছিল দুটো পুরুষই। প্রায় সমবয়সী, পুলিশ অফিসার হয়তো দু-চার বছরেব বড়, হয়তো যাদের আছে তাদেব পক্ষেই ছিল সে, মধুরার বিশেষ আপন ছিল সে। আর বিপ্লবী ছিল, যেমন তারা থাকে। কাবো আত্মীয়ই হয় না তাবা, আহা! ওদিকে বিপ্লবে দুপক্ষই থাকবে—এখন তারা কেউই নেই।

অবশ্য বিমানকে সে বলে নি, মিউজিযামে ওই যে পুরুষের ছবি, সুমিতা সস্নেহে যার কাচ থেকে ধুলো মুছে দেয় তা, তা হল, কথাটা নাটকীয়, বিমানেব পিতৃহন্তার। সুমিতাকেও, দেখছি, এই পঁচিশ বছরে বলা হয়নি।

চোখের সামনে উলের ডিজাইনটা তুলে ধবল সে। কী সুন্দরই দেখাবে বিমানকে। হ্যাঁ, ওর বাবার চাইতেও মাথায় ইঞ্চি কয়েক উঁচু হবে। আব গায়ের রঙেও কিছুটা পৃথক। মধুরা হাত উলটে নিজের হাতের পিঠের রঙটাকে লক্ষ্য করল। খুবই ভালো দেখাবে বিমানকে এই বিশেষ ধবনেব ব্রাউন জ্যাকেটে, লাল টাই, আর গোটিতে যদি গোটি রাখে। বাবা—মানে যার কথা কিছুই মনে থাকার কথা নয়।

মধুরা সাধারণত বেশ একটু তাড়াতাড়ি উল বুনে থাকে। ডান হাতেব আঙুলের ডগায় জড়ানো উল, কাঁটার মাথায় দুবার জড়িয়ে দিল কারণ ডিজাইনটার তাই নির্দেশ।...কিন্তু এরকম ভাবা হযতো ঠিক নয়, উচিত নয়, যে বিমান সবটুকু তার একারই। কিছুক্ষণ সামনের দিকে চেয়ে থেকে আবাব কোলের দিকে চোখ এনে বুনতে শুরু করল মধুরা।

সুমিতার বাজারে খুব কমই দরকার ছিল। এরই মধ্যে ফিরল সে। করিডরের মাঝামাঝি জায়গায় থেমে দাঁড়াল। মধুরাকে লক্ষ্য করল।

মধুরা তখন ভাবল। কী ঝড়! যেন মাটিই কাঁপছিল থরথর করে কিম্বা ভূকম্প। জীবন যেন থেমে যাবে, খসে পড়বে।

সুমিতা বলল, সেই থেকে রোদে আছো। সারা গায়ে রোদে স্নান করছো যেন। কিন্তু মাথা ধববে, উলেও রোদ পড়ছে। অবিশ্যি বোদটা খুবই টাটকা।

কখনো কখনো মনে হয় না—রোদটা একেবারে আজকের? মধুরা হাসল। মধুরা উঠে দাঁড়াল। আচ্ছা এই জ্যাকেটে লাল টাই মানাবে না বিমানকে?

এখন সে বরং একটু কাজ করবে। জানালায় রাখা ডালিয়ার কাটিংগুলোতে জল দেবে। শেলফে বইগুলোর হালকা ধুলো, কিম্বা দেয়ালের গায়ের সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল ঝাড়বে।

এদিকে শোবার ঘরদুটোতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে লম্বা ডাঁটের পালকের ঝাঁটা হাতে আবার করিডরে

এল মধুরা।

আর কাল রাতের কথাটা ভাবো। পাশাপাশি বসে সে আর বিমান বইটা পড়ছিল। আর অসংলগ্নভাবে নয় বরং সেই বইটার মতামত থেকে কথাটা উঠে এসেছিল; আজ সকালেও বিমানেব সঙ্গে প্রথম কথাটায় তারই রেশ ছিল—সেদিক থেকে দেখতে গেলে সেই যে বিপ্লব তাকে নাকি বিপ্লব বলা যায় না।

ঠিক যা ভেবেছি—করিডবের ছবিটার কাছেই সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল। পালকেব ঝাঁটার মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিযে জালটাকে সরিয়ে দিল সে। সেই প্রথম থেকেই ছবিটা এখানে আছে। সেটাই এখানে থেকে যাওয়ার কারণও। এখন কাছে থেকে আরও ভালো দেখা যাচ্ছে—দূর থেকে বোঝা যায় না, মুখটায় হাসি জড়ানো।

কিন্তু এবার? এই এতদিনে কিছু পরিবর্তন হবে, চেম্বাবেব কাছাকাছি কোন ফ্ল্যাটে উঠে যাবে বিমান, আগামী মাসের মাঝামাঝি কিম্বা তাব পবের মাসের প্রথম দিকে;

এদিকে আর ধুলো নেই, সুমিতা আর ধুলোয় অত্যন্ত খেয়োখেয়ি, সুমিতা থাকলে ধুলো থাকতে পাবে না। ওদিকের সবুজঘরের ছবিটাতেও এখন মাকড়সার ধুলো থাকতে পারে। সবুজঘবেব দিকে এগোল মধুরা।

কিন্তু নতুন ফ্ল্যাটে এমন সবুজঘর থাকবে কি? অবশ্য থাকবে না। অপরাধীদের কুৎসিত ছবিওয়ালা গ্লাসকেসটা? না, তা একেবারেই সম্ভব নয। আর একজনের ব্যবহার করা কলম, বই, সিগাবেটকেস, কিম্বা ছাইদান! থেমে দাঁড়াল মধুবা।

সুমিতাই বলেছিল—এসবই নতুন ফ্ল্যাটে মধুরার নিজের যে শোবাব ঘর হবে তাতে গুছিয়ে দেয়া চলতে পাবে। শুনে মধুবা বলেছিল. উঁ, হ্যাঁ. তাই ববং, কিন্তু কথাটা মনে থিতোতে গিয়ে ববং গুলিযে উঠল যেমন গা গুলিযে ওঠে।

খুব পুরনো। খুবই পুবনো নয়? মধুরা সবুজঘরে দাঁড়িয়ে অনুভব করল। হাসল, সুমিতা বোঝে না। আর তা ছাডা বিপ্লবের সেই ঘটনাটা একেবারে তার কোলেব কাছে ঘটেছিল বটে, কিন্তু এখন কি তা খুব দূরের নয়? হ্যাঁ, অনেক ভুলই তো হয—কিছুদিন আগেও বিমানের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করতে গিয়ে বালিগঞ্জেব মেয়েটার কথা ভেবেছিল। ও বিপ্লবটাতেও ভুল ছিল। হয়তো তীব্র আগ্রহ ছিল, প্রাণকে পণ কবেছিল কেউ কেউ নিজের অস্তিত্বের বিনিময়ে, কেউ কেউ পরিবর্তন ঘটাতে চেযেছিল, কিন্তু বিমানদের হিসাবে সেটা আসল কিছু ছিল না, বুর্জোযা বিপ্লব বলেছে বিমান। একটা ভুল পথে গিয়ে কিছু লোকের প্রাণ দেয়া, প্রকৃতপক্ষে সেই নতুন ফ্ল্যাটে এ সবকিছুকে বর্জন করেই যেতে হবে।

বিমান কি কঠোর? সে কিন্তু কঠোর স্ববেও বলেনি, উত্তেজিত সুরেও বলেনি। সত্য কে আর কবে উত্তেজিত হয়ে বলে?

ছবিটাব সামনে গিয়ে দাঁড়াল মধুরা। কপাল ঢাকা ঝাঁকড়া চুল, সরু একটা গোঁফেব রেখা, আয়তচোখ. কেমন বিপ্লবী বলে মনে হয়? ধরা দেয়নি, পুলিশের পক্ষে গোলাগুলি ছোঁড়ায় প্রাণ দিয়েছিল। ধরা দেয়নি। সেই পঁচিশ বছর আগে।

সুমিতার কথা মতো শোবার ঘরে নয়, তবুও হয়তো আঁচলে ঢেকে রাখতে পারে মধুরা এ ছবিটাকে আর তার পাশেই ও ঘরের ছবিটাকেও, কিন্তু বিমান যা বলেছে, ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ হয়তো একটা ভ্রান্ত বিপ্লব ছিল।

একটা নিঃশব্দ টানা নিঃশ্বাস পড়ল মধুরার। একেবারে ভুলে যাবার মতো ব্যাপার হবে। এগুলি সব পড়ে থাকবে, আর তারপর হয়তো ফ্ল্যাটের মালিক অন্য আবর্জনার সামিল করে ফেলে দেবে। আশ্চর্য, তাই ফেলে দিতে হয়? আশ্চর্য!

অথচ, বিমানকে দেখো।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল মধুরা। তুমি যদি বলো কোলের কাছেই সেই বিপ্লবটা ঘটেছিল, তবে সেই কোল জুড়েই বিমান বেড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে।

আর সেই নতুন ফ্ল্যাটটা হবে বিমানের। একেবারে নতুন হবে সেই ফ্ল্যাট। কেমন, বিমানকে দেখে আর একটি পুরোপুরি পুরুষ বলে মনে হয় না? রোদটা এখন থেকে দেয়ালে উঠেছে। রোদের নিজের সীমাটা একটা সরল রেখা।

আর তা হলে বিমানের লাঞ্চে আসবার সময় হল।

কী ক্ষিধে যে ওর পায়। ওব এই ক্ষিদেই প্রমাণ করে ওর স্বাস্থ্য কত সুন্দর। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওর কত নিশ্চিত আস্থা, কোলের কাছে বললে খুব আপনই বলা হয়, খুব আপনই ছিল ওরা। এতদিনে দুজনে যেন যমজের মতো। চোখ তুলতেই করিডরের ছবিটা চোখে পড়ে গেল।

যদি সাজিয়ে বলা যায়, তবে বলতে হবে তোমার কোলের কাছে যারা দুরন্তপনা করেছিল তাদের ভালো না বেসে উপায় নেই। আর এখন সেই কোল জুড়ে অন্য কারো জায়গা না রেখে বিমানই। বিমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে চায় বুঝি। ওদের দুটিকে যেন কোল থেকে নামিয়ে দিতে চায়। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হত মধুবার। বুকেব ভিতরে টান লাগতো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিমান সেখানে হাত রখেছে যেন।

সুমিতা এসে বলল, "হাসছো? টেবল পাতবে না?"

মধুরা স্নানে গেল। আর স্নান সেরে শোবার ঘরে। পোশাক পালটে এখনি তাকে বাইরে আসতে হবে। ঘড়ির কাঁটায় বিমান আসবে লাঞ্চে।

মধুরা শোবার ঘর থেকেই শুনতে পেল মৃদু সুরেলা ঘড়ির একটা মাত্র আওয়াজ। টেবলেব কাছাকাছি এসে গেল সে। সুমিতাও রান্নাঘবের দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল। এখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হবে বিমানের। করিডরের বেসিনটায় হাত ধুয়েই টেবলে বসবে।

ফ্ল্যাটের দরজাটা পর্যন্ত এগিয়ে গেল মধুরা। একটু দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলল। ফিরে এসে টেবলটার পাশে দাঁড়াল, কিছু পরে সে যখন খববের কাগজ নিয়ে এসে তাতে চোখ দিয়ে টেবলেব পাশে বসল, তখন সুমিতাও একবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেরি হচ্ছে? না? ফ্যাকাশে মুখে হাসল মধুরা।

কী আশ্চর্য মিউজিয়াম ঘবটা থেকেই আবার মৃদু সুরেলা ঘড়ির দুটো আওয়াজ হল। চমকে উঠে দাঁড়াল মধুরা। এতো কল্পনাও করা যায় না।

ঠিক তখনই টেলিফোনটা বাজল কোথায়। আর তখনই পাশের ফ্ল্যাট থেকে একজন এসে বলল, ফোনে আপনাকে ডাকছে বটে।

চলতে গিয়ে পায়ে পায়ে লেগে গেল। কাপড়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে।

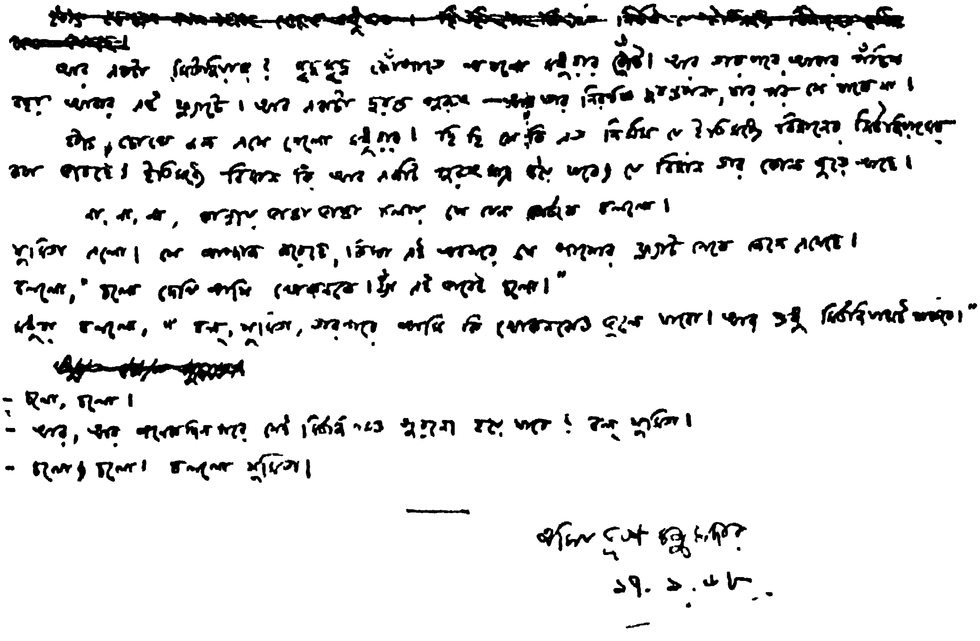
হসপিট্যাল! কী আশ্চর্য, হসপিট্যাল থেকে বলছেন? রোড অ্যাক্সিডেন্ট? ঢোক গিলল মধুরা। চোখে জল এসে যাচ্ছে। রোড অ্যাক্সিডেন্ট নয়? তবে? তবে?

অ্যাসিড বাল্ব, মুখের একটা পাশ, একটা চোখ—

ও ফ্ল্যাটের কেউ একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। তাতে ভেঙে পড়ল মধুরা একবার। রিভিশনিস্ট! আশ্চর্য! বিমান ঝুটো বিপ্লবী। তার বিপ্লবকে প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লব বলতে হবে? পার্টির পত্রিকার অফিসে—অ্যাসিড বাল্ব আর ক্র্যাকারে—একালের খবরের কাগজের ভাষা। একালের বিপ্লব।

মধুরা একটানে নিজেকে চেয়ার থেকে তুলে নিল। ঝড়, নাকি মাটি কাঁপছে, টলছে, ভূকম্প বলবে? ফ্ল্যাটে ফিরে এল মধুরা।

এই দ্বিতীয়বার। আর এটাও দেখো—এই দ্বিতীয়বার। বিমানের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল মধুরা। ছোট



মধুরার ফ্ল্যাট এবং মিউজিয়াম এর পাণ্ডুলিপি

ক্যাবিনেটের উপরে সেই বইটাই, কাল পাশাপাশি বসে তারা যা পড়েছিল। বইটার পাশে কলমদান আর অ্যাশট্রে।

ছটফট করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মধুরা। পর্দাব ওপর দিয়ে সবুজঘবের ছবিটা চোখে পড়ে গেল।

আর বিমানের ছবি। আর তিনজন? তিনজন হবে তারা।

আর একটা মিউজিয়াম? মৃদু মৃদু ফোঁপাতে লাগল মধুবার ঠোঁট আর তার পরে আবার পঁচিশ বছর আবার এই ফ্ল্যাটে। আর একটা দুরন্ত পুরুষ—আর তার নিবর্থক দুরন্তপনা, যারপর সে থাকে না।

হঠাৎ চোখে জল এসে গেল মধুরার। ছি, ছি, সে কি এতো নির্মম যে ইতিমধ্যে বিমানের মিউজিয়ামের কথা ভাবছে? ইতিমধ্যে বিমান কি আরেকটি পুরুষমাত্র হয়ে যাবে, যে বিমান তার কোল জুড়ে আছে?

না, না, না, কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় সে যেন কাউকে বলল। সুমিতা এল। সে আন্দাজ করেছে, কিম্বা এই অবসরে সে পাশের ফ্ল্যাট থেকে জেনে এসেছে। বলল, চল দেখে আসি খোকনকে। হ্যাঁ এইভাবেই চল।

মধুবা বলল, বল সুমিতা, এরপর আমি কি খোকনকেও ভুলে যাব? আর শুধু মিউজিয়ামই থাকবে?

"চলো, চলো।"

"আর, আব অনেকদিন পরে সেই মিউজিয়ামও পুবনো হয়ে যাবে" বল সুমিতা।"

"চলো, চলো।" বলল সুমিতা।

মধুরার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম

স্থান : নাটকের নামে যা বর্ণিত

কাল যে কোন এক বৈকাল ও সন্ধ্যা এবং পরের দিনের সকাল ও দুপুর

পাত্রপাত্রী

মধুরা জনৈক পুলিশ অফিসারের বিধবা। বয়স হয়তো পঁযতাল্লিশ কিন্তু যত্নরক্ষিত বলে চল্লিশের বেশি মনে হয় না। পরনে ফিতেপাড় শাড়ি, কিন্তু হাল্কা রঙের ব্লাউজ। মাথায় বেশ চুল। রিক্তবলয় প্রকোষ্ঠ, কিন্তু গলায় চিকচিকে সোনার হার, কানে মুক্তাফুল।

সুমিতা : মধুরার পরিচারিকা। ঝি নয়, বরং সহচরী। সরকারের খাতায় মধুরার পুত্র বিমানের আয়া। পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল পোশাক। হাতে সোনার মোটা বালা। নাকটা একটু বেশি উঁচু। চুল এলোখোপায় জড়ানো। বয়স পঁয়ত্রিশ।

শোভনা : মধুরার ননদিনী। বয়স সুমিতা ও মধুরার মাঝামাঝি। একেবারে শেষ ফ্যাশনের পোশাক। কানের বড় সবুজ দুলজোড়া, পরনের ছাপা ভয়েল খুব স্পষ্ট। হাতে বড় চেহারার ভ্যানিটিব্যাগ। সুউচ্চ ঢাউস খোপা।

মটুক সিং : মধুরা যে গাড়ি ব্যবহার করে তার ড্রাইভার। অবসর-প্রাপ্তির কাছে বয়স এসেছে এমন কনস্টেবল। মাথায় ছোট ছোট ছাঁটা চুল। গোঁফজোড়া বড় এবং এমন সাদা চুল— কাশের তুলি মনে হয়। জামাটা খাকি শার্ট যা প্যান্টের উপরে ঝুলানো, প্যান্টটা আধময়লা সাদা। পায়ের নিউকাট বুট কেটে তৈরী এমন সন্দেহ হয়।

বিমান : মধুরার ছেলে। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক। বয়স পঁচিশ। য়ুরোপীয় পোশাক। মাথায় অবিন্যস্ত শ্যাম্পু-করা চুল। উনিশ থেকে চব্বিশ দেশান্তরে কাটিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরছে। বিপ্লব-প্রবণ।

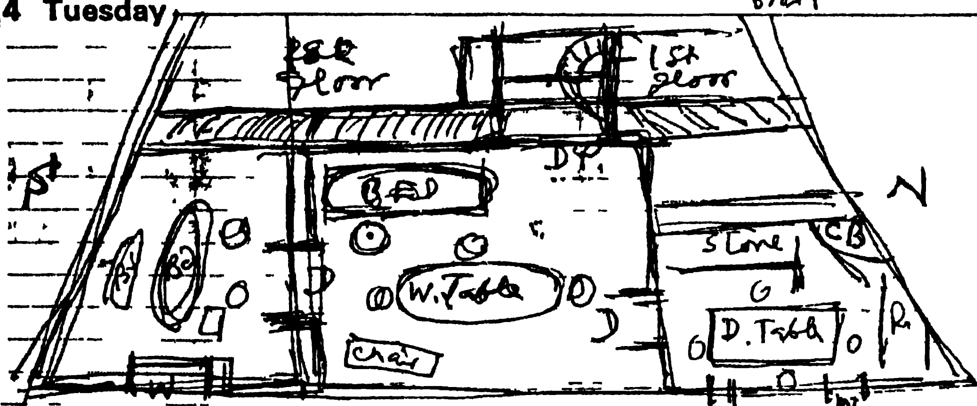
3 Monday

[illegible]

* * *

[illegible]

4 Tuesday



5 Wednesday

সুতরাং [illegible] বা [illegible]।

* * *

[illegible] : বিপ্লবী [illegible] Professional [illegible]।
KGB-র [illegible]।
[illegible]।

মধুবাবর ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম-এর নোট্সের পাণ্ডুলিপি · স্টেজের নকশাসমেত

প্রথম দৃশ্য

দর্শকের বাঁ-দিকে সামনে মধুরার শোবার ঘবের ফ্রেঞ্চ উইনডো– কাঁচেব বড় বড পাল্লা ও আগুন রঙের পর্দায় আধ-ঢাকা। ঘরের ডানদিকে দরজা দিয়ে দর্শকের মুখোমুখি যেন বসবাব ঘর। প্রকৃতপক্ষে যাতায়াতের পথ। কিন্তু বেশ চওড়া বলে বাড়তি ঘরের মর্যাদা পায়। মঞ্চের ডানদিকে পিছিয়ে প্রকৃত বসবার ঘর। মঞ্চের উপরে তার দরজা এবং জানালা। দবজা দিয়ে ভিতবেব অনেকটা চোখে পড়ে। এই ঘরের জানালার বাঁয়ে নেপথ্য অর্থাৎ বাইরে থেকে ফ্ল্যাটে ঢুকবাব আর্চওয়ে। ডান উইংসে রান্নাঘর স্নানেব ঘর প্রভৃতির ছোট দবজাগুলি।

দৃশ্যান্তবের প্রয়োজনে সেটটাকে ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

মধুরার শোবার ঘবের আধ-ঢাকা জানালা দিয়ে তাব পালঙ্ক, এবং একটা বইয়েব র‍্যাকেব খানিকটা চোখে পড়ছে। পথের মধ্যে একটা কালো রঙেব টেবলের সামনে-পিছনে খানকয়েক চেয়ার। বসবার ঘবের জানালা ও ফ্ল্যাটে ঢুকবাব আর্চওয়ের মাঝামাঝি দেয়ালে একটা বড় মাপের ফটো, টুপি ও যুনিফর্মে বোঝা যায উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাবেব। বসবাব ঘবেব ভিতবে টেবলেব একটা কোণ, একখানা চেয়ার এবং দেয়ালে বাসি ফুলেব মালা ঝোলানো একখানা বড ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবিটা একটা স্ট্যান্ডে, যেন কেউ আঁকছিল।

এক বিকাল। তার যেন রঙ আছে, সে রঙ ধূসব কিন্তু বিষণ্ণ নয়।

নীচের রাস্তায় কোথাও একবার ট্রামের গোঙানি শোনা গেল।

সুমিতা রান্নাঘর থেকে প্যাসেজে এসে মধুরাব শোবার ঘবের দবজাব দিকে চাইল। হাতেব ঝাড়ন দিয়ে টেবিলটাকে একটু ঝেড়ে, চেয়াবগুলোকে একটু সিধে করে আবাব বান্নাঘরে চলে গেল।

মধুরার শোবার ঘরের ফ্রেঞ্চ উইনডোব পিছনে মধুরা এবং শোভনাকে দেখা গেল। যেন তারা ঘবেব অন্যত্র থেকে এগিয়ে এল।

শোভনা। [পর্দা সরিয়ে নীচের দিকে চেয়ে] এদিকেও বড় রাস্তা দেখছি। তাহলে দুটি রাস্তার জোড়েব কোণটার উপরে এই ফ্ল্যাট। ইন্‌ট্রেস্টিং! [হাতঘড়ি দেখল]

মধুরা। তোমার তো এই প্রথম এখানে।.. চলো বসি।

শোভনা। [হাসিমুখে কপট আগ্রহে] স্কিউজ মি। [আবার ঘড়ি দেখে] খোকন এখন বেরোবে তার ক্লাবে। তুমি জানো তো?—এবারের সেমিফাইন্যালিস্টদেব দীপ্তেন—হ্যাঁ, সেই, আমাদেব খোকনই। আর তাছাড়া, আধ ঘণ্টার মধ্যে উনি মানে মিস্টার লাহাড়ি অর্থাৎ খোকনদের বাবা ফিরবেন। তুমি কখনও লাহাড়িকে মিট করোনি। দেখতে আমার সেকেণ্ড চয়েস বরং ভালোই। যদিও খোকনের বাবা মধু রাযকে তোমাদের সকলেবই ভালো লেগেছিল।

মধুরা। কতদিন পরে, আর এখানে তো একেবারে প্রথম। চলো একটু চা খাই অন্তত। এসো। [শোবার ঘর থেকে প্যাসেজে এসে মধুরা একটা চেয়ার টেনে দিল]

শোভনা। (বসতে বসতে) বেশ, শুধু চা, আর দেরি যেন না হয়।

মধুরা। না। তুমি বসো। আমি দেখছি। [মধুরা রান্নাঘরে গেল। শোভনা ফ্ল্যাটের দরজার উপরের ফটোটা লক্ষ্য করে সেদিকে উঠে গেল। সে ফটোটাকে ভালো করে দেখছে এমন সময়ে মধুরা ফিরে এল।]

খোকনকে, তাই নয়। আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল না কি, খোকন যখন স্কুলে, কলেজে এবং তারপর বিদেশে? আর তেমনি আলোই, দেখ, এখন। মাথা ধরবে কেন? এই উল আর কাঁটা।

সুমিতা। আসছি।

[সে বোধহয় রান্নাঘরে দই তদারক করতে গেল। মধুরা উল বুনছে। সুমিতা রান্নাঘর থেকে একটা নীচু মোড়া নিয়ে এসে মধুরায় পায়ের কাছে রাখল। মোড়ায় বসে সেও সেলাই তুলে নিল মধুরার ঝুড়ি থেকেই]

সুমিতা। এটাও তোমাকে মানাবে দেখো।

[আধবোনা জামাটার ডিজাইন মেলে ধরল]...কিন্তু ইনি বিশ বছরে একমার খোঁজ নেননি। এখন যখন আমাদের বিমান ফ্ল্যাট বদলাতে চলেছে এলেনই বা কেন? আব অমন কটকট করে না বললে নয়?

মধুরা। [একটু ভেবে] প্রায় বিশ বছর হল, সুমি, আমার সঙ্গে তোমার এই ফ্ল্যাটে থাকা। মাসোয়াবা, ফ্ল্যাটভাড়া আর গাড়িব সঙ্গে তোমাকেও পাঠিয়েছিল ডিপার্টমেন্ট। আঠারো বছবের মেয়ে—কী? না আযা। তারপর আমাকে চিনতে কি তোমাব বাকি আছে? কথায় বলে নিজেব লেডি ডাক্তারেব কাছে কিছু গোপন থাকে না। তোমার কাছেই আমাব কী গোপন আছে? ননদ যে—

সুমিতা। সেই গল্প নাকি? দেওরের মেয়ে আছে? আমাদের বিমানকে মনে ধবেছে?

মধুরা। [সেলাইটাকে কোলে বিছিয়ে নিয়ে] কোন উদ্দেশ্যই না থাকতে পারে। ননদকে কেন ননদ বলে গোলাপ না বলে, তাই বল। তেমন ননদদের অমন কটকট করে কথা বলাব অধিকাব কেন তাই বা কে বলবে? [সেলাইয়ের একটা মোড় ঘুরিয়ে, হেসে] তার চাইতে দইয়ের গল্পও ভালো।

সুমিতা। দই কি ঠাট্টাব জিনিস?

মধুরা। আদৌ না। আমি বরং অনেক সময়ে ভাবি ভালো দুধ, ভালো দই আর এই মাখন-সমেত দুধ বিমানেব স্বাস্থ্যেব পক্ষে ভালো, নতুবা ঠোঁটদুটোতে অমন রঙের আভাস থাকে না। এটা ঠিক একটা সুন্দর গাছে ফুল ফুটে ওঠার মতো। কেমন, ভালো দেখায় না আমাদের বিমানকে? সোজা সতেজ, যার ত্বক ফেটে কুঁড়ি বেরুবে এমন একটা গাছই যেন। আর সে তো আমারই তৈবি। তা ছাড়া...

সুমিতা। কী তা ছাড়া?

মধুরা। আমরা একাই ওকে গড়ে তুলিনি? সব রকমের আত্মীয় বলতেই তো আমি। দিদি, ছোটবোন, কাজন। এমনকি—তখন তোমার হাসি পেয়ে থাকবে আমিও খুব গম্ভীর থাকতে পারিনি, পাঞ্জাবি পায়জামা পরতুম যখন; কিন্তু বিমান খুব খুশী হতো, তার চোখে তা ধরা দিতো। ফ্ল্যাটে একজন পুরুষ চেহারার কেউ আছে তা যেন ভালো লেগেছিল। ভেবে দেখো, বলেছিল, তোমায় যদি বাবা বলি। আর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলুম, তা বলো, এখনই বলো। আর তার কিছুদিন পরে, তখন খোকনের বয়স আট, ন বছর হবে, তাই নয়, একদিন সে বলল, মামণি, এখন থেকে তোমায় যদি পুটু বলি। পুটু হয়তো পাড়ারই কোন ছোট্ট মেয়ে, যাকে খেলার সঙ্গিনী পেলে ওর ভালো লাগতো, কিন্তু কোন কারণে তা পায়নি। সেই থেকেই আমাকে পুটু বলে থাকে, তা হয়তো বিমানের মনে নেই। একা একা থাকলে এমন হয়। আমি একে অস্বাভাবিক মনে করিনে।

সুমিতা। অনেক দিন হল আমারও এই ফ্ল্যাটে। যখন এলুম বিমান তখন পাঁচ বছরের। আর তারও আগে ওকে নিযে তোমার একা পাঁচ বছব কেটেছে ফ্ল্যাটে।

মধুরা। সে সব দিনেব কথা—বিমানের ছ মাসের থেকেই আয়া ছিল। নেপালী আযা রাখা হতো তখন। তারপর ডিপার্টমেন্ট একদিন তোমাকে পাঠাল। আব তারপরে এই বিশ বছরে ডিপার্টমেন্টের অ্যালাউন্স নিলেও তুমি আর আয়া থাকলে না। তা ছাড়া ননদ আর গোলাপ এক নয়।

সুমিতা। কী তা ছাড়া?

মধুরা। ওটা ভুলই।

সুমিতা। কী ভুলই?

মধুরা। ওই জগন্নাথের ছবিতে মালা দেযার ব্যাপাব।

সুমিতা। ভেবেছিলুম হয়তো জগন্নাথের জন্ম-তাবিখ কিম্বা মৃত্যু-তিথি।

মধুরা। তেমন কিছু নয়।

সুমিতা। কিন্তু বাজার থেকে ফুল আনতে বলেছিলে।

মধুরা। তেমন কিছু নয়। সাধাবণভাবে মনে হযে থাকবে। কিম্বা মালা গাঁথাব পব কোন একটা ছবিতে তা দেয়ার কথা মনে হয়েছিল। চেয়ে দেখ, টেবিল-চেযার টানাটানি না করে ও ফটোটায় (দবজায উপরে ফটোটাকে ইঙ্গিত করে) মালা ঝুলানো যায় না। অন্যদিকে দেখ, (বসবার ঘরেব ছবিটাকে ইঙ্গিত কবে) জগন্নাথেব ছবিটা নিচে, প্রায টেবলেব গা ছুঁয়ে। মেঝেতে দাঁড়িয়ে অনাযাসে মালা দেযা যায়। আব এখন টেবল চেযার টানাটানি কবলে পিঠে ব্যথা হয।

[যতি। সুমিতা মধুবাব সেলাইযের দিকে নামানো মুখের দিকে চেযে দেখে আবার সেলাইয়ের মন দিল। কিন্তু মঞ্চে আলো আরও খানিকটা কমে গেল।]

মধুরা। (বিষণ্ন হাসিতে) আব তা ছাড়া জগন্নাথেব ও ছবিটারও বয়স পঁচিশ হয়েছে এ ফ্ল্যাটে। আর এ ফটোটাও তা-ই। বলতে পারো তার আগে দুয়েক বছব এই ফটোব মানুষটা এ ফ্ল্যাটে ছিল, জগন্নাথ যা কোনদিনই থাকতে পাবেনি- তা যাকগে, বিমান ফ্ল্যাট বদলালে এ সবই বদলাবে।

সুমিতা। অবিশ্যি আমার হযতো দোষ হযেছে। (ভেবে) দোষই হয়েছে। সিগারেট কেসটায় ধুলো থাকতে পারে। আগের মতো রোজ দুপুরে নিয়মমতো বসবার ঘরে আমরা বসি কি— আমাদের খোকন বিদেশ থেকে ফেরার পবে?

মধুরা। (ঝুড়িতে সেলাই রেখে) আর শুধু পিঠ নয়, চোখও। (চোখ ডলে হেসে।) বেশ কিছু দিন মানে বিমান আসার পর থেকে, আমাদেব এ সময়ে সেলাই নিয়ে বসা বাদ গিয়েছে। আজ আবার অনেকদিন পরে বসে চোখের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল।

সুমিতা। আলো জ্বালি।

মধুরা। কী হবে? সব ব্যাপারেই এমন হয়। অভ্যাসে আর কিছুদিন চলে যায়, তাই নয়?— জোর ফুরনোর পরেও। (উঠে দাঁড়ালো)

সুমিতা। তুমি তো আজকাল নভেলও পড়ো না। আগে সপ্তাহে দুবার করে গিয়ে নভেল বদলে আনতে হতো। এখন সপ্তাহে একবার করে গিয়েও দেখা যায় বসবার ঘবের টেবিলটাতে বই পড়ে থাকে।

মধুরা। তুই পড়লে পারিস। (হেসে) [শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে দাঁড়াল] খোকন অনেক বই আনে। ওর ঝোলায় অনেক প্যামফ্লেট থাকে। এখন বুঝতে পারি, বলে না বটে,

কিন্তু মোটা ধরনের বইগুলি ও আমার চোখে পড়বে বলেই আনে। নিজের সে সবই অনেক দিন আগে পড়া। যে কোন বই নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যায় তা। আমি না পড়লে বোধ হয় দুঃখিত হয়, তাই নয়।

সুমিতা। নভেলের নেশা টানে না?

মধুরা। তা যাই হোক। এখন তো তোমার খোকনের দইয়ের তদারক করোগে। রাতে ফিরবে এমন কথা নেই যদিও। আবার হঠাৎ আসতেও পারে। আর তখন রাতে দই দিতে পারলে তোমার ভালো লাগবে। অভ্যাসটা তোমারই করানো। (হেসে) রাতে দই।

সুমিতা। দইয়ে দীর্ঘ জীবন হয় সেদিনই পড়ছিলুম।

মধুরা। সে, তখন আচ্ছা (শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে) আর তা ছাড়া... জগন্নাথের নামে এ পাড়াতেই একটা পার্ক আছে না?

সুমিতা। তা আছে! প্রতি বছরে কবে যেন সেখানে সভাও হয়।

[মধুরা আর কিছু না বলে কিংবা কিছু বলা সম্বন্ধে দ্বিধা করে শোবার ঘরে ঢুকল। সুমিতা প্যাসেজে দুয়েক মুহূর্ত একা দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবল। নিজের বাঁ হাত ডান হাতের তেলোয় রেখে যেন পরীক্ষা করল। তখন আলোর অভাব বুঝতে পেরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। শোবার ঘরের গরাদহীন জানালাব কাছে দেখা গেল মধুরাকে। আলো জ্বালল। ব্যাক থেকে একটা বই নিল। বই হাতে এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে ফ্রেঞ্চ জানালার পাল্লা খুলে দিল। তখনই ফিরে এসে সুমিতাও আলো জ্বালল। প্যাসেজের আলোটা ফটোব কাছাকাছি জ্বলে উঠল। ফটোতে কিছুটা পড়ল। বসবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। এমন ভাবে আলোটা যে জগন্নাথেব ছবিটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রত্যূষ বলা যায় এমন সকাল সেই আগের সেটেই। সেটটাকে প্রয়োজন অনুসাবে ডাউনের দিকে সরানো হয়েছে। মধুরার শোবার ঘর মঞ্চের কেন্দ্রের দিকে সরে এসেছে। প্যাসেজে অল্প আলো। পথে ট্রামের শব্দ। কয়েকটি দাঁড়কাক ডাকাডাকি শুরু করল খুব জোরে। যেন খবর কাগজের হকাবের সাড়াও পাওয়া গেল।

মধুবার শোবার ঘরের জানালার পর্দা সরানো। মধুরা হালকা রাগে কোমর পর্যন্ত ঢেকে ঘুমিয়ে আছে। শীতের সকালের আলো তার গায়ে পড়ছে।

নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ। রান্নাঘর থেকে সুমিতা এসে আর্চওয়েব দরজা খুললো।

সুমিতা। আরে! (নেপথ্যে হাল্কা সুরে গুড্ মর্নিং ম্যাম্!)

[বিমান আর্চওয়ে দিয়ে প্রবেশ করে। এক হাতে পোর্টফোলিও, অন্য হাতে স্যুটকেস। পরনে আধুনিক পোশাক, অর্থাৎ পায়া-সরু প্যান্ট, ম্যানিলা শার্ট। চোখে চশমা। স্যুটকেসটা সুমিতার বাড়ানো হাতে দিল। এগিয়ে এল।]

বিমান। মা?

সুমিতা। এখনও ওঠেন নি।

বিমান। বাহ্, আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে গ্যাল্।

সুমিতা। সে তো খুব ভালো, পাওয়াই উচিত। হাত মুখ ধুয়ে নাও, টেবলে দিচ্ছি।

বিমান। (শোবার ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে) ভোর চারটাতে মিটিং সেবে শুনলুম পাঁচটাতেই একটা গাড়ি আছে। তখনই স্নান সেবে নিলুম।

[দরজায় আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে] পুটু, পুটু [সুমিতা দাঁড়িযে কথা শুনে হাসিমুখে রান্নাঘবেব দিকে গেল।]

বিমান। পুটু, পুটু।

[হাতল ঘুরিয়ে ঠেলতে দরজা খুলল। শোবার ঘরে ঢুকল বিমান। তাকে মুক্ত জানালা দিয়ে খাটেব পাশে দেখা গেল। এগিয়ে এসে পর্দা ঠেলে ঠেলে সবিয়ে দিল। এক ঝলক রোদ গিয়ে পডল বিছানায় এবং ঘুমন্ত মধুরায় গায়ে। বিমান হাসি মুখে বিছানার পাশে বসল। মুখ নিচু করে ডাকল।]

বিমান। পুটু, ওঠো।

[একটু যেন নড়ল মধুরা কিন্তু চোখ খুলল না। বিমান নিচু হয়ে দুহাতে মধুরার কাঁধ জডিয়ে ধবে গালে গাল রাখল] ওঠো মামণি, ওঠো।

মধুবা। (চমকে) ও! তুই? (কম্বলটা ঠেলে অর্ধেক উঠে) কখন এলি? (বিমানের গালে হাত বুলিযে দুহাতে বিমানের মুখ নিজের মুখেব উপরে ধরে।) অনেক বেলা হল নাকি? (বিমানকে ছেড়ে দিল) এখনই উঠছি।

বিমান। (কপট গাম্ভীর্যে) বুর্জুয়া, বুর্জুয়া, একেবারে বুর্জুয়া তোমবা। গায়ে বোদ এসে পড়ছে তবু ঘুম। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—আমি যখন বিদেশে তোমাদের ব্রেকফাস্ট বোধহয় দশটায় গিয়ে ঠেকতো। [সিগারেট বার করল]

মধুরা। তার কি উপায় ছিল? সুমিতা ঠিক নটাতেই চা আর রাস্ক হাজির করতো। তোমার মিটিং কেমন হল, তাই বল।

বিমান। [উঠে দাঁড়িয়ে সিগাবেট ধরাল।] একটু টারবুলেন্ট যদি তা বলতে চাও। (হেসে) ভোব চারটেতে শেষ আর পাঁচটায় আমি স্টেশন অভিমুখে। দেখো মম, কী রকম ডিউটিফুল তোমার ছেলে।

মধুরা। (সস্নেহে ছেলেকে দেখতে দেখতে) রাত জেগে শরীর খাবাপ লাগছে না তো? তুই তো বলবি বিপ্লবের ভাষা নয় এমন, কোমলতা ভালো নয় তাদের।

বিমান। [অন্যমনস্কভাবে টিপয়ে রাখা বইখানাকে হাতে নিল। নামটা দেখল কি না দেখল] বিপ্লব! কোন ভাষা যে বিপ্লবের তা বলা কঠিন। ইন্ট্রেস্টিং। শোন, কাল সভাতেই একজন আমাকে সমালোচনা করল আমি নাকি মাঝে মাঝে ব্লাসফেমি কবি। আমি নাকি প্রয়োজনীয় শব্দগুলোকে অপব্যবহাব করি। অনুপযুক্ত পরিস্থিতিতে বলার ফলে তিরস্কারগুলো মোলায়েম ঠাট্টা হয়ে যাচ্ছে। (মুখ টিপে হাসলো) আমার লেখায়—

মধুরা। কী রকম সে?

বিমান। যেমন তোমার ঘুম দেখে বুর্জুয়া বললুম। [হাসতে গিয়ে হাসির চাইতেও খুশী হয়ে বইটাকে দেখতে লাগল।]

মধুরা। এরকম কথাকে ব্লাসফেমি বলেছে?

বিমান। তুমি কি সিয়ারিআসলি নিচ্ছ? তা হলে তো আমর সমালোচকও ব্লাসফেমি করেছে, কারণ সে লবিতে নাকি বলেছে আমার শরীরের উচ্চতা এবং স্বাস্থ্য এবং নাকি ভারতীয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সুগৌর রং এসবই বুর্জুয়া এক্স্ট্রাক্টের চিহ্ন এবং প্রমাণও।

মধুরা। আমার ছেলে, আমার ছেলেই, তার চেহারা নিয়ে অন্যের আলোচনা অহেতুক।

বিমান। [হঠাৎ যেন হাতের বইটা লক্ষ্যে এল।] আব বাস্‌, এ যে দেখছি মার্কস্‌। কোথায় পেলে? না, তুমি, ইম্‌পসিব্‌ল্‌। অর্থাৎ—অর্থাৎ ছোট্ট একটি প্যাভেলের মা না হয়ে ছাড়ছো না। দেখো সৎ-সাহিত্য মানুষকে কেমন সাহায্য করে।

মধুরা। তুই একে সাহিত্য বলবি?

বিমান। (হেসে) বড্ড গোঁড়া, মানে হার্ডলাইনার হচ্ছো কিন্তু মামণি; মার্কসকে আমি সাহিত্য বলিনি। প্যাভেলের মায়েব কথায তোমার প্রিয় গোর্কির কথা বলেছি।

মধুবা। আচ্ছা, খোকা, এই বইখানা, মানে প্রবন্ধগুলো, ডাস্‌ ক্যাপিটালের আগে লেখা, এক কথায এই বলা যায় বোধ হয়, না?—ধর্মযাজকরা উপাসকদের উপরে যে চাপ সৃষ্টি করে, তা এমন যে ধর্মযাজকদেরও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব স্ফুতিব হতে বাধা দেয়। ঠিক তেমনই বুর্জুয়া শ্রেণীর শোষণ প্রবৃত্তি শুধু শ্রমিকের নয়, তাদেবও অর্থাৎ বুর্জুয়াদেরও মানবত্ব ফুটে ওঠার পথে বাধা, তাই নয?

বিমান। (নিভাঁজ মসৃণ গলায় হেসে) কিন্তু, মার্মণি, ব্রেকফাস্টের জন্য হয়তো টেবলক্লথ পাতছে সুমিতা। ফয়ারবাক থেকে শুরু করে বলছো, কিন্তু তুমি ওঠো।

[বিমান নিজেও ভিতরের দিকে দরজা ঠেলে নিজের ঘরে চলে গেল। মধুবা উঠল বিছানা থেকে। আলনা থেকে শাড়ি তোয়ালে নিল টেবল থেকে টুথব্রাশ—স্নানঘরে যাওযার জন্য সে প্যাসেজে এল। রান্নাঘবেব কাছে ডাকল সুমিতাকে। সুমিতা এল।]

সুমিতা। ঘুম ভাঙল?

মধুরা। (মুখেব হাসিতে) খোকন এসেছে।

সুমিতা। হ্যাঁ। তাগাদা লাগিয়েছে ব্রেকফাস্টের (হেসে)।

মধুরা। আচ্ছা! এটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ—এই ব্রেকফাস্টের উপরে টান। আর তা ছাড়া, দেখলে তো? কেমন চওড়া পিঠ আব কাঁধ চোখে পড়ছে। আর কেমন দৃঢ়, কুঁদে বার করা চিবুক। আর যখন দাঁড়াবে একটা সজীব সতেজ গাছের কথাই মনে হয, গাছ যাব ত্বক ফেটে থলো থলো ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

সুমিতা। সুন্দব বটে।

মধুরা। [মাথার উপবে হাত তুলে আডমোড়া ভাঙল।] কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি কর। এখনই আসছি আমি।

[মধুবা রান্নাঘবের পাশের উইংস দিযে বেরিয়ে গেল। সুমিতা রান্নাঘর থেকে টেবিলক্লথ এনে প্যাসেজের টেবলটায় পাতল। তাবপরে ছুরিকাঁটা চামচ প্লেট ইত্যাদি একপ্রস্থ এনে রাখল।

বিমান প্রবেশ কবল শিস দিতে দিতে। দেয়ালের ফটোটায় খানিকটা রোদ চকচক করছে। অবশ্যই সুমিতা যে প্লেটগুলো রেখেছে টেবলে তারই একটা থেকে প্রতিফলিত আলো। বিমান টেবলের ধারে বসল। সুমিতা আর-এক প্রস্থ কাঁটা চামচ ইত্যাদি রেখে গেল। বিমান কাঁটা চামচ চোখের সামনে তুলে তুলে পরীক্ষা করতে শুরু করল। ছুরি তুলে নিয়ে সেটাকে পরখ করে টেবলক্লথে মুছে পালিশ যাচাই করলে। মাঝে মাঝে শিসও দিচ্ছে। নেপথ্যে মোটরের হংক। তারপর ভারি জুতোর শব্দ। অতঃপর আর্চওয়ে দিয়ে মটুক সিং-এর প্রবেশ। হাতে সকালের খবর-কাগজ।]

বিমান। (হেসে) আবে, মটুক সিং যে।

মটুক। হাঁ। সোহি। (খুশী হয়ে) গুট্‌মনিং।

বিমান। তা হলে ওটা তোমারই সেই আদি অকৃত্রিম সাদা শেভ্রলের হর্ন।

মটুক। জি সাব।

বিমান। খুব ভালো। গতবার তোমাকে পুলিশ স্যালুটের বদলে গুড্‌মর্নিং শিখিয়েছিলুম তা মনে আছে দেখছি। তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে মটুক। আচ্ছা, সিংজি, তুমি আর

তোমার শেভ্রলের মধ্যে কে বেশী সম্মানযোগ্য—মানে বেশী পুরনো?

মটুক। পঁচিশ বরস এই শেভ্রলে ড্রাইব্ করলম। উর আগে প্রিজন্‌ভ্যান ড্রাইব করিয়েছি, ওয়ারলেস ভ্যান বি।

বিমান। (হেসে) ইম্‌পসিব্‌ল্ মটুক, তুমি আর তোমার শেভ্রলে আর এই ফ্ল্যাট। আমি এখন সাবালক, কী বলো? গত জ্যানুয়ারি থেকে মা মাসোয়ারা নিচ্ছে না, ফ্ল্যাটটাও বদলাবো আমরা হয়তো এ মাসেই। অবশ্য আমি এখনই গাড়ি কিনছি না বলে হয়তো মা ডিপার্টমেন্টকে গাড়ি ছেড়ে দেয়াব প্রস্তাব করেনি। আরও কিছুদিন হযতো শেভ্রলেটা কাছে লাগবে মার। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছিল আমাকে বলতে পারো? একবাব বলেছিলে বটে দনাদ্দন কী সব। তখন ঠিক ধরতে পারিনি—

মটুক। এ হি রকম সকাল হবে। সাহেব বাহার হোবেন। আমি তো গাডি লিযে হাজির।

বিমান। তোমার এই শেভ্রলে! যাও, বিশ্বাস হয় না।

মটুক। এ হি। সাহেব সিঁড়ি সে নামিযে গাড়িকা পাশ খাড়া হয়ে সিগরেট্ পাকাতে ধরলেন তো জোগ্‌নাথ আসিযে গেল। এ হি সাদা শেভ্রলে।

বিমান। জগন্নাথ?

মটুক। ও হি তো। জিস্‌কা নামসে পার্ক বনলো।

[তার কাছে অদ্ভুত এই ব্যাপারটা মনে হওযায সে হাসল]

বিমান। ইন্‌টরেস্টিং। তা তোমাব সাহেব জগন্নাথকে চিনতেন? তারপব?

মটুক। সাহেব জানিযে লিলেন। সাহেব বোলেন—ওঠো, জোগনাথ, গাড়িমে ওঠো। [হাত দিয়ে গাড়িতে উঠতে বলাব অভিনয় করল।] তা জোগনাথ ঝটাক সে পিস্তল বাহিব করল। [নিজের ডান তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে পিস্তল তৈরি কবে দেখালো।]

বিমান। [কৌতুক বোধ করে খাড়া হযে বসে] আচ্ছা?

মটুক। সাহেব বললেন—উস্‌সে কী হবে গাড়িমে উঠো। বহোৎ দিনসে ঢোড়তা থা, আজ আপ্‌সে আগিয়া। উঠো, উঠো। তো উসকো বাদ দনাদ্দন্ দনাদ্দন্।

বিমান। তারপর?

মটুক। সাহেব গিরিয়ে গেলেন। আমি চুপি সে গাড়িসে নামলোম। দেখি জোগনাথকে হাঁত মে বি গোলি লাগিযেসে লগ্‌ভগ্ দুঠো হোবে। দেখি শালা ভাগতা। তো মাবিযে দিলম পিছেসে হ্যান্ডিলকে বাড়ি। গিরিযে গেল। এ হি শেভ্রলেকে হ্যান্ডিল। [সুমিতা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এল। মটুকেব গল্প কানে গেল। মটুকের দিকে কিছুটা বিরক্ত হয়ে চাইল। রান্নাঘরে ফিরে গেল।]

বিমান। আচ্ছা! তারপর?

মটুক। দোনো ফুটপাতসে পুলিশ আসিয়ে ঘিরিয়ে নিলো।

বিমান। [মটুকের হাত থেকে খবর-কাগজ নিল] তারপর থেকেই তুমি এই ফ্ল্যাটেব হযে গেলে?

মটুক। আরে বাস্, উসকো আগে জোগনাথকে ফাঁসি তো হইতে দেন্। [গলায় হাত দিয়ে ভঙ্গি করল]

বিমান। (হো হো করে হেসে) তারপর থেকে তোমরা শেভ্রলে, তুমি আর এই ফ্ল্যাট। তোমার সাহেব কেমন দেখতে ছিল এতদিন পরে তা কি তোমার মনে আছে?

মটুক। (আর্চওয়ের ফটোর দিকে চেয়ে) ফঁটোমে যেইসা। ওহি তো।

বিমান। (কাগজ খুলে, হাসি মুখে) কিন্তু মটুক, একটা কথা। চাকবিটা এতদিন তুমি কার করলে? কখনও মনে হয় এই ফ্ল্যাটের নম্বর, কখনও ভাবি ওই সাদা শেভ্রলে তোমার মনিব।

মটুক। হে-হে। মনিব তো ডিপাট আছে।

বিমান। ডিপার্টমেন্ট?

[মধুরা স্নানঘর থেকে একেবারে তৈরি হয়ে টেবলের দিকে এগোল। রান্নাঘর থেকে সুমিতা এল, আরও ব্রেকফাস্টের সরঞ্জাম নিয়ে। মধুরাকে দেখে অ্যাটেনশন হয়ে পুলিশী কায়দায় স্যালুট করল মটুক।]

মধুরা। চা খাওগে মটুক।

মটুক। জি সাব।

[মধুরা টেবলের ধারে বসল। সুমিতা টোস্ট র‍্যাক এবং টিপট নামিয়ে রেখে মটুককে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল তাব সঙ্গে যেতে। মটুক তার পিছনে গেল]

সুমিতা। (রান্নাঘরেব দিকে যেতে যেতে মধুরা এবং বিমান থেকে সরে এসে—অর্থাৎ মঞ্চের সম্মুখভাগে) এমন করে বলো কেন? ওব বাবা নয়?

[মটুক তিরস্কারে বিভ্রান্ত হয়ে মাথা চুলকাল। কী করা উচিত বুঝতে না পারার ভঙ্গি করল। সুমিতার পিছনে রান্নাঘরে গেল।]

বিমান। (ছুরির ডগায় মাখন তুলে টোস্টে লাগাতে লাগাতে) টোস্ট সুমিতা একেবারে পারফেক্ট করে থাকে। এমন গরম রাখে যে মাখন দেয়ামাত্র ঘিয়ের চেহারা নেয়।

মধুরা। আর দেখো, জানালা দিয়ে খানিকটা ঝকঝকে মিষ্টি গরম রোদ এসে পড়ল টেবলে।

[খানিকটা বিনা চিনি দুধের চা ঢেলে নিল মধুরা। টোস্টে মাখন মাখিয়ে নিজের ও মধুরার প্লেটে রাখল বিমান। তার হাতের ছুরিটা থেকে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়ছে নড়ছে। সেদিকে তাকাল মধুরা।]

বিমান। আবার এই রক্তের মতো চা, কিছু না খেয়েই!

মধুরা। অভ্যাস, যদি তা বলো। এই গরম খানিকটা ঠোঁটে না লাগলে ব্রেকফাস্টে মন যায় না। (হেসে চায়ের কাপে চুমুক দিল।)

বিমান। (খেতে শুরু করে) কিন্তু তারপরে তুমি আর খেতেও পারো না।

[মধুবা পরিজের পাত্রটা টেনে দিল বিমানের দিকে। দেয়ালের ফটোটার উপরে একটা আলোর বৃত্ত গিয়ে পড়ল। মধুরা সেদিকে চাইল আবার।]

বিমান। (পরিজে চামচ ডুবিয়ে) তোমাব পরিজের দুধটা ভালো। বেশ ভালোই। তুমি কিন্তু খাচ্ছ না মামণি।

[দেয়ালের গা থেকে চোখ নামাল মধুবা। বিমানকে লক্ষ্য করল নিবিষ্ট হয়ে]

মধুরা। ওই দুধটাই যা ভালো পাচ্ছি।

বিমান। এরপরে বুর্জুয়া-মার্কা ভুঁড়ি তৈরি হবে।

মধুরা। [হেসে] আবার ব্লাসফেমি! তোমার মত চেহারায় কখনও ভুঁড়ি হয়? আচ্ছা, খোকন, তুমি গোটি রাখো না কেন? আমার তো মনে হয়, আচ্ছা, তুমি দু সপ্তাহ শেব না করে দেখো দেখি।

বিমান। (হেসে) গোটি?

মধুরা। ভ্লাডিমির ইলিচের গোটি ছিল কিন্তু।

বিমান। ভ্লাডিমির (ঝিরঝির করে হেসে) ইলিচ্! লেনিন! আ, মা, তোমার ছেলেকে, তোমার ছেলে কত বড় বলো তো?

মধুরা। আমার ছেলে কত বড়?

[মধুরা শাণিত হয়ে উঠল যেন কেউ তার হাতের কাজের সমালোচনা করেছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ উপস্থিত না থাকায় সে হাসল। টোস্টে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নিল। দেয়ালের ফটোর গায়ের আলোকবৃত্তকে লক্ষ্য করল। নিজের পরিজ-পাত্রটা সরাল। কিছু হল না। প্লেটটাকে পাত্রটার দিকে টেনে নিল। ছবিটার গায়ে একটা আলোকবৃত্ত নড়ে উঠে পাশে সরল। বিমানও আলোর আকর্ষণে মাথা ঘুরিয়ে ফটোটাকে লক্ষ্য করল।]

মধুরা। অবশ্য, আমার ছেলেকে আমি একাই তৈরি করেছি। একেবারেই একা, সেই এক বছরেব থেকে। অবশ্য গোটি রাখা না-রাখা এমন কিছু নয়। এমনিতেই তোমাকে জমকালো দেখায়। একাই এই ফ্ল্যাটে আর এক শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ ধরে তিল তিল করে তাকে গড়া হয়েছে। [সে হাসল]

বিমান। আ, সুইট্‌হার্ট।

মধুরা। আর ভালোই করেছো তুমি সরকারি চাকরি না নিয়ে। তোমার আকাশ কত নীল।

বিমান। কী যে বলো, কী যে বলো।

মধুরা। আচ্ছা, খোকন, যখন এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী চেপে রাখবে না, যখন মানুষের চিত্ত পরিপূর্ণ বিকশিত হবে—

বিমান। কী তখন?

মধুরা। তখনও কি বিপ্লব হবে?

বিমান। [হাত বাড়িয়ে ডিমসিদ্ধ তুলে নিয়ে খুলতে শুরু করল।] বিপ্লব, মানে, তা, আচ্ছা, মামণি, দেখো ছোটবেলায় আমরা মার্বেল খেলেছি, আরও আগে তুমি বোধ হয় আমাকে প্র্যামে নিয়ে বেরিয়েছো আমাদের পাড়ার এই পার্কটায়। আরও বড় হয়ে ক্রিকেট, কিংবা তা নয় বোধ হয়, ব্যাটবল খেলেছি। এককথায় [হাসলো] জগন্নাথের পার্ক, একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, কী বলো? কিন্তু তোমাব কী মনে হয় বলো তো? বুর্জুয়াদের অসন্তোষকে বিপ্লব বলা যায় না বোধ হয়, তাই নয়? সত্যিকারের বিপ্লবেব পরে তখন আমরা ভেবে দেখবো।

[সুমিতা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে প্যাসেজ দিয়ে বসবার ঘরে কাজ সারতে গেল। তার হাতে পালকের-ঝাঁটা। জগন্নাথের ছবির পাশে দাঁড়াল। টেবলেব যে কোণটা দেখা যাচ্ছে সেটার ধুলো ঝাড়ল। জগন্নাথের ছবির গলা থেকে শুকনো মালাটা খুলে নিল। আলাপ থামিয়ে তা দেখল এরা।

মধুবা টি-পট থেকে নিজের জন্য চা ঢেলে নিয়ে দুধ চিনি মিশাচ্ছে।]

বিমান। ও কি এরই মধ্যে চা ঢেলে নিচ্ছ। (নিজের প্লেটে ডিমসিদ্ধতে মশলা ছড়িয়ে দিয়ে) অবশ্য সেকালের সে সব ব্যাপারকে যদি বিপ্লব বলতেই চাও, তবে একালেব অর্থাৎ সত্যকার বিপ্লবকে অন্য শব্দ দিয়ে বোঝাতে হবে তাতে আমার আপত্তি নেই যদি দুটোকেই একই শব্দ দিয়ে বর্ণনা না করো।

মধুরা। সেকালে ওরা কিন্তু প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে—

বিমান। আ, সুইটি; (হেসে) নিজের নামে একটা পার্ক পাওয়া এমন কিছু নয়, তোমার মতো একটি মিষ্টি মেয়ের মনে স্থান পাওয়াতে ওদের প্রাণ দেয়া সার্থক হয়ে গেছে। কিন্তু বুর্জুয়া বিদ্রোহ, তার জন্য কেউ প্রাণ দিয়ে থাকলেও তাকে বোধ হয় বিপ্লব বলা উচিত নয়, কী বলো?

[সুমিতা জগন্নাথের ছবিটাকে মুছল। পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তাতে আকৃষ্ট হয়ে বিমান ও মধুরাও সেই দিকে চেয়ে রইল। সুমিতা তারপর এটা-ওটা মুছতে মুছতে অন্যদিকে সরে গেল কাজ করতে করতে। মধুরা চায়ে দুধ দিতে মিল্ক-পটটাকে টানল। আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়ল বিমানের মুখে। সে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল। হাসল।]

বিমান। ভারি ঝকঝকে সুন্দর রোদ, নয়? কিন্তু কিছুই খাও না। আচ্ছা, মামণি, এখনও এই পঁচিশ বছর বাদেও তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে কেন? তোমাকে কেন কষ্ট করতে হবে? বরং তোমার মতো একজনকে মিস করল যে—হ্যাঁ, তুমি বলো তো, এই পঁচিশ বছর পরেও সংযম, না শোক?

[বিমান টেবল খুঁজে দেখল। সুমিতাকে ডাকল]

সুমি, সুমি—[টোস্ট র‍্যাকটা এগিয়ে দিল মধুরার দিকে। সুমিতা এল বসবার ঘর থেকে।]

বিমান। দেখো, কিছু নেই যা মাকে দেয়া যায়। কাল থেকে ব্রেকফাস্টে একটি করে আপেল যেন থাকে। [সুমিতা মাথা নেড়ে জানাল থাকবে।]

মধুরা। (সুমিতাকে) এত ধুলো কেন?

বিমান। মিউজিঅমে ঢুকেছিল। (হেসে) কিন্তু, সুমি আমরা তো ফ্ল্যাট বদলাবো। তখন তুমি কী করবে? কী মুছবে আর কোথায় ধুলো ঝাড়বে? এসব ছবি-টবি কি সেখানে যাবে? তোমার সেখানে কাজই থাকবে না দেখছি। [চায়ে চুমুক দিল। সুমিতা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘর সাফ করতে ঢুকল।]

মধুবা। (একটা টোস্ট তুলে নিয়ে) আচ্ছা, খোকন—

বিমান। কিছু বলবে?

মধুবা। (ভয়ে ভয়ে) আচ্ছা, আবার জেলে যাওয়ার মতলব নেই তো?

বিমান। (হেসে) আ, মাদার, সেকালে ওরা, আচ্ছা তোমার কী মনে হয় বলো তো? আমার তো মনে হয়, সেকালে ওরা, জনগণ কিছু একটা করার জন্য উদ্বেল হয়ে উঠলেই জেলে গিয়ে আশ্রয় নিতো। জেলে যাওযাটা বিপ্লবীদের, অন্তত আমাদের পেশা নয়, বরং আন্ডারগ্রাউন্ড যদি প্রয়োজন হয়।

[ওদিকে মৃদু স্পষ্ট শব্দে ঘড়ির আওয়াজ হল। কব্জি উল্টে বিমান হাতঘড়ি দেখল। চায়ে চুমুক দিল। মধুরা টোস্টর‍্যাক সরিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিল।]

মধুরা। নখগুলো কিন্তু তোমার বড় বড় হযেছে, খোকন।

বিমান। [বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের আঙুল রেখে নখগুলোকে লক্ষ্য করে বলল।] আর একটু চা দাও।

[মধুরা টি-পট থেকে চা ঢেলে দিল। বিমান নিজে দুধ চিনি নিল। মটুক সিং রান্নাঘব থেকে বাজারের থলে হাতে প্রবেশ করল।]

বিমান। মটুক, বাজারে যাচ্ছ নাকি? একটু থেমে যাও নিচে। তোমার রথে একটু পৌঁছে দাও আমাকে আমাদের পত্রিকা অফিসে আর বারোটা নাগাদ আমাকে আর একটা লিফট দিও। ফিরে এসে যাতে করে—তখন কি কোর্টে দিয়ে আসতে পারবে?

মটুক। ওহি তো আমার ডিবটি আছে।

বিমান। নেহি তো দনাদ্দন দনাদ্দন (হাত দিয়ে পিস্তলের ভঙ্গি করে হেসে হেসে)

[মটুক আর্চওয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।]

মধুরা। তুমি কি এখনই বেরুবে, খোকন?

বিমান। (চায়ে চুমুক দিয়ে) মটুক, আর সাদা শেভ্রলে, কিম্বা এই ফ্ল্যাট, কে দায়ী জানি না—মনে হয় ওরা যেন, কী যেন সেই, ও, ক্ষুধিতপাষাণ। হ্যাঁ, এখন বেরুবো। আজ নতুন ফ্ল্যাটটাকেও দেখে আসার কথা।

মধুরা। (চায়ে চুমুক দিয়ে) আচ্ছা, খোকন, বুর্জুয়ারা কিন্তু বিপ্লবই বলে থাকে।

বিমান। (সিগারেট বার করল। হাসল।) আ, মামণি, তুমি আজকাল বড্ড ভাবছো। কিন্তু হাতের কাছে তোমার জগন্নাথ আছে তা থেকেই বুঝতে পারবে। মটুক বলে জোগনাথ। জিসকা নামসে পার্ক ভি বনলো। কিন্তু আর কী হয়েছে! বিপ্লব তো একটা আমূল পরিবর্তন। কী বদলেছে, বলো। এই আজাদী মিথ্যা নয় কি? ইংরেজরা চলে গেছে কিন্তু এখন কি আরও বেশি করে ব্যবসার মুনাফা নিচ্ছে না? দেশ শাসন করার ঝক্কি-ঝকমারি

ছিল, এখন তাও নেই। শুধু লাভ। আ, মামণি, কেক কী জাতের তা খেলেই বুঝতে পারবে। [সিগারেট ধরাল। হাসল। এই অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলো বলতে হচ্ছে বলে সে যেন সঙ্কুচিত] আগে তবু আমেরিকানদের সংস্পর্শে আসতে হয়নি, এখন দেখো শুধু ইংরেজ নয়, আমেরিকানরাও; আর আমেরিকা মন পর্যন্ত পৌঁছেছে। মনে ঢুকে পড়েছে বলা যায়। কিন্তু আমি এখন উঠবো। [সে উঠে দাঁড়াল] এ কি বিপ্লবের প্রমাণ?

মধুরা। (ভাবল) কী সুন্দর স্বচ্ছ তোমার দৃষ্টি। আমার তো মনে হয় আমার আরও পড়া দরকার, আরও পড়া আর চিন্তা। (হেসে)

বিমান। [টেবল ঘুরে এসে পাশে দাঁড়ালো] আ, মম।

মধুরা। [তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হল] কিন্তু তুই কি এই পোশাকে বার হবি?

বিমান। এই তো বেশ।

মধুরা। কিন্তু—

বিমান। কী কিন্তু?

মধুরা। অবশ্য এতেও ভালোই দেখায়, খুবই ভালো। কিন্তু লাঞ্চের পরে কিম্বা আজ বিকেলে সেই লাল টাইটা পবো, সেই লালে কালো বিন্দু দেযা টাইটা। [বিমানকে আপাদমস্তক সাগ্রহে লক্ষ্য করল]

বিমান। (হেসে) আচ্ছা, সে তখন .ওদিকে তোমার মটুক অপেক্ষা কবে আছে তার শেভ্রলে নিয়ে।

[বিমান টেবল থেকে আর্চওযেব দিকে এগোল। মধুবা উঠে এগোল তার পিছনে]

বিমান। [দরজার কাছে থেকে হেসে] আর গোটি বাখবাব কথাও ভেবে দেখবো।

মধুরা। (হাসল) কিন্তু দেবি করো না।

বিমান। আ, মামণি। [হাসিমুখে সে নিষ্ক্রান্ত হল।]

[মধুরা আর্চওয়ের কাছে কিছু সময় দাঁড়িয়ে াকে দেখল। টেবিলের কাছে ফিরে এল। খবরের কাগজটা তুলে নিল। চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। কাগজ তুলে ধবল মুখেব সামনে। সুমিতা এল ব্রেকফাস্টের টেবল সাফ করতে।]

পর্দা

তৃতীয় দৃশ্য

সেটটা কিছু বাঁয়ে সরেছে। অর্থাৎ শোবার ঘবটা দেখা না গেলেও চলবে। বসবার ঘরটা জগন্নাথের ছবিসামত প্রাধান্য পাচ্ছে। বেলা বারোটা হবে এখন। সকালের আলো-ছায়া অথবা প্রতিফলিত রোদ নেই এখন।

প্যাসেজে বসবার ঘরের কাছাকাছি টেবিল থেকে বরং দূরে মধুরা একটা চেয়ারে বসে আছে। কাগজ পড়ছে সে। পাশে টিপয়ের উপরে সেলাইঝুড়ি। তার পায়ের কাছে একটু দূরে একটা খালি মোড়া।

খবরের কাগজ উল্টে নিল। রান্নাঘর থেকে দুহাতে দুমাগ চা নিয়ে সুমিতা এল।

মধুরা। আবার চা?

সুমিতা। কী করে যে পারো তুমি! আমার তো এতদিনের এই অভ্যাস কিছুতেই যায় না।

মধুরা। (কাগজ রেখে চা নিয়ে হেসে) অবশ্য, বলি বটে, একদিনও বাদ দিই না নিজেও বারোটার এই চা। অভ্যাসই যে তার কারণ তাতে ভুল কী? অন্তত এটা পনরো বছরের অভ্যাস, এই দু মাগ চা।

সুমিতা। (মোড়াটায় বসে) আর কোন কোন অভ্যাস বিশ বছরের, এমন আছে।

মধুরা। আঠারো বছরের তুমি এই করে প্রায় চল্লিশে চলে এলে। আব এই বসবার ঘরটা যখন তুমি ঝাড়ো তখনও আমার অভ্যাসের কথাই মনে হয়।

সুমিতা। কে যেন ওকে মিউজিয়াম বলেছে, ও হ্যাঁ খোকনই বোধ হয়।

মধুরা। মিউজিয়াম? তা কি করে হবে? তা বলা যায় বোধ হয়। একটা টেবল, খানকয়েক চেয়ার, একটা বুকশেলফ্। টেবলে পেজমার্ক দেয়া একখানা ফরেনসিক মেডসিনের বই। তার পাশে একটা রূপোর সিগারেট কেস। আর দেয়ালে গ্লাসকেসে সে সময়কার অপরাধীদের ছোট ছোট ফটো। সে সময়কার মানে পঁচিশ বছর আগেকাব। [মধুরা ভাবল]

সুমিতা। আজ দেখলুম সিগারেট কেসটা কেমন কালচে হয়েছে। ওটাকে মাজলে হয়।

মধুরা। মাজবি? (মধুরা ভাবল, হাসল) এটাও আমাদের অভ্যাস—এমন করে এই সময়ে বসে ভাবা। ননদের কথায় তোর মনে পড়ে থাকবে সিগারেট কেসটাব কথা। কিন্তু মাজলে কি বদলে যায় না? ভিতরের সিগারেটগুলোকে ফেলে দিয়ে কি নতুন টাটকা সিগারেট এনে রাখা হবে?

সুমিতা। তুমি কিন্তু কখনও মিউজিয়াম বলোনি।

মধুরা। [বসবার ঘরটার দিকে চেয়ে ভাবল, অন্যমনস্কের মতো চায়ের মগে চুমুক দিল।] মিউজিয়ামই বলতে হয় কারো ব্যবহার করা জিনিসগুলো যদি পঁচিশ বছর ধরে একইভাবে সাজানো থাকে। ধুলো পড়েনি, কারণ তুমি রোজ ঝাড়ছো। কিন্তু রুপোর সিগারেট কেসটা কালচে হতে শুরু করেছে। আর পলাতক অপরাধীদের ফটোগুলো হয়েছে হলদে। তা একজন পুলিশ অফিসারের মিউজিয়াম বলা যায়।

আর এই বড় ছবিটাও তার কাছে অপরাধীর ছবিই ছিল। প্রতিপক্ষর ছবি। ছোট ফটো থেকে বড় করে আঁকানো, যাতে, হয়তো, সব সময়ে দেখে দেখে মনের পাতে নির্ভুল করে এঁকে নেয়া যায়, ছদ্মবেশ পরলেও ধরা পড়ে।

সুমিতা। (চায়ের মগ নামিয়ে রেখে) এখন কি সেলাই করবে?

মধুরা। হ্যাঁ, তাই করি। [চায়ের মগ নামিয়ে রেখে সেলাই-ঝুড়িতে হাত দিল। একটা আধবোনা উলের জামা হাতে নিল।] কাল রাতেও খানিকটা বুনেছি। আর ডিজাইনটা দেখ এখন। অলিভ

গ্রীনে এটা ভালো দেখায় না? ভালো দেখাবে না বিমানকে?

সুমিতা। বেশ ভালো।

মধুরা। (সেলাই শুরু করল) আর আলোটা আজ বেশ স্পষ্ট। চশমা না নিয়ে খুব অসুবিধা হয় না।

সুমিতা। (খবরের কাগজটা কুড়িয়ে দিয়ে তাতে চোখ রেখে একটু পরে) সংসাবের খবচ বেড়ে যায়, নইলে—

মধুরা। (সেলাই থেকে চোখ তুলে) কিছু পাল্টানো দরকার? কথাটা কিছুদিন থেকেই ভাবছি? তুমি আন্দাজও করেছ ঠিক। সেদিক থেকে না বললেও চলে। কিন্তু বলে দেয়ার সার্থকতা আছে। নতুবা তোমাকে না-জেনে থাকার ভান করতে হবে। চার মাস হল মাসোয়ারাটা বন্ধ হয়েছে।

সুমিতা। হ্যাঁ, এটা একটা পরিবর্তন। পঁচিশ বছরে মস্ত একটা পবিবর্তন।

মধুরা। তা আমাদের ছেলে চালাচ্ছে ভালোই, কি বলো?

সুমিতা। তুমি হাসবে শুনে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয—ওকে এখন আমাব খোকাবাবু বলা উচিত, বাবু কথাটা বলাই ভালো।

মধুবা। (ভাবলো) তাই কি স্বাভাবিক হয়? অথচ (বোনার ডিজাইনটা ঠিক উঠল কিনা দেখে নিযে) অথচ শুধু (হেসে) ভালো দুধ আব দইয়েব খবব কবতেই দিন কেটে গেল তোমার। সেদিন ওর মুখে একটা কথা শুনে কেবলই মনে হতে লাগল, কোথায় যেন শুনেছি, কোথায় যেন—। ও বললে, দূর কবো। পবে মনে হলো কথাটা তোব। তুই বলে থাকিস। তোর মুখ থেকে নিয়েছে খোকন।

[সুমিতা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল]

মধুবা। (হেসে) অমনি মনে পড়ে গেল তো রান্নার কথা।

সুমিতা। আগে তখন রান্না খারাপ হলে গল্প করে ভুলিয়ে খাইয়ে দেয়া যেতো। এখন রান্না ঠিকঠাক না হলে লজ্জায় মরে যেতে হয।

[সুমিতা রান্নার তদাবক করতে চলে গেল। মধুরা এক মিনিটকাল বুনল। তারপর উঠে বসবার ঘবে গেল বুনতে বুনতে। জগন্নাথের ছবিটাব পাশ দিয়ে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সুমিতা ফিবে এল। সেলাইয়ের ঝাঁপি থেকে নিজের সেলাই বার করে নিল। মধুবা যা বুনছে তা থেকে ভিন্ন রঙের ভিন্ন ডিজাইনেব। মধুরা জগন্নাথের ছবিটাব অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এল।]

মধুরা। (চেয়ারে বসতে বসতে হেসে) রান্না ঠিক আছে তা হলে!

সুমিতা। (হেসে) তুমি মিউজিয়ামটা দেখে এলে?

মধুরা। মিউজিয়াম? ও, হ্যাঁ, তা, বিমান বলছিল না? এটা, একঘেয়ে অভ্যাস বলবি নাকি? কিন্তু যদি রুটিনবাঁধা বলিস, অতীতেও আমাদের রুটিনবাঁধা দিন কখনও কখনও উল্টেপাল্টে যেতো। আর ছোটদের কত রোগই হতে পারে—ইনফ্লুয়েঞ্জা, পেটব্যথা, পা মচকানো, এমনকি মামস। আর তখন বিশেষ খাবার তৈরি, গরম জলের ব্যাগ নিয়ে ছুটোছুটি। এখন বিমান সে সব অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেছে। কিন্তু তা হলেও এই পঁচিশ বছর এই ফ্ল্যাটে সে সবদিন কী উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার কারণই না হয়েছে। আর এই সব রুটিন আর এইসব উৎকণ্ঠা নিয়েই পঁচিশ বছর কেটে গেল এই ফ্ল্যাটে, বিমান গড়ে উঠল। (ভাবল) ভালো হয়নি বিমানের গড়ে ওঠা? (যেন স্বপ্ন দেখছে এমন হেসে) সেদিন সেই লাল টাইটায় ওকে কেমন মানিয়েছিল দেখেছিলি? আচ্ছা, তোর কী মনে হয়? ও যদি গোটি রাখে, আরও সুন্দর হয় না!

সুমিতা। তোমার ননদ অবশ্য এই ফ্ল্যাট সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা করেন। (বুনতে বুনতে।)

মধুরা। (হাসল) স্মৃতিতে কি সত্যি জায়গা বদল হতে পারে? এটা কিন্তু একটু অসাধারণ আমার এই ফ্ল্যাটে স্থির হয়ে থাকা। মনে হতে পারে কেউ যেন একটা অ্যানুইটি রেখে গিয়েছিল আর তার শর্ত এই ফ্ল্যাটে বাস করা আর পুরনো সাদা শেভ্রলেটাকে ব্যবহার করা। প্রকৃতপক্ষে তা অবশ্যই নয়। শেভ্রলেটা পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অমার্কামারা গাড়িগুলোর একটি। একদিন দেখি গাড়ি। জানা গেল এটাও একটা ব্যবস্থা। উপরে কোথাও সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারেও হয়তো ফ্ল্যাটের মালিককে বলে দেয়া হয়েছিল, ডিস্টার্ব কোরো না। যার মৃত্যুর ফলে এমন সব বন্দোবস্ত—ঠিক যেন একজন মা ও তার শিশুর পক্ষে যথেষ্ট একটা নিশ্চিত মাসোয়ারা রেখে যাওয়ার মতো, কিন্তু তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। বিমানের উপাধিই অন্য কারো প্রমাণ। তাকে কি ভোলা গেছে?—মর্যাদা বোধ হয় কথাটা—(একটু ভেবে) কাল থেকে ব্রেকফাস্ট টেবলে নিরামিষ কিছু রেখো, বাপু।

সুমিতা। খোকন আপেলের কথা বলেছিল। আপেল আনিয়েছি।

মধুরা। এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়ার পরে যা থাকবে তা শুধু বিমানের উপাধি-ই। কথাটাও দেখো—এখন এই পঁচিশ বছর বাদে নিরামিষ খাওয়ার কী সার্থকতা? কিছু একটা রেসপেকটিবিলিটি আছে, তাই নয়?—এই নিরামিষে। মর্যাদা—যদি তা বলো।

[সুমিতা সেলাই রাখল। সামনে হাত লম্বা করে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল]

মধুরা। কাজের কথা মনে পড়ল? (হেসে)

সুমিতা। এখন ব্রেকফাস্টের বাসনগুলো ধোব, মুছবো, শুকিয়ে তুলে রাখবো শেলফে। এই বিশ বছরে, আমি আসার পরে এই ফ্ল্যাটে একটা জিনিসই বদলেছে—বাসন ধোবার বেসিনটা। আগে ছিল না, রান্নাঘরের নালিটাকে ব্যবহার করা হতো। চিনেমাটির বেসিনটা আর তার গায়ে জলে ট্যাপ বসানো হল; অবশ্য তার জন্য ভাড়াও বাড়ল দশ টাকা। এমন হতে পারে, ভাড়া বাড়ানোর ছুতো সেটা। মনে করে দেখো।

মধুরা। (হেসে) ফ্ল্যাটে মালিক কি করে টের পেয়েছিল সেই বছরের মাসোয়ারার টাকাও বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা আর তা বিমানের হাইয়ার এডুকেশনের জন্য।

[ভেবে] অবশ্য মনস্তত্ত্বে এমন একটা কথা আছে। যাতে অনিচ্ছা তাতেই ভুল হয়ে যায়।

সুমিতা। কিসে তোমার ভুল হল?

মধুরা। যদিও পিঠের ব্যাথার কথাও মিথ্যা নয়। চেয়ে দেখ, প্যাসেঞ্জের ফটোটার তুলনায় জগন্নাথের ছবিটা কত নিচে। মালা দেয়ার পক্ষে সুবিধে নয়? অবশ্য ননদ বলতে পারে· তোমার পিঠে ব্যথা, চেয়ার টেবলই বা টানাটানি করতে হবে কেন তোমায়, সুমিতাকে ডাকলে হতো। সেই মালাটা ঠিক ছবিতে দিতে পারতো।

সুমিতা। হঠাৎ কেন মালার কথা মনে হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছি না। হয়তো বাজারে গিয়ে ফুলের দোকানে দেখে তোমার মনে পড়ে থাকবে ছবিতে মালা দেয়ার কথা।

মধুরা। (ঝুড়ি থেকে সেলাই নিয়ে) আর ওটাও মনস্তত্ত্বের কথা। এরকম গল্প আছে। অনেক সময়ে মা ছেলের বিয়ে দিতে চায় না।

সুমিতা। কেন?

মধুরা। মনস্তত্ত্বের বইয়েতেই তা সম্ভব।

সুমিতা। তোমার ননদ বলছিলেন?

মধুরা। আসলে পৃথিবী আর মেয়েমানুষে গুলিয়ে ফেলে মনস্তাত্ত্বিকেরা, কোন কোন ব্যাপারে

দুইয়ে মিল আছে বলে। তোকে একদিন ইডিপাসের গল্পটা বলবো। আসলে তা নতুন ফসল বোনার ব্যাপার থেকে শুরু, এখন অন্য গল্পে দাঁড়িয়েছে।

সুমিতা। নতুন লোকে ভুল বুঝতে পারে। তোমার ননদও তাই বুঝে থাকবেন। অবশ্য মিউজিয়ামে যে ভাবে ছবিটা আছে তাতে কারো মনে হতে পারে ও ঘরখানিতে, এই ফ্ল্যাটে যার স্মৃতি ছড়ানো সে ওই ছবির লোকটি-ই। আর প্যাসেজেব দেয়ালের ফটোটা—ঠিক উল্টো, তাই নয়?

মধুরা। অথচ ফ্ল্যাটের মালিক পুলিস অফিসাবেব চোখে জগন্নাথ অপবাধীদেব একজনই ছিল। আর তার ছবি ওখানে রাখবার কারণ বারবার দেখে এমন চিনে রাখা যে ছদ্মবেশেও চিনতে পারা যায়। পুলিশ অফিসারের সেটা মানসিক ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য যে প্রতিপক্ষকে নিজের বসবার ঘরের চোখের সামনে রাখতে চাইতো। শিকারকে থাবাব মধ্যে রাখা যেন। অথচ এখন মনে হয় ও ঘবটা জগন্নাথেরও।

সুমিতা। নতুন লোকের কাছে। বরং বিপবীত প্রমাণই বেশী। সেই পঁচিশ বছরেব পুবনো হারের ভাড়ায় এই ফ্ল্যাটে থাকা, পুরানো মডেলেব শেভ্রলে—

মধুরা। এমনকি এই সেদিনও মাসোয়ারার খাতায় সই দিয়েছি। মিসেস অমুক বলেই আমার পরিচয়। স্মৃতিতে ছবি দুটোর জায়গা বদল উচিত নয়। অন্তত উচিত নয়। [মধুরা যেন ব্যস্ত হয়ে আবার সেলাইটা তুলে নিল।] আর, কথাটা নাটকীয়, খুবই নাটকীয় শোনাবে, মিউজিয়ামের ওই ছবিটা প্রকৃতপক্ষে বিমানেব পিতৃহন্তার। (মধুরা একটু তাড়াতাড়ি উল বুনতে লাগল) কেঁদেছিলুম, খুবই কেঁদেছিলুম। এক বছরের খোকনকে, তখন কেউ জানতো না ওর নাম বিমান হবে, বুকে জড়িয়ে ধবে কেঁদে উঠেছিলুম। আচ্ছা, বল, সুমি, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জগন্নাথও আমার জীবনেব গল্পে একটা চরিত্র নয়? একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পুরুষদুটিকে একই ঘটনার দুইপক্ষ হিসাবে সমান দেখায় না? যেন এই ফ্ল্যাটটাকে দখল করবার জন্য দুইটি পুরুষের দ্বন্দ্ব। এখানে মাটি খুবলে গেল, ওখানে কাঁচ ভাঙল। তারপর যেন বিজয়ী আর বিজেতা দুজনেই সবে গেছে। (চোখের সামনে উলের ডিজাইনটা তুলে ধরল।) আর তা ছাড়া (মুখের সামনে থেকে সেলাই নামাল) তা ছাড়া (হাসল) পৃথিবীর অবশ্য ননদ নেই।

সুমিতা। বিজয়ী আর বিজেতা ইতিহাসে সমান বলছো?

মধুরা। তাই নয়? হয়তো উচিত নয়। উচিত নয়। কিন্তু কী সুন্দরই দেখাবে বিমানকে এ জ্যাকেটে। হ্যাঁ, ওর বাবার চাইতেও মাথায় ইঞ্চি কয়েক উঁচুই হবে। আর গায়ের রঙও—(মধুরা হাত উল্টে নিজের হাতের পিঠের রংটাকে লক্ষ করল) খুবই ভালো দেখাবে বিমানকে দেখিস, এই জ্যাকেট, লাল টাই, আব গোটিতে, যদি গোটি রাখে। তা ছাড়া—

[নেপথ্যে হঠাৎ ট্রামের শব্দ শোন গেল।]

সুমিতা। এমন শব্দ হয়, মাঝে মাঝে।

মধুরা। বাহ্! ভাড়ার হারটা সেকেলে কিন্তু শহরের মাঝখানে নয় এই ফ্ল্যাট? বরং দুটো বড় রাস্তা যেখানে মিশেছে সেই কোণে।

তা ছাড়া আজকের রোদটার মতো কিম্বা তা নয়, বিমানের কথাই বলছি, বিমানেব একটা পুতুল ছিল মনে করে দেখ, পুতুলটা তার বাড়ির তুলনায় লম্বা ছিল। দাঁড় করাতে হলে বাড়ির ছাদ রাখা যেতো না। এখন এই ফ্ল্যাটে আমাদের রুটিনবাঁধা পুরানো অভ্যাসগুলোব মধ্যে থেকেই বিমান উঠে দাঁড়িয়েছে যেন তার মাথা ছাদ ফুটো করে উঠেছে—এমন মনে হয় না?

সুমিতা। আজই তো খোকন নতুন ফ্ল্যাট দেখে আসবে। আর (হাসল)

মধুরা। কী?

সুমিতা। এখন থেকে আমি খোকাবাবু বলবো। এখন বড় হয়নি? অনেক বড় হয়েছে।

মধুরা। [হেসে] তাই তো হয়। এখনই, মানে এই পুবনো ফ্ল্যাটে, সেই তো কর্তা, সেই তো পুরুষ।

সুমিতা। এটাই আর কিছু মিথ্যা খুঁজে পাবে না—অবাক লাগে না, সেই কোলের ছেলে—এখন তারই সমস্যা, সেই কর্তা।

মধুরা। (হেসে) এ জন্যই পৃথিবীর সঙ্গে মেয়েমানুষের মিল আছে বলে। প্রতি বছরে নতুন ফসল নয় শুধু, একই অযোধ্যায় পরের পর বিভিন্ন পুরুষের রাজা হওয়াও। আর এই ফ্ল্যাটও বদলাবে সে। আর সেই নতুন ফ্ল্যাটটা হবে বিমানের।

সুমিতা। এখানকার অনেক জিনিস রেখে যেতে হবে পিছনে। আর সেখানে এমন একটা ঘর পাওয়া যাবে না যাকে মিউজিয়াম বলা যাবে। তখন কিন্তু তোমার ননদেরও কিছু বলার থাকবে না। কারণ ছবিদুটোকে সে ফ্ল্যাটে টাঙানোর জায়গা পাওয়া যাবে কি? হয়তো তোমার শোবার ঘরে রাখতে পারো, কিন্তু সে তো আঁচলে ঢেকে রাখার মতো।

মধুরা। (নিঃশব্দ টানা নিঃশ্বাস পডল) একেবারে ভুলে যাওয়ার মতো ব্যাপার হবে, তাই না? এসবগুলি পড়ে থাকবে আর তারপর হযতো ফ্ল্যাটের মালিক অন্য আবর্জনার সামিল করে ফেলে দেবে। আশ্চর্য, তাই ফেলে দিতে হয়? আশ্চর্য! [ভাবল মধুরা সম্মুখেব দিকে চেয়ে। কোথায় একটা ঘড়ি বাজল। মধুরা চমকে উঠল।]

মধুরা। একটা!

সুমিতা। (উঠে দাঁড়াল) ছি, ছি, দেরি হয়ে গেল।

মধুরা। রান্না বাকি আছে? কী ক্ষিদে যে ওর পায়! আর এই ক্ষিদেই প্রমাণ করে ওব স্বাস্থ্য কত সুন্দর, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওর কত নিশ্চিত আস্থা।

সুমিতা। [রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে] সব ঠিক থাকারই কথা। মাংসটা এতক্ষণে হয়ে গেছে। তা হলেও দেখি। তুমি কি ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িযে দেখবে দেখা যায় কি না? (রান্নাঘরে গেল)

[মধুরা উঠে দাঁড়াল, আর্চওয়েয়র দিকে যেতে যেতে যেন থমকে দাঁড়াল মঞ্চের মাঝখানে। আবার ট্রামের শব্দ শোনা গেল। রান্নাঘরের দরজায় সুমিতা মুখ বাড়াল—হাসি মুখ]

সুমিতা। সব তৈরি।

মধুরা। টেবল পাতবে?

সুমিতা। আসছি।

[সুমিতা রান্নাঘবে ঢুকল, পরমুহূর্তে টেবল-ঢাকা চাদর নিযে এল। মধুরা টেবিলের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। টেবলে চাদর বিছাল সুমিতা। মধুরা তার এক কোণ ধরে সাহায্য করল।]

সুমিতা। নতুন ফ্ল্যাটে আমার কিন্তু কাজ কমে যাবে।

মধুরা। কেন?

সুমিতা। বসবার ঘরের, যাকে মিউজিয়াম বলা যায়, তার কাজ থাকবে না। ছবি দুটোকে নেয়া হলেও বা কোথায় রাখা যাবে সেখানে?

মধুরা। খোকনের কি দেরি হচ্ছে আসতে? ছবি নিয়েই বা কী হবে?

সুমিতা। এখনই এসে যাবে মনে হয়।

[সুমিতা টেবলক্লথ পাতা শেষ করে রান্নাঘরে চলে গেল, জলের জাগ, গ্লাস নিয়ে এসে রাখল। এখন

খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে সে। মধুরা তার কাজ লক্ষ্য করছে আর ভাবছে। তার মানসিক চঞ্চলতা শুধু তার টেবলের উপরে রাখা হাতের আঙুলে ধরা পড়ছে।]

সুমিতা। (প্লেট কাঁটা চামচ ইত্যাদি নিয়ে প্রবেশ করে টেবলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে) যারা জানে না তাদের কাছে হঠাৎ মনে হবে—(হাসল)

মধুরা। কী?

সুমিতা। খোকন, আচ্ছা খোকন নিজেও তো বিশ্বাস করে বিপ্লবে।

মধুরা। তোকে বলি শোন, খোকন বলে, আর সত্যি হয়তো তাই, ও বিপ্লবটাতে মানে জগন্নাথদের বিপ্লবে কিছু ভুল ছিল হয়তো। হয়তো তীব্র আগ্রহ ছিল। হ্যাঁ। প্রাণকে পণ করেছিল কেউ কেউ। কিন্তু—

সুমিতা। তোমার জন্য টেবলে লাঞ্চেও ফল রাখবো। যে ছেলে, নিরামিষ খাওয়া নিয়ে আবাব হাঙ্গামা শুরু করবে। (হেসে) কিন্তু কী বলছিলে?

মধুরা। ভোকাবুলারি বলে একটা কথা আছে। হ্যাঁ তাই। (হেসে কাঁটা চামচগুলোকে গুছিয়ে দিল) ঠিক শব্দতালিকা নয়। মানে খোকনই আমাদের জীবনের পুরুষ এখন। আব মেয়েদের পুরুষের ভোকাবুলাবি শিখতেই হয়। ঠিক যেন সত্যি তাই, তোকে তো গ্যাল বলে।

সুমিতা। ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল এনে দেবো? ভাল হয় না? কী শিখতে হয় বলছিলে? [দাঁড়াল কথা বলতে]

মধুরা। বিমানদের হিসাবে সেটা আসলে কিছু নয়। বুর্জুয়া বিপ্লব বলেছে বিমান। একটা ভুল পথে গিয়ে কিছু লোকেব প্রাণ দেয়া। কিন্তু ওর কি দেরি হচ্ছে?

সুমিতা। [একটু অবাক হল। তাব কাজেব হাত থেমে গেল।] তাই? মানে জগন্নাথেব ব্যাপারও?

[সে তাড়াতাড়ি রান্নঘরেব দিকে যাবে এমন সময়ে মোটরেব হর্ন। হেসে ইসাবা কবল -এসে গেল বিমান]

সুমিতা। কী ছেলে যে। এখনই এই প্যাসেজের বেসিনে হাত ধুয়েই বলবে—দেরি কবছো কেন, খেতে দাও। তা খোকনেব ভোকাবুলারি আমাদেব শিখে নেয়া ভালো। [হাসল] ভোকাবুলারি নয় কথাটা? আর যদি বলো আমি বাবুই বলবো ববং। [বসবার ঘবে টেলিফোন বাজল] দেখো হযতো ফোনে জানতে চাইছে টেবল পেতেছি কিনা।

মধুবা। (নেপথ্যে) হস্পিট্যাল? কী আশ্চর্য! হস্পিট্যাল থেকে বলছেন? কেন? রোড অ্যাক্সিডেন্ট? না, বুঝতে পারছি না। না, কিছুই বুঝতে পারছি না। [মধুরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। ট্রামের শব্দ।]

সুমিতা। কী হল, কী হল? [মধুরা টলতে টলতে চেয়ার ধবে দাড়াল। মটুক সিং প্রবেশ কবল।]

মধুরা। [উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে] মটুক, মটুক

মটুক। চলিয়ে সাব।

সুমিতা। কী হল, মটুক, কী হল?

মটুক। অ্যাসিড বাল্ব, মুখের এক পাশ, দক্ষিণ চোখ—[হাত দিয়ে দেখিয়ে]

সুমিতা। কী বলছো?

মটুক। হামি তো গাড়ি নিয়ে গেলাম। তো ভারি ঝাগড়া বাধিয়ে গেল। হঁ, পত্রিকা অফিসমে। ওহি তো উনকো পার্টিকো পত্রিকা অফিসমে।

সুমিতা। আ, মটুক!

মটুক। রিভ্সনিস্ট, রিভ্সনিস্ট, হল্লাগুল্লা, ইনকিলাব, উসকো বাদ দনাদ্দন, দনাদ্দন। ক্র্যাকার মারিয়ে দিল।

মধুরা। রিভিশানিস্ট! আশ্চর্য! বিমান তাই? আশ্চর্য! মানে, আশ্চর্য! তার বিপ্লবও ঝুটো? পার্টির পত্রিকা অফিসেই অ্যাসিড্ বাল্ব আর ক্রাক্যার। একালের খবরকাগজের ভাষা, একালের উপাদান। সুমি, সুমি, আমি কাঁদতে পারছি না কেন?

সুমিতা। শান্ত হও, দাঁড়াও, রসো, আমাদের খোকন যে!

মধুরা। ঝড় নাকি? মাটি কাঁপছে, দেখো। এই দ্বিতীয়বার, আব এটাও দেখো, এই দ্বিতীয়বার।

[তার ঠোঁট ফোঁপাচ্ছে কিন্তু কান্না আসছে না। সুমিতার দুচোখ থেকে অজস্র জল গড়াচ্ছে।]

সুমিতা। চলো দেখে আসি খোকনকে।

মধুরা। (ফোঁপাতে ফোঁপাতে) আর একবার আর একটা মিউজিয়াম নাকি? তাবপরে আবার পঁচিশ বছর এই ফ্ল্যাটে।

সুমিতা। চলো দেখে আসি।

মধুবা। আর একটা দুরন্ত পুরুষ, আর তার নিরর্থক দুবন্তপনা। তাবপর সে থাকে না, থাকে না। (হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে) ছি-ছি, কী ভাবছি আমি! ছি-ছি, এর মধ্যে বিমানের মিউজিয়ামের কথা কেন মনে আসে? বিমান কেন আব একটা পুরুষ মাত্র হবে? যে বিমান আমাব কোলজুড়ে...বিমান, বিমান...

সুমিতা। চলো দেখে আসি খোকনকে, এইভাবেই চলো।

মধুরা। চল, সুমিতা। তারপব আমি কি খোকনকেও ভুলে যাবো? [দুহাতে আঁচল তুলে মুখ ঢাকল। কান্নার শব্দ।] বল তুই, বল।

সুমিতা। চলো, চলো।

মটুক। চলিযে সাব। [মটুক আর্চওয়ের দিকে যাওয়ার ভঙ্গি কবল।]

যবনিকা

প্রবন্ধ

উপন্যাস সম্বন্ধে

এবকম এক কৌতুকেব ব্যাপাব ঘটেছিল যে কতিপয শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তাঁদেব ছাত্রেবা উপন্যাস সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ থেকে যা যা প্রামাণিত হয তাব মধ্যে এই একটি যে এখনও কোথাও এই ধাবণা টিকে থাকতে পেবেছে যে এ ব্যাপাবে অগাস্টান যুগে পৌছতে পাবিনি। তাঁবা আর্টেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে টলস্টযেব বক্তব্য জানতেন, গ্রিক কাব্যাদর্শে তাঁদেব সহজ অধিকাব ছিল এবং অন্তত একজন হ্যামলেট-তৃতীয অঙ্ক, দ্বিতীয দৃশ্য থেকে প্রকৃতিব সম্মুখে আযনা তুলে ধবাব কথা বলেছিলেন। তাঁদেব নিবস্ত কবা খুব সহজ ছিল না। কেন না, এই বক্তব্যগুলো উপবিতলে পবস্পবকে সমর্থন কবে না, এবং তা কবে না বলে যেহেতু উদ্দেশ্য বা গন্তব্য জানা নেই, গডে তোলাব বা পথেব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত নিবর্থক।

জীবন সম্বন্ধে ধাবণা স্বচ্ছ হলে সমস্যাগুলো যেমন হয, উবে যায অথবা সহজ হযে থাকে, উপন্যাস অথবা সাধাবণভাবে আর্ট সম্বন্ধেও তা ঘটে। ভাবী বিপদেব কথা, উদ্দেশ্য কী হবে সে নিযে একমত হওযা দূবে থাক, বিষযটা কী সে সম্বন্ধেও সকলেব মত এক নয। এটা যে শুধু শব্দেব আলগা ব্যবহাব তা বলা যায না। নতুবা যে বিদগ্ধজন জানেন যে মেডিক্যাল বিপ্রেজেন্টেটিভেব বিজ্ঞাপন এবং শেকসপিযাবকে এক জিহ্বায লিটবেচব বলা হলেও আসলে তা নয, তিনি অন্তত কাকে উপন্যাস বলা হবে কাকে তা বলা হবে না সে বিষযে বেশ একটা পবিচ্ছন্ন ধাবণা দিতেন। কিন্তু একবকমেব আধুনিক ঔদার্য থেকেই যেন যাব সংবেদন[১] নেই তাকেও যেমন কাব্য বলা হয, নবনাবীব নামযুক্ত ঘটনাবলীকেই উপন্যাস বলা হযে থাকে।

মনে পডছে কে একজন উপন্যাসকে পোর্টম্যান্টোব সঙ্গে তুলনা কবেছেন, অর্থাৎ এতে, পোর্টম্যান্টোতে যেমন, তোমাব সব কিছু বাখতে পাবে। –ধোযা জামা কাপড, শুহর্ন, টুথপেস্ট এবং কন্ট্রাসেপটিব, ব্যবহাব কবা মোজা এবং ছাডা আন্ডাবউয্যাব, মাযেব চিঠি এবং শেকসপিযাব, এমন কি ইকোনোম্যানিযাব[২] তাবিজকবচ। বলা বাহুল্য এ ঔদার্য যতটা নাগব[৩] ততটা বিচক্ষণ নাও হতে পাবে। কাবণ যদি পোর্টম্যান্টোই হত উপন্যাস তবে প্রতিদিনকাব সংবাদপত্র কেন পৃথক উপন্যাস হবে না? একজনেব লেখা নয বলে? প্রকৃতপক্ষে স্বীকাব কবতে না চাইলেও আমবা অনেক সমযেই অনুভব কবে থাকি এ উদাবতাব একটা সীমা থাকলে ভাল ছিল। সংবেদন না থাকলে শব্দগুলিকে যেভাবেই সাজানো হোক তা যেমন কাব্য হয না, পেস্টবোর্ডে কাগজেব টুকবো, ভাঙা স্প্রিং এবং/অথবা কুডিযে পেবেক নানা কৌশলে লাগালে সংবেদন সত্ত্বেও তা ছবি হয না, যেমন নানা ভাবনা চিন্তাব পোর্টম্যান্টো হলেই উপন্যাস বলা যায না। তাঁবা যদি প্যানডোবাব বাক্সও বলতেন।

অনুমান কবি আমবা যদি সব কিছুকেই উপন্যাস বলতে না চাই তবে কাকে তা বলা হবে সে বিষযে মনকে স্থিব কবে নেযা মন্দ হয না। এখানে প্রশ্ন ওঠে, আপাতত যাকে আমবা উপন্যাস

---

১ সংবেদন = Communication

২ মানুষ এবং তাব জীবনকে শিল্পোৎপাদনেব পদ্ধতি প্রক্রিয়াব মাপে বোঝা যায় এবকম মত অভ্রান্ত মনে কবাকে ইকোনোম্যানিযা বলা যায় কিনা পাঠক ভেবে দেখবেন

৩ নগব = Sophisticated Urbane

বলব, চিরকালই তাকে তা বলা যাবে কিনা, সমাজের চেহারার বদলের সঙ্গে তারও বদল হবে কি না। উত্তরে এই বলা যায় স্ত্রীলোকেরা তাঁদের পোশাক দেশে কালে বদলে থাকেন কিন্তু পুরুষ স্ত্রীলোকের পোশাক পরলে হিজড়ে হয়, আর মহিলারা যদি এককালে ডানা মেলে উড়তে থাকেন তবে তাঁদের পরী বলা হবে, স্ত্রীলোক নয়। এরকম সময় এসেছে যেন যে উপন্যাস কাকে বলা হবে তা বেশ নির্দিষ্ট করেই বলে দিতে হবে। তা করা হলে উপন্যাসের ক্ষতি হবে এ মনে করার কারণ নেই, কেন না নদীর দুপাড় থাকায় নদী মজে যায় না। অন্যদিকে লাভ এই, সমস্যাগুলোকে বুঝতে সহজ হয়, কারণ যার আকার নেই তার সমস্যাও নিরাকাব।

বোধহয় এরকম মেনে নেয়া সঙ্গত হবে উপন্যাস একটা কলা এবং সেহেতু তার সংবেদন থাকবে। নাটক ও মহাকাব্যের জ্ঞাতি হওয়ার ফলে চরিত্র ও ঘটনাবলীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সে একটি জটিল সংবেদন উপস্থাপিত করে থাকে। জীবিত অন্যান্য বিষয়ের মতো সে জ্ঞাতিত্ব সৌভ্রাতৃত্ব মানলেও বৈশিষ্ট্যকেও স্থাপিত করেছে। তার ভাষা আমাদের প্রত্যহের ভাষার অনুকৃতি, তার বর্ণনার অধিকাংশই প্রত্যহের দেখা বাস্তব। ধারণা করি, এমন একটি সংজ্ঞা, দার্শনিক দুরূহতা থেকে দূরে থেকেও উপন্যাস এবং তাব উদ্দেশ্য যেন কিছুটা প্রতীয়মান করে।

এবকম একটি স্বীকাবকে সম্মুখে বাখা মাত্র উপন্যাস যে কলা হিসাবে, নাটক ও মহাকাব্যের জ্ঞাতি হিসাবে এবং বিশেষত তার স্বকীয় ধরনধারণ নিয়ে সমস্যায় পড়েছে, তা অস্বীকাব করা যায় না; উপরন্তু তার ধরনধারনের জন্য যে সমস্যা তাকেই তার বিশেষ সমস্যা বলা উচিত হবে।

জন্ম থেকেই এই দায় আছে উপন্যাসের যে তাকে বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়। রূপকথা, গল্প, মহাকাব্য, নাটক প্রভৃতির এমন দায় নেই। তাবা খুশিমতো বাস্তবের কথা বলে বটে, না বললেও তাদেব বেশ চলে। কে যেন বলেছিলেন, গল্পের গরু আছে উঠতে পাবে। তা হয়তো পারে কিন্তু সে গল্প-উপন্যাসে নয, কারণ উপন্যাসে তাদের ঘাস খেতে হয় মুখ নিচু করে এবং মাঠে। রাবণের দশ মাথা নিয়ে কাব্যে কোনও নালিশ নেই, আর সেখানে আমবা তা বিশ্বাসও কবি, কিন্তু উপন্যাসে যদি বা সে তেমন আসতে চায়ই তবে তাকে বলে নিতে হবে একটাব বেশি তার কাঁধে যা আছে তা মুখোশ।

এই বিচাবেব ফলেই সায়েন্স ফিকশন ফিকশনই বটে, নভেল নয়। উপন্যাস এক বকমের গল্প, কিন্তু আকারে প্রকারে বড় গল্প মাত্রই উপন্যাস নয়।

এখানে একটা কৌতুকের ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়; দায়দায়িত্ব যেমন অনেক সময়ে জীবনকে আচ্ছন্ন করে, একেবারেই চেপে দেয় কখনও কখনও, এই বাস্তবে বিশ্বাস উৎপাদনের দায় তেমন অনেক সময়ে উপন্যাসকে এমনভাবে আবৃত করে যে মনে হবে বাস্তবের অনুকৃতিই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন চেপে যাওয়া জীবনে প্রায় দেখা যায় উদ্দেশ্যের পিছনে এক সান্ত্বনা থাকে, একপ্রকারের মহৎ অভিপ্রায়; এবং উপন্যাসও যখন বিপাকে পড়ে তখন সে মানুষের প্রয়োজনেব শহিদ এমন ঘোষণা হয়ে থাকে।

তখন এই মনে হওয়াকে ভ্রান্তি বলেও মনে হয় না, এবং শহিদত্বের ঘোষণা গৌরবের অনুমান করা হয়। উচ্চকণ্ঠে বলতে শোনা গিয়েছে যে উপন্যাসের এই বাস্তব অনুসরণ কলার সংজ্ঞা-সম্মত। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে তার সব খুঁটিনাটিতে আঁকতে হবে, এমন শোনা যায়, কারণ তা করে জীবনকে আবিষ্কাব কবা যাবে এবং যখন তা আবিষ্কার হবে তখন তত্ত্বেও পৌছানো যাবে যা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনেব, যেন এই আবিষ্কৃত তত্ত্ব টলস্টয় কথিত ফুলের পিছনে ফলের আভাস। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আঁকা, কিছুই বাদ না দিয়ে থাকলে সার্থকতা লাভ করেছে, এমনটা উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হলে তা যেন একই সঙ্গে আরিস্টটল এবং শেকসপিয়ারের সমর্থনও লাভ করে। কারণ একজন আর্টকে অনুকৃতি, অন্যে প্রতিবিম্ব বলেছেন।[৪]

এখানে একটা কৌতুকেব কথা মনে পড়ছে। ইডিপাস বেকস অথবা হ্যামলেটেব কথাই ধবা যাক। দুটিতে নাবী এবং তাব প্রেমেব কথা বলা আছে। একদিক দিযে দেখতে গেলে সে প্রেম সাধাবণত যাকে প্রেম বলা হয় তাব চাইতে অনেক তীব্র কিছু। এবং সেই প্রেমই নাটকেব চবিত্রগুলিকে প্রভাবিত কবে আঘাত কবে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি কবেছে—বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন আমাদেব স্পুটনিক ইত্যাদিব অনেক আগে থেকেই ডেনমার্ক ও থিবস্ নামক মনুষ্য সৃষ্ট গ্রহদুটিও সূর্যকে প্রদক্ষিণ কবছে। প্রেমই তো, যদি বা পূর্ববাগ না থেকেও থাকে, অনুবাগ নিশ্চযই, দুবন্ত, অপবিণামদর্শী, বিধি-বিধান অতিক্রান্ত প্রেম। কিন্তু কথাটা বলাই দবকাব, গার্ট্রুড এবং জোকস্টা আধুনিক দৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে পাষাণী[৫], কেউ কি একটা চুমু খেতেও দেখেছ গার্ট্রুড অথবা জোকস্টাকে? স্বীকাব কবি ওদুটি পৃথিবীতে দীর্ঘদিন বাস কবেও, অলি গলিতে এবং বাজসভাতে ঘুবেও চোখ নামিযে নেযাব মতো ঘটনাব সামনে পড়িনি। পাষাণী ছাড়া আব কিছু বলা যায়? এ কী প্রকাবেব ব্যভিচাব অথবা অগম্যা-গমন?

অন্যদিকে দেখুন গার্ট্রুডেব বযস কম কবেও সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ প্রমাণ, হ্যামলেটেব বযস পঁচিশ থেকে ত্রিশেব মধ্যে হবে। জোকস্টাব ততোধিক। অথচ কাবও মুখে বলিবেখা দেখা যায না। তখনকাব দিনে এত সহজে কডোপাইবিন পাওয়া যেত না যে দাঁত ব্যথা গোপন কবা যাবে। উপবন্তু তখনকাব দিনে অন্তত ইউবোপে বযস এখনকাব তুলনায অনেক ভাব ছিল বলে মনে কবি, কাবণ অ্যান্টিবাযোটিকস সেদিন এসেছে, হাইজিন সম্বন্ধে জ্ঞান দূবে থাক বছবে এক আধ দিনেব বেশি স্নানও হত না। তা হলে এই বযোভাবাক্রান্তাদেব অন্য বকমে সেই গিবিচূড়া, উপত্যকা, সানুদেশ ইত্যাদি অনুকবণ কবা, প্রতিবিম্বিত কবা দূবে থাক, আগে যেমন বলেছি, একবাব চুমু খেতেও কাউকে দেখলাম না। এ কীবকম জীবনকে সমগ্রভাবে আঁকা? এ কী প্রকাবেব অনুকৃতি অথবা প্রতিবিম্ব?

এবকম একটা মত শুনতে পাওযা যায, ঠিক এখানেই নাটক ও কাব্যেব সঙ্গে উপন্যাসেব তফাত যে শেষোক্তকে তীব্র ও তীক্ষ্ণতব, আবও বেশি বাস্তব হতে হয। শেকসপিযাব তাঁব শোবডিচেব উন্মুক্ত পযঃপ্রণালীব দুর্গন্ধকে উপেক্ষা কবতে পাবেন, ঔপন্যাসিক তা পাবেন না, আব পাবেন না তাঁব কলাব বিশিষ্টতাব জন্যই। অন্যকথায যেন উপন্যাস আজন্ম কিছু পিকাবেস্ক।[৬] অবশ্য এতে নতুন কিছু বলা হয না। উপন্যাস বিশ্বাস উৎপাদনেব জন্যে একটু বেশি বাস্তবানুযাযী হতে গিযে ওটাকেই তাব পবিচয চিহ্ন কবে ফেলেছে, এখন আব জ্ঞাতিত্বেব সুবিধাব জন্যও যেন আব পিছনে ফেবা সম্ভব নয, যেন প্রযোজন মতো অনুকৃতি থেকে প্রতিবিম্ব থেকে কিছু বাদ দেযা আব তাব চলে না।

এমন হয না তা নয। হাতি তাব নাকটাকে শখ কবে বড কবেনি, জীবিকা অর্জনেব জন্য তা কবেছিল, আধুনিক ভাষায বাঁচাব তাগিদে, হাতও অন্য অনেকেবই আছে। কিন্তু এমনই বড আব পটু কবল হাতি তাব নাককে যে হাতকেও হাব মানায, যেন বড নাকই তাব পবিচয। উপন্যাসেব বাস্তব অনুসবণেব ফলে এমন কিছু হযেছে যেন।

---

৪ বিশ্বাস কবতে বাধ্য হযেছি শেকসপিযব আমাদেব প্রশ্নে ধবা দেন না এবং উক্তিটা হ্যামলেটেবই, কিন্তু তা এত ভাল যে মনে হয এই একবাবই শেকসপিয়াব তাঁব টাক এবং ঈষৎ বাঁকা হাসি সমেত আমাদেব সামনে এসে কিছু বলেছেন।

৫ পাষাণী frigid

৬ Picaresque শব্দটাব প্রতিশব্দ হয়তো কবা যায কিন্তু টেবল চেয়াব ট্রামেব মতো এটিকে বাখতে চাই কাবণ অভিধানগত অর্থেব চাইতে বেশি দ্যোতনা যা এটি সংগ্রহ কবেছে নতুন শব্দে তা আসা যাবে না।

কিন্তু হস্তী অবশ্যই তার নাকটাই নয়, তা একটা জীবনও বটে। এবং এটাই সমস্যা। হাতিতে যে শুধু শুঁড়টাই দেখেছে তার দেখাকে বিশেষ রকমের হস্তীদর্শন বলা হয়ে থাকে। অনুমান করি, উপন্যাসে বাস্তব থাকবে, একটু বেশিই থাকবে, জীবনে যা কিছু ঘটে তা থাকাই ভাল, কিন্তু বেশি বাস্তব দেখা সেই বিশেষ রকমের দর্শন কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ উপন্যাসকে তো জীবিতদের জগৎও হতে হবে। স্বীকার কবি, আধুনিক কালে উপন্যাস কতখানি বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত করবে তা সমস্যা।

বলা হয়েছে জোকস্টা অথবা গার্ট্রুডের জীবনের কিছু কিছু প্রতিবিম্বিত করা হয়নি। এবং সেটা একটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ বিষয় ; সেটিকেই উদাহরণরূপে আলোচনায় আনা যেতে পারে। যদি বা তাদের নাটক বলে এখানে অবান্তর মনে হয়, কারমাজভদের শহর এবং পারমা[৭] রাজ্যের কথা ধরা যাক, কারণ তারা ডেনমার্ক ও থিবসের মতো নাটকীয় পৃথিবী নয়, উপন্যাসেরই বাস্তব রাজ্য দুটি। ডস্টয়েভস্কি ও স্তঁদল কি প্রুড় ছিলেন? গশ্। তা সত্ত্বেও এ দুটি রাজ্যেও শায়িত নারীদেহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, অন্যদিকে মোরাভিয়ার দুপাতা অন্তর, সার্ত্রতে প্রতি ঘরে, লোলিটায় তা না পেলেও স্বপ্নের মতো তাই প্রতি পদক্ষেপে জড়িয়ে যায়।[৮]

এদিকে ওদিক ঝোপ না পিটিয়ে বলাই ভালো, যৌন বিষয় কখনও সুন্দর, অনেক সময়েই মধুর, ও আপাত নয় প্রকৃতই, এমন কি তা জীবনের উৎস। কিন্তু উৎসই জীবন নয় এবং বাস্তবে যৌনবিষয়ের তুলনায় তীব্রতর অনুভূতি অনেক কিছু আছে। হ্যামলেট নামটা একাধিকবার উচ্চারণেব ফলে, ঠিক এই মুহূর্তে এরকম মনে হতে, পাশে ধোঁয়া উঠছে এমন চায়েব কাপ ও সিগারেটেব ধোঁয়ার আড়ালে লম্বা বারান্দায় এক নির্জন কোণে বেতের চেয়াবে গভীরে সেই পুরানো হ্যামলেট নিয়ে এই রবিবাব সকাল কাটিয়ে দেয়ার চাইতে সুখ বাস্তবে কোথাও নেই।

কিন্তু এহো বাহ্য। এরকম যুক্তি উঠতে পারে যৌনবিষয় বাস্তব জীবনের অংশ, উপন্যাসেও (নাটক ইত্যাদির চাইতে বেশি) বাস্তব দেখানো হয় সুতরাং পূর্বে বর্ণনা কবা হয়নি বলে এখনও তার আলোচনা করা হবে না—এমন যুক্তি হতে পারে না। সমস্যাটা এখানে এই—যৌনবিষয় জীবনের অংশ বটে জীবনটাই নয়। বাস্তব জীবনের আস্বাদ দিতে গেলে তাব অনেকটুকুর মধ্যে যৌনবিষয়কে তার সঠিক দাবি মতো জায়গা দিতে হবে। অন্যদিকে এমন কথা উঠতে পারে, জীবনের সবটুকু আস্বাদ না নিয়ে অংশবিশেষের আস্বাদ বেশি নিয়েও তো আর্ট হতে পারে। হয়ও এবং তা হয় যখন, তখন এমন হওয়া সম্ভব যে সেরকম উপন্যাসে যৌনবিষয়কে প্রাধান্য দেযা হবে। যুক্তিটা আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অংশবিশেষ বড় করতে গেলে বিশেষ ধরনের হস্তীদর্শন তো ঘটতেই পারে, উপরন্তু যা ঘটেছে তা দেখা যাক।

অনেক উপন্যাসে সেই শায়িতা নাবীদেহগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু মেদিনীস্বরূপা সেই দেহগুলি আর যাই হোক জীবিতার নয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে সেগুলি ছিন্নমস্তা। নায়িকাগুলিকে পরস্পরের থেকে পৃথক করে চেনা যায় না। সবগুলি মূলত গিরিচূড়া, সানুদেশ, প্রসারিত উপত্যকা। ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্যও দর্শনীয়। কারও মুখ নেই যে চিনে নেয়া যাবে। মাথা বাদ যাওয়ার তাদের মস্তিষ্কও নেই এবং শয্যার দঙ্গলে তারা চরিত্রহীনাও হতে পারে না কারণ নিউম্যাটিক ডামির মতোই তাবা চরিত্র-বিচ্ছিন্ন।

অন্যকথায় শয্যার সেই দঙ্গলে চরিত্র গঠিত হয় না বলে তারা বাস্তবে অর্থাৎ জীবিত বাস্তবের

---

৭ Brothers Karamozov এবং Charter House of Parma

৮ মোরাভিয়া, সার্ত্র অথবা নবোকভ বিশেষভাবে বেছে নেওয়া নয়, নিত্যন্ত উদাহরণরূপে ধরে দেওয়া।

অনুকৃতি অথবা প্রতিবিম্বও হয় না। সুতরাং উপন্যাসে তারা ক্ষতিকরভাবে অপ্রয়োজনের অর্থাৎ অশ্লীল, কেন না আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে উপন্যাসকে বুঝিবা নাটকের চাইতেও বেশি জীবিত জগতের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হবে। এবং যাদের জীবনের কথা বলা হবে তারা চরিত্র-যুক্ত হয়ে ঘটনা ঘটাতে এবং ঘটনা থেকে নিজের চরিত্র গড়ে নিতে না পারলে, জীবিত জগতের বিশ্বাস এবং উৎপাদন হয় না, এবং শেষোক্তটি এমন বিষয় যা না হলে উপন্যাস কলা থাকে না, যেহেতু ডামিদের সাধ্য কী সেই জটিল সংবেদন উপস্থাপিত করে? এখানে এই প্রশ্ন উঠবে, এই ডামিগুলি এবং তাদেব কার্যক্রম বর্ণনায় কিছু তৈরি হয কিনা, এবং যা তৈবি হয তা আমদের মনকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এবং/অথবা সময়ে অধিকার কবে কিনা। মানুষের তৈরি বলে তা কলাও এবং তাকে উপেক্ষাও করা যায না। বস্তুত তা করতেও বলিনি। জুল ভার্ন-এর বইগুলি আমাদের খুব ভাল লাগে, তেমন মোরাভিয়ার বইগুলি কারও ভাল লাগতে পারে। জুল ভার্ন-এব বইগুলিকে আমরা সায়ান্স ফিকশন বলে থাকি। এখন সময় এসেছে, উপন্যাস থেকে পর্নোগ্রাফিকে, তা যতই ভাল লাগুক এবং আর্টও হোক, পৃথক করে চিনতে হবে। মানুষেরই তৈবি বলে পর্নোগ্রাফি আর্ট বটে, কিন্তু উপন্যাসকে তার বাহন হতে হবে কেন? কোনও কলাই অন্য কোনও কলার বাহন নয়।

বলা বাহুল্য হ্যামলেট ও ইডিপাসে যে জীবনেব সবকিছু বিবৃত করা হয়নি তাব কারণ নাটকে তা না হলে চলে এমন নয় , ববং সবটুকু বললে জীবনকে অনুকবণ বা প্রতিবিম্বিত করতে অসুবিধা হতো বলেই তা করা হয়নি—এ তথ্যে বিদগ্ধজনের কোনওদিনই সন্দেহ ছিল না।

এ সমস্যাটিবই অন্য আর একটি দিক আছে এমন মনে পড়ছে। যদিও সমস্যাটিকে উপর থেকে অন্য বকমেব অনুমান হতে পারে। কিন্তু একই সমস্যার অন্য মুখ বলার যুক্তি এই যে পর্নোগ্রাফি যেমন মস্তিষ্কহীন নায়িকা সৃষ্টি কবতে পাবে, এমন কতকগুলি বই আছে যাতে যেন মনের অতিশয়িত বর্ণনা নরনারীগণকে বিদেহ কবে। ঘটেব বাইরের আকাশেব সবই তো একাকার। ঘটনাবহির্ভূত আকাশের মতে মনের সেই নানা চিন্তাব স্রোতে সব মনই এক। এখানেও চরিত্রই প্রথম বলি। মনেব এই চবিত্রহানি শুধু বস্তুবিস্তাবেব দরুনই হয না, অতি গভীরতাব দরুনও হতে পাবে। অতি গভীর করে দেখতে গিয়ে মনের অনেক ফাটল, অনেক দুর্বল অংশ চোখে পড়ে যেন, এবং তা উপন্যাসে প্রাধান্য দেয়াকে বাস্তবসম্মত মনে হয। এবকম গ্রন্থেব একখানা হিসাবে পুরনো সেই লোলিটার কথাই তোলা যেতে পারে এবং অনেক গ্রন্থেব যাতে বিকৃত মনকে সুনিপুণ কলমে আঁকা হয়েছে।

বলা হযে থাকে এ-হেন বিকৃতি মানুযেব পক্ষে সত্য সুতরাং উপন্যাসেই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। এমনও শুনতে পাওয়া যায, এ প্রকার বিকৃতি মানুষেব জীবন সম্বন্ধে সত্য উদঘাটনে সাহায্য করবে। এবং সেজন্য যদি বা এই মনোবিকলনগুলি চরিত্র সৃষ্টিতে অক্ষমতার দরুন বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদন করে না, অথবা চরিত্রগুলি একই সঙ্গে সাধারণভাবে সব মানুষের প্রতিভূ এবং নিজেও এক বিশিষ্ট জীবন্ত মানুষ হয়ে ওঠে না, তা হলেও যদি সেদিকে কিছু লোকসানও হয়ে থাকে, সত্য উদঘাটন দ্বারা মানুষ সম্বন্ধে নতুন আবিষ্কাব হয় বলে শেষপর্যন্ত আমরা লাভবানই হয়ে থাকি।

যদি বা ধবে নেওয়া যায় এ জাতীয় উপন্যাসে সত্য আবিষ্কার হয়, এরকম একটা কথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে—সে কি আদৌ কোনও নতুন সত্য? অনুমান করি, যদি এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে মানুষ এই কয়েক হাজার বছর আগে ভগবান কর্তৃক প্রস্তুত হয়েছিল তবে তাব কাছে লোলিটা নতুন কিছু হতে পারে। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে আসল তথ্যটা কী? আমরা যাকে মনুষ্যত্ব বলি তার সবটুকুই কৃত্রিম। আমরা যত কৃত্রিম তত সভ্য। অকৃত্রিমতাই ভয়াবহ। গাত্র মার্জনা, দাড়ি

কামানো, নানা যানবাহনের সাহায্যে গতিকে দ্রুত কবা যেমন এই কৃত্রিমতার অংশ, নরনারীর যৌন সম্বন্ধ বেঁধে দেয়ার ব্যাপাবেও আমরা তেমন কৃত্রিমতাকেই আশ্রয় করে থাকি। ধাতবপিণ্ড থেকে ধাতু সংগ্রহের প্রক্রিয়াব সঙ্গে এই পদ্ধতিব যেমন মিল আছে, দুধ থেকে দই তৈরি করার সঙ্গেও এর তেমন তুলনা দেযা যায। আমরা জানি চেষ্টা সত্ত্বেও ধাতুতে খাদ থেকে যেতে পারে, দুধ দই না হয়ে মাঝপথে পচে যেতে পাবে। নতুন করে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কোনও কোনও মন অন্য সব ব্যাপাবে সার্থকভাবে কৃত্রিম হয়েও যৌন ব্যাপারে যদি কোথাও কোথাও কাঁচা থেকে যায। এমনকি তা থাকা উচিত কিম্বা নয়, তাও বোধ করি উপন্যাসের প্রশ্ন নয়, সমাজতত্ত্বে যদি বা তার মূল্য থাকে।

আর সমাজ— কোনও এক বিষয় আমাদেব সমাজে অনুচিত হলেও সমগ্র মানব সমাজে তা নাও হ্তে পারে। ইজিপ্টে এক সময়ে ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ সিদ্ধ হত। জনৈক টলেমি তো বাজকীয় প্রয়োজনে মাতা ও ভগ্নীকে একই সঙ্গে বিবাহ কবে থাকবে। এই টলেমি এ জন্যই উপন্যাসের নায়ক হওযার দাবি পেশ কবলেও, সে ইডিপাসেব সমকক্ষ হয় না। হেতুটা, বলা বাহুল্য, ট্রাজেডি সমাজতত্ত্ব নয। কোনও তত্ত্বই নয়।[৯]

অনুমান করি মানুষ এবং জীবন সম্বন্ধে নতুন কিছু আবিষ্কাব হবে সত্যেব প্রতিষ্ঠা হবে এই আশাতেই সার্ত্রকে উপন্যাসে যৌন বিষয়ে বেশি জায়গা নিতে দেখা যায না, কারণ উপন্যাস কলা এবং কলা কদাচিৎ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কবতে পাবে। অনুকৃতি ও প্রতিবিম্বেব কি উদ্দেশ্য আছে? যদি তা থাকে তা অবশ্য সত্য আবিষ্কাব নয়। সত্য আবিষ্কার আর্টেব উদ্দেশ্য কেই বা কবে ভেবেছে। সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় যুক্তি বা বুদ্ধিব সাহায্যে। কলায আমাদেব অবলম্বন আবেগ ও অনুভূতি যা ববং যুক্তি বুদ্ধিকে গুলিয়ে দেয়, ডুবিযে দেয়।

এই পবিস্থিতিতে এবকম দেখা যায় কলায় সত্যেব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করার কথা যাঁবা চিন্তা করেন, তাঁদেবই কেউ কেউ কলাকে কাজে লাগানোর কথাও ভেবে থাকেন। এবং এটাই তাঁব সমস্যা হযে দেখা দেয়। কলাকে লাগানো উচিত কিম্বা নয, অথবা কলা যখন বিশুদ্ধ কলাই তা মানুষের কাজে লাগে কি না, এ প্রশ্নে না গিয়ে আমাদের লক্ষ্য করা দরকার, অনুমান কবি, যে উপন্যাসকে সত্যেব প্রচারক কবতে হলে কুশীলবগণেব চরিত্র-বিচ্যুতি ঘটানো দবকাব হয়ে পড়ে। কেন না চরিত্রবান কুশীলব ঔপন্যাসিকেব সৃষ্ট হলেও তাবা খানিকটা স্বাধীন, সহজে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চায না, তাদেব দিয়ে কিছু প্রমাণ করানো কঠিন।[১০] অন্যদিকে মনোগত তত্ত্ব ততই ভাল প্রমাণিত হবে, কুশীলবগণ যত ধারণাব নামমাত্র হবে। মিস্টাব ব্যাডম্যান, মিস্টার হোপফুল, জায়ান্ট ডেসপেয়াব, মিস্টার লেবার, মিস্টার ক্যাপিটাল—এবা কোনও না কোনও সাধাবণনামমাত্র। আমরা বানিয়নকে বিস্মৃত হতে পারি না। তাঁব তৈরি ছায়া-নাচেব কোনও কোন পুতুল এমন সুন্দর ভাবভঙ্গি কবে এবং এত সহজে যে সাময়িকভাবে মনে হতে থাকে তারা বোধহয় মানুষই। কিন্তু এই মনে হওয়া যে ভুল তাও প্রতিমুহূর্তে মনে থাকে, কারণ সেটাই লেখকের উদ্দেশ্য নতুবা আমরা লেখকের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হব, যে মূল লক্ষ্য জীবাত্মাব প্রগতি। এবং এ কারণে বিদগ্ধজনেরা পিলগ্রিমস প্রোগেসকে তাব নানা গুণাবলী সত্ত্বেও উপন্যাস বলেননি।

---

৯ মানুষ যদি শব্দাতিগ বিমান আবিষ্কাব করে থাকে, যদি সে কোযান্টাম মেকানিকসে সিদ্ধ হয়ে থাকে, যদি বা আশা বাখে সববকমেব শোষণমুক্ত সমাজ সে প্রতিষ্ঠা কববে তবে একদা বমণীকে ভোগ্যা না রেখে কচিৎ জীবনেব উৎস এবং সব সময়েই প্রেমের দেবতা হিসাবে দেখা অসাধ্য হবে কেন?—প্রেমেব সেই আলোক যা যৌন-প্রজ্জ্বলন থেকে বিশেষভাবেই পৃথক তা মানুষেবই আবিষ্কাব তো বটে।

১০ শেকসপিয়ব নিজেব তৈবি চবিত্রগুলো দিযে কিছু প্রমাণ কবাননি।

এখন, এক ধবনের গ্রন্থে (উদাহরণস্বরূপ) শ্রমিক সম্বন্ধে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা, বিপ্লব সম্বন্ধে এক পূর্বনির্ধারিত মত, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা, বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং সেগুলি যেহেতু গদ্যে এবং বাস্তবে ভাষায় লিখিত তাদের উপন্যাসও বলা হয়ে থাকে। এখানে যা ঘটে তা এই যে, এই বিমূর্ত, পূর্বনিধারিত ধাবণাগুলি, বানিয়নের গ্রন্থেব কুশীলবের মতোই, কখনও বাস্তবেব বিশ্বাস উৎপাদন কবে না, আর তা করে না বলেই তাদের চলাফেরার যোগফল কলা হয় না, তাদের সুদীর্ঘ কার্যাবলীর বর্ণনা আমাদের মনে সেই জটিল সংবেদন পৌঁছে দেয় না।

সামাজিক প্রযোজনের কথা বলা হচ্ছিল। এ জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রয়োজনেব কিনা, তাদেব সেরকমেব মূল্য কতটুকু—এ আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় বর্তমান লেখক মঙ্গলকাব্য পড়ে সময় কাটানোকে সময়ের অপব্যবহার মনে করে না, জুল ভার্ন সম্বন্ধে দুর্বলতাব কথা আগেই বলা হযেছে; মিস্টার হোপফুল প্রভৃতিকে নিয়ে যেমন গ্রন্থ হয মিস্টার লেবার ও মিস্টার ক্যাপিট্যালকে নিয়ে তা হতেও যুক্তিসঙ্গত আপত্তি থাকতে পারে না। এগুলি কলাও বটে যদিও উপন্যাস-কলা নয়। জুল ভার্ন-এব সেগুলিকে আমবা সায়েন্স ফিকশন বলি, এই নতুন ধরনের গ্রন্থগুলিকে অন্য কোনও নাম দেযা যেতে পারে।

কিন্তু এই সমস্যাগুলি কেন? কীভাবেই বা তার নিরসন হবে? এসবই অন্য এক নিবন্ধের বিষয় হতে পারে। রবীন্দ্রনাথই আমাদেব দেশে মঙ্গলকাব্য বচনাব মানসিক পরিমণ্ডলেব কথা বলেছেন। এখন যেন তেমন কিছু ঘটেছে আবাব, মন যখন পবিমণ্ডলে আবদ্ধ। কিন্তু এই বললেই এ প্রশ্নকে নিরস্ত করা যায় না। কেন এই পবিমণ্ডল সৃষ্টি হল, যা মধ্যযুগীয় ধর্মের গোঁড়ামিগুলি বিদায় নেয়ার পরে অন্য আব একটি ধর্মমত স্থাপনের চেষ্টা চলেছে, অথবা কেন আবাব সেই মানসিকতা দেখা গেল স্ত্রী-মানুষকে চাকবি করার এবং ভোট দেওয়াব স্বাধীনতা এনে দিযেও মস্তিষ্ক-বিচ্যুত শয্যাংশ মনে করা হবে।

অনুমান করি, এসবেব কারণই এই যে, আমরা কালচার-উদ্বাস্তু। অন্য কথায় ঃ পৃথিবীময় উপন্যাসের উপাদান, প্রতিটি মানুষ উপন্যাসেব নাযক হওযার যোগ্যতা বাখে, পৃথিবীকে দেখে দেখেই তো উপন্যাস রচনা করা হয। আসলে আমরা দেখছি না। কাবণ এ দেখা যে দেখে, সে বাজনৈতিক নয, ধার্মিক নয, এমনকি দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিকও নয়, সে একজন কালচাড ব্যক্তি এবং সে অধুনা ঘর হারিয়েছে।

প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। আমদের পৈতৃক আবাস ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মধ্যদেশে। পদ্মা পার হলে নদে, ব্রহ্মপুত্র পার হলে মৈমনসিং। নদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এবং বাঙ্গালদেশের সঙ্গেও। কোচবিহার থেকে যখন সেখানে যেতুম মনঃকষ্টের কারণ ঘটতো—সমবয়সী আত্মীয় বলতো, 'বাহে' . বর্ষিয়সী এবং তৎকালে হিসাবে শিক্ষিতা আত্মীয়া বলেছিলেন, বেম্মকোচ। তখন মনে আঘাত লেগে থাকবে, নতুবা এত স্পষ্ট মনে থাকবার কথা নয়।

এখন অবশ্য বুঝতে পারি, কোচবিহাব সম্বন্ধে বাইবের লোকের সাধারণ একটা অনুমান আছে, এটা বাহের দেশ, বিশদ কবে বাহেভাষার দেশ। আর যাঁরা জানতেন তাঁদের কাছে তখন এটা বিশেষভাবে ব্রাহ্মসংস্কৃতির দেশ ছিল। অনুমান করি, দুটো ধারণাই ভুলেব উপরে গড়ে উঠেছে। প্রথম ধারণাটা এখনও এ অঞ্চলের বাইরে অবজ্ঞাকে আশ্রয় কবে বেঁচে আছে। দ্বিতীয়টি এখন আর কাউকে প্রকাশ কবতে শুনি না। কারণ বোধ হয় এই যে—ব্রাহ্মসংস্কৃতি ছিল বাংলা সংস্কৃতিব স্রোতে একটা প্লাবন, মূল স্রোতকে খানিকটা জোব দিয়ে যা ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে, ও একটা স্রোত হয়তো এসেছিল, হয়তো তা সামান্য দাগ বেখে মিলিযে গিযেছে। কিন্তু বাহে অর্থাৎ পৃথক? কী হবে বাহেব অর্থ?

এদেশের ভাষায় কী বৈশিষ্ট্য আছে? কিংবা সংস্কৃতিতে? কোচবিহার এই নামটিতে এখন যে জেলাটাকে বোঝায, একসময়ে তার চাইতে অনেক বড় জাযগাকে বোঝাতো। সেটা ছিল একটা বাজ্য, কোন এক সময়ে, প্রবাদ অনুসারে, যার প্রসার ছিল প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসাম, ভুটান, এবং বিহারের উত্তর-পূর্বাংশ পর্যন্ত। সে সময়ে এই রাজ্যের নাম হয়তো ছিল কামতা, কিন্তু সে রাজ্যেব মূলশক্তি ক্রমশঃ বিহারেশ্বর নামেই পরিচিত হল।

কোচনায়ক হাজোর দুই কন্যা জিবা ও হীরার বিবাহ হয মেচ যুবক হরিযার সঙ্গে। কোচ ও মেচের এই সম্মিলন—যা নাকি দেবাদিদেব মহেশ্ববের দৃষ্টিপাতে প্রসন্নতর—তা থেকেই কোচবিহার রাজবংশের সুরু। হরিয়া মেচ সাধারণ যুবক ছিলেন না। সম্ভবত বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার একটা অংশের মণ্ডল ছিলেন। জেষ্ঠা পত্নী জিবার দুই পুত্র—চন্দন ও মদন; কনিষ্ঠা পত্নী হীরাব গর্ভে শিবের প্রসাদে দুই পুত্র—বিশু ও শিশু। সম্ভবত হবিয়া মণ্ডলের রাজধানী ছিল চিকনা। সেখানে চন্দনই প্রথম বাজা হন। সেটা ১৫১০ খৃষ্টাব্দ। তখন থেকেই কোচবিহাবের বাজশক আরম্ভ হয়। ঐতিহাসিক মতে চন্দন ও মদন, বিশু ও শিশুর জন্মকথা কাল্পনিক হতে পাবে, রাজশক কাল্পনিক নয়। কোচবিহারের বাইরে ভুটান, আসাম, কাছাড়, মণিপুর ইত্যাদি রাজ্যেও এই শকের প্রচলন হয়ে ছিল। চন্দনের মৃত্যুর পর বিশু সিংহাসনের অধিকারী হন। শিশু হলেন তাঁর মন্ত্রী। তখন তাঁরা আর চিকনার রাজ্য সীমায় আবদ্ধ নন। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুন্ঠপুরের রায়কতরা শিশুর বংশধর। কথিত আছে শিশু শিলিয়াগুড়িতে (শিলিগুড়ি?) বাস করতেন। কোচবীরদের পরাক্রমে ভুটানের দেব ও ধর্মরাজ বিশ্বসিংহের আধিপত্য স্বীকার করলেন, বাংলার মুসলমান শাসনকর্তা প্রমাদ গণলেন। কিন্তু কোথায় এদের ইতিহাস? বাণিজ্যের কথা?

স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে, এই পরাক্রমশালী কোচজাতি উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলের নতুন রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কি নতুন সংস্কৃতির জোয়ারও আনেন নি? অন্য কথায় কোচবিহার অঞ্চলে

সেই কি সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত হয় নি? সংস্কৃতি কী, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গীতে যে কোন একটি সময়ে সমাজের নিছক বাঁচার প্রয়োজনের চাইতে বাড়তি আড়ম্বর ও সমারোহের মধ্যে সংস্কৃতি খুঁজতে হবে, এবং প্রকৃত অর্থে নিছক বাঁচার উর্ধ্বে যে আত্ম-উন্নতির অনুশীলন, তাতেই সংস্কৃতি অনুসৃত। পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে সে যুগের কোচবিহার-সংস্কৃতির নিদর্শন রাজসভা থেকে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টি অনুসারে সে সময়ের ধর্মাচরণই হবে সংস্কৃতির পরিমাপক।

ষোড়শ শতকেও যাঁরা শিবাত্মজ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার এই অনুমান হয়, তাঁরা নিজেদের আর্যধর্মনিষ্ঠ হিন্দু বলেই জানাতে এবং জানতে চেয়েছিলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন, এবং গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলী মতে শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রবাদ এই, তিনি কনৌজ কাশী প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়েছিলেন। কোচবিহারের রাজকীয় ইতিহাসের মতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব আচার্যের পুত্র বল্লভাচার্যকে শ্রীক্ষেত্র থেকে এনে কামাখ্যাদেবীর পূজারী করেছিলেন। সার উইলিয়াম হান্টারের মতেও বিশ্বসিংহের সময়েই কোচজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবেশ লাভ করেছিল। বিশ্বসিংহের পর মহারাজা নরনারায়ণ। নিজের রাজ্যে তিন অনেক দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হলে, তাঁর ধর্ম বিষয়ে প্রধানতর কীর্তিগুলো হচ্ছে হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের সংস্কার এবং কামাখ্যামন্দিরের পুনর্নির্মাণ। এটা খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়, বহুপ্রাচীন প্রথা অনুযায়ী একজন হিন্দু রাজার ধর্ম সম্বন্ধে যা করণীয় বলে ধারণা করা হতো সেটাকেই কোচবিহারের রাজবংশ করণীয় মনে করতেন। কিন্তু এই হিন্দুয়ানীর সব চাইতে বড় প্রমাণ এবং সার্থকতা বোধ হয় এই যে মহারাজ নরনারায়ণ মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেবকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। আমরা এত কাছে থেকেও অনেকে জানি না আসাম ও উত্তরবাংলার ধর্ম ও সাংস্কৃতির জীবনে শ্রীশঙ্করদেবের কী অসামান্য দান।

শুধু ধর্ম নয়, সেই রাজসভাটা কী রকম সাজানো ছিল তা দেখা যাক। রাজসভায় সেনাপতি, মন্ত্রী, কোটাল, চোপদার, লস্কর, বড়ুয়া এ সব থাকবেই, যেমন থাকবে রাজসিংহাসন ও রাজদণ্ড। কিন্তু তারও কিছু ছিল যা সে সময়ের হুসেন শাহদের বাংলাদেশে কচিৎ দেখা যেতো। তাঁর রাজসভায় ছিল পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ। ভূষণ দ্বিজ ছিলেন রাজকবি। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত প্রয়োগ রত্নমালা ব্যাকরণ লিখলেন (১৫১৮)। পণ্ডিত অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতী রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ গদ্যে অনুবাদ করলেন। শ্রীধর বৈদগ্ধ জ্যোতিষ এবং বকুল কায়স্থ ভূমি পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করলেন, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ মার্কণ্ডের পুরাণ ভাগবতের একাধিক স্কন্ধ অনুবাদ করলেন। আর সর্বোপরি শ্রীশঙ্করদেব যাঁর লেখা অন্ততঃ ত্রিশখানা গ্রন্থ একাধারে সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থ। শুধু অনুবাদ নয় সংস্কৃতের চর্চা ছিল সবিশেষ। রাজসভায় সংস্কৃত ভাষাতেও কথোপকথন হতো। সংস্কৃতবিনে আন মাত না মাতয়। সামান্য কথাকো সবে সংস্কৃতে কয়॥ এটা এই সভারই বর্ণনা।

আর এই সব অনুবাদ কোন ভাষায় হয়েছিল? তাকে কি রাহে ভাষা বলব না? দেখা যাক সে 'রাহে' ভাষাটা কেমন ছিল শঙ্করদেব।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মাধবদেব রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভূমিকায় লিখছেন,

জয় জয় নরনারায়ণ হই নৃপকুল শিরোমণি।
যাহার পরম প্রচণ্ড প্রতাপ ঢাকিল ইতো ধরনি।
সাগর পর্যন্ত ভুজন্তোক রাজ্য প্রজা করি প্রতিপাল।
তৃষ্ণার ভকতি প্রচারি ইহন্তো জিয়ন্তোক চিরকাল॥

আনুমানিক ১৬০২ খৃষ্টাব্দে পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ লিখছেন,

পুরাণাদি শাস্ত্রে য়েহি রহস্য আছয়।
পণ্ডিত বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়॥
এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশ ভাষা বন্দে রচিয়ো পয়ার॥
বেদপক্ষবাণ আর শশাঙ্ক শকত।
আরম্ভ কবিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা যত॥

আনুমানিক ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বালদেবকৃত দরঙ্গরাজ সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীর ভাষার নমুনা দিচ্ছি—

অগ্নিকোণে দেবীগতহ আছয় সাক্ষাত।
নামত কামতেশ্বরী দেবী আছে তাত॥

আনুমানিক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজপবমানন্দ তাঁর বনপর্বের ভণিতায় লিখেছেন—

ভীম নাতি ভীমকৃত মল্ল জিতি বলে।
মল্ল নারায়ণ নাম হৈল ভূমণ্ডলে॥
নিজ দলে ভুজ বলে বিপক্ষে জিতিল।
অশেষ বিদেতা চর স্বদেশ কবিল॥
শ্মশানে মশান সঙ্গে রঙ্গে কবে বণ।
ভীরু ভয়ানক যুদ্ধে তেজিল জীবন॥

পীতাম্বর সিদ্ধান্তাবাগীশের এই দেশভাষা বন্দের চর্চা থেকে নেমে যায়নি, বরং অব্যাহত চলেছিল। তার প্রমাণ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গনারাযণের বংশবলী, এবং ১৮৪০ এব গন্ধর্বনারায়ণের বংশবলীতে পাওয়া যাবে। খড়্গনাবায়ণের বংশাবলীব ভাষা এই রকম—আমি এক বংশবলী অছহো কবিয়া বিজয় নারাণে আছে বেহারক দিয়া। বেহাবনগরে রাজা হরিন্দ্র নারায়ণ দূত পাঞ্চি নিযাই আছে বংশীবলীখান॥ আর এক বংশীবলী পাছতে নির্মিলো ছাহেবক দিবে রাজা বিজয়ক দিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা হয়েছে। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রামায়ণের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেছেন, গান বেঁধেছেন, উপকথা লিখেছেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে উপকথা বচনা করেছিলেন তার নমুনা দিই।

কোটালক আনী আজ্ঞা করিলা ভূপাল।
পাত্রের পুত্রক্ নিয়া কাটহ শকাল॥
এহি আজ্ঞা পাযা ধায়া জায় কোতোয়াল।
পাত্রের পুত্রক জেন ধরিলন্ত কাল॥

আর শুধু কি পদ্যে? বাহে ভাষার গদ্যের নমুনা উদ্ধৃত করা যাক।

আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহার থেকে লেখা চিঠির প্রথমাংশ এই রকম ছিল।

লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমাব আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ গোটা কর্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। যতানন্দ কর্মী রামেশ্বব শর্মা কালাকেতু ও ধুমাসদ্দার উত্তণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামারার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

আনুমানিক ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বেহারি ভাষার আর একখানি চিঠি—

আতদসার গরদিস পত্রে কাতহাতক লিখিব—শ্রীসর্বানন্দ গোসাঞি আমাদিগের ঘরে ২ বিভেদ

বান্দাইযা আমাবে ভুম হইতে বেদাস্ত কবিযা লুট তবাজ কবিযা খানে ওযাবন কবিল আমি চাইব সন হইলো নালিস মন্দ আমাব ইনসাপ কেহ কবে না, সন ১১৯৩ সালে শ্রীযুত মেস্ত্র মেথবোব সাহেব জিলা বঙ্গপুব পক্ষীযা বাবা শ্রীমান বিবেন্দ্রনাবাযণ জুববাজকে তলব দিযা লইযা জাইযা বৎস্ববাবদি কাল বাখিল গোসাঞিব কাবসাজি মতে ইনসাফ না কবিযা বিদাএ হওনেব কালে হুকুম কবিল তুমি বাজাব সহিত মিলওবে

এই নমুনাগুলো উদ্ধৃত কবাব পব কোচবিহাবেব ভাষা সম্বন্ধে আমবা কী ধাবণা কবতে পাবি? যতদুব মনে পডছে প্রথম পত্রখানি কোচবিহাব থেকে কোচবিহাবেব বাজাব লেখা হলেও তাকেই বাংলা গদ্যেব প্রথম নিদর্শন বলে গণ্য কবা হযে থাকে। দ্বিতীয পত্রখানি প্রাচীন বাঙ্গলা পত্রসঙ্কলন থেকে উদ্ধৃত। ঐতিহাসিকেব মতো এটিব ভাষাও বাংলা এবং কোচবিহাব থেকে লিখিত। এখন এটা বুঝাতে খুব বেশী বুদ্ধি খবচ কবতে হয না যে, যাবা বাংলায গদ্য লেখে তাবাই পদ্য লেখাব সমযে সে ভাষাই ব্যবহাব কববে। পদ্যব যে নমুনাগুলো উদ্ধৃত কবা হযেছে, তা যে বাংলা ভাষাতেই লেখা এতে সন্দেহ কবাব কিছু নেই, যদিচ এগুলোকে কোন ঐতিহাসিক বাংলা এই ছাপ নাও দিযে থাকেন। অথচ কৌতুকেব কথা এই যে, বাহে ব্যবহৃত গদ্যকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকাব কবলেও কেউ কেউ তাদেব পদ্যকে প্রাচীন আসামী বলেছেন। এই বিভ্রান্তিব কাবণ এই যে, আমবা ভুলে গিযেছি আসামেব দবং, বিজনি, গোযালপাডা এক সমযে সাক্ষাৎ কোচবিহাব বাজাব ও পবে সেই বাজবংশেব অধীন ছিল, এবং এসব বাজ্য ও উপবাজ্যেব ভাষা ও সংস্কৃতি অভিন্ন ছিল। কোচবিহাব বাজ্যে ব্যবহৃত ভাষা কী গদ্যে কী পদ্যে বাংলাই ছিল। আব তা যে 'বাহে' ভাষাও ছিল, তাব প্রমাণ পাবো। যাঁবা 'বাহে' ভাষা জানেন তাঁদেব কাছে নমুনাগুলিতে আমাদেব দাগিযে দেযা পদগুলোকে উপস্থিত কবা যথেষ্ট। বাহে ভাষা সুতবাং বাংলা ভাষাই যাতে শুধু কাব্যই বচনা হযনি, বাজকর্ম চলতো এবং ঐতিহাসিক ডক্টব সুবেন্দ্রনাথ সেন মহাশযকে অবিশ্বাস না কবলে কুচবিহাব, মণিপুব, আসাম ও কাছাড এবং ভুটানে স্বমহিমায প্রতিষ্ঠা লাভ কবেছিল। ভুটান, কুচবিহাব, আসাম, মণিপুব ও কাছাডেব নবপতিগণ এই ভাষাতেই পবস্পবেব সঙ্গে ও ইংবেজ সবকাবেব সঙ্গে পত্রালাপ কবতেন।

এখানে এসে আমাদেব মনে পডছে, প্রাচীন বাংলা ভাষাব প্রাচীনতব পদ্যেব নিদর্শনও পাওযা গিযেছে উত্তবাঞ্চলেই—নেপালে। নেপালি বাঙ্গলা নাটকেব কথাও স্মবণীয। অবশ্যই কিছু মিসিং লিঙ্ক আছে। কিন্তু চৌদ্দদোঁহা পদগুলো দক্ষিণে বচিত হযে উত্তবে সংগ্রহশালায স্থান পেযেছিল, এই চিন্তা কবাব চাইতে ববং সেগুলি উত্তবাঞ্চলে কিম্বা উত্তবপূর্ব ভাবতেব এই অঞ্চলে (যাব প্রায মাঝখানে কোচবিহাবেব অবস্থিতি) বচিত হযেছিল বলেই এদিকেই তাঁব খোঁজ পাওযা গিযেছে এবকম অনুমান কবাব দিকে আগ্রহ হয। বৌদ্ধদোঁহা পদগুলি বচিত হওযাব পবে ভাষাকে বেফ্রিজাবেটবে বাখা হযেছিল এমন হয না। অনুমান কবি, সেই ভাষাব স্রোতস্বিনীব বিশেষ একটি তলে 'বাহে' ভাষাব সৃষ্টি। এই প্রাচীন বাংলা ভাষা—এক সমযে বিহাব নৃপতি ও তাদেব বংশধবা যাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—যে কোন সমযেই অনুচ্চাবিত ও অব্যবহৃত ছিল মনে কবা যায না।

কোচবিহাবেব বাজপবিবাবেব পৃষ্ঠপোষকতাব প্রতীক্ষায ভাষাব বেলায যেমন শূন্যতা বিবাজ কবেনি, সংস্কৃতিব বেলাতেও তাই। এবকম অনুমান কবা অসঙ্গত হবে মনে কবি যে, কোচবিহাব বাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওযাব পব বিজযী কোচজাতি ক্রমশ বিজিত হিন্দুদেব সংস্পর্শে এসে তাদেব সংস্কৃতি গ্রহণ কবেছিল। এবং তা গ্রহণ কবা সত্ত্বেও নিজেদেব সংস্কৃতিব কিছু কিছু আমাদেব গবেষণাব সুবিধায অবিকৃত বেখে দিযেছিল। অথচ এ বকম অনুমান যে পণ্ডিতগণও কবে থাকেন, তাব প্রমাণ পাওযা যাব যখন দেখি তাঁব 'বাহে' ভাষাব নিদর্শনেব জন্য এদেশেব দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলোব সন্ধান না কবে গ্রাম্য অশ্লীলতাব অনুসন্ধান কবেন, মহাবাজ হবেন্দ্রনাবাযণেব লেখা গানগুলোব

খোঁজ না নিয়ে, আধুনিক অকবিব লেখা গ্রাম্যতাকে—এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হিসাবে সংগ্রহ করেন, এ অঞ্চলের সংস্কৃতি কী ছিল তা জানতে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ান—যেন লোকাচারকেই সংস্কৃতি বলা যাবে।

সংস্কৃতির বেলায় বরং এটা অনুমান কবহে সঙ্গত হবে কোচজাতি বিজয়ী হওয়ার পরে ক্রমশঃ সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি, বরং হিন্দু সংস্কৃতির বীজ কোচ জাতির গর্ভে নিষিক্ত হওয়ার ফলেই দিগ্বিজয়ী এই শক্তিকে সৃষ্টি কবেছিল। দিগ্বিজয়ী বণশক্তি যেমন নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহ দেখাতে পারে, নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতি তেমন একটা জাতিকে দিগ্বিজয়ের প্রেরণা দিতে পারে। আমার তো মনে হয় কোচানি হীরার শিবের প্রসাদে দিগ্বিজয়ী সন্তান লাভের এটাই প্রকৃত অর্থ।

কোচবিহারের ভাষায় সুতরাং প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাবে এবং এ অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি থেকে অপৃথক। বরং অনুমান হয়, প্রাচীন বাংলা ভাষা কী রকম ছিল, তা জানতে আমাদের কোচবিহারের ভাষাকেই জানতে হবে, এবং হয়তো এরকম অনুমান করা অযুক্তিক হবে না যে, সারা বাংলা যখন পাঠান বা মোগল ও ভুঁইযাদের লড়াই নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাংলাদেশে হিন্দু সংস্কৃতি কী অবস্থায় ছিল তার অনুসন্ধান এই একটি রাজসভাতেই করতে হবে। এই প্রসঙ্গ আমাদেব বোধ হয় মনে বাখা উচিত, এখন আমরা যাকে বাংলা ভাষা বলি ও সংস্কৃতি বলে জানি, তা যতটা প্রাচীনের অনুবর্তন, তাব চাইতে বেশী বিদেশাগত—এক কথায তাকে কলকাত্তাই বলা চলে, তা ভালো কি মন্দ সে কথা স্বতন্ত্র।

প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় (সপ্তম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা) বাংলা দেশের একাংশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে দুটি আলোচনা পড়ার সুযোগ পেলেম। বলতে চাইছি—'বাবুহে এ গোট তোমাব কর্তব্য উচিত হয়, যেমত সত্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে, আরু তোমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক, আমবা সে উদ্যোগতে আছি, না কর তাক আপনে জান।'

এখানে কিন্তু অসুবিধা এই, আমদের এ সম্বোধন এবং সম্ভাষণ 'সভাত বলিবার উচিত ন হয়' মনে হতে পারে। কারণ ইংরেজরা যে লীলা-কালচার[১] ও গড়ী ভাষা[২] গড়ে তুলতে সাহায্য কবেছিল, তাতে বাংলাদেশের সম্বোধন ও ভাষণ রীতিতে অনেক রদবদল হয়েছে। রংপুর কোচবিহাবের গ্রামে বাহে বলে সম্বর্ধিত হওযাব অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তিনি বলতে পাববেন আনুনাসিকযুক্ত ক্রিযাপদ ব্যবহাব কবেও তাঁকে আজগুবী আপনি[৩] না বলে তুমি বলা হযেছে। এ সম্বোধন সম্মানসূচক এবং এ ভাষা ব্যাকরণহীনতা নয় তা জানতুম, কারণ আরও উত্তবে তাঁরা যখন জানলেন, উপাধি যাই বলুক বংশটা ব্রাহ্মণেবই বটে তাঁবা আমাকে বা-জে বলে সম্বোধন করেছিলেন। রংপুর থেকে শুরু করে নেপালে সম্মানিতকে বাহে, বাজে, বলার রীতি এখনও আছে। অথচ কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি—এ অঞ্চলকে বাহে দেশ ব'লে আমরা, লীলার বংশধরা, কত না বিদ্রুপ করলুম মনে করি। ওটা বুমেরাং তা বুঝি না, যেহেতু, বাজনৈতিক মতবাদের মধ্যেই মত্ততার কারণ থাকে। ভাবুন একবার, ফরাসিদের মঁসিয়ে ব'লে কেউ যদি মনে কবে জাঁদবেল ঠাট্টা করেছি। অন্যদিকে ১৯২৫এ আমাদেব মতো অনেক পরিবাবে রবিবাবুর গান করা হত। (অভ্যাস সহজে যায় না, ১৯৬১র শালবন চুবমার কবা তুলকালামের মধ্যেও, এবং এখনও কোনো কোনো সভাতে মুখ ফসকে রবিবাবুই বেরিয়ে যায়)। এখন আমরা বাবু বলি না, দাদু বলি। (আমার এই দাদামো এখনও সয় না, মগজে কিছু চিরচির কবে ওঠে। তা কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার)। এখানে দেখতে হবে পরবর্তীকালের কোনো ঐতিহাসিক, আমাদের এই বাংলা দেশ ও ভাষাকে দাদুদের দেশ ও ভাষা বলে, বাংলা দেশে ও ভাষায় মারাঠী প্রভাব প্রমাণ করবেন কি না, কারণ সে অঞ্চলে কাকা কালেলকব ইত্যাদি বলার রেওয়াজ আছে। আমার তো মনে হয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বিভ্রান্তিপূর্ণ হওয়ার একটা কারণ এখানেই আছে। আশ্চর্য কি, যে ডক্টর অরুণকুমাব মুখোপাধ্যায মশায় প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তার আগে যা নিয়ে প্রশ্ন তাকেই চেনা যাক।

যারা বাহে বলে সম্বোধন করে তারা বাঙালি কি না এবং তারা যে ভাবা বলে, তাও বাংলারই কথারূপ কি না—প্রশ্নটা এই। এক সহজ উত্তর এই হবে তারা উত্তর বঙ্গের বাঙালি কাবণ কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই তারা শাসিত। কিন্তু তাদের ভাষা? না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনুমান করছি উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটির অনৈক্যমতের কারণ এখানেই—বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা বলতে কী

---

১ লীলা জোব চার্নকের স্ত্রী এবং কলকাতা ও চার্নকসন্তানদের গার্ডিয়ান সেন্ট।

২ গড। ফোর্ট উইলিয়াম

৩ 'আপনি' কোথায় পেলেম? তা কি প্রথম পুরুষ? সংস্কৃত স্বযমের অর্থে পিতৃবাচক (আপা বাপা পাপা) শব্দে উদু 'নে' প্রত্যয়েব সংযোগ মাত্র? আপনি>আপানে।

বুঝতে হবে, কারাই বা বাঙালি, এ প্রশ্নের সমাধান নেই। বন্দোমানী, শিলোট্যা, মালদৈয়া, হালার ডাকাই যদি বাঙালি হয়, তবে বাহেরাও বাঙালি হবে কি? পণ্ডিতগণ জানেন, বঙ্গ বগধা, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে, এমন কি সুবে বাংলায় বাংলা দেশের আভাস থাকলেও, সদাশয় ইংরেজরাই যেন প্রথম ম্যাপে এবং তা থেকে মাটিতে বাংলাদেশকে একটা চেহারা দিয়েছিলেন। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলেছেন, (পৃষ্ঠা ১৮১) 'তখন আজকের বাংলাদেশ কোথায়?' লাট/রাঢ় ছিল, গৌড় ছিল, কামতা কামযো ছিল।' এখনই বা বাংলাদেশ কি? ইংরেজরা গত হতেই বাংলাদশেও লোপ পেল?

এ সব নামের পিছনে আমাদের কী প্রত্যয় আছে দেখলে মন্দ হয় না। যে দেশে বাঙালি বাস করে তাই বাংলাদেশ? অথবা যার বাংলাদেশে বাস করে তারা বাঙালি? বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারাই কি বাঙালি অথবা বাঙালিদের ভাষাই বাংলা। উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক, সেকালের বীরভূম (বর্তমানেও), সেকালের গৌড় (বর্তমান মালদহ যার অন্তর্ভুক্ত) বাংলাদেশ কি? সেখানকার ভাষাকে বাংলা ভাষা বলা হবে কি? বীরভূম এবং পাবনা জেলা কি একই সঙ্গে বাংলা এবং প্রমথ চৌধুরী ও তারাশঙ্কর কি উভয়েই বাঙালি লেখক? ভারতে গেলে ধোঁয়াটে ঠেকে। কিন্তু এখানে মনটাকে শানানো চাই কারণ বন্দ্যোপাধ্যায়মশায় কথিত কামরূপ এবং কামরূপী ভাষাকে চিনতে তা দরকার হবে।

কোন দেশ কামরূপ, কোনটিই বা কামতা? প্রাগৈতিহাসিক প্রাগজ্যোতিষ যদি জ্যোতিষ দেশেরও (বর্তমান দিনাজপুরের?) পূর্বের দেশের সাধারণ নাম না হয় তবে তার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। হয়তো বা বিষ্ণুপুত্র নরক এদেশে রাজত্ব করতেন। কিন্তু কামরূপ তেমন নয়। পুরাণাদি মতে তার এক ভৌগোলিক সীমা আছে। একটা বিরাট ত্রিভুজ কল্পনা করা যেতে পারে যার এক বাহু সাদিয়া থেকে ত্রিহুত পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ, দ্বিতীয় বাহু করতোয়া নদী, তৃতীয় বাহু চলনবিলের কাছে থেকে উঠে ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, কাছার ঘিরে মণিপুরকে বাইরে ফেলে সাদিয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। তখন কোথায় আসাম, কোথায় বা বাংলা দেশ? কামরূপের এই বর্ণনা বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ও উল্লেখ করেছেন, (আশা করি দিকবাসিনী অথবা ডিক্রাই নদী এবং দিক্কুনদীর অবস্থান তাঁর অজ্ঞাত নয়)। কিন্তু নাগাভূমি ও বর্তমানে আসামের উত্তরপূর্বের জেলাগুলিতে কি ভাস্কর বর্মা, পাল ও সেন রাজারা রাজত্ব করতেন? অথবা সে এক অন্য কামরূপ যেখানে পাল ও সেন বংশের প্রভাব ছিল? অনুমান করি, যে কামরূপ পুরানের কামরূপের মতো [illegible] বড় নয়। উত্তর বাংলাকে করতোয়া নদী লম্বালম্বি প্রায় দুভাগে ভাগ করতো, সুতরাং এই কামরূপে উত্তর-বাংলার পূর্বের আধখানা ছিল, অন্যদিকে যাকে নিয়ে কামরূপ কামতা নাম সেই কামরূপী কামদা কামাখ্যার পীঠ এই কামরূপে থাকাই স্বাভাবিক। ম্যাপ দেখুন, এই ছোট কামরূপের সীমাটা তা হলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার নীচু সমতল ভূমি এবং গোয়ালপাড়া, রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই মোটামুটি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কোথায় এই কামরূপের রাজধানী ছিল যখন পালবংশীয় রাজারা শাসন করতেন? আমি জানি না। তাঁদের সময়ে কী ভাষা ছিল এ অঞ্চলের? পালরাজাদের রাজধানী কি করতোয়ার পশ্চিম পারে ছিল? তাঁদের রাজ্যের বিস্তার কী করতোয়ার উভয় তীরেই ছিল না? এ রকম কোনো প্রমাণই পাচ্ছি না যে করতোয়াকে বৈতরণী বলা যাবে যাতে তার পূর্ব-পশ্চিমপার একই রাজবংশের অধীনে [illegible] ইহলোক পরলোকের মতো পৃথক হবে। কী ভাষা ছিল করতোয়ার পশ্চিম পারে? তা কি [illegible] অবহট্‌ঠ [illegible] হলে করতোয়ার পূর্বপারে কি সে ভাষাই ছিল না? আরও পূর্বে [illegible] প্রভাব পড়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু উত্তরবঙ্গে, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, [illegible] কামরূপী ভাষা করতোয়ার পশ্চিমপারের ভাষা থেকে অভিন্ন

তাব আগে, পালবাজাদেব আগে, কী ছিল সে সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায মশায অনেক মূল্যবান ইঙ্গিত কবেছেন, কিন্তু যা নিযে তাঁব আলোচনা ও মুখোপাধ্যায মশাযেব দাবিব তুলনায সে ইঙ্গিতগুলি একটু ব্যাপক হযে পডেছে। বৌদ্ধ গান ও দোঁহাব পব থেকেই 'মিসিংলিঙ্ক' খুঁজতে চেযেছেন মুখোপাধ্যায। অনুমান কবি বৌদ্ধ গান ও দোঁহাব বচনাকাল পাল বাজত্বেই পডছে। বৌদ্ধ গান ও দোঁহাব চাইতে পুবনো যদি কিছু থাকে বাংলাভাষাব তা আপাতত আলোচনা বাইবে বাখা যায। কোথায বচিত হযেছিল দোঁহাগুলি? অনেক বকমেব অনুমান কবা যায, তাব মধ্যে একটি এই প্রাপ্তিস্থানেব কাছাকাছি জন্ম। নেপালেব যত কাছে উত্তববঙ্গ, কামৰূপ, প্রাঙ্মগধ, তত কাছে নয বাঢ ও পূর্ববঙ্গ।

পালবংশ কামৰূপ থেকে মুছে যাওযাব পব কী হযেছিল সেখানে? অহমবা বাজত্ব কবেছিল কি? কাবা এই অহম, বা আসামী? এখানে একটা কৌতুকেব কথা মনে পডলো। বন্দ্যোপাধ্যায মশায ববিনসন ও গেইট উল্লেখ কবেছেন (পৃষ্ঠা ১৮৩) যেন আসাম unequalled না unrivalled অথবা peerless। অনুৰূপভাবে অন্য কেউ টম্ ডিক ও হ্যাবি undulatedই বা বলবে না কেন? অনেক পাহাড বযেছে তো আসামে এবং সমতল ভূমি। মনে পডছে যখন বিধানচন্দ্র বায মশায বাংলা বিহাব সংযুক্তিব প্রযাস কবেছিলেন তখন এক বিহাবী ভদ্রলোক কোচবিহাব জেলাকে বিহাবেব জন্য দাবি কবতেন। যুক্তি এই ছিল ঃ নামেই প্রমাণ, কুচবিহাব মানে কুছ (কিছু) বিহাব। কযেকবাব শোনাব পব একদা আমাব এক ব্রাহ্মণ বন্ধু শিখা নেডে তাকে বলেছিল—অবে মুর্খ, এ কি তাই? এ দেশ কামৰূপী কামদাব, কুচাভ্যাং বিহর্বতি যত্র ইতি। অহম একটি নবগোষ্ঠীব নাম। এবং মুখোপাধ্যায মশায যে কালেব কথা বলছেন কোথায তখন তাবা কামৰূপে? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দেব দ্বিতীয দশকেব মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ কোচবাজ্যেব পূর্বাংশেব বাজা পবীক্ষিৎনাবাযণেব আত্মসমর্পণেব আগে সীমায সীমায অহমবা লুটপাট যুদ্ধ কবলেও কামৰূপ কোচদেব শাসনেই ছিল। একদিকে অহম অন্যদিকে কামতাব কোচ —ফলে কামৰূপেব উত্তবপূর্ব এবং পূর্বসীমান্ত কখনও বেডেছে কখনও কমেছে।

বন্দ্যোপাধ্যায মশায শ্রীযুক্ত চাৰুচন্দ্র সান্যালকে উপস্থিত কবেছেন। সান্যালমশায বলছেন— Ahoms occupied the eastern zone' প্রশ্ন এই B.. when? সান্যাল পবেব বাক্যেই বলছেন— 'The Kochs became masters of the Western zone' যেন খালি বাজ্য পডেছিল অহম এবং কোচেবা এসে কামৰূপেব পূর্ব ও পশ্চিম মণ্ডলে বাজা হযে বসলো। সানালমশায বলছেন—'The Coch tribe defeated the Khens'–কাবা এই খেন? কোথা থেকে এল, কোথায বা গেল? অহোম ভাষায (অসমীয়ায়) খুন বা খেন বলে শব্দ আছে যাব অর্থ বাজা, বৃহৎ, উত্তব ইত্যাদি। অহোম বুৰুঞ্জীতে খুন কামতা, খুন-কামতেশবেব উল্লেখ আছে শুনেছি, এ থেকেই কি বুকানন হ্যামিল্টন বিশ্বসিংহেব পূর্ববর্তী কামতা বাজকে খেন বাজা বলেছেন?

কিন্তু এগুলো বাজনৈতিক ইতিহাসেব বিষয়। মুখোপাধ্যায় মশায যে সময়েব কথা বলছেন তখন কামৰূপ নামেব পাশেই কামতা শোনা আছে। কখনও তা কামৰূপেব সমসংজ্ঞক, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী। একটু নজব কবলেই বুঝতে পাবা যাবে, হুশেন শা কামতা বাজ্য দখল কবলেও, সে বাজবংশেব দুর্লভচন্দ্র আবও পূর্বদিকে সবে গিযে বাজত্ব কবাব চেষ্টা কবেছিল। তাব পব কোচবাজা বিশ্বসিংহেব সমযে দুর্লভচন্দ্র ও হুসেন শাহেব প্রভাব কামতা বাজ্য থেকে মুছে যায। মহাবাজা নবনাবাযণেব বাজত্বের সমযেই কামৰূপেব কোচ-আধিপত্য দুটি বাজ্যে ভাগ হয, পশ্চিমভাগেব নাম কামতা, বেহাব, পূর্বভাগেব নাম কখনও কামৰূপ কখনও কোচহাজো। তখন অহমবা কামৰূপ ছিল কি? সে যাই হোক, হুসেন শাহেব সমসাময়িক কবতোযাব পশ্চিমপাবেব গৌডেব ভাষা কী ছিল? কবতোযাব পূর্বপাবেব বাজ্য কামতাব (সতা নীলধ্বজ, দুর্লভচন্দ্র অ‍ ব বিশ্বসিংহ যাবই হোক)

ভাষাই বা কী ছিল? মাগধী প্রাকৃতের অবহট্‌ঠ অবস্থা থেকে তা হয়তো বিবর্তিত, তা কি কোচভাষা কিংবা খেনভাষা অথবা অহোম প্রভাবিত কামরূপী? করতোয়ার এপাবে গৌড়ী বাংলা, ওপারে তখন কামরূপী চলছে এমন ভাবটা সম্ভবত লজিক নয়। পোল পার হয়ে কলকাতা আর হাওড়ার মুখের ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু লেখার ভাষা কি অত সহজসাধ্য যে নদীর এপারে ওপারে পৃথক হবে? হতে পারে, যদি বিদেশী রাজাদের কড়া প্রভাবে পড়ে বিদেশী শব্দসম্ভার গ্রহণ করে। কোচরা কি বিদেশী? কোথায় তাদের বিদেশী ভাষাব শব্দ নরনাবায়ণের সময়ে লেখা এ অঞ্চলের সাহিত্যে! অথবা তেমন বিদেশী কি অহোম? অহোমদের লিখ্য ভাষা বলতে কী ছিল, তা আমার জানা নেই। মুখেব ভাষা কী রকমের ছিল, তাদেব নাম থেকে কি সে ভাষার জাত ধরা যায়? নদনদীর নাম—নামডাও ফি, নাম্ তিলাউ, বাজার নাম চুকা ফা, সুখাংফা, সুক্রাম ফা, বাজপুরুদের নাম তা ফিখেন, চাও পুলাই, শেংডাং, খাম্‌শেং, লাংলাউ। এ থেকে সহজেই বলা যায় থাই অহমদের ভাষা মোঙ্গলযেড ছিল, আসামী ভাষার মতো সংস্কৃত গোষ্ঠীব নয়। অহোমরা আসবার আগে কামরূপে বোড়ো গোষ্ঠীর ভাষা ছিল। কোচরা কামতা উত্তববঙ্গে স্থিত হওয়ার আগে হয়তো বোড়োগোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহার করতো, কিন্তু রাজত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্রহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতগোষ্ঠীব ভাষা গ্রহণ করে থাকবে। এদিকে অহোমবা যখনই লিখল, তখন করতোয়াব পারঘোঁ কামতার ব্যবহৃত ভাষাকেই গ্রহণ কবেছে দেখা যাচ্ছে। এবং এখন পর্যন্ত কামতার বাজসভায় লিখিত সাহিত্যই অসমীয়া ভাষাব ক্লাসিক।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তা থেকে এই এবকম ধারণা করা যায়—পাল রাজবংশেব সভায় যেমন করতোয়ার এপাবে ওপারে ভাষা এক থাকা স্বাভাবিক, খেন রাজবংশ এবং কোচরাজবংশেব প্রভাবকালেও তেমন করতোয়ার দুপারে একই ভাষা থাকা স্বাভাবিক। রাজা বদলালেই ভাষা বদলায় না। দ্বিতীয় যা কামতার[৪] ভাষা ব্রহ্মপুত্রের দুপার ধরে অনেক দূব পর্যন্ত সেটাই এ অঞ্চলের ভাষা ছিল, তাকে কামরূপী উপভাষাই বলা হোক কিংবা কামতা উপভাষাই বলা হোক। এ ভাষার অহোম গোষ্ঠীর প্রভাব অন্তত মহারাজ নবনাবাযণ, লক্ষ্মীনারাযণ, প্রাণনারায়ণের সমযে পড়ে নি। বোধ হয় আমাদের লক্ষ্য করা উচিত ভাষাব প্রবাহ অব্যাহত থাকে—এটাই স্বাভাবিক। করতোয়ার দুপাবেব ভাষা প্রায় একই থেকে পাল রাজবংশেরা সময় থেকে প্রবাহিত হতে হতে কামতার ভাষায় পরিণত হয়ে থাকবে। এখনই এই ভাষাকে করতোয়ার পশ্চিম বাংলা এবং পূর্বে কামরূপী উপভাষা বললেও বলা যায়, তাতে ভাষাটা বদলায় না।

কিন্তু করতোয়ার পূর্বে কামতার এ ভাষাকেই কী বলা হয় প্রকৃতপক্ষে? একখানা চিঠি পাওয়া গিয়েছে ১৫৫৫ (১৪৭৭ শকে) আষাঢ় মাসে লেখা। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল কামতার রাজদরবাবে, প্রাপক অহোমরাজ। এই চিঠিখানিকে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে। এতে এটুকু অন্তত প্রমাণ হয় পণ্ডিতজন কামতা বাজসভার এই ভাষাকে কামরূপী উপভাষা মনে করেন না। এবং সম্ভবত আমার এবং প্রমথ চৌধুবী মশায়ের বারেন্দ্র পূর্বপুরুষ করতোয়ার পশ্চিম পারে এই রকমের ভাষাতেই জোতজমার হামলা হুজ্জুতি সম্বন্ধে পত্রালাপ করতেন এবং স্বীয় ব্রাহ্মণীকে প্রেমপত্র পাঠিয়ে থাকবেন। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করি। 'কোচবিহারের

---

৪ কামতাব ভাষা ও বাষ্ট্রের Centre of gravity ছিল বাংলা দেশেই। হুশেন শা যে কামতা-বাজধানী ১২ বছরেব চেষ্টায় জয় কবেন তা যদি আসামের ধুবড়ির কাছে না হয়ে থাকে তবে কোচবিহার জেলার গোসানিমারিতে হতে পারে। আমি নিশ্চিত নই। বিশ্বসিংহের রাজধানী ছিল মণ্ডলাবাস।—হিঙ্গুলাবাসে যা উত্তরবঙ্গেই। এখানে আবও লক্ষণীয় ধুবড়ি সমতে গোয়ালপাড়া জেলা উনবিংশ খৃষ্ট শতকেও রংপুব জেলার অঙ্গ হিসাবে বাংলারই অংশ ছিল।

ইতিহাস'-এ আর একখানি পত্র ছাপানো আছে। প্রথম চিঠির প্রায় একবছর পরে আষাঢ় মাসেই লেখা। এটি ঐতিহাসিক পত্রখানির উত্তর, লেখক এবার অহোমরাজ। যদি এটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসে প্রমাণ হবে কামতার ভাষা যাকে পণ্ডিতগণ প্রাচীনতম বাংলা গদ্য বলেছেন অহমরাজও সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন। এখানিকে তখন দ্বিতীয় প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নজির বলতে হবে। কামরূপে অহোমরাজার প্রভাব কতখানি ছিল কিংবা ছিল না সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত থেকেও বলা যায় করতোয়া-ঘেরা কামতা ভাষা যা প্রাচীন বাংলাও বটে অহোম রাজদরবারের ব্যবহারিক ভাষা ছিল। রাজকীয় ভাষা নিশ্চয়ই বিদগ্ধজনের ভাষাও বটে। এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত হবে না ১৫৫৫/৫৬ খৃষ্টাব্দে কী কামতা, কী অহোমরাজ্যে বিদগ্ধজনের এবং রাজদরবারের ভাষা ছিল প্রাচীন বাংলা। তখন কামরূপী উপভাষা কোথায় ছিল?

মুখোপাধ্যায় মশায়ের এটাই প্রশ্ন, যদি আমি তাঁকে বুঝে থাকি, পাল রাজাদের আমলে করতোয়ার পশ্চিম পারের ভাষা যদি বাংলা থেকে থাকে (হয়তো বৌদ্ধ গান ও দোঁহা যার নজির), করতোযার পূর্বপারের ভাষা যা ১৫৫৫/৫৬ খৃষ্টাব্দেও প্রাচীন বাংলা, তা পাল রাজাদের পর থেকে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, কোন ভাষা ছিল? এই 'লিঙ্কটাই তো মিসিং' তা খুঁজতে হবে কামতায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় কয়েকটা খুবই মূল্যবান কথা বলেছেন। বলেছেন তিনি—'বহুস্থলে উদ্ধৃত ভাব ও ভাষা সমানভাবেই বাংলা ও অসমীয়া দাবি করতে পারে।' (পৃষ্ঠা ১৭৯ ১৮০) অন্যত্র বলেছেন—'কামরূপ কামতা ও উত্তরবঙ্গ প্রায় এক ছিল।' (পৃষ্ঠা ১৮২) নিঃসংশয়ে সত্য। জয়দেব বিদ্যাপতি ইত্যাদি কবিগণকেও বাংলাদেশ অন্যান্যদের সঙ্গে সমানভাবে দাবি করতে পারে, করেও। কিন্তু বিচিত্র এই, অনন্ত কন্দলী, পীতাম্বর, শঙ্করদেব, মাধবদেবকে অসমীয়ারা দাবি করে, বাংলা করে না। এটাই মুখোপাধ্যায় মশায়কে নতুন করে বিস্মিত করেছে।

ডিম্বেশ্বর নিওগ (বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বৃত) বলছেন—'বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন, আরু গোপীচন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বুলি ধরিছো:' এবং এগুলি কি রকম? না, 'বাংলা সাহিত্যের তিতরূপ বুলি ধরা।' জেনে শুনেই বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত বলে ধরা বৌদ্ধ গান দোঁহা ইত্যাদিকে তিনি অসমীয়া সাহিত্যের ভিতরে ধরেছেন। কিন্তু কেন? এই জন্য যে বুদ্ধিমান সাহিত্য-ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন বৌদ্ধ গান দোঁহা, কৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি যে ভাষায় লিখিত পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের 'দেশভাষা বন্দ' অথবা শঙ্করদেবের ভাষা, বিবর্তন সত্ত্বেও তা থেকে ভিন্ন নয়। অসমীয়া ভাষায় বৌদ্ধ গান দোঁহা দরকার, নতুবা শঙ্করদেব আকাশ থেকে পড়বেন? আমরা বাঙালিরা অন্য রকম বুঝে থাকি। একদিকে মহারাজ নরনারায়ণের রাজদরবারে লেখা গদ্যকে বাংলা গদ্য বলি, বৌদ্ধ গান ও দোঁহাকে প্রাচীন বাংলা বলি, আর কামতা রাজদরবারে লেখা পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের লেখাকে বাংলা বলতে সংকোচ বোধ করি? এটা একটু অদ্ভুত রকমের লজিক নয়? বৌদ্ধ গান ও দোঁহাকে, কৃষ্ণকীর্তনকে তো অসমীয়া ভাষার সাহিত্যের তালিকায় ধরা হয়েছে, সেখানেও তো আমাদের দাবি গুটিয়ে নিই না। কামতা রাজদরবারে এবং তার আওতার লেখা পয়ারের উপর থেকে দাবি তুলে নেয়ার কারণ কী থাকছে?

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর আলোচনায় বলেছেন—'তখন আজকের বাংলা দেশ কোথায়?' এমন সত্য কথা আর নেই। তাঁর এ মতকে গোড়াতেই সমর্থন করেছি। ইংরেজ ম্যাপ আঁকার আগে বাংলাদেশ কোথায়? তমলুক, রাঢ়, গৌড়, বাকলা, চাটিগাঁ এসব বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই নয়, যেমন নয় কামতা, তখন প্রশ্ন হবে তা হলে বাঙালি কে? তার ভাষাই বা কোনটি? শুধু নদেবাসী? নদেতে কিছু কিছু বই লেখা হয়েছে বটে, তার অনেকখানি কিন্তু ব্রজবুলিতে। সে ব্রজবুলিকে কি এজন্যই বাংলা বলা হবে, যে তা বাংলাদেশে বসে লেখা?

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় কামরূপ, কামতা, উত্তরবঙ্গকে একই culture belt এ দেখেছেন। এ বিষয়ে

তাঁকে সমর্থন করতেই হবে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এটা কি পৃথক culture belt, বাংলার সংস্কৃতি থেকে পৃথক? ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা যাক, রাঢ়ের সংস্কৃতিও কি তেমনি পৃথক কিছু নয়? নাকি সেটাই বাংলা সংস্কৃতি? বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় উভয়েই রাঢ়ী ; আমি অবশ্য, উপাধি অন্য রকম বললেও, বারেন্দ্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের; আমরা কি শুধু তাই-ই, না সংস্কৃতিতে বাঙালিও বটে? অথবা এই কি সত্য যে ইংরেজ রাঢ়, বরেন্দ্র, পূর্ববঙ্গকে একঘাটে জল খাওয়ানোর আগে, বাঙালির সংস্কৃতির কিছু ছিল না। রাঢ়ী 'কালচার' ছিল, উত্তরবঙ্গ কামতা 'কালচার' ছিল। লজিক এই যে, হয় রাঢ়ের 'কালচার' এবং উত্তরবঙ্গ-কামতা 'কালচার' (মুখোপাধ্যায় কথিত 'নরনারায়ণী 'কালচার' যার অন্তর্ভুক্ত) একই সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতি, নতুবা দুটোর একটাও তা নয়, নতুবা যেমন গোড়ায় বলেছি, লীলা 'কালচার' বলে একমাত্র কিছু আছে, যার কেন্দ্র কলকাতা। মাঝে মাঝে এটাই সত্য মনে হয়, বাংলা 'কালচার' এমন সংস্কৃতি, যা অবস্থা-বৈগুণ্যে ক্রমাগত বিদেশী মতবাদের-সন্তান ধারণ করে চলেছে।

বস্তুত আমার নিজের ধারণা এমন নয়। রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র মিলে যেমন বাঙালি, রাঢ়ী ও কামতা ও বারেন্দ্র 'কালচার' মিলেই বাংলা 'কালচার'। লীলা 'কালচার' অন্য কথায় কলকাতা-বিচ্ছুরিত সংস্কৃতি, একটা উটকো ব্যাপার হয়তো। ইংরেজরা বিশ-বাইশ বছর হল গিয়েছে, এখনও সুস্থ কিংবা আত্মস্থ হতে পারছে না বাংলা সংস্কৃতি, তাই এটা ধরা পড়ছে না। অনুরূপ ভাবে বলতে পারা যায়, ভাষার ব্যাপারেও যদি আমরা ফোর্ট উইলিয়ামের চাইতে পুরনো কিছু খুঁজি, তবে যে লজিকে রাঢ়ী কৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা বলবো, পূর্ববঙ্গ গীতিকাকে বাংলা বলবো, ব্রজবুলিকে বাংলা বলবো, সেই লজিকেই কামতার রচিত পয়ারকেও বাংলা বলবো; এ বিষয়ে আরও যুক্তি এই কামতার গদ্যকে আমরা গদ্য বলে ফেলেছি।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় সুনীতিবাবুর মত উদ্ধৃত করে বলেছেন—'আসামের স্বাধীন নরপতিদের শাসনছায়ায় অসমীয়া ভাষা একটি স্বাধীন ভাষায় পরিণত হয় যদিও তার স্বগোত্রা উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষা ক্রমশ লিখিত ও সাহিত্যিক বঙ্গভাষার বশ্যতা স্বীকার করেছিল।' সুনীতিবাবুর এমত ঠিক কোন Contex-এ কোথায় বলা হয়েছে, তা মনে করতে না পেরে আমি দুঃখিত। কিন্তু এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে—(১) স্বাধীন রাজা শুধু আসামে ছিল না, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরেও কামতায় অর্থাৎ বেহারে স্বাধীন রাজা ছিল (২) উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষা বলতে যদি রংপুর কোচবিহার জলপাইগুড়ির কথ্যভাষা ধরা যায় তবে শহরের বাইরে এখনও তা লিখিত আধুনিক বাংলার প্রভাব এড়িয়ে চলেছে, শহরে প্রভাবিত হয়েছে তার কারণ শহরগুলিতে যারাই কেউ তারা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির রাজত্ব থেকে এসেছিল। (৩) অসমীয়া ভাষা স্বাধীন সত্তা কবে পেয়েছিল? আমার তো মনে হয় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর ঠিক না করে নিলে, সুনীতিবাবুর মতকে ঠিক বুঝতে পারছি না। ষোড়শ খৃষ্ট শতকে, বিশেষ করে নরনারায়ণের রাজত্বকালে, কামতার রাজভাষার অতিরিক্ত অসমীয়া ভাষা ছিল কি? থাকলে অসমীয়া ঐতিহাসিকগণ নরনারায়ণের রাজত্বকালকে সাহিত্যের এলিজাবেথীয় স্বর্ণযুগের সঙ্গে তুলনা দেবে কেন? এখানে আবার সেই প্রশ্নটাতেই ফিরে আসতে হবে সুনীতিবাবু যদি উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষার কথাই বলে থাকেন, কামতার রাজদরবারের ভাষা কি লিখিত ভাষা নয়, অথবা তা লিখিত ভাষা হলেও, উত্তরবঙ্গীয় নয়? তবে তার সে চিঠিখানাকে বাংলা গদ্য বলা কেন?

এখানে আবার আমরা ইতিহাসের প্রশ্নে আসছি যা মুখোপাধ্যায় মশায় তুলেছেন। মুখোপাধ্যায় মশায় বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি খুব একটা ইতিহাস লিখেছি যে, নরনারয়ণ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পাবেন? আমরা যখন ইতিহাস লিখতে শুরু করি তখন আমাদের এক কুড়ুল শানানো দরকার ছিল। কারণ সময়টা ছিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের বীজ বোনা। আমরা তেমন ইতিহাস লিখি নি, অথবা লিখতে শিখি নি বলেই ভাষা ও সাহিত্য-ইতিহাসে লজিককে স্থান দিতে পারি না। নতুবা বাঢের কৃষ্ণকীর্তন, ময়মনসিংহগীতিকাকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহসে স্থান দিয়ে, কামতার শঙ্করদেব, অনন্তকন্দলী, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখকে বাইরে রাখা কঠিন হত।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় তাঁর আলোচনার শেষ দিকে ভারি সুন্দর একটি মনোভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। এটা National Integrationএর সহায়ক সন্দেহ কি? রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' থেকে উদ্ধৃতিও লাগা সই হয়েছে। কিন্তু যা বাঙালি এবং অসমীয়া একই সঙ্গে দাবি করতে পারে, বাঙালি তাতে দাবি জানালেই কি মিলন নষ্ট হবে? হয় কি? আমি ভারতীয় বটে, কিন্তু বাংলা অঙ্গরাষ্ট্রের ভোটারও তো। আমার ভোটের অধিকার আমাকে Parochial Patriot করে কি? উপরন্তু, যদি ভুল না বুঝে থাকি, রবীন্দ্রনাথ যে ক্রিয়াপদগুলো ব্যবহার করেছেন তাতে দুটিপক্ষের ইঙ্গিত সব সময়েই রয়েছে মনে করি। দুপক্ষ না থাকলে দেয়া নেয়া হয় না, মিলানো যায় না, মেলা যায় না, দুয়ের একপক্ষ যদি বাঙালি হয় ক্ষতি কী? মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ এমনও বলেছেন —ঐক্য মানে একাকার নয়। অসমীয়া যাতে দাবি জানায়, সেখানে বাঙালিও দাবি জানালেও দোষ কী? বিশেষ করে তা যদি মাত্র কামতারাজ্যের সংস্কৃতি ও ভাষা হয়?

বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের শেষ বাক্যটি অপূর্ব। 'সুতনুকাকে রূপদক্ষরা সব সময়েই নিজের দলে টানতে চায়।' ঠিকই বলেছেন তিনি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ হয়তো বা রূপদক্ষ নয়। সেজন্য শঙ্করদেবের সাহিত্যের আমরা প্রাচীন বাংলা বলে দাবি করি না, এক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে প্রাচীন আসামী বলি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ব্যক্তি সঞ্জয় ভট্টাচার্য গত হয়েছেন। কিন্তু মনের ভিতরে খোঁজ করে দেখলুম যাকে বিধুঃ বলে তেমন কিছু সেখানে নেই, অথচ এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। তাঁকে যে ভালবাসতুম, একেব সামাজিক সৌজন্যেব মুখোস ফেলে মুখোমুখি হতেম—সে সব তা হলে কী? এক চালাকির উ হতে পারে আসলে ভালবাসতে জানি নি। কিন্তু অনুভব করছি ব্যাপারটা হয়তো ঠিক তা ন

অন্য উত্তব হতে পারে ব্যক্তিটিকে না ভালবেসে তাব কীর্তিকলাপকে ভালোবেসেছিলুম—অ সেটিও ঠিক হচ্ছে না।

এই দ্বিধাব মধ্যে থেকে যা মনে আসছে তা এই যে তাঁর ব্যক্তিগত মনটিকে হয় ভালবেসেছিলুম—কীর্তিকলাপ, আলাপচারী, চিঠিপত্রে যে মন আমার কাছে স্থায়ী, অন্য কথ অবিনশ্বর। আমার কাছে অবিনশ্বর—অর্থাৎ যত দিন আমার মন অনুভব করছে, চিন্তা করছে ততা তাঁর মন গত হতে পাবে না। কিন্তু আমাব মন যখন থাকবে না এ অবস্থায়, যেহেতু এই পৃ থেকে মুছে যেতে কেউই চাই না, এরকম আকাঙ্খা হয় আমাব ব্যক্তিগত মন ও তাঁর ব্যক্তি মনকে সংযুক্ত করে সমাজ-মানসের অন্তহীন প্রবাহে বোপণ কবা যায। বলা বাহুল্য, তা সহজ ন এটা আরো কঠিন বোধ হয় এজন্য যে সমাজ-মানস বলতে এখন আব যাকে বাংলা দেশ ব থাকি তাব সমাজ মানস বোঝায় না, কি কবে তা থেকে ইউবোপ আমেবিকাব সমাজ-মানস দেওযা যাবে?

এখন, এই যে সমাজ-মানসেব প্রবাহ যাব গ্রাফ বিভিন্ন দেশেব কলা ও সাহিত্যেব ইতিঃ তাব কোথায সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কতটুকু স্থান দেয়া যাবে? তিনি যে ভাষায় লিখেছেন সে ভ ইংরেজী, ফবাসী, জার্মান, রাশান ভাষাব তুলনায নিত্যন্তই মাইনব, এবং ভাষাতেও তিনি মাই লেখক, মাইনর সম্পাদক। সুতবাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই উপদেশ আসতে পারে অন্ত সমাজ-মানসে তার মনকে বোপণ কবার আকাঙ্খা বর্জ্জন কবাই সুবিধাব হবে। কেন না, মা সমাজের আদি-অন্তকাল প্রবাহিত কলা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাদেশেব সঞ্জয় ভট্টাচার্য না একজন মাইনর লেখকের পক্ষে একটি লাইন আদায় করে নেয়া সম্ভব হবে না।

এ থেকে সমান যুক্তিসিদ্ধ দুটি সিদ্ধান্ত পৌঁছানো যায় মনে করি ঃ প্রথম, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্ব আলোচনা ব্যর্থশ্রম, দ্বিতীয়, যেহেতু সে সব ইতিহাসে তাঁর স্থান নাও হতে পাবে, এখনই ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেওয়ার সময। উদাহবণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমরা যদি মা সম্বন্ধে আগামী পঞ্চাশ বছর একটা কথাও উচ্চারণ না করি, অথবা ডস্টয়েবস্কির সম্বন্ধে সব আলো যদি রুশিরা আইন কবে বন্ধ করে দেয়ও, আবার একসময়ে তাঁদেব নিয়ে আলোচনা হবে; বি একজন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, একজন জীবনানন্দ অথবা একজন কঙ্কাবতী-লেখক সম্বন্ধে আলোচনা ক সময় নষ্ট করা উচিত হয় না, যেহেতু সে সময় একবার হারালে কদাচিৎ ফেরে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে প্রথম কথা কী বলা উচিত, এ নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। আমার এর ধারণা, তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক। কী ছিল সে পরিচ পূর্ব্বাশার সঙ্গে কেউ কেউ কল্লোলের তুলান করেছেন তৎকালীন অভিনবত্বর দিক দিয়ে। স নিজেও ভাবতে ভালবাসতেন কল্লোল কালিকলম প্রগতির পরে উত্তরসাধক হিসেবেই পূর্ব্ব

আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা। বস্তুত পূর্ব্বাশা আদৌ তা ছিল না। কারণ কল্লোলের অভিনবত্ব যা তৎকালীন ভদ্ররুচির নাকে ঘুষি মারা ছাড়া বেশী কিছু নয়, তেমন আধুনিকতা পূর্ব্বাশার অথবা সঞ্জয়ের আকাঙ্ক্ষিত ছিল বলে মনে করা যায় না। কী ছিল পূর্ব্বাশা? সে সময়ের অন্যান্য মাসিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ব্বাশার অবস্থান বুঝতে সুবিধা হয়। তখনকার অন্যান্য মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পরিচয়, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, বসুমতী ও প্রবাসী। প্রবাসী তখন রবীন্দ্রনাথ বিযুক্ত, সুতরাং প্রতিদিন অভিনব হয়ে ওঠার সেই বয়োবৃদ্ধ অভ্যস্ততাও তার নেই। কল্লোলকে ঠেকাতে গিয়ে শনিবারের চিঠি যে রক্ষণশীলতার বর্ম পরেছিল সে বর্ম খোলার কায়দা তার আর মনে নেই। ভারতবর্ষ ও বসুমতী তখনও যেমন এখন, বর্তমানের দেশাদি পত্রিকার মত পাঠকতোষিণী। পরিচয় সুধীন্দ্রনাথের হাতছাড়া হয়ে তখন জনযুদ্ধের উচ্চগ্রামে নিনাদপরায়ণ। একটা অভাব দেখা দিয়েছিল—একটি পত্রিকার যেখানে নতুন লেখা ব্যবসা, রক্ষণশীলতা ও রাজনীতির প্রভাব থেকে পৃথক হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পূর্ব্বাশা এই অভাবটা পূরণ করেছিল।

এ বিষয়ে উদাহরণ নেয়া যেতে পারে। ১৩৫৩র আশ্বিন থেকে ১৩৫৩র চৈত্র এই সাত মাসের পত্রিকা আমার সম্মুখে রয়েছে। কারা লিখেছেন এই সংখ্যা কয়টিতে, কী বা লিখেছেন তাঁরা, তার হিসাব নিলে মন্দ হয় না। এই ছটি সংখ্যায় প্রবন্ধগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্কসীয় দর্শনের উপরে তিনটি প্রবন্ধ (লেখক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), বাংলার রূপরস সাধনার উপরে প্রবন্ধের উপরে ছটি ইনষ্টলমেন্ট (লেখক যামিনীকান্ত সেন), নারায়ণ চৌধুরীর তিনটি প্রবন্ধ, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পাঁচটি প্রবন্ধ যার তিনটির বিষয় অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে নিবন্ধ, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি দার্শনিক নিবন্ধ, প্রবোধচন্দ্র সেনের অশোকস্মৃতি। আমার মনে হয় এতগুলি এমন প্রবন্ধই কোন পত্রিকার ছসাতমাস ভরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই শেষ নয়। এই সাত সংখ্যায় যাঁরা কবিতা লিখেছিলেন তাঁদের নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ। এই সাত সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং সাত সংখ্যায় পনেরটি গল্প ছিল। তার মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তিনটি, অমিয়ভূষণ মজুমদার দুটি , অন্যান্যদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরীর প্রত্যেকের একটি করে গল্প ছিল।

উদাহরণস্বরূপ ঠিক পরবর্তী ছয় সংখ্যাকে আলোচনা আনা যেতে পারে। কী কী ছিল ১৩৫৪র বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই ছয় সংখ্যায় তা দেখুন। প্রবন্ধের কথায় প্রথমেই মনে আসছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর, হুমায়ুন কবির, কবি অজিত দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী, শশধর দত্ত, করালী কান্ত বিশ্বাস, মণিলাল শর্ম্মা ও অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুগুলিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, যেমন ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদ ও মনুষ্য ধর্ম্ম, অতঃকিম্, অজিত দত্তর আপন কবিতার কথা, করালীকান্ত বিশ্বাসের আধুনিক নাটকের প্রথম যুগ, অন্নদাশঙ্করের বাংলা উপন্যাস ইত্যাদি। এ ছাড়াও পূর্বের সংখ্যাগুলোর মত এ সংখ্যাগুলোতে ইংরেজি মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ থাকত— এ ছয় মাসে জহরলাল এবং লুই ফিশারের প্রবন্ধের অনুবাদ ছিল। গল্প লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচায, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রজত সেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

উপন্যাস লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেন এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার লেখক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র গুপ্ত, সৌমিত্রশঙ্কর প্রভৃতিকে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ব্যক্তি সঞ্জয় ভট্টাচার্য গত হয়েছেন। কিন্তু মনের ভিতরে খোঁজ করে দেখলুম যাকে বিধুরতা বলে তেমন কিছু সেখানে নেই, অথচ এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। তাঁকে যে ভালবাসতুম, একেবারে সামাজিক সৌজন্যেব মুখোস ফেলে মুখোমুখি হতেম—সে সব তা হলে কী? এক চালাকির উত্তর হতে পারে আসলে ভালবাসতে জানি নি। কিন্তু অনুভব করছি ব্যাপারটা হয়তো ঠিক তা নয়।

অন্য উত্তর হতে পারে ব্যক্তিটিকে না ভালবেসে তার কীর্তিকলাপকে ভালোবেসেছিলুম—অথচ সেটিও ঠিক হচ্ছে না।

এই দ্বিধাব মধ্যে থেকে যা মনে আসছে তা এই যে তাঁব ব্যক্তিগত মনটিকে হয়তো ভালবেসেছিলুম—কীর্তিকলাপ, আলাপচারী, চিঠিপত্রে যে মন আমার কাছে স্থায়ী, অন্য কথায় অবিনশ্বর। আমার কাছে অবিনশ্বর—অর্থাৎ যত দিন আমার মন অনুভব করছে, চিন্তা করছে ততদিন তাঁর মন গত হতে পারে না। কিন্তু আমার মন যখন থাকবে না এ অবস্থায, যেহেতু এই পৃথিবী থেকে মুছে যেতে কেউই চাই না, এরকম আকাঙ্খা হয় আমার ব্যক্তিগত মন ও তাঁর ব্যক্তিগত মনকে সংযুক্ত কবে সমাজ-মানসেব অন্তহীন প্রবাহে রোপণ কবা যায়। বলা বাহুল্য, তা সহজ নয়। এটা আবো কঠিন বোধ হয় এজন্য যে সমাজ মানস বলতে এখন আব যাকে বাংলা দেশ বলে থাকি তাব সমাজ-মানস বোঝায় না, কি করে তা থেকে ইউরোপ আমেরিকাব সমাজ-মানস বাদ দেওয়া যাবে?

এখন, এই যে সমাজ-মানসের প্রবাহ যার গ্রাফ বিভিন্ন দেশেব কলা ও সাহিত্যেব ইতিহাস তাব কোথায় সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কতটুকু স্থান দেয়া যাবে? তিনি যে ভাষায় লিখেছেন সে ভাষা ইংরেজী, ফবাসী, জার্মান, রাশান ভাষাব তুলনায় নিত্যন্তই মাইনর, এবং ভাষাতেও তিনি মাইনর লেখক, মাইনব সম্পাদক। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই উপদেশ আসতে পাবে অন্তহীন সমাজ-মানসে তার মনকে বোপণ কবার আকাঙ্খা বর্জ্জন কবাই সুবিধার হবে। কেন না, মানব সমাজের আদি-অন্তকাল প্রবাহিত কলা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাদেশেব সঞ্জয় ভট্টাচার্য নামক একজন মাইনর লেখকের পক্ষে একটি লাইন আদায় করে নেয়া সম্ভব হবে না।

এ থেকে সমান যুক্তিসিদ্ধ দুটি সিদ্ধান্ত পৌঁছানো যায় মনে করি ঃ প্রথম, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে আলোচনা ব্যর্থশ্রম, দ্বিতীয়, যেহেতু সে সব ইতিহাসে তাঁর স্থান নাও হতে পারে, এখনই তাঁব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নেওয়ার সময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমরা যদি মাতিস সম্বন্ধে আগামী পঞ্চাশ বছর একটা কথাও উচ্চারণ না করি, অথবা ডষ্টয়েবস্কির সম্বন্ধে সব আলোচনা যদি রুশিরা আইন করে বন্ধ করে দেয়ও, আবার একসময়ে তাঁদের নিয়ে আলোচনা হবে; কিন্তু একজন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, একজন জীবনানন্দ অথবা একজন কঙ্কাবতী-লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় নষ্ট করা উচিত হয় না, যেহেতু সে সময় একবার হারালে কদাচিৎ ফেরে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে প্রথম কথা কী বলা উচিত, এ নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। আমার এরকম ধারণা, তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক। কী ছিল সে পরিচয়? পূর্ব্বাশার সঙ্গে কেউ কেউ কল্লোলের তুলান করেছেন তৎকালীন অভিনবত্বর দিক দিয়ে। সঞ্জয় নিজেও ভাবতে ভালবাসতেন কল্লোল কালিকলম প্রগতির পরে উত্তরসাধক হিসেবেই পূর্ব্বাশার

আবির্ভাব এবং প্রতিষ্ঠা। বস্তুত পূর্ব্বাশা আদৌ তা ছিল না। কারণ কল্লোলের অভিনবত্ব যা তৎকালীন ভদ্ররুচির নাকে ঘুষি মারা ছাড়া বেশী কিছু নয়, তেমন আধুনিকতা পূর্ব্বাশার অথবা সঞ্জয়ের আকাঙ্ক্ষিত ছিল বলে মনে করা যায় না। কী ছিল পূর্ব্বাশা? সে সময়ের অন্যান্য মাসিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে পূর্ব্বাশার অবস্থান বুঝতে সুবিধা হয়। তখনকার অন্যান্য মাসিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পরিচয়, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, বসুমতী ও প্রবাসী। প্রবাসী তখন রবীন্দ্রনাথ বিযুক্ত, সুতরাং প্রতিদিন অভিনব হয়ে ওঠার সেই বয়োবৃদ্ধ অভ্যস্ততাও তার নেই। কল্লোলকে ঠেকাতে গিয়ে শনিবারেব চিঠি যে রক্ষণশীলতার বর্ম পরেছিল সে বর্ম খোলার কায়দা তাব আর মনে নেই। ভারতবর্ষ ও বসুমতী তখনও যেমন এখন, বর্তমানের দেশাদি পত্রিকার মত পাঠকতোষিণী। পরিচয় সুধীন্দ্রনাথের হাতছাড়া হযে তখন জনযুদ্ধের উচ্চগ্রামে নিনাদপরায়ণ। একটা অভাব দেখা দিয়েছিল—একটি পত্রিকার যেখানে নতুন লেখা ব্যবসা, রক্ষণশীলতা ও রাজনীতির প্রভাব থেকে পৃথক হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পাবে। পূর্ব্বাশা এই অভাবটা পূবণ করেছিল।

এ বিষয়ে উদাহরণ নেয়া যেতে পাবে। ১৩৫৩র আশ্বিন থেকে ১৩৫৩র চৈত্র এই সাত মাসের পত্রিকা আমার সম্মুখে রয়েছে। কারা লিখেছেন এই সংখ্যা কযটিতে, কী বা লিখেছেন তাঁরা, তার হিসাব নিলে মন্দ হয় না। এই ছটি সংখ্যায প্রবন্ধগুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মার্কসীয় দর্শনের উপবে তিনটি প্রবন্ধ (লেখক নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত), বাংলার রূপরস সাধনার উপরে প্রবন্ধের উপরে ছটি ইনষ্টলমেণ্ট (লেখক যামিনীকান্ত সেন), নাবায়ণ চৌধুরীর তিনটি প্রবন্ধ, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যেব পাঁচটি প্রবন্ধ যাব তিনটিব বিষয় অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ, জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে নিবন্ধ, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি দার্শনিক নিবন্ধ, প্রবোধচন্দ্র সেনের অশোকস্মৃতি। আমাব মনে হয় এতগুলি এমন প্রবন্ধই কোন পত্রিকার ছসাতমাস ভবে বাখাব পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু এই শেষ নয়। এই সাত সংখ্যায় যাঁবা কবিতা লিখেছিলেন তাঁদেব নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ। এই সাত সংখ্যায উপন্যাস লিখেছেন অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত এবং সাত সংখ্যায় পনেবটি গল্প ছিল। তাব মধ্যে নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তিনটি, অমিয়ভূষণ মজুমদার দুটি , অন্যান্যদের মধ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরীর প্রত্যেকেব একটি করে গল্প ছিল।

উদাহবণস্বরূপ ঠিক পরবর্তী ছয় সংখ্যাকে আলোচনা আনা যেতে পাবে। কী কী ছিল ১৩৫৪র বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই ছয় সংখ্যায় তা দেখুন। প্রবন্ধর কথায় প্রথমেই মনে আসছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কব, হুমায়ুন কবির, কবি অজিত দত্ত, নারায়ণ চৌধুরী, শশধর দত্ত, কবালী কান্ত বিশ্বাস, মণিলাল শর্ম্মা ও অনিলকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধেব বিষযবস্তুগুলিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, যেমন ধূর্জটিপ্রসাদের মার্কসবাদ ও মনুষ্য ধর্ম্ম, অতঃকিম্‌, অজিত দত্তর আপন কবিতার কথা, করালীকান্ত বিশ্বাসের আধুনিক নাটকের প্রথম যুগ, অন্নদাশঙ্করের বাংলা উপন্যাস ইত্যাদি। এ ছাড়াও পূর্বের সংখ্যাগুলোব মত এ সংখ্যাগুলোতে ইংরেজি মূল্যবান প্রবন্ধের অনুবাদ থাকত — এ ছয় মাসে জহরলাল এবং লুই ফিশারেব প্রবন্ধের অনুবাদ ছিল। গল্প লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রজত সেন, অমিয়ভূষণ মজুমদার, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

উপন্যাস লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেন এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার লেখক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্র চক্রবতী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র গুপ্ত, সৌমিত্রশঙ্কর প্রভৃতিকে।

অথবা ১৩৫৬র শেষ ছয় মাসের সংখ্যাগুলোকে লক্ষ্য করুন। এগুলোতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সম্পাদক নিজে ছাড়াও, প্রবোধচন্দ্র সেন, অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সুখরঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দীনেশ দাশ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, নির্মলচন্দ্র বসুরায় ও বুদ্ধদেব বসু।

এ সংখ্যাগুলিতে উপন্যাস ছিল না, তার বদলে ছিল অচিন্ত সেনের কল্লোযুগ নামের সে যুগের মেমোয়্যার। অনূদিত প্রবন্ধ ছিল আর্নল্ড জ টোয়নবী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট-এর।

এই সংখ্যাগুলোতে কবি হিসেবে উপস্থিত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহসন হাবীব, বীরেন্দ্র গুপ্ত, চিত্ত ঘোষ, হাসান হাফিজুর রহমান, জীবনানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। গল্প লেখক ছিলেন ঃ অমিয়ভূষণ মজুমদার, নরেন্দ্র মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, রজত সেন প্রভৃতি। পূর্ব্বাশা তখন আর একটা কাজ করতে ইদানীং যা পত্রিকাজগতে উপেক্ষিত প্রায়। তৎকালীন চিত্রীদের ছবির ব্লক ছাপাত পূর্ব্বাশা। যে সব চিত্রীর ছবির ব্লক ছাপা হত তাদের নাম কি প্রমাণ করবে এই ছবি ছাপানোর ব্যাপার তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকার মত পত্রিকাকে বাহারী করার চেষ্টা নয়।

১৩৫৩-এর আশ্বিন থেকে চৈত্র ছবি ছাপা হয় সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সুবর্ণ রেখার বাঁক) হৈমন্তী সেন (বাংলা ১৩৫৩ এবং আতঙ্ক), সুনীল কর (একা) ঃ ১৩৫৪-র বৈশাখ থেকে আশ্বিন প্রকাশ পায় নিম্নলিখিত ছবিগুলির বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (বটের ছায়ায়), যামিনী রায় (বাপুজি—আলেখ্যের আলোকচিত্র), উষারঞ্জন দাশগুপ্ত (মা—টেনসিল), শ্রীরামকিঙ্কর (মাঠে) ১৩৫৬র আশ্বিন থেকে চৈত্র সংখ্যাগুলিতে এই ছবিগুলো ছাপা হয় ঃ ভ্যানগগের একটা রঙীন রিপ্রোডাকশান, ফসলের ক্ষেতে কাক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নৃত্য), গোবর্দ্ধন আশ (নামহীন), গোপাল ঘোষ (বিষকন্যা), প্রাণকৃষ্ণ পাল (দানবের লড়াই) ও শ্রীরামকিঙ্কর (পাইন বন)।

১৩৬০ এর ভাদ্র থেকে চৈত্র অর্থাৎ ছসাত বছর পরেও পূর্ব্বাশার রূপ কী ছিল? যাঁদের কবিতা প্রকাশ হয়েছিল তাঁরা সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধাকৃষ্ণ দাস, সুনীল নন্দী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, লোকনাথ ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিয়ভূষণের গড় শ্রীখণ্ড তখন ধারাবাহিক চলছে। পাশাপাশি প্রতিভা বসুর উপন্যাস। গল্পলেখক শংকর চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, রজত সেন, অমল দত্ত, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ছয় সংখ্যাতে প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা প্রকাশিত হতে থাকে।

তালিকা দীর্ঘ করা সহজ কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয়ের পক্ষে এই তালিকাই যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গিয়েছে সবুজপত্রের জীবিত লেখকেরা, কল্লোল পত্রিকার সমসাময়িক বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, তারাশঙ্কর প্রভৃতি, যাঁরা তখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অল্পবিস্তার যথা ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, নরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এবং যাঁরা প্রতিষ্ঠা চাইছেন যথা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অমিয়ভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্র, রমাপদ, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রজত সেন, তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি একই সঙ্গে পূর্ব্বাশায় লিখতে সুরু করেছেন। লক্ষ্য করতে হবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিগ ক্যাপিটাল হাতে নিয়ে ব্যবসা করতে নামেননি। লিটল ম্যাগাজিন ছিল 'পূর্ব্বাশা।' প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, গল্প এবং সহোদরা আর্টচিত্রকে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল 'পূর্ব্বাশা'র।

ব্যবসায়ী পত্রিকা এবং লিটল ম্যাগাজিনে যে মৌল পার্থকাগুলো থাকে তার একটি এই ঃ লেখকেরা অন্যত্র যেখানে পাবে লিখে নাম করতে পারলে, অন্যকথায় যখন তার লেখা দ্বিতীয়

শ্রেণীর পাঠকগোষ্ঠীর কাছেও, যাঁরা সংখ্যায় সব চাইতে বেশি, অভ্যাসের বশে শুয়ে বসে পড়ার মত সহজ হয়ে আসছে এবং তা নিয়ে গল্প করলে রুচিবান পাঠক বলে পরিচয় দেয়ার সুযোগ এসেছে, তখনই ব্যবসাদারী পত্রিকার সেই রকম লেখকদের লেখা ছাপা হয়। অন্যপক্ষে লিটল ম্যাগাজিনে সব সময়ে নতুনকে প্রকাশ করার ঝোঁক থাকবে।

একটা ঘটনার কথা বলি। ১৩৫৩র আশ্বিনে একখানা পত্রিকা আমার হাতে আসে। পত্রিকাটা আমার তৎকালীন লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে ভাল লেগে যায়। কিছু ভাবতে না ভাবতেই একটা গল্প লিখে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে পত্রিকাটার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই। চিঠিও দিইনি, ফেরৎপাওয়ার ডাকটিকিটও নয়। কার্তিকের প্রথম সপ্তাহে, গল্পটা পাঠানোর হপ্তা পনের দিনের মধ্যে ডাকে একটা পত্রিকা পেয়ে অবাক হলেম, আরও অবাক হলেম তাতে গল্পটা ছাপা হতে দেখে। ভুল নাকি? ভুলে ছেপে ফেলেছে? মাস দুএক পরে আর একটা গল্প পাঠালুম। তিন সপ্তাহের মধ্যে গল্পটা ছাপানো হয়েছে এমন পত্রিকা পেলেম। কী আশ্চর্য! এ বিষয়ে পত্রিকার সঙ্গে তৎকালে যুক্ত অনিল চক্রবর্তী আমাকে তথ্য বলেছিলেন। প্রথম গল্পটা যখন পৌঁছায় তখন পত্রিকার লেখা বাছাই শেষ। পত্রিকা প্রায় অর্দ্ধেক ছাপা হয়ে গিয়েছে। অনিল চক্রবর্তী বুকপোষ্ট পেয়ে গল্পটা পড়ে ফেলে। এবং কম্পোজ হয়ে গিয়েছে এরকম এক গল্প সরিয়ে রেখে অজ্ঞাতনামা লেখকের গল্পটা কম্পোজ করতে দেয়। যথাকালে সঞ্জয় গল্পটার প্রুফ দেখতে সব করেন এবং অনিল চক্রবর্তীকে সমর্থন করেন।

এখন, অমিয়ভূষণ তখন প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত লেখক ছিলেন না (এখনই বা তা হয়েছে কি?) এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার না ছিল আত্মীয়তা এমন কি সে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রিকার বা প্রেসের কর্মচারীও ছিল না। এ অবস্থায় কি করে এমন ব্যাপারটা ঘটতে পারে?

এটা এই প্রমাণ করে বলে মনে করি, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হতে যে সাহসিকতা, নতুনকে চিনবার যে বুদ্ধি থাকা অপরিহার্য—তাতে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও এ বিষয়টিকে লক্ষ্য করতে হবে, যে সম্পাদক অক্লেশে ধূর্জটিপ্রসাদ, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরাদেবী চৌধুরী, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য মানিক, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাশঙ্কর ইত্যাদির লেখা পেতে এবং ছাপাতে পারেন তিনি কেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মিত্রকে আহ্বান করেন এবং তার চাইতেও এগিয়ে রমাপদ সন্তোষ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র, অমিয়ভূষণ ইত্যাদির লেখা চেয়ে পাঠান এবং প্রকাশ করেন। (দ্বিতীয় গল্পের পরের থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য বর্তমান লেখকের সঙ্গে যত পত্রালাপ করেছেন, শতাধিক হতে পারে সংখ্যায়, তার মধ্যে আধাআধি লেখার তাগিদ)। এবং কেনই বা লেখার এবং বড়জোর বগবগে বাট্রাঁ না ছেপে তৎকালীন চিত্রীদের চিত্র প্রতিলিপির সমাদর প্রকাশ? মনে করি সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের জানা ছিল সাহিত্যে আধুনিকতার মূল্য ক্লাসিকের তুলনায় কম নয়, (যে সাহিত্য শুধুই ক্লাসিক তাতো মৃত সাহিত্য!) এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক সাহিত্যকে সাহায্য করা।

এই প্রশ্ন এখানে উঠবে একেবারে হালফিল যারা সাহিত্য করছেন তা বয়োজীর্ণ ক্লাসিক লেখক কিংবা এখানে ওখানে সেলাম প্রদায়ী তরুণ হন, তাদের কারো মুখেই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কথা শোনা যায় না কেন? অথবা অত যোগ্যতা সত্ত্বেও পূর্ব্বাশা কেন তেমন পত্রিকা হল না যা একটা যুগের সূচনা করেছে বলে ধরা যাবে? আমার মনে হয় এই দুই প্রশ্নের এক উত্তরই পাওয়া যাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের Personalityতে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পক্ষে কল্লোলের মত ঐতিহ্য এবং রুচির নাকে ঘুসি হাঁকড়ানো সম্ভব ছিল না। সে জন্য একেবারে নতুন অমিয়ভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রর সঙ্গে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, মানিক এবং আরো পিছিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ ও প্রমথ চৌধুরীকে সমাদর করা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় উত্তর এই, কল্লোলের মত যুগান্তরকারী হওয়া কোন পত্রিকার পক্ষেই সম্ভব নয় কারণ কল্লোল কোন দিক

দিয়ে যুগান্তকারী ছিল না।

সাহিত্যের প্রবাহ অনিবার্যভাবেই আধুনিকতম লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই প্রভাবকে তাঁর পত্রিকার প্রতিফলিত করেছেন। হৈ হৈ করে নয়, নিশ্চিতভাবে প্রতিদিন বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আদর্শ ছিল মনে করি।

এ সত্ত্বেও 'পূর্ব্বাশা' বিলেতের কোন কোন যুগান্তকারী লিটল ম্যাগাজিন, যারা মেজর কবিদের সম্মুখে এনেছে, তাদের মতো না হয়ে থাকে তার কারণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য অক্ষমতা নয়, তার কারণ আমরা সবাই এ যুগে মাইনর লেখক।

এ সত্ত্বেও যদি আমাদের কাছে 'পূর্ব্বাশা' বিস্মৃতপ্রায় হয়ে থাকে তবে তার কারণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য যাদের সাহিত্যের পরিমণ্ডলে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তারা কোন না কোন কারণে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তাঁর প্রাপ্য দিতে কুণ্ঠিত।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গল্প লেখক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবশ্যই আমাদের অপরিচিত নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দকে উল্লেখ করার পরেই যাঁদের উল্লেখ অপরিহার্য সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবশ্যই সেই পাঁচজন কবির অন্যতম। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গল্প আমার প্রিয় নয়। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবশ্যই আলোচনা যোগ্য। নানা কারণে আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র পরের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আলোচনায় এক সময়ে তাঁকে অনেকটা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু আমার কাছে সব চাইতে বড় সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জ্যার্নাল থেকে

পুনর্বাসন এক মহতী প্রবৃত্তি। এবং এর তাড়নায় আমরা এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তাঁর বেলায় আমাদের সুবিধা ছিল, কারণ তিনি আত্ম সমালোচনা করেছেন, নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন, তাঁর গান যে সর্বত্রগামী হয় নি, কৃষকের শরিক তো নয়ই, এ বিষয়ে তাঁর একরারনামা আছে।

কিন্তু এখন যাঁর কথা মনে হচ্ছে তিনি আনন্দমঠের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিছুদিন আগে রাজধানী দিল্লির এক সংবাদপত্রে তাঁর একটি রচনা ছাপা হয়েছিল, যা কতিপয় তা রচকে নাকি এতদূর বিচলিত করে যে তাঁর বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও চিন্তা করা হয়েছিল। বাস্তিকতার ক্ষেত্রে কিমতঃপর খোঁজ করতে নেই। নস টানলো নাজিল।

এ বাবদে যা মনে পড়ল তা এই যে, এক সময়ে (বিশেষ করে অভঙ্গ বন্দোমাতরম যখন আমাদের জাতীয় গীতি ছিল) বঙ্কিমচন্দ্রকে সেকুলার এবং দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা হতো। এখন অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র, যতদূর জানতে পেরেছি, স্কুলে এবং কলেজেরও ডিগ্রি ক্লাশে মাত্র পাঠ্য। সহজেই বোঝা যায়, কালে কালে সে লেখায় ঝাঁজ মরেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সম্ভবত আনন্দমঠ সেখানেও পাঠ্য নয়, যদিও আমাদের অনুমান, বাংলা ভাষায় যে তিনখানি কুল্যে রাজনৈতিক উপন্যাস (বাঁশের কেল্লা ও পদ্মানদীর মাঝিকে এ পর্যায়ে উল্লেখ করা কিছু শক্ত) তার মধ্যে আনন্দমঠই উত্তীর্ণ। হয়তো আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পারবো, পথের দাবীতে কিছুই বক্তব্য নেই, অন্ধ-এলার গল্পে বক্তব্য এতো যে চায়ের দোকানের ছোকরাও সালর কাপ্তানের চাইতেও অবলীলায় মঁ ভ্রুস্‌ৎ শব্দ ব্যবহার করে।

এখন কি করে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর প্রকাণ্ড কপাল, চোখা নাক, এবং চাপা পাতলা ঠোঁট সত্ত্বেও সেকুলার এবং দেশপ্রেমিক প্রমাণ করার চেষ্টা হতো? আমাদের মধ্যে যাদের সে কালের (পঁচিশ বছর আগেকার অন্তত) কথা মনে রাখার মতো বয়স, তাদের মনে পড়বে আনন্দমঠে, যাদের ম্লেচ্ছ মুসলমান প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ, বঙ্কিম চন্দ্র যেহেতু ইংরেজদের চাকরি করতেন সুতরাং ইংরেজ না বলে ঘৃণাটাকে অন্যত্র ট্রান্সফার করেছিলেন- এরকম বলার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল, এবং এরকমও বলা হতো চিকিৎসকের ব্যাপারটাই প্রক্ষিপ্ত, অন্য কথায় চাকরির মালিক ইংরেজদের চোখে ছিটানো ধুলো এটা বুঝে নিতে হবে।

তখন আমাদের ভাবখানা এই ছিল, যাকে বন্দেমাতরম্ গানের জন্য চার হাজার বছরের পুরোনো ঋষিদের সারিতে বসিয়ে দ্রষ্টা বলে ফেলেছি, সেই গানের কনটেক্সটা খুঁজতে গিয়ে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়ার দাখিল, সে কনটেক্সট থেকে হয় গানকে খসাতে হয়, নয় যেন যুগান্তর-অনুশীলনের দলও চালানো যায় না, খিলাফৎ আন্দোলনও নয়, যেন বা যে গান গলায় নিয়ে ফাঁসীতে যাওয়া হবে, যা গেয়ে গেয়ে হিন্দু-মুসলিমে রাখি বন্ধন হবে—তার কনটেক্সটটা? শুধু কি গল্প-ছলে? দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে দি লিবারল পত্রিকার প্রকাশিত যে সমালোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত করেছেন তাতে খুলেখেলেই বলা হয়েছে ইংরেজ শাসন বরং বিধাতার দান, যা মুসলিম অপশাসন থেকে উদ্ধার করেছে দেশকে। আমাদের যতদূর মনে পড়ছে এই বেয়াড়া কনটেক্সটের জন্যই তখন ভাবা হতো, চাকরিগত-প্রাণ বাঙালীপনাই, যার দরুণ বঙ্কিমচন্দ্র একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন।

আমরা বোধহয় তাঁর জন্য সহানুভূতিই বোধ করে থাকবো, (নির্জ্ঞান মানসে যুধিষ্ঠিরের বেকসুর মিথ্যার নজির তো ছিলই।)

অন্য ভাবেও বঙ্কিমচন্দ্রকে পুনর্বাসনের চেষ্টা হতো। আর কেউ করেছেন কিনা জানি না, আমরা একবার বলতে চেষ্টা করেছিলুম -ওটা তো ১৮৮২ র কথা নয়, অনেকদিন আগেকার সেই মন্বন্তরের সময়কার কথা, বঙ্কিমচন্দ্র সেই মন্বন্তরের বাঙালির মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন, তাঁর নিজের মনোভাব নয়। বলা বাহুল্য এসব যুক্তি কুযুক্তির চাইতেও খারাপ।

দেখা যাচ্ছে সব প্রবৃত্তির মতো পুনর্বাসন প্রবৃত্তিরও কামড় আছে। নতুবা রবীন্দ্রনাথ আত্মসমালোচনা করে আমাদের যে সুযোগ দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কুত্রাপি তা না দিলেও আমরা এমন করে এগোবো কেন? (আমাদের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কড়া ধাতেরই ছিলেন, ঠাকুরদা হওয়ার মতো সুপরিপক্ক এবং মোলায়েম হন নি।)

রাজধানীর সংবাদপত্রকে ধন্যবাদ, এই সুযোগে বুঝতে পারছি, বঙ্কিমচন্দ্রকে পুনর্বাসন করা যায় নি। তিনি যেখানকার সেখানেই থেকে গিয়েছেন, যে কালচার্ড সমাজের অত্যন্ত মূল্যবান সদস্য ছিলেন সে সমাজের বাইরে কাউকে পরোয়া করবেন কখনও, এমন মনে হয় না।

কিন্তু কী সমাজ ছিল সেটি?

বাংলাদেশ চিরদিন ব্রাত্য, ধর্মবোধ তাদের কিছু কম। অন্তত এখানকার মানুষ উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি অঞ্চলেরা তুলনায় অধার্মিক। হিন্দুর গোমাংস খাওয়ার চাইতে বড় অকর্তব্য নেই, অথচ এ বিষয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা কী করতেন, তার রেকর্ড শিবনাথ শাস্ত্রী উদ্ধার করেছেন। চক্রবর্তী ফ্যাকশানের তারাচাঁদই এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন হয়তো, যদিও এ রকম বলার প্রমাণ হাতের কাছে নেই। মজার কথা, তারা ওই নিষিদ্ধ কুআহার হজম করেও নিজেদের কিন্তু অহিন্দু বলতে রাজী হন নি। আমার ঠিক জানা নেই, সতীদাহ প্রথাটা বেদ উপনিষদের অথবা ভাগবতে অনুশাসিত কিনা, কিন্তু তা হিঁদুয়ানীর অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ব্রাত্য বাঙালি ইংরেজের সহায়তায় ১৮২৯তে তার লোপ সাধনের ব্যবস্থা করলে। সতীর একমাত্র পতিই হতে পারে। হিন্দুধর্মের এটাও নাকি অনুশাসন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যাসাগরই ১৮৫৬তে বিধবা বিবাহ আইন পাস করানোর গোড়ায় ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বাংলাদেশে মাটিতেই, তাকে তখন ধিক্কার দিয়েছিল বাঙালিরাই, তাতে যোগ দেয় দূরের কথা; এমন কি ঘটনাটার একশো বছর পরেও সুরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (দুজনেই বাঙালি) কেউই তাকেই পুরো জাতীয় আন্দোলনের মর্যাদা দিতে আগ্রহী নন।

এ রকম বলা হয়ে থাকে ১৮৫৭ র সেই ঘটনার যে সব প্রভোকেশন ছিল, তার মধ্যে টোটায় গরুর চর্বি, সতীদাহ দমন, বিধবা বিবাহ আইন, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ইত্যাদি ধর্মে হস্তক্ষেপকারী ব্যাপারগুলি উল্লেযোগ্য। তা হলে তো দেখা যাচ্ছে যে প্রভোকেশনগুলো সেই জাতীয় আন্দোলনের মূলে, তার সঙ্গে বাঙালীরা বরং সোৎসাহে সংযুক্ত ছিল। গোমাংস ভক্ষণ, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহের সঙ্গে—অনুমান করি, ব্রাত্য বাঙালির নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে দিয়েছে, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও তাদেরই উৎসাহিত দেখা যাচ্ছে—তাদের অর্থাৎ সেই ব্রাত্য সমাজের। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সারাভারতে নাকি জাতীয় আন্দোলন হয়েছিল (প্রকৃতপক্ষে উত্তরভারতের কিছু অংশে, বাংলাদেশে তার বীজ প্রতিকূল পরিবেশে অঙ্কুর ছাড়ে নি) আর তখন অন্য একটা ঘটনা ঘটেছিল কলকাতায়, বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৭তে হিন্দু কলেজ যার স্থাপন করেছিল, যার ডাফসাহেবের কলেজকে সমর্থন করেছিল, যাদের এক বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য দর্শন পড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী, তাদেরা স্বপ্ন সফল হল এইভাবে, ইংরেজেরই সহায়তায় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই।

১৮৫৭-র এ দুটো ঘটনা বাঙালিসমাজকে বুঝতে সাহায্য করে। এমন কি হরিশচন্দ্রের পত্রিকায় সেই জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কী লেখা হচ্ছে তা জানতে লাটসাহেবের আগ্রহের গল্প বাঙালির মনের ঝোঁকের আর এক প্রমাণ, কিন্তু এগুলিও সবেমাত্র নয়।

বাঙালির এই এক স্বভাব জন্মেছে, এখানে ওখানে চিন্তার চিহ্ন রেখে যাওয়া, কাজেই আমরা আশ্চর্য হই নে, যখন ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বাঙালির আন্তরিক প্রীতির চিহ্ন সর্বত্র ছড়ানো দেখি। প্রথম আধুনিক বাঙালি কবি শ্রীমধুসূদন ইংরেজিতে যে স্বপ্ন দেখতে চাইতেন সেটা আজগুবি গল্প নয়। আমরা তখন ইংরেজদের কাছে থেকে নাটক লেখা শিখছি, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করছি, সনেট লিখছি, ব্ল্যাক ভার্সে জন্মে সার্থক হয়ে উঠছি, উপন্যাস লিখছি, বোধহয় ন্যাচারাল সায়েন্স সম্বন্ধেও দু'এক কথা জানছি। ১৮১৭ থেকে ১৮৮২ এই পঁয়ষট্টিটি বছর ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আমাদের আন্তরিক আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছি এত ভাবে এবং এমন করে যে, চিকিৎসককে আনন্দমঠের উপসংহারে না আনলেই, বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক চিন্তাকে অবলম্বনহীন মনে হত।

এ রকম সিদ্ধান্তে আসার পর বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলিম শাসন বিদ্বেষী না বলে উপায় থাকে না, কারণ আর তাঁর ইংরেজ-প্রীতিকে চাকরির জন্য মিথ্যাচার বলা যাচ্ছে না। এ বিষয়েও তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মানস অদ্ভুত এক সাক্ষ্য দেয় যাকে আজকালকার বিচারে অনুদারই বলা যায়। নবীনচন্দ্র সেন এবং শচীন সেনগুপ্ত এবং অক্ষয় মৈত্র ছাড়া কেউ ই বা এ বিষয়ে উদার ছিলেন? জিজিয়া কর, কাজির বিচার, মন্দির ভাঙাভাঙির ব্যাপারগুলো সমাজের স্মৃতিতে ছিল না বললে, বোধহয়, সত্য বলা হবে না। মন্দির ভাঙাটা কি সহজ ব্যাপার? আল আক্যাসা নিয়ে এখন গোটা পৃথিবী টালমাটাল। আর নিজের দেশে নিজের ধর্মে থাকার জন্য যদি কর দিতে হয়? যদি বিচার ব্যবস্থা বিশেষ এক ধর্মমতের মাপ কাঠিতে ঘটে? অন্যদিকে শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন? রমেশচন্দ্রের জীবনপ্রভাত (১৮৭৮), জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯) তে কোথায় আমাদের সহানুভূতি, কার বিপক্ষে? মুসলিম শাসনে অত্যাচার ছিল না বললে তো, শিবাজী ও প্রতাপসিংহকে দেশদ্রোহী বলতে হয়, তখনকার হিন্দু সমাজ বোধহয় এ রকম বলতে রাজি ছিল না।

আমাদের এ রকম এক বিশ্বাস আছে মুসলিম শাসন অন্তত পপুলার শাসন ছিল না। সিরাজদ্দৌল্লা না হয় (নবীন সেন ও শচীন সেনগুপ্তের মনে) কুচক্রের গাড্ডায় পড়েছিল। মীর কাসেম? তখন ইংরেজ সৈন্যের যে সংখ্যা তাতে বাঙালির প্রিয় নৃপতি মীরকাসেমের (যদি সত্যি প্রিয়ই হতেন) ডাকে বাঙালি লাঠিআলারাই পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারতো ইংরেজদের। এদিকে কিন্তু কামান বন্দুক সত্ত্বেও, মীরকাসেম হেরেই যাচ্ছেন, হেরেই যাচ্ছেন। ইংরেজদের রাজ্যলাভের আগে নবাব সরকারের বড় বড় চাকরে কিছু হিন্দু ছিল। তারা করতো ষড়যন্ত্র, কারণ রাজনীতি করার মতো বড় ছিল তারা, যে হেতু তখন রাজনীতি বলতে ভোট বোঝাত না, ষড়যন্ত্র বোঝাত, সে ষড়যন্ত্রের শিকার যে কোন অল্প বয়সের নবাব মাত্র, তা নয় , নিজের বাপ ভাই, অন্নদাতা, সম্রাট কে নয়? অন্তত দেশের অধিকাংশ মানুষ, যারা সাধারণ হিসাবে হিন্দু ছিল, মুসলিম শাসনের সঙ্গে দেশাত্মবোধের পর্যায়ে ইনভলবড ছিল না। কোন শাসন ব্যবস্থাকে নিজের বলে মনে না করা, আর তাকে উটকো বিপত্তি মনে করার মধ্যে ফারাক কম। কিছুই আশ্চর্যের নেই তাতে, যদি বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম শাসনকে আপনার মনে না করে থাকেন।

এখানে মনে পড়ল, কিছুদিন আগে ইতিহাসে নতুন করে লিখবার কথা হচ্ছিল। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাজনীতির অসাধ্য কী? আওরঙজেব যদি সদাশয় প্রজাবৎসল হন, এখন তাতে অবশ্য মোগল শাসনের পতন বোধ করা যাবে না। আমাদের কখনও কখনও এরকম মনে হয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ব্যাপারটা যে বিদ্রোহে থেকে গেল, সিপাহীরা, গদিচ্যুত কোন কোন সামন্ত, কোন কোন জমিদার ও জায়গীরদার ও তাদের প্রজাপুঞ্জ, এবং কিছু সংখ্যক ধার্মিক জনসাধারণ যোগ

দিলেও; তার কারণ এই, জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোন আদর্শ ছিল না; তা আজকালকার অ্যান্টি-কংগ্রেসিজমের মতো অ্যান্টি-ইংরেজ ব্যাপার ছিল মাত্র; কিন্তু সেই সংযুক্তির কর্তা শেষ পর্যন্ত কে হতেন? বৃদ্ধ বাহাদুর শা? মোগল তক্তাউসকে তার অনেক আগেই বাংলা অযোধ্যার নবাবেরা, মারাঠারা, শিখেরা, দক্ষিণে নিজাম বাহাদুর দূর করো বলে অপাংক্তেয় করে নি কি? ধরে নেয়া যাক, বাহাদুর শা জয় লাভ করেছেন। নানা ফড়নবিশ কি সেই দরবারে মারাঠা শক্তিকে কুর্নিশ করাতে রাজি করাতে পারতেন? করলেও তলে তলে আগামী মওকার সুযোগ খুঁজতেন না?

এখানে একটা কৌতুকের ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে। ভারত এবং ভারতীয় জাতীয়তা কত দিনের? আমাদের তো মনে হয়, যাকে আমরা ভারতবর্ষ বলে থাকি তার জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। ইংরেজরা যে লাল ম্যাপ এঁকেছিল তা থেকে সুরু। এ রকম যুক্তি শুনেছি যে, এই দেশ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকলেও ভারতীয় বোধ বলে কিছু একটা জাতীয়তা ছিল, কারণ ধর্ম, ভাষা, কালচার— প্রভৃতিতে ঐক্য ছিল। ছিল, নিশ্চয়ই ছিল, যখন এত লোকে বলছেন। কিন্তু, ভগবান, ধর্মভাষা সংস্কৃতি কি ইরাক, সওদি আরব, এবং ইজিপ্টকে এক দেশ করেছে, কিম্বা এক জাতীয়তা আছে তাদের? লক্ষণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র সপ্ত কোটি কণ্ঠ উল্লেখ করেছেন, বিশ ত্রিশ কোটি নয়। অবশ্যই ভারতের একত্ববোধ নতুন। ইংরেজরা শুধু কোহিনুর নয় অনেক নিয়েছে। তার বদলে যদি শেকসপিয়ার আর ভারতের একত্ব অনিচ্ছাতেও রেখে গিয়ে থাকে, তবে তাকে ছাড়তে আমরা কিছুতেই রাজী নই। এরকম বলাই ভালো নয়?

তা যাক, তা হলে এই বাঙালি ভ্রাতারা কি রকমের ছিল? যতদূর মনে পড়ে, লাঙ্গল যার জমি তার, এ বক্তব্যটা এ দেশে যুক্তির সাহায্যে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই উচ্চারণ করেছিলেন; মার্কসের নাম তখন কতদূরই বা ছড়িয়েছে, কিন্তু পেতিবুর্জুয়া শ্রেণীর বঙ্কিমচন্দ্রই, বোধ হয় সাম্যবাদ শব্দটা এদেশে প্রথম উচ্চারণ করেন, এবং সেই শ্রেণীরই দীনবন্ধু, হরিশচন্দ্র, মধুসূদন, শিশির ঘোষ প্রভৃতি কৃষকদের প্রথম বিদ্রোহ নীল বিদ্রোহে গুরুত্ব সঞ্চার করেছিলেন। এখানে এটাও লক্ষণীয় নীল চাষীদের মধ্যে কারা মুসলমান কারা হিন্দু, তার পার্থক্য করা হয় নি।

এই দলছুট বাঙালী সমাজ তা হলে কি এমন ইংরেজ-প্রেমিক ছিল যে তাকে ইংরেজদের ক্রীতদাস বলা যাবে? বোধ হয় তা নয়। ১৮৭৫-এর ইণ্ডিয়া লীগ, ১৮৭৬-এর ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৮৩ বার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে আন্দোলন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এগুলোর ভূমিকাকে অন্ততঃ বিরোধী রাজনৈতিক দলের সক্রিয় ভূমিকার মূল্য দিতে হবে। দাসদের মতো মেনে নেয়ার কোন লক্ষণ ছিল বলে মনে হয় না।

এরকম সিদ্ধান্ত করতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের পুনর্বাসন ব্যবস্থা না করাই ভালো। কেননা, না করলে, আমরা গোটা মানুষটাকে হারাবো না। এটা খুব আশার কথা তাঁকে আর খুব একটা ঘাঁটানো হচ্ছে না। এর ফলে বুদ্ধিজীবিরা এক সময়ে তাঁকে অনুসরণ করে স্পেডকে স্পেড বলতে সাহস পাবে।

কথাটা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের। উপরে উপরে চুনকাম করলে ফাটল ঢাকা যায়, দূর করা যায় না। তিনি বোধ হয় এ বিষয়ে আদেশও দিয়েছিলেন। মুসলিম সমাজের অধিকাংশ (যেমন হিন্দু সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ অংশ) গ্রামের অধিবাসী কৃষকদের কিছু উন্নতি বিধান করতে পারলে, মুসলিম-সমাজ আমাদের এই নতুন দেশের ব্যাপারে নিজেকে ইনভলবড মনে করবে। পরস্পরে বিশ্বাস জন্মাবে, (ফিরে আসবে নয়) এবং তখন ব্রাত্য বাঙালী, যারা নিজেদের ধর্মের অনুদারতাকে রেয়াৎ করে না, অন্যের ধর্মে উদারতা দেখলে কোন গোঁড়ামী আঁকড়ে ননসেকুলার থাকবে এমন মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রকে পুনর্বাসিত না করে, আপাততঃ যা চোখে পড়ছে, তা হচ্ছে এই মুসলিম শাসন ব্যবস্থা বা অব্যবস্থাকে উটকো আপদ মনে করতেন তিনি, কিন্তু মুসলিম ও হিন্দু রায়তে বোধ

হয় ভেদ করতেন না। হাসিম সেখ, রামা কৈবর্ত, পরাণ মণ্ডল, তাঁর দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ছিল। এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি যদি চারিয়ে যায়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সেকুলার না হয়ে পারে না। সমাজ সেকুলার হলেই রাষ্ট্র সেকুলার হবে—যা আমরা চাই।

অনুসিদ্ধান্তের মতো মনে হয়, ইংরেজ আনুকূল্যে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্কিমচন্দ্রের কালের বাঙালিরা কেরাণী তৈরীর অথবা ক্রীতদাস তৈরীর আখড়া মনে করতেন না, এ রকম মনে করতে সুরু করা হয়, সম্ভবতঃ ১৯২০ এর আন্দোলনের সময় থেকে। লক্ষণীয় যে মনোভঙ্গির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিহার করার আহ্বান, তাকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি। আমাদের মনে হয় আনন্দমাঠের চিকিৎসকের বক্তব্যে এবং 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তাৎপর্যের দিকে বেশ একটা মিলই আছে।

অন্যদিকে বিশেষ করে এ বৎসরে, এ কথা না বলে পারা যায় না বঙ্কিমচন্দ্র যেন আগেই আঁচ পেয়েছিলেন, কোন পথে চলা উচিত, যদিও মহাত্মার আসতে তখনও দেরি আছে।

চিকিৎসক বলিলেন, "সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না।"

এটা পেতিবুর্জুয়া মোর‍্যালিটির চিহ্ন কিনা, এ বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারি নি। মনে পড়ছে মহাত্মারও এমন বাছবিচার ছিল উপায় অবলম্বনের ব্যাপারে। কোনটা পাপ পথ কোনটা অন্যায়ের পথ, এ বিষয়ে খুব সতর্ক বিবেচনা ছিল তাঁর। আমাদের ধারণা, পাপের পথের শেষে পাপই থাকে, এই রকমই বিশ্বাস ছিল তাঁর। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সব পথই রাজপথ, এ রকম বিপ্লববুদ্ধি তাঁরও ছিল না।

সুরাকসিন

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ॥

প্রথমে প্রবীর সাণ্ডেল সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা হয়েছে তা ব'লে রাখি। সে নাট্যকার, আমাদের স্বশ্রেণী! এ একরকমের পক্ষপাতই বটে।

প্রবীরের কথায় ক্রিস্টমাসের রঙিন মোমবাতির ছবি মনে আসে। দোহারা আকৃতি। ত্বকের রং হাল্কা বাদামি। গম্বুজাকৃতি মাথার প্রায় সবটুকু জুড়ে টাক। নাকটা উঁচু, ভারি মুখেও বড় দেখায়। ঠোঁট দুটোর গড়ন নিখুঁত। চিবুকে কিছু গোটি, যার বক্ষ্ম কালো রঙে পাটকিলে সাদা আঁশ দেখা দিচ্ছে। পোশাকের দরুণ বোঝা যাচ্ছে না তার শরীর পেশীবহুল কি না, কব্জি দেখে ধারণা হয় একসময়ে ক্রিকেট অথবা টেনিসে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে অনুমান হয় এই চল্লিশ বছরে তার কোমরের ক্ষীণতা লোপ পাচ্ছে, কিন্তু মেরুদণ্ডের দু পাশের পেশিগুলোতে, এবয়সে যা সাধারণ, তেমন ক্লান্তি আসেনি।

বিশেষ মোটা ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করে সে। কিন্তু বাইফোকল্ হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে নাকের উপরের চাইতে বরং তার হাতেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। চটপটত্বের অভাবে এমন হতে পারে? দু'পাশে দেরাজ, সামনে হোয়াটনট বসানো নিচু একটা টেবল। তার উপরে কাঠের টেবল ল্যাম্প। টেবল আর টেবল ল্যাম্পের রং কাঁচা কাঠের। টেবল ল্যাম্পের গোড়ায় একটা বই তার উপরে প্রবীরের চশমাটা ভাঁজ করে রাখা।

এখন বেলা ন'টা তো বটেই। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই ঘরে টেবল থেকে দূরের অংশে জানালায় আসা দিনের আলো থাকলেও বই পড়ার জন্য টেবল ল্যাম্পটা জ্বলছে। এটা রুচির কথা, প্রবীর টেবলের পাশের জানালাটা কদাচিৎ খোলে। দিনের স্মগ্ চোঁয়ানো ম্যাটমেটে আলোর চাইতে কৃত্রিম আলোর মধ্যরাত্রির অনুভূতি লেখাপড়ার পক্ষে লাগসই মনে করে সে। মৃদু আলোয় ঘরটা এখন ঝিক্‌মিক্ করছে।

টেবল থেকে খানিকটা সরে গিয়ে সোফাটার পিছনে ঘরের সেই অংশে বিছানো রাগটার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের স্লিপারটা বিশেষ সৌখীন। আর ট্রাউজার্সের রং চাঁপা ফুলের, তার পরনের নাইট-গাউন কমলা রঙের।

প্রবীর সাণ্ডেলের একটা ডাকনাম কিছুদিন আগেও তার বন্ধুমহলে চালু ছিল। ত্রিশ বছর বয়সেই এটাকে সে অর্জন করেছিল। তাকে শোপেনহর টু (দি সেকেণ্ডের রসজনিত বিকৃতি) বলা হত।

মদকে যারা ঘৃণা করে প্রবীর তাদের সম্বন্ধে মিষ্টি কথা বলে না। কিন্তু তার নিজের কিছু কড়া বক্তব্য আছে। হুইস্কি, আঁবসাৎ, ইত্যাদি যা কিছু দ্রাক্ষাজাত নয় তার উপরে তার সবিশেষ অবজ্ঞার ভাব আছে। অথচ পোর্ট, ক্ল্যারাট, ইত্যাদি ইত্যাদিতে, বিশেষ করে নৈশভোজনের পর তার তৎপরতাও লক্ষণীয়। সেটাই বরং তাকে মুখর করে, সেই তৎপরতা। লক্ষণীয়। সেটাই বরং তাকে মুখর করে, সেই তৎপরতা। আর তখন সে যে শব্দ নিয়ে কারবার করে থাকে, শব্দের কারবারি হিসাবেই সে সমাজে পরিচিত তা বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায় তার মাথার গম্বুজাকৃতি গড়নটা তার কিছু কিছু অশান্তির কারণ হয়ে আছে।

স্যাম্পেনে আকণ্ঠ নিষিক্ত প্রবীর মৃত্যুর কথা উত্থাপন করতে পারে। হ্যাঁ, মৃত্যুই, তার চাইতে কম কিছু নয়, সেই শেষ হয়ে যাওয়া, সেই সীমান্ত যেখান থেকে আর কেউ ফেরে না। এ রকম এক সন্ধ্যায় তার বান্ধবী বেলা টেবলের তলায় তার শিন্‌বোনে জুতোর ডগা ঠুকে দিয়েছিল ; কিন্তু প্রবীর তাতে বরং তার বক্তব্যের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। সে সেক্‌সের কথায় চ'লে এসেছিল। অক্লেশে বিনা দ্বিধায় বলেছিল—আর সেক্‌সেও মৃত্যুর প্রতিকার নেই, প্রতিষেধ নেই। বরং, হে নরনারী, সেক্‌সই মৃত্যুর প্রথম পদসঞ্চার। তোমার বৃদ্ধি থেমে গেলো, ক্ষয় শুরু হল. সেক্‌সের ব্যাপারে জেগে উঠার, যৌবন লাভের, ওই একটি অর্থই হতে পারে।

ইদানীং তার ডাক নামটা বদলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে রং পছন্দের ব্যাপারে

মত বদলই তার কারণ। মেরুন, স্টীল ব্লু, ইত্যাদি রঙের উপর ঝোঁক ছিল তার ; এখন বাদামির নানা সেড থেকে কমলা রং পর্যন্ত তার পছন্দের সীমা। তার ফ্রককোট কমলা রঙের তা সাটিন কিংবা সার্জ হোক। আর লক্ষণীয় কখনও কখনও তার কোটের ঝুল এত লম্বা হচ্ছে যে তাকে ফ্রক্‌কোট না-বলে ফ্রক বলার ঝোঁক দেখা দিলে অন্যায় হয় না। এরই সঙ্গে তার মস্ত বড় টাকটার কথা মনে রাখতে হবে। তার বন্ধুমহলে এখন তাকে ফ্রায়ার বলা হয়ে থাকে। কেউ ফাদার বললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ফ্রায়ার টাক।

রং পছন্দ বাহ্য। সাদা মাংসের পুডিং এবং ক্ল্যারাটের উপরে তার এক ধরনের আকর্ষণ, নারী সম্বন্ধে একরকমের করুণামিশ্রিত শৈত্য, এবং মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতনতা তার এই ডাকনামটা স্থায়ী করবে বলে মনে হচ্ছে।

তিন কামরার এই ফ্ল্যাটে সে বাস করছে দশ বছরের উপরে। অকৃতদার পুরুষের সংসার, যদি অধিকাংশ দিনের লাঞ্চ ও ডিনার হোটেলে অথবা ক্লাবে খাওয়াকে সংসার বলা হয়। সুন্দরী পাঠিকা, আপনার সাজানো গোছানো মনে প্রবীরের ব্রেকফাস্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। আপনার কৌতূহল নিরসনের জন্য বলতে পারি এই ফ্ল্যাট সমষ্টির তত্ত্বাবধায়ক একজন অবসরপ্রাপ্ত হোটেল কর্মচারী। ডিম, হ্যাম এবং মিষ্টি কফির ব্রেকফাস্ট সে-ই ঢাকা ট্রে'তে প্রবীরের ঘরে পৌঁছে দেয়। দরকার হলে লাঞ্চ এবং ডিনারও।

কথাটা যখন উঠল তখন ফ্ল্যাট সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা যায়। এটাকে সিনেমাসঙ্কুল পল্লী বলা যেতে পারে। এই ব্লকের ফ্ল্যাটগুলোর অধিকাংশ, ধারে কাছের ব্লকগুলোর অনেকাংশে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত মানুষ বাস করে থাকে। সিনারিও লেখক, উঠতি ডাইরেক্টর, অভিনেতা, টেকনিসিয়ান, অভিনেত্রী।

কিন্তু প্রবীর নাট্যকার বলেই তার দিকে আমাদের পক্ষপাত। সুতরাং তার নাটকের কথা কিছু বলা যেতে পারে। পনের দিন হল, রেনেশাঁ থিয়েটারে সুরথ সোমের প্রযোজনায় তার নতুন নাটক 'সোনালী চামড়া' অভিনীত হচ্ছে।

রেনেশাঁ যেখানে অবস্থিত তাকে থিয়েটার পাড়া বলা হয়। নামটা সেকেলে হলেও আমরা বদলাতে পারি না। এই থিয়েটারে সুরথ সোম এবং তার মতো আর দু-একজন নাটক প্রযোজনা করে থাকে। অল্প সময়েই রেনেশাঁ ঐতিহ্য সঞ্চয় করেছে। সে ঐতিহ্যের একটা উপাদান এই যে মাঝে মাঝে এটির দরজা বন্ধ থাকবে। এবারও 'সোনালী চামড়া' উপলক্ষ্যে খোলার আগে লোকে ভাবতে শুরু করেছিল এবার বাড়িটায় একটা ডিপার্টমেন্ট-স্টোর বসবে।

থিয়েটার সম্বন্ধে কি তবে জনগণ উদাসীন? বরং বলা উচিত নাটক, যাকে আর্ট থিয়েটার বলা হয়, তার সম্বন্ধে জনগণের উৎসাহ কালোচিত ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। এই পাড়াতে, এই রাস্তাতেই একাধিক নাট্যগৃহ আছে যেখানে একই নাটক সাফল্যের সঙ্গে শত রজনী অভিনীত হচ্ছে।

রেনেশাঁ সম্বন্ধে শেষ কথা এখন বলা যাচ্ছে না। প্রবীরের বান্ধবী এবং সুরথ সোমের স্ত্রী বেলার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

বেলা বলেছে : এক ধরনের ক্ষণজীবী সাহিত্য-পত্রিকা আছে, ব্যবসায় মার খেয়ে উঠে যায়, জীবিতকালে যাকে আয়তনে পুষ্ট, বেশভূষায় উজ্জ্বল অন্য পত্রিকাগুলোর পাশে অন্ত্যজ বলে মনে হয়। থিয়েটারের মধ্যে রেনেশাঁ সেই সব ক্ষণজীবী পত্রিকার উপমেয়। অথচ একই রাস্তার উপরে নীল, সোনালী, সিঁদুরে এনামেলে রঙিন, আলো ঝলমল নাট্যগৃহগুলোকে দেখতে পাবেন। বিশ বছর আগে যে আধুনিকতা গত হয়েছে তারই রকম-সকম কী করে ব্যবসাতে লাগানো যায় তাও দেখতে পাবেন সেখানে।

এই জায়গায় সুরথ সোম প্রশ্ন করেছিল বিশ বছর? ঠিক বিশ বছরই কি?

বেলা : এ বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? চলতি ভাষায় যাকে আমরা সার্থক নাট্যগৃহ বলি কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পত্রিকা তারা ঠিক বিশ বছরের পুরনো জিনিসের কারবার করে কি না? তা হলে, আমার মনে হয়, মতদ্বৈধতায় না গিয়ে জিনিসগুলো দুই দশকের দু পাঁচ বছর বেশি পুরনো হওয়াও অসম্ভব নয়—এটা মেনে নেয়াই ভাল।

রেনেশাঁতে সুরথ সোম পরীক্ষামূলক নাটক নিয়ে পরীক্ষামূলক প্রযোজনা করে থাকে। সুরথ কতখানি

অ্যাটর্নি, আর কতখানি নাট্যপ্রযোজক এ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তার সমালোচকরা তা করেও থাকে। সুরথ একসময়ে বলেছিল—তার শরীরটা স'ছফিটের ইঞ্চি তিনেক কম হলেই সাবাজীবন সে অভিনয় করে কাটিয়ে দিত। দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সার্থক অ্যাটর্নি ব্যবসার চাইতে নাটক-প্রযোজনাকে সে কম মূল্যবান মনে করে না।

সুরথেব বন্ধুরা প্রচার করে প্রযোজনাব ব্যাপাবে সে বিশিষ্ট এবং স্বাশ্রয়ী। তাব চোখে ছন্দের বাহুল্য যেমন কাব্যের, জমানো প্লট যেমন উপন্যাসের, মঞ্চসজ্জাব পাবিপাট্যও তেমন নাটকের পক্ষে অশ্লীল! এমন নানা মত সে প্রয়োগ করে থাকে। সব মিলে তার উদ্যোগ এখনও পরীক্ষামূলক। প্রবীর কয়েকজন প্রযোজক নিয়ে পরীক্ষা করার পর স্থিব করেছে অতঃপর তার নাটক সুরথের দ্বারাই প্রযুক্ত হবে।

ব্রেকফাস্টের পবে চুরুট জ্বালিয়েছে প্রবীর।

এখন কী কববে সে? বই খুলেছিল দেখা যাচ্ছে।

আজ তৃতীয় সপ্তাহের শুরু তার নাটকের। কাল সুরথ বলেছিল : নবজাতক নিয়ে ছ' দিন পবে পনেব দিন পরে উৎসব করার প্রথা ছিল, তোমার নাটক তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করছে, একটা উৎসব করা যায় ; কিছু পবিবর্তন চিন্তা করছো কি?

প্রথম রজনীর পর নাটককে পরিমার্জিত করাব অধিকার অবশ্যই লেখকবা কাজে লাগিয়ে থাকে। তার জন্য নাট্যকাবের পক্ষে নোটস্ নেয়াও স্বাভাবিক, সুরথেব কথা মনে রেখে টেবলের কাছে ফিরে গিয়ে নোটবুকটাকে তুলে নিয়ে প্রথম অভিনয়ের তারিখের নিচে লেখা নোটস্গুলোতে চোখ বুলালো প্রবীব। নোটস্গুলো পড়ে পড়ে কিছুক্ষণ চিন্তাও করল সে।

তৃতীয় অঙ্কর পরেব সেই লম্বা বিরতিটা তার পছন্দ হয়নি। তখন থিয়েটাব-লাগোযা বাবে উঠে গিয়েছিল অনেকে, ফয়াতে, স্মোকিং বেঞ্চগুলোতে ভিড় জমিয়েছিল, হলে যাবা ছিল এ বক্স থেকে ও বক্সে যাওয়া আসা কবে শিষ্টাচার বিনিময়, ব্যবসার আলাপেব এমন কি সামাজিক পরিচয়েব সূত্রপাত করেছিল। এই বিরতি কাজের চাপে ব্যস্তসমস্ত প্রেস গ্যালারির মতেও অপ্রযোজনেব। আর নাটকে যা অপ্রয়োজনের, যা কিছু আলগা তাই ক্ষতিকব।

প্রেস-গ্যালারির মত, হ্যাঁ তা অবশ্য,—দেখা যাচ্ছে প্রথম অভিনযের পবে খববের কাগজে যে বিভ্রম থাকে সেটাই পরবর্তীকালে নাটকের সমালোচনায় ব্যবহার করা হয়। রদবদল কবে সমালোচকবা সেই মতেবই অনুবর্তন করে চলে। নতুবা নতুন কবে নাটকটাকে পড়তে হয়, অভিনয় দেখতে হয়। আব এই অনুবর্তন ত্রিশ বছব চলতে পারে—সাধারণত যা একটা নাটকের জীবিতকাল।

কিন্তু মঞ্চসজ্জাব বারো ফিট উঁচু স্টিলব্লু ব্যাকড্রপ যেমন, এই বিরতিও তেমন সুরথের পরিকল্পনাব অংশ। ব্যাকড্রপটা এ রকম একটা অনুভূতি আনে যে আমরা আমাদের উল্লম্ফন এবং উচ্চিৎকার সত্ত্বেও সবটুকু ভরে ফেলতে পারি না, কাল এবং পরিব্যাপ্তি তার তুলনায় অনেক ফাঁকা। বিরতিটা নাটকের থেকে দৈনন্দিন জীবনে সরে যাচ্ছে মন, তার ফলে নাটকের তত্ত্বও দৈনন্দিন জীবনের কাছে আসছে, কারণ মন নিজের অগোচবে তত্ত্বটাকে বহন করবে।

নোট খাতাব পাতা উল্টোতে উল্টোতে প্রবীরের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দিন সাতেক আগেকার একটা তারিখের নিচে কিছু নোটস্। 'যুদ্ধক্ষেত্রে কেউ মরে, কেউ সম্মান অর্জন করে, এটাকে ভাগ্য বলা যেতে পারে। এখনও নানা প্রাগ্রসর দেশেই লটারি-র‍্যাফেল প্রচলিত আছে। 'মানুষ না ভেবে যে কাজ করে সেটাই প্রতিভাদীপ্ত, ভেবে চিন্তে যা করে সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর।' কিন্তু এগুলোব নিচে দুটো পাতার অনেকটা জুড়ে একটা স্কেচ আঁকা।

নোটস কিছু নেয়া আছে। সর্বোত্তম চেষ্টাকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা নাট্যকারের কর্তব্যও বটে। কিন্তু স্কেচসমেত নোটস্গুলোকে চোখের সামনে রেখে প্রবীর ঠিক করল নাটকে নতুন কিছু লিখবার নেই।

স্কেচটা বরং মনে করিয়ে দিল সেদিন গম্ভীর মুখে নোটস্ নিতে বসে প্রকৃতপক্ষে সুরথের বক্সটাকে হাল্কা হাল্কা টানে স্কেচ করেছিল প্রবীর। সুরথের মাথায় পিছন দিকটা মুখের একটা পাশ সমেত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঝুঁটিদার, খুবই ঝুঁটিদার মনে হচ্ছে সুরথের ভঙ্গিটাকে। হারেমে রাজকীয় টার্কির মতোই। হয়ত তখন

নিজের প্রশংসা নিজের হারেমে উচ্চারিত হতে শুনে সে তৃপ্তি ভোগ করছে।

আর তা স্বাভাবিকও কারণ সুরথের বাক্সে, স্কেচই প্রমাণ, সেদিন বেলা ছাড়াও অন্য দুটি মহিলা ছিল। কিন্তু বেলা এই মহিলাদের সঙ্গে প্রবীরের পরিচয় করে দেয়নি। এটা একটা সামাজিক বিচ্যুতি হল না। কিংবা ভুল? এমন নয় যে সুরথের বক্সে রোজ সে সপরিবারে থাকছে! খুব সম্ভব এই অন্য দুটি মহিলার কোন একজনের জন্যই বেলার থিয়েটারে আসা। সাধারণ দর্শক নয়, নাট্যকারের বন্ধু যে প্রযোজক তারই অতিথি। ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর একজন।

আচ্ছা, আ, আচ্ছা ; বরং সে এখন বেরিয়ে পড়তে পারে। কিছু করার নেই এখন।

বেলার বাড়িতে যাওয়া যায়। তাকে এখন বাড়িতে পাওয়ারই কথা। সুরথ তার দপ্তরে চলে যাওয়ার পর থেকে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত বেলা বই পড়ে, ছেলেমেয়েদের তত্ত্ব তল্লাশ করে।

পরনে হয়ত সেমিজের উপরে চওড়াপাড় ইস্তিরি-লেপটানো শাড়ি, কানে সম্ভবত বড় একজোড়া দুল। এই পোশাকেই বেলা তার স্বকীয়তায় ফোটে—এরকম ধারণা প্রবীরের। এটার অন্যদিক এই-ধারণাটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে বেলাকে এই পোশাকে দেখার পরেই, কারণ এই পোশাকে বেলার শবীরের ঢিলে ভাবটা ফুটে ওঠে : চওড়া পেট, ভারি পাছা, মোটা বুক ; স্নিগ্ধ, আয়ত, ধীর চোখ, নাকের পাশে কিছু মেছেতার দাগ যা অন্য সময়ে পাউডারে মিলিয়ে যায়। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে তখন তার দুটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে দেখে মনে হয় না সেই তিনটি আধুনিক, মাজা, স্ট্রিমলাইনড্ শরীব এই শরীর থেকে উঠেছে।

উপরন্তু, এ সময়ে বেলার সেলাই-এর টুকরি রাখা টেবলটার পাশে অনায়াসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসা যায়। যে বেয়ারা দরজা থেকে বেলার কাছাকাছি পৌঁছে দেবে তাকেই বলে দেয়া যায় এক কাপ কফি পাঠাতে। তাতে বড় জোর বেলার মুখের দিকে তাকাবে বেয়ারা, আব তুমি যদি দেখতে জানো দেখবে বড় জোর ইঞ্চিখানেক মাথাটা নোয়ালো বেলা আর তা যেন সেলাই-এর ফোঁড় তুলতেই। কফি আসবার আগেই চেয়ারটাকে বেলার কুনুই-এর কাছে টেনে নিয়ে নিজের যে কোন সমস্যার কথা তাকে বলা যায়। তখন অবশ্যই তাকে সুন্দরী বলা চলে না। হয়ত বেলাব শাড়ি থেকে একটা মৃদু সুগন্ধিব ইশারা পাবে। কিন্তু তাতে সুরথের বিশেষ একটা সুগন্ধির দিকে ঝোঁকটা ছাড়া আর কিছু প্রমাণ হয় না। এ সময়ে মনে হবে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চাইতে অন্যের সুখ সুবিধার খোঁজ খবর নেয়াতেই বেলার ঝোঁক।

এখন তাকে দেখে মনে হয় না এক সময়ে সে খান কয়েক বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ করেছিল, অন্তত মোরাভিয়া নামে এক ঔপন্যাসিকের দুখানার অনুবাদ পর পর সার্থক বলে মানা হয়েছিল। বিদেশী সাহিত্যের সার্থক অনুবাদ রসগ্রহণের ক্ষমতা, ভাষার উপরে দখল, সাহিত্যে লাগবার মতো রুচি ইত্যাদি প্রমাণ করে। নিছক সাহিত্যকর্মই কারো অস্তিত্বকে শাণিত করে তুলতে পারে। মোরাভিয়ার উপন্যাসগুলোকে তখনও সমাজের একাংশ অশ্লীল বলতো। তার ফলে বেলার সাহিত্যকর্ম তাকে অত্যন্ত ধারালো কবে দেখাতো। সুতরাং নিজের সমাজেও সে দূরস্থিত আকর্ষণীয় একটি চক্চকে মেয়ে হয়ে উঠেছিল।

পোশাক পাল্টালো প্রবীর।

এই ফ্ল্যাটগুলোর একটা সুবিধা আছে। ট্যাক্সির জন্য ভাড়াটেদের বিব্রত হতে হয় না। নিচতলায় গ্যারাজ। ব্লকের মালিক গাড়ির যোগান দিয়ে থাকে। প্রাইভেট কারের মতো দেখতে এই গাড়িগুলো।

একতলার গ্যারাজে তার পছন্দসই সিঁদুর রঙের বুইকটাকে পেলো প্রবীর। তারিখ আর সময় লিখে মেকানিক লগবুক এগিয়ে ধরল।

এখানে একটু দেরি করল প্রবীর। তেলকালিমাখা গ্যারেজের এই মানুষগুলো সম্বন্ধে তার কিছু দুর্বলতা আছে। এদের সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা বলে সে। এরাও ভঙ্গিটাকে জেনে ফেলেছে তার ফলে যন্ত্র সম্বন্ধে প্রবীরকে চমকে দেয়ার, অবাক করে দেয়ার, টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে তার অজ্ঞতা প্রমাণ করার কোন সুযোগই তারা ছাড়ে না। প্রবীর তখন যে কথাগুলো বলে ইডিঅম ইংরেজি : 'না!' অথবা 'তুমি এ-রকম বলছো না!' অথবা 'তুমি বলছো!'

হাতে এখন অনেক সময়। বেলা একটা পর্যন্ত। তখন লাঞ্চ। বিশেষ মৃদুগতিতে গাড়িটাকে চালিয়ে

নিয়ে পথে নামল প্রবীর। দিনটা ঝক্‌ঝকে। রোদটা বরং কড়া হবে। প্রবীর অনুভব করল তা হলে তার ভাল লাগবে।

নোটসগুলোর কোন কোনটা এই সময়ে আর একবার মনে এলো, দু পাঁচ মিনিট মনের মধ্যে ঘুরল, কিন্তু সেটা সত্যিকারের লেখার ক্ষুধা নয়।

এ পাশ ও-পাশের দ্রুতগামী গাড়িগুলো অফিসের দিকে ছুটছে তা বোঝা যায়। তুলনায় প্রবীরের গাড়িটা গুড় গুড় করে গড়িয়ে চলেছে।

আর এক ঘণ্টা বাদে হলে কারো অফিসে গিয়ে দু' দশ মিনিট কাটিয়ে আসা যেতো। এ-রকম আড্ডা ভালও লাগে প্রবীরের। যখন ভারিগোছের কোন বুরোক্র্যাটের গাম্ভীর্য প্রবীরের অস্থানোচিত হাল্কামিতে কাঁটা হয়ে উঠতে থাকে।

এখন সঙ্গী পাওয়ার সময়ই নয়। অথবা সঙ্গী পেতে হলে তাকে সিনারিও লেখক, অভিনেতা, প্রযোজক বা তেমন কাউকে খুঁজে বার করতে হবে।

একটা ক্লাব আছে বটে জকিদের। ঠিক এই সময়ে তারা সেখানে স্নুকার খেলে থাকে। ধর্মের গোঁড়ামি এ বিষয়ে তাদের রীতিনীতির গোঁড়ামির কাছে হার মানে। প্রবীর নিজে একবার দীর্ঘস্থায়ী আলগা সময়ের চাপে আবিষ্কার করেছিল এই ক্লাবটাকে।

নতুবা একটা টাই অথবা চোখে লাগা একটা কিছু কেনার সুযোগে নিউ মার্কেটের দোকানে দোকানে ঘুরে সময় কাটিয়ে দিতে পারে।

একটা দোকানের সামনে গাড়ি থামালো সে। অনুভব করল কিছু একটা কিনলেও হয়। এক বাক্স চুরুট কিনলো সে। দোকানের সেলসম্যান মুখ চেনা। কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে প্রবীর নতুন কি কি সংগ্রহ এসেছে তার খবর নিল। কিন্তু কতক্ষণই বা তেমন খবর দেয়ার থাকে। চোরা চোখে ঘড়িটা দেখল সে। আধ ঘণ্টা কেটেছে।

এতক্ষণ তো সে পূর্বদিকে এসেছে এবার দক্ষিণে গেলে হয়।

আর মিনিট দশেকের পরে একটা পাবলিক বুথের সম্মুখে গাড়ি থামাল প্রবীর। রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ চওড়া সিঁড়ি। মোটা মোটা পলতোলা থাম। সেগুলোর মাথায় একটা প্রকাণ্ড সমবাহু ত্রিভুজ। ছবিতে দেখা কোন বিখ্যাত স্মৃতিমন্দিরের ছাপ আছে। প্রবীরের মনে হল, আপাতদৃষ্টিতে নরম লোককে কখনও কখনও খুব শক্ত হতে হয়। বন্ধু বান্ধব, সমশ্রেণীর অন্য সকলের কাছে যা অসম্ভব তেমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রায় পশুর মতো দাসের মানুষদের জন্য যুদ্ধে, গুলিছোঁড়া যুদ্ধেও নামে নরম মানুষটি।

কিন্তু পাবলিক বুথ তো। স্লটে পয়সা ফেলে ডায়াল করল প্রবীর।

—তুমি প্রবীর তো? কোথায়?

—পথে, পাবলিক বুথে।

—সে কি। বিপদ নয় তো? আসবো?

—না না। আদৌ না। ধারে কাছে কোন বিপদ নেই। না, বেলা।

টেলিফোনে ভাসা কণ্ঠস্বরে কথার সেই সূক্ষ্ম আঁশগুলোকে লক্ষ্য করা যায় না, যা চোখে মুখে উজ্জ্বলতার তারতম্যে ধরা পড়ে। বেলা কি নিরাশ হল?

বেলা বলল আচ্ছা, আচ্ছা, বলো তো কি, কি করছো তবে ওখানে।

—কিছু না, একেবারেই কিছু না। ঘুরছি একটু। স্বাস্থ্যের পক্ষে—তুমিই বলেছিলে।

—এখানে এসো না হয়।

—বাল আচ্ছা আজই অন্য এক সময়ে।

ফোনটাকে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে প্রবীর বলল তোমার কি ধারণা হয়, বেলা, কোথায় যাওয়া যায় এখন?

—পীযূষ মিত্রের কাছে যাবে?

—পীযূষ পি. ইউ. পাগ পাস, ম্‌ ম্‌ ম অর্থাৎ তুমি বলছো।

—পীযূষ মিত্র একজন সিনারিও লেখক খুঁজে হয়রান হচ্ছে। আর তুমি যদি একবার এদিকে মন দাও।

তোমাব চেষ্টা সত্ত্বেও আর গোপন নেই যে কয়েকটি স্ক্রিপ্টে তোমার হাত আছে।

—মানে—

—তুমি পীযূষকে পাগ্ আর পাস্ বলেছ বটে।

—দেখ শব্দ দুটো ইংরেজি। লিখতে পি আর ইউ লাগে।

—পীযূষ শব্দটা ইংরেজিতে লিখতে তা লাগে ব'লেই তোমার মনে এসে থাকবে। আর তার নাম সই-এ ও দুটো অক্ষর স্পষ্ট।

কিন্তু—

—না, না, বেলা। আমার সময় বেশ কাটছে। তুমি নিজেকে এমন অকেজো লোক মনে ক.রা কেন যে সময় কাটছে না ব'লেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আচ্ছা, তুমি বলতে পারো ব্যারোক্ প্রদর্শনীর কি হয়েছে?

—ব্যাবাক্?

—হ্যাঁ ব্যাবোক্।

—তুমি ঠিক জানো ব্যারোক্?

—তাই শুনেছি।

—আমি জানি না! ..কিছু একটা হচ্ছে বটে। সে তো পুরনো চৌরঙ্গীব কাছে! যোগাড়যন্ত্র চলছে। ছবিটবি ঝোলাচ্ছে। বোধ হয় আসছে সপ্তাহে খুলবে। কিন্তু পীযূষ কয়েকদিন আগে তোমাব উল্লেখ করছিল। প্রস্তাবটাকে ভেবে দেখো। আমি শুনেছি চেক্ নিয়ে কোন হুজ্জুৎ ক'রে না।

—না, না। একশ'বার। ওটা কিছু নয়। নিশ্চয় আমি চিন্তা করবো।

রিসিভাবটাকে ঝুলিয়ে রেখে প্রবীর নেমে এল। ব্যারোকো, বড় বদখৎ মুক্তা, মাইকেল এঞ্জেলো প্রথম, এটা এখন আর গোপন নেই কোন কোন সিনেমা স্ক্রিপ্টেব সঙ্গে সে যুক্ত। পীযূষ মিত্রেব হয়ত কথাটা ঠিকই যে পীযূষ মিত্র চেক নিয়ে হুজ্জুৎ করে না। যা আব কোন কোন সিনেমা ডাইরেক্টব করে থাকে। আব এ-রকম একটা কথাও আছে পীযূষ সিংহ বটে উপবন্তু কিছুট রোঁয়া ওঠা, কিছুটা ক্ষুধার্ত। ইতিমধ্যে একটা অসমাপ্ত সিনেমাব সঙ্গে তাব নাম যুক্ত হয়েছে। এটা কি সত্য নয় যে বর্তমানকালে সৎ মানুষের পক্ষে কোন মহৎ আর্টকে সমাপ্ত কবা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রবীর নিজেব উপবে খুশি হয়ে উঠল। সুন্দর পেরেছে সে সিনারিও লেখকদের ভাষায়, ম্যানেজ করতে। এই কায়দাটাকে অভ্যাসে এনে ফেলতে হবে। অভ্যাস মানুষেব দ্বিতীয় স্বভাব। বোধ হয় তখন বেলার এমন সব অনুবোধের সামনে কপালে বিন্ বিন্ কবে ঘাম ফুটবে না। বেলাব মুডেব সম্বন্ধে না জেনে তাকে ফোন করা সব সময়ে নিরাপদ নয়।

কিন্তু চেক্ একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বেলাব পক্ষ থেকে এ-রকম যুক্তি উঠবে ধবে নেয়া যায়, সাধারণত পুরুষমাত্রই নিজের মঙ্গল অমঙ্গল সম্বন্ধে অজ্ঞ। বেলা জানে সংসারেব ব্যাপারে পুরুষ হুঁ হাঁ কবা ছাড়া আর যা কিছু করতে যায় তাতে, বিড়ম্বনাই বাড়ে। প্রকৃতিই তৎপরা, পুরুষ দর্শক মাত্র, নিজেব সংসাবেব এই সারাৎসার তত্ত্ব উপলব্ধি করেই সেকালের দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখেছিলেন।

এ চিন্তাটা অথবা এ-ধরনের চিন্তাগুলো বেলা সব স্ত্রীলোকদেব সঙ্গে সমান ভাবেই করে থাকে! কিন্তু বিশেষ ধরনের চিন্তাও আছে, যেটা স্ত্রীলোকদের কেউ কেউ করে যখন পুরুষকে সমাজের কেজো সদস্য হিসাবেও দেখতে চায়।

সমাজে চেক্বহুল কেজো সদস্য হিসাবে দেখা দিতে হলে প্রবীরের পক্ষে পীযূষ মিত্রের হয়ে সিনারিও লিখে দেয়াটা প্রয়োজনের চাইতে বেশী, বলা উচিত, স্বাভাবিক। প্রবীরেব পক্ষে এজন্য যে চল্লিশ বছরের দাগ পার হওয়ার পর সে এখন কি দপ্তরে গয়ে বসতে পারবে আর? আর পীযূষ যখন নিজে থেকেই আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষ পীযূষ সেই রকম একজন সিনেমা প্রযোজক যে চেক সম্বন্ধে হুজ্জুৎ করে না এবং রোঁদ্যা মিয়াম্দানির মতো মহৎ না হলেও, তাকেও সিংহ বলার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

বেলা এতগুলো শব্দে বলেনি, কিন্তু প্রবীর অনুভব করল বেলা এরপরে যখন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কোন

ডিনার টেবলের আড়াআড়ি তারদিকে তাকাবে তখন এই কথাগুলোই সেই বিষণ্ণতার তাৎপর্য হবে।

কথাটা টাকা পয়সার। সোজাসুজি বলে দিতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু একবার বলে নিতে পারলে সুবিধা আছে। অনেক সঙ্কট এড়ানো যায়, ভান করার দরকার কমতে থাকে।

আর্ট থিয়েটারকে অবলম্বন করেই কেউ কেউ প্রফেশ্যনের সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে। প্রবীরের বেলায় তা হচ্ছে না। অন্যদিকে নিয়মিত সিনারিও লিখবার কমিশন নিলে প্রবীরের আয় দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছতে পারে। এরই সঙ্গে মনে করতে হবে পীযূষ খাঁটি 'রিয়েল' রোঁয়া ওঠা সিংহ যে চেক্ নিয়ে হুজ্জুৎ করে না।

এটা কি একটা সিচুএশন্, যাতে প্রবীরের চরিত্র ধরা পড়বে?

প্রবীর সাণ্ডেল লিখে থাকে। কেউ কেউ বলে তার লিখবার একটু আলগা স্টাইল আছে। তার এই স্টাইলকে ইতিমধ্যে নকল করতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সে সব নকলে যথেষ্ট আলগাভাব থাকলেও কি যেন একটু থাকে না যা থেকে বোঝা যায় সেটা প্রবীবের নয়। দু একজন সাহিত্য সমালোচক আচমকা এমন উক্তি কবেছে যে ইতিহাসের পাতায় পাতায় নামকরা লেখকদের জমাট মজলিশের পাশ দিয়ে লম্বা ফ্রককোটপরা একজন স্টাইলিস্টকে আপন মনে হাতের পাকানো সরু ছাতাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলতে দেখা যাবে। ইতিহাসের কথা ফস্ ফস্ করে বললে অতিশয়োক্তি হয়, এটাও সম্ভবত তাই, কিন্তু প্রবীরের স্টাইলে লেখা।

যার লেখার স্টাইল সম্বন্ধে আমরা কিছু আশা রাখি, এত কথা বলি, তাদের নাম বলতেই চিনতে পারছি না কেন?' অন্য কথায় লিখবার এমন একটা স্টাইল থাকতেও সে উপন্যাস লিখলো না কেন? কারণটা অবশ্যই তার মেজাজ। এর ফলেই কেউ কেউ তাকে সিনিক বলে। তারাই বলে সিনিক হতে গেলে যে বিশেষ যোগাযোগ থাকা দরকার তা তার আছে। কিন্তু যারা তাকে ফাদার অথবা ফ্রায়ার বলে তারা বুঝে সুজে তাকে বরং ফিনিকল্ বলে শেষের অর্ধ 'ল'কে উচ্চারণ না করে।

মৃদুগতিতে সিঁদুর রঙের বুইকটাকে এদিক ওদিক এ-চক্কর ও চক্কর চালাতে লাগলো প্রবীর নিউ চৌরঙ্গীর স্রোতে। দু একবার তার মনে হল একটা পাকে পড়েছে, বেরোতে পারছে না।

ভাবতে না ভাবতেই সে চক্কর কেটে বেবিযে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যেই ঠাহর করল সে ওল্ড চৌরঙ্গী ধ'বে চলেছে। ট্র্যাফিক দ্বীপে গুলমোর, আর গুলমোরের মাথা ছাড়িয়ে ইউক্যালিপট্যাস থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু গুলমোর কি থাকতে দেবে? রাস্তার নিচে যে দিন থেকে ট্রামের রাস্তা হয়েছে তখন থেকে কথা উঠেছে গাছপালার শিকড় নিচতলার রাস্তার ক্ষতি করবে। আজকের রোদে গুলমোরগুলো দেখার মতোই মনে হচ্ছে। প্রবীর অনুভব করল—রেখে দেবার মতোই ; ও, লেট্ দেম বি লেফট্!

এখন, ওল্ড চৌরঙ্গী এমন জায়গা, আমার তো মনে হয়, যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এখানে আসে না। কোন কোন দূরদেশের এয়ার-টিকেট, আর্কিওলজির মিউজিয়ম, দু একটি কিম্ভুত নামের সরকারি অফিস সাধারণত যাব উদ্দেশ্য বুদ্ধির অগম্য, বিক্রয়যোগ্য চিত্রের প্রদর্শনী, উৎকৃষ্ট না হোক দামী মদের দু-একটা দোকান, মার্বেল সিঁড়ি সমন্বিত কিছু সেকেলে ধরনের ফ্ল্যাট, ইত্যাদি ইত্যাদি যদি উদ্দিষ্ট হয় তবে এদিকে এসে লাভ আছে।

গুড় গুড় করে প্রবীরেরর গাড়িটা এগিয়ে গেলো আরও দু তিন মিনিট। কখন থামলো বোঝা গেলো না এমনভাবে থেমেও গেলো। রূপসী পাঠিকা, প্রবীরের স্টাইলটা নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন। সে ব্যারোক চিত্রপ্রদর্শনীর দরজায় গাড়ি থামিয়েছে কিন্তু তার চলা দেখে মনে হচ্ছিল গায়ে রোদ লাগানো কিংবা গুলমোর সম্বন্ধে মন্তব্য করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য তার নেই। অবশ্য গুলমোরের কাছাকাছি সুরথ অথবা তেমন কেউ থাকলে সে হয়ত আর এগোতো না। সে কি তা হলে এই চল্লিশ বছরে সত্যি নিঃসঙ্গ? নাকি ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ আর তারপরেও কিছুক্ষণ এটাই চল্লিশ পার হওয়া ব্যাচিলরের ভাগ্য?

বেলা যেমন বলেছিল, চিত্রপ্রদর্শনী এখনও দর্শকের জন্য খোলা হয়নি। মাপজোখ ছবি টাঙানো চলছে। কর্তাব্যক্তিদের অফিসে দু-একজনকে পাওয়া গেল। তিনটে করিডর আর দুটো হলে প্রদর্শনী সাজাো হবে।

প্রবীর বলল, 'ছবি দেখতে এসেছি, মশায়'।

'কিন্তু এখনও, সে তো রবিবারে—' ওরা হতভম্ব।

'একমেটে দোমেটে দেখা আমাদের দেশে রেয়াজ ছিল।' প্রবীর হাসিমুখে বলল।

কর্তাব্যক্তিদের একজন এরপরে যে হলটা সাজানো হয়েছিল সেখানে নিয়ে গেল প্রবীরকে। আধুনিক সন্ন্যাসীর মতো এই সাগুেলকে তারা অনেকবার চোবা চোখে লক্ষ্য করল। উপন্যাসে রীতি অনুসাবে এখানে প্রদর্শনীর কিছু বর্ণনা পাঠক-পাঠিকা আশা করতে পারেন। এই সুযোগে আমাদের পাঠক ও পাঠিকার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে নিতে চাই। এ-রকম ক্ষেত্রে বর্ণনীয় বিষয়গুলোকে আপনাদের অভিজ্ঞতার উপবে ছেড়ে দিল ভাল হয়। আপনারা অনেক প্রদর্শনী দেখেছেন, নব-ব্যারোক আন্দোলন যা বিমূর্ত চিত্রণ পদ্ধতিব আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে আপনাদের অজ্ঞাত কিছু নেই। ঠিক এই সময়েই আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল। সে জন্যই কর্তাব্যক্তিরা শেষপর্যন্ত প্রবীরের উৎসাহে উৎসাহিত হযে উঠল। নতুন কোন আন্দোলনে যেমন হয়।

ছবি দেখে এবং কর্তাব্যক্তিদেব সঙ্গে আলাপ করে প্রায় একঘণ্টা কাটলো প্রবীবেব। সে সিদ্ধান্ত করল দু-তিনবার অন্তত এই প্রদর্শনীতে আসতে পারবে সে। এবং অন্তত একখানা তেলরঙের ছবি নিজের ফ্ল্যাটে টাঙানোর জন্য সংগ্রহ করবে।

গাড়িতে বসেও ছবিটাব কথা মনে এলো তার। ক্রাইস্টকে ক্রস্ থেকে নামানো হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য তাঁর গায়ের বং গাঢ় বাদামি, পুরু ঠোঁট, মোটা খাঁদা নাক। সবুজ আখক্ষেতে নীল ক্যাবেবিযান আকাশের প্রভাব ; যেন ক্যালিপ্সো শুনতে পাবে, ক্রিকেটনেট, স্মক ফ্রক পরা ক্রিওল শ্রমিক, অন্তর্বর্ত্নী তিনটি নাবী যাদেব মুখ চোখে স্প্যানিশ প্রভাব কিন্তু যাদের গায়ের রং ববং কালো।

কথাটা এই ' খোঁজো, তোমাকে দেয়া হবে , চাও, তুমি পাবে। খুশিতে হেসে ফেলল প্রবীব সাগুেল। কথাটা মূল্যবান না হলে এতদিন পরে আবার প্রমাণিত হত না। খোঁজো, তোমাকে দেয়া হবে। এবং তা আশ্চর্যজনকভাবে, তোমাকে অবাক করে দিয়ে, তুমি যা আশা কবোনি ততখানি। এই ছবিটা আর ঠিক যখন বিমূর্ত চিত্রণ কৌতূহলী ফিলিস্টাইনদের জন্য সাজানো মূল্যবান ইয়ারকি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন বিখ্যাত আঁকিযের সেক্রেটারি যেন কথাটাকে ফাঁস করে দিয়েছে।

ধাবে কাছে আর একটা টেলিফোন বুধ নিশ্চযই আছে। প্রবীর সাগুেল বেলাকে ডেকে চিত্রপ্রদর্শনীব কথা বলবে এমন তাগিদ অনুভব করল। কিন্তু আসলে এটা পাওয়া নয়, পাওযার আশা। রবিবারের পরে যা পাওয়া যাবে তার প্রত্যাশা। কি সুন্দর বলো তো জীবন?

চুরুট ধরিয়ে নিলো প্রবীর। লাঞ্চ পর্যন্ত সে এখন মনুমেন্টের কাছে গিযে কাটাতে পারে। এদিকে বোজ আসা হয় না। লাঞ্চের পরে সে তার নাটক সম্বন্ধে চিন্তা করবে। নবব্যাবোক আন্দোলন সম্বন্ধেও।

ট্র্যাফিক্ আইল্যান্ডের ইউক্যালিপটাস আর গুলমোর লাঞ্চ পর্যন্ত, লাঞ্চের পর মনুমেন্ট। এমন ব্যবস্থাও করা যায়। এখন উত্তাপটাও বেশ চড়া হয়ে উঠেছে দিনের। চামড়ায় তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করছে। প্রবীরেব অনুভূতিটাকে অন্য কোন উপায়ের অভাবে ভাষায় মোটামুটি দিনটাকে অনুভব হচ্ছে এ-রকম বলা যায়।

লাঞ্চের জন্য ক্লাবে যাওয়া যায়। কিন্তু ক্লাব ড্রুরি লেনে।

গুলমোরের পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে প্রবীরের মনে পড়লো এদিকের একটা হোটেলে সে এবং বেলা একটা দিনের আট ন ঘণ্টা কাটিয়েছিল। সেদিন বেলার অনূদিত প্রথম উপন্যাসটা বাজারে এসেছিল বিক্রির জন্য। বেলাকে কোণঠাসা বিপ্লবী মনে করলে হোটেলের ঘর দুখানাকে অবরুদ্ধ দুর্গ বলতে হয়।

সেই সময়েও, অর্থাৎ যখন সে এবং বেলা হোটেলে একটা দিনেব অনেকক্ষণ কাটিয়েছিল, প্রবীরের স্কেচ করা অভ্যাস ছিলো। তা না থাকলে বেলার মতোই নার্ভাস হয়ে পড়তো সে। ইলোপমেন্ট এই শব্দটাই ব্যবহার করে তাকে বন্ধুমহল এই ঘটনাটাকে উল্লেখ করতে। বেলার খান পাঁচেক স্কেচ করেছিল সে। বই হাতে বেলা, ফাউন্টেন পেন কামড়ে ধরা বেলা, স্নানার্থিনী বেলা, ঘোটকী হেন বেলা।

প্রবীরের মুখে হাসির উজ্জ্বলতা দেখা দিল। কোথায় আছে, আছে কি না সেই কালির স্কেচগুলো কে জানে। তখন তার স্কেচের মধ্যে চিত্রীদের নিপুণতা থাকতো নাকি? এখন, যেমন নোট বুকের পাতায় সুরথের বক্সের স্কেচে, অধৈর্যর ভাবটাই দেখা যায় কিংবা কার্টুনিস্টদের ভঙ্গি।

কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর নয় বেলার কাজন্। বয়স অনুমান চল্লিশ। সুরথকে রাজকীয় মোরগ বলতে হলে তাকে ধারে কাছের সব চাইতে বাহারে দেয় বলতে হয়। কিছু বিদেশী, কিছু অসাধারণ।

মসৃণ পুরনো হাতির দাঁতের মতো ত্বক, সুগড়ন ঝক্‌ঝকে দাঁত, চক্‌চকে চোখ, অচঞ্চল মুখের পেশী, বড় এলো খোঁপা থেকে বেরিয়ে আসা খয়েরি রঙের এক গোছা নরম চুল। কিন্তু পাথরের মতো , চুল, চোখ, ঠোঁটে রং দেয়া হয়েছে এমন পাথরের মতো, ঠোঁট দুটো পানসে গোলাপী।

এটা অসামাজিকতার ত্রুটি হয়নি বেলাদের পক্ষে যে প্রযোজকের কিছু অতিথিকে নাট্যকারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়া হল না? প্রথমবারের একটা ঘটনার সব দিক দেখা যায় না। এই দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে প্রশ্নটা মনে আসতেই প্রবীর দেখতে পেলো,—সেদিন সে থিয়েটারে দেরিতে গিয়েছিল আগে চলে এসেছিল। নিশ্চয়ই সুরথ তাকে খুঁজে পায়নি।

পরে সুরথ তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিল, জানিয়েছিল যে অভিনেত্রী নায়িকার অংশে নামছে তাকে দুরাতের ছুটি দিতে হবে। প্রবীর তা অনুমোদন করে কি না। 'নিশ্চয়ই, ছুটি খুব ভাল উদ্ভাবন। কিন্তু তোমার অসুবিধা হবে না?' 'তেমন নয়, আর একজনকেই গোড়াতে তৈরি করেছিলাম যদি মনে করে দেখো। একটু বেশি বয়স, আর তার চাইতে অনেক সুন্দরী একে পাওয়া গেল বলেই সাইডপার্টে সরিয়ে দিয়েছিলাম। যদি ছুটি দেয়া যায়, দুটো পার্টই সে করতে পারবে আর তাতে অসুবিধাও না।' 'চেহারার সাদৃশ্য? নায়িকা আর সাইডরোল দর্শকরা গুলিয়ে ফেলবে না?' 'তাতে লোকসান নেই। সাইডরোল ঋতু পরিবর্তন বোঝানোর জন্যই লিখেছো। মাঝখানের সময়ের ব্যবধান বোঝানোর জন্য। "সাইডরোল না বুঝে দর্শক যদি ছদ্মবেশে নায়িকা বলে বোঝে তাতে নাটকের ক্ষতি হয় না ' তা হলে ছুটি দিও।'

সুতরাং আজ থেকে দু রাত প্রধান অভিনেত্রীর ছুটি।

এ সময়ে অভিনেত্রী বদলকে মাঝ ঝরনায় ঘোড়া বদলানো বলা যেতো। কিন্তু ও ইঙ্গিতটাও মন্দ নয় যে নায়িকাই অপরিচিতের মতো পোশাকে বেরিয়েছে। পোশাকটার তা হলে বদল দরকার। মুখের কথারও দু একটা হেরফের। গ্রে রঙের গ্রেট কোটের বদলে, কালো রঙের গ্রেট কোট ভাল হয়। কথায় দু একটা অসহিষ্ণু অব্যয় জুড়ে দিয়ে নায়িকার আন্তরিক ক্লান্তি দিতে হয়।

বদলী অভিনেত্রীর নাকের ডগাটা উপরমুখো। এটা খুঁত। কিন্তু হয়ত কারো কারো ভাল লাগে। কণ্ঠস্বর ভাল। শরীর একটু ভারি।

হোটেলটা ওল্ড চৌরঙ্গী থেকে বেরোনো একটা গলির মধ্যে। হোটেলের দিকে এগোতে গিয়ে একটা ট্রাফিক আইল্যান্ডকে আধখানা চক্কর দিতে হল। এতক্ষণে দিনের উত্তাপে পিপাসা পেয়েছে। একটা বাজতে অল্প দেরি আছে। লাঞ্চের সময় হল।

হোটেলের দরজায় প্রবীর সাগুেল ভাবল, দেখা যাক সুরথ যখন সাহস পাচ্ছে।

দেয়ালের প্লাকে নিরামিষ আমিষ লাঞ্চের হল দুটোর পথ দেখানো। এখনই ভিড় হওয়ার সময় হয়নি। ছ' আনা টেবলে লোক বসেছে, বাকিটা খালি। একেবারে কোণের দিকে দু তিন খানা টেবল খালি। এক সারি আগে এক টেবলে একজন মহিলা একা—খাদ্যের জন্য অপেক্ষা করছে। মহিলাটির টেবলের পাশ দিয়ে প্রবীর তার পছন্দ করা টেবলের দিকে এগিয়ে গেল। খালি ঘরে ওয়েটারকে সহজে পাওয়া যায়। প্রবীর একটা সাদা মাটা চাপাটি তরকারি লাঞ্চের অর্ডার দিল।

মহিলাটিকে খুব নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে না? নিঃসঙ্গ, তা, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কখনও কখনও ভিড়ের মধ্যেও হঠাৎ সে রকম হতে পারে। কিংবা ওটা তার গাম্ভীর্যের ফল। নীল পাড় বসানো দুধে কড়িয়াল। চৌকোণ পরকলার চশমা। ওহো। সেদিন সোনালী ফ্রেমের গোল চশমা ছিল। ভাবল প্রবীর আর খোঁপাটা আরও বড় আর আলগা ছিল, খোঁপা থেকে এক গোছা চুল অশ্বপুচ্ছের আভাস দিয়ে ঝুলছিল। কিংবা বরং পিছন থেকে মুখের একটা পাশ দেখে স্কেচ করেছিল সে।

মহিলাটি আধমিনিট সময়ে দু-তিনবার প্রবীরকে লক্ষ্য করল। তারপর সে-ই আগে বলল, 'একা নাকি?'

প্রবীর বলল, 'হ্যাঁ একাই এসেছি।'

আধমিনিট পরে মহিলাটি বলল 'আপনাকে—

এবার প্রবীরকে উঠতে হল, মহিলাটির টেবলের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হল। 'কিছু বলছেন আমাকে?'

'বসুন'।

প্রবীর সময়-উপযোগী কথা খুঁজতে লাগল।

'চিনতে পাবেননি? বসুন, এই টেবলেই বসি দুজনে।'

প্রবীরের মনে হল চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছে এর আগে, সুবথেব বক্সে দেখবাব আগে। চোখ দুটি? নাকি হাত দুখানা? প্রবীর চেয়ার টেনে বসলো। মহিলাটি ওয়েটারকে ডাকলো। বলে দিলো, 'একই টেবলে খাবার দিও। সাহেব যে খাবারের অর্ডাব দিয়েছেন আমার জন্যও তাই এনো।' বোধ হয় তোমাদের অসুবিধা হবে না।" প্রবীব বললে, 'দুটো অর্ডাব মিশিয়ে আনুক।' মহিলাটি হেসে বলল, 'তাও হয়, সেটাই ভাল হবে।'

ওয়েটার মাথা নুইযে চলে গেলো।

মহিলা . ভেবে বেখেছিলুম বেলাব বাড়িতে দেখা হয়ে যাবে, এখন ধন্যবাদ দেবো। নাটকেব আগে পবে সেদিন আপনাকে পাওয়া যায়নি।

প্রবীর সাগুেল . আপনি খুশি হযে থাকলে ধন্য হযেছি।

লাঞ্চ এসে গেলো। এখানে পাঠক পাঠিকাব সঙ্গে একটা পবামর্শ কবে নিতে চাই। একজিবিশনেব ব্যাপারে যেমন, লাঞ্চ ইত্যাদির ব্যাপাবে বর্ণনাকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপবে ছেড়ে দিতে চাই। কারণ হিসাবে বলা যায আহাবাদিব বর্ণনাতে লেখকের ব্যক্তিগত রুচির ছাপ থাকে বলে মনস্তাত্ত্বিকবা ইঙ্গিত করেন, যার সত্যাসত্যের প্রমাণ দেযা বাঞ্ছনীয় মনে করি না, কিন্তু আসল কাবণ গল্পটাকে সহজ কবা।

লাঞ্চের মাঝামাঝি মহিলাটি বলল, 'আমাব নাম মিত্রা। এখন কি চিনতে পাবছেন?'

বডা জাতীয় কিছু একটা বেসামাল হল প্রবীরের মুখ আব কাঁটাব মধ্যে। কাযদা কবতে সে মাথা নোযালো। মনে মনে সিদ্ধান্ত করল—এটা অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে মহিলাটিকে চিনতে পাবছে না।

এরপবে খাদ্য নিয়ে আলাপ চলল। আর কিছু খাওয়া উচিত কিনা, কি ধবনেব খাদ্য ইত্যাদি।

লাঞ্চেব প্রায় শেযে মিত্রা বলল, 'যখন দেখা হল আপনার সঙ্গে আর খানিকটা সময় কাটাতে পাবলে ভাল হত।'

'আদৌ নয়, আদৌ নয়। আপনাব কাজ থাকতে পাবে। তা থাকাই স্বাভাবিক। হযত কোথাও যাওয়াব জরুবী তাগাদা আছে।'

'ব্যাপাবটা তাই।' ছোট্ট একটা তৃপ্তিব শব্দ কবে মিত্রা বলল, 'একটা সভায় একটু দরকাব আছে। নতুবা—'

ন্যাপকিনে মুখ মুছে সিগারেট ধরালো মিত্রা। প্রবীরের সামনে কেসটা এগিয়ে ধরলো।

বিল চুকিয়ে বাইবে এসে মিত্রা ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়ালো। এ রকম ক্ষেত্রে পুরুষেব পক্ষে অন্তত সঙ্গের মহিলার ট্যাক্সি যোগাড় না হওযা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বিধেয়।

পরিবর্তন অভূতপূর্ব হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা নজরে পডবে এমন কথা নেই। এ পথে অন্তত দশ পনরো মিনিটে ট্যাক্সি পাওয়াব কথা। মিত্রাব ঘড়িদেখা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে তার তাড়া আছে। বিশ মিনিট অপেক্ষা কবার পব ধবা পড়ল ব্যাপাবটা—একটা ট্যাক্সিও বাঁ বা ডান ফুটপাতের দিকে এগোচ্ছে না। ট্যাক্সিব বিশেষ বং যানবাহনের স্রোতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বটে কিন্তু তা রাস্তাব মাঝ-বরাবর স্রোতেব ঠিক মাঝখানে দূরপাল্লায় চলেছে।

মিত্রা হাসিমুখে কিন্তু বিরক্তির স্বরে বলল, 'কি ব্যাপাব, ধর্মঘট করেছে নাকি?'

প্রবীর বলল, 'ধর্মঘট। কই না তেমন কিছু শুনিনি।'

পাশে অপেক্ষমান একজন পথচারী বলল, 'ধর্মঘটই। নিচতলার ট্রামসার্বিসে ধর্মঘট হলে এসব পথে ট্যাক্সির আকাল পড়ে। সব দেখুন গে অফিস পাড়ায় আব স্টক এক্সচেঞ্জে ভিড করেছে।'

'তা হলে?' মিত্রা বিপন্ন বোধ করল। বিবক্তমুখে কিন্তু সরস গলায় বলল, 'এমনটা ঠিক প্রত্যাশা কবিনি।'

আমরা জানি এটা প্রবীরের পক্ষে কোন সমস্যাই নয়।

সে বলল, 'আরও খানিকটা একসঙ্গে যাওয়া যাবে, আসুন। ভালই হল, খুবই ভাল।'

এই বলে সে তার সিঁদুরে বুইকটার পাশে গিয়ে দরজা মেলে ধরে দাঁড়ালো।

গাড়িতে বসে মিত্রা বলল, 'যোগাযোগ কেমন ঘটে দেখুন।'

প্রবীর বলল, 'সেকালের রবিঠাকুর এমন সব ধর্মঘটকে ভদ্রগোছের ভালুক বলেছেন।'

হেসে মিত্রা বলল, 'র‍্যাভিশিং!'

দেখা গেল মিত্রার হাসি বেশ তরল। সে হাসলে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। সাধারণ কথার কণ্ঠস্বর বরং ভারি। এস্রাজের প্রথম পিতল তারটার কথা মনে হল প্রবীরের। আজকাল উপরতলার রাস্তায় যত গাড়ি চলে তার বড় একটা অংশ ট্যাক্সি। তাদের অভাবে পথে ভিড়ই যেন কম। মিত্রার ঠিকানা 'সেমিনার'-এ পৌঁছতে কম সময় লাগল সে দিনের চাইতে।

ইস্ট লেক এভেন্যুতে সেমিনার। ৮৩ নম্বর ইস্ট লেক এভেন্যু। সেমিনারে দোতলা বাড়িটাকে চারিদিকের পাঁচ সাত তলা বাড়িগুলোর তুলনায় বড় জাতের মনে হয়। আকাশ থেকে দেখলে এক ফালি মাঠের মধ্যে একটা শ্বেত পাথরের বেদী বলে মনে হবে। চারিদিকের রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে হলের বারান্দায় পৌঁছানো যায়। বড় বড় ঘর চারিদিকে, এ পদ্ধতিটাকে এখনও ডোরিক বলা হয়। জানালাগুলোতো বটেই দেয়ালের অনেকাংশ ফাইবার গ্লাসের। দেয়ালের কাচ মসৃণ দুধ রঙের, জানালার কাচ নক্সাদার।

শহরের পক্ষে এটা ভালই হয়েছে। পাবলিক হল হিসাবেও বটে আকাশেও খানিকটা ফাঁকা রাখা গিয়েছে বলেও বটে।

সেমিনারেব সিঁড়িতে মিত্রাকে নামিযে দিয়ে প্রবীর গাড়ি ঘুবিয়ে নিলো। দবজাব কাছে নোটিশ বোর্ডটা চোখে পড়ল তার। বেশ বড় কালো হরফে লেখা আছে 'দুইটি সংস্কৃতি'। তার তলায় দুটি তারিখ, তার একটা অবশ্যই আজকের। তার তলায় বক্তাদের নাম। প্রবীরের মনে পড়ল মাস দুয়েক আগে খবরের কাগজে কিছু পড়েছিল এই আলোচনা সম্বন্ধে অথবা বেলা সুরথ, কিংবা ক্লাবে বঙ্গ সেন কিছু বলেছিল।

অফিসে চাকরি না করার ফলে, অফিসে চাকরি করলেও কি অন্যথা হত, লাঞ্চের পর অন্তত এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়া অভ্যাস হয়েছে প্রবীরের। আলোচনাটা বিশ্রাম নয়। বিশেষ করে বিষয়টা তর্কমুখর। প্রবীর এ দুটি সংস্কৃতিকে বিজ্ঞান-সংস্কৃতি এবং ধ্রুব-সংস্কৃতি বলে থাকে যেহেতু কি এক অদ্ভুত উপায়ে অতিপ্রচলনের ফলে ধ্রুব বলতে ক্লাসিকস্‌কে বোঝায়।

প্রবীর ভাবল, অন্য অনেকে মানব শব্দে নানা প্রত্যয় যোগ করে হিউম্যানিটিসের প্রতিশব্দ তৈরি করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিউম্যানিটিস বলতে কি সে রকম বোঝায়? তুলনীয় হিউম্যানিটেআবিঅ্যান্‌ মানবতাবাদী? কে জানে। ঋতুটা, দিনটা, পায়রা দেখবার মতো বটে, ছবিটার কথা মনে পডলো প্রবীরের। মৌচাকের গায়ে ব্যস্ত মৌমাছির মতো, মনুমেন্টের গোড়া থেকে আগা, মাথার উপবে আকাশে, চারিদিকের অসংখ্য পায়রা। মৌচাক যেমন থেকে থেকে চমকে উঠে, পায়রার ঝাঁকের তেমন দেখতে দেখতে চমকানি লাগে। এক লক্ষ কথাটা আধিক্য, হাজার দশেক হলে অসম্ভব নয়।

হিউম্যানিটেআরিঅ্যান্‌রা যিশুকে মানুষ মনে করতো সেজন্যই এই নাম। তা হলে তারাই বা বিজ্ঞানপন্থী নয় কেন? অথবা প্রথম বিজ্ঞানপন্থী।

ওল্ড চৌরঙ্গীর পাশ ঘেঁসে মনুমেন্ট। যেমন আশা করা যায় বেশ কিছু দর্শক জমেছে। সোনালি জ্যাকেট, কালো শাড়ি পরা মেয়ের পাশে, বেগুনী ম্যানিলাপরা তরুণ। আর চানাওয়ালারা ঠোঙায় করে পায়রার দানা বিক্রি করছে নানা সুরে হেঁকে হেঁকে। ঝকঝকে রোদ। অনেক উঁচু নীল আকাশ। শরৎকালের কথা মনে আসে। ম্যাগনোলিয়াই বোধ হয় গাছটা। ম্যাগনোলিয়া ক্যামবেলি।

সিঁদুরে রঙের বুইকটা সেই গাছের নিচে থামলো। আকাশে এক ঝাঁক লোটন উঠল। কি ফুর্তি তাদের শীতের আমেজ লাগা অক্টোবরের দুপুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্লকের সদর দরজার কাছে ফুটপাতে দাঁড়ালো মাধবী। গাঢ় খয়ের রঙে সাদা চৌখুপী বসানো স্কার্ট, হালকার চাইতে কিছু গাঢ় হলুদ রঙের তিন পোয়া হাতা ব্লাউজ। মাথায় গাঢ় বাদামি রঙের চামরের মতো চুল, কিন্তু চামর কখনও তত চক্‌চকে এবং মসৃণ হয় না। চোখে সানগ্লাস। ঠোঁট দুটো হালকা লাল। কাঁধে ক্যামেরাকেসের মতো ক্রোম-হলুদ ব্যাগ ঝোলানো। পায়ে আঙুল বারকরা উঁচু গোড়ালির স্লিপার। পরিপুষ্টর চাইতে বরং কিছু চাপা গড়ন পাছা, লম্বা পা, কিছু নিচু ছোট মাপের বুক। মুখে কিছু উৎকণ্ঠা যেন ট্যাক্সি খুঁজছে। অনুমান করি এতে মাধবীর বর্ণনা মোটামুটি দিতে পেরেছি। অবশ্য তার দেহের মৃদু সিভেট সুগন্ধ এতে ধরা পড়েনি।

মনে হ'তে পারে মাধবী ট্যাক্সির জন্যই দাঁড়িয়েছে। এমন কি একটা ট্যাক্সি রাস্তার ওপার থেকে পাক খেয়ে মাধবীর ফুটপাতের দিকে এসে আস্তে আস্তে চলল। কিন্তু মাধবী অন্যদিকে চাইলো। ট্যাক্সিটা চলে গেলো। সে স্থির করল ওমনিবাসেই যাবে সে।

ক্লাসিক থিয়েটারকে সংক্ষেপে ক্লাসিক বলা হয। সেখানে রিহার্সাল। এই বাক্য দুটিকে অনুভব করল মাধবী। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল সে। এই দ্রুতভঙ্গিটা এমন নয় যে শরীর সামনের দিকে নুয়ে যাবে, কিংবা পদক্ষেপ থেকে গাঢ়তার আভাস কমবে।

আজ আবার ওমনিবাসে। কিছু দূরে বাস-স্টপ। হাতে সময় আছে। তাব পোশাকও ওমনিবাসে চলাব উপযুক্ত করে পছন্দ কবেছে।

ক্লাসিক থিয়েটার ড্যারি লেনে। চারিদিকে এমন সাইনবোর্ড, কিঅস্ক, কিন্তু সেখানে এমন কোন চিহ্ন নেই যা থেকে বোঝা যাবে ক্লাসিক থিয়েটার কি কোন জায়গায় হতে পারে। যারা জানে তারা জানে ড্যাবি লেন যেখানে লেক এভেন্যুর বুকে তীরের মতো বসানো সেখানে সেই ত্রিভূজাকৃতি ব্লকেই ক্লাসিক। নানা ব্যবসাব সাইনবোর্ডের মধ্যে একতলায় 'শোরডিচ্' কাফেটেরিয়ার একটা পুবনো সাইন বোর্ড খুঁজে পাওয়া যাবে। আব তখন ক্লাসিকেব ফ্যানরা নিশ্চিন্ত হয় যে তারা ঠিকই এসেছে। যারা ক্লাসিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাদের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায় ক্লাসিকের ঠিকানায় চিঠিপত্র দেয়াব অসুবিধা এই যে তার স্ট্রিট নম্বর অনেকেই জানে না।

মাধবী মির্জা গালিব আর চার্চ স্ট্রিটের সংযোগে ওমনিবাস স্টপের ছাতেব নিচে কিউ-এর শেষে গিয়ে দাঁড়ালো। লেজটা খুব বড় নয়। কিন্তু মাধবী লক্ষ্য করল সে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কেউ কেউ ফিরে ফিবে দেখছে। সে ঠোঁট দুটোকে ভিতরে টেনে এনে মুখটাকে গম্ভীর করল। অন্য কোন কোন রূপসীকে এ-রকম করতে দেখেছি। ক্লাসিককে খানিকটা রহস্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানে ক্লাসিকের প্রভাব বাইরে থেকেও চিনতে পারা যায়। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ছ নম্বব আই. টি রোড নতুবা ড্যাবি লেন নাম পেতো না, কিংবা কাফেটেরিয়ার নাম শোরডিচ্ হত না।

রাস্তার লেভেলের নিচে ব্লকটার ভিত্তির তলায় ক্লাসিকেবহল। হল, অফিস, লাইব্রেরী। সব সময়েই যেখানে টিউব আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। পথ থেকে শোরডিচ্ কাফেটেরিয়ায় ঢুকতে একটা করিডর আড়াআড়ি পার হতে হয়। করিডরের বাঁ দিকে লিফ্‌টের লোহার খাঁচা, তার উপরে পিতলের গায়ে লেখা 'পূবের তলাগুলোর জন্য।' ডানদিকে একটা বন্ধ দরজা যার মাথায় কালো বোর্ডের উপরে এক ইঞ্চি পরিমাণ অক্ষরে লেখা 'কেবল মাত্র সদস্যদের জন্য।' ভাবভঙ্গি অবস্থান দেখে মনে হতে পারে সেটা হয়ত এই ব্লকের ইলেক্‌ট্রিসিয়ানদের ক্লাব ও ইউনিয়নের দরজা। বড় বড় অন্যান্য ব্লকে যেমন থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটাই ক্লাসিকে যাবার রাস্তা। দরজাটার ওপারেই সিঁড়ি। দু থাক সিঁড়ি পার হলে ক্লাসিকের ফয়্এ। যেদিন অভিনয় থাকে দরজার উপরের কালোবোর্ডটা সরিয়ে দেয়া হয। সেদিন অবশ্য ছোটো খাটো ভিড়ই হয় দরজার সামনে, রেলস্টেশনের গেটের মতো।

শুধু অভিনয়ের দিনে যারা ক্লাসিকে যায় তারা অবশ্য জানে না অন্যান্য দিনে অডিটরিয়ামটাই ক্লাসিকের রিডিংরুম। একপাশে যখন অভিনয়ের মহড়া চলছে দেখা যাবে দূর কোণে মাথা নিচু করে বসে ছোট

ছোট ডেস্কে টেবল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে দু পাঁচজন পড়ছে, নোটস্ নিচ্ছে। খানিকটা অংশ রঙিন প্লাস্টিক পর্দা দিয়ে চেম্বারের মতো করে ঘেরা। সেটা ক্লাসিকের অফিস। রিহার্সালে অথবা পড়তে এলে ওই কামরাটায় ঢুকে হাজিরা খাতায় সই দিতে হয়। যেন একটা গোপনতার ভাব,—অভিনয়ের ছাড়া অন্য দিনে এ-রকম একটা অনুভূতি হয়।

অনুমান করছি মাধবীর সঙ্গে ক্লাসিকের সম্বন্ধটা এখনও নতুন। সে জন্যই ক্লাসিক সম্বন্ধে তার অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যায়নি। নতুন এলে কোন জায়গা সম্বন্ধে যেমন হতে পারে ক্লাসিক সম্বন্ধে তাব মনে এই কথাগুলো আপনা থেকে ফুটে উঠছে।

মাধবীব চিন্তায ছেদ পড়লো। তেব নম্বর মেরুন রঙেব অমনিবাসটা এসে দাঁড়ালো। মাধবী অন্যমনস্কভাবে খবরেব কাগজের পুরনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হযে স্থির করল, রুট অনুসারে অমনি বাসেব রং করা ভাল হয়েছে। ভিড় ছিল, কিন্তু এমন নয় যে জায়গা পেতে অসুবিধা হবে। মাধবী আন্দাজ করল প্রায আধ ঘণ্টা গেলে লেক এভেন্যু। ড্যাবি লেন জংসনের কিছু উজান দিয়ে রুট। সেটুকু হেঁটে গেলেই হবে।

সিটে বসে গ্রীক ট্যাজেডি সম্বন্ধে ক্লাসিকের পুস্তিকাটাকে বার করল সে ব্যাগ থেকে। এটাই ক্লাসিকের বিশিষ্টতা, নাট্যকাবদের সম্বন্ধে লেখা এই পুস্তিকাগুলো। লোকে বলে পুরনো প্রাচীন লেখকদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল আছে। সেজন্যই এই পুস্তিকাগুলো বিক্রি হয়। আর বিক্রি হয় বলেই ক্লাসিকেব অভিনযেব খরচ ওঠে।

লোকে বলেনি, কথাটা বলেছিল গাযত্রী পাব্‌কর। অনেকদিন গাযত্রীর সঙ্গে দেখা হয় না। এক সময়ে একই ফ্ল্যাটে থাকতো মাধবী আর গাযত্রী। গায়ত্রী মাধবীব চাইতে বযসে বড়। সাযেন্স ফিক্‌শান নিযে বছরে যদি দশটা ছবি তোলা হয তবে তার অন্তত তিনটিতে গায়ত্রী থাকবেই। গাযত্রীর বন্ধুত্ব মাধবী অস্বীকাব করতে পারে না। নিবঞ্জনের সঙ্গে দেখা হওয়াব আগে পর্যন্ত মাধবী গাযত্রীব ফ্ল্যাটেই থাকতো। গাযত্রীব সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয না। ছমাস আগে এক সকালে ফেব্রুয়ারী-ফেয়াবে দেখা হয়েছিল। তাকে দেখতে পেযে গায়ত্রী ছুটে এসেছিল। জডিযে ধরেছিল, চুমু খেয়েছিল। কোন কথাই শোনেনি। তাব ফ্ল্যাটে নিযে গিযেছিল। নতুন একটা অ্যাম্বারেব মালা উপহার দিয়েছিল। আর বোধ হয় হাজারবার চুমু খেযেছিল। উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিল মাধবীর গডনের। অবশেষে সন্ধ্যায় আবার তাবা বেড়াতে বেরিয়েছিল গাযত্রীব গাড়িতে। গায়ত্রী নিশ্চয়ই সুন্দবী, বুদ্ধিমতী, আব সাযেন্স-ফিক্‌শানের ছবিতে বারবার কনট্র্যাক্ট পাওযা থেকেই বুঝতে পারা যায় অভিনেত্রী হিসেবে তার আদব আছে। গায়ত্রী এমন যে তাব সঙ্গে নিজের আর্থিক অবস্থা নিয়েও কথা বলা যায়। বিদায় নেবার সময়ে গায়ত্রী বলেছিল—তুমি আবার আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। অভিমান ফুটে উঠেছিল তার স্ববে। বলেছিল, তুমি আসবে না জানি, সে জন্য ঠিকানাটাও গোপন রেখেছিলে। কিন্তু আমি তোমাব জন্য এই মার্কোস স্কোয়ারের ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করে থাকবো।

গায়ত্রী ক্লাসিক সম্বন্ধে জানতো। বিজ্ঞাপন না থাকা সত্ত্বেও ক্লাসিকের এমন একটা প্রচার আছে মুখে মুখে যার ফলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে অন্তত নামটা অজানা নয়।

বেনেশাঁ অভিনয়ের প্রথম অভিনয় রাত্রিতে গাযত্রীকে নিমন্ত্রণ কবা যেতো। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীব মতো সেও বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণের কার্ড পেয়েছিল। পাঁচটি সিট মিলে একটি বক্‌স্। সেই কার্ডগুলোর নিচে লেখা ছিল অভিনেত্রী মাধবী ঘোযালেব সৌজন্যে। গায়ত্রী পেযে নিশ্চয়ই খুশি হত। কিন্তু মাধবী কার্ড কয়েকটিকে স্টুডেন্টস্ ব্যুবো অব কালচাবে পাঠিয়ে দিয়েছিল। অথচ এ কাজটাই সে গায়ত্রীব অনুকবণে কবেছিল, তাকে যেমন একবার করতে দেখেছিল, তেমন করেই হ্যান্ডবুক অব বেফাবেন্সেস্ দেখে। এটা ঠিক কৃতজ্ঞতা নয়। গায়ত্রীকে কি তবে সে নিজের অগোচরে এড়িয়ে চলতে চায়?

কতদুর এসেছে দেখবাব জন্য ক্লাসিকের পুস্তিকাটার প্রথম পাতা থেকে চোখ তুলেছিল সে, (প্রথম পাতার চাইতে এগোতে পারেনি) তখন, ব্যাপারটা তার চোখে পড়লো। পুরুষের দৃষ্টিতে সে যে বিশেষভাবেই আকর্ষণীয় এটা মাধবীর অজানা নয়। কিন্তু এমন সহজভাবে প্রকাশ্যে তার দিকে চেয়ে থাকতে খুব কম

লোককেই সে দেখেছ। মাথার বারান্দা বার করা টুপি থেকে বুঝতে পাবা যায় আর্মির অফিসার। এক দৃষ্টিতে যেন মাধবীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দ্বিতীয়বার দেখে মাধবীর মনে হল যেন পবিচিত লাগছে মুখের আদল। সে অনুমান করল হয়ত কোন বিদেশী ছবির সুন্দর আমেবিকা মার্কা নাযকের মুখের আদলের সঙ্গে মেলে বলেই এমন মনে হচ্ছে। অন্যদিকে মন নেবার জন্য সে ভাবল কিন্তু সেই বিশেষ আমন্ত্রণে একজনই মাত্র এসেছিল—সে রাজেন। আর বাজেন অভিনয়ের শেষে দেখা করে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানাতে এসেছিল। সেই প্রথম আলাপ। সে কি! লোকটি একেবাবে পাশে এসে দাঁড়ালো। একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটবে নাকি।

'হেলো।'

কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিল। মিলিটাবি একাডেমির অমল।

মাধবীব মুখে হাসি ফুটলো ; সে বলল, 'আপনাব মাথাব টুপিই তার জন্যে দাযী। বসুন।'

মাধবী সবে বসে পাশে জায়গা করে দিল।

অমল বলল, 'সামনের স্টপেই নামবো। এই পথেই কয়েক ব্লক আগে বাজেনকে ঢুকতে দেখলাম। রাজেনের খোঁজে গেলে এখানেই নামতে হবে। ফিরে যেতে হবে।'

মাধবী বলল, 'তা হলে?' যেন সে রাজেনেব খোঁজেই তেব নম্বরের অর্মনিবাস বেছে নিযেছে। যেন নয় নিশ্চয়ই। তবে কাজটা সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে কবেনি। বাইশ ববং ড্রারি লেনেব মুখে যায়। সরাসরি ক্লাসিকে যাওয়াব বাস সেটাই। কিন্তু তেব নম্ববই প্রথম এসেছিল।

মাধবী হেসে বলল, 'আপনাদের কথাই ভাবছিলুম, আব তখনই আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

অমল হাসিমুখে বলল, 'মরুভূমিতে এবকম হতে দেখা গিয়েছে। কোন বিশেষ জন্তুব কলোনির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই জন্তুব কথাই মনে হয। গা ছম্ ছম্ কবে, তা সে টিকটিকি অথবা সিংহ হোক। এটা বইএর পাড়া, বাজেনের কথা মনে হতেই পারে। আসুন, নামি।'

নেমে পড়লো অমল আব মাধবী। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অমল হলুদ বঙেব বুকটাকে দেখিয়ে দিল। বলল, 'গভর্মেন্ট সিকিউবিটির বিজ্ঞাপন আছে কিঅস্কে। তাব সোজাসুজি দরজা দিযে ঢুকে যাবেন। অপাঠ্য দুষ্পাঠ্য পত্রিকাব খান ত্রিশ চল্লিশ একসঙ্গে নিয়ে তাব উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে দেখবেন দার্শনিক।' এই বলে অমল আর্মি স্যালুট করে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। হন্ হন্ করে ফুটপাথ বেয়ে এগিযে চলল।

রাস্তাটা বাঁকা, সে জন্য সিকি মাইল দূব থেকেই ব্লকটাকে চোখে পড়ে।

মাধবী হাঁটতে শুরু কবল। আর হঠাৎ তখন তাব মনে হল, সে কি একটু আতিশয্য করে ফেলছে না? সম্ভবত বাজেন এখন ব্যস্ত আছে এবং তাকে অভ্যর্থনা জানানোব জন্য প্রস্তুত নয়। তা ছাড়া রাজেনকে এখন এটুকুই বলতে পারে সে ক্লাসিকে যাচ্ছে রিহার্সালে।

অবশ্য, রাজেন তাব সমবয়সী। দেখা হলে সেও কিছু বলতে পারে যা থেকে হয়ত লাঞ্চ, রিহার্সাল সঙ্গে মিলিযে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টাকে কাটানোব প্রস্তাব উঠতে পাবে, এমন কি ডিনারের জন্যও ফ্ল্যাটে ফিরতে পারে মাধবী রাজেনকে নিয়ে।

কিন্তু অভিনেত্রীবা কদাচিৎ ফ্যানেব খোঁজে পথে ঘুরে বেড়ায়। বলতে পারো মাধবী তেমন নয় যাদেব অত্যুজ্জ্বল তারকা বলা হয়ে থাকে, অন্যদিকে, তার প্রথম ছবি যে বৃথা হযনি তারও প্রমাণ আছে।

অথবা কিঅস্ক বিজ্ঞাপনই কথাটাকে মনে করিয়ে দিল। গভর্মেন্ট সিকিউরিটির বিজ্ঞাপনের গায়ে গায়ে লাগা দু রঙে আঁকা মাধবীব নিজের প্রতিকৃতি। তাতে মাধবীর চোখ দুটোকেই আট ন' ইঞ্চি লম্বা করে আঁকা হয়েছে। পক্ষ্মগুলোই ইঞ্চি দুয়েক। আর নীল চোখের মণিতে একটা উলঙ্গ বালকেব ছবি। বিজ্ঞাপনটাব ঔজ্জ্বল্য থেকেই বোঝা যায় দু' একদিন হল লাগানো হয়েছে। এখনও, ছমাস পরেও, এমন টাটকা বিজ্ঞাপন দেবার অর্থ ছবিটা দর্শক টানছে।

হলদে ব্লকটার চার-পাঁচটি বড় দবজা এই রাস্তার উপরে, কিন্তু কিঅস্কের সামনেরটি দিযেই ঢুকতে হবে—বলেছিল অমল।

ছবিতে গোপন প্রতিবোধে ব্যস্ত একটি দলকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দলে এসে পড়লো নায়িকা

(মাধবী), শরৎবাবুর সেই উপন্যাসে যেমন হঠাৎ নায়ক অপূর্ব এক বিপ্লবী দলে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপরে দেখানো হয়েছে প্রতিপদক্ষেপে নায়িকার দ্বিধার যন্ত্রণা। এখানে ছবির কাহিনী রবীন্দ্রনাথের অস্তু-এলার কাহিনীকে খানিকটা অনুসরণ করেছে। ওদিকে উপনায়ক, এক্ষেত্রে নায়িকার (মাধবীর) একদা ঘর বাঁধবার প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্ত পুরুষ, ঘর বাঁধবার অনুপ্রেরণাতেই প্রতিরোধ আন্দোলনের শত্রু গোপন-পুলিশের (গো, পুর) অফিসার। নায়িকার ঘরে এখনও সে প্রেমের অভিনয় করতে আসে। নায়িকা এবং উপনায়ক দুজনেই দুজনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, দুজনেই অভিনয় করে চলে, উপনায়ক—আরও কিছু খবর জানার জন্য, নায়িকা দলের ঘাতকরা না-আসা পর্যন্ত উপনায়ককে ধরে রাখবে বলে। এখানেই ছবির হাই-সিরিয়াসনেস শুরু। এই যে ছলনা তা নাকি প্রকৃতপক্ষে ছলনা নয়। চিত্রের ফটোগ্রাফি এখানে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছে। উপনায়কের কোট খুলে দিচ্ছে নায়িকা, তখন আইডেনটিটি কার্ডটা মাটিতে পড়ে গেলো। নায়িকা (মাধবী) সেটাকে যেন দেখতে পায়নি এমন করে আবার কোটের পকেটেই রেখে দিল। ওদিকে নায়িকা যখন কফি কবতে ব্যস্ত ডাকের চিঠি এলো। উপনায়ক আনলো সেটা ফ্ল্যাটের দরজা থেকে। মোটা সাদা কাগজের এনভেলপের কোণায় একটা হলুদ বিন্দু। ক্লোজ-আপে বিন্দুটা বড় হতে হতে পর্দা জুড়ে গেলো আর দেখা গেলো সেই বিন্দুটাকে বিদ্ধ করে আছে তীরের মতো একটা কিছু। উপনায়ক (সুদেহী অভিনেতা সুমন্ত্র, সেকালের উহ্সমূলারের তুলনায় কিছুমাত্র ন্যূন নয়, চুল এবং প্যান্টের কাটে বরং আরও আমাদের কালোচিত) বুঝতে পারলো, শেষ প্রমাণ পেলো নায়িকার প্রতিরোধ-আন্দোলনের শরিকত্বে। কিন্তু মন আর দেহ এক নয়। এখানে নাকি সেকালের রবিবাবুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ছবি। পরস্পরকে কি করে কায়দায় ফেলা যাবে ভাবতে ভাবতেই তারা আলিঙ্গন করল। দেখানো হয়েছে সে সম্ভোগে এতটুকু প্রবঞ্চনা নেই। এর পরে উপনায়কের মৃত্যু, নায়িকার কারাবরণ, এবং বিচার পর্ব। পাঁচ মাস ধরে বিচার পর্ব চলেছিল, সেই সময়ে নায়িকা আবিষ্কার করল সে অন্তর্বত্নী। জেরায় দেখানো হয়েছে নায়িকা (মাধবী) উপনায়ককে (সুমন্ত্র) গো. পুর অফিসার হিসাবে ঘৃণা করে। কিন্তু জেরার বাইবে সে স্বপ্ন দেখে। তার চোখের মণিতে, তাব চোখ থেকে ঝবে পডা জলের বিন্দুতে সুমন্ত্র অথবা তাব সন্তান, অথবা এক থেকে আব সুঠাম উলঙ্গ বালক হয়ে ফুটে উঠেছে। ফ্ল্যাশ-ব্যাকে দেখানো হয়েছে সেই প্রথম দিকে মাধবী-সুমন্ত্রর ঘর বাঁধাব পবিকল্পনা, তারই জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টায় সুমন্ত্রর গো. পুর চাকরি নেয়া। এতেই নাকি নাবী পুরুষের প্রেমের সার কথা, সেই আত্মপ্রবঞ্চনা সংযুক্ত আদিমশত্রুতার চমৎকার ইঙ্গিত আছে।

এখনও সগৌরবে চলছে ছবিটা!

পলকের জন্য মনে হল মাধবীর এই ছবিই কি নিরঞ্জনের মনে সন্তান ক্ষুধা জাগিয়েছিল?

হলটাতে খুব বেশি লোক নেই, যারা আছে তারা টেবিলের দিকে মুখ নামিয়ে। মনে হবে অফিস, কিন্তু লাইব্রেরী তা বুঝতেও দেরী হয় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে মাধবী অবশেষে ঠাহব করল একেবারে কোণ ঘেঁসে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে যারা বসেছে, তাদের মধ্যে দেয়াল থেকে তৃতীয় জনই রাজেন।

অনুমান ঠিকই হয়েছে। মাধবী কিছুটা এগোতেই তার পায়ের শব্দে রাজেন মুখ তুললো। গোটির উপরে বুড়ো আঙুল রেখে যেন অবাক হয়ে দেখলো মাধবীকে। যে পত্রিকাটা পড়ছিল সেটাকে বন্ধ করল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল হাসিমুখে, 'দেখা হওয়াটাই এমন মূল্যবান যে কি করে জানলেন আমি এখানে আছি, এখন কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি আলাপ একেবারে অসঙ্গত। আগে চলুন বাইবে যাই।'

করিডরে এসে অপ্রতিভ মাধবী বলল, 'ড্যারি লেনের শোরডিচ্ কাফেটেবিয়ায় বেলা একটায় লাঞ্চ করা যেতে পারে।'

হাতঘড়ি দেখলো রাজেন। 'কিন্তু ততক্ষণ?'

মাধবী বলল. 'সেদিকেই আমার একটু কাজ আছে।'

রাজেন বলল, 'ড্যাবি লেন? শোরডিচ্? নাটকের মহলা?'

মাধবী বলল, 'বেলা বারোটায় শুরু। খুব ধরেছেন তো।'

ফুটপাতে দাঁড়ালো ওরা। আঙুল তুলে ট্যাক্সির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজেন বলল, 'ড্যারি লেনে শোরডিচের কাছে যদি কোন অভিনেত্রীর কাজ থাকে তবে সেটা ক্লাসিকের অভিনয় কিংবা মহলা এটা বুঝতে শারলক

হোমস্ না হলেও চলে।'

ট্যাক্সিতে বসে মাধবী বলল, 'আমি কিন্তু আপনার কাজে বাধা দিলাম।' রাজেন বলল, 'তা যখন দিয়ে ফেলেছেনই তখন অতীতকে বিদায় দিন—এই বলতো অমল। সুধীর বলতো—মৃতেব কোন চিকিৎসা নেই। আমার মতে কোন কাজই এত মহামূল্য নয় যে বাধা দিলে ক্ষতি হবে।'

মাধবী বলল, 'ট্যাক্সিকে বলুন কোথায় যাবে।'

কথাটার জন্যই ট্যাক্সিওয়ালা অপেক্ষা করছিল।

রাজেন বলল, 'ড্যুরিলেন লেক এভেন্যু জংসন।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

দু এক মিনিটের জন্য মাধবী একটা উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। রাজেন সিগারেট কেস বাব করল। দুজনে সিগারেট ধরিয়ে নিল।

মাধবী বলল, 'কিন্তু সোজা ক্লাসিকে চলেছি কেন? খানিকটা নিছক ঘুরে বেড়ালে হত না।'

'লাঞ্চের পরে যদি আবার মহলায় না যান খানিকটা ঘুরে বেড়ানোর সময় পাওয়া যাবে।'

'আমি যতক্ষণ মহলায় থাকবো?'

'শোরডিচের ওয়েটারদের সঙ্গে আমার মোটামুটি বোঝাপড়া আছে। বারের পিছন দিকে একটা ময়লা টেবল আছে। এক কাপ কফি নিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ কাটানো যায়। কিন্তু আপনার পোশাক, চুলের কায়দা, পায়ের স্লিপার থেকে আমি বুঝতে পারছি, আপনার মন আজ ছুটি চাচ্ছে। মহলার চাইতে বরং অকশান ব্রিজ, অভিনয়ের চাইতে বরং ট্যুবিস্টদের ভঙ্গিতে শহরের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলো দেখে বেড়ানো।'

হাসতে হাসতে মাধবী বলল, 'আপনার কলেজ পালানোর অভ্যাসটা এখনও আছে। নতুবা এমন নিখুঁত করে বলতে পারতেন না।'

রাজেন বলল, 'বটেইতো। আপনি ক্লাসিকের কর্তৃপক্ষকে বলে যদি আজ ছুটি নিতে পারেন কিংবা লাঞ্চের পরে আব যদি না যেতে হয়, আমরা রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় গিয়ে সময় কাটাতে পারি , কিংবা যদি টিকেট যোগাড় করে সংস্কৃতি মাইফেলে গিয়ে দুচারটে বক্তৃতা শুনে আসতে পারি। অথবা যদি তেমন আপনার ভাল লাগে, সন্ধ্যায় রোম্যান ক্যাথলিক গির্জায় যেতে পারি। আজ কিসেব একটা ধন্যবাদ দিবস আছে। সেন্টপলসের অর্গ্যানিস্ট বাস্তবিক ভাল বাজায়।'

মাধবী বলল, 'ক্লাসিকেই চলুন। যতক্ষণ মহলা চলবে, কিংবা বেলা একটা অবধি এক ঘণ্টা সেখানেই থাকবেন। শর্ত এই মহলাব সময়ের কাঁচা অভিনয় দেখে হাসবেন না।'

রাজেন বলল, 'এটা আমার একটা রোগ পোশাক পরার আগে মানুষ, আর মঞ্চে উঠবার আগে নাটক আমার সহ্য হয় না।'

ড্যুরি লেনে ঢুকে পড়ল ট্যাক্সি। রাজেন বলল, লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে থাকবো। এক ঘণ্টা আর কি এমন সময়। কিন্তু লাঞ্চের পরে কোথায় তা ঠিক করা দরকার। সংস্কৃতির মাইফেলে যেতে হলে টিকেট যোগাড় করতে হবে। লাঞ্চের পরেই আবার বক্তৃতা শুরু হবে।'

মাধবী বলল, 'কোথায় যেতে হবে তা নির্বাচন করার জন্য আপনি এক ঘণ্টা সময় পাচ্ছেন।'

শোরডিচ্ কাফেটেরিয়ার সামনে ট্যাক্সিকে বিদায় দিল রাজেন। কাফেটেরিয়ার সামনে করিডরের কথা আমাদের জানা আছে। করিডরে দাঁড়িয়ে রাজেন বলল, 'আপনাক জানাতে পারি ক্লাসিকে যাওয়ার জন্য যা দরকার অর্থাৎ সদস্য-কার্ড তা আছে আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে এদিকে এই অবসরে কারো কারো সঙ্গে দেখা করে নিতে পারি।'

ক্লাসিকের 'সদস্যদের জন্য' নির্দেশ লেখা দরজার পর্দা ঠেলে মাধবী নেমে গেলে রাজেন কাঁচের ট্র্যাপ-ডোর ঠেলে কাফেটেরিয়ায় ঢুকলো। টেবল্ রিসার্ভ করল। তারপর পথে বেরোল। একটা পত্রিকা আছে রাজেনের। এ পাড়ার কোন ব্যবসাদার তার ক্ষুদে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে কিনা যাচাই করে দেখলে হয়।

প্রিয় পাঠিকা, অভিনয়ের মহলা সম্বন্ধে কৌতূহল থাকাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করি। কিন্তু গল্পটাকে

সংক্ষিপ্ত করা দরকার, এই সুযোগে মাধবীর হাউসকিপার সুরঙ্গমার কথা বলে নিই।

হাউসকিপার শব্দটার বাংলা আমার জানা নেই ; অনুমান করি বিদেশী প্রথাটাকে যখন নেয়া হয়েছে শব্দটাকেও নেয়া যেতে পারে। এমন অনেক কিছুই রোজই এসে যাচ্ছে সমানে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কথা ধরুন। তারা নতুন নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যাধিক্যটা? তাদের সংখ্যা এখন প্রতি দশজন শ্রমিকের একজন হবে। কিংবা কিছু বেশি। এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই, নখকাটা দাড়িকামানোর গ্যাজেট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর অতিকায় কম্পিউটারগুলো পর্যন্ত ইলেকট্রিকের প্রসার।

মাধবীর হাউসকিপার সুরঙ্গমা—সেকালের আধুনিক এই নাম থেকে বুঝতে পারা যাবে তার বয়স চল্লিশের সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।

ফ্রিজিডেয়ারের উপরে ছোট টাইমপিসটায় বারোটার কাছাকাছি সময় হল। এক কাপ চা ভিজিয়ে নিয়েছে সে। মোটামুটি প্রায় আধঘণ্টা এখন তার বিশ্রামের সময়। এসময়ই সে চা শেষ করতে করতে খবরের কাগজটাকে পড়ে নেয়। এটা তার নিজের কাগজ। মাধবীর জন্য যে কাগজ সেটায় তার সুখ হয় না। মস্ত প্রকাণ্ড চেহারার সেই কাগজ মাধবী করে বা পড়ে? টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষালের সময় থেকে আছে। আকারের বিরাটত্ব এবং স্থূলতাই প্রমাণ করে কাগজটা টেকনোক্র্যাট্-শ্রেণীর।

চা ঢেলে নিয়ে সুরঙ্গমা টুলটাকে বাঁদিকে খানিকটা ঠেলে দিল। ওদিকে একফালি রোদ এসেছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসলে ভাল হবে। পিঠের পেশীতে আজ ব্যথাটা লাগছে না বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে রোদ তার পিঠের পক্ষে খুবই উপকারী। সেদিক থেকে দিনটা আজ বিশেষ ভাল। রোদটা আজ উজ্জ্বল, খানিকটা উত্তাপও আছে।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম পাতার উপরে চোখ রাখল সুরঙ্গমা। ট্রাম-শ্রমিকদের মাইনা বাড়ার কোন সংবাদ সে আশা করেছিল, কিন্তু স্কুললিভিং পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা দেখতে পেলো বরং। ছেলেকে এবার লেখাপড়ায় একটু বেশি করে মন দিতে বলতে হবে। আর তার নিজের চশমাটাকেও বোধহয় বদলানো দরকার।

আজ তার স্বামীর সকালে ডিউটি নেই তা সে কাল রাত্রিতেই জানতে চেয়েছিল, আর কাল সকালের কাগজেই জানা গিয়েছিল ট্রাম-শ্রমিকদের মাইনা বাড়ার ব্যাপারে দুপক্ষে কোন নিষ্পত্তি হয়নি। আজ ধর্মঘট শুরু আর সেটা নাটকীয়ভাবে কোন কর্মব্যস্ততার মুহূর্তে হবে। সেজন্যই অত সকালে বেরিয়ে গিয়েছে তার স্বামী। এটা যে নতুন তা নয়। বিশ বৎসর সে স্বামীর সঙ্গে আছে আর বিশ বৎসরই এই ট্রেড ইউনিয়ান ব্যাপারটা তার মনে আশঙ্কার বিষয় হয়ে আছে।

এসবই কারণ যার জন্য কাল রাত্রিতে সে বাড়ি গিয়েছিল, যদিও কাল তার দিন ছিল না।

হাউসকিপারদের ট্রেড-ইউনিয়ান নেই। কোন কোন চাকরিতে তা থাকা উচিত কিনা এনিয়ে সন্দেহ আছে : হাউসকিপার, প্রাইভেট সেক্রেটারি, চেম্বারমেইড। এ চাকরিগুলো মালিকপক্ষের সঙ্গে কর্মচারীতে এত ঘনিষ্ঠ করে শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা ভাবাই যায় না। বরং বিশেষ করে হাউসকিপারদের বেলায়, মালিকপক্ষের সঙ্গে একাত্মতা না জন্মালে চাকরির বিশেষ যোগ্যতার অভাব প্রমাণ হবে। একাত্মতা না বলো, বিশ্বস্ততা! মালিকপক্ষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছুই তোমার কাছে গোপন থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবিকার খাতিরেই সে সম্বন্ধে তোমার স্বামীকেও বলা চলে না। তোমার চাকরি যেতে পারে, মালিকপক্ষ হঠাৎ দেউলে হয়ে যেতে পারে, কিংবা সুরঙ্গমার জীবনে যা হয়েছে সেই বর্ধিষ্ণু চিত্রকর যার হাউসকিপার ছিল সুরঙ্গমা—তার মতো আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটতে পারে ; তখন নতুন চাকরি পাওয়ার এটাই সব চাইতে বড় আশ্বাস হবে যে তোমার পুরনো মালিকপক্ষ তোমার বিশ্বস্ততায় তিলমাত্র সন্দেহ করেনি। মালিকপক্ষর মৃত্যুর পর তুমি স্মৃতিকথা লিখতে পারো কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অন্যান্য প্রায় সব জীবিকারই স্কুল আছে হাউসকিপারের তা নেই। একখানা মাত্র উল্লেখযোগ্য বই আছে বাজারে। আর তাতে একটা পরিচ্ছেদে স্মৃতিকথা লেখার প্রশ্ন তুলে বরং সতর্ক করেই দেয়া হয়েছে—তা লিখলে হাউসকিপারদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে মালিকপক্ষের মনে অবিশ্বাস দেখা দেবে।

ট্রেড-ইউনিয়ান না থাকলেও হাউসকিপারদের সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত। অবশ্য

এই ছুটিগুলোর অর্ধেক ভোগ করা যায়—যখন মালিকপক্ষ সপ্তাহান্তিক ভ্রমণে বার হয়। নতুবা ছুটির বদলে ওভারটাইম নিতে হয়।

কিন্তু কাল বিশেষ ছুটি নিয়ে বাত এগারটাব শেষ ট্রামে সে নিজে ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। আজ সকালে ফিরতে একটু দেরীই হয়েছে তার।

খুব সকালেই উঠেছিল সুরঙ্গমা। কিন্তু তাবও আগে তার স্বামী শয্যাত্যাগ করেছে। সে যতক্ষণ দাড়ি কামাচ্ছে সুরঙ্গমা তার খাবার তৈরি করেছিল তারপবে তাব স্বামী এসেছিল রান্নাঘবে। খাকি প্যান্টে সাদা জামায় তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। দীর্ঘ একহারা চেহাবা। গালের গোলালো ভাবটাব জন্যে নাকটাকে আরও উঁচু দেখায়। মাথার সামনে একগোছা রুপোলি চুল। তার নাকটাকে অন্য কেউ বদখত বকমেব উঁচু বলতে পারে কিন্তু সেটাকেই যেন সুবঙ্গমার ভাল লাগে। সাদা সার্টের উপরে সে যখন খাকি কোটটা পবা শেষ করেছে সুবঙ্গমা তার একখানা হাত তুলে নিয়ে নিজেব গালেব উপবে চেপে ধবেছিল। হাত ছেড়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে অনুরোধ কবছিল—একটু সাবধান কিন্তু।

এই কথাটুকু বলতে গিয়েই সুরঙ্গমার দেরী হয়ে গিয়েছিল। ন'টাব আগে ব্রেকফাস্ট কবে না মাধবী। আর সুরঙ্গমার পটু হাতে ব্রেকফাস্ট গুছিয়ে দিতে চল্লিশ মিনিট যথেষ্টর চাইতে বেশি। কিন্তু মাধবীকে ব্রেকফাস্ট দিযে এসে সে অনুভব করছিল তখনও সে হাঁপাচ্ছে। এটা এখন আব চাব মিনিটে যায় না। সারাদিন ধবে চেষ্টা কবে কবে নিঃশ্বাসে ক্ষমতা আনতে হবে। যদিও ডাক্তারেব মতো অনেকটাই এব মানসিক। ফ্যাটি ডিজেনারেশ্যান নয় সত্যি?

সাদা অ্যাপ্রন্ আব বনেট খুলে সুরঙ্গমা সেগুলোকে ফ্রিজিডেয়াবেব পাশের কাবার্ডে তুলে বাখল। তার স্বামী নিশ্চযই অভিজ্ঞ আব অভিজ্ঞলোকেব চালচলন সাবধানী হযে থাকে।

পিঠে বোদ লাগছে সুবঙ্গমাব। এটা তাব চল্লিশ বছরেব পিঠেব পক্ষে ভাল। পেশীগুলো কি সত্যি স্থিতিস্থাপকতা হারায এ বয়সে? সুবঙ্গমাব ব্লাউজেব পিঠে বোতাম একটা খুলে গিয়েছে। গাজব বঙেব খানিকটা পিঠে বোদ পড়ছে এখন।

আসলে ট্রাম এঞ্জিনিযাবদেরও মাইনা বাড়া দবকাব নতুবা ছেলেমেযেকে একই সঙ্গে কলেজে পড়ানোব বোঝা সহ্যের অতিবিক্ত হযে দাঁড়াবে। আব ট্রেড্ ইউনিয়ান, সেখানে পার্ট-টাইম কাজের জন্য সুবঙ্গমাব স্বামী মাইনা পায, সেটা কম হলেও তাতে ফ্ল্যাট ভাড়াটা দেয়া চলে। বেতন নিলে ঝুঁকিও নিতে হবে।

সুবঙ্গমা হাত ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টালো। এখন তাকে একটু তাড়াতাড়ি ববতে হবে। আজ ঘরদোর মুছবাব দিন। তাছাড়া ধোবিখানায় যেতে হবে। কাল দেখা গেলো ভাল মদ কিছু নেই। অসুবিধায় পড়তে হত কালকের ডিনার অন্য রকম হলে।

নিরঞ্জন ঘোষাল চলে যাওয়াব পব মাধবীর লাঞ্চে ওয়াইন জাতীয় কিছু থাকছে না। ডিনাবেও কি চাইবে মাধবী তাব অপেক্ষা কবে থাকে সুবঙ্গমা। অন্তত এখন যে মদ ডিনাবের শেষে চায় মাধবী তা তেমন কড়া নয়, তেমন প্রচুর নয়, নিবঞ্জনের সময়ে যেমন ছিল। এটাই মাধবীর পক্ষে স্বাভাবিক, বরং নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সে, অন্তত টেকনোক্র্যাটদের ঘরে জন্মায়নি, যদিও অনেক দূব উঠেছে, যার প্রমাণ এই ফ্ল্যাট, এই ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা।

কিন্তু তা হলেও কালকের কক্‌টেইলটা বরং অস্বাভাবিকই ছিল। পাঁচ কোর্সেব ছোট ডিনার চাব জনো জন্য। মাধবী এক সময়ে পরামর্শ নেয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল—তোমার কি মনে হয় সাইডাব চলতে পাবে ডিনারের শেষে, কিংবা এইল্। ব্রাণ্ডি আর কমলার যুসে কি কক্‌টেইল হতে পাবে। যেন মাধবী কোন অভিভাবিকা, ছুটিতে প্রত্যাগত ছেলেমানুষদের ডিনাবের ব্যবস্থা করছে। অথচ মাধবীব নিজের বযসই বা কি হয়েছে কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

অবশ্য, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়, বয়স আর অভিজ্ঞতাব বয়স এক নয়। পুরুষ বন্ধুদের বয়স বেশি হলে কম বয়সেই বেশি বয়সের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে মেয়েদের। আব মাধবীর সঙ্গীদের অনেকেরই বয়স চল্লিশের উপরে। নিরঞ্জন পঁয়তাল্লিশের দাগ অবশ্যই পার হয়েছিল।

প্রত্যেক জীবনের কতগুলো শর্ত থাকে। মাধবীব জীবনের শর্তঅনুসারে বযস্ক লোকেরাই তাব বন্ধু হবে।

কারণ একজন নর্তকী বা অভিনেত্রীকে সমাদর করতে তারাই পারে, যারা আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, যারা সমাজে প্রতিপত্তির দরুণ বিরূপ আলোচনাকে আমল দেয় না। তেমন প্রতিষ্ঠা পেতে বয়স চল্লিশের কাছে চলে যায়।

কাল যারা এসেছিল তারা ছাত্র। অবশ্য এমন নয় যে সাইডার খাবে ডিনারের শেষে। পোর্ট দিয়েছিল সুরঙ্গমা। আর তার পরে বার্গান্ডি আর তাতে তারা ভয় পায়নি। কিন্তু কি হালকা কণ্ঠস্বর থেকে, কি উঁচু গলার হাসি থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছিল তারা ছাত্রই। ডিনার শেষে তারা অকশান ব্রিজ খেলতে বসেছিল মাধবীর শোবার ঘরে।

এটা হয়তো খেয়ালই মাধবীর, তার বেশি কিছু নয় যে কাল রাত্রিতে তার ছাত্রদের সংসর্গ ভাল লেগেছিল, পোর্ট আর অকশান ব্রিজের হালকা একটা রাত্রি। তা ছাড়া আর কিই বা প্রমাণ হবে। নতুবা এমন মনে করতে হয় মাধবীর সেই সব চল্লিশ-উত্তীর্ণ বন্ধুরা সরে গিয়েছে৷

কোন কথা মনের মধ্যে কিভাবে চলতে চলতে কখন কোন চেহারায় বেরিয়ে আসবে তা কল্পনা করা যায় না। হঠাৎ এমন প্রশ্ন উঠল সুরঙ্গমার মনে—মাধবীর আয় যদি পড়ে যায়?

এই সব ব্যক্তিগত চাকরিতে সুবিধা অনেক আছে, কিন্তু এই মহা অসুবিধে যে মনিবের কিছু হলে সে ক্ষতি কর্মচারীর উপরে তিনগুণ হয়ে লাগে।

কে এমন তার মতো ভুক্তভোগী? এই ব্লকেই সে দশ বছর চাকরি করছে হাউসকিপারের। দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটে সেই স্মগে অন্ধকার শীতে কাঁপানো কান্নাব সকাল আসবে তা কেউ কল্পনাতেও আনেনি। কিন্তু সেই চিত্রকর আত্মহত্যা করল। তখন কিছুদিনের মধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল না এলে সুবঙ্গমাকে এখনও হয়ত বেকার থাকতে হত। আর হাউসকিপার একবার দীর্ঘদিন বেকার থাকলে বাসি ব্রেকফাস্টের মতো চিরকালেব অস্পৃশ্য হয়ে যায়।

মাধবী দেউলে হলে সুরঙ্গমার চাকরি থাকবে না। অথচ ঠিক দুমাস আগেই বাসনপত্তর ধোয়ার কলটা কিস্তিতে বন্দোবস্ত করে বসানো হয়েছে সুরঙ্গমার নিজের ফ্ল্যাটে।

মাধবীর এটা উঠতি সময়। কিন্তু অত্যন্ত খরচের হাত তার। নিরঞ্জন থাকতে যে মান ছিল তাকে রাখতে গিয়ে এরই মধ্যে কিছু কিছু ধার হয়েছে। এখন তার প্রতিপত্তিশালী বন্ধুদের সরে গেলে চলে না।

অবশ্য এসবই অমূলক উৎকণ্ঠা হতে পারে। সকালে ব্রেকফাস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকে সুরঙ্গমা যে মাধবীকে দেখতে পেয়েছিল সে একবারে সকালের রোদের মতো ঝরঝরে তাজা। ম্রিয়মাণ নয় বরং উৎসাহিত। সুরঙ্গমার ভয়ের কারণটার মূলে উৎকণ্ঠা ছিল। এই আত্মসমালোচনা করল সে। ট্রামশ্রমিকদের ধর্মঘটই সেই উৎকণ্ঠা। শ্রমিকনেতাদের কখনও কখনও বেকায়দায় পড়তে হয়। শ্রমিকনেতাদের স্ত্রীদের মনে ধর্মঘটের মুখে একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সে আশঙ্কা তার বেলায় সত্যি হলে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দূরে থাক, বহুদিনের চেষ্টায় সাজানো ফ্ল্যাটটাকেও ছাড়তে হতে পারে। এ অবস্থায় নিজের চাকরির উপরে দরকারের চাইতে বেশি টান দেখা দেয়।

খবরের কাগজটাকে ভাঁজ করে রাখল সুরঙ্গমা। এবার কাজে লাগতে হবে। এখানে অবশ্য অনেক বিষয়ের সুবিধা আছে। চিত্রকরের ফ্ল্যাটে তা ছিল না। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, রেফ্রিজারেটার, রেগুলেটেড কুকার, অটো-ডিশওয়াশার এসব বিষয়ে নিরঞ্জনের রুচি আধুনিক ছিল। আর সে যে একজন প্রকৃত টেক্‌নোক্র্যাট ছিল তার প্রমাণ এসবগুলোকে ফ্ল্যাটে আনতে সে অঙ্ক কষতে বসেনি। অন্যদিকে দেখো ঘর গুছিয়ে তোলার আগ্রহই দেখা দিয়েছিল। দাড়ি কামানোর গ্যাজেট থেকে ইলেক্‌ট্রিক মাসেজার—কিছুই যোগাড় করতে ভুল হয়নি।

আগে বিছানা রোদে দেয়া। মাধবীর শোবার ঘর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এটা সুরঙ্গমার বৈশিষ্ট্য যে সেকেলে ধারায় অন্তত সপ্তাহে দুবার বিছানাকে হাওয়ায় মেলে দেয়। চেয়ার জড়ো করে তার উপর দিয়ে তোষক, রাগ, বালিশ পিরামিডের মতো করে সাজিয়ে দিল সুরঙ্গমা। রোদটা বেশ ঝক্‌ঝকে।

চাকরি, পেশা—সুরঙ্গমা এমন একটা শ্রেণীতে জন্মেছে যাদের পক্ষে চাকরি নেয়া আবশ্যিক। সে দিক দিয়ে সে মাধবী আর তাদের মতো হাজার হাজার মেয়ে একই পথের পথিক। টেক্‌নোক্র্যাটের মেয়েরা

ছাড়া চাকরি ছাড়া কারই বা চলে?

পেশার ব্যাপারটা কিছু কৌতুকের। কে কি পেশা ধরবে তা বলা যায় না ; গুণ, পটুতা যতখানি প্রায় ঠিক ততখানি ঘটনার পরম্পরা বলে দেয় কার কি পেশা হবে। একটা বালিকাকে দেখে বলে দেয়া যায় না সে স্টেনো অথবা নার্স, কিংবা ডাক্তার হবে। সুরঙ্গমা হাউসকিপার হয়েছে। কিন্তু একবার একটা পেশা ধরলে সেটাতে দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেটা মাধবীর মতো রূপসীর পক্ষেও সত্য।

সব হাউসকিপার এমন চিন্তা করে কি না কিংবা ট্রেড-ইউনিয়নিস্ট স্বামীর সঙ্গে বিশ বছর কাটিয়ে সুরঙ্গমার চিন্তা এমন রূপ নিয়েছে ; উপরন্তু সেই লোকটি আজ ধর্মঘটের নেতৃত্ব করছে বলেই আজ বিশেষ করে সুরঙ্গমা ভাবছে, তা আমাদের জানা নেই।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা ঠেলতে ঠেলতে সুরঙ্গমা ভাবল : মাধবী যদি নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যাসগুলোকেও ছেড়ে দেয় ভালই হবে। ওয়াইনটা লিভারের পক্ষে ক্ষতিকর এ বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়। অভিনেত্রী হিসাবে, কিংবা নর্তকী হিসাবে যদি অর্থ উপার্জন করতে হয় শরীরের যত্ন করতেই হবে। টাইপিস্টের যেমন দশটা আঙুল, শিক্ষয়িত্রীর যেমন ধৈর্য, সাহিত্যিকের যেমন মস্তিষ্ক, মাধবীর তেমন রূপ।

এমন কি মাধবীর পেশাটা এ রকমই যে তাকে নিরঞ্জনের কথা মানতে গেলে পেশা ছেড়ে দিতে হয়। আদালত থেকে আসবার পরে এখন এটা অন্তত এ ব্লকের সবাই জানে : মাধবী নিরঞ্জনের ছেলেপুলের মা হতে অস্বীকার করেছিল। ডাইভোর্সের আবেদন নাকচ করে দিয়ে আদালত একবছর পৃথক থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেখানে এই পেশার যুক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবেই তুলেছিল মাধবীর উকিল।

এটা অবশ্যই অনেক দামী ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। কিছুমাত্র শব্দ হয় না। সুবঙ্গমার নিজের ফ্ল্যাটের জন্য কিনবার সময়ে এটাকেও ক্যাটালোগে দেখিয়েছিল সেলসম্যান। কিন্তু নাম দেখলেই বুঝতে পারা যায়। হাতলের গায়ে সোনালী রঙে লেখা 'টেক্‌নোক্র্যাট'। কিন্তু কখনও কখনও সামান্য একটা শব্দ কি রকম আটকে ধরে মনকে। সুরঙ্গমা বোধ হয় তিন চার মিনিট ক্যাটালোগে এটার ছবির দিকে চেয়েছিল। যেন সেটা একটু চ্যালেঞ্জ। সে কি আর একটু কষ্ট করলে 'গারস্থি' মার্কা দেয়াটার বদলে 'টেক্‌নোক্র্যাট' মার্কাটাকে কিনতে পারবে না?

তখন সেই বদখত্‌ বড় নাকওয়ালা মাথার সামনের দিকে রুপোলি চুলের গোছা সমেত ট্রামকর্মচারী কথা বলেছিল। (সুরঙ্গমার চোখ দুটো স্নেহে কোমল হয়ে উঠল।) আমরা তো প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থই কি বলো। মেজাজ বুঝে সেলস্ম্যান সুর পালটে ছিল, কথায় সাম্প্রদায়িকতার সুর এনে বলেছিল,—আমাদের মধ্যবিত্তদের পক্ষে 'গারস্থিই' ভাল। 'টেকনোক্র্যাট মার্কায় সুপার ক্যাথোড লিনিয়াল ব্রেক বলে যা আছে তা যে ঠিক কি তা সে নিজেও জানেনা। অথচ দামে প্রায় দেড়গুণ বেড়ে যায়।

সুরঙ্গমা সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানে, অনেক কথা সে তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনাও করেছে। যার ফলে যেটা অন্য অনেকে বুঝতে পারে না সেটা তার কাছে স্বচ্ছ—টেক্‌নোক্র্যাট কথাটা সমাজে স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছে। তারাই প্রতিপত্তির দিকে বেড়ে চলেছে। এটা এই শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য যে তাদের অনেকেরই, যেমন নিরঞ্জনের বেলায় নিজের টেকনিক্যাল ক্ষেত্রের বাইবে কিছুমাত্র রক্ষণশীলতা নেই।

কিন্তু সুরঙ্গমার নিজের ফ্ল্যাটটা রক্ষণশীল। কিছু একটা যেন আছে যা রোজকার রোজ বদলায় না। তারই দিকে লক্ষ্য রেখে রেখে সে নিজের ফ্ল্যাটটাকে গুছিয়ে তুলেছে। ফ্ল্যাটের পর্দাগুলো, কারুকার্যবর্জিত জ্যামিতিক গড়নের আসবাব, সাদামাটা পর্সিলেনের বাসন, 'গারস্থি' মার্কা ভ্যাকুআম ক্লিনার, 'গৃহস্থ' মার্কা ডিশ্‌ওয়াশার, 'ঘরোয়া' মার্কা রেফ্রিজারেটর। সুরঙ্গমা বলতে পারে বিজ্ঞাপন তাকে সব সময়ে বেসামাল করতে পারেনি।

মাধবীর মধ্যেও এমন একটা শক্ত হতে পারার ক্ষমতা আবিষ্কার করতে পেরে সুরঙ্গমা খুশি হয়ে উঠল। নিরঞ্জনের মতো একজন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ প্রকৃত টেকনোক্র্যাটের আদরেও যা আত্মবিলোপ করেনি।

এমন কিছু এখনও আবিষ্কার হয়নি যার সাহায্যে সন্তানধারণের আগেকার আকৃতি বজায় রাখা যায়।

সন্তানবা পেট আর বুকেব গড়নকে ধ্বংস করবেই। মাধবীর মূল্য তাতে অনেকটাই কমে যেতো।

হাউসকিপারদের কথা আলাদা। একটু মোটা গড়নের, আর হালে শরীরে একটু 'মা-মা' ভাবটাই হাউসকিপারদের মধ্যে দেখতে চায় মালিকশ্রেণীর লোকেরা।

ফ্লানেলের টুকরো দিয়ে শার্সির কাচগুলোকে মুছতে হবে এবার।

একটা জানলা খুলে তার সামনে দাঁড়ালো সে। আজকের দিনটা বেশ খট্‌খটে তা মানতেই হবে। সারা বছব এ-রকম বোদ থাকলে পিঠের পেশীর জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না। নতুবা—

বোম্বাই-এব বিচে এক ছুটিতে গিযেছিল সুবঙ্গমা। পনরো দিন ছিল তারা সেখানে। সেই রোদে তাব স্বামীর আর তার নিজের গায়ের রং লালচে বাদামি হযে উঠেছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে স্বামী বলেছিল—এখন তুমি চাকরিতে গেলে কিছুদিন কষ্ট হবে। কথাটায় এমন একটা মোহ তৈবি করেছিল যে কিছুক্ষণ সুরঙ্গমা কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু তার স্বামীও জানতে' সেও জানতো পনরো দিনের ছুটিতে সঞ্চয়ের প্রায় সবটুকুই খরচ কবে ফেলেছে তারা। চাকরিতে ফিরে না-গেলে ফ্ল্যাট-লিজের কিস্তি শোধ করাই যাবে না। ভবিষ্যতেব পরিকল্পনার কথা দূবে থাক।

তার চাকরিটা এমন যে সপ্তাহে দেড়দিনেব বেশি ছেলেপুলেব সঙ্গে বাস করতে পারে না সে। তাতে অবশ্য খুব অসুবিধাও হয না। তেমন দরকাব হলে টেলিফোনে কথা বলা যায। উৎসব কবতে হলে তারা এই মির্জা গালিব এভেন্যুর কোন রেস্তোরাঁয় আসে, একসঙ্গে লাঞ্চ কবা যায়। এটা একটা আদর্শ বন্দোবস্ত নয় সেই সেকালের নিরিখে। কিন্তু মনে কবো তার মেয়ে যদি ভ্যাকুআম ক্লিনাব, ডিস্ওযাশাব, রেফ্রিজাবেটর ইত্যাদি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকে কিংবা অটোমোবাইল চালাতে না জানে? সেজন্যই অন্তত এই গ্যাজেটগুলোকে নিজেদের ফ্ল্যাটে রাখা দবকাব। একটা ছোটখাটো গাড়ির অভিজ্ঞতা দবকাব। মেযেকে তাব সংস্কৃতির সাহায্যেই সমাজে আদর পেতে হবে। এ সবের বন্দোবস্ত করতে হলে সুবঙ্গমার চাকবি কবা ছাড়া উপায কি? তাব স্বামী একদিন বলেছিল সময় বাঁচানোর জন্যই গ্যাজেট কিন্তু গ্যাজেটগুলো কিস্তিতে কিনতে আমাদেব দুজনকেই চাকবি করতে হচ্ছে। সমযটাই হাবিযে গেল। কিন্তু এটা রসিকতা ছাডা আর কি হতে পাবে।

মাধবীবও পেশার উপবে টান থাকা স্বাভাবিক। শার্সিগুলো খুব কম সময় নিল। সুরঙ্গমা প্যান্ট্রিতে ফিবে এলো। বেতের একটা হাল্কা কেস আব প্যাবাসল নিযে সে ধোবিখানায় যাওয়াব জন্য তৈরি হল।

টেকনোক্র্যাটদের রীতিনীতি একটু চঞ্চল। কেউ কেউ বলে ডাইনামিক। কেউ টের পাবে না একদিন দেখা যাবে পোশাকে রদবদল হযে গিয়েছে। এরই মধ্যে সিল্কে ফিরে এসেছে টেরিলিনের বদলে। তেমনি হয়ত এই ছেলেমেয়ের উপবে ঝোঁক। সুবঙ্গমা ঠিক কবল সপ্তাহান্তিক ছুটিতে এবাব যখন সে ফ্ল্যাটে ফিরবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে সন্তানপালন করাটা ফ্যাস্যানেবল্ হয়ে উঠেছে কি না। কযেকদিন রোজ খুঁটিয়ে খববের কাগজ পডলেই ব্যাপারটা ধরা যাবে। দেড়টা বাজে। হাত ঘড়িতে সময় দেখে সুবঙ্গমা লিফ্‌টের খাঁচার সামনে এসে দাঁডালো।

যে দরজা দিয়ে মাধবী ক্লাসিকে গিয়েছিল, দেডটার দু এক মিনিটেব মধ্যেই সেই দরজা দিয়েই সে ফিরে এলো। রাজেন ইতিমধ্যে ফিরে এসে আটকে রাখা টেবলটায় অপেক্ষা করছে। মাধবী বসতেই লাঞ্চ এলো।

অভিনয়ের মহলার পর গাল দুটো এখন আরক্তিম। উষা-ভ্রমণের পর এরকম হলে যে স্বল্প ঘমার্ক্তিতা থাকতো—এখন তেমনটা দেখা যাচ্ছে না। অনুমান করি পবিশ্রমটা মানসিক, সবিশেষ বলতে হলে আবেগের।

মাধবী বলল, 'রাজেনবাবু, ক্লাসিকের সদস্যকার্ড আপনার আছে তা শুনে গিয়েছিলাম।' রাজেন বলল, 'না বললে মনে হত মিথ্যা ব্যবহার করলুম। যদিও ক্লাসিকের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে আবহাওয়া বাজাবদর, এমন কি কুকুর-প্রদর্শনী নিয়ে আলাপ করে, ক্লাসিকের কথা বলে না।' মাধবী বলল, 'সুতরাং আমরাও বলবো না।'

রাজেন বলল, 'সংস্কৃতি মাইফেলের দুখানা টিকেট পাওয়া গিয়েছে। লাঞ্চের পরেই আবার শুরু। জেনে নিয়েছি চারটে প্রধান বক্তৃতা হবে এ বেলায়। কিন্তু ভেবে দেখলাম সিম্পোসিয়াম কথাটার চাইতে মাইফেল

কথাটাকে চালু করা ভাল।'

মাধবী ছুরি কাঁটা নামিয়ে রেখে মুখ তুললো।

রাজেন বললে, 'অন্যদিকে আমি প্রকৃতপক্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট নই কিন্তু তাই বলে প্রায় সমবয়সী একজনকে নিয়ে যদি নিছক পথে পথে ঘুরে বেড়াই তা হলেও কিছু বেমানান হয় না। অথবা আমরা রাষ্ট্রীয় চিত্রশালায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখে বেড়াতে পারি। কিংবা মনুমেন্টের পাশে গাছের ছায়ায় ঘাসের উপরে পা ছড়িয়ে বসে পায়রা ওড়া দেখতে পারি।'

মাধবী বলল, 'ও কয়েকটি আর একদিনের জন্য তোলা থাক। আজ আমরা সেমিনারে যাবো। সেমিনারে এখন কি আলোচনা হচ্ছে বলুন। যাকে পুর্বাভাস বলে।'

রাজেন বলল, 'আপনার ঝাল লেগেছে দেখছি।'

ওয়েটারকে ডেকে আইসক্রিম আনতে বলে দিলো রাজেন। মাধবী বলল, 'সেমিনারের আলোচনার অর্ডার দিয়েছিলাম।'

রাজেন বলল, কতদূর এগিয়েছে তা জানি না। যতদূর আন্দাজ করেছি—বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি আর মানবিকী সংস্কৃতি নামে যে কুৎসিত পরিভাষা দুটো তৈরি হয়েছে, ঝগড়াটা তাদের মধ্যে। আরও বেশি জটিল হয়েছে এজন্য যে দুটি দলই দুই দুই উপদলে বিভক্ত।'

কথা বলতে বলতে রাজেন—টম্যাটো সসের বোতল, সল্টসেলার, জলের গ্লাস আর নিজের বুড়ো আঙুল উঁচু করা বাঁ হাত পরস্পরের থেকে প্রায় সমান দূরে রেখে একটা চতুষ্কোনের আভাস তৈরি করল টেবলের উপরে।

মাধবী বলল, 'এর মধ্যে আপনি কোন দলে আছেন, কিংবা আমার কাল রাতের ব্রিজ-পার্টনার সুধীর ডাক্তার।'

রাজেন হেসে ফেলল, 'আমরা তো সেমিনারে যাচ্ছি। আলোচনা শুনে বুঝতে পারবো আমরা কে কোন দলের। আমাদের মেডিকোর কথা বলতে পারি, তার একটা সুন্দর পরীক্ষা আছে। আপনার ভ্যাকসিনেশন হয়েছে? টাইফয়েড ইনোকিউলেশন হয়েছে? বি-সি-জি টিকা নিয়েছেন? ব্লাড কোন গ্রুপের তার পরীক্ষা করিয়েছেন? কোন কোন জিনিস খেলে আপনার অ্যালার্জি হয় তার তালিকা প্রস্তুত তো? এসবই যদি হ্যাঁ হয় তবে বৈজ্ঞানিক প্রায়োগিক সংস্কৃতিকে আপন অনেক দূর এগিয়ে আছেন।'

মাধবী জল খেয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছে বলল, 'কফি আসুক। এগুলোর একটাও কিন্তু আমার করানো হয়নি।'

রাজেন হেসে বলল, 'সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে জানা যাবে আপনার সম্বন্ধে এখনই হতাশ হতে হবে কি না।'

পুরনো কথার জের টেনে মাধবী জিজ্ঞাসা করল, 'আর আমাদের ট্যাক্‌টিসিয়ান অমল?'

রাজেন বলল, 'সে ভারি মজার কথা। অমল অঙ্ক কষতে অভ্যস্ত, মিসাইল নিয়ে তার কারবার। বলা যেতে পারে মিসাইলের প্রায়োগিক উন্নতিই তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু সে দিন রাত শুভ অশুভের কথা বলে। তার যুক্তি এই মিসাইলের সুইচ টিপে দিলে সেটা অঙ্কের হিসাবে ইলেক্‌ট্রনিক্‌সের সাহায্যে লক্ষ্যকে চুরমার করবে। কিন্তু লক্ষ্যটা একটা সহর হতে পারে। সুতরাং অঙ্কের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে। তার ঝোঁকটা মানবিকী সংস্কৃতির দিকে মন হয়। কিন্তু যেহেতু সে আকৈশোর অঙ্ক ও ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ নিয়ে ডুবে আছে, অনুমান করি তার এই ঝোঁকটা পড়ে শেখা নয়, দেখে শেখা। সে বোধ হয় মানবিকী-উদ্ভাসনী গোত্রের।
রাজেনের বলবার কায়দায় মাধবী হেসে ফেলল।

কফি এসেছিল। সময় দেখলো রাজেন। সেমিনারের লাঞ্চ-উত্তর বৈঠকে গোড়া থেকে যোগ দিতে হলে উঠতে হয়। উঠে দাঁড়ালো তারা। বিল মিটিয়ে দিলো মাধবী। লম্বা লম্বা পদক্ষেপে পাশাপাশি হেঁটে বার হল তারা কাফেটেরিয়া থেকে।

অনুভূতিকে চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক সময়ে অনুভূতির উপরে সুবিচার হয় না। মাধবী অনুভব করল নিরঞ্জন ঘোষালের সঙ্গে কাটানো অনেকদিনের লাঞ্চ-উত্তর ঘন্টাগুলো থেকে এগুলো পৃথক

হতে চলেছে। রাজেনকে তার বন্ধুরা পরিহাসছলে দার্শনিক বলেছিল কালকের ডিনারে। গোটিযুক্ত রাজেনকে অল্পবয়সী দার্শনিকের মতো দেখায়—অল্পবয়সী যদিও মাধবীর চাইতে দুচার বছরের বড়ই হবে।

ট্যাক্সির অপেক্ষায় ফুটপাতে দাঁড়ালো তারা। আর তখন মাধবী আবার ভাবল—মাধবী নিজেও যদি দর্শনের ছাত্রী হত তা হলে রাজেনের কাছে পরীক্ষার খাতিরে তত্ত্বের কথা জানতে চাইতো। আর তা স্বাভাবিকই হত। এখনও যদিও সে দর্শনের ছাত্রী নয়, তেমন খোলা মনে জানতে চাইলে কি ভাল লাগবে না?

কিন্তু অনেক সময়েই নিজেরা চেষ্টা না করলেও এমন ব্যাপার ঘটে যাতে পরিকল্পনা বদলে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন তারা ট্যাক্সি পেঁলো না তখন শোরডিচের গেটম্যানের শরণ নিতে হল। তার কাছে জানতে পারা গেল ট্রাম ধর্মঘট শুরু হয়েছে লাঞ্চের ঘণ্টা থেকে। বাসগুলোকে অন্য সব রুট সাসপেন্ড করে অফিস পাড়ার দিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, নতুবা লাঞ্চের পরে অফিসগুলোতে খুব কম কর্মচারীই ফিরতে পারবে। উপরন্তু ওমনিবাস যেদিকে যায় ট্যাক্সিও সেদিকে চলে। আর ড্যুরি লেন এমন রাস্তা নয় যে পরিচালকদের বিশেষ বন্দোবস্তের আওতায় পড়বে।

শুনে রাজেন বলল, 'সুতরাং?'

মাধবী বলল, 'লেক এভেন্যু দিয়ে হেটে চলতে থাকলে হয়ত ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।'

রাজেন গম্ভীরভাবে বলল, 'লাঞ্চেব ভিড়টা কমলে লেক এভেন্যুতে ট্যাক্সি আসতে থাকবে, কিংবা এদিকে যে সব ম্যাটিনি চলছে তার কাছাকাছি ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে।'

শোরডিচের গেটম্যান বলল, 'লেক এভেন্যুর উপরে 'সুদেহী', সেখানে কুস্তির ম্যাটিনিও আছে।'

হেসে রাজেন বলল, 'তুমি দেখছি খবর টবর রাখো। তা হলে মিসেস্ ঘোষাল আমরা এগোতে পাবি। আপাতত সুদেহীর দিকে।'

মাধবী হাসল। 'অফিস পাড়া থেকে দর্শক নিয়ে দু-একটা ট্যাক্সি অন্তত সেখানে আসতে পারে।'

শোরডিচের গেটম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাঁটতে শুরু করল তারা।

অনেক সময়ে বাধা মানুষের উপকার করে থাকে। পাঠক, আপনি সংস্কৃতি সেমিনারের বক্তৃতাগুলো থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু প্রিয় পাঠিকা, এতক্ষণে আমাদের কারো কারো মনে সেমিনারের আলোচ্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মেছে। এ অবস্থায় মাধবী এবং রাজেন যতক্ষণ লেক এভেন্যু ধবে 'সুদেহী'র দিকে এগোচ্ছে আমরা সেমিনারের বিষয়ে সেদিনের যে কোন সান্ধ্য পত্রিকা থেকে একটা বিপোর্টাজ উদ্ধৃত করতে পারি।

রিপোর্টাজ :

লাঞ্চের পরে অধিবেশনের মূল সুরটা ছিল সমন্বয়ের। বৈজ্ঞানিক ও মানবিকী সংস্কৃতির পার্থক্যের উপরে সাধারণত জোর দেয়া হয়ে থাকে। প্রোটেস্ট্যান্টরা যেমন নিজেদের বক্তব্যকে জোরদার করে বলতে অভ্যস্ত ছিল এক সময়ে, তাদের কারো কারো যেমন সবিশেষ পিউরিট্যানিক ঝোঁক ছিল, যেমন একরোখা ডগ্‌ম্যাটিকতা কোন কোন মার্কসপন্থীর মধ্যে সেকালে দেখা যেত, সাধারণভাবে সে-রকম একটা কট্টরতা ইদানীং বৈজ্ঞানিক-সংস্কৃতিওয়ালাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু লাঞ্চের পরে এই চতুর্থ অধিবেশনে (কাল শুরু হযেছে, কালকের লাঞ্চ, ডিনার, আজ সকালের ব্রেকফাস্টের পর তিনটি অধিবেশন বসেছিল) পার্থক্যর চাইতে বরং ঐক্যের উপরে জোর দেয়া হয়েছিল—সমন্বয়ের এটাই পদ্ধতি।

প্রথম বক্তা অধ্যাপক স্নুভার (কার্ল) বললেন : আর্ট এবং বিজ্ঞান দুই-ই মূলত অবধারণের প্রক্রিয়া, কঠিনকে সহজ ভাষায় বলতে হলে জানার পদ্ধতি। কেউ কেউ প্রদীপের মিঠে আলো এবং আর্কল্যাম্পের দ্যুতিকে—এই দুই-এর পার্থক্য বোঝাতে তুলনা দিয়েছেন। এই দুই মানস-পদ্ধতিকে যখন আমরা একই সময়ে চিন্তা করি একটা আপাতবিরোধ আমাদের চোখে পড়ে : নতুন হলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ হয়েছে, তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু আর্টের সাহায্যে অবধারণের প্রাচীন পদ্ধতির তেমন কার্যকারণ বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়নি। তা হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই, বিজ্ঞান জগতে আমাদের

ধারণাগুলোর বৈপ্লবিক অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও আর্টের সাহায্যে অবধারণ প্রক্রিয়াকে আমরা বাতিল করতে পারি না। মানুষ নিজের প্রয়োজনে এই দুই অবধারণ পদ্ধতিকে আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান বিষয় এবং ঘটনার সত্তাসার নির্ধারণ করে, জগতে সেই বিষয় এবং ঘটনার স্থানিক এবং কালিক অন্বয় নির্দিষ্ট করে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বিগত অনুভূতি, সুখদুঃখসম। অন্যদিকে আর্ট ব্যক্তিসাপেক্ষ। স্থান ও কালের পরিপেক্ষিতে বিষয় এবং ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ উপলব্ধিই আর্টের লক্ষ্য, আর্ট অনুভূতি-নির্ভর। সংক্ষেপে বিশ্বের নিরিখে মানুষকে জানাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, অন্যপক্ষে আর্ট মানুষের নিবিখে বিশ্বকে জানতে চায়।

পরবর্তী বক্তা (অধ্যাপক ভলকার্ট) আর্ট এবং বিজ্ঞানেব অন্তর্নিহিত ঐক্যব আর একটি দিক তুলে ধরেন। সাধারণত বিজ্ঞান এবং আর্টের পার্থক্য দেখাতে আবেগের উল্লেখ করা হয। তিনি বলেন সেম্যানেটিক বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনই আমরা বলতে পাবি—ভব এবং শক্তির মতো 'সংবাদ'ও বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ। বস্তুর সামীপ্যে আসামাত্রই আমবা যেমন তাব ভরকে দেখতে পাই তেমনি তার 'সংবাদ' আছে বলে বুঝতে পারি। এই 'সংবাদ'কে আত্মীকরণই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। তাকেই জানা বলে। বস্তুমাত্রেরই যেমন জাড্য তেমনি একটি নির্দিষ্ট মাপের 'অনির্দেশ্যতা' আছে। তাবই সাহায্যে 'সংবাদ' গোপন থাকে। এই সংবাদ আমাদের মনে বাহিত হলে সেখানে এক আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই আলোড়নকে আমবা আবেগ বলতে পারি। এই আবেগকে বোঝাতেই আমবা উত্তাপ, ঘনত্ব, ভব, ইত্যাদি শব্দকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করি। অন্য কথায় আবেগ, যাকে আর্টের উপজীবা বলা হয়ে থাকে, তা মনেব উপরে এই 'সংবাদে'র প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না। এদিকে দিয়ে দেখা যাচ্ছে 'সংবাদ' আবিষ্কারেব চেষ্টা যা বিজ্ঞানের লক্ষ্য আব 'সংবাদ'-জাত আবেগ পরস্পর সংলগ্ন।

নন্দনতত্ত্বের অধিকার আর্টের সীমায় আবদ্ধ থাকছে না। আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন এটা তাঁর হবিমাত্র নয়। অণুর স্বরূপ সম্বন্ধে নীল্‌স ববের প্রস্তাবকে আইনস্টাইন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বজ্ঞার উদ্ভাস মনে করেছেন। আইনস্টাইনের নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে বলা যায় তা মননের উৎকাঙ্ক্ষী মুহূর্তে স্বজ্ঞার উদ্ভাস; আর সেই অবস্থাটা তার সঙ্গেই তুলনীয় যখন মৎসার্টের মতো কোন সঙ্গীতকাব তাঁব অলিখিত সঙ্গীতেব সম্পূর্ণ সুরলহরীমালা একটি মুহূর্তেই শুনতে পান। এই স্বজ্ঞা, এই কান্তি-অনুভব—এইতো আর্টের স্বকীয়ত্ব বলে এতদিন ঘোষিত হয়েছে।

রীতির দিক দিয়েও আর্ট এবং বিজ্ঞান কাছাকাছি সবে আসছে। দূরে সবে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এমন কতগুলো প্রত্যয়ের প্রচলন করেছিলেন যা প্রত্যক্ষতায় প্রমাণিত নয়, অথচ সেগুলো বস্তুব সত্তাসাব বুঝতে আমাদের অনন্য সুযোগ এনে দিয়েছে।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে তলস্তয় আধ্যাত্মিক জগতে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পাঠকদের কাছে বলতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিগুলোও প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে ধরা পড়ে না কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

চিত্রকলায় প্রকৃতিবাদ থেকে সরে আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানও দৃষ্টিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোকে এই বাহ্য বলে এড়িয়ে গিযেছে। তার আপেক্ষিকতত্ত্ব, কোআন্টম্ বলবিদ্যা, প্রতিজগতের তত্ত্ব ইত্যাদি আমাদের কমন সেন্সের কাছে, জনতার চোখে বিমূর্ত চিত্রণের মতো, উদ্ভট এবং হাস্যকর।

এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সঙ্গ, কান্তি-অনুভূতি, অতি-প্রাকৃতবাদ ইত্যাদিকে যে আমরা আর্টের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি নন্দনতত্ত্বের বিচার্য সেই বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান এবং আর্টের, তা থেকে বৈজ্ঞানিকী এবং মানবিকী সংস্কৃতিব সমন্বয় হতেই হবে।

স্থানীয় অপরাধ-বিজ্ঞানী ভূধর সেন সমন্বয়বাদের বিপক্ষে মতপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন . একই রকমের জামা পরলে বা টেবল ম্যানার্স একই রকম হলে দুজন মানুষ এক রকম হয় না। বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বজ্ঞা কিংবা উৎকাঙ্ক্ষা নয়। প্রথম বক্তা ঠিকই বলেছেন—বিজ্ঞান ব্যক্তির পরোয়া করে না। বিজ্ঞানকে মানুষেব সুখদুঃখে উদাসীন হতেই হবে। কান্তিবিদ্যা-কোন সময়েই নীতিশাস্ত্রনিরপেক্ষ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানে নীতিশাস্ত্রের স্থান নেই। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং সত্য মানবজীবনের পক্ষে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর তা নিয়ে চিন্তা করা

বিজ্ঞানের মাথাব্যথা নয়। ডেসডিমোনার মৃত্যু জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্বাসরোধের ঘটনামাত্র, অপরাধবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা হীনমন্যতাজাত অসূয়ার আত্মপ্রকাশ, কিন্তু আর্টের দৃষ্টিতে? বিজ্ঞানে ইনসেস্ট বলে কোন কথা নেই, জীববিজ্ঞানের ভালো স্পেসিমেন পাওয়ার জন্য তা ঘটানও যেতে পারে। কিন্তু সমাজে?

তর্কের খাতিরে যদি বা ধরে নেওয়া যায় নীলস বর অথবা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক স্বজ্ঞার পথে চলতে পারেন, একজন গেয়টে বা মৎসার্টের মতোই নিজের কান্তি-অভীপ্সাকে চরিতার্থ করতে পারেন, তা হলে জনসমাজ কোআন্টাম বলবিদ্যা অথবা প্রতিজগতের সিদ্ধান্ত আলোচনায় কান্তিঅভীপ্সা চরিতার্থ করতে পারে কি না আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

পরবর্তী বক্তা দুজনই ভূধর সেনকে সমর্থন করেছিল। প্রথম জন যেখানে ভূধর তার বক্তব্য শেষ করেছিল সেখানে তার বক্তব্য শুরু করে বলে '—সেজন্যই বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে মানুষ হৃদয়কে, স্বজ্ঞাকে, নীতিজ্ঞানকে বর্জন করতে পারে।

সংস্কৃতি অবশ্যই অন্নময় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে ওঠার উপায়। অন্নময় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে বর্তমানে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকায় কান্তিঅভীপ্সার চরিতার্থতাকেই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য বলা হয়। সুতরাং জনসমাজ যেহেতু আইনস্টাইন অথবা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নয়, বিজ্ঞান তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কয়েকটি ধরতাই বুলি দিতে পারে, যাকে প্রকৃতপক্ষে এনেছে তাকে প্রায়োগিকবাদ বলে।

দ্বিতীয় সমর্থক বলেন যাকে সংস্কৃতি বলা হয় তা কয়েকটি ব্যক্তিতে মাত্র সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি কথাটার অর্থ থাকে। পূর্ববর্তী বক্তা ঠিকই বলেছেন সমগ্র চেতনাকে অন্নময় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে স্থাপনের প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতি বলা যেতে পারে, সমগ্র চেতনা বলতে অবশ্যই বোধশক্তি ও স্বজ্ঞাশক্তি দুটোকে ছাড়াও আবেগকে বোঝাচ্ছে। এই অন্যতর অস্তিত্বের উপরে আগ্রহ মানুষের সহজাত। এতদিন মানবিকী বিদ্যার চর্চা এবং আর্টস তাকে সাহায্য করছে। মানবিকী বিদ্যা থেকে সরে আসার ফলে এখন যা পাওয়া যাচ্ছে তাকে ভোগ্যপণ্য অর্জনের আত্যন্তিক আগ্রহ বলা যেতে পারে। আবার টেবল থেকে সরে আসবার পর নানা ফ্যাক্টরি এবং মিলে যে ভোগ্যপণ্যগুলো সৃষ্টি হচ্ছে তার যতদূর সম্ভব করায়ত্ত করার শক্তিকেই সার্থকজীবন মনে করা হচ্ছে। একটি মোটরগাড়ির সুন্দর লম্বা গড়ন যেহেতু শুধুমাত্র আহার নয়, তেমন একটা গাড়িকে নিজের বলে পাওয়াকেই সংস্কৃতিবান পুরুষের লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

এর পরেও খবরের কাগজে প্রথম বক্তা সুডার (কার্ল) এর উত্তর আছে। কিন্তু তার উদ্ধৃতি দেয়া আমাদের দরকারের নয়।

রাজেন বলল, 'একটা কথা আমি কিছুক্ষণ থেকে ভাবছি। এই দুপুর রোদে আপনার সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করাটা ভালো হচ্ছে না।'

মাধবী একটা কাজ করল। কাছাকাছি একটা টফি-লজেন্সের দোকান দেখতে পেয়ে তরতর করে সেদিকে এগিয়ে গেল। টফি কিনে ফিরে এসে বলল—'নিন। আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কি কোন দুপুরে হাঁটেন নি? কিম্বা দালমুট চিবোতে চিবোতে খেলা দেখতে যাননি কোন সহপাঠিনীর সঙ্গে?'

রাজেন টফি নিল, পকেটস্থ করল। বলল : 'অন্তত সন্ধ্যার অভিনয়ের সময়ে ক্লান্ত দেখাবে আপনাকে।'

কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। এই কড়া রোদ ত্বক পুড়িয়ে দিতে পারে। একটু ভাবলো মাধবী। হর্স টেইল সমেত মাথা দুলিয়ে বলল, 'আজ ছুটি আছে। দরকার হলে আরও দুদিন ছুটি নিতে পারি।'

রাজেন বলল, 'রোদে ঘোরার চাইতে তা হলে কি আমরা কুস্তির হলে ঢুকবো?'

মাধবী হাসিমুখে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে লাইটওয়েট কুস্তি আমার ভালো লাগতে পারে।'

হলে ঢুকতে ঢুকতে রাজেন বলল, "আমি কিন্তু পয়েন্ট গুণতে জানি না।'

মাধবী বলল, 'দেখা যাক দুজনে মিলে হিসাব রাখতে পারি কি না।'

লেক এভেন্যুর কুস্তির হল 'সুদেহী', খবরের কাগজকে বিশ্বাস করতে হলে বলা যায়, সহরের আধুনিকতর কুস্তির হলগুলোর একটি হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্লাস্টিক ও ফাইবার গ্লাসের ব্যবহারের অনুপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব প্রায়োগিক খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় হলটায় রোম্যান বিপুলতাকে অনুকরণ করার চেষ্টা হয়নি। সব বিষয়ের আদিম

রূপে একটা সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা থাকে। এ হলটায় তেমন কিছু চোখে পড়ে যদিও তা হয়তো অনিচ্ছাকৃত, প্রতিষ্ঠাতার আর্থিক কুণ্ঠার ফলও হতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই টিকেট কেনবার পোর্চ। রাজেনবা যখন পৌঁছালো তখন কুস্তি শুরু হযে গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু কুস্তি জোড়ায় জোড়ায়, মধ্যে বিরতি রেখে রেখে টিকেট কাটাও চলেছে। অল্পবযস্ক দর্শকদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়কে দেখতে পেয়ে রাজেন তাকে প্রোগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা কবল।

লোকটি কিছু না বলেই বলল, 'আবে, মশায়, তবে আর বলছি কি? এখন বোধ হয় লাইট হেভিওযেট লড়ছে। ঘড়ির কাঁটায় সময় মাপা আছে, মশায়, একটুও নডচড হবে না। এর পবে লাইটওয়েট। আজও যদি সে জোড়াই থাকে তবে বুঝতে হবে এটা কৃত্রিম লড়াই। লড়িয়েরা এদের মাইনে করা।'

মাধবী জিজ্ঞাসা কবল, 'মাইনে কবা?'

'হ্যাঁ, মা লক্ষ্মী, তবে আর বলছি কি? আজই শেষ পবীক্ষা করবো। যদি চাঁপা ল্যাঙট হারে তবে বুঝবো ওদেব নিয়ম হচ্ছে দু বাজি জিতে তিন বাজি হাবা, আব তারপর পরপব তিন বাজি জিতে দু বাজি হাবা। এর ফলে সাধারণ লোক বুঝতে পারে না, মশায, কে কখন হারবে। কিন্তু দেখে নেবেন, আমি যদি কলকেতাব খাঁটি বাসিন্দে হই, লাইট ওয়েটে চাঁপা ল্যাঙট হারবে এই বাজিতে।'

রাজেন এমনটা আশা করেনি। সে লোকটিকে আব খানিকটা কথা বলানোব জন্য জিজ্ঞাসা কবল, 'আমার এই সঙ্গিনীটি লাইটওযেট দেখতে চান। আমরা কি জানতে পাববো কখন লাইটওয়েট সুরু হবে?'

লোকটি বলল, তবে আব কি বলছি, সে সব ঠিক আছে। লাইট হেভির পবে ঘণ্টা বাজবে। পাঁচ মিনিট ইন্টারভ্যাল। তারপবে আপনারা আসনে বসবার জন্য আবও দু মিনিট সময় পাবেন। আবার ঘণ্টা বাজবে। তবে আর কি বলছি, তিনবার ঘণ্টা।'

লোকটি ফোঁস করে খানিকটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দিল।

রাজেন বলল, 'তা হলে বেশ সাজানো গোছানো ব্যাপার। কি বলেন?'

কিউ ধরে এগোতে এগোতে লোকটি বলল, 'তাই বলে মনে করবেন না—তবে আর বলছি কি, এ কি মশায, সেই জিনিস কবি ভোলা বায যাকে ক্লাসিক বলেছে। সব মিশোল দেযা।

বাজেন বলল, 'ভেজাল কুস্তি বলছেন?'

'তবে আর বলছি কি? এই যে এত টাকা খরচা, স্কুল কলেজে শেখানো, মশায় কিছুমাত্র ক্লাসিক নেই এতে। এব চাইতে বক্তাবাক্তি বক্সিংও ভালো যদিও তা রোমান্টিক। তবু তো রক্তটায় ভেজাল থাকে না।'

লোকটা যৎপবোনাস্তি কৃশ। পরনে মার্কান্টাইল বিপ্রেজেন্টেটিভদেব মতো একেবারে হালকাটের জামা প্যান্ট। চোখে সোনার ফ্রেমের ইন্টেলেক্চুয়াল স্নান গ্লাস। টিকেট কাটা হযে গিয়েছিল তার। টিকেট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে হলের দবজার দিকে ছুটলো। 'তবে আর বলছি কি, আসুন আপনারা।'

রাজেন একটু উঁচু গলাতেই জিজ্ঞাসা করল, 'বক্তটা ভেজাল নয বলছেন?' কিন্তু ততক্ষণে আমাদেব বন্ধু হলে ঢুকে পড়েছে।

মাধবী ঝির ঝির কবে হেসে ফেলল।

রাজেন বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, কথা বলতে গিয়ে টিকেট কাটা হল না।' মাধবী বলল, 'আমবা তা হলে খানিকটা বসে নিতে পাবি ওদিকের ওই বেঞ্চগুলোব একটিতে। দেখতে পাচ্ছেন পয়েন্ট গোনার কোন মূল্য নেই।

'কারণ কুস্তিগীররা ওদের মাইনে করা।'

বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালো রাজেন।

মাধবী বলল, 'দু বাজি জিতে তিনবাজি হারা, আর তারপর তিনবাজি জিতে দুবাজি হারা।'

'আর তারপর বোধহয় দুবাজি জেতা।

মাধবী বলল, 'আমাদের বন্ধু যদি পদ্ধতিটাকে ধরতে পেরে থাকে তবে অন্তত এই কুস্তি কুড়িবার দেখেছে।'

রাজেন বলল, 'উনিশ বারও হতে পারে। এইবার বুঝতে পারবে পোনঃপুনিকতার চক্রটাকে ঠিক বুঝতে

পেরেছে কি না। কিন্তু ভাবছি ওরা যদি ল্যাঙটের রং বদলে ফেলে তবে চক্র ধরার তাগিদে আরও কতবার তাকে কুস্তি দেখতে হবে।'

মাধবী খিলখিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু ঘণ্টা বেজে উঠল বিরতি জানিয়ে। পায়ের শব্দে বোঝা গেল এবার দরজাগুলো দিয়ে জনস্রোত বেরিয়ে আসবে। তারপরে তাদের দেখতে পাওয়া গেল। নানা বয়সের, নানা চেহারার পুরুষ, স্ত্রীলোক, যুবা যুবতী, কিশোর-কিশোরী। চুলের সাজের নানা কায়দা, পুরুষদের নানা-ডিজাইনের রংদার জামা, মেয়েদের অত্যন্ত নিচু কাটের ব্লাউজ, স্কার্টের অনেক উঁচু ছাঁট—বুঝতে পারা যাচ্ছে তারা আধুনিক রুচি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কারো মুখ শুকনো, কারো মুখ লাল, কারো মুখে বিষণ্ণতা, কেউ বা রক্তহীন হয়ে পড়েছে। দেখে বুঝতে পারা যায় কুস্তিটাকে পুরোপুরি উপভোগ করেছে।

রাজেন বলল, 'আমরা কি এই সময়ে হলে যাবো? মনে হয় না কুস্তি ভাঙবার আগে ট্যাক্সি আসবে।'

মাধবী বলল, 'কিন্তু ট্যাক্সি এসে যদি চলে যায়?'

রাজেন বলল, 'এত কাছে এসে ফিরে যাওয়াই বা কি রকম?' তাছাড়া আমার সঙ্গিনীকে এই কুস্তি দেখার পক্ষে এতটুকু বেশি প্রধান মনে হচ্ছে না।

হলটার ঠিক মাঝামাঝি ফোম প্যাডের তৈরি মল্লভূমি। তাকে ঘিরে কিছু চেয়ারের আসন। দরজা কয়েকটিকে বাদ দিয়ে দেয়াল ঘিরে গ্যালারি।

ইন্টারভ্যাল শেষ হওয়ার আগেই রাজেন আর মাধবী হলে ঢুকে পড়লো।

মাধবী বলল, 'দরজার কাছাকাছি বসা যায় না।'

রাজেন বলল, 'দেখা যাক্ দেখা যাক্।'

তারা বসতে না বসতেই ঘণ্টা বাজলো ইন্টাবভ্যালের শেষ জানিয়ে। যেমনটা আশা করা গিয়াছিল জনস্রোত দুড়দাড় করে ঢুকে পড়লো, গ্যালারির শূন্যস্থানগুলো ভরে উঠতে লাগল। চেঁচিয়ে এ ওর খবর নিতে লাগল। আগের লড়াই সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অকুণ্ঠিত মতামত বিনিময় শুরু হল। যেহেতু বন্ধুবান্ধবদেব কেউ কেউ গ্যালাবির দূরস্থিত চাপেও থাকতে পারে মতামত বিনিময় চিৎকারের সাহায্যেও হতে লাগল কোন কোন ক্ষেত্রে। কি বললে? ইল্লে। গ্রাফুস্। শেয়াকুফ এমন ধরনের দু-চারটে শব্দও ওয়াইন গ্লাসের ফেনার মতো হাসির উপরে কখনও ভেসে কখনও উপচে পড়তে শুরু করল।

মাধবী বলল, 'কিন্তু মল্লরা আসবে কোথা দিয়ে।'

তার প্রশ্নের সমাধান সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল। গ্যালারির তলায় খিলান দিয়ে প্রথমে একজন কুস্তিগীর ঢুকলো। পরনে চাঁপা রঙের ল্যাঙট। চুলগুলো ছোট ছোট কোঁকড়ানো। ফ্ল্যাশ-আলোর দরকার ছিল না। তার সুঠাম সুগঠিত হাল্কা দেহের পেশীগুলো যেন মৃদু একটা বাতাস লেগে নদীর জলের মতো ঢেউ তুলতে শুরু করল। কিন্তু অদ্ভুত বিষণ্ণ লোকটির মুখ।

রাজেন বলল, 'চাঁপা রং দেখছি।'

কিন্তু মাধবী সানগ্লাস সরাল। তার চোখদুটোকে উজ্জ্বল দেখল।

দ্বিতীয় কুস্তিগীর প্রবেশ করল। যেন তাকে ধরে রাখা হয়েছিল, হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে এমনভাবে দৌড়ে এলো সে। শরীর গঠনে সে প্রথম কুস্তিগীরের যমজ। শুধু তার মুখ আর চোখ যেন আত্মপ্রত্যয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে।

মাথায় পাগড়ি বাঁধা গলায় পাঞ্জাবির উপরে সোনার তাবিজ ঝোলানো, লুঙ্গির মতো ভাঁজ করে ধুতি পরা তিনজন প্রৌঢ় রিঙের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারা অবশ্যই বিচারক।

আর একটা ঘণ্টা বাজলো। রঙ্গস্থলী নিঃশব্দ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে নিস্তব্ধতা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। একটা চাপা উৎকণ্ঠা যেন দেবদারু-তেলের গন্ধকে আরও ভারি করে তুললো নিশ্বাসের পক্ষে।

মাধবী বলল, 'চাঁপারঙের পালোয়ান বোধ হয় অসুস্থ।' 'কিংবা পৌনঃপুনিক মহাশয়ের মতো বলতে পারি আজকে ওরই হারার দিন, আর তা জানে বলেই অত বিমর্ষ।'

ওদিকে তখন পালোয়ানরা পাঁয়তারা শুরু করেছে। চাঁপা রং আজ শুধু বিমর্ষই নয় যেন ভীতও বটে।

শুধু এড়িয়ে এড়িয়ে যাওয়াই তার একমাত্র চেষ্টা। কিন্তু রঙ্গস্থলীতে কতক্ষণ শুধু এড়িয়ে যাওয়া যায়। এক আকস্মিক আক্রমণে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে মাটিতে ফেলে দিল। কিন্তু হতে পারে সে অসুস্থ, হতে পারে সে বিষণ্ণ, কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে যা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে তারই সাহায্যে সে পড়লো বটে কিন্তু উপুড় হয়ে মাটি কামড়ে ধরল।

উত্তেজনা দেখা দিল দর্শকদের মধ্যে। কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল, 'অন্যায়, অন্যায়।'

রাজেন বলল, 'তোমার পৌনঃপুনিক মশাই দাঁড়িয়ে উঠেছে দেখো।'

'ও তো হারবেই। খোঁজ করে দেখো কাল রাত থেকে ওকে খেতে দেয়া হয়নি।'

হঠাৎ যেন একটা চাপা অসন্তোষ দেখা দিল। প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁপা রংকে মাটির উপরে চেপে ধরেছে। যেন তার দম বন্ধ করে তাকে অসাড় করে দেবে। উৎকণ্ঠায় মুখ শুকিয়ে উঠছে দর্শকদের।

মাধবী ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'এটা বোধ হয় ফাউল হচ্ছে। ওভাবে ঘাড়ের উপরে কুনুই দিয়ে চাপ দেয়া।'

রাজেন বলল, 'কি জানি।'

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হর্ষোৎফুল্ল পালোয়ান বোধ হয় বেশি কঠোর হতে চেষ্টা করেছিল। মাটির উপরে দু প্রস্থ ঘর্মাক্ত উজ্জ্বল পেশীর স্রোত পরস্পরকে গিলে ফেলাব চেষ্টা কবছে। চাঁপা রং যে ইতিমধ্যে হেরে গিয়েছে তাতে আর সন্দেহ থাকছে না। ঠিক তখনই হঠাৎ দেখা গেল কি করে এক ঝটকায় মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে চাঁপা রং উঠে দাঁড়িয়েছে, রিং-এব প্রান্তে সরেও গিয়েছে।

মাধবী বলল, 'ক পয়েন্ট গুণেছো?'

রাজেন বলল, 'গুণতে হবে না, যদি সাজানো ব্যাপার হয।'

কিন্তু অন্য কারণেই গোণা দরকার ছিল না। রিঙের ঠিক উপরেই ছাতের থেকে কালো একটা ডোম নেমে এলো। ডোমেব গায়ে মল্লদের কে ক পয়েন্ট পেলো তা ফুটে উঠল আলোর অক্ষরে।

আবার পাঁয়তারা শুরু করল মল্লরা। এবার চাঁপা রং বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার নিষ্ক্রিয়তা কিংবা বিষণ্ণতা প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমা করবে না। বাধ্য হয়েই সে নড়াচড়া শুরু করল। মাধবীর পায়ের কাছে একজন স্থূলকায় ভদ্রমহিলা বসেছিল। সে হঠাৎ বলল তীক্ষ্ণ স্বরে—এর জন্য পয়সা নেয়া উচিত নয়। এ ছেলেখেলা। সার্কাসের বাঘও এর চাইতে চক্‌চকে থাকে।

হঠাৎ দেখা গেল মল্লরা পবস্পরের বাহু চেপে ধরে পা দিয়ে একে অপরকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।

মাধবী বলল, 'দেখো, দেখো।"

রাজেন বলল, 'আমি অন্য একটা বিষয় লক্ষ করছি।'

'কি?'

'বুঝতে পারেননি? মল্লরা ছাড়াও অন্য কিছু দর্শনীয় আছে।'

'কোনদিকে, কোথায়?' মাধবী কৌতূহল জানালো।

'রাজেন বলল, 'ঠিক তাই, যা আন্দাজ করেছিলাম তাই বটে।'

'বাহ্ বলো না।'

'লক্ষ করুন, আমাদের ঠিক বিপরীত দিকে গ্যালারির উপবে তিন চারটি দর্শক মাথা নিচু করে পরামর্শ করছে, ওরা কুস্তি দেখছে বলে মনে হয় না। এই এক্ষুনি আঙুল দিয়ে বোধ হয় আমাদেরই দেখাচ্ছিল।

মাধবী কৌতুক বোধ করে বলল, 'কেন?'

ঠিক তখনই রাজেন যাদের কথা বলেছিল তারা মুখ তুললো। দেখা গেল সংখ্যায় তারা মাত্র তিনজনই নয়। কিংবা তাদের তিনজনের দেখাদেখি ধারে কাছের আরও কেউ কেউ মাধবী আর রাজেনকে লক্ষ করছে।

মাধবী বলল, 'কেন, ওদের কি উদ্দেশ্য?'

রাজেন বলল, 'উদ্দেশ্য মনোগত বিষয়। ঠিকঠাক বলে দেয়া কঠিন। অনুমান করি বিখ্যাতা অভিনেত্রী মাধবী ঘোষালকে ওরা চিনে ফেলেছে।'

মাধবী বলল, 'না, না, তা কেন, তা হলে—'

রাজেন বলল, 'অনেক আগেই এমনটা হতো। সানগ্লাসটাই চোখ দুটোকে আড়াল করে রেখেছিল।'

মাধবী ফিসফিস করে বলল, 'না, এ ভালো নয়।'

'কি ভালো নয়? আমাকে ওরা হিংসা করছে তাই?'

'আমি চাই না ওরা চিনুক।'

'তা হলে পালাতে হয়। কিন্তু এখন নামতে গেলে ভিড় পিছু না নেয়।'

মাধবী বলল, 'তাই বলে দরকার থাকলেও আমরা বেরুতে পারবো না এটাই বা কোন কথা। আমাদের তো ট্যাক্সি খোঁজাই বড় কথা।'

রাজেন মনস্তাত্ত্বিকের মতো বলল, 'অর্থাৎ আমরা ট্যাক্সি পাওয়ার আশাতেই এই কুস্তির দঙ্গলে এসেছিলাম। অর্থাৎ অভিনেত্রী মাধবী ঘোষাল এবং তার ভদ্র চেহারার সঙ্গীকে ম্যাটিনি কুস্তির আখড়ায় দেখা গিয়েছে—এটা প্রচারিত হয় তা আপনি চান না।'

মাধবী বলল, 'আঃ যে কোন ছাত্রের মতোই দুষ্ট তুমি। এখন ব্যূহ ভেদের চেষ্টা দেখো।'

ফুটপাতে পৌঁছে এদিক ওদিকে চাইলো রাজেন। আজকে ভুগতেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালাদের নাম গন্ধ নেই।

'তা হলে?' রাজেন প্রশ্ন করল।

'আবার হাঁটা যায়। কোন একটা দিক ঠিক করুন।'

'তা করা যায় না এমন নয়, কিন্তু এই রোদটা আপনার রঙের পক্ষে ভালো নয়। তা ছাড়া সন্ধ্যার অভিনয়ে ক্লান্ত দেখাবে।'

'প্রথম কথা আজ আমার ছুটি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় কথা রংটা মাঝে মাঝে ঝলসে নেয়া ভালো।'

মাধবী সিগারেট ধরালো। রাজেনের চোখে পড়লো তার ঠোঁটে রং আছে কি না আছে, হাতের নখগুলো সুগঠিত, সুকর্তিত উজ্জ্বল প্রবালের মতো লাল।

রাজেন বলল, 'এখানে একটা ছায়াওয়ালা রাস্তা আছে। লেক এভেন্যুর পিছন দিকে। পুরনো বইয়ের পাড়া।'

মাধবী রাজেনের মুখের দিকে চাইলো, তার নিজের মুখটাই বরং লাল হল, মুখ নিচু করে হাতঘড়িটাকে দেখতে লাগল।

মাধবী বলল, 'আমরা আজ আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের মতো চলেছি।'

রাজেন বলল, 'কেন, গন্তব্য বদলে যাচ্ছে?'

মাধবী তার মাথাটা একটু ঝাঁকালো।

'তবে, দুপুর রোদে বই-এর পাড়ায় চলেছি?'

'সবটা মিলে।'

দু'শ গজ গিয়েই রাজেন একটা মাঝারি চওড়া গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ছে এটার মাথায় বই-এর গলি পড়বে।'

মাধবী খুশি মনে বলল, 'কিন্তু।'

'কি কিন্তু?'

'কুস্তির কি সবটাই ফাঁকি, মানে অভিনয়?'

'তাতে দোষের কি আছে যদি অভিনয় হয়ে থাকে? দর্শকরা কি সিনেমার ভালোবাসা দেখে তৃপ্তি পায় না? এখানে যে উত্তেজনা যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছিল তা দর্শকদের চোখে মুখেই প্রমাণিত হয়েছে।'

'এ ভাবে দেখলে পরিচালকদের দোষ থাকে না। আর চাঁপা লেঙট আমাদের স্বজাতিও বটে।'

'শিক্ষার্থী হিসেবে কেউ যদি গিয়ে থাকে তবে সে ঠকেনি। প্যাঁচগুলোর শিখবার সুযোগ ছিল। কিন্তু পৌনঃপুনিক মশাই কেন গিয়েছিলেন অথবা নিয়তই গিয়ে থাকেন তা আমার জানা নেই।'

পৌনঃপুনিক নামটা মনে আসতেই রাজেন হো হো করে হেসে উঠল। মাধবী হাসল। হাতের সিগারেটটা

ফেলে দিল। এগিয়ে গিয়ে রাজেনের বাহুব ফাঁকে নিজের হাতটা গলিয়ে দিল।

ঠিক এই সময়ে রাজেনের মনে হল :

মাধবী যে অসাধারণ রূপসী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে কবা যাক একটা খুব বড় আর উজ্জ্বল লাল গোলাপের গুচ্ছ অথবা ঝাড় তার হাতে এসেছে, এবং সেটা তাকে প্রকাশ্যে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু এ-রকম একটা ঘটনা কি করে সম্ভব হতে পারে? নিউমার্টের ফুলের দোকানগুলোতে এ-রকম এক ঝাড়া গোলাপ কল্পনা করা যায়, যা থেকে একটি ডালে কয়েকটি পাতা সমেত একটি কবে ফুল বিক্রি হয়। সেই দোকানে যদি কোনদিন কোন কারণে, অথবা নিতান্ত যোগাযোগেব ফলে, একটি গোলাপও বিক্রি না হয় তবে দিনের শেষে এ-রকম একটা ঝাড় সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই ফুলেব ঝাড় বয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় তাকে থামতেই হবে। তা তার বোর্ডিং হাউসেব ছোট্ট কামরাটাও হতে পাবে। তখন কি করবে সে সেই অজস্র ফুল নিয়ে।

গলিটার মাথায় প্রায় এসে পড়েছে তারা। রাজেন নিজেব আলগা হাত তাব নিজেব অন্য বাহুতে আটকানো মাধবীর আঙুল গুলোর উপরে বুলিয়ে দিল। বই-এর পাড়ায় বছর দশেক আগেও কর্তাদের দৃষ্টি ছিল। ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রাস্তাটাকে চওড়া করার পব কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। দেবদারু আর জাপানিয়া। রাজেনেব সঙ্গে বই-এর পাড়ার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে গত তিনচাব বছবে। কাজেই রাজেনের কাছে বই পাড়ার এই রাস্তাটা চিরদিন গাছে-ঢাকা, আধাবন্য। জলবায়ুর প্রভাবেব ফলেই কিংবা তাব স্বভাবেই হয়তো গাছগুলো কিছুটা বৃদ্ধি-রহিত। আর যত পাতা হয় তাব চাইতে বেশি পাতা ঝবে পড়ে। রাজেন অনেকবারই মনে মনে বলে নানা মূর্খের ভিড়ে একবাব একদল বুদ্ধিমান লোক কি কবে এসে পড়েছিল যারা কলকাতাব পথে পথে গাছ লাগানোর কথা ভেবেছিল। নিজেকে তাদেব অধস্তন পুরুষ বলতে আনন্দ হয়।

জুতোর তলায় শুকনোপাতার শব্দ ভালো লাগল রাজেনেব। রাস্তাব ভিড়টা হালকা। সেটা হয়তো ট্রাম ধর্মঘটেব ফলেই।

'কেমন ছায়া না?' রাজেন জিজ্ঞাসা করল। মাধবী মুখ তুললো। একটা নিছক যোগাযোগেব ফলে তার বাঁদিকেব গাল, কাঁধ, আব ব্লাউজেব গায়ে জালিজালি ছায়া পড়লো কোন গাছেব।

সে ভাবলো সেপ্টেম্বরে পাতা ঝবাব কি যুক্তি আছে? আব তার ও চিন্তাটাও ঠিক নয় যে যত পাতা হয় তার চাইতে বেশি পাতা ঝরে পড়ে। চিন্তাটায় আঙ্কিক সৌষ্ঠব নেই। কিন্তু মাধবী আশ্চর্য রকমে সুন্দরী। দু এক পা যেতেই একটি দুটি করে বই এব দোকান শুরু হল। একটাও নিয়ন জ্বলেনি। পথেব ধারেব শো কেসগুলোতে সাজানো বইগুলোব জ্যাকেটের কালো, ধূসর কচিৎ সিঁদুব রঙেব অক্ষর-ন্যাসগুলো সেজন্যই যেন স্পষ্ট চোখে পড়ছে। আলো জ্বললে এক বর্ণাঢ্যতা দেখা দেয় যাব মধ্যে এইগুলো আব স্বতন্ত্র থাকে না। রাজেন ভাবলো একটু শুকনো বেবঙা ভাব। কিন্তু তাই ভালো নয়?

রাজেন ভাবলো · বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছলে মেয়েরা হয়তো সাদামাটা পুরনো কিছু-রংজ্বলা পোশাকেও সামনে আসতে পাবে, আর তখন বোধ হয় সেটাই ঘরোয়া ভাবেব উপকবণ হয়, ভালোও লাগে। বই-এর পাড়ায় শুধু সন্ধ্যাতে যারা আসে তাদের কারো কারো কাছে হযতো এই আলোছাড়া শো কেসগুলো আকর্ষণীয় বোধ হবে না। রাজেনের সঙ্গে বইপাড়ার সম্বন্ধ এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে দিনের যে কোন ঘণ্টায়, এমন কি শো কেসের ধুলো ঝেড়ে নিরাভরণ শো-কেস সাজিয়ে তোলার সময়েও কেমন দেখা যায় তা রাজেনের জানা আছে। এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন বলতে পারা যায়। এখন রাজেনের সঙ্গে দোকানের সেলস্‌ম্যান এবং কর্তাদের শুধু বই নিয়ে আলোচনা হয় না। বই লেনদেনের আলোচনাব বাইরে ব্যক্তিগত বিষয়েও আলাপ হয়ে থাকে, কারো স্ত্রীর অসুখ বা ছেলেমেয়ের বিয়ের কথা উঠে পড়লেও অবাক হওয়াব কিছু নেই।

মাধবীকে বোধ হয় সুন্দরই দেখাবে সাদামাটা সেমিজেব উপবে তেমনি ঘরোয়া শাড়ি পবলেও। কিংবা শাড়ি পরার আগে শুধু সেমিজেও। না-না, তা সে পছন্দ করে না, নাটকের রিহার্সালের মতোই সেটা তার কাছে অপছন্দের ব্যাপার। যদিও এমন হতে পারে যে সে নিজে হয়তো এখনও প্রাপ্তবয়স্কের রুচি থেকে দূরে আছে। একটু হয়তো সে সেকেলে যেজন্য প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে ধীরে ধীরে স্তরের পরে স্তর পার হয়ে।

পথের ধারের গাছগুলোর ঝরাপাতার সীমা ছাড়িয়ে সে বরং দোকানগুলোর দেয়াল-দরজা ঘেঁষে চলতে শুরু করল। একটা দোকানের সামনে শো কেসে পুরনো একজন লেখকের নাম দেখে থেমে দাঁড়ালো। কি মুস্কিল, শো-কেস্ তো লোভ জাগানো জন্যই সাজানো। দিন সাতেক পরে একদিন এসে দেখলেই হবে।

একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগল রাজেন। তখন তার ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হবে যে সে শিস্ দিচ্ছে। সে ভাবলো, কিন্তু এই হোয়াইটহেডখানা নিয়ে সে কি করতে পারে। এর আগে সান্তানায়া নিয়েও বুককেসের পিছনে লুকিয়ে রেখেছে, অন্তত কারো চোখে পড়লে এরকমই মন্তব্য করবে সে। অত্যন্ত দামী খাবার হোয়াইটহেড এবং সান্তানায়া, যেন ফবাসি পদ্ধতির কিছু। ভূদেব সমাদ্দারের পার্টিতে যেমন একবার খেতে হয়েছিল।

আর তা ছাড়া? কি তা ছাড়া? তুমি তোমার এক কামরার বাথরুম-ছাড়া কমন ল্যাভেটরি সমেত ফ্ল্যাটেও কাউকে নিয়ে যাও যদি তোমার কর্তব্য হবে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যর দিকে নজর রাখা। কারণ হোস্টের গুণাবলী না থাকলেও তার ভঙ্গিটা রাখা উচিত নতুবা অপরপক্ষের অসুবিধা হতে থাকে।

দেখো মাধবীর পক্ষে বই-এর পড়াটা নতুন। আর এটা তার নিজের ফ্ল্যাট না হলেও এখানেও সে বেশ অভ্যস্ত।

রাজেন পাশে মাধবীর দিকে চাইলো।

সে কোণ করে রাখা নিজের বাহু ঝুলিয়ে দিল। মাধবীর হাতটা আশ্রয় হারিয়ে নড়েচড়ে বাহুটাকে আবার ধরল।

রাজেন বলল, 'আপনাকে আমাকে, দুজনকেই দুহাতে ধরে বই তুলে দেখতে হবে।'

মাধবীর মুখ একটু লাল হল। সে নিজের দু হাতে হাতব্যাগের স্ট্র্যাপ ধরল। এ দোকানটা বেশ বড়ই। ফুটপাত থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে কাউন্টারে পৌঁছাতে হয়। হেড সেলস্‌ম্যান কাউন্টার থেকে দেখতে পেয়েছিল রাজেনকে। ডেকে বলল, 'আপনার হাত দেখা ঠিক হয়েছে, মশায়, বুয়েছেন? স্টিপল চেজে কুইন অব ফারারাই।'

রাজেন হেসে বলল, 'কেমন, দেখলেন তো?'

'আসুন, আসুন।'

'এখন নয়, স্যার, এখন নয়।' রাজেন হাসিমুখে এই বলে তাড়াতাড়ি দোকান পার হল। হাসিমুখেই সে ভাবলো, নিশ্চয়ই হাত দেখার ভঙ্গী বিশ্বাস করে ফারারার উপবে ধরেনি, ধবলেও যৎসামান্য। এর পরে ওরকম রসিকতার ফল মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। বেশ কিছু ধরে একেবারে ভরাডুবি। ঘোড়দৌড় আর কাকে বলেছে।

কিন্তু দামী খাবার দিয়ে সে কি করতে পারে। যেমন ধরো মাধবী ঘোষাল। সে যে প্রকৃতপক্ষে খুবই সুন্দরী তাতে সন্দেহ কি? হেড সেলসম্যান মুহূর্তের মধ্যে তা অনুভব করেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মতো একজন ছাত্র (ছাত্র বলাই ঠিক) কি করতে পারে মাধবীর মতো একজনকে দিয়ে। এখানে পরপর কয়েকটি দোকানই বল। রাজেনের নিজের রসিকতা অনুসারে প্রথমটি বেস্ট ইন দ্যা ওয়ার্লড, দ্বিতীয়টি ইন্ দ্যা সিটি, তৃতীয়টি বেস্ট অন্ দিস্ স্ট্রিট। এই রসিকতাই তার সঙ্গে শৌরীন বাবুর সখ্যের মূলে।

তার মনে পড়লো দিন পনরো আগে দোকানে এসে সে শৌরীনবাবুর অসুখের খবর শুনেছিল। আজকাল যা স্ট্রোক হচ্ছে। যে দেশে রেডিওর শব্দ শোনা যায়নি, যেখানে জীবন ঘণ্টায় পনেরো কে. এম. এর-বেশি দ্রুত নয় হয়তো সেই ইনিংস ফ্রিতে স্ট্রোক হয় না। কলকাতার পথে পথে গাছলাগানেওয়ালা পৌরপিতাদের মতো যদিও রেডিও ধ্বংসী কালাপাহাড় জন্মাত!

রাজেন দোকানে ঢুকে পড়লো। কাউন্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কর্তার খবর কি?'

কর্তা শৌরীনবাবু কাছাকাছি ছিলেন। একটা র‍্যাকের পাশ থেকে মাথা তুলে নিজেই বললেন, 'আরে বামুন যে। এসো এসো।'

রাজেন বলল, 'না, মানে, কেমন আছেন জেনে যেতে চাইছিলাম।'

'এসো না হে। এলে কি তা জানতে পারবে না। উটি কে? ছাত্রী? তা এসো।'

এ ডাক এড়ানো যাবে না।

দোকানের পিছন দিকে শৌরীনবাবুর চেম্বার।

সেখানে ঢুকে শৌরীনবাবু রাজেনকে বসতে বলে হাঁক দিলেন 'ওরে কেউ আছিস? তুমি ওদিকটায় বসো মালক্ষ্মী।'

যেমন শৌরীনবাবুর গেরুয়া কেঠোর ধুতি, যেমন তার চেম্বারের নিরাভরণ চেহারা, তেমন এই ডাক তার বৈশিষ্ট্য। যেন তাঁর সন্দেহ আছে তার ডাকে কেউ সাড়া দিতে পারে কি না।

একজন লিভারিপরা বেয়ারা দৌড়ে এলো। শৌরীনবাবু বললেন, 'ওরে, বামুনের জন্যে একটু চায়ের জল চাপা।'

রাজেন বলল, 'না, না, এই মাত্র, ওর আমি বিশেষ ভক্ত নই।'

শৌরীন বললেন, 'আরে বামুন, কায়েতের হাতে চা ভালো লাগবে কেন, এ-দোকান সে-দোকানের ছাঁকনি নিঙড়ানো না গিল্‌লে কি চলে।'

এই কথোপকথন এতো পুরনো যে এটাকে এখন আর বাড়তে দেয়া হয় না। রাজেন বুঝলো এখানে কিছুক্ষণ সে বসে এটাই শৌরীনবাবু চাইছেন। বেয়ারা চেম্বারের এক পাশে রাখা হিটারে কেৎলি চাপিয়ে দিল। সে যখন চলে যাচ্ছে শৌরীনবাবু তাকে বলে দিলেন সে যেন পত্রিকার টেবল থেকে উপর দিকের কয়েকখানা পত্রিকা দিয়ে যায়।

শৌরীনবাবু বললেন, 'পত্রিকা আসুক, ততক্ষণে এইগুলো দেখো দেখি, বাপু, কদিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম। এই লাল পেনসিলটা দিয়ে পাশে পাশে দেগে দিও। আজকের দৈনিক পত্রিকাগুলো দেখেছো। তোমার তো দৈনিক পত্রিকা পড়লে সারা গায়ে র‍্যাশ বেরোয়। হ্যাঁ মা লক্ষ্মী, তোমার মাস্টার মশায়ের ওটাই অ্যালার্জী।'

শৌরীনবাবু লাল পেনসিল আর বিলেতি এক দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্য-সংখ্যা এগিয়ে দিলেন। এটাও নতুন নয়। মাঝে মাঝে রাজেন নতুন-প্রকাশিত বিলিতি সাহিত্য পুস্তকের নামের পাশে লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে দেয়। শৌরীনবাবু বই এর অর্ডার দেয়ার সময়ে এই দাগগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাজেন কাগজের আড়ালে ডুবে গেল। শৌরীনবাবু নিঃশব্দে তাঁর খাতাপত্র দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এটা শৌরীনবাবুর হিসাব পরীক্ষার ফলাফলের সূচক। রাজেনের পত্রিকার পাতা উল্টানোর শব্দ হচ্ছে কিছুক্ষণ বাদে বাদে। একবার খাতা থেকে মুখ তুলে শৌরীনবাবু বললেন 'শুয়োর ব্যাটা পনরো দিনেই সব ডুবিয়েছে দেখছি। ওরে মা লক্ষ্মীকে খানকয়েক বই দে না, কবিতারই দে।' বেয়ারা ইতিমধ্যে চা করে দিয়ে গেল। একজন কর্মচারী খানকয়েক সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই রেখে গেল মাধবীর সম্মুখে। শৌরীনবাবু প্রকাশকও বটেন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রাজেন পত্রিকাটার এখানে ওখানে লাল পেনসিলের দাগ দিয়ে চলল। কিছুক্ষণ বিস্মিতের মতো বসে থেকে মাধবী কবিতার বইগুলো উল্টে দেখতে শুরু করল, কারণ অন্য আরও দু-একবারের মতো এবারও সে অনুভব করল নতুন নাটকে মহলা দেয়ার সময়ে যেমন, নাটকের বাইরের জীবনেও তেমন সে অন্য কারো ডাইরেকশান ছাড়াই নিজেকে সিচুয়েশনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, আর তাতে সিচুয়েশনকে সে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারে। রাজেনের পড়া দেখে তাদের কথা মনে হবে। কাজেই বিলিতি পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যা দৈর্ঘে আড়ে যত ঢাউসই হোক, এখান ওখানে দাগ দিয়ে দিয়ে শেষ কলামে চলে আসতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগল না তার। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পত্রিকাটা দুভাঁজ করে তার উপরে লাল পেনসিলটা রেখে সোজা হয়ে বসল রাজেন।

শৌরীনবাবু বললেন, 'উঠছ নাকি? আর একটু চা করাই বসো। কিছু খাবার আনুক।'

'না' না।'

রাজেনের কথার মাঝখানে কথা বসিয়ে দিয়ে শৌরীনবাবু বললেন, 'আরে তোমার জন্যে না হোক মা লক্ষ্মীর জন্যে আসুক। আমার নতুন খদ্দের। তা ছাড়া রোদ পড়তে এখনও অনেক দেরি। আজকের

কাগজ দেখেছো?'

রাজেন বলল, 'কিছু আছে নাকি?'

শৌরীনবাবু বললেন, 'সংবাদপত্রে কিছু থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে পড়ুয়ার উপরে।'

রাজেনের কানের কাছে রংটা গাঢ় হল।

পত্রিকাগুলোর সঙ্গে খানদুয়েক দৈনিক কাগজও এসেছিল। তারই একখানা টেনে নিল রাজেন।

শৌরীনবাবু বললেন, 'তুমি, বামুন, বলবে বই পড়ে শেষ করা যায় না কাগজ পড়বে কখন। আমি অবশ্য অসুখের পনেরো দিন কাগজ ছুঁইনি। হাজার হলেও বামুনের কথা, একেবারে ফেলতে নেই। কিন্তু দুনিয়াটা তো নিত্যি রোজ বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে চলতে গেলে খোঁজ খাঁজ রাখতে হয়। তা তুমি কাগজ ছাড়া কোথায় পাচ্ছ বলো?'

ইদানীং কাগজগুলো বেশ লম্বা মাপের হয়েছে। বরং যত বড় চেহারা তত তার মর্যাদা। কারণটা আমাদের ঠিক জানা নেই। এমন হতে পারে বড় চেহারার কাগজ হলে শীর্ষ পংক্তিগুলোকে বড় বড় অক্ষরে ছাপানো যায়। দু ইঞ্চি অক্ষরের শীর্ষপংক্তির চিৎকারে একাধিক সংবাদ দেয়া যায়।

দৈনিকটার প্রথম পাতা এ-রকম সাজানো ছিল :—

(প্রথম তিন কলামের মাথায়। চার মিলিমিটার অক্ষরে)

● স্বীকার কর্তৃক মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

● প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বিবৃতি দেবেন

(এগার মিলিমিটার অক্ষরে)

মন্ত্রী মহোদয়ের মধুচক্রের দরজায়
অন্যদেশীয় রাষ্ট্রদূতের
গাড়ি আবিষ্কার

পরের তিন কলামের মাথায় একটা হোটেলের ছবি।

(নিচে চার মিলিমিটার অক্ষরে)

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সৈন্য আহ্বান
পাঞ্জাব হরিযানায় বিদ্যুৎব্যবস্থা
বানচাল।

(সপ্তম ও অষ্টম কলামের মাথায় চার মিলিমিটার অক্ষরে)

প্রথম মহাশূন্যে

(তিন মিলিমিটার অক্ষরে)

মনুষ্যবাহিত যান প্রেরণের সম্ভাবনা
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

দু তিন মিনিটে পঞ্চম পাতা উল্টে গেল রাজেন। আর মিনিট দু তিনে মাঝখানের আট দশ পাতা শেষ করে পিছনের পৃষ্ঠায় চলে এলো।

শৌরীনবাবু বললেন, 'পেলে কিছু খবর?'

'হ্যাঁ, তা—'

'মন্ত্রীমহোদয়ের মধুচক্রের দরজায় নাই থামলে! প্রথম মহাশূন্যটা লক্ষ্য করেছো?' কথা বলতে গিয়ে হাসির ধমকে সেটা রাজেনের গলায় কিম্ভূত শব্দ করে আটকে গেল। শৌরীনবাবু বললেন, 'ওটা তো একটা কিছু বটে। একেবারে প্রথম মহাশূন্য।'

রাজেন বলল, 'এবং মনুষ্যবাহিতও বটে।'

'তুমি উত্তেজনা বোধ করছো না?'

'উত্তেজিত হওয়ার কথাই বটে, কিন্তু আমরা বোধ হয় ইতিমধ্যে খানিকটা ধরে নিয়েছি ওটা হবে। সকালের রেডিওতে যখন বলছিল, ফুটপাতের পানের দোকানগুলোর সামনে কিছু ভিড় ছিল। কিন্তু এটা

সেই ভিড় নয় যা নেচে উঠবে।'

'ভিড় মানে ক্রাউড্ আবার নাচে না কি।'

'নাচে। গাগারিনের বেলায় ফুটপাত জুড়ে টুইস্ট নাচ হয়েছিল। ছেলেরা এবং মেয়েরা নেচেছিল।' শৌরীন বললেন, 'কোথাও যাওয়া বলেইতো যান। কিন্তু মহাশূন্যে যাচ্ছ কোথায়? এ বিষয়ে কিছু ভেবেছো?

রাজেন কথা বলার আগেই বিস্মিত হয়ে চুপ করে গেল।

শেষ পাতাটার মাথায় এগারো মিলিমিটার মাপের বাঁকা বাঁকা অক্ষরে বঙ্গজগৎ লেখা। তার নিচে আর্টথিয়েটারগুলোর খবর। রেনেশাঁয় সোনালি চামড়া। একটা ইন্টারভিউ। দেড়কলামের খবর। দুটি কলামে দুটো দাঁড়ানো মহিলার ছবি। কিংবা কথাটা বিস্ময় থেকে বদলে কুণ্ঠা হল। পাশে যে লোকটি বসে আছে তারই সংবাদ যদি ছবি সমেত দৈনিক কাগজে ছাপা হয়ে থাকে তবে তা কুণ্ঠার কারণ হতে পারে কারণ সাংবাদিকের মতামত সর্ববাদীসম্মত না হতে পারে, যার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তার বিড়ম্বনার হেতু হতে পারে, বর্তমান সঙ্গে যা উত্থাপন করা সমীচীন নয় তেমন কথা থাকতে পারে সাংবাদিকের আলোচনায়।

রাজেন অনুমান করার চেষ্টা করল সানগ্লাসে চোখ ঢাকার ফলে মাধবীর মুখ কাগজে ছাপানো তার ফটো থেকে কতটা পৃথক হয়েছে। অবশ্য মাধবীর স্কার্ট ব্লাউজের পোশাক তার আত্মগোপনের কিছু সহায়তা করছে এখন।

কিছুটা বিব্রত হয়ে কাগজটা উল্টে রাখলো রাজেন। কিন্তু তার আগেই অন্তত আলোচনার হেডিং এর সাব হেডিং মাধবী এবং শৌরীনবাবুর চোখে পড়ে থাকবে। কারণ বঙ্গজগতের সাবএডিটর অন্যান্য সব এডিটরকে মাটি ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। আলোচনাটার হেডিং এ রকম ছিল —

(দুই মিলিমিটার অক্ষরে) রেনেশাঁয়

(চার মিলিমিটার) সোনালিচামড়া—সুরথ সোমের প্রযোজনা

(দুই মিলিমিটার অক্ষরে) নায়িকা বদল না পালাবদল।

শৌরীনবাবু বলল 'সুরথ সোমটি কে বটে, বামুন? খুব বেশি নাম দেখি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি আর্ট থিয়েটারে মাঝে মাঝে কি সব করে। তা করুক। কিন্তু সোনালী চামড়াটা কি?'

রাজেন মৃদু হেসে বলল, 'গিয়ে দেখুন।'

শৌরীন বলল, 'তুমি যেতে বলছো? রিকমেন্ড করো?'

'এই দেখুন, আমি কি সাংবাদিক না সুরথ সোমের এজেন্ট।'

শৌরীনবাবু হাসলেন।

রাজেন বলল, 'রোদ অনেকটা পড়েছে দেখছি।'

'বাইরে তাকাচ্ছ যে? ব্যস্ত আছ?

'না, হ্যাঁ, তাও বটে, ভালো কথা ট্রাম খুলেছে নাকি?'

'কোথায় যাবে?'

'মির্জা গালিব এভেন্যুতে।'

'তা গাড়ি নিয়ে যাও না।'

'গাড়ি? ও, আপনার গাড়িটা?'

'তাই ভালো। নইলে শুয়োরবেটা সটকাবে ওটা নিয়ে।'

'সে কি। কে সটকাবে আপনার গাড়ি নিয়ে?'

'ওই তো বললুম, তোমরা যাকে শুভেন্দু বলো।'

'সাবাস, শুভেন্দুবাবু তো আপনার ছেলে।'

'তা হলে শুয়োরবেটা হয় না? বেশ যুক্তি। আরে আমি খাই বই বেচে আর সে কি না রাতের আলো জ্বেলে টেনিস খেলে।'

রাজেন হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। শুভেন্দুবাবু এ গাড়ি নিতে নিজের গাড়িতেই আসবেন। কাজেই যে কোন একটা পাওয়া যাবে যদি ইতিমধ্যে ট্রাম না খোলে। কিন্তু আমাকে

একটু সাহায্য করুন।'

'সে তো আমি অনেকদিন থেকেই বলছি, বাপু। বই বাছাই করা বাবদ—এখনও ছাত্র, মাঝে মাঝে বেহিসেবী খরচ খরচা হবে তা হিসেবের বাইরে আমদানিও চাই বটে।'

'আরে, না, না। তা নয়।'

'তবে?'

'নাটক সম্বন্ধে, নাটকের কলা সম্বন্ধে কান্তিবিদ্যাগত আলোচনার কোন বই আছে?'

শৌরীন ভাবলেন। গভীরভাবে ভাবতে গেলে তাঁর মৃদু মৃদু দোলার মুদ্রাদোষ আছে দেখা গেল। একটু পরে বললেন, 'বসো, হয়েছে। তুমি যা চাইছো ঠিক তা নয় হয়তো। গ্রীক নাটক সম্বন্ধে একখানা আসল বই আছে বোধ হয়। বসো।'

শৌরীন নিজেই উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে মোটা চেহারার একখানা বই নিয়ে এলেন। নীল কাপড়ে বাঁধানো সোনালি জলে নাম লেখা। বোঝা যায় বেশ দাম ছিল এক সময়ে। বেশ কিছুদিন থেকে অবিক্রীর বইএর সঙ্গে পড়ে আছে।'

রাজেন হাতে নিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখে বলল, 'মেলা দাম দেখছি।'

'আসল যে।'

'না এত দামী জিনিস দিতে চাচ্ছি না।'

শৌরীন বললেন, 'নেবে তো নাও না। দাম আর তোমাকে দিতে হবে না। ও আমাব এমনিতেই লোকসান। দেখছো না নীল কাপড়ের বাঁধাই এখানে ওখানে সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খুলে দেখে নতুন বইএর গন্ধ পাবে। কি বিনি পয়সায় নেবে না? দাও এক টাকা। কাউন্টারে নে যাও। ক্যাশমেমো কেটে দেবে।'

রাজেন আবার হেসে ফেলল। 'এমন দামী বই আনলেনই বা কেন, পড়েই বা রইলো কেন?'

'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দু-একটি বুঝলে কিনা, এক সময়ে বিষয়টার দিকে ঝুঁকেছিল। লেখা লিখি করে বইটার খবর পেয়ে কর্তা ব্যক্তিদের নজবে আনলুম। তা তাদের দোষ নেই হাওয়া বদলায় নাকি, পালাবদল হয। তারই ফলে নাকি ফলশ্রুতিতে কাটলো না। তা এখন সিনেমাস্কোপের গ্রীক রোম্যান রীলগুলো তো হাইয়াব সেকেন্ডারী স্কুলেই দেখিয়ে দিচ্ছে। তা, বাপু, ছ মাস ধরে এ-রকম একখানা বই পড়ে, তস্য নোট পড়ে, নোটের নোট নিয়ে যা মনে থাকে এক সপ্তাহেই স্কুলের হলের ছ-ঘণ্টার সিনেমা দেখে তাই হয়। বুঝলে কি না। হয় কি না হয় মা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করো। ওরে, বইখানার একখানা ক্যাশমেমো আনিয়ে দে কাউন্টার থেকে।'

বেয়ারা এসে বইখানা আর রাজেনের হাত থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি এনে দিল।

রাজেন বলল, 'এবার তাহলে উঠি।'

'উঠবে? যদি অসুবিধা না হয় আগামী সপ্তাহে একদিন এসো। কিছু দিশি বই কিনতে হবে।'

রাজেন এবং মাধবী উঠে দাঁড়ালো। তাদের সঙ্গে শৌরীন কাউন্টারের দরজা পর্যন্ত এলেন। বললেন, 'বসো গাড়িটা ঘুরিয়ে আনুক।' দরজার কাছে বসে থাকা ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন।

শৌরীনবাবু বললেন, 'ভালো কথা তোমাদের ক্লাসিকে কি হচ্ছে হে?'

'বোধ হয় ইউরিপিডিস।'

'মনে হয়তো--আমি ঠিক বুঝতে পারি না এগুলো কেন হয়। একদিন আমাকে বুঝিয়ে দিয়ো তো। ওদের নীতিকে বাদ দিলে এসব নাটকগুলো কি একেবারে অর্থহীন খোলস নয়? অথচ ওদের সমাজনীতি আব আমাদের সমাজনীতি কখনো এক নয়।'

রাজেন একবার শৌরীনবাবুর মুখের দিকে একবার মাধবীর মুখে দিকে তাকালো, তারপর হাতের বইখানার দিকে। তাকে অপ্রতিভ দেখল।

শৌরীন বললেন, 'এখন নয়, অন্য একদিন তখন—।'

লিভারি পরা ড্রাইভার গাড়ি দাঁড় করাল। রাজেন এবং মাধবী গাড়িতে বসল। শৌরীন তাঁর চেম্বারে ফিরে গেলেন।

গলির মাথায় পৌঁছে ড্রাইভার ঠিকানা জানার জন্য আড়চোখে পিছন দিকে তাকালে রাজেন বলল, সাতাশ মির্জা গালিব।

স্বভাবতই তারা পাশাপাশি বসেছিল। রাজেন লক্ষ্য করল মাধবী ড্রাইভারের পিঠের ঠিক মাঝখানটায় কিছু একটার উপরে দৃষ্টি ঘিরে রেখেছে। তার মুখটা বরং নীলাভ দেখাচ্ছে। কিছু একটার ছায়া পড়লে যেমন হতে পারে। তাও নয় বরং ফ্যাকাশে। খুব ক্লান্তি বোধ হয়। বোধ হয় খুব বিরক্ত হয়েছে আর তা গোপন করার চেষ্টা করছে। বই-এর দোকানে এমনভাবে বসে থাকতে ভালো লাগেনি, না লাগাই স্বাভাবিক মাধবীর পক্ষে।

মাধবী একটু সরে বসল। তার ফলে তার হাঁটু দুটো বরং কোনাকুনিভাবে এগিয়ে এসে রাজেনের হাঁটুকে ছুঁয়ে রইলো। গাড়িটা একটা বাঁক নিল। বাইরে দিনের আলো তখন পড়ে আসছে। এটা দিনের উত্তাপ কমে আসার সময়। কিন্তু দিনমান রোদটা চড়া ছিল। একটা গরমের ঝাঁজ বাঁধানো পথ এবং দুপাশের বাড়ির দেয়ালগুলো থেকে উঠে আসছে মনে হয়। উত্তাপ কমার আগে বিকিরণ।

মাধবী তার হাত দুটো জড়ো করে রাজেনের হাঁটুর উপরে রাখলো। এরপর যদি সে মাথাটা কাৎ করে জড়ো করা হাত দুটোর উপরে রাখে তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।

মাথাটা বরং পিছনে হেলিয়ে মাধবী হাই তুললো। হাই-এর মাঝখানে হাতের পিছন দিক দিয়ে ঠোঁট আড়াল করল।

রাজেন বলল, 'একটু ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করবো কি?'

'না। মার্কোস স্কোয়ারে যাওয়ার শর্টকাট আছে এখান থেকে?'

'যাবেন?'

একটু দ্বিধা করে মাধবী বলল, 'না।'

'ভারি ইন্টারেস্টিং।'

'কি?' মাধবী উঠে বসল।

'মনের এই ব্যাপারগুলো।'

রাজেন আঙুলের মাথায় মাথায় গুণে বলল 'ছমাস আগে ভদ্রলোক সাতাশ মির্জা গালিবই বলেছিলেন। একবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মনের কোথাও সেটা লুকানো ছিল। আসল কথা ঠিকানাটা শুনবার সময়ে খুব ক্লান্ত ছিলাম।'

একটা টানা নিঃশ্বাস ফেললো মাধবী। রাজেন সিগারেট বার করল। মাধবীর দিকে এগিয়ে ধরল প্যাকেটটা।

মাধবী সিগারেট ধরালো।

রাজেন নিজের মনের কারচুপি ধরে ফেলে খুশি হয়ে উঠল, একটু জোরে জোরেই হেসে উঠল।

মাধবী বলল, 'বই-এর দোকানের কর্তা ক্লাসিকের অভিনয়ের কি বলছিলেন?' রাজেন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের চিন্তাটাকে ওজন করে নিল। বলল, 'কথাটার দাম আছে। প্রকৃতপক্ষে ওদের ট্র্যাজিডিগুলোর সঙ্গে ওদের সময়ের ধর্মাধর্মবোধ, নীতিবোধ এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সেগুলোকে বাদ দিয়ে ট্র্যাজিডিগুলোকে অর্থহীন মনে হতে পারে।' ...বাইরের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে রাজেন বলল, 'এই পথ ধরে মার্কোস স্কোয়ারে যাওয়া যায়।'

মাধবীর মনের উপর মার্কোস স্কোয়ারে গীতা থাকে এই অনুভূতিটা খেলে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওটা তো স্রেফ খবরের কাগজে যা ছিল। আর মাধবী জানে সে সুন্দরী, বিশেষ রকমেই সুন্দরী।

আর ঠোঁট দুটোকে কিছুটা গোলালো করে চাউনিকে কিছুটা সংকীর্ণ আর নরম করলে যে কামনার আমন্ত্রণ হয় তা কম সংখ্যক পুরুষই প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটা সে সিনেমার শেষ বইটা করতে গিয়ে আয়নার সামনে আবিষ্কার করেছিল। নিরঞ্জনের উপরে সার্থকভাবে অনেকবার প্রয়োগ করেছে। অবশ্য দুষ্টুমিভরা চোখে জিভের ডগা দাঁতে কাটলেও এমন একটা আকর্ষণ তৈরি হতে পারে যা কারো কারো

পক্ষে কাটিয়ে ওঠা কঠিন। কিংবা ফিস্‌ফিস্ করে বলা দু-একটা কথারও তেমন জোর আছে।

মাধবীর গালে রক্ত ফিরে এলো।

সে বলল ফিস্‌ফিস্ করে, 'না মার্কোস স্কোয়ারে এখনই কিছু কাজ নেই।'

রাজেন ভাবলো, বই এর দোকানে অতটা সময় কাটানো তার ভালো হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সঙ্গিনী তার সহপাঠিনীদের একজন নয়।

মাধবী তার বাঁ হাতটা রাজেনের মণিবন্ধের উপরে রাখলো।

এটাই যেন তার চিন্তাটাকে অনুপ্রবিত করল। কিংবা এটা ঠিক বোবড় হওয়াও নয়। বঙ্গজগতের সংবাদটাই কি? তা হলে তার আড়াল করার চেষ্টা বৃথা হয়েছে, মাধবী তার আগেই আলোচনাটাকে দেখে নিয়েছে।

রাজেনের মুখ বিমর্ষ হল।

কিন্তু সে মাধবীকেই বরং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। অসাধারণ রূপ সে বিষয়ে সে সন্দেহ করবে?

রাজেনের চোখ দুটো স্নিগ্ধ হল। প্রবালের মতো করে রাঙানো নখগুলো সমেত মাধবীর একখানা হাত সে নিজের হাতে তুলে নিল।

কিন্তু রাজেন ভাবলো, সুরথ সোমের থিয়োরিটা একেবারে পাথরে উপরে বসানো। নায়িকার রূপ যদি দর্শককে প্রয়োজনের চাইতে বেশি আকর্ষণ করে নাটকের আবেদন প্রয়োজনের চাইতে কম পৌঁছাবে তাদের মনে।

মাধবী বলল, 'গরম লাগছে না একটু।'

রাজেন ভাবলো—আর এক্ষেত্রে রূপের আকর্ষণ অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই। সে আকর্ষণ যেন অনুভব করা যায় বর্ণনা করা যায়। যেন তা পরোক্ষ অপরাধের মতো কিছু। একটু যেন গরম লেগে ওঠা। কিন্তু সুরথ সোমের থিয়োরি যাই হোক এটা বোঝা যাচ্ছে মাধবীকে দিয়ে নাট্যকার প্রযোজকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। সে তেমন অভিনেত্রী নয় যা তারা চায়। আর এ ব্যাপারটা হয়তো কোন কারণে মাধবী ইতিপূর্বে জানতে পারেনি।

কিন্তু, রাজেন ভাবলো, দুঃখ বোধ হলেও এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই, যেমন মহাশূন্যের মনুষ্যবাহিত যান সম্বন্ধে। যানটা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যবাহিত হবে কি না তা খবরের কাগজওয়ালারা গবেষণা করুন। আরও দুটো রাস্তা পার হয়ে মির্জা গালিব এভেন্যু। কাল যে ঘরে বসে তাশ খেলা হয়েছিল সেটাই কি মাধবীর ঘর? কিংবা সেই নরম বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে হয়তো অভিনয়ে যাওয়ার আগে মাধবী খানিকটা বিশ্রাম করে নেয়। একটা জানালার হয়তো পর্দা তোলা থাকে। আর তা দিয়ে পড়ন্ত দিনের রং কিছু যাচ্ছে ঘরের মধ্যে।

মাধবী বলল, 'একটা সিগারেট জ্বলে শেষ হয়ে গেল, আমরা কিন্তু কথা বলিনি।'

রাজেন বললে, একেবারে খাঁটি কথা।'

'সাতাশ মির্জা গালিবেই আপনার কাজ আছে মনে হচ্ছে।'

'তিনতলার ফ্ল্যাটে'—একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। অবশ্য আজই তা করতে হবে এমন কথা ছিল না। আপনার সঙ্গী হওয়ার সুযোগ এবং দেখা করারও দুটোই ঘটিয়ে দিলেন শৌরীনবাবু।'

'তাহলে আবার কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে তা এখনই ঠিক করে নেয়া যাক।'

'আর দুটো রাস্তার পরে মির্জা গালিব। এই বইটা নিন আপাতত। আরও পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে দেখবো।

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ। ক্লাসিক নাটক, নাট্যকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা থাকতে পারে।'

হাত পেতে বই নিয়ে মাধবী খুশি হয়ে উঠলো।

বলল, 'আপনার কাজ যদি শেষ হয়ে যায় ডিনারের আগে, আর তার পরে যদি আর কোন এনগেজমেন্ট না থাকে, আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন? আজ আর বেরুব না।'

রাজেন হেসে বলল, 'অন্তত এ পাড়া থেকে যাওয়ার আগে জানিয়ে যাব।'

ভূদেব সমাদ্দার সাংবাদিক, কিন্তু কোন পত্রিকার সঙ্গে সে যুক্ত নয়। একটা সংবাদ সিন্ডিকেটের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং তার ছআনা অংশের মালিক।

তার বয়স কিছুদিন আগে চল্লিশ পার হয়েছে। ছোটখাটো একহারা চেহারা, অত্যন্ত সাদা রং, কখনও কখনও রক্তহীন মনে হয়। নিখুঁত দামী পোশাক প'রে থাকে। মাথায় পাতলা ধোঁয়াটে রঙের চুল, উল্টে আঁচড়ানো, মাঝখানে সিঁথি। ডান চোখে মনাকল্ ব্যবহার করে। কথা বলতে বলতে বাঁ হাতের পিঠে ডান হাতের আঙুলের ডগা ঘষার অভ্যাস আছে। টেলিভিসন্ প্রভৃতি নানাবিধ গার্হস্থ্য গ্যাজেট নিজে সারানো হবি। মদের ব্যাপারে রসপণ্ডিত (কনেসর্)। আয়কর দেবার পর বার্ষিক আয় আনুমানিক চল্লিশ হাজার। এলিজিবল্ ব্যাচেলর্। তার সম্বন্ধে হুজহু তে মোটামুটি এরকমই লেখা হ'য়ে থাকে।

কারো পেশা সম্বন্ধে কিছু না বলার রীতি আছে কিন্তু এক্ষেত্রে পেশার দিকটা উল্লেখ না করলে সামদ্দারকে চিনতে অসুবিধা হবে।

একটা পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সিন্ডিকেটের স্থায়ী কনট্র্যাক্ট আছে সপ্তাহে পাঁচ দিন ফীচার যোগানোর। স্কুপ সংবাদ বিক্রির ব্যাপারে নীলামের পদ্ধতিটাকেই সে ভালো মনে করে। সংবাদটা কীভাবে প্রকাশ করা হবে কিংবা আদৌ প্রকাশ করা হবে কি না তার দায়িত্ব ক্রেতার। এক চতুর্থাংশ কলমের উপযুক্ত ছোট্ট একটা সংবাদ পাঁচ হাজার টাকায় কিনে কেউ বা সেটাকে একেবারে গিলে ফেলেছে এমন নজির আছে। ক্রেতা অবশ্যই তা লাভজনক মনে ক'রে থাকবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আবিষ্কৃত সংবাদ চেপে যাওয়া হ'লে সামদ্দারের সাংবাদিক বিবেক পীড়িত হয় কি না। এ বিষয়ে তার মত প্রণিধানযোগ্য। সে বলে থাকে তার নিজের বিবেক আছে বলেই সে বলতে পারে সাংবাদিকদের বিবেক থাকা সম্ভব নয়। সে বলে—ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকের কাজ নয়, তাকে সাজানো গোছানো আকর্ষণীয় করাই তার উদ্দেশ্য। সত্য যেমন বিজ্ঞানের, সত্যের অনুকৃতি যেমন সাহিত্যের, অর্ধসত্য তেমন সংবাদপত্রের মালমশলা। অর্ধসত্য কি ক্ষতিকর নয়? স্ স্ স্, সংবাদপত্র একটা ব্যবসা। প্রত্যক্ষভাবে সেগুলোকে পরিচালনা করে কোন রাজনৈতিক দল, কিংবা কোন ব্যবসাদার, পরোক্ষভাবে অন্য অনেক বিজ্ঞাপনদাতা। সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতের তাৎক্ষণিক অভ্রান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে। দেখাও একটা দল যে তা করে না। বিজ্ঞাপনদাতা ব্যবসাদাররা নিজের স্বার্থের হানি করে সত্য উদ্ঘাটন করতে চাইবে এরকম চিন্তা করাও হাস্যকর। সুতরাং সেই সংবাদপত্রগুলো যাদের যে কোন একদিনের ব্যবহৃত কাগজগুলো বিছিয়ে দিলে বাংলাদেশকে ঢেকে দেয়া যায় তা অর্ধসত্য এবং অর্ধসত্য ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা হলেও মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্র জনসমষ্টি কার্ডিয়াল ড্রপ্ , ওটা দরকার। সকালে পাঁচ ফোঁটা গ্রহণ করলে সারাদিনের জন্য বিবেক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, যদি বা সংবাদপত্রকেই বিবেক না বলো।

কিন্তু সমশ্রেণীর লোকদের কাছে এগুলো ঝাঁজালো রসিকতা ব'লে গৃহীত হ'লেও যেমন স্ত্রীলোকের নিতম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে রূঢ় উল্লেখ কোন কোন ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে, হুজহুতে প্রকাশ করা যায় না। তেমন বোধ হয় এ সংবাদটাও সেখানে দেখা যাবে না যে ভূদেব সমাদ্দার ইলেকট্রিক মেকানিক ফিটারদের সঙ্গে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা গল্প করতে পারে। এই মেকানিকের দল যাদের সংখ্যার শতকরা হার বর্তমানের জনসংখ্যায় ক্রমশ বেড়েই চলেছে তাদের প্রতিপত্তি দেখে কখনও কখনও মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তারাই গৃহের মালিক। যেমন এক সময়ে খুব বেশী এবং এখনও মাঝে মাঝে রাজনৈতিকদের সম্বন্ধে মনে হ'তে পারে। সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই তাদের ডাকা যেতে পারে কিন্তু ভাবখানা এই যেন তারাই বলে দেবেন সমাজের মানুষগুলো নিঃশ্বাস নেবে কি না, কিংবা কোন্ কবিতা পড়বে। সংখ্যাতীত গ্যাজেটের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের সাহায্য তোমার দরকারে লাগতে পারে, খুবই দরকার হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে শোবার ঘরে বিছানায় বসিয়ে মেঝের কার্পেটে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে দেবে? শুনে মনে হয় প্রথমত কথাগুলো ভূদেবকে প্রত্যাখ্যান করেছে, মাঝরাতে তার ফ্ল্যাট থেকে চ'লে গিয়েছে এমন কোন ললনার , দ্বিতীয়ত ভূদেবের এমন একটা দুর্বলতা আছে মেকানিকদের সম্বন্ধে যার জন্য সে ররং সেই স্ত্রীলোকের প্রত্যাখ্যান মেনে নিয়েছে।

মির্জা গালিব এবং সাতাশ নম্বরও বটে—তেতালার এই তিন কামরার ফ্ল্যাটটা ভূদেবের। সামনের এই ঘরটা লিভিং রুম। বেশ বড়, চওড়ার অনুপাতে লম্বাই বেশী। সে জন্য ঘরটাকে একটা অদৃশ্য রেখায় দ্বিখণ্ডিত করতে অসুবিধা হয় না। এদিকে মাঝাবি বড় একটা ব্যুরোকে ঘিরে খান কয়েক চেয়ার। ব্যুরোর ছাদ ক্রোম-হলুদ। চেযারগুলোর গদি গোলাপী। চেয়ারগুলোর কাঠের অংশ অ্যাম্বার-রঙের। ব্যুরো যেমন সাজানো থাকে তেমন ক'রেই সাজানো। একাধিক টেলিফোনের রিসিভার, একটি ডিক্টাফোন। ঘরের অন্য অংশে জ্যামিতিক নকশায় তৈরি নিচু নিচু সোফা ডিভ্যানের সাজানোব কায়দায় একটা দুরূহ জ্যামিতিক নক্সাব আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সোফা ডিভ্যানের বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলো ছিটে মোড়া নয়। ব্যুরো, চেয়ারের বেলায় যেমন, সুদৃশ্য দামী রেকসিনে মোড়া, রংএর কথাতো আগেই বলা হয়েছে। কিংবা রেক্সিন বলা ঠিক হ'লো না, চামডাই বরং। চামড়া থেকে এর পার্থক্য বুঝতে হ'লে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে এবং সেখানেও সহজে বোঝা যাবে না।

ব্যবসাব কথাবার্তা উপন্যাসে আনতে কেউ কেউ দ্বিধা ক'রে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রেক্সিন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এমন কি শীতপ্রধান মহাদেশের বরফগলা কাদায়, যাকে ওরা স্লাশ্ বলে, এ বস্তুটি চামড়ার মতোই বিশ্বাসযোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী। প্রতি বৎসর কয়েক কোটি জোড়া জুতোই রপ্তানি করা হচ্ছে সুরঞ্জিত তলাপাত্রের এই বিশেষ রেক্সিন আবিষ্কারের ফলে। শুধু কি জুতো, কোট, জ্যাকেট, এবং চাদর-রেক্সিন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে টেবিসিল্ক ও টেবিউলের আমদানি বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় এই বেক্সিন্ তার দ্বিগুণ অর্জন করে। সেই কবে মসলিন ছিলো আবার এই এতদিন পবে এই বেক্সিন্ পাওযা গেল। চাবশ' বছব ধ'রে এ অঞ্চলেব লোকরা ব্যবসায় বিমুখ শুনবার পর ওটাকে সত্য ব'লে মনে হ'যেছিলো। এখন? এটা অতিশয়োক্তি নয় যে একদিন যেমন ইউবোপের পরিধেয়-রুচি নিয়ন্ত্রণ কবতো এই অঞ্চল—এখন অনেকাংশে আবাব তা করবে এমন মনে হচ্ছে। এবং সহসা প্রতিযোগিতায় হাবতে হবে এমন সম্ভাবনাও নেই। এক জাপানি ইঞ্জিনিয়ার যে এদেশে বিশবছব বাস কবার প্রমাণ দেখিয়ে উৎপাদন কেন্দ্রে চাকরি পেয়েছিলো, সে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় আশঙ্কা হচ্ছে হযতো সে স্বদেশে ফিরে গিযেছে কিছু গোপন তথ্য নিযে। হযতো জাপানি পবিবর্ত বাজারে বেরুবে। অত সহজ হবে কি? আমেরিকা এর পরিবর্ত বাব কবেছে, বাজাবেও চলছে। কিন্তু মটকা-গরদের সঙ্গে চীনা সিল্কেব তুলনা? এই বেক্সিন্, সুবঞ্জিত তলাপাত্রের এই রেকসিন, কিংবা গোডাতে বেক্সিন বলাই ভুল হয়েছে, নতুন জিনিষ নতুন নামেই পরিচিত করা উচিত, এই সুরাক্সিন্ লেদাবই, পুড়িয়ে দেখলেই অন্যান্য বেক্সিনেব সঙ্গে পার্থক্য ধবা পড়বে, লেদাব পুডলে যে গন্ধ পাও। অন্যান্য বেক্সিনে তা থাকে না। কিন্তু লেদাবেব চাইতে ভালো, কারণ লেদারে সব রং ধ'রে না। অন্য অনেক কারণে সুরাকসিন আলোচনার যোগ্য, কিন্তু অন্য সব কাবণ ছেড়ে দিলেও এই অঞ্চলেব লোকের যে চিবুক তুলে চলতে শিখেছে তার মূলে এই সুবাক্সিন।

সে যাই হ'ক, এই বসবার ঘরে সমাদ্দার কার্পেটে ব'সে একটা টেলিভিসন্ সেট শোধরাতে কিংবা গ'ড়ে তুলতে ব্যাপৃত। সমাদ্দারেব পরনে কিমোনো। তার পাশে একটা টুল-বক্স। সেটাকে দেখে তার ছবি সম্বন্ধে আসক্তির একটা পরিমাপ করা যায়। টুলবক্সটা সেই রকমের একটি যা চার অঙ্কের সব চাইতে বড় সংখ্যাতেও কেনা যায় না। পোর্টেবল ওয়ার্কশপ্। বাক্সটার নিচে চাকা লাগানো। কাজ হ'যে গেলে, সুইজ টিপলেই হ'লো। ভিতরে বসানো মুষ্টিপরিমিত ইলেক্‌ট্রিক্ মোটরের সাহায্যে চলতে শুরু করবে।

এখানে সত্যেব খাতিরে গল্প থামিয়ে একটা কথা বলা দরকার। টুলবক্সটা দামী বটে কিন্তু তা থেকে হঠাৎ বড়লোকের দামী জিনিস কিনবার ঝোঁক ধরা পড়েছে এমন মনে কবা ঠিক হবে না। এটা টেক্নো ক্র্যাটদের আতিশয্যও নয়, আজকাল তাদের সেই অনেকদিনের পুরনো ভাষায় ফিলিস্তিন বলা হচ্ছে গোপনে। হবিহর্স ব'লে একটা কথা মনে পড়ছে। হর্স যখন তা খোঁড়ালেও চড়ার জন্যই। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় সেই হর্সই বরং ঘাড়ে চেপে ব'সে। আব তখন ছবি দেখে ডু ইট ইয়োরসেল্ফেব পর্যায়ে থাকে না। ভেবে দেখা দরকার, জীবিকা উপার্জনের বাইরে, খাওয়াব টেবল থেকে দূরে স'রে এসে, এই যে এক বিষয় যা মনকে তৃপ্ত করে, পরিপূর্ণ করে, দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতা থেকে অন্যত্র নিয়ে যায় তার চর্চাকে সংস্কৃতি বলা হবে কি না। পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখার হবি নিযে শুরু করে আমাদের কাউকে কাউকে যেমন এক

পর্যাযে ঔপন্যাসিক হওযাব জন্য বাধ্য হ'যে মনকে গুছিযে গুছিযে একটা গ্রন্থাগাব ক'বে তুলতে হয--ভূদেব সমাদ্দাবকেও তেমনি এই টুলবক্সটাকে যোগাড কবতে হযেছে। যেহেতু ভূদেব সমাদ্দাব বিবেচক, বিবেকবান, এবং বিদ্বান সে বলবে এই কাবিগবিব চর্চাই তাব কাছে সংস্কৃতি। এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য না থাকলে কোন ললনাই শেষপর্যন্ত সহনীয নয। ববং যেতে দাও তাকে।

ভূদেব ঠুক্ঠাক্ কবছে, খুট্খাট্ কবছে। একটা সক তাব কিংবা তাব চাইতেও সক স্ক্রু টেনে বাব ক'বে আলোতে তুলে ধ'বে পবীক্ষা কবছে, ঘুণাক্ষবে বুঝতে চেষ্টা কবছে। স্ক্রু কষছে, নব্ মোচডাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে যেমন হ'যে থাকে, চিত্রকব যেমন ইজেল থেকে খানিকটা স'বে গিযে অর্ধসমাপ্তকে লক্ষ্য কবে, মাঝে মাঝে টেলিভিসন্ সেট্টাকে চালু পবখ কবেও নিচ্ছে। তাব ফলে সেটাব পর্দায কখনও কোন উবর্স্বিনী গানেব একটা কলি গেয়ে উঠছে, কোন পেলে (কালোমুক্তা) পাযেব উপবে ফুটবল দোলাচ্ছে, কোন বিজ্ঞানবোমাঞ্চিকাব নাযিকা বাদামেব মতো ছোট একটা ডিক্টাফোন যন্ত্রকে ডিনাব টেবলে নিযে যাওযাব জন্য লাঞ্চেব আখবোট-বাদামেব প্লেট সাজাচ্ছে। বলা বাহুল্য এগুলোতে জাপান, ইংল্যাণ্ড এবং ব্রাজিল ধবা পডলো।

কাজ কবতে কবতে ভূদেব কথা বলল। আমবা তখন নাটকীয ভাবে ঘবটাতে অন্য আব একজনেব উপস্থিতি লক্ষ্য কবলাম। ঢাউস চেহাবাব কাগজটা নডলো আব তাব পিছন থেকে ভূধব সেন আত্মপ্রকাশ কবল। ভূধব সেন অন্তত নামে পবিচিত আমাদেব কাছে। এই অপবাধ-বিজ্ঞানীকে আমবা সংস্কৃতি সেমিনাবে উভযবিধ সংস্কৃতিব সমন্বযেব বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ কবতে শুনেছি। ভূধব সেনব এবকম আত্মগোপন ক'বে ব'সে থাকা থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চযই আতিশয্য হবে কিন্তু এটাকে তাব চালচলনেব প্রতীক হিসাবে নিলে অন্যায হয কিনা ভেবে দেখবো, কাবণ এটা আমবা ভুলতে পাবছিনা অপবাধবিজ্ঞান তাব হবি উপজীবীকাব দিক দিযে সে বাষ্ট্রিয অনুসন্ধান বিভাগেব উচ্চপদস্থ কর্মচাবী।

ভূদেব বলল, 'আ, ভূধব, আ, এখনও কি সন্ধ্যা হযনি?"

সমাদ্দাবেব স্ববে যেন বিষাদ, যেন সে অপবিসীম ক্লান্ত।

বস্তুত তখনও সন্ধ্যা হ'তে কিছু দেবী আছে। ভূধব কাগজ সবিযে হাতঘডি দেখালো। নিঃশব্দে হাসল। বলল "কোথায আছে?"

সমাদ্দাব বলল, "আট্রোগায, আমাব মনে হচ্ছে, যদি তা বলো, শোবাব ঘবেই আছে।

ভূধব উঠে গেল। কিছুক্ষণেব মধ্যে চাকালাগানো ছোট্ট সুদৃশ্য মদেব বাবটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিযে এলো।

ভূদেব উঠে দাঁড়ালো। নিচু হ'যে উঁকি ঝুঁকি দিযে দেখল। বলল, আ, ভূধব, দেখো, লুক্, লো, ওটা এমাবেল্ড আঁবসাৎ, ওটা ছিপি খোলা হযনি এখন ভার্মুখ। আমাব হাতে তেল কালি, ভাই। তুমি দুটো গ্লাস ভ'বে ফেলো তোমাব পছন্দ মতো। আবাব ভবো, আবাব ভবো, আবাব।"

ভূধব দুটো গ্লাস ভবলো। ভূদেব নিজেব গ্লাসটাকে তুলে নিযে তাব টুলবকসেব দিকে মন দিলো। ভূধব আলোব দিকে গ্লাস ধবে মদটাকে দেখে দেখে মৃদু মৃদু চুমুক দিযে চলল। অনুমান হয সে ভাবছেও বটে।

ভূদেব একটা স্ক্রু নিযে কিমোনোব আস্তিনে মুছে টেলিভিসন যন্ত্রটাব যথাস্থানে লাগিযে দিযে পবখ কবাব জন্য সুইচ্ লাগালো। সঙ্গে সঙ্গে কবতালিব শব্দ চডচড ক'বে উঠলো। অব্যর্থ দক্ষ লেফট্ হুক। মুষ্টিযোদ্ধাদেব একজন টলতে টলতে কোণেব দিকে স'বে যাচ্ছে, তাব ব্যথায় বিকৃত মুখ লালচে হ'যে উঠতেই গাঢ বক্তেব একটা ধাবা গলা বেযে বুকেব দিকে নেমে এলো।

সুইচটাকে একটু ঘুবিযে দিযে ভূদেব মদেব গ্লাসটাকে তুলি নিযে বলল আচ্ছা, ভূধব, ইনকামট্যাক্স ডাইবেক্টবেট্ কিংবা অ্যান্টিস্মাগলিং ব্যুরো-

কথাব মাঝখানে থামলো ভূদেব, সাগ্রহে ববং টেলিভিসন স্ক্রিনেব দিকে চেযে বইলো।

ভূধব নিঃশেষ কবা গ্লাসটাকে নিঃশব্দে নামিযে বেখে বলল, "তোমাব কাজ হযেছে! তা হলে আমবা বেডাতে যেতে পাবি, কিংবা কোন আর্ট থিযেটাবে।"

স্ক্রু কষে কষে কেসটাকে শক্ত করল ভূদেব। অনুমান করা যায়। নিজের পরিশ্রমের ফলে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছে সে। শেষ বারের মতো পরখ করার জন্য সুইচটাকে একটু ঘুরালো। ছবিটা আর একটু স্পষ্ট হল। মুষ্টিযোদ্ধা দুজনেই সম্ভবত এই রাউন্ডেই প্রতিপক্ষকে নকআউট করতে কৃতসংকল্প। একজনের মুখ রক্তাক্ত, অন্যের ডান চোখটা ফুলে উঠেছে, রক্ত মিশানো জলের মতো কিছু একটা গড়াচ্ছে চোখ থেকে। দর্শকদের হাততালির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বিলম্বিতলয়ের তালে তারা সমবেত ভাবে করতালি দিচ্ছে খট্ খট্ খট্। যেন কিছু একটাকে প্রতীক্ষা করছে তাবা। আর মুহূর্তেই তা ঘটে গেল। নিখুঁত, অনবদ্য একটা রক্তঝরানো আপার কাট্। আঘাতপ্রাপ্ত মুষ্টিযোদ্ধা টলছে, তার পেশীদৃঢ় পা দুখানা ন্যাক্‌প্যাক করছে। ঝড়ে পড়া কলাগাছের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সে ক্যানভাসের উপবে আছড়ে পড়লো। দ্রুত আনন্দিত করতালি। ভূদেবেব মুখে তৃপ্তিব চিহ্ন দেখা দিলো আ, বিউটি! একমুহূর্তে সে টেলিভিসন্ স্ক্রিনটার দিকে চেয়ে রইলো। এখন সেখানে ফেড্ অফ হচ্ছে।

ভূধব হাততালির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে টেলিভিসন্ সেটটার দিকে চেয়েছিলো। কেউ যেন তার কড়ার উপবে নেচেছে এমন চেহাবা হল তাব মুখেব। তাব ভ্রুদুটো একটু উপবে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসল।

সুইচ্ অফ্ করে একটা সোফাতে বাহু বেষ্টন কবে ভূদেব ভূধবেব মুখোমুখী গিযে বসল মদেব গ্লাসটা নিয়ে।

ভূদেব বলল, "এটা আজকাল ভালোই হযেছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আহমেদাবাদ ৩০শে আগস্ট ১৯৬৭ বেলা ৪টা ১৫ মিনিট। এ টি এম-২ উপগ্রহ ব্যবহাব কবে আমরা প্রথম দূব-সংযোগ স্থাপন কবেছিলাম।" (সলজ্জ দেখল ভূদেবেব মুখ।)

ভূধব সিগারেট কেস এগিয়ে ধবল। "স্ স্ স্ তা, হ্যাঁ, বলতে পাবো।"

"আর, অবশ্য এটা সাজানো। মানে ঠিক তিন বাউন্ডে নক্ আউট হতেই হবে, কাবণ তিন বাউণ্ডের বেশি টেলিভিসন পর্দাকে তুমি আটকে বাখতে পাবো না। তবু তাবই মধ্যে জেনুইন রক্ত। এটা তোমাব বেশনিং-এর চাইতে ভালো, যদি তা বলতে চাও। কি বলো?"

ভূধর বিশেষ বিব্রত বোধ করল। বলল, "তা অনেকটা ভালো। এক্ষেত্রে অন্তত নাড়িভুঁড়ি বেবিযে পড়ে না যেমন বোমের সেই ক্রীতদাসদেব পড়তো।"

গ্লাস দুটো নিজেই ভ'বে নিল ভূদেব। বলল, "ও, হ্যাঁ, একথা নয়, আসলে তুমি কিছু বলেছিলে।"

"বলছিলুম তোমার হাতে যদি তেমন কাজ না থাকে বেড়াতে গেলে হয়।"

"এটা তোমার ফাঁকিব কথা যদি ভেবে দেখো। এই দেখো তুমি যে ঠোঁটে ছুঁইযে নামিয়ে রাখলে। একটু উপকার তো তোমার কাছে আশা করতে পারি, কিছু সাহায্য, আব তা মানুষ বন্ধুবান্ধবেব কাছে আশা কবেই থাকে। সমাজ বলতে যা বোঝায় সেখানে কি কেলেঙ্কাবি আব ঘটছে না। কিংবা তোমাব অনুসন্ধানেব বিষয়গুলো সম্বন্ধে এতটুকু ইঙ্গিত।"

ভূধব বলল, "তোমার লোকেবা যেখানে সংবাদ খুঁজে পায় না আমি যেখানে কিছু পাবো এ আশা কবা যায় না।" ভূধর হাসল "আর তা ছাড়া—"

"কি তা ছাড়া?"

"সোসাইটি স্ক্যান্ডাল বলে আব কি অবশিষ্ট আছে?"

"এটা তোমার অত্যন্ত ক্ষমাশীলতার পরিচয ভূধর।"

"তা হতে গেল কেন? তুমিই বলো না আমাদের ভুল ধারণাগুলো শুধবে যাওয়ার ফলে এখন স্ক্যান্ডাল খুঁজে পাওযা যাচ্ছে?"

"বাহ্ এই তো বেশ বলছো। এ বিষয়ে তোমার চিন্তা অবশ্যই কাজে লাগানো যাবে। এখানে বলে রাখি আমি একজন নতুন ফীচারিস্টের খোঁজ পেযেছি। আসবাব কথা আছে। যদি থাকো তখন আলাপ হবে। এখন বলো স্ক্যান্ডাল খুঁজে না পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে তোমার মত কি।"

ভূধর হাসল, "ফুটিযে তুলতে পারলে বোধ হয় তুমি যা করতে চলেছো এটাই একমাত্র স্ক্যান্ডালের

বিষয় হতে পারে। অশ্লীল হতে পারে।"

"বুঝিয়ে না বললে মানছি না।" ভূদেব পায়েব উপরে পা তুলে বসল।

"এই ঝোঁকটাই বোধ হয় স্ক্যান্ডাল হতে পারে বন্ধুবান্ধব পরিচিত যে যা বলুক তার মধ্যেই অর্থকবী ফীচারের বীজ বা সংবাদেব ইঙ্গিত খোঁজার ভঙ্গি নতুবা অন্য কাকে কেলেঙ্কারি বলবে? আগে, এমন কি আমাদের প্রথম জীবনেও, স্ত্রীপুরুষের বিধিবহির্ভূত প্রেম কেলেঙ্কাবিব উৎস ছিলো। এখন এটা সংবাদ হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে, অ্যালায়েন্স বদলানোর সংবাদ, কিন্তু বিধিগুলো এখন এতো উদাব যে তার বহির্ভূত কি হতে পারে ভাবা যায় না।"

ভূদেব অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল। বলল, "এর উত্তব আমি দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তুমি উদাহবণ দিয়ে বোঝাও আইন উদাব হওযাব ফলে কেলেঙ্কারি কি কবে লোপ পাচ্ছে।"

ভূধর বলল, 'কোন বিবাহিত নাবী যদি পরপুরুষকে স্বামীর চাইতে বেশী কৃপা কবে, সমাজ কণ্টকিত হয় না আর ; কারণ সেটা ডাইভোর্সেব প্রকাশিত সঞ্চয়যোগ্য প্রমাণ মাত্র। কোন অবিবাহিত নারী যদি ভ্রূণহত্যার জন্য ডাক্তাবের সাহায্য নেয় তবে সমাজ সে বিষযে ভ্রূক্ষেপও কবে না, কাবণ নাবীর সে অধিকাব আছে।"

ভূদেব বলল, "বসো, রসো। স্যানমশাই, একটা বিষয তুমি গোপন কবছো, যদি তা বলতে চাও। মনে কবো কোন ভদ্র পুরুষ, যাকে সমাজ ভদ্র বলে, সে যদি আবিষ্কাব কবে তাব স্ত্রী পরগামিনী আর তা আবিষ্কার কবে সে যদি প্রতিবেশীদেব শান্তি নষ্ট কবে 'চিল্লাচিল্লি' কবে? সেই চেঁচামিচি, কথাটা দেখো 'চিল্লাচিল্লি', তা হলে স্ক্যাণ্ডাল হবে না? কিংবা কোন অবিবাহিত তরুণী যদি ভ্রূণহত্যাব জন্য ডাক্তাবেব সাহায্য না নিয়ে পথের ধাবে তা নিক্ষেপ করে, কিংবা আনাড়ির হাতে প্রাণ হারায় তবে তা কেলেঙ্কারি হবে না? কিংবা এখনও ইনসেস্টকে তোমবা বিধিসম্মত করো নি। সে বকম ঘটনা নেই? আ ভূধব, আমি এব আগেও লক্ষ্য কবেছি আবঁসাৎ তোমাব যেন কিছুটা ধার কমিয়ে দেয়।" ভূদেব সমাদ্দার হাসল, বাব থেকে নতুন একটা বোতল বার কবল, "এটা সেই আদিযুগের হুইস্কি, সাহায্য নাও এবং তাবপবে বলো।"

ভূধব সিগাবেট বাখবাব জন্য অ্যাসট্রে খুঁজে এদিক ওদিক চাইলো। উঠে গিয়ে টেবল থেকে নিয়ে এলো একটা। আঁবসাতেব গ্লাসটায মৃদু মৃদু চুমুক দিল। হেসে বলল, "তোমাব ধবনধাবণ আজকাল সূক্ষ্ম হয়েছে দেখছি। কিন্তু সব সংবাদসেবীর তা নয। আজকের সকালেব কাগজে মন্ত্রীমশায়েব কেলেঙ্কারি হিসাবে যা ছাপা হয়েছে সেটা খানিকটা কাদা ছিটানো বটে কিন্তু স্ক্যাণ্ডাল বলা যায না। ভালো কথা তোমাকে বলে রাখি, ও ব্যাপাবটায তুমি থেকো না। দুপুবে মন্ত্রীপবিষদেব নির্দেশে ওই সংবাদেব উৎস খুঁজে বার করার ভাব নিযেছি, এবং আমি আমার সহকাবীদের নিয়ে ইতিমধ্যে কাজ শুরুও করেছি।"

তাই নাকি? কিন্তু ও ব্যাপাবটাকে তুমি কি মনে কবো?" ভূদেব হাসল। "সবই নির্ভব কববে মন্ত্রীমশায় নিজে কি বিবৃতি দেন তার উপব।"

সমাদ্দাব বলল, "ঠিক বলছো? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাক্, দেখা যাক্। কিন্তু স্ক্যান্ডাল যখন নেই, নাই থাকলো, ইন্‌কামট্যাক্স অনুসন্ধান ব্যুবো যাব বোঠোকখানা তার কাছে সংবাদ নেই একি হতে পাবে, তা ছাড়া তুমি বোধ হয় ট্যাবিফ বহির্ভূত বাণিজ্যের কনট্রোল বোর্ডেও আছো।'

ভূধর একটু অবাক হল। বলল, "তুমি যে দক্ষ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। টাট, টাট্, এখবব ইতিমধ্যে ছড়িযে পড়া উচিত হয়নি।"

ভূধব আলাপটাকে সরিয়ে নিল। "ইনকামট্যাক্স নিয়ে একটা নাটক হয়েছে তা শুনেছো?"

"বলো কি, আর্ট থিয়েটাবে?"

"হ্যাঁ। ইনকামট্যাক্সই বিষয় নয়। কিন্তু ওটা যে একটা ফোর্স, সেকালের লাইফ-ফোর্সের মতো, এবকম একটা ভাব আছে। অবশ্য আর্ট থিয়েটারে তোমার অ্যালার্জি হয় শুনেছি।"

"আচ্ছা ভূধর, তুমি সত্যি কথা বলো তো, তুমি কি রেনেশাঁর কথা বলছো? তা নাকি এক স্ক্যান্ডাল।"

"গিয়েছো? না, শুনে বলছো?"

ভূদেব কিছুটা অপ্রতিভের মতো হেসে বলল, "না, না। যেতে হবে একদিন। ভদ্রলোকেব সঙ্গে আলাপও

আছে। তাব ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। তুমি শুনেছো নাকি মাধবী ঘোষালের সেই ফিল্মটাব সিনারিওর অনেকাংশই নাকি প্রবীরবাবুরই তৈবি। কিন্তু অমন একটা সিনারিও কিনবার পর আর্ট থিয়েটারের খোপে ফিবে যাওয়া–অবশ্য প্রত্যেকেরই রুচিব স্বাধীনতা আছে।

ভূধর বলল, "এর আগে আর্ট থিযেটার নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। যার জন্যে অন্তত অসহিষ্ণু ভদ্রমহিলা আমাদের গোবা-বিনয়ের অপবাদ দিয়েছিল। তোমার মত বদলায় নি, সুতরাং ওতে ফিরে লাভ নেই। তবে মাধবীও নামছে এই নাটকে এই খবর দিতে পারি।"

ভূদেব হো হো করে হেসে উঠল। "আচ্ছা, আচ্ছা, প্রবীর সাণ্ডেল তোমার বন্ধুস্থানীয় আমারও পবিচিত। এর মধ্যেই যাব একদিন। দেখে আসবো ইনকামট্যাক্স কি করে লাইফ-ফোর্সের কাজ করে। কিন্তু, শোনো ভালো কথা, নিরঞ্জন ঘোষালেব ব্যাপারটাকে কি বলবে? নিরঞ্জন মানে মাধবী ঘোষালের স্বামী।"

ভূধব অবাক হল। "কি ব্যাপার?"

"অবশ্য ডাইভোর্স বা জুডিসিয়্যাল সেপারেশনেব কথা বলছি না। মাধবী ডাইভোর্স চেয়েছিল, নিরঞ্জন পবেরটি। জজ পরেরটিকেই দিয়েছে কারণটা শুনেছ? মাধবীর কাউন্সেল বলেছিল–সন্তানলাভেব পর বমণীব মন হয়তো বন্দনাযোগ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তাব দেহ অনিন্দিত থাকে না। আর আমার মক্কেল মাধবীব জীবিকাব পক্ষে অনিন্দিত কান্তিই অপরিহার্য। নিরঞ্জনের ব্যাবিষ্টার বলেছিল–আমার মক্কেল একটি পুত্র চান, এবং মাধবীর কাছে থেকে চান, কারণ তাঁকেই তিনি ভালোবাসেন। এটা মানসিক অসামঞ্জস্য নয়। এর উপরে ডাইভোর্স চলে না। ববং মাধবীকে ম্যাচিউর হওযাব সময় দেয়া হোক। আমাব মনে হয় আইনের ন্যাযপরাযণতা তাতেই বক্ষা পাবে।"

"একেবারে মুখস্ত দেখছি।"

"সব কাটিংসে বোজ পড়া হয় না। আজ সকালেই পড়ছিলাম। আব তাব কারণ আমার নতুন ফীচাবিষ্ট রাজেনকে এর উপবেই লিখতে বলবো ভাবছি।"

"এর মধ্যে কি স্ক্যান্ডাল আছে মনে কবছ?"

"হুঁ, তা, যদি তা বলো ; এটা কি কেলেঙ্কাবি নয় এই পুবনো ধবনেব চিন্তা একজন টেকনোক্র্যাটেব পক্ষে?"

ভূধরের চোখ দুটি একটু চক্‌চক্ করে উঠল। অনুমান হল সে তর্কেব কোন বিষয় পেয়েছে, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে তাব কিছু বক্তব্য আছে।

সে সিগাবেট ধরালো। ভূদেব আবার গ্লাস ভবতে গেল। সে হাত নেড়ে জানালো আব দরকাব নেই। খানিকটা ধোঁয়ানোর পর ভূধর বলল, "আচ্ছা উইল করাকে তুমি কি রকম মনে কবো?"

"মানে? তাও ভালো। কিন্তু আসল কথা কি জানো, রেখে যাওয়াব মতো কিছু সঞ্চয় করছি না। একটা ছোট টাকাব অঙ্ক অবশ্য একান্ত সচিবের নামে নমিনেশন করা আছে। হঠাৎ কিছু হলে চলতিমাসেব বিলগুলো শোধ করতে পারবে, শরীরটাকে পোড়াতে অসুবিধা হবে না।"

"তুমি না করলেও অনেক মানুষ উইল কবে থাকে।"

"তা কবে, কিন্তু গ্লাস দুটোই খালি দেখো। বোঝা যাচ্ছে উইল কেউ করে, কেউ কবে না।"

"তোমাকে অঙ্কেব বই-এর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। পুত্রকলত্র কন্যাকে উইল কবে দেয়াব সময়ে কি রকম সব কঠোর চেহাবার ভগ্নাংশ ব্যবহার কবা হয় তা যদি মনে করো। পুত্র অর্ধেক, কলত্র অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ, কন্যারা প্রত্যেক অবশিষ্টেব এক চতুর্থাংশ কবে–"

"মনে পড়ছে বটে," ভূদেব বলল, "ভাগটাকে অসমান রাখাই উদ্দেশ্য আর তাতেই নাকি গাণিতিক বুদ্ধির উন্মেষ হয়ে থাকে।"

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ শুধু অসমান বাখা নয়, বড ভাগটা সব সময়েই একজন পাচ্ছে আর সে পুত্র, এটা পক্ষপাতিত্ব নয়!"

"তা যদি বলো এমন অসাম্য আবও আছে।" ভূদেব দুটো গ্লাসই আবার ভরলো। ক-এরদিকে এরকম একটা টান সব সময়েই ধরা পড়ে যার ফলে খ-কে ক-এর চাইতে বেশি খাটতে খুটতে হয়, ক-বাবু প্রায়ই

কাজ ফেলে সরে পড়ে, আব খ-কে খেটেখুটে নিজের কাজের সঙ্গে তার কাজও তুলে দিতে হয়, অথচ পাওয়ার ব্যাপারে ক-বাবু কিছু বেশিই পেয়ে থাকে।"

ভূধর হাসল। বলল, "আমি মনে করি ব্যাপারটা সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন আছে। মানুষ পুত্রকেই অধিকাংশ সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে যদিও আইনে উইল না থাকলে ওয়ারিশরা সবাই সমান হকদার!"

"কেউ কেউ সমাজকেই অনেকটা দিয়ে যায়।"

"যে সারাজীবন সমাজের কল্যাণ করেছে মৃত্যুব পরেও সমাজেব কল্যাণ কবতে থাকবে তার বিদেহ শক্তি দিয়ে এবকম একটা ইচ্ছা থেকে এটা হতে পারে। কারণ ভুলে যেয়ো না টাকাটা শক্তিব সিম্বল মাত্র নয়, শক্তিকে টাকায় এবং টাকাকে শক্তিতে পবিণত কবা চলে। কলত্র এবং কন্যাকে দেয়াব বেলাতেও এমন কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। নিজের বিমূর্ত প্রেম আব স্নেহ তাদের কাছে রেখে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়তো। কিন্তু পুত্র? আকৃতি, প্রকৃতি, এমন কি নাম—এ সবেব ঐক্যে নিজেই যেন অন্যদেহে থেকে যাওয়া-তাই নয়।"

ভূদেব হেসে বলল, "র'শো, র'শো। সমাজকে যা দিচ্ছি সেটা কল্যাণ কামনা, বউ আব মেয়েকে দিচ্ছি ভালোবাসা আর স্নেহ, এগুলো আমার অস্তিত্বের একটা দিক যা আমাব অস্তিত্বেব পোটেনশিয়াল অবস্থায় থেকে যাবে, আর ছেলের বেলায় আকৃতি, প্রকৃতি নাম—উপরন্তু আমাব শক্তিব অধিকাংশ পোটেনশিয়াল নিয়ে আমিই থেকে যাবো, দেহে এবং মনে?"

ভূধব কিছু বলাব আগেই ব্যুরোব উপবে রাখা একটা টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে উঠল। ভূদেব উঠে গেল। একটু কথা বলেই একটা প্যাড টেনে নিল। টেলিফোনে শুনে শুনে কিছু লিখল। তারপর জানিয়ে দিল ঠিক এখন সে অন্যভাবে ব্যাপৃত পরে লোক পাঠাবে। কিন্তু সংবাদটা তাব সিন্ডিকেট থেকে আসছে, উপজীবিকাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটু চিন্তা করল সে ফোনটা বেখে দিযে। প্যাডে লেখা সংবাদটা আবাব পড়লো।

তারপব ফিরে এসে বলল, "আপাতত আমার আর তোমার সে সুযোগ নেই, স্যানমশাই, কারণ, কারণ আমবা অপুত্রক। ওটা ভবিষ্যতেব ব্যাপাব। এখন এসো বর্তমানের খোঁজ খবব নেয়া যাক। তুমি তো তিব্বতীদের কাযদায় বছবগুলোব নামকরণ কবে থাকো। এ বছরটাকে কি নাম দেবে। অর্ধেকেব বেশী পাব হযে এসেছি আমরা। তেমন কিছু ভেবেছো? যে বছব বাঘে ধান খেলো, কিংবা সূর্য যে বছব তুষারাবৃত?"

ভূধর হেসে বলল, "তোমার মনে আছে দেখছি। পর পব বছব দুটিকে একই ধরনের নাম দেয়া হযেছে বটে।" একটু থেমে আবার বলল, তিব্বতীরা সেকালে বছরের নাম-করণ করতো রাশিফল গণনা কবে। আমাদের সময়ে বছবগুলোকে নাম দিতে তুমিও পাববে যদি সংবাদগুলোকে ভালো কবে বিশ্লেষণ কবো।"

ভূদেব বলল, "তোমাব নামকরণে সাবা বছবের সামাজিক মনোভঙ্গীর মূলভাবটা ধরা পড়ে কিনা জানি না কিন্তু নামটা টাটকা রসিকতা হিসাবে তোমার পাঠকদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোমার গোঁফটা মুছে নাও। এমারলড্ হয়ে উঠেছে আঁবসাতে।"

ভূধর বলল, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" গ্লাসে একটা মৃদু চুমুক দিয়ে আবার বলল, "তুমি যখন এতই আগ্রহী তোমাকে বলতে পাবি—এ বছবটাকে আপাতত যে বছব মৃত্যুভয় দেখা দিল এমন একটা নাম দেয়া যায় কিনা ভাবছি।"

ভূদেব বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, এবার আমি তোমার কৌশলটা ধবে ফেলবো। স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট নিশ্চয় গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বেশি—আর এটা বোধ হয় তোমার গ্রাফে ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে, কিংবা, কিংবা সংখ্যায় তেমন বেশি না বেড়েও অ্যাক্সিডেন্টগুলো অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি মৃত্যু ঘটাচ্ছে অথবা তুমি লাইফ ইনসিওরেন্সের গ্রাফে কিছু দেখেছ, এনডাওমেন্টেব তুলনায় হোললাইফ পলিসি বেশি নিচ্ছে লোকে, কিংবা সাধারণ ভাবে পলিসির সংখ্যা অন্যান্য বছবের তুলনায় হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে।"

ভূধব মৃদু মৃদু হাসল।

ভূদেব বলল, "কি, ঠিক হচ্ছে না?"

ভূধর বলল, "জরিপ করা দরকার, ব্যাপক এবং গভীর। তোমাকে ডাইভোর্স কোর্টের সংবাদ এবং নথিপত্র

দেখতে হবে, আত্মহত্যার বিবরণগুলো সংগ্রহ করতে হবে, তার মনস্তত্ত্বগত কারণগুলোকে খুঁজে দেখতে হবে। তোমরা সাধারণত আত্মহত্যাটাকে একটা গা সওয়া সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা হিসাবে দেখে থাকো আজকাল। স্ট্রিট অ্যাক্‌সিডেন্টের মতোই একটা শতকরা হিসাবের ব্যাপারের চাইতে বেশি কিছু মনে করো না।"

ভূদেব বলল, "ডাইভোর্স কোর্টেও বলো কি? এতো পো-র সেই 'লাল মৃত্যু' গল্পের মতো দাঁড়াচ্ছে, গতবার যা সিনেমায় দেখা গিয়েছিল।

ভূধর বললে, "টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জন ঘোষালের ব্যাপারটাকে কি মনে করো?"

"সে কি।"

কিন্তু ভূধর আর কিছু বলার আগেই দরজার পুস্ বেলটা মৃদু মৃদু বাজল। ভূদেব উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আগন্তুককে দেখে এসো, এসো বলে অভ্যর্থনা করল।

রাজেন ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আমার একটু দেরিই হল বোধ হয়।' 'তোমার মতো পড়ুয়া মানুষের একটু দেরি হলেই স্বাভাবিক হয়। এস, এই আমার বন্ধু ভূধর সেনমশাই, সমাজতত্ত্ববিদ্, অপরাধবিজ্ঞানী আর এই আমার তরুণ বন্ধু রাজেন, দর্শন-ছাত্র। তুমি যদি পানীয় চাও রাজেন, বিনা দ্বিধায় বারের কাছে এগিয়ে যাবে। আপাতত দেখতে পার এই এমারলড আঁরসৎ তোমার পছন্দ কিনা। আমরা যা আলোচনা করছিলাম তাও বলে দিচ্ছি। আমাদের জীবনে মৃত্যুভয় এসেছে আর তার ফলে আমরা অনেক কিছু ঘটাচ্ছি, উইল করে পুত্রকে অধিকাংশ সম্পত্তি দিচ্ছি, অপুত্রক অবস্থায় পুত্রের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ডাইভোর্স কোর্টে নিয়ে যাচ্ছি। এমন কি আত্মহত্যাও করছি। আচ্ছা, স্যানমশায় মৃত্যুভয়ে আত্মহত্যা করাটা বাঘের ভয়ে বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দেয়া হল না। কি বল, রাজেন, তাই হয় না?"

রাজেন তর্কে ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ করল। তার মুখে লজ্জার ভাব দেখা দিল। কিন্তু আলাপের যে কোণটা তার দিকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাকে না ধরলে আলাপটা চুপসে যাবে। সে বলল, ' আর মানুষের মৃত্যুভয় থাকা অদ্ভুত নয়। বরং আমার মনে হয় মৃত্যুভয় আর অন্ধকারকে ভয় একই বয়সের। জাতেও প্রায় এক। পশু আর মানুষে যত তফাৎ আছে তার মধ্যে এটাও একটা যে পশুর মৃত্যুভয় নেই, ওটা মানুষেরই।' ভূধর বলল, "সুন্দর বলেছেন। মৃত্যুভয় বিচার বুদ্ধির সঙ্গে চিন্তাপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। চিন্তা করলে ওটা বাড়ে, অন্যদিকে ওটাকে এড়ানোর জন্যে মানুষ নানা রকমের চিন্তাও করে।'

রাজেন সলজ্জভাবে বলল, 'এ বিষয়ে আমাদের বিনাদ্বিধায় এক মত হওয়া উচিত।'

ভূদেব বললে, 'মৃত্যু আছে। কিন্তু তাকে আমরা কি সত্যি তেমন ভয় করি। জীবনটাকে আশি বছরের বেশি টেনে নেয়া কঠিন, কিন্তু যা কিছু আমরা করি তা কম করেও একশ' বছরের জন্যে। মৃত্যুকে আমল দিলে তা করতাম না।"

ভূধর বলল, "আমরা যা কিছু করি তা অন্তত একশ' বছর থাক এ রকম আকাঙ্ক্ষা থাকে আমাদের। মনে নেই 'কে তুমি পড়িছ বসি—'? এটা মৃত্যুকে ভুলবার চেষ্টা।" রাজেন একটু ভেবে বলল, "হয়ত কাজটা করার সময়ে আমি মরে যাব সুতরাং কাজটা দীর্ঘস্থায়ী করে যাব এ রকম ভাবি না আমরা, কিন্তু যদি জানতাম যা কিছু করছি তা আমার মৃত্যুতেই শেষ, তা হলে আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই তা করতে চাইতো।"

ভূদেব বলল, 'উদাহরণ দাও।'

'ধরুন দেশপ্রেমিক যুদ্ধে যাচ্ছে, যদি সে জানতে পারে তার সব চেষ্টাই বৃথা হবে কারণ কর্তৃপক্ষ বরং পরাজিতের সন্ধিকে মেনে নিতে পারত, তবে কি সে প্রাণ দিতে চাইবে? ধরুন একটা বিপ্লবের কথা। তার জন্য ক্ষতিস্বীকার করে প্রাণ দেয়। কিন্তু যদি সে জানতে চায় যে, যে ধারণাগুলোর সমষ্টি তার বিপ্লব, সে-ধারণাগুলোর মধ্যে অনেক চিন্তার ত্রুটি আছে, সে পথ বহুলাংশে পরিত্যক্ত হবে, তার মৃত্যুর পরে তার ধারণাগুলোকে অন্য অনেকে বহন করে নিয়ে চলবে না। তা হলে তো কোন বিপ্লবই হতো না। আমার পরেই প্লাবন নয়, বরং আমার পরে অন্য অনেকে যারা চিন্তার দিক দিয়ে, চেহারায় যতই অনৈক্য থাক, আমিই বটে—এ সম্বন্ধে নিশ্চয় বিশ্বাস না থাকলে প্রাণ দেবার ঝুঁকি অনেকেই নেবে না।'

ভূধর বলল, 'তা হলেই দেখা যাচ্ছে উত্তরপুরুষ তার ভাল কিছুর উত্তরাধিকারী হবে এ না জানলে

মানুষ মৃত্যুভয়ে সম্মোহগ্রস্ত হত, কিছুই করত না। কিন্তু মানুষ মৃত্যুভয় দূর করতে চায়, নিজের কাজের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, সুতরাং সে উত্তরপুরুষকে কল্পনা করে, যেতে ইচ্ছা করে, উইল করে।'

রাজেন বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে তাই বটে। কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত কাজকর্মও তো আছে, সেখানেই আমরা সবচাইতে হতাশ। আগে ধর্ম ছিল, নীতি ছিল, অন্তত ঐতিহ্য ছিল। তা থেকে আমরা বুঝতাম জানতাম আমার কি করা উচিত। আশা করতাম এই নীতিগুলো আমার পরেও সমাজ মেনে চলবে। এখন সে বিশ্বাস আমরা করি না। মানুষ একটা বিশেষ নীতিকে কেন মেনে চলবে বারবার যার কোন যুক্তিই নেই। মানুষের কোন অবস্থায় কি করা উচিত তা কে বলতে পারে? আর সে জন্যই হতাশা। উইল ক.. ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। যদিও আপাতত তারই সাহায্যে মৃত্যুভয় থেকে পালাতে চেষ্টা করা যাবে ব্যক্তিগত টাকা পয়সার এবং সামাজিক নীতির উইল।'

ভূদেব বলল, 'এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনের মত খুব কাছাকাছি। মোট কথা এই মৃত্যুভয় আর তার নিজের মধ্যে সন্তানের ব্যবধান না থাকলে, কিংবা সে ব্যবধানকে যদি অর্থহীন বলে মনে হয়।

পারছি না। যদিও আপাতত তারই সাহায্যে মৃত্যুভয় থেকে পালাতে চেষ্টা করা যাবে ব্যক্তিগত টাকা পয়সার এবং সামাজিক নীতির উইল।'

ভূদেব বলল, 'এ বিষয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুজনের মত খুব কাছাকাছি। মোট কথা এই মৃত্যুভয় আর তার নিজের মধ্যে সন্তানের ব্যবধান না থাকলে, কিংবা সে ব্যবধানকে যদি অর্থহীন বলে মনে হয়।
বাঘেই খাবে যখন একদিন, তখন আজই খাও বলে মানুষ বাঘের মুখে মাথা দিতে পারে। এই বলছ?

ভূধর বলল, 'অনারোগ্য ব্যাধিতে যে ভুগছে অনেক চেষ্টা করতে করতে একদিন সে তার এতদিনের সব চেষ্টাকে পাগলামি মনে করে যার জন্যে চেষ্টা তাকেই নষ্ট করতে পারে।

'কিংবা,' রাজেন বলল 'জীবনটাকে ভার বলে বোধ হতে পারে যা কাঁধ থেকে ফেলে দেয়া উচিত, কিংবা ভান বলে বোধ হতে পারে। সুতরাং নেপথ্যে যাওয়ার আগেই মুখোস খুলে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়া ভালো।

ভূদেব একবার পায়চারি করে এল। আর তখন একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটল। একবার একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল। কয়েকটা কিশোর এক ভাঙাবাড়ির দুপুর রোদের বারান্দায় বসে আপসে ভূতের গল্প করছিল। এই ভাঙা ইটটা ভূত হতে পারে, ওই দেয়ালের ফাটলটা প্রকৃতপক্ষে কারো বুকফাটা কান্না হতে পারে, এ রকম নানা আলাপে গল্পটা এমন জমে উঠেছিল যে এক সময়ে কিশোর কজন ভয়ে দিশেহারা হয়ে দুড়দাড় করে ছুটে পালাল। আর এই পরিত্যক্ত বারান্দার ওপরে রোদটুকুও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠল, ইটের টুকরোগুলোর ওপরে তা যেন হা হা করে হেসে উঠবে। এই ঘটনাটার মধ্যে কিছু যেন ঘটল এখানে। যেন অস্বাভাবিক কিছু অবতরণ করেছে, যেন মৃত্যুভয়ই। দু পাঁচ মিনিট ধরে এটা যেন ছড়িয়ে ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে চলল এই ঘরটায়। অন্তত একটা অস্বস্তি।

তারপর ভূদেব একটু জোরে জোরে বলল, 'তোমার কোথায় এনগেজমেন্ট আছে, ভূধর? নেই? বা, নাইস। আমি একটা প্রস্তাব তুলছি। ডিনারে চলো। ডিনারের পরে সিনেমা, কিংবা হিপোড্রোমে তুমি কি এর আগে কখনও হিপোড্রোমে গিয়েছ, রাজেন হোটেলে ডিনার নাচ অসম্বৃত বস্ত্রের। এসো আমরা আদিম পুরুষের মতো হিপোড্রোমের বিবস্ত্র যুবতীদের নাচ নির্দয় পুরুষদের জন্যই, যদি বলতে পার।'

সে হাসল। তার মুখের রং এমনিতেই ফ্যাকাসে।

ভূধর নিচু হয়ে বসে বারে পছন্দসই মদ খুঁজতে শুরু করল। রাজেন সিগারেট ধরাল।

অবশেষে মনের মতো কিছু একটা সে পেয়েছে, বোতলটাকে ভূধর যে ভাবে তুলে ধরল সস্নেহে তা থেকে আন্দাজ করা যায়। নিঃশব্দ আনন্দিত আমন্ত্রণে বোতলটার ভিনটেজের তারিখের দিকে রাজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোতলটাকে বারের মাথায় রাখল সে। বারের নিচের থেকে তিনটে নতুন ওয়াইনকাপ তুলে বোতলের পাশে সাজাল। যেন সে ঘর্মাক্ত গরমে হাঁপাচ্ছিল এমনভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আ, কুল ক্ল্যারাট। আমি সব সময়েই স্বীকার করি যে কখনও কখনও সমাদ্দারের গুহায় নিছক উৎকৃষ্ট মদের আশাতেই এসে থাকি।''

রাজেন বলল, 'কথাটা অন্তত ঠিক পুরুষদের মতোই হয়েছে।".. গোটি সত্ত্বেও রাজেনের মুখ সলজ্জ দেখাল। সে বলল, 'কোন কোন সময়ে মনে একটা সমস্যা দেখা দেয়। মানুষ যখন সিগারেট আবিষ্কার করে নি, এবং যে দেশে মদ চলে না, তখন এবং সে দেশে পুরুষরা বেকায়দায় পড়লে কি অবলম্বন করত এবং করতে পাবে।'

ভূধবকে ক্ল্যারাটের বোতল খুলতে দেখে ভূদেব পায়চারি থামিয়ে ফিরে এল। ভূধরের মুখোমুখী বসে তাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল অন্যালোক কি বলবে তার অপেক্ষা না করেই সে বলতে পারে সময়ের উপযুক্ত মদ বাছাই-এর ব্যাপারে ভূধরের ট্যালান্ট সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল। কিছুক্ষণ ক্ল্যারাট চলার পর ভূদেব রিঙ্কোতে ডিনাবের প্রস্তাব উত্থাপন করল। প্রথমে ভূধর এবং পরে রাজেন রাজী হওয়াতে টেলিফোনে বিঙ্কোকে ডেকে দোতালার ব্যাল্কনিতে ডিনাবেব কথা বলে দিল ভূদেব। কাবণ বিঙ্কো ভূদেব এবং ভূধর দুজনেবই ক্লাব, এবং যেহেতু (রাজেনেব মুখ চেয়ে) রিঙ্কোব ব্যাল্কনি ডিনাবে পোশাক পবতে হয় না। কিন্তু রাজেন কাজের জন্য এসেছিল। সুতবাং সে বিষয়টা এখন উত্থাপিত হল সহজেই। ভূধর উপস্থিত থাকাতে কোন অসুবিধা হল না। একটু আনুপূর্বিক বলা দরকার।

সিন্ডিকেট লক্ষ্য করেছে সাধারণ মানুষেব মধ্যেও আজকাল অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিন্তার দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। ব্যবসার খাতিবে এই ঝোঁকটা কাজে লাগানো চাই। যারা সুযোগ খুঁজে নিতে জানে তারা সুযোগ পেয়ে থাকে। কিছুদিন আগে বাজেন সিন্ডিকেটের অফিসে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল 'রূপদর্শন এবং আমরা' এই বকম ধবনের একটা বিষযে। মঙ্গলবারেব কাগজে সেটা প্রকাশিত হযেছে। প্রকাশ হওয়ার পরেই প্রবন্ধর কাটিং বিলেব কাগজপত্রর সঙ্গে ভূদেবের টেবলে গিযেছিল। নামটা নতুন দেখে প্রবন্ধব প্রথম দিকটা পড়েছিল ভূদেব। তখন তার মনে হয় দিকে এরকম প্রবন্ধ কাজে লাগতে পারে। তাবপরই খোঁজখবর নিয়ে ভূদেব রাজেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কবেছে।

এই জায়গায় রাজেনের প্রবন্ধটাব একটা সংক্ষিপ্তসার দিলে বাজেনেব অর্থাৎ তার স্টাইলকে বুঝতে সাহায্য করবে না, কিন্তু তার ভঙ্গিটাকে কিছুটা ধরা যাবে। প্রথমেই সে বলেছে, অজন্তাব চিত্রে কিংবা কোণারকের ভাস্কর্যে নারীরূপের যে আদর্শ ছিল এখন তা নেই। নিতম্বেব পৃথুলতা, বক্ষেব নিটোল আতিশয্য, মুখের লাবণ্যমণ্ডিত পর্ণপত্রের পূর্ণতা এখন আর আদর্শ বলে মনে হয না। লম্বাটে পাযের উপরে মাঝারি মাপের নিতম্ব, ছোট খ্রিয়মান ববং ডিমের মতো গড়নের মুখ, চোখের কোণে ক্লান্তিব কালি—মোটামুটি এগুলোকেই বর্তমানে নারীর রূপেব মূল আদর্শ বলা যেতে পাবে।

এর পরে সে লিখেছিল—আদর্শটা বদলানোর কারণ মানুষের বাস্তববোধ। বাস্তবে অজন্তাব চিত্রে উৎকীর্ণ রমণীকে পাওয়া যায় না। এখন প্রকৃতির বর্ণনায় কোন সাহিত্যিক মহান পর্বতমালা, বিশাল অরণ্য, বিরাট সমুদ্রকে নিয়ে টানাটানি করে না। সূর্যোদয়ের বর্ণনায় কালোর বুকে অরুণ রঙের প্রভাব কথা না বলে মিলের চিমনির প্রথম ধোঁযার কথা বলা হয়ে থাকে। কালো রঙে ডুবানো ব্রাশেব মতো বাতাসে আঁকা ধোঁয়া আকাশেব গায়ে চলতে থাকে। এখন গ্রোটেস্ক বা কিম্ভুতই আমাদের মনে ধবে, কিন্তু সেই কিম্ভুতত্বে কিছুটা ক্লান্তির ভাব থাকতে হবে। লাবণ্য আর প্রফুল্লতা বরং এই বিশেষ ধরনের গ্রোটেস্কের বিরুদ্ধে। নিটোল একখানি করপল্লব তারই হতে পারে যে সংসার সম্বন্ধে শিশুব মতো চিন্তা কবে। আমাদের এই বর্তমানে যার মন শৈশব-সারল্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ সেটা ছাড়া আব সবাই কিছু না কিছু হতাশা অনুভব করছে। তার পক্ষে হাত দুখানা কিছুটা শির বার করা হওয়াই মানানসই হবে। অনেক কিছুব মুখোস খুলে গিয়েছে বলে মুখোসেব তলে আমরা কতটা ক্লান্ত তা ধবা পড়ছে।

আব কখনই মানুষ এমন প্রত্যক্ষভাবে ইন্টেলেক্চুয়াল হওয়ার চেষ্টা করেনি এখন যেমন করছে। যেহেতু ইন্টেলেকচুয়াল হওয়া বযস আব অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সাহিত্যে বয়ঃসন্ধিকালের নায়িকা অনেকদিন আগেই লোপ পেয়েছে। এখনকাব সমাজেও উদ্ভিন্নযৌবনা অষ্টাদশীরা প্রেমপাত্রী হিসাবে নয়, ছাব্বিশ বরং, এমন কি অভিজ্ঞতার ছাপযুক্ত ত্রিশের দিকে।

এখন আমরা ফ্রিজে রাখা ফল পছন্দ করি তা নির্বীজ হলেও।

ভূদেব বলল, 'আ, ধন্যবাদ ভূধর। শোন, রাজেন, আমাদের বন্ধু বলছিলেন আজকাল আর্ট থিয়েটারে

নাকি কেউ কেউ ইনকামট্যাকসকেও বিষয় হিসাবে উপস্থিত করছে। এ বিষয়ে কী ফীচার লেখা চলে, রাজেন?'

রাজেন বলল, 'অনেকটা প্রভাব আছে ইনকামট্যাকসের। তা আমরা স্বীকার করতে পারি না।'

ভূদেবের নিজের হয়তো আয়কর বিভাগের সেই খামগুলোর একটির কথা মনে পড়ল। যার একটি নাকি যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে রকেট বৃষ্টির মধ্যে এক ক্যাপটেনকে খুঁজে বার করেছিল। তেতো দেখাল তার মুখ। সে বলল, কিন্তু তাই বলে সাহিত্যেও?' রাজেন বলল, 'সমাজের ওপরে কতখানি প্রভাব ইনকামট্যাক্সের তা আমাদের চাইতে ভূধরবাবুই ভাল জানবেন।"

কিন্তু ভূধর হাতঘড়ি দেখল।

বলল, 'সে আর একসময়ে কি বল, সমাদ্দার। এখন বরং প্রস্তুত হয়। রাজেনবাবুর স্বাস্থ্য ভাল। আর্লি ডিনারের অভ্যাস আছে। বিশেষ করে যখন তুমি হোস্ট। এখন বরং পোশাক পাল্টে নাও।'

ভূদেব বলল, 'ঠিক বলেছ, সুইট রিমেমব্রান্সার। ঠিক তাই, রাজেন, তাই। যদি তা বল আমরা পথে বেরিয়ে এমনকি আমাদের ব্যালকনিতে আলাপ করতে পারব। তোমার লেখা এখনও হবি। সে জন্যই বারবার বলছি তুমি চেষ্টা করে দেখো ইনকামট্যাক্স—লাইফকোর্স, অথবা বহুর মৃত্যুভয়ে ভীত এই দুটো বিষয়ে ফীচার লেখা যায় কিনা। সাড়ে তিনশো রইল পার ফীচার। পরে রেট্ বাড়বে, কি বল? আচ্ছা আমি পোষাক পাল্টে নি।'

রাজেন বলল, 'আপনি আমার পক্ষে অত্যন্ত দ্রুতচিন্তায় অভ্যস্ত। দেখা যাক কি হয়। আপনি তৈরি হতে হতে বরং আমি এই ব্লকেই কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করি আসি। দশ মিনিটেই আসব।'

'অবশ্য', বলে ভূদেব নিজেও পোশাক পালটাতে গেল।

রাজেন অবশ্য সিনেমা অভিনেত্রী মাধবী ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। তাকে বলেছিল রাজেন, এ পাড়া থেকে যাবার আগে জানিয়ে যাবে। ফীচার লেখার কথা মনে এল রাজেনের। যে দুটো বিষয় আলাপে উঠে পড়েছে সে দুটোই ফীচারের উপযুক্ত। অবশ্য বোধ হয়. হবে। আগেকার ফীচারটার কথা মনে পড়ল।

লিফ্‌ট্ দোতলায় লাগতেই হঠাৎ মনে হল রাজেনের। আশ্চর্য আশ্চর্য। ফীচারে যাকে রূপের মান হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে সে, তার মধ্যে, সেই রসিকতার আড়ালে আকর্ষণীয় রূপ সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাই প্রকাশ করে ফেলেছে, আরও আশ্চর্য যে তার সঙ্গে মাধবী ঘোষালের রূপের মিল আছে। তাহলে মাধবী ঘোষালের সিনেমাটা দেখেই কী ফীচার ঝোঁক এসেছিল তার মাথায়। তা হলে সে তো মাধবীর রূপের প্রশস্তি। নিজের এই আবিষ্কারের সে অবাক হয়ে গেল। তার মনে পড়ল আজ সারাদিনে মাধবীকে কিরকম দেখিয়েছিল। ভারি সুন্দর খুবই সুন্দর

পোশাক পরতে পরতে ভূদেব বলল, 'আচ্ছা, ভূধর, উইলটা খুব খারাপ কিছু নয় তাই নয়? মানে ক্লাসিক সাহিত্যেও তার উল্লেখ আছে যেমন বিষবৃক্ষে।' ভূধরের লজ্জা তার মুখেও প্রকাশ পেল। এই রকমই সাধারণ হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি কোন উপগ্রহের সাহায্যে কত ঘড়ির কাঁটায় ঠিক কটায় প্রথম স্পেস্ টেলিকমিউনিকেশন সংযোগ স্থাপন করে গিয়েছিলত' বলেছে এখন সেই বিষবৃক্ষে উইল খোঁজ করছে।

ভূধর বলল, 'থাক, ভূদেব, থাক। মৃতদের শান্তিতে থাকতে দাও এই বলে সে হাসল। ভূদেব বলল, 'আদৌ নয়, তুমিই কি তা দিচ্ছ। তুমি আজ উইলের জটিল ভগ্নাংশ ভাবতে ভাবতে ঘরে এসেছ। এবং কথা উঠেছে তোমার মনে। আমার আন্দাজ কি খুব বিপথগামী হবে? তোমার তদন্ত অনুসন্ধানগুলোর মধ্যে একটা খুব বড় রকমের উইল এবং কেস এসে থাকে।'

ভূধর বলল, 'তা তোমাকে বলতে পারি। ঠিক অনুসন্ধান নয়, কিছুদিন আগে চোখে পড়েছিল বটে ডেথ ডিউটির অঙ্কটা। তবে ফাঁকি না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ শুরু হয় না তাতো জানোই। এখানে ঢুকেই বরং ব্যাপারটা মনে পড়ল, তোমার ঘরের আসবাবে সুবাক্‌সিন ছড়াছড়ি দেখে।'

'চমৎকার! সৌরভ পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিও না, ম্যান। টাকার অঙ্কটা বেশ বড় কিছু হবে। সুরঞ্জিত

তলাপাত্রের কথাই বলছ নিশ্চয়, তার উইল আর কি। তা সুরাক্‌সিন যত টাকা বৈদেশিক অর্থ অর্জন করে তার একটা অংশ বয়্যালটি হিসাবে পেত। শতকরা এক টাকা হলেও সেটা মাঝারি বড একটা জয়েন্টস্টক কম্পানির লাভের অঙ্কব চাইতে কম নয়। আর একটু বল।'

'সুরাক্‌সিনকে সিনথেটিক লেদার বলা হয়, কেমন কি না?'

'তা হয়।'

'অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপাযে প্রস্তুত মবা চামডা।'

'বাচ্যার্থ তাই। কিন্তু উইলের কথা কি বলছিলে না?'

ভূধর বোধ হয় চিন্তা করে নিল কতটা বলা যায। বলল, 'আচ্ছা কতদিন হল সুরঞ্জিতের মৃত্যু হযেছে বলতে পাবে?'

ভূদেব বলল, 'এক মিনিট।' সে শার্টেব বোতাম লাগাতে লাগাতেই তার বুবোড্রয়ার্স খুলতে অগ্রসব হল।

ভূধর হেসে বলল, 'তোমাব মতো একজন সাংবাদিকের বুরোড্রয়ার্সে সুরঞ্জিতের ইনডেকস্ কার্ড থাকবে, তাতে তার জন্মমৃত্যুর তারিখ, সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাব সম্বন্ধে কোন পত্রিকা বা পুস্তকে কবে কি আলোচনা হয়েছিল তা সবই লেখা থাকাব কথা। কিন্তু অতটা দরকার নেই। মোটামুটি বছর দু-এক হল কি বল।'

'তা হল। দু বছরের দু একমাস বেশি হবে। এটা সেপ্টেম্বর, তা দু বছব তিন মাস চলছে বলতে পাবো।' ভূদেব করে গুণে নিল।

'তুমি নিজেই একটা জীবন্ত ইনডেকস। তাব সম্পত্তির একটা হিসাব নেয়া হযেছে। ডেথ্ ডিউটি কত হতে পাবে তাব প্রাথমিক অঙ্ক কষা হযেছে। কিন্তু উইলেব প্রবেট নিযে কেউ সামনে আসছে না।'

'বলো কি?' ভূদেব বেশ উত্তেজিত হযেছে বোঝা গেল।' খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিংবা তুমিই তো খোঁজ নেবে। যদি সংবাদটা আমার কাজে লাগার মতো মনে কব, অথবা তুমি আব বাছাই কবার কষ্ট করো না। যা কিছু পাবে 'র' পাঠিযে দিও। তুমি কত চাও বল?'

ভূধব হাসল। দু আঙুল ক্ল্যারাট ঢেলে নিল। বলল, এখন এ বিষযে আমাব কোন কর্তব্য নেই, ডেথ-ডিউটি ফাঁকি দিলে আমাব কাজ শুরু হবে।'

আযনার সামনে দাঁড়িয়ে বো বাঁধল ভূদেব নিঁখুত কবে।

বলল। 'তাও বটে ক্ষুধাও পাচ্ছে। টাকার অঙ্ক নাই বললে একস্‌চেঞ্জ ইনফবমেশন হিসাবেও হতে পাবে। এই যে রাজেনও এসে গেছে।

বাজেনের যতটা সময় লাগার কথা তাব চাইতেও কম সময়ে সে ফিরে এল। মাধবীব ফ্ল্যাটের ঘণ্টার সুইচ্ টিপতেই হাউসকিপার সুবঙ্গমা সাড়া দিযেছিল। দবজা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু মাধবী নিজে ছিল না। সুবঙ্গমা বলেছে মাধবী মার্কোস স্কোয়াবে গিয়েছে, বলে গিয়েছে বাজেনবাবু এলে এ খববটা যেন তাকে দেযা হয।

ভূধব বলল, 'তাহলে আমবা এখন বেরুতে পাবি।'

রিস্কো ক্লাবটার বয়স ত্রিশ বছর হল। ক্লাবের অনেক সদস্য আছে যারা আশা কবে ক্লাবটা তিনশ' বছব বাঁচবে। আর এই সমযেব মধ্যে কোন কোন সদস্য নিজেব স্মৃতিকথা লিখবে তাতে ক্লাবের আনন্দিত উল্লেখ থাকবে, এবং সেই স্মৃতিকথা থেকে সমাজের যুগপরিবর্তনেব ধবণ ধারণাগুলোকে বুঝতে পারা যাবে যেহেতু সদস্যদেব অনেকেই নিজের নিজেব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি।

একটা আটতলা ব্লকেব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলা অধিকাব করে ক্লাব। সদস্যদেব একটা গণনীয় সংখ্যা ক্লাবে লাঞ্চ কবতে আসে। ক্লাব-ডের কথা বাদ দিলে ডিনারের সংখ্যা তাব চাইতে কম নয়। ক্লাব-ডে ডিনারে অবশ্যই তিল ধাবণেব স্থান থাকবে না। সুতরাং দোতালার বড হল ঘবটায় ঢুকে পডলে একটা বিশিষ্ট হোটেলেব কথা মনে হবে। হয়তো ব্যান্ডস্ট্যান্ডটা একটু নতুন রকমে সাজানো। ক্লাবের নিয়ম অনুসারে দরজায প্রাইভেট লেখা থাকা সত্ত্বেও ক্লাব-সেক্রেটারিয়াটের অনুমতিসাপেক্ষ অসদস্যরাও এখানে অর্থাৎ এই বড় হলে আসন খালি থাকলে লাঞ্চ বা ডিনার করতে পাবে। কিন্তু হলের এদিকে ওদিকে যে ছোট

হল আছে সেখানে অথবা ব্যালকনিগুলিতে ডিনারের অধিকার ক্লাব-সদস্য ছাড়া আর কারো নেই। তেতলা পুরোপুরি প্রাইভেট। সেখানে সদস্যরাই যেতে পারে, তাদের অতিথিরাও যেতে পারে না। নীরবতা অথবা নিঃসঙ্গতা অনুভব করার জন্য অথবা ধ্যান করার জন্য (তা রাজনৈতিক অথবা সমাজতাত্ত্বিকও হতে পারে) কোন কোন সদস্য কখনও কখনও তেতলায় কোন ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এমন একজন সদস্য এখনই আছে যে গত ছ সপ্তাহ থেকে নিজের মহার্ঘ্য ফ্ল্যাট ছেড়ে তেতলার ইজিচেয়ারে কাটাচ্ছে।

ক্লাবের আহারাদির ব্যবস্থা ভালো। কিন্তু আমাদের পূর্বকথিত সঙ্কল্প অনুসারে ডিনারের কাঁচাচামচ ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলব না।

যেহেতু তিনজনের ডেনার সেক্রেটারির অফিস একটা গোলটেবিলের ব্যবস্থা করেছিল। ওয়েটার আসতেই ভূদেব বলল, স্টক্। এই পানীয় দিয়েই শুরু হল। ডিনারে বসার ভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। ভূদেবের গলায় ন্যাপ্কিন বেঁধে বসার ভঙ্গি থেকে তাকে বহুভোজী মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা বিপরীত। আহার করার চাইতে আহার সম্বন্ধে গল্প করাটাকেই সে ডিনার মনে করে। ভূধর ন্যাপকিন কোলের উপরে বিছিয়ে বসেছিল। লক্ষ্য করা গেল ঝাঁঝালো স্বাদের আহার্যে তার আকর্ষণ কম। রাজেন তার বয়সের ধর্ম অনুসারে যে কোন ধরনের ডিনারের সদ্ব্যবহার করতে পারে। আলাপটা এদিক ওদিক ঘুরতে খবরের কাগজের সংবাদে পৌঁছাল। মন্ত্রীমহোদয়ের মধুচক্র সম্বন্ধে সংবাদটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

এই আলাপের একসময়ে ভূধর বলল, 'কেন যে আজকালকার দিনে নানারকম সংবাদকে সংবাদ মনে হয় কারো কারো ভাবতে অবাক লাগে। আমি তো বলেছি ও আর স্ক্যান্ডাল নয়।'

'তাই নাকি?' ভূদেব বলল।

'তাই নয়? এটা কি যথেষ্ট কেলেঙ্কারি? মন্ত্রীমহোদয়কে একটা মানুষই মনে করতে হবে তো? বল। কম বয়স হলে বলতাম বয় মিটস্ এ গার্ল। একে কি বলব? সেক্সপীয়ারের ভাষায় বুড়ো লম্পটের কামনার অন্ধকারে জোনাকির মতো। কিংবা বলব পিঁজরাপোলের বুড়ো ঘোড়া ছ্যাকড়া টানা ঘুড়িটাকে দেখতে পেয়েছে, শেয়েরটির বয়স কিছু কম এই যা।'

ভূদেব হাসল। হেসে বলল, 'তাহলে ওটাকে এখন আলাপের বাইরে রাখো। দেখা যাক।'

ডিনারের মাঝামাঝি একটা মৃদু কৌতুকের ব্যাপার হল। বক্তৃতার ঢঙে কেউ কথা বলছে এমন শুনতে পাওয়া গেল। ব্যালকনিগুলো এমনভাবে সাজানো যে অনায়াসেই হলের ব্যান্ডস্ট্যান্ডটা চোখে পড়ে পর্দার অন্তরালে। বড় টেলিভিসন পর্দায় আমাদের পূর্ব-পরিচিত সংস্কৃতি-সেমিনারের বক্তৃতা দেখানো হচ্ছে।

ভূধর বিব্রত বোধ করে বলল, 'খাবার সময়ে এ সব ঝঞ্ঝাট মনে এলে হজমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তেই টেলিভিসনের পর্দায় ভূধরকেই দেখা গেল বক্তৃতা দিতে। ভূধর সলজ্জভাবে বলল, 'এতে আর কিছু না হোক নিজের বক্তৃতার ভঙ্গিগুলোর ত্রুটি নিজের চোখে ধরা পড়ে।'

রাজেন ভূধরকে সংবর্ধনা জানিয়ে বলল, 'এতে মানে এই টেলিভিসনে রেডিওতে যা হয়েছিল তার চাইতেও পড়ার অভ্যাস কমে গেলেও দু এক ক্ষেত্রে সত্য কথা শুনতে পায় লোকে। এটা ভালো।'

সে ভাবল ভূধরবাবুর মতটাকে সে সমর্থন করতে পারে।

সে আবার বলল, 'এখন সব চাইতে আলোচিত বিষয়ই সংস্কৃতি।

ভূদেব বল, 'কিন্তু, ভীধর তুমি কি বলতে চাও বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বলতে কিছু কল্পনা করা কষ্ট-কল্পন?'

ভূধর আর একবার মনে করিয়ে দিল করে কোন এক বৃদ্ধা মহিলা তাদের দুজনকে গোরা-বিনয়ের অপবাদ দিয়েছিল। বলল, 'ক্লাবে রান্না সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার।'

পর্দা টেনে দিয়ে তারা আহারে মন দিল।

ভূদেব তার পুরনো কথায় ফিরে এসে বলল—'থাই অব দি নিম্ফ অ্যাট ডন্ শুনতে যাই মনে হোক, বুঝলে রাজেন, তা কিন্তু ক্রিম স্যাম্পেন সহযোগে পরিবেশন করা ব্যাঙের ঠ্যাং।'

ভূধর বলল, 'সেই উষায় দেখা বনবালার উরুদেশ খেতে কি রকম?'

কিন্তু, প্রিয় পাঠিকা, নিতান্ত সময়ের অভাবে মুখরোচক অনেক আলোচনাকেই বাদ দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। যেমন নানা রকমের আহার সম্বন্ধে ভূদেবের আলাপ।

ডিনার শেষে তাদের সিনেমা বা পেট-নাচ দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব ছিল। অন্য অনেকে ডিনারের শেষে সিনেমা এবং পেট-নাচ দেখার পর নিজেরাও কোথাও নাচে কোন নাইটক্লাবে। কারণ রাত আটটায় ডিনার শেষ করে রাত তিনটেতে ফ্ল্যাটে ফেরার মধ্যে অনেকটা আলগা সময় হাতে থাকে।

ডিনার শেষে প্রায় এক ঘণ্টা পবে ভূদেব প্রভৃতি ক্লাবের নিচে ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। আকাশের যে টুকু চোখে পড়ল তার রং কালো। চাঁদ উঠেছে মনে হল কিন্তু মেঘে ঢাকা। তারাগুলো অস্পষ্ট। স্মগের দৌরাত্ম্য ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। সেজন্যই তাবাগুলো অস্পষ্ট এবং দূরের নিওন টিউবগুলোকে কুয়াশা ঢাকা মনে হচ্ছে।

তারা ট্যাক্সির খোঁজেই দাঁড়িয়েছে। এটা একটা প্রযোজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নিজের গাড়িতে ডিনারের জন্য যত লোক বার হয় তত লোকই ট্যাক্সিকে পছন্দ করে। কারণ নিজের গাড়ি পার্ক করার দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ঘটনা যা বাইবের সময়েব অধিকাংশকে গিলে ফেলতে পারে ট্যাক্সি নিয়ে তা সব এড়ানো যায়।

কিন্তু সিনেমা, নাইটক্লাব, অথবা হিপোড্রোমে সেই বিবস্ত্র পেট-নাচ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা তাবা কাজে লাগাল না। দেখা গেল রাত্রিতেই ভূধর কোথাও অনুসন্ধানে যাবে। সে ভূদেবকে নিমন্ত্রণ করল না বটে কিন্তু সে যেখানে যাবে সেখানে সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ থাকতে পারে এরকম ইঙ্গিত করল। এবং তা শুনে ভূদেব বলল—তার হাতে যখন কাজ নেই তখন কিছুক্ষণ সে ভূধরেব সঙ্গী হতে পাবে। হিপোড্রোমেব বিবস্ত্র নাচ সম্বন্ধে বাজেনের মত আমরা আন্দাজ কবতে পারি। সে থিয়েটাবের নটনটীকেও দেখতে চায় না তাদের সাজ শেষ হওয়ার আগে।

ট্যাক্সি আসার আগে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল।

ভূধর হঠাৎ বলল ডিনাব-আন্তিক চুরুট চিবুতে চিবুতে, 'আচ্ছা, ভূদেব, এই মন্ত্রীমহোদযেব কেলেঙ্কারিটা কি বলো তো ঠিক। যদি মনে থাকে, এই তৃতীযবার বলে ফেললাম।'

'সে তো কাগজেই দেখেছ।'

'ঠিক তা নয়, তবে, মানে—'

ভূদেব এবং ভূধর পরস্পবেব দিকে তাকিযে কিছুক্ষণ দাঁডিযে রইল। সেই মুহূর্তে বিচক্ষণ কেউ তাদেব লক্ষ্য কবলে অনুভব করতো তারা যেন দুজনেই দুজনাকে দেখে অবাক হযে গিয়েছে, প্রাথমিক চমৎকাবিত্বেব পর দুজনের মুখের বেখা বৈশিষ্ট্যগুলোকে মুখস্ত কবার চেষ্টা কবছে। অথবা যেন ডিটেক্‌টিভ নম্বব 'ক' ডিটেক্‌টিভ নম্বব 'খ'কে যাচাই করার চেষ্টা কবছে।

ভূধর হাসল, 'আচ্ছা, কি বলো?'

'তা, দেখো, কেমন কি না?'

ভূদেব অনুভব করল, ভূধর যে মন্ত্রীমশাযের কিংবা মন্ত্রীসভাব পক্ষ থেকে সংবাদের উৎস অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে হাসল। একটা ট্যাক্সি দেখে সে ইঙ্গিত করল। ট্যাক্সিটা থামতেই রাজেনকে তুলে দিল।

ভূধর অনুভব করল, 'বলা যায় না এখনই, তবে ভূদেবের সংবাদ সিন্ডিকেট যে এব মধ্যে থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে।' দ্বিতীয় ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে সে বলল, 'এসো ভূদেব।'

সে ভূদেবের মন্যাকল্ আঁটা চোখটাকে লক্ষ্য করল।

রাজেনের কথা না বললে পরিচ্ছেদটাকে শেষ করা যাচ্ছে না।

নিজেব এক কামরার ফ্ল্যাটে ফিরে সে জামা খুলল, জুতো খুলল, কিন্তু গুছিয়ে রাখবাব অবসর পেল না। ফ্যান খুলে দিল। বেসিনের কল থেকে আঁজলা করে জল খেয়ে ট্রাউজার্সে হাত মুছল। টেবলে গিয়ে বসল। স্তূপাকার বই ঠেলতে ঠেলতে সে বিড়বিড় করে যেন বলল, সরো সরো তোমাদের ছোটভাইকে একটু কাগজ পাতবার জায়গা দাও। ঠিক নয়, নোটস নেয়া ফীচারের জন্যে। সে শর্টহ্যান্ডে লিখল

সাহিত্যে আয়কর বিভাগের কথা লেখা হয় নি, অথচ আয়কর দেয়া হয় এমন অনেক লোকের কথা লেখা হয়। আমাদের একটা ধারণা আছে, সাহিত্যে টাকার অঙ্ক লিখলে তা সাহিত্য থাকে না। অথচ টাকার

সুতরাং আয়করের কথা না বললে কি আধুনিক পুরুষ চরিত্র হয়? বঙ্কিমচন্দ্রের নগেন্দ্রনাথ আয়কর বিভাগের নোটিশ পায়নি। কৃষ্ণকান্তের উইলের উপর ডেথ-ডিউটি ধার্য হয়নি। নগেন্দ্রনাথ আয়কর বিভাগের মুখোমুখি হলে দ্বিতীয় সংসারের সাহস পেতো কিনা সন্দেহ করা যায়। আর নগেন্দ্রনাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে কিছু কালোটাকা সঞ্চয় করতে পারলে তার গোপন ব্যয় নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কুন্দকে বিবাহ না করে মিস্ট্রেস হিসাবে রাখতে চাইত আর ডেথ-ডিউটির চাপ থাকলে হয়তো রোহিনীকে কেউ উইল চুরিতে নিযুক্ত করতো না।

অন্যদিকে ফাঁকি দেওয়াটাকে যে আত্মঅবমাননা মনে করে আয়করের ব্যাপারে তারাও কিছুটা কম করে বলা অভ্যাস হচ্ছে। মন কোন একটা কাজ রপ্ত করতে পারলে সেটা সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারে। আয়কর ফাঁকির অভ্যাস অন্যত্র কাজে লাগতে পারে।

এই পর্যন্ত লিখে রাজেন খিল খিল করে হেসে উঠল।

ওদিকে দেখো আয়কর সুপারট্যাক্স ইত্যাদি মানুষকে উদার করে তুলছে। উনবিংশ শতাব্দী এমন কি বিংশ শতাব্দীরও গোড়ার দিকে উপন্যাসে পুঁজিবাদী বলতে এক শ্রেণীর শ্রমিকশোষক কৃপণকে বোঝাতো। এখনও কোন কোন সাহিত্যিক এ চিত্রটিকেই বহাল রাখছেন। কিন্তু তার কারণ তাঁরা সুপারট্যাক্স ইত্যাদিকে হিসাবের বাইরে রাখছেন। বর্তমানের এইসব টাইকুন কর্মচারীদের বাড়ি খরচ, বোনাস ইত্যাদির ব্যাপারে এত উদার যে কিছুদিনের মধ্যে পুঁজিবাদী বলতে নাই দিয়ে মাথা খারাপ করে এমন কাকামশায়কে বোঝাবে।

গোটি সত্ত্বেও রাজেনের মুখটা কোমল দেখাচ্ছে। তার হাসিটা প্রায় অনেক কমবয়সী মেয়েদের হাসির মতো কোমল।

সে লিখল, দেখো, ভালোবাসা বলতে বেশির ভাগ বিরহের মধ্যে অল্প কিছু সম্ভোগের স্বাদ বোঝাত। এখন রেলওয়ে, সাবওয়ে, এরোপ্লেন কথায় ট্রান্সপোর্টের ফলে বিরহ কাল্পনিক ব্যাপার। ভালোবাসা বলতে এখন প্রেম করা বোঝায়। চিন্তার অভ্যাস শতকরা নব্বুইটা ক্ষেত্রে আমাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি আমাদের চরিত্রকে নির্ধারিত করছে। অনুরূপভাবে আয়করও হয়তো।

একদিনের পক্ষে একটিই ভাল। রাজেন উঠল সিগারেট ধরাল। একটা বই খুলতে গেল। কিন্তু তা না খুলে ভাবল। তার মুখটা করুণ হল। মৃত্যু এই শব্দটাই যেন তার মনে ঘুরে বেড়াল, মৃত্যু, মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ের সঙ্গে আত্মহত্যার কি সত্যি যোগ আছে কোন কোন ক্ষেত্রে?

রাজেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, তুমি কি ঐন্দ্রিলা চৌধুরীর ঘটনাটা জানো? যদিও এখনও সেই আত্মহত্যার ঘটনাকে সাহিত্যে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া, সাহিত্য-মেলাঙ্কোলিয়া বলেই সকলের ধারণা . কিন্তু ভূদেব সমাদ্দারের সিন্ডিকেট এরকম একটা ইঙ্গিত করেছিল অসুখী দাম্পত্যবন্ধন। আঠারো থেকে আটত্রিশ বাসব চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ বৎসর সাহিত্যিক-সখ্য এবং অবিবাহিত দাম্পত্যজীবন কাটিয়ে হঠাৎ তারা তাদের বিবাহটাকে রেজিস্ট্রি করতে গেল কেন এমন কথা বলেছিল সিন্ডিকেট। আর তার দু বছরের মধ্যেই কী এমন সুগভীর মনঃকষ্টে পীড়িত হল ঐন্দ্রিলা যে তাকে আত্মহত্যা করতে হবে? ঐন্দ্রিলার চেহারাটা মনে পড়ল। সুগঠিত চেহারা ছিল তার। কিন্তু পুরুষের মতো কাটা চুল, টাই ও শু সমেত পুরুষের পোষাক, শেষের দিকে চুরুটও থাকত মুখে। একজন স্ত্রীলোক বিশেষ করে যে মৃতা তার সম্বন্ধে এমন ঘনিষ্ঠ আলোচনা করা উচিত কিনা বুঝতে পারছি না। পনের বছর আগেও স্ত্রীলোকদের মধ্যে পুরুষের মতো নির্ঝঞ্ঝাট হওয়ার জন্য চিকিৎসিত হওয়ার প্রথা ছিল। সহজ, খুবই সহজ অস্ত্রোপচার। তার ক্ষেত্রে সেটা হয়তো অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বলেই তার গায়নোকোলজিস্ট বলে থাকবে, নতুবা বিশ বৎসর পরে অন্য কী আগ্রহে তারা তাদের অবিবাহিত দাম্পত্য-নৈকট্যকে বিধিসম্মত করতে যাবে। আর তারপরে কি ঐন্দ্রিলা বুঝতে পারল তার সেটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে চিকিৎসকের অপটুতায়?

রাজেন অনুভব করার চেষ্টা করল, ঐন্দ্রিলার সম্বন্ধে এই ধারণা সত্য হলে তার মনোভাব কী রকম হয়েছিল তা বুঝবার জন্যে নিজের মনের গভীরতম অংশে সমবেদনা নিয়ে পৌঁছুতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু লাভ হল না। বোধহয় বয়সের পার্থক্য এ বিষয়ে কাজ করছে।

একটা তুলনা দেয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তাও খুঁজে পেল না। তখন সে উঠে বেসিনের ট্যাপ খুলে, জলের ধারায় হাত পেতে মুখ নীচু করে জল খেল। এখন ঘুমোলে মন্দ হয় না।

কিন্তু তুলনাটা তার জানলার উপরেই ছিল। টবে বসানো একটু পাতাবাহার। সারা বছর রঙিন পাতা দেখা দিচ্ছে, ঋতুতে ঋতুতে পাতার রং বদলায়। ফুলের মতো পাতা। ছোট গুঁড়িটা ছেয়ে অজস্র ফুলের কুঁড়ি বার হয় কিন্তু একটু বড় হলেই সেগুলো আরও রঙিন পাতা হয়ে ওঠে। দু-এক বছর গুঁড়িটায় একটা চুলের মতো ফাটল দেখতে পাবে। সেই ফাটল ভেদ করে একটা পল্লব দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে পল্লবের সবুজ পাতাগুলোর মধ্যে একটা মোচা ফলে। যে আগ্রহে রঙিন পাতার বাহার, আর যে আগ্রহে সবুজ পাতার আচ্ছাদনে মোচা দেখা দিয়ে থাকে—তারা পৃথক। কিন্তু দু'এক বছরে একবারই মাত্র।

অবশ্য এটা আধুনিক বোটানিস্টদের কৃতিত্বের চিহ্ন, ড্রয়িংরুমে পিতলের টবে বসানো তিন ফুট উঁচু ঝুরিনামানো বামন বট যেমন। স্বাভাবিক অবস্থায় নাকি এই পাতাবাহারের গুঁড়ি ভেদ করে যতগুলি কুঁড়ি বার হয় ততগুলো মোচা ফলে থাকে। রাজেন বিছানায় গিয়ে বসল। ট্রাউজার্স টেনে খুললো।

ছোট দেয়াল ঘড়িটা মৃদু ধাতব শব্দ তুলে রাত একটা বাজল। হঠাৎ আবার ইনকামট্যাক্সের কথা মনে হল রাজেনের। আর সে হেসে ফেলল।

টেলিফোনটা বেজে বেজে নিজে থেকেই থামল।

প্রবীর পোষাক খুলে ঘরের গাউন চাপালো গায়ে। সোফায় পায়ের উপরে পা তুলে বসল। পাশের দিকে তাকাল যেন সেখানে কিছু আছে। একটু সরে বসল যেন ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

সে বরং একটু অসুবিধাতেই পড়েছে।

পায়রা কয়েকটির মতো সে ছটফট করছে মুক্তির জন্য কিন্তু তার সেই মুহূর্তটাও যেন চিরকালের জন্য সেই চটের থলের অন্ধকারে বন্দী হয়ে গেল। মানুষের হাত যে অত কালো দেখাতে পারে, তার আঙুলগুলো কালো প্যান্থারের দাঁতের মতো হিংস্র তৃপ্তিতে ঝক্ ঝক করতে পারে তা প্রবীর জানতো না। ছোলা মটর বিছানো রকের উপর গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে নিমেষের মধ্যে ছোঁ দিয়ে প্রথম পায়রাটাকে ঝোলায় পুরে আবার হাতটা রকের ধারে রোদ পোয়াতে শুরু করল। ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে দ্বিতীয় পায়রাটা এগিয়ে গেল ছোলা মটরগুলোতে দেখতে। তখনই আবার

ছটফট করে উঠে দাঁড়াল প্রবীর। না, না, তার কিছুই করার নেই। তুমি বলবে ক্ষুধা, তুমি বলবে নিচের তলার দারিদ্র্য, তুমি বলবে উপরতলার পাই এর যোগান। তাহলেও, তা সত্ত্বেও কোথায় লাগল না? আর এমন কোন আইন নেই যার জোরে গাছ থেকে যারা ফুল ছেঁড়ে, কিংবা মনুমেন্ট থেকে পায়রা সরায় তাদের এ শহর থেকে কিংবা রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা যায়।

তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিল প্রবীর। নিতান্ত অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তাকে। রৌদ্র উজ্জ্বল পায়রা চমকানো আকাশের নিচে পায়রার মনুমেন্টের গোড়ার কাছে এমন কালো নিঃশব্দ হিংস্র হাত হয়তো চিরদিনই আছে। নতুবা পৃথিবী তেমনভাবেই রোমান্টিক হতো যেমন ভুল ধারণা হচ্ছিল প্রবীরের তখন।

থিয়েটারে আজ সে যাবে না। তাহলে? সেখানে আজ সুরথ নতুন অভিনেত্রী নিয়ে পরীক্ষা করবে। আর হয়তো এ নাটকটার জন্য কোন সন্ধ্যাতেই যেতে হবে না থিয়েটারে। মাধবীকে দিয়ে যা হয়নি নতুনটিকে দিয়ে তাই হবে এমন মনে করার যুক্তি কোথায়। মাধবী সুন্দরী, আধুনিক সৌন্দর্যের মাপে তো বটেই। কিন্তু তার সৌন্দর্যই অভিনয়ের অন্তরায় হচ্ছে এ রকম একটা চিন্তা যেন আছে সুরথের চিন্তায়।

মনে হল একটু ভাববে প্রবীর। অন্তত চিন্তার সূচনাটা হল। সৌন্দর্য অভিনয়ের অন্তরায়, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পিত পরিচ্ছন্নতাও তাই—এটা কি সেই যাদুভীতিরই আর এক চেহারা যে যাদুর থেকে দূরে থাকার জন্য কবিতা বিরস, কুরব, উপন্যাস অ্যান্টিনভেলে পরিণত?

কিন্তু চিন্তার দিকে যেতে চায় না প্রবীর। তার মনের অবস্থাটাকে বোঝাতে হলে বলতে হবে সে যা অনুভব করছে তাকে একটিমাত্র বিদেশী শব্দেই প্রকাশ করা যায়। অনুঈ। সেটাই লাগসই।

অবশ্য, প্রবীর, ভাবল, লোকে বলতে পারে তোমার নিজের ভাষার কোন শব্দ দিয়ে কেন প্রকাশ করতে

পারছ না। উত্তরটা খুব সহজভাবে দেয়া যায়। হোটেল, ক্লাব, অটো, নানাবিধ গ্যাজেট, নানা রকমের খাবার এবং পানীয়, যেন প্রায় সব দেশেই এক হয়ে গিয়েছে এখন। সে সব যেমন গোড়ায় বিদেশ থেকে এসেছিল এই শহরে। মনের এই অবস্থাকে, যা হয়তো বিদেশ থেকে এসেছিল, বোঝাতে এখন বিদেশী শব্দটাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এবং এটাও অনূঈ-এর একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষণ যে এখন তোমার মনে যা আসবে তা ভোঁতা হতে বাধ্য ; রসিকের মতো উজ্জ্বল বা সিনিকের মত ধারালো কিছু ভাবতে পারলে তো অনূঈ কেটেই যায়।

সোফা থেকে উঠে খবরের জার্নাল রাখার টেবলটার দিকে এগিয়ে গেল প্রবীর। কেউ যত্ন করে গুছিয়ে রাখেনি কিন্তু একের পরে এক রেখে দেয়ার ফলে একটা প্যাটার্ন হয়েছে বটে। জার্নালগুলোর মোড়ক খোলা হয়নি আর দৈনিক কাগজগুলো—প্রবীর যেন বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল। তাহলে এই মাস দুয়েক দৈনিক কাগজগুলোকে ছোঁয় নি। অন্য সময়ে হলে হয়তো বলে ফেলত, বাঃ বেশ হয়েছে তো।

কিন্তু এখন সে বরং তিনচারদিনের কাগজ টেনে নিয়ে সোফাটায় বসে গেল।

তা খবরের কাগজকে তুমি অবহেলা করতে পারো না, যদিও তুলনাটা লাগসই হচ্ছে না। ঘুমের পরে হাত পা টানটান করে, হাই তুলে না নিলে যেমন নিজেকে জেগেছি বলে মনে হয় না, খবরের কাগজ পড়াও তেমন ব্যাপার। খবরের কাগজে ছাপানো সংবাদ, টিকাটিপ্পনি, বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিগত কলমের ব্যাপারগুলো ঘুমে মিইয়ে যাওয়া মনকে রোজ সকালে তাজা করে তোলে। কিংবা বোধহয় তারযন্ত্রের তুলনাই ভাল। যত ভালই হোক তাকে বেঁধে না নিলে কি সুর লাগে৷ খবরের কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে মন বেঁধে সমাজে পা বাড়ায় নাগরিক।

কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত! লুনা কর্তৃক চন্দ্রস্পর্শ। আচ্ছা, ও, আচ্ছা, মন্ত্রী মহোদয়ের, ছি-ছি, স্ত্রীলোকঘটিত . (এরা কি কিছুতেই বুঝবে না ওটা অপ্রাপ্তবয়স্কতার চিহ্ন?) সাংস্কৃতিক সেমিনার স্‌স্‌। প্রবীর চুরুট ধরালো। সেমিনারের সংবাদটা আদ্যোপান্ত পড়ে, মন্ত্রীমহোদয়ের স্ত্রীলোকঘটিত সংবাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে সে ভাবল এতে আবার রাজনৈতিক টানাটানির ব্যাপার আছে নাকি? তারপর মহাশূন্যযানের চন্দ্রাঘাতের খবরে পৌঁছাল। যাই বল খুব উঁচু ট্রাপিজের উপরে যখন সার্কাসনন্দিনী খেলা দেখায় তখন তাকে ভাল না লেগে উপায় নেই। বেশ কিছুদিন আগে এই অঞ্চলে সেই বোধহয় সর্বপ্রথম বলে ফেলেছিল এইসব উপগ্রহ হিটলারের রকেটের গায়ে গতরে বাড়া উত্তর পুরুষ। উদ্দেশ্যও কি বদলেছে? তা সত্ত্বেও সাধারণ ব্যাপার নয়। প্রকাশিত বিবরণটুকু পড়ল সে।

কিন্তু অনূঈর স্বভাবধর্ম এই মন চিন্তার খোঁজে শিকড় ছড়ায় না, যদিও এ সব সংবাদ সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে অসাধারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। অনূঈ-এর অ্যানাটমি যেন দেখতে পাবে এমন অনুভব করল প্রবীর। এ অবস্থায় একা একা টেবলে বাজে মদের তলানিসমেত একটা গ্লাস মুখে নিয়ে বসে দু তিন হাত পরিসর শূন্যে ভোঁতা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে গোঁফ চোমরানো যায়, আর কিছু নয়। অথচ ট্র্যাফিক আইল্যান্ডের গুলমোহরের স্তবকগুলোর কথা ভাব, কিংবা অর্ধেক সাজানো গ্যালারির সেই ছবিটাকে। হ্যাঁ, অবশ্যই, ছবিটা। ছবিটা কি সে নিজস্ব করতে পারবে? প্রবীরের নির্গতরক্ত মনে যেন আবার রক্তসঞ্চার হবে এরকম মনে হল।

প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। সে আবার খবরের কাগজে চোখ নামাল! আবার সেই উদ্দেশ্যহীন দৈনিকতাই, তারই তরঙ্গের উপরে ভেসে থাকা। অতীত দিন বাসি খবরের কাগজের মতো অর্থহীন, অথচ প্রতিটি আজ টাটকা ভাঁজ করা মৃদু সুগন্ধযুক্ত। আর তা ছাড়া প্রত্যেকের উদ্দেশ্যহীনতা উদ্দেশ্যহীনতা থেকে পৃথক।

কিন্তু এটা প্রবীরের ভুল ধারণা, কিংবা তার তৎকালীন মেজাজের নির্দেশক যে সে সবটা দেখতে পাচ্ছিল না যেন। এই উদ্দেশ্যহীন দিনমাত্রিক জীবনের লক্ষণই এই যে তুমি একা থাকতে পারবে না। একা থাকতে পারলে জীবনটাকে এক রকমের রোমান্টিক সন্ন্যাসে ভরে তোলা যেত। তরঙ্গের উপরে ভাসমান বস্তুগুলি যেমন পুঞ্জীভূত হতে থাকে এখানেও তেমনি সংযোগ যূথবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রাখে।

টেলিফোনটা আবার বাজল। প্রবীর উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল।

'কী আশ্চর্য বেলাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কখন ফিরলে? কটা বাজে বলো তো?'

হাতঘড়ি দেখল প্রবীর। বেলা তিরস্কার করলে এরকম দেখা তার অভ্যাসও বটে।

'দেখো ঠিক—' প্রবীর খুব সতর্কভাবে এগুল।

সেটা আর নতুন কথা কি? কিন্তু মিত্রা তো নতুন, অন্তত অনেকদিন পরে আবার এসেছে এদিকে, তার বেলাতে? সে ইতিমধ্যে একবার টেলিফোনে খবর নিয়েছিল তোমার।'

'যদি কিছু মনে না করো, বেলা, একটু বুঝিয়ে বলো।'

'আ, প্রবীর, তোমার টেবলের উপরে যেখানে এনগেজমেন্ট ক্যালেন্ডার তার কাছে কার্ডস্ট্যান্ডে কি মিত্রার কার্ডটা দেখতে পাচ্ছ না?'

'ধরো। দেখি।'

'তোমাকে আর কষ্ট করে দেখতে হবে না, প্রবীর। আটটায় ডিনার আর এখন সাতটা বাজে।'

'মানে?'

'তোমাকে একটু আগেই যেতে হবে। আমি আসছি বরং, পনের মিনিটের মধ্যে তোমার ব্লকে পৌঁছে যাচ্ছি।'

মাউথপিসটা হাতে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর। তার আগেই বেলা কেটে দিয়েছে।

মিত্রা? ও হ্যাঁ, মিত্রা। আজই এক সঙ্গে লাঞ্চ হয়েছে। অদ্ভুত। পরশুদিন একজন লিভারিপরা আর্দালি এসেছিল বটে কার্ড নিয়ে। তাকে দেখে প্রবীরের ধারণা হয়েছিল হয়তো কোন কলেজের কিংবা কোন স্কুলমিশনের কোন উৎসব হবে।

প্রবীর তখন শার্টটা বদলেছে, বেলা ঢুকে বলল, 'একি?'

ওয়াড্রোবের দরজা হাট করা। বেলা কথা না বলে এগিয়ে গেল, তার যেন স্থির করাই ছিল। সিপিয়া রঙের কোটটাকে বার করে আনল। নিজেই খুলে ধরল প্রবীরের হাত গলানোর জন্যে।

'রসো, রসো, সুরথ যাচ্ছে?'

'সে তো আজ আবার পরীক্ষা করছে নতুন অভিনেত্রী নিয়ে।'

'তা হলে আমার পক্ষে এটা স্বার্থপরতা হচ্ছে না?'

'না, হ্যাঁ, তা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পুরুষকে তা হতে হয়।'

কোট পরে প্রবীর সোফায় বসল জুতোর ফিতে বাঁধতে।

'ডিনারে আব কারা আসছে?' সাহস দেখিয়ে প্রবীর বলল।

বেলা একটা হাত আয়না আর ব্রাশ উদ্ধার করে এনে সামনে দাঁড়াল।

'অধ্যাপক ভল্‌কার্ট, অধ্যাপক শ্মূডার, শোভন সামন্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, সুরথ যাবে না, তুমি যাচ্ছ, অললায়নস্ বলতে পার।'

প্রবীরের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হল। বেলার হাত থেকে আয়না নিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রবীর।

'শোভন সামন্ত মানে যে হৃৎপিণ্ড না মস্তিষ্ক কিসে ছুরি চালায়?'

'হ্যাঁ। সেই। প্রবীর তুমি কিন্তু সেখানে এরকম—'

'কখনই না। কিন্তু তোমার সেই পীযূষও তো লায়ন।'

'অসম্ভব নয়। কী অন্যায় হবে মিত্রা যদি তাকে নিমন্ত্রণ করে থাকে? প্রযোজক হিসাবে তাকে লায়নই মনে করা হয় যতই তুমি পাগ্ বল।

গাড়িতে বসে বেলা বলল, 'এদেশে মিত্রা ধরতে গেলে এই প্রথম ডিনার দিচ্ছে। আর তোমার মনের মতো হবে। কক্‌টেইলের বদলে আনারস আর কমলার শরবৎ। নিরামিষ ডিনার। ওয়াইন হিসাবে পোর্ট থাকবে।'

প্রবীর ভাবল এটাই উদ্দেশ্যহীন দৈনিক পৃথিবী। দুটি নারীর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ দেখা দিয়েছে এখন।

কথা বলার জন্যই সে বলল, 'এটা কি খানিকটা উন্নাসিকতা হল না এই নিরামিষ ডিনার? আর পাগ্‌ও যদি যায়—'

বেলা আশা করছিল প্রবীর কথা বলবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে বলল, 'কি থেমে গেলে যে? ডিনারে পৌঁছানো পর্যন্ত পীযূষ সম্বন্ধে তোমার যা কিছু বলার আছে বলতে পার।'

প্রবীর বলল, 'তা নয়, আমি মিত্রার কথাই ভাবছি। আজই এক সঙ্গে লাঞ্চ হয়েছে। অদ্ভুত না?'

বেলা বলল, 'আদৌ নয়। আমি অবশ্য মিত্রার সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দিইনি। মিত্রা বলেছে তার সুযোগ আসবার আগেই লাঞ্চে তোমাদের আকস্মিক দেখা এবং আলাপ হয়ে গিয়েছে। আর এখন তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তাকে তুমি আগেই চিনতে।'

'এখন মনে পড়ছে, মানে লাঞ্চের সময়েই এরকম মনে হচ্ছিল, তোমাদের বাড়িতেই হবে, কিন্তু তা অনেকদিন আগে।'

বেলা একটু হেসে বলল, 'তখন তুমি ভারতীয় ডেভিস কাপ টিমের একজন হবে কিংবা যামিনী রায়কে গুরু মেনে ছবি আঁকবে সেটা স্থির করতে পারছিলে না। আর হবি ছিল পামিস্ট্রি, আর সে হবি তোমাকে লেডিকিলার হবার সুযোগ করে দিচ্ছিল।

প্রবীর বললে, 'কুড়ি বছর আগে কি না তাই বল। তোমার মামী হোয়াইট রাস্যান মহিলা আর তার নন্দিনী।'

বেলা বলল, 'এবার তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ। বাকিটুকু বলি এখন ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছে আমাদের এই শহরের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে। জেনেটিক্স ও বিহেবিয়ার সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছে।'

প্রবীর বলল, 'আর সেই মামী? মিসেস তলাপাত্র নয়?'

'তিনি সপ্তাহ খানেক হল এসেছেন। আবার বেরুবেন ট্যুরে।'

'গতবারে তুমি বোধ হয় তাঁর সঙ্গে এয়ারফিল্ড পর্যন্ত গিয়েছিলে!'

গাড়ি চালাচ্ছিল বেলা। সে একটু সাবধানী। পথের দিকেই মনোযোগ তার। প্রায় দুমিনিট পরে বলল সে, 'তুমি কি পার্টিতেও চুপ করে থাকবে না কি!

প্রবীর বলল, যেমন এ অবস্থায় অস্ফুটস্বরে মমম করা হয়, "তা বৈকি সে আর যা।' আর তারপর হাসল আঠারো থেকে চল্লিশ এই দুই যুগ সে অনেক ডিনারে অনেক ধরনের সঙ্গ লাভ করেছে। ভাবল, অর্থাৎ মসৃণ নাগরিক ভদ্রতার পক্ষে যা স্বাভাবিক তেমন কথা এবং হাসি।

আমেরিকায় বিশেষ একরকমের বাড়িকে কলোনিয়াল বলা হয়। দেশে তেমন বলার রেয়াজ নেই। থাকলে ওল্ড আলিপুরের এই বাড়িটাকে এককথায় বর্ণনা করা যেত। পথের ধারে লোহার ফেনসিং-এর গা ঘেঁষে টেনিস গ্রাউন্ডের কায়দায় উঁচু পর্দা তারের জালে লতা তুলে তৈরি। পর্দা সরালে ঘাসে ঢাকা মাঠে ইউক্যালিপটাস ও বাদাম গাছ—গাছগুলো রঙিন একটা গ্রীন-হাউস। দু-তিনটি ইংল্যান্ডে তৈরি গ্রীসিয়ান স্ট্যাচু রুচিমত। দু-চারটি ঝোপ যা ফুলগাছের হতে পাবে। এগুলো পার অনেক সিঁড়িওয়ালা নিরেট গড়নের তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। অনেক পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল কারণ সেকালে সেটাই সম্ভ্রান্ত রীতি ছিল।

গাড়িগুলো দেখে বোঝা যায় প্রায় সব অতিথি ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। এমন কি প্রবীর নামতে না-নামতে আরও দুখানা গাড়ি এসে থামল।

দুতিন ধাপ সিঁড়ি উঠতেই মিত্রা এসে অভ্যর্থনা জানালে। হাসি মুখে বলল, ডক্টর সামন্ত এলে পুরো পার্টি হবে।

যে বসবার ঘরটায় অতিথিরা সমবেত হয়েছেন সেটা কিন্তু সেকেলে। গেলো মিত্রা আসবাবপত্র সাজানোর কায়দায় যেমন, অতিথিদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ব্যাপারেও তেমনি সেকালের রীতিই মেনে চলল। অবশ্য অধিকাংশই পরস্পরের পরিচিত এবং ইতিপূর্বে অন্য অনেক ডিনার পার্টিতে একত্র হয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে বিরোধ, দেখা গেল পার্টিতে তারাও পরস্পরকে এড়িয়ে যায় না। যথা প্রবীর সিনেমা-প্রয়োজক পীযূষকে দেখা মাত্র হাসিমুখেই তার দিকে এগিয়ে গেল। পীযূষ ঠিক তার আগেই মিসেস ভোলকার্টের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দুপা সরে গিয়ে সিগারেট বার করেছে। বেশ ইনফর্ম্যাল ভঙ্গিতে প্রবীরের সামনে সিগারেট কেসটা এগিয়ে ধরল। কিন্তু দু একটি ক্ষেত্রে পরিচয়ের দরকার ছিল। যেমন

অধ্যাপক ভোলকার্ট, এবং অধ্যাপক শ্লুডারের বেলায়। সুবিধার জন্য এরকম দু একটি পরিচয় আমরা উল্লেখ করতে পারি। অধ্যাপক ভোলকার্ট সিন্ধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস্। সংস্কৃতি সেমিনারে উভয়বিধ সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন।

[অধ্যাপক ভোলকার্ট তাঁর প্রকাণ্ড টাক সমেত মাথাটা দোলালেন। কাঁচা মাংসের রঙের তাঁর প্রকাণ্ড মুখে ওয়ালরাশের মতো গোঁফ। ঝাঁকড়া ভ্রুর নিচে তাঁর বাদামী চোখ দুটোকে তিনি প্রসারিত করে কৌতুকের ভঙ্গি করলেন পরিচয়ের প্রশংসার দিকটাকে লঘু করতে।]

[অধ্যাপক শ্লুডাব (অ্যাম্ব্রোসিয়াস নয়, কার্ল)। জর্মান ইন্ডোলজিস্ট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর। নগর-পরিকল্পনার সঙ্গে সংস্কৃতি সমন্বয় সম্বন্ধে এ অঞ্চলে এখন মূল্যবান গবেষণা করছেন। শ্লুডার জার্মান বটে কিন্তু দেখে ববং স্কচ্ ব্যবসাদারের কথা মনে আসে। লম্বা নিখুঁত ডিনার জ্যাকেট। মাথায় হালকা সাদা চুল। হাত জোড় করে জোর দিয়ে নমস্তে বললেন বিদেশীব পক্ষে যেমন স্বাভাবিক।]

মিসেস ভোলকার্ট। [বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। ভালো ছবির খোঁজে আছেন। বেলার হোয়াইট র‍্যাশান মামী মিসেস তলাপাত্রের সঙ্গে মৃদু আলাপবত। সম্ভবত রিভিয়েরার নতুন প্রথাগুলো সম্বন্ধে।]

মিস্ শ্লুডার। গারট্রুড্ শ্লুডার। অধ্যাপক শ্লুডাবের কন্যা এবং বিপত্নীক অধ্যাপকের গৃহকর্ত্রী। [হালকা ছিপছিপে গড়ন। চোখে সোনার ফ্রেমেব চশমা। ফ্যাকাশে রং। এক সময়ে যাকে ইন্টেলেকচুয়াল টাইপেব সুন্দরী বলা হতো তেমন চেহাবা। এদিকে আসবার পব বাংলা ভাষা শিক্ষা কবছেন।]

শান্তনু তলাপাত্র, মিত্রার কাজন্। [বযস অনুমান কুড়ি। গোলাপী গাল, টুকটুকে লাল ঠোঁট, সরু কালচে-বাদামী গোঁফের বেখা] চোখ দুটো গভীর নীল। পীযূষেব ঠিক পাশেই বসেছিল সে এবং পীযূষ হযতো ভাবছিল রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনোর মতো মুখের কাট ছোকরার, অথচ ফুয়েল সম্বন্ধে অন্য দেশের উপবে আমরা কেন নির্ভবশীল তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।]

পীযূষ বলল (শ্লুডাবের আলোচনায় যোগ দিযে), 'আমাদের দিল্লিব পবিকল্পনা সম্বন্ধে আমবাও লজ্জিত, আপনি বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন।

অধ্যাপক ভালকার্ট বললেন, 'গেভেশেব মতটাই এখন মানাব মত মনে হয। কি বলেন সান্ডেল মশাই?' প্রবীর বলল, 'ও, হ্যাঁ, তা।' সম্ভবত মনে মনে ভেবে নিল তাব বক্তব্য তাব দেশেব কনসাল জেনাবেলকে বিব্রত করবে কি না। তিনি বললেন, 'স্কুলের ছাত্রকে ম্যাথমেটিক্যাল বক্স দিযে দিলে সে যেমন বৃত্ত আর সমান্তরাল আঁকবে, কতকটা তেমন মনে হয় না।

পীযূষ বলল, 'ফ্ল্যাট্।'

এ দিকে আলোচনাটা নগব-পবিকল্পনার সঙ্গে সংস্কৃতির সংযোগের দিকে এগোবে বলে অনুমান হল। ওদিকে মিসের ভোলকার্টেব কোন কথায় মিসেস তলাপাত্র মৃদুস্বরে হেসে বললে, 'ব্যাভিশিং।' দুজনের প্রায় একই বযস, সম্ভবত রুচির ক্ষেত্রেও অনেকটা মিল আছে। মিস্ শ্লুডার শান্তনুকে অবাক হযে দেখছিল এবং সম্ভবত ভাবছিল একজন পুরুষের ঠোঁট দুটি এমন টুকটুকে লাল হয় কি করে, আর সেই ঠোঁটের উপরে নিচে পাখির রোমের মতো এমন কোমল গোঁফ আর দাড়ির স্পষ্ট হয়ে ওঠা রেখা।

আলোচনার এক জাযগায় পীযূষ বলল, 'অনেকটা যেন খামাব অঞ্চলের লোকদের চোখ ধাঁধিযে দেয়ার চেষ্টা দেখা যায় এমন সব নগর-পবিকল্পনায়।'

বেলা হেসে বলল 'আ, পীযূষ তুমি খামার অঞ্চলের লোকদেব একটা ধাক্কা দিলে।' পীযূষ বলল, 'কবে? আরে না, না! সে কথা যদি বলেন, আমাদের কারো কারো খামাব অঞ্চলে যাওয়াব অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে মহিলাদের পোষাক আমাদের শহরের চাইতে বরং অনেক বেশি খাটো-খোটো। এবং পুরুষদেব হাই বুট থেকে গ্লাবস এবং সানগ্লাস পর্যন্ত আমাদের চাইতে অনেক বেশি আধুনিক।'

ভোলকার্ট বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ। তা হলে তাদের পোষাক পরবার ধরণ ধারনের ধাক্কা কি শহরেও লাগছে?'

পীযূষ বলল 'আমার তো মনে হয় আমাদের ফোরম্যান সম্প্রদায় এবং আমাদের ট্র্যাক্টর ড্রাইভারদেব মধ্যে তুলনা করলে, কার জামায় বেশি সাপ, পোকা মাকড় ও মেয়ে-মুখ আঁকা থাকে তা বলা কঠিন হবে। তবে কিনা ওরা মানে খামারে গোঁফটা একটু বড় রাখে আর মহিলারা কোন কোন অঙ্গে একটু বেশি চওড়া।'

মিসেস তলাপাত্র কোন কোন অঙ্গে একটু চওড়াই। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'তুলোর প্যাডিং আছে কিনা পরখ করার জন্য সে সব চওড়া জায়গায় চিমটি কেটে দেখেন নি তো?' হাসির দমক উঠল।

মিত্রা বলল, 'আপনি ওদের অতিথি হয়েছিলেন না কি?'

পীযূষ বলল, 'এবং তারই ফলে আমি বলতে পারি যে কোন চারটে চপ্ ওজন করলে এক কিলোগ্রাম হবেই, আর চারটে চপের সঙ্গে ওরা যে স্যালাড্ খেয়ে থাকে, এমন কি মহিলারাও, তাতে একটা আস্ত শশা, গোটা দশেক পেঁয়াজ, দুটো রসুন, এবং এক আউন্স ভিনিগার লেগে থাকে।' বেলা বলল, 'তুমি বোধ হয় হিপোদের সঙ্গে মিলিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে।

মিত্রা উঠে দাঁড়াল। হার্ট-সার্জারি স্পেশ্যালিস্ট শোভন সামন্ত দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে। অভ্যর্থনা ও পরিচয়ের পালা।

পীযূষ জনান্তিকে বেলাকে বলল, 'পরে এবং একা একসময়ে আসার কারণটা কি উজ্জ্বল আলোটা একা কেড়ে নেবার চেষ্টা।'

বেলা পীযূষের জন্য সহানুভূতি বোধ করল। আলাপটাকে বেশ নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সে সেজন্যই সাহায্য করতে এগোল, 'পীযূষ, সার্জন সামন্ত, আমার অঞ্চলের খাওয়ার কথা বলছিল।' পীযূষ বাধা পাওয়ার পর আলাপটায় ফিরবে কি না ভেবে দ্বিধা করছিল। খানিকটা শূন্যতা দেখা দিল। প্রবীর বরং বেলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল, 'এয়ারফিল্ড লাউঞ্জে, তুমি ভেবে দেখো বেলা, তোমার মামীকে তুলে দিতে গিয়ে ওদের দুজনকেই দেখে থাকব। নতুবা সেই বাং দুটোতে হঠাৎ নিজেদের প্রবাসী মনে করে দু চার টামলার দুধে পিত্তি রক্ষা করা আর কারো পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।'

সার্জন সামন্ত মিসেস তলাপাত্রের পাশে বসতে বসতে বিড়বিড় করে বললেন 'নাথিং বাট জার্ম সুপ।'

মিসেস তলা পাত্র বললেন, 'জার্মান সুফলে?'

'একই রকম ক্ষতি করে থাকে।'

স্পেশ্যালিস্টদের দোষ দেওয়ার আগে ভাবতে হবে—এ ধরনের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা তাদের স্ত্রীরাও বলে কিনা তাদের সঙ্গে। প্রবীরকে জনান্তিকে এই বলে বেলা পীযূষকে বললে 'আচ্ছা পীযূষ তুমি কি ফোরম্যানদের সঙ্গে মিশেছ? দেখলে চিনতে পারো?'

মিস্ শ্রুডার আর একবার শান্তনুকে দেখতে চোখ তুলেছিল। সে দেখতে পেলো শান্তনুও তাকে যেন বিশেষ করে দেখছে। গাবটুডের ফ'কাশে গাল হঠাৎ রক্তাভ হয়ে উঠল। তার চোখ দুটো শান্তনুর দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা করল। তার ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাক হয়ে একটা আদল তৈরি করল।

পীযূষ বলল, 'আপনার মনে পড়বে, আমাদের বাল্যে বোম্বেওয়ালা একরকম ছবি ছিল। কিছুদিন আগে সিনেমা মিউজিয়ামে দেখা হয়েছে। বোম্বেওয়ালা পোষাক, কথা জীবনযাত্রা। মনে করুন পার্মানেন্ট বোম্বেওয়ালা, তাহলে ফোরম্যানদের চিনতে পারবেন।"

অধ্যাপক ভোলকার্ট বোম্বের অধিবাসী না হলেও বোম্বাই রসজ্ঞ হো হো করে হেসে উঠে বললেন 'আক্যাডেমিশন পীযূষ যা বলেছেন তা বোধ হয় এই যারা ভোলাটাইল হাই স্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ দিয়ে জামার আস্তিনে বা কোটের ল্যাপেলে মাখামাখি করে ফেলে।'

প্রবীর তখন হঠাৎ ভাবল, টেবলের বসবৎ ভালো না জানার ফলে লোভী উপ যুবকের পক্ষে ডিনারকোটে সুপ লাগানোর মতো, ফোরম্যান সম্প্রদায় হাস্যকর কিছু হয়তো করে থাকে, কিন্তু তাতে এখানে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। টেবলে সাজানো নারাঙ্গির রং চোখে লাগছে বটে। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করতেও পার। কিন্তু তা ত্বকগভীর। এ চোখগুলোও কি বাসি নয়?

কিন্তু তখনই মিত্রা উঠে দাঁড়াল। ঘড়িতে কোথায় জলতরঙ্গের সুরে আটটা বাজল। আটটাতেই ডিনার।

এখানেই বেলা একটু অসুবিধায় পড়ল। নিজের পরিচিত মহলে ডিনার ব্যবস্থাপনায় তার প্রশংসা আছে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ইনফর্ম্যাল ডিনার এবং বিশেষ অতিথিদের নিয়ে পুরোপুরি ফর্ম্যাল ডিনার দুয়েতেই সে পারদর্শী। ইনফর্ম্যাল ডিনারের গালগল্প এবং ফর্ম্যাল ডিনারের বক্তৃতা এবং টোস্ট দুয়েতেই সে অভ্যস্ত। সে অনুভব করল এটা নতুন ধরনের হতে চলেছে। আয়োজনটা মিত্রার, কিন্তু পরামর্শদাতা

হিসাবে দায়িত্ব তার খানিকটা আছে। এটা যে অল-লায়নস্ হতে চলেছে তা শুধু রসিকতা নয়। সবাই যদি সস্ত্রীক আসতেন তবে ইনফর্মালিটির দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়া যেত! কিন্তু পীযূষের স্ত্রী আসে নি, শোভন সামন্তও অসস্ত্রীক, প্রবীর অবশ্য সব সময়েই ন্যাড়া। সব সমেত এগারো জন হয়েছে। ডিনার টেবিলটা অবশ্য গোল, হেড্ এবং বটম্ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগের কায়দায়, যাকে ডিনারের ব্যাপারে ক্লাসিক বলে, বেলা এগিয়ে গিয়ে শোভন সামন্তের পাশে দাঁড়াতেই, সেও বুঝতে পেরে বেলার বাহু ধারণ করল। তখন অন্যেরা সহজেই অনুকরণযোগ্য রীতি খুঁজে পেল। অধ্যাপক শ্লুডার মিত্রাকে, অধ্যাপক ভোলকার্ট মিসেস তলাপাত্রকে, পীযূষ মিস্ শ্লুডারকে, এবং শান্তনু মিসেস ভোলকার্টকে মনে করে ডিনার টেবলের দিকে অগ্রসর হল। প্রবীর, সকলের শেষে এবং অন্য অনেক সময়ে ঘটেছে, একা ধীরে সুস্থে অনুসরণ করল।

মিত্রার নিজেরই ব্যবস্থা গোল টেবল, এবং এ নিয়ে বেলার সঙ্গে কয়েকদিন আলোচনাও করেছে সে, তা হলেও হঠাৎ আশঙ্কায় কয়েক জন্য তাকে ফ্যাকাসে দেখালে। গোল টেবলের সুবিধা এই তার চারিদিকে জোড় বিজোড় যে সংখ্যাই বসাও ফাঁকা থাকে না।

টেবলে বসে বেলাই প্রথমে কথা বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে মিত্রাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে শহরে সব কটি সিংহকে একত্র দেখার সুযোগ নতুবা হত না।' এই বলে সে মধুর করে হাসল।

মিত্রা বলল, 'আসুন আমরা রুটি ভাঙি। আমাদের হোস্ট শান্তনুকে অনুরোধ করছি আমাদের পথ দেখাতে।'

টেবলের উপরে খ্রিস্টমাসে যেমন থাকে তেমন করে সাজানো একটা কেক। শান্তনু উঠে দাঁড়াল। একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কেকের ট্রে নিজের দিকে টেনে নিল। এদিক থেকে মিত্রা ছুরি এগিয়ে দিল। মিসেস ভোলকার্ট বললেন, 'ওর মধ্যে কিছু লুকানো নেই তো?'

অধ্যাপক শ্লুডার বললেন, 'খুবই সম্ভব। যার ভাগ্যে পড়বে তাকে সপ্তাহের ভাগ্যবতী বলা যাবে।'

ডিনার শুরু হল। চারজন পরিবেশন করছে। দুজন পুরুষ এবং দুজন যুবতী। লিভারি নতুন। কিন্তু প্রবীরের কাছে বনেট এবং অ্যাপ্রনের নতুনত্ব সত্ত্বেও অন্তত একজনকে পরিচিত মনে হল। সুপের বাটিতে চামচ দিয়ে সে ভাবল—বেলার বাড়ি থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তাই। লিভারি নতুন এবং মূল্যবান তা থেকে বোঝা যায় মিত্রা প্রফেসর হয়ে এলেও যতদিন থাকবে সকলের একজন হয়েই থাকবে, অন্যদিকে বাজার থেকে পছন্দ মতো লিভারি করানো গেলেও সার্ভিটর পাওয়া এখন বরং আগের চেয়ে কঠিন। এদের দুজনকে মিসেস উপযুক্ত তলাপাত্র এবং একজনকে বেলা সোম ধার দিয়েছে।

কেকের বাদামটা শান্তনু আশা করেছিল গারট্রুড্ শ্লুডার পাবে, পেলেন কিন্তু অধ্যাপক ভোলকার্ট। এবং তা নিয়ে বিশেষ হাসাহাসি হল। সিন্ধুসিংহের মতো গোঁফসমন্বিত অধ্যাপক ভোলকার্টকে ভাগ্যবতী বলা যাবে কিনা এ রকম প্রশ্ন তুলল পীযূষ।

বেলা ভাবল এ রকম ডিনারের সার্থকতা বাড়ে যদি সিংহেরা নিজের নিজের বিষয়ে মুখ খোলেন। প্রবীরের উপরে চোখ পড়ল তার। সে বলল, 'আচ্ছা পীযূষ, গতবারের থিয়েটার উৎসবে প্রবীরের 'ছেঁড়া বুট' তোমার কেমন লেগেছিল?'

পীযূষ বলল, 'আমি তখনকার মতো এখনও নাটকটার পক্ষপাতী যদিও কেউ কেউ বলেছিল বুটজোড়াকে দেখে চার্লির বুটের কথা মনে পড়ে গেল।

বেলা বলল, 'ওটা একটা অতিপাণ্ডিত্য। যদি তাও বল রাবণের গল্পটা কি আদৌ নতুন! কিন্তু মেঘনাদবধ নিশ্চয় কৃত্তিবাসের লেখা নয়। আর তা ছাড়া নাটকে সিনেমার কায়দায় ক্লোজ-আপ ব্যবহার করা হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে একটা বিরুদ্ধমতের প্রচার হতে পারে, কিন্তু তাতে নাটকটা অপাংক্তেয় হয় না।'

পীযূষ বলল, 'শেষ দৃশ্যটার কথা বলছ?'

বেলা বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। রিয়ালিস্টরা প্রশ্ন তুলতে পারে গাছের গায়ে টিনের তোবড়ানো পাতে লিখে গেঁয়োপথের তেমন মাইলপোস্ট তৈরি করা হয় কিনা, কিংবা গাছের তলায় রাখা সেই ছেঁড়া পুরনো বুটজোড়া সাধারণ জুতোর তিন চারগুণ বড় হওয়াটা রিয়ালিজম কিনা, আমার কিন্তু মনে হয় সেই পুরনো

জুতো জোড়া দিনের শেষ আলোতে যখন ফুটে উঠেছিল তখন তাকে বিভ্রান্ত ক্লান্তির পরাকাষ্ঠা বলেই মনে হয়েছিল।'

অধ্যাপক ভোলকার্ট বললেন, 'নাটকটা আমরা দেখিনি, কিন্তু আপনার কথায় নাটকের মূল বক্তব্য সুন্দর ফুটে উঠছে।'

অধ্যাপক শ্লুডার বললেন, 'মূল বক্তব্যটাই যদিও আর্ট নয়, বক্তব্যটাকে কি করে রসানো হয়েছিল তা না জেনে কিছু বলতে গিয়ে হয়তো অন্যায় করে ফেলব, তা হলেও কিন্তু আমাদের বিভ্রান্তি ক্লান্তির সুন্দর প্রতীক হতে পারে 'ছেঁড়া বুট'।

অধ্যাপক ভোলকার্ট বললেন, 'আব সেকালের চার্লির কথা যদি মনে পড়ে তাতে ববং লাভই আছে, আমাদের প্রগতি সব সময়েই একই সঙ্গে লুডিক্রাস এবং ট্র্যাজিক ছিল। আর এখন তা বিভ্রান্ত।'

মিত্রা বলল, 'সিনেমার ক্লোজ-আপে লাইফ সাইজের থেকেও বড় করা হয়, এখানেও জুতোজোড়াকে বড় করা হয়েছিল, তাতে নাটকের আর্টের পক্ষে ক্ষতি হবে কেন?'

প্রবীর বলল, 'এ বিষয়ে আমার বন্ধু নাট্য-প্রযোজক সুরথ সোমের মত এই সাধারণ মাপের একজোড়া বুট মঞ্চে রাখলে দর্শকরা সেটাকে গ্রহণ করতে পাবত না।'

অধ্যাপক ভোলকার্ট বললেন, 'আর সেই বুটজোড়া যে ট্র্যাম্পের এমন না হতে পারে। সুপারসোনিক সেভেনলিগ বুটও বোধ হয় ক্লান্ত।'

মিত্রার চোখ দুটো চক্চক্ কবে করল। সে বলল, 'শান্তনু, এ বিষযে তুমি সব চাইতে ভাল বলতে পার। আমাদের মধ্যে কেউ সুপারসোনিক জেট চালাতে অভ্যস্ত।'

বেলা জিজ্ঞাসা করল, 'এয়ারফোর্সে ড্রাপ্টি?'

শোভন সামন্ত বলল, 'আচ্ছা? তাই নাকি?'

মিত্রা বলল, 'কতকটা ইচ্ছা করে।'

শান্তনু গারট্রুডের দিকে চাইল। গাবট্রুড বলল, 'রিঅ্যালি?'

শান্তনু বলল, 'কই না, ঠিক ক্লান্তি নয়, সুপারসোনিক যখন শব্দের দ্বিগুণ চলে তখন কখনও কখনও ফেড্ আউট করে পাইলট।'

'খুবই স্বাভাবিক।' শোভন সামন্ত বলল, 'আমাদেব হার্টের পাম্পিং-এর একটা স্পীড আছে। তাকে সেকেন্ডে কতবার তা বলে দেয়া যায়। (সে হাসল।) যদি মার্কটাইম না করে প্রতি পাম্পিং-এ একবাব পা পড়তো তার গতি ট্রামেব চাইতে বেশি হত না।'

মিসেস তলাপাত্র বললেন, 'হার্টের গতির চাইতে বেশি গতিতে চলার চেষ্টা করেই কি—' মিসেস তলাপাত্র মাঝপথে থামলেন।

শোভন সামন্ত বলল, 'চমৎকার বলেছেন মিসেস তলাপাত্র। অনেক পেশেন্টের কেস-হিস্ট্রিতে এক্স্ট্রা-ফাস্ট লাইফের প্রমাণ থাকে।' কিন্তু হার্টকে যদি জেনারেটব মনে করা যায়, কবিরা সেখানেই উত্তাপকেন্দ্র আছে বলে মনে করেন, তবে বেশি তাপের চাহিদায় মেশিনটাকেই ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। আমরা মেবামত করতে পারি। তখন বলে দি বেশি উত্তাপের চাহিদা থেকে দূরে থাকতে। তুঙ্গীয়ান, তুরীয়ান অন্তঃকরণের বেলায় চলে কিনা সন্দেহ।

এ রকম ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে শোভন সামন্তের বিবস স্বরে বলা এই কথা কয়েকটি যেন অদৃশ্য দেয়ালের গায়ে অদৃশ্য আঙুলের লেখা। টেবলের সব কটা চোখ শোভনের মুখের উপর নিবদ্ধ হল।

দ্বিতীয় কোর্স তখন মাঝামাঝি। বেলাই আবার হাসল বলল, "আমাদের অন্তঃকরণ যদি উত্তাপ-কেন্দ্র হয় তবে নক্ষত্রের বেলায় যেমন হয়ে থাকে বিভিন্ন উত্তাপের মাত্রায় বিভিন্ন রং চোখে পড়বে।'

মিত্রা বলল, 'এমনও হতে পারে সাধাবণত অন্তঃকরণ যে উত্তাপের নিম্ন ও ঊর্ধ্ব সীমার মধ্যে কাজ করে থাকে আমরা সাধারণ মানুষ তার সঙ্গেই পরিচিত। সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা সেই সীমার বাইরে যে হৃদয়-উত্তাপ আবিষ্কার করেন তাই অভিনব কাব্য এবং শিল্পের উৎস।'

বেলা বলল, 'পীযূষেব নতুন ছবিটার কথা বলছ, মিত্রা?'

পীযূষ বলল, ছবিটা যে আপনাদের দুজনেরই ভালো লেগেছে। এজন্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। (একটু হাসল সে)। ছবিটা তৈরি করতে গিয়ে আমার অনেকবার মনে হয়েছে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের ভিন্ন পথে চলা বিশ্বাসযোগ্য রাখার সীমা পার না হয়ে যায়।'

বেলা বলল, 'কখনও কখনও মনে হয়েছে বটে দীর্ণব্যক্তিত্বে আক্রান্ত হয়েছে নায়ক নায়িকারা, কিন্তু ছবি কখনও অবিশ্বাসযোগ্য হয়নি।'

এ সূত্রপাত থেকে সাম্প্রতিক ছবির আধুনিকতার বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু হল। সে আলাপ চতুর্থ কোর্সের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছাল। পীযূষ যে আন্তর্দেশীয় নাম কেনার উপযুক্ত কিছু সব সময়ে করছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রইল না। পীযূষ অনেক প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত, এ প্রশংসাও সে শালীন ভঙ্গিতে গ্রহণ করল।

নিরামিষ ডিনার—কিন্তু তা ছ'কোর্সের। চতুর্থ কোর্সে মটর-পোলাও এবং ছানার গুলাশ্ আলাপকে তৃপ্তিভারাক্রান্ত করে দিয়েছে! বাঙালির যা স্বভাব—পঞ্চম কোর্সেই পিঠের সঙ্গে ক্ষীর ও নরম সন্দেশ জাতীয় আসতে শুরু করল। অনুমান করা যায় শেষ কোর্সে নানারকম ফলের সঙ্গে কড়া পাকের বরফি আসবে।

অবশেষে আঙুরের সঙ্গে পোর্ট।

প্রবীর বলল, 'আমার অঞ্চলে প্রতিটি মাটন টুকরো এক পো ওজনের কিছু কম বেশি হতে পারে। কিন্তু এ আঙুরগুলোও প্রতিটি একশ গ্রাম।

গারট্রুড শ্লুডার ভাবল, 'বাংলা শেখা নিশ্চয়ই একটা অসাধারণ হবি। প্রজাপতি সংগ্রহ করা বা দেশলায়ের বাক্সের ছবি সংগ্রহ করার তুলনায় তাদের মহলে নতুন বলেই মনে হবে। কিন্তু গভীরভাবে, খুব গভীরভাবে ভালবাসলেই কি সেটা হবির মতো হয় না।' অধ্যাপক শ্লুডার হেসে বললেন তফাৎটা বোধ হয় শুরমে এবং শুরমার মধ্যে! পার্থক্যটা বেশ সূক্ষ্ম। অনেক সময়ে শারীরিক অপটুতা আমাদের সহায় হয়। মৃদু একটা ঢেঁকুর তুললেন তিনি।

বেলা বলল, 'পোর্ট কি তোমার তেমন পছন্দ নয় প্রবীর? তা তা যদি বল মিত্রা নিশ্চয়ই—' প্রবীর বলল, 'আরে না না। অধ্যাপক শ্লুডার শারীরিক অপটুতা বলে যা বুঝিয়েছেন তা রুপোলি বয়সের কথাই। এখন প্রবীণ পোর্টই ভাল। সাদা অথবা লাল পোর্ট।'

পোর্ট চলতে চলতে খুব স্বাভাবিক ভাবে সংস্কৃতির কথা উঠে পড়ল। কথাটা উঠল আস্বাদ নিয়ে। আমার অঞ্চলে প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে বটে। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিই তার কারণ। এ দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত পোলট্রি গড়ে তোলা, এবং মাটিতে প্রচুর সারের ব্যবহার করার উপরেই প্রাচুর্য নির্ভর করে এই তত্ত্বটা জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেদের মনে বদ্ধমূল হওয়ার ফলেই এটা হয়েছে--মিসেস ভোলকার্টের এই বক্তব্য থেকেই বিজ্ঞানের কথা উঠে পড়ল। একজন বলল, কেউ কেউ অবশ্য বলে এখন আপেলগুলো প্রায় দ্বিগুণ চেহারার কিন্তু ঠিক যেন তেমন টুকটুকে লাল নয়, আর যেন একটু পানসে। বেলা বলল, সে রকম বলা ঠিক হবে না হয়তো, কারণ তুলনাটা দেয়া হচ্ছে নিজেদের অল্প বয়সের আপেল-আস্বাদের অভিজ্ঞতা থেকে, আর অল্পবয়সের সব কিছুই বেশি লাল, বেশি মিষ্টি বোধ হয়।

অধ্যাপক শ্লুডার বলেন, 'নতুবা আমাদের স্বীকার করতে হয় হোমস্পান এবং মিলের টুইডে যে তফাৎ, আপনাদের বেনারসী এবং রেয়ন বেনারসীতে যে তফাৎ, সেকালের সেই আপেলগুলোর সঙ্গে সারে তৈরি আপেলে সেই তফাৎ—কারিগরের শিল্প আর ম্যাস-প্রোডাকশন।'

এরপরে পছন্দ অপছন্দের কথায় যাওয়া স্বাভাবিক। আগেকার দিনে কারিগরের গোপন কৌশলের তারিফ আমাদের সৌন্দর্যবোধকে সাহায্য করতো, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিল, এখন আমাদের সৌন্দর্যবোধকে সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আমাদের কৌতূহল। এরকম একটা মত তৈরি হবে মনে হল। দেখা গিয়েছে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের গড়ন যতই সুন্দর করার চেষ্টা কর তাতে ক্রেতার আকর্ষণ বাড়ে না, কিন্তু যদি বলা যায় ভাকুয়াম সেল্‌ফ-স্টার্টারযুক্ত এবং তাতে সুপারক্যাথড্ লিনিয়াল ব্রেক আছে তা হলে বিক্রি শুশু করে বেড়ে যায়, যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে সেল্‌ফ-স্টার্টার কোথায় থাকতে পারে, কিংবা সুপার ক্যাথড্ লিনিয়াল ব্রেকটা আদৌ কিছু কিনা তা জানা যায় না।

প্রবীর বলল 'অথচ—'

'কি অথচ' বেলা বলল।

প্রবীর বলল, 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোন কোন বিষয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধ থেকে হানি ঘটাতে পারত। যেমন একজোড়া হীরার দুল সম্বন্ধে বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকের চোখে ওটা কয়লা বিশেষ। কিন্তু এখন দেখুন যাকে সসম্ভ্রম স্পর্শ করা দেবতাদের ভাগ্য সেই বেলা সোমের গালে যথেষ্ট ছোঁয়াছুঁয়ি ঘটাচ্ছে।'

অধ্যাপক ভোলকার্ট বললেন, 'কয়লার চাইতে অযুতগুণ বেশি চাপ সহ্য করেই হীরার টুকরো দুটো এখন এই সৌভাগ্য লাভ করছে।'

প্রবীর বলল, 'তা হলেই দেখুন ওদুটোর সঙ্গে একটা পচনশীল ফার্নের গুঁড়ির অথবা ঝরিয়ার খাদের দুটুকরো কয়লার যদি পার্থক্য করতে হয় তবে বলতে হবে দ্যুতি নয়, ঔজ্জ্বল্য নয়, বেলা যা বয়ে বেড়াচ্ছেন তা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লক্ষ বৎসর সময় এবং অযুত অযুত পাউন্ডের চাপ।' হাসি মুখে মিত্রা প্রবীরের গ্লাসটা ভরে দিল।

বেলা বলল, 'আহ্, প্রবীর, তুমি যে কথার কারবারী, কি কথার পুঁজিপাতি এ বিষয়ে আমাদের কারোই সন্দেহ নেই।'

প্রবীর বলল, 'শব্দের ব্যাপারে কেউ কেউ দুঃখজনক ভাবে হোর্ডার, এমন কি দারুণ রকমের সাম্রাজ্যবাদীও হতে পারে, (সে মৃদু মৃদু হাসল তার গোটি ছুঁচলো দেখাল।) কিন্তু বেলা নিশ্চয়ই অযুত বৎসরের প্রাচীনতা এবং কোটি পাউন্ডের চাপ অনুভব করেন না।'

পোর্টটা অনেকক্ষণ ধরেই চলল। পরে যেমন প্রবীর বলেছিল, ডিনারটার মূল ভাবটা ছিল দূরে সরে যাওয়া—ভিক্টোরিয়ান যুগের ধরনধারণ করা। আর তাতে মিত্রার একটা বিশেষ মনোভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু আলোটায় কিছু পার্থক্য আছে। তখনও ডিনার টেবলে নিশ্চয় প্রচুর আলো থাকত, কিন্তু টিউবলাইটের কলা কৌশলে এখানে যে অত্যন্ত উজ্জ্বল পূর্ণিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে তখন তা সম্ভব ছিল না। সে আলো অধ্যাপক শ্লুডারের সাদা চুলে, ভোলকার্টের মস্ত টাকে, প্রবীরের গোটিতে, শান্তনুর আপেল রঙের গালে, গারট্রুডের ফ্যাকাশে লম্বাটে গড়নের ইন্টেলেকচুয়াল রূপে সমভাবে পড়ছে। যেমন পড়ছে রূপোর পাত্রগুলোতে।

পোর্টটা ভাল। তা যে মৃদুমৃদু কাজ করতে শুরু করেছে তা বোঝা গেল যখন পীযূষ হঠাৎ গ্লাস হাতে আবার উঠে দাঁড়াল টোস্ট করতে। আমাদের হোস্ট শান্তনুর স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক। অবশ্য এই বলে অধ্যাপক ভোলকার্ট গ্লাসের গায়ে গ্লাস ঠেকাতে গেলেন কিন্তু ব্যাপারটা সহজ হলো না।

শোভন সামন্ত বলল, 'আমরা যে পরস্পরের পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলাম এজন্য অধ্যাপিকা মিত্রাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

বেলা বলল, 'এই শান্তিপূর্ণ ডিনারটার কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

মিত্রা হাসল, মাথা নিচু করল, প্রবীরের গ্লাসটা আবার ভরে দিল। বলল, একান্তে, 'এখন বিলিয়ার্ড কেমন লাগবে।'

'কিংবা ব্রিজ? কিন্তু ।'

ব্যাপারটা প্রবীর ঠিকই আন্দাজ করেছিল। বসবার ঘরে ফিরে সিগারেট শেষ হতে না হতে শোভন সামন্ত বিদায় চাইল। মিসেস তলাপাত্রের খুব সকাল থেকেই আর একটা টুরের জন্য প্যাকিং করতে হবে। পীযূষের পক্ষেও বিলিয়ার্ড কিংবা ব্রিজে মন দেয়া সম্ভব হচ্ছে না – তার সিনারিও রাইটাররা দয়ে পড়েছে। কাল সকালের আগেই কিছু করতে হবে।

রূপসী পাঠিকা, এবং বিদগ্ধ পাঠক, এখানে আর একবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনারা এতক্ষণ অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে যদি এটা নভেল হত তা হলে এই অধ্যায়টিকে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদ হিসাবে উপস্থিত করতাম। এবং সে ডিনারটার আরও বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব হত। কারণ যে সব উপাদান রাখা হয়েছিল সেগুলোকে ওজন এবং যাচাই করে দেখতে দেখতে অনুমান হচ্ছে এই অ্যান্টিরোমান্সের মধ্যে যদি একটা কাহিনী গড়ে ওঠে তবে শান্তনু, গারট্রুড, মিত্রা ইত্যাদিকে

নিযে তা সম্ভব। পরে এ বিষয়ে আপনাদের মত নেযা সম্ভব হবে।

শোভন সামন্ত ও পীযূষ নিজেদের অত্যন্ত স্পেস্যালাইজড্ জীবিকার খাতিরে, এবং মিসেস তলাপাত্র নিছক প্রয়োজনে বিদায় নেবার পর দেখা গেল ভাগ্য মানুষকে অনেক সময়ে বঞ্চিত করে। অধ্যাপক শ্লুডার নিদ্রাহীনতাব রোগী। ডাক্তারের পরামর্শে রাত্রি তরুণ থাকতেই ঘুমের ওষুধ এবং শয্যা অবলম্বন করা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য, সুতরাং রাত এগারোটার আগেই তাঁকে যেতে হবে।

ভাগ্য এই কথাটা থেকেই মিত্রার মনে পড়ে থাকবে। সে তার পরিপুষ্ট সুন্দর বাঁ হাতখানি প্রবীরের হাতের উপরে রাখল। হাসি মুখে বলল, 'এখানে কিন্তু আলোর অভাব নেই।'

অধ্যাপক শ্লুডার বললেন, 'আচ্ছিবৎ, পামিস্ট্রি?'

প্রবীর বলল, 'না, না ও সব।'

বেলা প্রবীরের এই বিড়ম্বনায় খুশি হযে বলল 'তোমার অতীত কি বলে দেবো? সে কালে নির্ভুল ভাগ্য বলা তোমার গর্বের বিষয় ছিল।'

প্রবীর বলল, 'সে কালে যা বলতুম তা নির্ভুল হত কি না জানি না, এখন ভুল ভাগ্য বলতেও ভুলে গিয়েছি।'

কিন্তু কেউই প্রবীরের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। সবাই ঘিরে বসল। মিত্রার হাতটা ধরাই রইল প্রবীরের হাতে। সে বলল, ভাগ্যকে বিশ্বাস করার কি যুক্তি তা কিন্তু আমি বুঝতে পারি না।'

বেলা জনান্তিকে মিত্রাকে বলল, 'তোমার মনে পড়ছে? টেক্‌নিক্‌টা বদলায় নি দেখো।'

'অর্থাৎ নিজে বিশ্বাস করার যুক্তি খুঁজে পান না, অথচ যা বলেন তা একেবারে এক্‌জ্যাক্‌ট্?' অধ্যাপক শ্লুডার জিজ্ঞাসা করলেন।

শান্তনু বলল, 'নিজে অবিশ্বাস করেন তা কিন্তু বলেন নি।'

হাসিমুখে প্রবীর বলল, 'তা বটে, কথা দুটোর একটু তফাৎ আছে। কিন্তু শান্তনু কি বিশ্বাস করো ভাগ্য বলে কিছু আছে?'

শান্তনু বলল, 'আর্মি, এয়ারফোর্স, ম্যারাইন, না, ভাগ্য না মেনে উপায় নেই। এরকম প্রায়ই দেখা গিযেছে দুই বন্ধু ক্যাডেটের মধ্যে যে বেশি উজ্জ্বল সে অ্যাকশনে প্রথম ফায়ারেই শেষ হয়ে গেল ; অন্যজন ধীরে সুস্থে ধাপে ধাপে ফিল্ড ম্যার্শাল হযে রিটায়ার করে অবশেষে রাজনীতি করছে। ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যাবে?'

শ্লুডার বললেন, 'কিংবা বিজ্ঞানেব গবেষণা—কারো ভাগ্যে সারা জীবনের কিছুই আবিষ্কার হয় না, অন্য কারো হয়—এমনভাবে যে, তাকে ভাগ্যের দান না বলে পারা যায় না। কিংবা একই লোকেব বেলায় দেখা গিয়েছে, ত্রিশ বছর বয়সেই হঠাৎ যে আবিষ্কার করল, তারপর আরও পঞ্চাশ বছরে এতটুকু এগোতে পারল না।

বেলা খুব গম্ভীর সুরে বলল, 'তা ছাড়া বিজ্ঞানে যে সব দেশ বেশি এগিয়ে আছে বলে মনে করা হয় সেখানেও লটারির টিকিট প্রচুর বিক্রি হয়, যাতে বোঝা যায় জনসাধারণের মধ্যে ভাগ্যকে পরীক্ষা করার প্রবল ইচ্ছা আছে।'

ততক্ষণে প্রায় সবগুলো হাতই প্রবীরের দিকে এগিয়ে এসেছে।

বলা-বাহুল্য এটা একটা ডিনারান্তিক কৌতুক। হাত দেখা বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নয়। মিত্রার হাত প্রবীরেব হাতের উপরেই রইল, সে গারট্রুডের হাতের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'খুব অল্প দিনের মধ্যেই হবে।'

'কি?'

'এই মুহূর্তে যা কামনা করছ।'

শান্তনু এবার তার হাতটা গারট্রুডের হাতের পাশে রাখল, 'আমারটা দেখুন।'

প্রবীর গম্ভীরভাবে শান্তনুর লম্বাটে গড়নের আঙুলগুলোকে দেখতে লাগল। হাসিমুখে বলল, 'অসাধারণ হাত। প্যাশনেট এবং সিন্সিয়ার।

এরপরে ভাগ্য নিয়ে আরও খানিকটা আলাপ হল।

শান্তনু তার বন্ধুর গল্প বলল। তখন একটা বিশেষ ট্রেনিং হচ্ছিল। প্রথম গ্রুপে ছিল শান্তনু আর সাধারণ যা হয় না দ্বিতীয় গ্রুপে তার বন্ধু। বারই তারিখে প্রথম গ্রুপ, আর চোদ্দই দ্বিতীয় গ্রুপ। এখন তার বন্ধুর চোদ্দই তারিখে শহরে যাওয়ার দরকার ছিল। ওপরওয়ালাদের ধরাধরি করে সে আর তার বন্ধু গ্রুপ পাল্‌টে নিল। অফিস থেকে ফেরার পথে হঠাৎ যেন আবিষ্কার হল বারই মঙ্গলবার। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধুর মুখ ফ্যাকাসে এবং একটু পরেই গম্ভীর হয়ে গেল। মঙ্গলবার নাকি তার পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু তখন ফিরে গিয়ে উপরওয়ালাদের বলা যায় না, আবার আগের অ্যালটমেন্টে ফিরে যেতে। বারই তারিখে মেস হলে শান্তনু ঠাট্টা করে বলল, আজ কিন্তু মঙ্গলবার। বন্ধুর চকচকে মুখে চলন্ত কিছুর ছায়া পড়ল। সে দুই আঙুলের মধ্যে সিগারেট ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, আমার কথা কিন্তু মনে রেখো। শান্তনু মনে করতে চেষ্টা করল বন্ধু তাকে কী করতে অনুরোধ করেছে এর আগে। হতে পারে কোন চিঠি পোস্ট করা কিংবা লন্ড্রি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করাব আগেই বন্ধু এয়ারস্ট্রিপের দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। কারণ তখন স্ক্র্যাম্‌লিং সাইবেন বাজতে শুরু করেছে। এক, দুই। তৃতীয় জেটটাই তার বন্ধুর—রানওয়ের উপরেই, নাকি অবিশ্বাস্য, হ্যাঁ রানওয়ের উপরেই টেক অফের আগেই আগুন লেগে গেল। এখন শান্তনুর মাঝে মাঝেই মনে পড়ে বন্ধু তাকে বলেছিল, আমার কথা মনে রেখো।

গল্পটা হয়তো তেমনই আর একটি যা ভাগ্যকে রাজস্ব দিতে প্ররোচনা দেয়। মিত্রা শান্তনুর পিঠে হাত রাখল। তার চোখ দুটো যেন ছায়ায় ঢেকে গেল। দেখা গেল এরকম ধরনেব অভিজ্ঞতা আরও দু-একটি আছে। অধ্যাপক শ্লুডার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে একটি, এবং বেলা ঘবোয়া অভিজ্ঞতা থেকে একটি বলতে পারে। শ্লুডারের গল্পটা ততখানি ভাল নয়, যতটা কৌতুকেব। বেলার গল্প যতটা কৌতুকের তার চাইতে বেশ কৌতূহলের।

বেলার গল্প শুনে শ্লুডার হা হা করে হেসে উঠে দাঁড়ালেন। 'অনুমতি পেলে—'

মিত্রা বলল, 'এখুনি যাবেন?'

গারট্রুড বলল, 'তুমি কিন্তু এঁদের বলোনি, পাপা।'

শ্লুডার বললেন, 'ও, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। তবে তুমি একা কি পারবে, মা? বরং রিজে কিংবা অশোকায়। রিজ কি বল? বল তুমি এবার।'

গারট্রুড তখন উপস্থিত সকলকেই শনিবার রিজে ডিনারের নিমন্ত্রণ করল।

পার্টি ভাঙবার এটা একটা সুন্দর সূচনা হতে পারে। তা, রাত এগারোটা হয়েছে।

বেলা এবং প্রবীরও উঠে দাঁড়াল।

ম্যানসনের দরজার কাছে রীতিসম্মতভাবে বিদায় নিলেন অধ্যাপক। গাড়িতে গিয়ে বসলেন। দু তিন ফিট দূরে দাঁড়িয়ে মিত্রা প্রভৃতি। অনেকে শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গারট্রুড হঠাৎ বলল, শান্তনুর দিকে চকচকে চোখ তুলে বলল—আমাকে একটি ডেট দাও না কেন? তারপর যেন ছুটে পালাল। অর্থাৎ দু তিন ফিট জায়গার মধ্যে যতটুকু যেমন পালানো যায় এবং চশমার আড়াল থেকে যতটা চকচকে দেখাতে পারে সে। শান্তনু কিছু বলাব আগেই গারট্রুডের গাড়ি ড্রাইভের উপর দিয়ে চলতে শুরু করল।

মিত্রা বলল, 'মিস্ শ্লুডার ঠিকই বলেছে।' সিগারেট কেস এগিয়ে এল প্রবীরের দিকে। নিজে সে ধরাল।

প্রবীর বলল, 'বয়সে এটাই স্বাভাবিক।' মিত্রার কেস থেকে সিগারেট নিয়ে সেও লাইটার জ্বালল। তারপর এগিয়ে গিয়ে সে বেলার জন্য গাড়িব দরজা খুলে ধরল। গাড়িতে বসে বেলা এবং প্রবীর শুভরাত্রি জানাল মিত্রা এবং শান্তনুকে।

দু পাঁচ মিনিট প্রবীর যেন স্টিয়ারিং-এর উপরে বেলার হাতটাকে লক্ষ্য করল। একটু কি র‍্যাশ চলেছে। না সে রকম কোন আশঙ্কা নেই।

প্রবীর বলল, 'বাড়িতে ফিরবে?'

বেলা বলল, 'তোমার মন কি এখনও ভাল হয় নি?'

প্রবীব বলল, 'আমার মন? মানে—'

বেলা বলল, 'নতুবা পোর্টে এসে তোমাব মুখ খুলত।'

'পোর্ট? উঁ? আ—।'

বেলা বলল, 'কোথাও যেতে পারি আমরা, আচ্ছা হিপ্পিদের সম্বন্ধে—'

'না, সে বিষযে আমাব কোন গবেষণা নেই।' প্রবীর শেষ কথা বলাব সুবে বলল।

গাড়িটা যে অঞ্চল দিয়ে চলেছে তাকে এক কথায় ডাউন টাউন বলা চলে। সেকালে মহাদুর্ভাগ্যের লক্ষণ ছিল শয়নং হট্টমন্দিবে। রাস্তাব দুধারে আলোয ঝকমকে দোকানের প্রাচীর। শুধু এ বাস্তাতেই নয়, এটার সমান্তবাল কয়েকটিতে, এবং সেই সমান্তরাল শ্রেণীকে খণ্ডিত কবে প্রবাহিত অন্য সমান্তরাল শ্রেণী সেগুলিতেও দোকান এবং আরও দোকান। হাট হট্টগোল, কিংবা হট্টগোল কথাটা ঠিক হল, হট্টগোল, গণ্ডগোল ইত্যাদি শব্দে নেক্রপোলিসেব কোলাহল ধরা যায না।

কিন্তু অনুমান করি আমাদের এ আলোচনাটা নিরর্থক হল। অন্য জগত থেকে এলে তবেই চোখে পড়তে পাবে। কিংবা প্রবীবের অন্য মনেব উক্তি। প্রকৃতপক্ষে কোলাহল, বাত্রিব অত্যুজ্জ্বল আলো অতিশযিত গতিবেগ প্রবীবদের কাছে চমকে ওঠার মতো কিছু নয়। ববং যেন জীবনেব উত্তাপ। যদিও হঠাৎ কাবো মনে হতে পাবে এখানে আলোব অত্যধিক ব্যবহাবের ফলে আলো অন্ধকারে একরকমেব সমঝোতা দেখা দিয়েছে যেমন নাকি অত্যধিক অ্যান্টিবাযোটিক ব্যবহাবে বোগ বীজাণু ও ওযুধে সহঅবস্থানের সমঝোতা হতে পারে , যাকে আলো বলে মনে হচ্ছে আসলে তা আলোকপুষ্ট অন্ধকারেব পুঞ্জ।

এটা যে তাদেব চোখে প্রায স্বাভাবিক তার প্রমাণ বেলা গাড়ি চালাতে চালাতে গালগল্পেব সুবে বলল. 'মিত্রা, শান্তনু, মিসেস তলাপাত্র, যার নাম শশী তাদেব তুমি ঠিক প্লেস কবতে পাবছ তো, সান্ডেল।'

বেলা যা বলল তা ইতিহাসেব ভাযায এবকম দাঁড়াবে। আমাদেব দেশে কযেকটি পবিকল্পিত উন্নতির পর তখন সারা পৃথিবীতে যে বিসেশনের প্লাবন দেখা দিযেছিল তাব ধাক্কা এসে লেগেছে। সব দেশেব খবরেব কাগজে সেই একই আর্ত চিৎকার। কোন দেশই আব কিনতে চায না। মিল ফ্যাক্টবিব গুদাম থেকে মাল বাইবে যায় না। বন্ধ কর, ছাঁটাই কর, টাল সামলাও। পৃথিবীতে ব্যবসা যে অসুস্থ, বিশেষ বকমে অসুখ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কবা যায না। পৃথিবীর মোটবগাড়িব উৎপাদকরা অঙ্ক কষে দেখল পৃথিবীব মানুষেব মাথাপিছু এখনও একখানা গাড়ি এখনও পৃথিবীর সব মানুষেব মাথাপিছু বছবে পনেব গজ কাপড় হয না। তবে কেন মন্দা। তখন কথা উঠেছিল উৎপাদন কমাও, কেউ কেউ বললেন শুধুমাত্র সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদন কর। সমাজের প্রয়োজন খর্ব কবাব চেষ্টা এখন ব্যর্থ হবে।

এ রকম সময়ে সুরঞ্জিত তলাপাত্র তার টেকনোক্র্যাসী বজায় বাখতে কিছু মনে কবছিল। এই অবস্থায চিত্র সংগ্রহেব বদলে সুবঞ্জিত বায়োলজিব গবেষণায মন দিয়েছিল। যাকে সামাজিক জীবন বলে তা কেবল প্রৌঢ়ত্বে অবসন্ন। গ্রামের বাড়িতে লেটুস উৎপাদন করা, উলবোনা, মালিব সাহায্যহীন বাগান থেকে দুচারটে ফুল তুলে এনে সংক্ষিপ্ত আহার্যের ডিনার টেবল সাজানো, আর ডিনাবের পরে ঘরে বসে নভেল পড়াকে সামাজিক জীবন বলে না। মহিলাবা বাধ্য হয়ে বেঁচে আছি এটা বোঝার জন্যই এ সময়ে কখনও কখনও যাকে আগে এফেয়াব বলতো তাতে জড়িয়ে পড়তো। এরকম একটা সংক্ষিপ্ত, তীব্র-আস্বাদ একবাব ঘটেছিল শশীর। আর তারই ফলে শান্তনু। সেই অল্প বয়স্ক (পার্বত্য) আর্মিব অফিসাব অসুস্থ অবস্থায তখন শশীদের সিমলার বাড়িতে অতিথি।

এ সব মেয়েলি ব্যাপাবে নজর দেবার মন সুবঞ্জিতের কোন সময়েই ছিল না, তার তখন গবেষণার নেশায় সময়েরও অভাব। কাবণ গবেষণার নেশা বনেজঙ্গলে শিকারের নেশা, অথবা রাজনৈতিক নৌকায় টালমাটাল করার নেশার চাইতে কখনও কখনও নাকি তীব্রতর হয়। স্ত্রীলোক বলেও বটে, আর পারিবারিক সম্প্রীতি ছিল বলেও বটে, মিত্রাকে শশীব সাহায্যে এগোতে হয়েছিল। বেলার মন্তব্য · এদের ননদভাজের সম্বন্ধে বয়সের কিছু তফাৎ সত্ত্বেও সখ্যতা আছে।

তারপর আবার শান্তি এল। ততদিনে সুরঞ্জিতের গবেষণাজাত রেকসিন পণ্য হয়ে পূর্ব ইউরোপের বাজারে যেতে শুরু করেছে। কেউ কেউ বলে মানুষ আগের চাইতে বুদ্ধিমান হওয়ায় ফ্যাক্টরি মিলগুলোকে

ভোগ্যপণ্যের বদলে যুদ্ধের পণ্য উৎপাদন শুরু করে বিশেসন কাটিয়ে উঠেছিল। তুমি কি দেশের সব শক্তিসম্পদ দিয়ে পটকা ফানুষ তৈরি করে দুদিনে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে দীপালি করতে পার তবে ফ্যাক্টরি চালু হয় সেই দীপালির যোগাড় করতে, আর যা উৎপন্ন করে তার ক্রেতার জন্যও ভাবতে হবে না। উপরন্তু সেই দীপালির নেশা যদি অন্যদেরও ধরে তবে কিছু পটকা রপ্তানিও করতে পারবে। যে সময়ে পটকা এবং তার অনুষঙ্গ নিয়ে সকলে ব্যস্ত, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বন্ধ থাকে বলে ক্রমশ তার অভাব এবং পরে চাহিদা দেখা দেয়। বিসেশন কেটে যায়। কিন্তু অন্য কেউ কেউ বলে অধিকাংশ মানুষ আগের চাইতে বুদ্ধিমান হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে ধর্মের নামে প্রকৃত ঈশ্বরের নামে যুদ্ধ করার চাইতে প্রকৃত রাজনৈতিক মতবাদের নামে যুদ্ধ করা কম বর্বরোচিত নয়। কেউ কেউ এই সত্যটা উপলব্ধি করে, বড় বড় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নীতি যত তার চাইতে বেশি ব্যক্তিগত প্রবণতা কাজ করে থাকে।

বেলার মন্তব্য ফল ভালই হয়েছে প্রবীর। আমার এবং তোমার গত বিশ বছরের জীবনে যে অসুবিধা ও দুঃখ ছিল অথবা কখনও কখনও ব্যর্থতা মনে হয়েছিল এখন সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার তুলনায় তা সবই নগণ্য।

মিত্রাও একই কথা বলবে। বিসেশনের অভাব অভিযোগ, নিজেকে শাণিত অন্বিত করার চেষ্টা, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর বেদনা—পার হয়ে হয়ে বর্তমান জীবনে পৌঁছানো এমন কিছু ক্ষতির হয়নি। মিত্রার স্বামীর মৃত্যুটাকে পলিটিক্যাল সুইসাইড বলা হয়ে থাকে। যদিও কাগজে সেটা পোর্টের রাস্তায় গাড়ি সমেত জলে পড়ে যাওয়ার ঘটনা বলা হয়েছিল। ক্ষতির হয়নি? কি জানি কি হয়। গানের ব্যাপারে দেখা গিয়েছে বিশুদ্ধ স্বরসপ্তক প্রয়োগ করে যে রাগ তার তুলনায় যে রাগে স্বরসপ্তকের দু একটি বাদ দিতে হয় তা কোন অংশে ন্যূন নয়।

এ জায়গায় প্রবীরের মনে হল বেলার সম্বন্ধে প্রামাণিক মন্তব্য করার অভিজ্ঞতা প্রবীরের আছে। বেলার মুখের গঠনটাই এরকম যে তাকে কেউ সুন্দরী বলবে না, কিন্তু সব সময়েই প্রায় সব অবস্থাতেই একটা ঔজ্জ্বল্য যা মৃদু হওয়ার জন্য আকর্ষক। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি কল্পনা করে নাও। মনে করো কোন পার্টি থেকে বিদায় নেওয়ার মুখে হঠাৎ তুমি আবিষ্কার করলে তোমার পার্সটি খোয়া গিয়েছে। তখন সেই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পার্টির অনেক উজ্জ্বল সুন্দর মুখের উপর দিয়ে সরে সরে গিয়ে যে মুখের উপরে তোমার চোখ দুটি আশ্রয় পাবে তা অবশ্যই বেলার। অন্যপক্ষে মিত্রা রূপসী। একই দিনের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার প্রবীর নিজের কাছে স্বীকার করল। আর এর আগে তা করে থাকবে সুবর্ণের বক্সে দেখে স্কেচ করার সময়ে।

কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা ডাউন-টাউনের আলোক সমারোহের কথা বলছিলাম। বলেছিলাম এই আলো এবং কোলাহল প্রবীরদের গা সওয়া। দোকান সারিগুলোতে সাজানো একদম শেষ ফ্যাশানের পণ্য, রমণীদের ব্রোকেড, টেরিলিন, সিল্কের পোশাকে, অটোর চকচকে পালিশে, আলো প্রতিফলিত দ্বিগুণিত। মুচমুচে আধুনিকতম রীতরাগ গান, অটোর হংক্, কদাচিৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া জেটের কুইঙ্কারে উচ্চ-উচ্চকিত হাসির ঝাপটা লাগছে। এই রাত এগারোটাতেই।

হঠাৎ গাড়ির গতি কমল। যেন সিনেমার শেষ শো ভাঙছে এমন একটা চঞ্চল জনতা, ফুটপাত উপচে রাস্তায় পড়ছে। জুতোর শাপ্ শাপ্ খুটখাট্ শাড়ির খস্ খস্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনুচ্চ গলার হাসি, আদুরে খাদে টুকরো আলাপ। প্রবীর চোখ তুলে দেখল বিজই বটে।

বেলা একটা চাপা উত্তেজনায় বলল 'হিপ্পি?'

প্রবীর বলল, 'তুমি তাদের দেখতে উৎসুক, বেলা, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা কোন ট্রেডের কম্যুনিটি ডিনার শেষ হল।

তা হলে এটা কি সেই ব্যাপার যে সকালের কাগজে দেখা কোন বিজ্ঞাপন যার উপর দিয়ে চোখ গড়িয়ে দিয়েছিল আর যার ফলে (বিভ্যালশন) বিতৃষ্ণার আকর্ষণ নিজের অজ্ঞাতে এই পথটাকে বাছাই করে নিয়েছে? বেলা মৃদুভাবে শিউরে উঠল। স্টিয়ারিং-এ হাত দ্বিধা করছে যেন তার। 'তা হলে আমরা ফোরম্যানিটির মাঝখানে গিয়ে পড়ব?'

ফোরম্যানিটি? ও, আচ্ছা, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। শব্দটা তোমারই দান। প্রায় একই ওজন একই ভর এবং আয়তন ; হিউম্যানিটি—ফোরম্যানিটি।'

বেলা বলল, 'আ, সান্ডেল, আবার? তুমি যে শব্দের পুঁজিপতি কারবারী বারবার তা ধরা পড়বে কেন?'

প্রি-র‍্যাফায়েলাইট্ ঝোঁক নিয়ে বর্ণনা করা যায়। বব্ অথবা শিঙ্গল করা চুলে কারো কারো পিগটেইল, চতুর্থ পাঁজরার কাছে একটিমাত্র ক্লাম্পে আঁটা রক্তলাল, সমুদ্রনীল, কিংবা অলিভ সবুজ টিসার্ট, কানে বড় ফাঁদের মুক্তো বা প্রবাল গাঁথা রিং। উরুসন্ধি থেকে পাঁচ ছ ইঞ্চি নিচে নামতে পেরেছে এমন খাটো স্কার্ট। পায়ে ছুঁচলো উঁচু গোড়ালির জুতোর উপরে কদম ফুলের মতো বড় এবং তেমন কেশর সমেত ঘুন্টি। জুতোর লাল, নীল অথবা সবুজ রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কোমরবন্ধ থেকে যেন সার্বিসপিস্তল অথবা রোম্যান তরোয়ালের খাপ ঝুলছে। বাহুর উপরে ভাঁজ করা হাল্কা ক্লোক। ছবি দেখা থাকলে অষ্টাদশ শতকের বাকেনিয়ারদের কথা মনে আসবে। আর তা হওয়াই ফ্যাশানটার উদ্দেশ্য। কোমরবন্দ থেকে যা ঝুলছে তা অবশ্যই মারাত্মক অস্ত্র নয়, হাক্সলির নতুন জগত হলে বলা যেত পরিবার পরিকল্পনার সরঞ্জাম। এগুলো ভ্যানিটিব্যাগ। কিন্তু নিরাবরণ সুগঠিত নিম্নাঙ্গের প্রান্তদেশে এই নতুন পরিকল্পনার জুতোগুলোই সব চাইতে বেশি চোখে পড়ে।

ধীরে ধীরে এই জনঘূর্ণির মাঝখান দিয়ে পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিতে নিতে বলল বেলা 'লেখার ভাষায় কথা বলা ক্ষমা করবে?'

'কিছু বলতে চাইছ? এরা কিন্তু হিপ্পি নয়। অত্যন্ত সুমার্জিত দেখ, চকচকে দেখ। কাঁধে গামছা অথবা কম্বল, মাথায় ক্যানিং-এর টোকা কিংবা খেজুর পাতার টুপি দেখলে বরং—'

বেলা বলল, 'তা হলে তো হিপ্পিদের সম্বন্ধে প্রেডিক্ট করাই হল। তাই নয? জুতোগুলোই বেশি চোখে পড়ছে না? সব যেন ফিতে বাঁধা বুট।'

'সুরাক্সিন অবশ্যই জুতোর ব্যবসাকে—'

'না। বরং এসব জুতোই তোমার সেই ছেঁড়া বুটের চামড়ায় তৈরি।

মির্জাগালিব এভেন্যুতে এসে পিপাসা পেলো বেলার। সুতরাং প্রবীরের ফ্ল্যাটে যেতে হল। প্রবীর সেখানে বলল, খুঁজে দেখ কিছু পাও কি না। শ্যাম্পেনই পাওয়া গেল। সেই শ্যাম্পেনের উপরে প্রবীরের গাম্ভীর্যের চারিদিকে বেলার ছোটছোট হাসির ঢেউ আর সোসাইটি টুকরো গল্প ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বেড়াল। অবশেষে বেলার হাই উঠল। কারণ তখন সত্যি ঘুমের সময়। রাত দুটো হযেছে।

বেলার বাড়িতে যখন পৌঁছাল তারা এখন এটাই সমর্থিত হল। বসবার ঘরে সুরথ অবশ্য জেগেছিল বই হাতে। অবশ্য চোখের চারিদিকে ঘুম লেগেছে।

'পড়ছ!' বলল প্রবীর দরজায় দাঁড়িয়ে।

'কি করা যায় বলো, বার্ডস্, র‍্যাটস অ্যান্ড ফিশেস। লেখিকা তার উপরে বেলার কাজন মিত্রা। তা মন্দ নয়। দেখা যাচ্ছে ওদের ব্যবহার দিয়ে মানুষের ব্যবহারের অর্থ করা যায়।' হাই তুলল সুরথ। 'তাই বলে এখন আর বসবে না।' বেলা বলল।

প্রবীরের ও সেই সঙ্কল্প। সে হাসিমুখে বলল,' এমন কি থিয়েটারের কথাও নয়। গুডনাউট। গুডনাইট।'

এষা ৪বর্ষ ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা ১৩৭৭

শহরে ছবির মরসুম শেষ হল, এ কথাটা থেকেই বোঝা যায়, এখন এটা নভেম্বর মাস। সূর্যের সঙ্গে আমাদের টেকনোলজি এখনও পেরে ওঠেনি বলে কলকেতা সহরে এখন শীতটা আরও গাঢ় হয়েছে। কিন্তু কী তার প্রমাণ? সমাজতত্ত্ববিশারদেরা বলেন তোমার গ্রোসারকে লক্ষ্য করো, কিংবা আগে যাকে জগুবাবুর বাজার বলত এখন যার নাম ক্যাস্ট্রো সুপার মার্ট সেখানে যদি যেতে পার দেখবে লেটুস, গাজর, কফি কী পরিমাণে ও কত টাটকা অবস্থায় জমা আছে। অবশ্যই বলতে পারা যায় নভেম্বরেই কি সব লোক তা খেতে পারে? পারে না, কারণ তখন যেমন এখনও তেমন এসব আনাজ নতুন উঠলে একটু বেশি সুস্বাদ থাকে এবং দামেও চড়া। সেই সুপার মার্টে এখন টেকনোক্র্যাটদের ভিড়, মাঝে-মাঝে দু-একজন বেশি ওভারটাইমযুক্ত ফোরম্যানকে দেখতে পাবে।

নিশ্চিতই এ নিয়ে হৃদয়কে উত্তপ্ত করার কারণ নেই। টেকনোক্র্যাটরা যেমন আছে (এবং টেকনোক্র্যাট বলতে এখন তাদেরও বোঝায়, আগে যাদের বুরোক্র্যাট বলা হত, আর তা যুক্তিসঙ্গতও বটে কারণ পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার কিংবা ডিস্ট্রিক্ট সিক্রেট সার্ভিসের কর্তার যে কর্তব্যভার তাও কি বিশেষভাবেই টেকনিক্যাল নয়, যদিও তারা টেকনোক্র্যাসির নিতান্ত নিচের স্তরের যেহেতু তখনকার দিনে রাইটার্স বিল্ডিংস ব্যুরো এবং জেলার ব্যুরোতে যেমন তফাৎ ছিল এখনও তা আছে এবং আপাতদৃষ্টিতে একটা সমতার ভাব থাকলেও এখনকার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর তাঁরাও মনে-মনে জানেন সেকালে যেমন এখনও তেমন প্রকৃতপক্ষে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ না-এলে বুরোক্র্যাট অর্থাৎ এখনকার ভাষায় টেকনোক্র্যাট হওয়া যায় না ; এবং সে সত্ত্বেও এটাও দ্রষ্টব্য সমতার মধ্যে যেমন কেউ-কেউ বেশি-সমান, অনেক টেকনোক্র্যাসির দাবির মধ্যে প্রকৃত টেকনোক্র্যাসির দাবি করে থাকে নিরঞ্জন ঘোষালদের মতো লোকেরা)। কিন্তু আসল কথা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, বলছিলুম টেকনো-ক্র্যাটরা যেমন আছে, তেমন আছে তাদের বেতনের জ্যোতিষশাস্ত্রসুলভ অঙ্কগুলি। কি করবে তারা তা দিয়ে? সম্পত্তি করতে পারো না। কিংবা একমাত্র সম্পত্তি যা করতে পারো তা শহরের উপকণ্ঠে দশমিক পাঁচ একর জমির উপরে কুটীর। তুমি তাকে সাততলা করতে পারো। লাভ? ভাড়া দেওয়া চলবে না তো। ছেলেকে দিয়ে যাবে? দেয়ও বটে। কিন্তু তাতে ছেলেরই আপত্তি, তাতে তার নিজের অর্থে দশমিক পাঁচ সংগ্রহ করার সুখ ও সুযোগ নষ্ট হচ্ছে, এমনই আইন। আইনই যা প্রতি পদক্ষেপে, এমনকী চেয়ারে বসে থেকেও আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে তোমার কব্জিতে অনুভব করবে, যদিও একসময়ে আর-দশটা অভ্যাসের মতো সহনীয় হয়। সুতরাং সুপার মার্টেই তার অনেক দামের কেনাকাটায় ব্যয় করার দিকে টেকনোক্র্যাটদের ঝোঁক আছে।

আসলে কিন্তু যাতে শীতের তারতম্য বোঝায় তা স্মগের তারতম্য। দেশে-দেশে যে-স্মগের তারতম্য তাছাড়াও একই দেশের বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে তফাৎ আছে। কলকেতার স্মগ সম্বন্ধে নানা রকম চিন্তা করা হয়েছে। তার মূল কারণ যে কলকারখানা এবং অটোমোবাইলের একজস্ট সে তো সবাই জানে। সমস্যার সমাধানে দেশের ফিজিসিস্ট, কেমিস্ট, মনস্তত্ত্ববিশারদ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকরা মাথা খাটাচ্ছে। এখন থেকে দশ বছর আগে এক সম্পাদক প্রেরণার এক ভাস্বর মুহূর্তে তার পত্রিকায় নানাবিধ অব্যবস্থার দারুণ সমালোচনা করতে-করতে প্রস্তাব করেছিল কয়লা পোড়ানো ডিজেল পোড়ানো আইন করে বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত কলকারখানা, রান্না, অ্যাটমিক এনার্জিজাত ইলেকট্রিসিটিতে চলবে। কিন্তু তাও যদি সম্ভব হয় রেলওয়ে, ট্রেন, ট্রাম সবই না-হয় ইলেক্‌ট্রিসিটিতে চলল , ট্যাক্সি, লিমোসিন, জাগুয়ার, প্যাকার্ড ইত্যাদির কী হবে? সেই দুঃসাহসী বিবেকবান সম্পাদক তখন লিখেছিল ট্রাম যদি মাথার উপর টাঙানো ইলেকট্রিক তার ছুঁয়ে চলতে পার তবে অটোমোবাইলগুলিই-বা চলবে না কেন? প্রত্যেক রাস্তার উপরে তার চওড়াই অনুসারে সাত আট দশ পনের পঁচিশটা তার টাঙাতে কে আটকাচ্ছে। সে তার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে অটোমোবাইলগুলি পর পর লাইন বেঁধে চলবে।

অবশ্যই সেই সম্পাদকের কথা কেউ শোনেনি। কারণ (১) আমাদের দেশের তুলনায় অন্যদেশে স্মগ আরও বেশি গভীর হলেও এ রকম কিছু তারা করেনি, এবং তারা না-করলে আমরা করি না, (২) পরিত্যক্ত যুদ্ধ জাহাজ এবং প্রাচীন হয়ে যাওয়া টাইপের এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্ক বিক্রি করে আমাদের দেশ তত ধনী হতে পারেনি যে তার খাটাবে, (৩) মানুষের মনের মধ্যে তার পুরনো চালচলনের দিকে এক ভয়ঙ্কর রকমের টান আছে। স্মগ ব্যাপারটা ক্রমশ অগ্রসর হলেও এখন কলকেতার আবহাওয়ার অঙ্গ। সুতরাং তাকে রাতারাতি বদলে দিলে ওয়ে অব লাইফ বদলে যায় না? সুতরাং কলকেতায় তার ফ্রিলান্স মোটর মেকানিক, এবং ক্যাবি এবং স্মগ থেকে গিয়েছে। নতুনত্ব যা তা ওজেন যন্ত্র। অক্সিজেন জেনারেটর থেকেই ওজেন। আগে যেমন ফ্রিজ, এয়ারকুলার, প্রভৃতি বিয়েতে যৌতুক দেয়া হত এখন তার সঙ্গে উপরন্তু ওজেন দেয়া হয়। ঘরেই থাকে ছোট হলে, বড় হলে বাথরুমের মাপের একটা ঘর করে দিলেই হয় তার জন্য, সেখানে বসেই নলে নলে ঘরে ঘরে তা ছড়ানো যায়।

এ শীতের স্মগ এড়ানোর অন্য আর এক উপায় সহরের বাইরে চলে যাওয়া এবং আয় অনুসারে কুলু,

সিমলা, নেপাল, তরাই থেকে শুরু করে, পিটসবার্গ, প্যাটাগোনিয়া, আরিজোনা, যে কোন জায়গায় অথবা এমন কি জাহাজে করে প্যাসিফিকেও যাওয়া যায়। এই জাহাজগুলোর গন্তব্য নেই, ভেসে বেড়ানোই কাজ। এখন আর সেকালের মতো বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে বেড়ানো বন্ধ হয় না, যেহেতু ভ্রমণে ব্যয়িত অর্থ সাধারণ বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সে যাই হোক, মাধবী ঘোষালের হাউসকীপার সুরঙ্গমা মাধবীর ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে করতে এরকমই চিন্তা করছিল। বেলা নটা বাজে, ফ্ল্যাট এখনও নিঃশব্দ। স্টোভে একটা মুরগী সিদ্ধ হচ্ছে, এই সুযোগে সুরঙ্গমা খবরের কাগজ খুলে প্রথম চায়ের কাপ শেষ করতে করতে নানা ভ্রমণকেন্দ্রের বিজ্ঞাপনের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। তার ফলেই এই চিন্তা। অবশ্যই বলা যেতে পারে এই চিন্তায় নতুনত্ব কিছু নেই যেহেতু স্মগ এবং তার সম্বন্ধে নানা চিন্তা সব কালকাটানেরই সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সুরঙ্গমাকে যারা বিশেষভাবে চেনে তাদের সন্দেহ হবে এরকম তীর্যক দৃষ্টিতে কোন বিষয়কে দেখার মূলে তার স্বামীর প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, সেই ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের মাঝারি মাপের নেতার।

সুরঙ্গমার নিজের আয় তার স্বামীর আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একটা অঙ্ক তৈরি করে না যা দিয়ে ফি বছর সপরিবারে কলকারখানাহীন এমন কি অটোমোবাইলের বদলে পনি চলে এমন কোন পাহাড়ী উপত্যকায় যেতে পারে। প্যাসিফিকের উৎসব-জাহাজে ভেসে বেড়ানো দূরের কথা। ইন্‌স্টলমেন্টে একটা সাধারণ চেহারার ওভেন কিনতে নিশ্চয়ই পারে তারা এবং তিন বছরের ভবিষ্যৎ আয়ের একটা বড় ভগ্নাংশ তার জন্য বাঁধাও দেয়া যায়। কিন্তু তাহলে গাড়ি কেনার ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করতে হয়। অথচ তার দুই মেয়েই এখন বড় হয়েছে। নিজেদের গাড়ি ছিল না। নিজেরা গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে হাত রাখেনি এটা প্রায় অখ্যাতির সামিল হতে পারে , এবং সুরঙ্গমার এই মত আমরা আগে থেকেই জানি যে এরকম অভাববোধ মনের সাংস্কৃতিক গঠনের মধ্যেও কিছু অভাব রেখে যায় বলে মেয়েদের বেলা তেমন হোক তা সে চায় না।

সুরঙ্গমা কিছুটা কনজারভেটিভও বটে। কেন? তা কি পেটিবুর্জোয়া সুলভ নিজের অভাবকে নীতিতে পরিণত করা, যার প্রান্তিক উদাহরণ বুনো রামনাথ? সে যাই হোক, সে যে রক্ষণশীল তার প্রমাণ এই যে বিশ বাইশ বছরে পুরনো হয়ে স্থায়িত্ব প্রমাণ করার আগে সে কোন বিষয়ে হাত বাড়ায় না। এখনই একটা প্রমাণ দেযা যায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তার কপালে না থাক, বাঁকা সিঁথির মধ্যে খুব সরু করে দেয়া সোনালি সবুজের একটা রেখা আছে , সিঁদুর না হলেও তারই আভাস। তার চোখের চারিদিকে উপরের ও নিচের পাতা হাল্কা কালো দিয়ে রং করা, যার ফলে চোখের কোলে সব সময়েই কালিমা, অত্যধিক ব্যবহৃতা নারীর যেমন হতে পারে, এবং এককালে যেমন কালো করা ফ্যাশান ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে কপালে বা গালে কোন রং করে না। এবং সে জন্যই, এই মনোভঙ্গির জন্যই, কলকেতার স্মগ তার কাছে তেমন দুঃসহ কিছু নয়।

মুরগিটা স্টিমে সিদ্ধ হচ্ছে, ঘড়ির কাঁটা দেখে নামানো যাবে। কাগজের পাতা উল্টাল সুরঙ্গমা।

যখন নটা ত্রিশ হয়েছে তখন সে কান পাতলো। এতক্ষণে মাধবীর চটির শব্দ শুনতে পাওয়া উচিত। তা না হলে ঠিক দশটার জন্য যে প্রাতরাশ সে গুছিয়ে তুলছে তা ধোঁয়ানো গরমে থাকবে না যখন দেরি করে টেবলে আসবে মাধবী।

অথচ কাল মাধবীর তেমন দেরি হয়নি। আর ডিনারে তেমন কিছু উচ্ছ্বাসও ছিল না। তিনজন ছিল ডিনারে—মাধবী, গীতা পাবকর এবং দাড়িপরা সেই দর্শনের ছাত্রটি যে নাকি আগে একদিন একটা বই উপহার দিয়ে গিয়েছিল মাধবীকে। এই দ্বিতীয় ডিনার হল মাধবীর ঘরে ছাত্রটির। কী যেন নাম? সুরঙ্গমার স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ নয় কিন্তু নামটা সে মনে করতে পারল। রাজেন। এগারোটার সময়ে মাধবী বলেছিল, তুমি শোও গে সুরঙ্গমা। সুরঙ্গমা আর কিছু লাগবে না জেনে রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে নিজের বিছানায় শুতে গিয়েছিল। তখনই ঘুম আসেনি। অনুমান ঘন্টাখানেক ঘুম এবং জেগে থাকার মাঝখানে ছিল সে এবং তারই এক সময়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার, ল্যান্ডিং-এর উপরে কথা বলার শব্দ কানে গিয়েছিল তার।

অবশ্য গীতা পাবকরকে সে দেখামাত্রই চিনেছে এমন নয়। সিনেমা দেখার ফলে চেনা চেনা লাগলেও

আপনাকে চিনেছি এমন কিছু ভঙ্গি কবা যায় না। তাব অনেক কাবণেব মধ্যে এটাও একটা যে হাউসকীপাবেব পক্ষে তেমন কবা প্রফেশনাল এটিকেট নয়। এ ক্ষেত্রে মাধবী পবিচয় কবিয়ে দিয়েছিল। আব তাতে সুবঙ্গমা খুশিই হয়েছিল। সে যে গীতাব ফ্যান তা নয়, তাহলেও গীতা যে মূল্যবান অতিথি তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে গীতাও ভাবি সুন্দব অমাযিক ব্যবহাব কবেছিল। অত বড অ্যাকট্রেস হয়েও।

হাউসকীপাবদেব এমন স্বাধীনতা সাধাবণভাবে দেয়া থাকে না, কিন্তু সুবঙ্গমা মাঝে মাঝে মাধবীব ঘুম ভাঙায় বটে নিবঞ্জন ঘোষালেব সঙ্গে তাব জুডিশিয়াল সেপাবেশানেব সেই ঘটনাটাব পব থেকে।

প্যান্ট্রি থেকে লিভিংরুমে যাওযাব একটা বাডতি চাবি তাব কাছে। তা দিযে লিভিংরুমে তা থেকে শোবাব ঘবে ঢুকল সুবঙ্গমা।

শোবাব ঘবেব আলোটা লিভিংরুমেব চাইতে কম উজ্জ্বল, কাবণ লিভিং রুমে ইলেক্‌ট্রিকেব আলো ছাডাও প্লাস্টিকেব পর্দা বসানো সিলিং লাইট দিযে বেলা ন'টাব পব স্বর্গ চোযানো আলো খানিকটা আসে। এসেছেও তা। কিন্তু সুবঙ্গমা লক্ষ কবল পর্দাব নিচে ও উপবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শোবাব ঘবে এত আলো থাকাটাই অযুক্তিক হয় যদি মাধবী জেগে না থাকে।

পর্দাটা সবাল সুবঙ্গমা আব তখন সে অবাক হল। নেটেব আডাল সত্ত্বেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাধবী এখনও বিছানাতেই। তাহলে এমন স্পষ্ট আলো থাকা উচিত নয়। এখনও সে যেন ঘুমাচ্ছে, অর্ধেকটাব চাইতে ববং বেশি যেন উপুড হয়ে শুয়ে আছে সে। একখানা হাত মাথাব তলে, হাত বেযে চুল ছডিয়ে আছে, উঁচুতে তোলা হাতেব নিচে একটা স্তনেব আভাস। মাধবী অবশ্যই সুন্দবী, আব তাকে সুন্দবই দেখাচ্ছে এখন। নেট সত্ত্বেও আলো গিযে পডেছে তাব সুন্দব উজ্জ্বল ত্বকে। একই দৃশ্য পৃথক মনে পৃথক ভাবেব উদ্রেক কবে থাকে। বিকিনিপবা মাধবীব অনেক ছবি সিনেমাব পর্দাতেই দেখা যায়। এখানে সেই বিকিনিও অনুপস্থিত। সুতবাং একটু নতুন দেখাচ্ছে বটে, যেন সেকালেব কোন চিত্রকবেব আঁকা। কিন্তু সুবঙ্গমাব চোখে তাব চাইতে স্পষ্ট হয়ে পডল বিছানাব অন্য বালিশজোডা যা মাধবীব বালিশেব পাশে দেখা যাচ্ছে।

আব আলোও তাহলে সেজন্য এত উজ্জ্বল, আব ঘবেব উত্তাপও অন্তত পাঁচাওব ডিগ্রিতে তোলা, অর্থাৎ পাশেব বালিশ জোডা থেকে মাধবীকে দেখা হয়েছিল ঘুম ভাঙাব পবেও এই সকালে।

অবাবই হল সুবঙ্গমা, তাব ঠোঁটেব কাছে একটা প্রশ্নেব ভাঁজ পডল। তাহলে ডিনাব শেষে বাজেন থেকে গিযেছিল? সুবঙ্গমাব চোখ দুটো স্নিগ্ধ হল—সেই পুবনো গল্প। মাধবীব মতো একজনেব মনে সঙ্গহীনতা খুবই প্রবল চাপ সৃষ্টি কবতে পাবে। কিন্তু প্রশ্রয় দিলেও, সুবঙ্গমা ভাবল তাব পিছিয়ে যাওযা উচিত কাবণ এ দবজা অথবা সে দবজায় বাজেন এসে পডতে পাবে, আব তা হলে জানাজানি হতে বাকি থাকে না। সাক্ষী হয়ে ডাইভোর্স কোর্টে যাওয়া হাউসকীপাবেব প্রফেশনেব পক্ষে খুবই ক্ষতিকব।

পিছিযে গেল সুবঙ্গমা। বোঝা যাচ্ছে দেবি হবে ব্রেকফাস্টেব। আচ্ছা তা হোক। কি এমন বয়স হয়েছে মাধবীব? কত ছেলেমানুষই না তাকে দেখাচ্ছে নেটেব আডালে ঘবেব এই কৃত্রিম বোদ পোযাতে।

সুবঙ্গমাব পাযেব শব্দ ঠিক কানে গিয়েছিল তা নয়। কিন্তু মাধবী অনুভব কবল যেন তাব ওঠাব সময় হয়েছে। আব সে যেন ক্লান্ত এবং দুঃখিত কোন কাবণে। আব তাবপবে আবাব সে চোখ বুঁজল। মাথাটাকে ভাব বোধ হচ্ছে একটু। জিভটাও যেন।

হয় কাল বাতে ঘুমিয়ে পডাব আগে সে অনেকক্ষণ চিন্তা কবেছিল। কিংবা সকালে ঘুমেব গাঢতা কমে যাওযাব পবে সে চিন্তা কবে থাকবে, কতটুকু চিন্তা, আব কতটুকু স্বপ্নেব ঘোবে দেখা যখন বলা যায না। সে চিন্তাটাব সাবাংশ একটা ছবিব মতো সে দেখতে পেল। সাধাবণত আমবা বই-এ যেমন লেখা থাকে তেমন কবেই চিন্তা কবি। লাইনে লাইনে এগিযে যাই চিন্তাকে অনুসবণ কবে কবে। ছবিব চিন্তা একই বাবে চোখে পডে। বলতে পাবা যায় সবটুকু ছবিব মত ডিটেইলস্ একই বাবে দেখা সম্ভব নয়। তা না হলেও মোট বক্তব্যটা ক্রমশ বেশি স্পষ্ট হয়।

সে ভেবেছিল কলগার্লদেব কথাই। কলগার্ল তেমন একজন যে প্রকাশ্যে স্কুলে শিক্ষিকা। যে শিক্ষিকা ছিল মাধবী ঘোষালেব জননী, আব তখন তাব নাম মাধবীও ছিল না। শিক্ষিকাদেব বেতন তখনই অর্থাৎ দু'দশক আগেই বেশ খানিকটা বেডেছে বটে আন্দোলনেব ফলে, কিন্তু তখনও তা এক মাসে এয়ার

হোস্টেসের বেতনের সমান নয়, কলগার্ল এর সাতদিনের উপার্জনের চাইতে কম, সিনেমা অভিনেত্রীর আয়ের কথা না তোলাই ভাল। অর্থোপার্জনই তো শিক্ষিকা হওয়ার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য অন্য ভাবে যদি আরও সার্থকশ্রম হয় তা হলে ক্ষতি কি? আর কলগার্ল প্রকাশ্যে না হলেও চলে, দোভাষীর কাজও করতো তার জননী, দোভাষী এবং গাইড।

ভালবাসা সম্বন্ধে পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। মাধবীর জননী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই নিজের বলে পরিচিত না করে, খোলা বই-এর মতো রেখেছিল মাধবীর সামনে। ভালবাসা? কাবণ মাধবী বড় হয়ে কলগার্ল হবে এটাই আশা করেছিল তার জননী। কারণ সে জননী ছিল একজন সৎ কলগার্ল। এফিসিয়েন্ট কলগার্ল , এবং সে প্রাণপণে বিশ্বাস করতো তুমি কি পেলে সেটাই বড় কথা, কি করে পেলে তা ভাবে সেকেলে লোক। বেশ কথা, এ কি শুধু কলগার্লদের বেলায়? কি করে বিপ্লব হয়, কি করে ভোট পাওয়া যায় সর্বত্রই কি একথা খাটে না? তুমি ক্ষমতা পেয়েছ এটাই বড কথা, কি করে তা পেলে সে সব কথা ভাবে যারা পবলোকে ও পারলৌকিকে বিশ্বাস কবে, আর পবলোক তো কথার কথা মাত্রই।

ভালবাসা? মাধবীর জননী তাতে নিশ্চয দক্ষ ছিল, নতুবা প্রায় এক দশক তার অর্থোপার্জন মোটামুটি ভাল থাকবে কেন? অন্তত একজন বুদ্ধিমান পুরুষকে নতুবা পর পব পাঁচ ছটি সিজন ধরে রাখতে পেরেছিল কেন? আর তা ছাড়া সে মহিলাটি কখনও কোন প্রতিবিপ্লবী ডোপ-পেডলার অথবা ফাটকাবাজকে সঙ্গ দেয়নি, এক রাত্রির জন্যও ভালবাসেনি। বরং তাব এই এক রীতি ছিল যতদূর সম্ভব সমধর্মী হতে হবে। একবার সে এক ডিপ্লোম্যাটকে সঙ্গ দিয়েছিল, যে নাকি বায়োলজিস্ট ছিল প্রথম জীবনে। সংবাদটা পেযে সে নিজের ব্যাক খুঁজে বায়োলজির বই বার করে হাতে যতটুকু সময় ছিল পড়ে নিযেছিল। অবশ্য ততটা পড়েনি যাতে নিজেকে ক্লান্ত দেখাবে। আর তা ছাড়া করুণাবতী ছিল তার জননী। ধন্যবাদ তাঁকে। কাবণ মাধবী ঘোষাল দুঃখ সত্ত্বেও বেঁচে আনন্দিত। তাঁকে ধন্যবাদ, যখন মাধবী এসেছে জানতে পেরেছিল তখন খুব সহজ উপায়ে তাকে এই আলো থেকে সরিয়ে দেয়নি। মাধবী মুখ তুলল। আলোটা ঘরে। ঘবেব উত্তাপটা আবামদাযক। পাযের শব্দ পেল সে। সুরঙ্গমা ব্রেকফাস্টেব আয়োজন করছে? ভাবি তৃপ্তিদাযক সুরঙ্গমার ব্রেকফাস্ট, ডিনারের চাইতেও ভাল। ধন্যবাদ দিতেই হয়। সে তো সহজেই মাধবীকে না আসতে দিতে পাবতো।

তবু ভালবাসার কথা যদি বলো—তা যদি পবিবাবের জন্য পবিকল্পনায নিযুক্ত হতে পারে, তবে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য নিযুক্ত হবে না কেন? ভালবাসা এখন আর সেই আবেগভূয়িষ্ঠ আকর্ষণ নয় যা শরীর ও মনকে দুর্জ্ঞেয় দুর্নিবার বিদ্যুতের মতো টানে, ঝড়েব মতো গ্রাস কবে। হয়তো এখনও বিদ্যুত, তবে তাবে তারে চলা সুইচের সাহায্যে অফ্ অন্ করা যায় পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে। নিজেকে ভালবাসার জন্য নানা রকমে প্রস্তুত করে। সে নিজেই কি নিজের সম্বন্ধে পরিকল্পনার জন্য নিরঞ্জনকে দূবে ঠেলে দেয়নি।

মাধবী উঠে বসল। নিজেকে সে রকম অবস্থায় দেখতে পেল। লম্বা আলখেল্লার মতো ঢিলে সেমিজটা তুলে গাযে দিল। একটু তাড়াতাড়ি করল সে। কারণ সে অনুভব করল কিছু যাকে অন্য ক্ষেত্রে সঙ্কোচ বলা যেত, কিন্তু ভুললে চলবে না এক সময়ে মাধবী বেলি-ড্যানসার ছিল। গলার ফিতেটা টেনে বাঁধল না বলে বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত খোলা রইল।

কপাল থেকে চুল পিছন দিকে ঠেলে দিযে সে ভাবল, এসব দুঃখের কথা মনে হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? মাথাটা ভার বলে?

ও, হাঁ, সেই সিগারেট কেসটা তাকে কষ্ট দিয়েছিল বটে কিন্তু গীতা কি সত্যি ভাবতে পারে? অথচ তাই মনে হয়েছিল। তখন ডিনার শেষ হয়েছে। রাজেনকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। সে মর‍্যালিটি সম্বন্ধে বলতে শুরু কবেছিল। সিগারেট কেসটাকে বার করেছিল গীতা, সোনার উপরে ক্ষুদে ক্ষুদে হীরে দিয়ে ইংরেজি জি পি এই অক্ষর দুটি লেখা। সত্যি সুদৃশ্য। সিগারেট কেস বার করে কিন্তু যেন একটু ইতস্তত করে সেটাকে না খুলে টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছিল গীতা। তখনই দুষ্টুমি বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল মাধবীর। নিজের সিগারেট কেসটা অনায়াসেই উঠে গিয়ে আনতে পারতো কিংবা গীতাকে ইঙ্গিত করতে পারতো সিগারেট দিতে। তা না করে যেন গীতার সিগারেট কেসটার উপরে তার আদেখলেপনা জন্মেছে এমনভাবে

সেদিকে হাত বাড়িয়েছিল সে। আর ঠিক তখনই সেটাকে সরিয়ে নিয়েছিল গীতা। এটা একটা হাসির হাত কাড়াকাড়ির ব্যাপার হতে পারতো। কিন্তু মনোভাব তো বোঝা যায় চোখে মুখে। অদ্ভুত রকমের একটা ব্যস্ততা দেখা দিয়েছিল গীতার ভঙ্গিতে , তার চোখের দৃষ্টিতে ক্রুদ্ধ তিরস্কারের মতোই কিছু ছিল যা চাপতে চেষ্টা করায় অভিনয়ের চাইতে বরং সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। ঠোঁটের কোণ কঠিন। আর তা রাজেনের চোখও এড়ায়নি। সে তার কথার মধ্যে থেমে গিয়েছিল, যেন সঙ্কোচে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, যখন গীতা ছোঁ মেরে তার সিগারেট কেসটা তুলে নিল। তখন তীব্রভাবে, তার মনে ক্ষত তৈরি করে যেন, অনুভব করেছিল মাধবী--হয়তো সে গীতার মতো সার্থক নয় অভিনেত্রী হিসাবে, গীতা সার্থক, অন্তত সায়েন্স-ফিকশ্যন সিনেমায় তার দাম প্রথম দু তিনজনের মধ্যে, কিন্তু তাই বলে মাধবী কী এত কোণঠাসা, এত অভাবগ্রস্ত যে সিগারেট কেসটা তা সোনায় হীরার টুকরো বসানো থাকলেই তার আদেখলেপনা দেখা দেবে।

ব্যাপারটা পরে অন্যরকম হয়েছিল, কিন্তু সে প্রথম আঘাতের ক্ষতটা এমন গভীর হয়েছিল যে পরে অন্য অনেক ঘটনার প্রলেপেও তা নিশ্চিহ্ন হয়নি, বরং ঘুমে যখন স্মৃতির বাছবিচার কমে গিয়েছে, ক্ষতটাকেও সে আবার খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এসব যদি মনস্তত্ত্বের ব্যাপার হয়, তবে, আমরা বলতে পারি, মাধবীর চিন্তার মূলে রাজেনের ডিনার আলাপও থাকতে পারে। কারণ রাজেন আলাপ করেছিল মর‍্যালিটি নিয়ে। সে হাসি হাসি সলজ্জ মুখেই এমন সব কথা বলে। সে বলেছিল এক সময়ে মর‍্যালিটি বলতে সত্য কথা বলা, পাপ-পুণ্যের বিচার করে চলা, পরলোক, সতীত্ব, ইত্যাদিকে মূল্য দেয়া বোঝাতো। এখনও সেই আগের মাপকাঠিতে আমরা মর‍্যালিটিকে মানি তা বলা যায় না। সতীত্ব এখন একটা ব্যক্তিগত হাইজিনের চিন্তা , পরলোক কোথায় থাকবে এখন? আমরা কি বায়ুলোকে অনেক দূর ঘুরে পৃথিবীর উর্ধ্বে শুধু যে শূন্য ও মহাশূন্য তা অধিকার করিনি। সত্য কাকে বলে? আমাদের বিচারে সত্য তাই ই যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নতুবা একই ইতিহাস বারবার লিখতে হয় কেন? তাই বলে, রাজেন বলেছিল মিট মিট করে তার গোটির মধ্যে হেসে, এরে কেউ যেন ইমমর‍্যালিস্টদের যুগ মনে না করে। বরং মানুষ এত মর‍্যালিস্ট আর কোন যুগে ছিল না। মর‍্যালিটির সেই প্রথম যুগে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন করেছিল, যে ঈশ্বর নাকি মানুষের স্রষ্টা এবং যার বিধানে মানুষ নাকি তাঁর টানা পুতুলের মতো চলতে বাধ্য ছিল। সেই ব্যক্তি যে দশ বিশটা হুকুম জারি করেছিল তাই ছিল মর‍্যালকোড। তার লঙ্ঘন হলেই পাপ হত। শাস্তি যে শুধু পরলোকের জন্য তোলা থাকত তা নয়, ইহলোকেই বহুসংখ্যক কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সুযোগ ছিল। এখন ঈশ্বর নেই বলে আমরা নিজেদেরই মর‍্যালিস্ট ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইতিমধ্যে কেউ আবার আর এক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে এবং দশ বিশটা হুকুমও জারি হয়েছে। এখন অবশ্য সে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় এবং পারলৌকিক মনে করা হয় না, বরং ভয়ঙ্কর রকমে বৈজ্ঞানিক বাস্তব মনে করা হয়। তার নাম বদলে তাকে রাজনীতি বলা হচ্ছে। এই মর‍্যালিটি সম্বন্ধে আলাপ মাধবীর ঘুম ভাঙার পরের চিন্তায়, কলগার্ল সম্বন্ধে সে মর‍্যালিটি অর্থাৎ যৌক্তিকতা চিন্তা করেছিল, প্রভাব রেখেও থাকতে পারে। কিন্তু এখন অবান্তর। এখনও তাকে খানিকটা তন্দ্রাগ্রস্ত মনে হচ্ছে, এবং তন্দ্রার ঘোরে অনেক সময়ে এটা ও ওটায় মিশে যায়।

যদিও লম্বা পা দুটো ঝুলিয়ে বসেছে মাধবী। মাথার উপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে। আর ঠিক তখনই তার চোখ পড়ল গীতার সিগারেট কেসটার উপরে। চেয়ারের উপরে গীতার পোশাক, তার উপরে সিগারেট কেসটা। উজ্জ্বল আলো পড়েছে সিগারেট কেসটায়। সেটা যে কী চোখ ধাঁধানো রকমের সুন্দর তা বোঝা যাচ্ছে এখনও।

না, প্রকৃতপক্ষে গীতা সিগারেট কেসটার ব্যাপারে কিছুমাত্র আঘাত দিতে চায়নি তাকে। রাজেন তার ডিনার আলাপ শেষ করে চলে যেতেই গীতা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ফ্ল্যাটের। প্রায় ছুটে এসে বসেছিল মাধবীর পায়ের কাছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেট কেসটা নিয়ে, একটু দ্বিধা করে খুলেছিল সেটাকে। চার পাঁচটি সিগারেট ছিল, সেগুলো হাতে ঢেলে নিয়ে কেসটাকে মাধবীর দিকে এগিয়ে ধরেছিল। তখন বোধহয় নিজেই বুঝল সিগারেট সমেত কেসটা তেমন করে ধরলে তবু সিগারেট মাধবীর আগ্রহের

ছল হতে পারে। সিগারেট ছাড়া কেসটায় আগ্রহ প্রমাণ হল না এবার।

কিন্তু গীতা হাসল, বলল, তুমি কি একটা সিগারেট নেবে, মাধু। এই সিগারেট।

গীতা চার পাঁচটি সিগারেট সমেত তার হাতের তেলো মাধবীর সামনে ধরেছিল। একটা সুন্দর নিখুঁত ভঙ্গি যা বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীদেরই পক্ষে ভেবে পাওয়া সম্ভব।

মাধবী একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে যে-কোন অবলম্বন পেলেই সেদিকে হাত বাড়াবে, বিচিত্র কি? সে তাকিয়ে দেখল, তার মনে হল এই ব্র্যান্ডটার নাম যেন তার পরিচিত।

এই এমন পরিস্থিতি না হলে গীতা তেমন কৈফিয়ৎ কখনও দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

মাধবী ব্যাপারটাকে সহজ করে দেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে গীতার হাতের তেলো থেকে একটা সিগারেট নিয়েছিল। তখন সে লক্ষ্য করেছিল এটাই সেই সিগারেট ব্র্যান্ড যা কিনতে একদিন গীতা তাকে সঙ্গে করে মার্কোস স্কোয়ার থেকে পুরনো চৌরঙ্গীর সেই তামাকের দোকানটায় গিয়ে সেই বুড়ো তামাকওয়ালাকে দেখেছিল, যার চোখে সুরমা, মাথায় লেসের টুপি এবং গায়ে খুব পাতলা কাপড়ের পাঞ্জাবী ছিল। লোকটির দাঁতগুলো ছিল তরমুজের বিচির মতো কালো এবং চোখা কিন্তু দাড়ির যেটুকু মেহেদি রঙানো নয়, তা ছিল সাদা।

গীতা বলেছিল, তুমি কি এ সিগারেট একটা খাবে, মাধু? আস্তে আস্তে ধোঁয়া নিও। তোমাকে বলি, এটা মারিউআনা।

গীতার মুখ সময়ের ছাপ পড়বে না এমন অচঞ্চল, উদাস, দূরস্থিত। মাধবী এক মুহূর্তেই যেন এতক্ষণ যে অভিনয় হল তার মূল সূত্রটাকে দেখতে পেল, এবং গীতা যে কেন সিগারেট কেসটাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করল তা বুঝতে পেরে অদ্ভুত রকমে চাপমুক্ত অনুভব করল নিজের মনকে। প্রায় হেসে উঠল সে, স্থিতিস্থাপকতার সূত্র অনুসারে, হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল।

বলল, মাধবী, চাপমুক্ত মনের আবার প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, মারিউআনা? তা আর হতে হয় না। এটা তোমার গেছো মেয়ে হওয়ার অভিনয়।

হেসে বাঁচিনে, বা তেমন কিছু বলেছিল গীতা। দুজনে দুটো সিগারেট নিয়ে বাকিগুলোকে কেসে ভরে তারা সহজ হয়েছিল অর্থাৎ সে অবস্থায় সেই প্রথম মারিউআনার ধোঁয়া নিতে নিতে রক্তহীন মুখে মাধবীর পক্ষে সহজ হওয়া যতটা সম্ভব তা যদি আন্দাজ করে নেয়া যায়। ব্যাপারটা সহজ হয়েছিল, কিন্তু মনের দাগ?

মাধবী পা বাড়িয়ে বিছানার নিচে স্লিপার খুঁজল, সকলেরই (জানা আছে একজন সিনেমা অভিনেত্রীর সে রকম নগ্ন পায়ের বিস্তার সাধারণত বিশেষ আগ্রহের বিষয়), স্লিপার পায়ে গলিয়ে প্যান্ট্রির দরজার কাছে গেল লিভিংরুমের মেঝে পার হয়ে, সুরঙ্গমাকে ডাকল, সুরঙ্গমা এসে বলল, খুব ক্ষিদে পেয়েছে, সুরঙ্গমা, তুমি কি তৈরি, বলতে ভুলে গেছি দুজনের ব্রেকফাস্ট দিও।

সুরঙ্গমা বলল, আমিও তৈরি, আমিও তৈরি।

সে মনে মনে হাসল, তোমাদের যে বয়স। কিন্তু আমাদের বয়সেরও অভিজ্ঞতা আছে। আগেই তা বুঝেছি, আর ব্রেকফাস্ট দুজনের মতোই করে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

মাধবী বলল, আমি এখনই তৈরি হবো। আর ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। ভাবল সুরঙ্গমা এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণই।

মাধবী স্নানের ঘরে যাবে। তার আগে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। নিজের সিগারেট কেসটা আয়নার সামনে পাওয়াতে সিগারেট ধরাল, আয়নার সামনে প্যাচের উপরে ঘুরতে পারে এমন টুলটায় বসল। সিগারেটটাকে নিজের চোখের সম্মুখে এনে সে ভাবল, এটা কিন্তু সে আদৌ জানতো না কেন মারিউআনাতে কেউ কেউ এত আগ্রহ জানিয়ে থাকে। আলডুস্ হাক্সলির সময়েই নাকি, গীতা বলেছিল, এটা বুঝতে পারা গিয়েছিল মারিউনা এবং গাঁজারও এমন এক গুণ আছে যা দৃশ্যমান সহরের ডিটেইলস্ ভুলতে সাহায্য করে। গীতা বলেছিল মনে করো তোমার এই ঘরে অনেক জিনিসপত্র আছে। লক্ষ্য করে

দেখো সবই জ্যামিতিক রেখায় আবদ্ধ। সেই রেখার বাইরে তারা কি ছড়িয়ে যেতে পারে। ভালো করে দেখো। কোন ঘড়ি কি গলে গড়িয়ে পড়ছে এমন মনে হয়? অথচ সালভাডর ডালির সেই ছবিটার কথা মনে করো। সেই মরুভূমির ধূসর নির্জল পটের সামনে টেবলে রাখা, টেবলের উপরে গজানো বাজে পোড়া গাছের ডালে ঝোলা, কিংবা মেঝের উপর যে হাত ক্রমশ ভ্রূণের আকার নিচ্ছে তার গায়ে ঘড়িগুলো টফির মতো, জল পাওয়া লজেন্স-এর মতো গলে আসছে।

তুমি বলবে ভ্রম, ইল্যুশন। কিন্তু এমনটাই কি আমাদের মনে এই সহরের প্রকৃত যে ছাপ পড়ে তার প্রতিকৃতি হতে পারে না? আমার তো মনে হয়, মাধু, মারিউআনা সব জিনিসেরই রেখার বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে পারে।

মাধবী বলেছিল, কিন্তু ট্রামে চড়তে গিয়ে যদি কোথায় হ্যান্ডেলের রেখা বুঝতে না পারো? না তেমন কিছু।

কিন্তু প্যাবলো পিকাসোর একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি বুঝতে কি তুমি রেখা খুঁজবে?

তুমি কি বলতে চাও?

শুধু ছবিওয়ালা কেন, মনে করো যারা অ্যাবসার্ড নাটক লেখে? একটা কাপ বা একটা বোতলের চারিদিকে যেমন রেখা, আমরা মানুষের আচরণ যা দেখি সেগুলোকে লজিক দিয়ে আবদ্ধ করে রাখি না? মারিউআনা সেই লজিককে তুলে দিতে সাহায্য করে। তা ছাড়া–

কি আবার তা ছাড়াও?

যে কোন শিল্পীর তা ছবিওয়ালা, ভাস্কর কিংবা কবি হোক যা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় সে কি যা সে অনুভব করেছে যা সে দেখেছে তার প্রতিভাস নয়? এখন এই যে ছাপ পড়ে শিল্পীর মনে তা কি আরও বিশুদ্ধ, আরও গভীর হয়ে ওঠে না যদি তার চারিদিকে রেখার, চিন্তার, লজিকের রেখাগুলো না থাকে? আমি শুনেছি সে রকম ছাপই এক সময়ে ক্যালিপসোর স্কেল ভাঙা সুর, ডাইলান টমাসের কবিতার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

মাধবী সিগারেটটাকে অ্যাস্ট্রেতে রাখল।

তখন, যখন গীতা বলছিল, মাধবী খুব আস্তে আস্তে সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেটের স্বাদ নিচ্ছিল, মাধবী অনুভব করছিল ধোঁয়াটা যেন মাথার মধ্যে ঢুকে, বাধা দিয়ে নয়, ধোঁয়ার মতোই নিঃশব্দ হালকার চাইতেও হালকা হয়ে, কোন কোন রেখাকে মুছে দিচ্ছে বটে। তখন সম্ভবত এই রকম কিছু বলেছিল গীতা কেউ বলেনি আলডুস হাক্সলির আগে, কিন্তু গাঁজার ধোঁয়ার ফলেই ভারতীয় সাধকদের কাছে পৃথিবীকে ভ্রমাত্মক মনে হতো , পৃথিবীর রেখার ধাঁধার বাইরে গিয়ে তারা গোটা বিশ্বটার আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পেরেছিল।

কিন্তু এখন? একথা বললে খুব বেশি বলা হয় যে কোন কোন ঋতু যেমন কারো কারো বিশেষ পছন্দ, তেমন দিনের কোন কোন উত্তাপ কারো কারো কাছে বেশি প্রীতিপ্রদ। তার শোবার ঘরের এই উত্তাপ যা ৭৫ ডিগ্রীর উপরে কিন্তু আশির খুব কাছে, অর এই আলো যা একটু বা ল্যাভেন্ডার রঙের তা মাধবীর ত্বককে খুবই হৃষ্ট করতে পারে যা মাধবী হয়তো এখনও আবিষ্কার করেনি, কিন্তু কোন কোন সকালে সে যে নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করে তার সঙ্গে হয়তো এই উত্তাপের যোগ আছে। (হয়তো এই উত্তাপ পরিচালনের ব্যাপারটা টেকনোক্র্যাট নিরঞ্জনের সময়কার অভ্যাস।)

আয়নার সামনে মাথাটা ঝাঁকাল সে এবং খুব মৃদুভাবে খুবই মৃদু, তখন কোন যৌবনবতী ঘোটকীর মাথা ঝাঁকানোর ছাপটা মনে আসতে পারে।

মাধবীর ফ্ল্যাটে, অর্থাৎ যা নিরঞ্জন খেয়ালের মতো টেকনোক্র্যাট মাধবীর জন্য পাঁচ বছরের লিজ নিয়েছিল তাতে দুখানা শোবার ঘর তো আছেই সুতরাং একাধিক স্নানের ঘরও। মাধবী তারই একটার দিকে গেল।

ততক্ষণে সুরঙ্গমা তার রান্না ঘর এবং প্যানাট্রির মধ্যে যাতায়াত করে একজনের জন্য তৈরি করা

ব্রেকফাস্টের এদিকে ওদিকে, লম্বায় চওড়ায় গভীবতায়, এটা ওটা যোগ করে দুজনের জন্য পর্যাপ্ত ব্রেকফার্স্ট তৈরি করতে গলদঘর্ম হযে উঠেছে। তার গাজর রঙের বাহু দুটো ব্যতিব্যস্ত, তাব কপালে চুলের দাগের একটু নীচে ঘেমে উঠছে। টিং করে একটা শব্দ হল। ফিরে দাঁড়াল সুবঙ্গমা। শব্দটা ঘড়ির নয়, স্টোভেব থেকে এসেছে। কেন না সেখানে তখন ফিলেট স্টিক। কিন্তু ঘড়িতেও দশটা বেজে কযেক মিনিট।

ক্ষুধাব সময় কাবো কাবো প্রসাধনেব কথা মনে থাকে না। কালোয় সাদা আব হালকা লালে প্রজাপতি আঁকা কিমোনোয গা ঢেকে খাবার ঘবেব টেবলে মাধবী সাড়ে দশটাব মধ্যেই পৌঁছে গেল। আব তার পাযের শব্দ পেযে গীতা, রাজেন নয়, পৌঁছে গেল টেবিলেব কাছে।

গীতা বলল, আ, ডার্লিং, কি সুন্দব দেখায তোমায এ কিমোনোটায়।

শুধু পায়ের শব্দ নয়, গলাব স্ববও, সুতবাং সুবঙ্গমাও তা শুনে ব্রেকফাস্ট দিতে শুরু করল, গীতা টেবলে বসতে না বসতেই।

সুরঙ্গমার বীতি এই ব্রেকফাস্ট টেবিলটাকে সে সাজিয়ে দেয়, ওয়েটাব বা শেফেব সঙ্গে তফাৎ এই হাউসকীপারের। দেখতে দেখতে প্লেট, পিরিচের আকাব পছন্দ কবাব ফলে এবং আহার্যের বংগুলো পছন্দ কবাব ফলেও, সেগুলোকে এদিকে একটু ওদিকে একটু লক্ষ্য করে টেবলে বসাতেই একটা যেন ছবির মোটিফ ধরা দিতে লাগল। সব সময় সকলেব চোখে তা ধবা পড়ে এমন নয় মোটিফটা যদি পদ্ম বা ওই জাতীয খুব পরিচিত না হয। কিন্তু মাধবী জানে, সুবঙ্গমা নিজেই তাকে একদিন বলেছিল, সেদিন মাধবী জিজ্ঞাসা করেছিল একই সেটের টিপট, পিবিচ প্লেট, পেযালা ব্যবহার না কবে বিভিন্ন সেটেব বিভিন্ন জ্যামিতিক গড়নেব সেগুলোকে কেন ব্যবহাব কবছে।

সুবঙ্গমা টেবলটা সাজিযে দিযে সবে গেল।

জিজ্ঞাসা করল, সাইডার?

মাধবী আহার্যের দিকে চোখ দিযেছিল। ঢাকা প্লেটগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সুগন্ধ ধোঁযা উঠছে।

মাধবী মাথা নুইযে সেই সঙ্গে তার কোলেব দিকে ঢাকা দেযা প্লেটটা খুলল।

সুবঙ্গমা একটু অবাক হল। সে ব্রেকফাস্ট টেবলে মাধবী ছাড়া দ্বিতীয যাকে আশা কবেছিল সে বাজেন।

সাইডাব নেবার জন্য সে আলমাবি খুলল। তার মন সাইডাব খোজাতেই ব্যস্ত, তা খুঁজতে খুজতেই সে ভাবল : তাহলে? কিছু অস্বভাবী বলবে? তা বটে বাজেন তো নয়। এ বিষযে একটা থিয়োরী আছে অবশ্য। এখন কোন কোন সংবাদপত্রেব সম্পাদক সে বিষয়ে বিশেষ গভীব সম্পাদকীযও লিখেছিল। যারা থিযোরিটাকে সামনে এনেছিল তারা এমন বলেছিল। পুরুষ ভালবাসার অন্যপক্ষ হতে পাবে না, যদি তাকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসা বলতে চাও, কারণ পুরুষেব মনটাই আগ্রাসী আগ্রহে তৈরি। পুরুষ ভালোবাসাকে সংসাব, সন্তান ইত্যাদি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িযে ফেলে, ভালবাসা তখন ডানাকাটা পবীর মাংসল উদব।

সাইডারটা পেল সুবঙ্গমা আলমারিব নীচেব তাকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ফোঁস কবে নিশ্বাস ফেলতে হল তাকে। এখন অবশ্য থিয়োরিটার কথা আব প্রকাশ্যে আলাপেব বিষয় নয়। প্রেম সম্বন্ধে কোন বিষয়ই আব সম্পাদকের লেখাব উপযুক্ত সামাজিক কৌতূহলের? তখন শোনা গিযেছিল তেমন অস্বভাবী প্রেম শিল্পীদের অনুভবেব বিষয় হতে পারে, কেননা শিল্পীদেব অনুভবেব শক্তি জনসাধাবণেব তুলনায় কযেক গুণ বেশি। হওয়া সম্ভব।

এটা কিছুই নাও হতে পারে। সাইডাবেব বোতল, দুটো তারা, নামিয়ে দিযে সুবঙ্গমা দেখল টম্যাটো সস্‌টা একটু বেশি ব্যবহাব কবছে বটে, কিন্তু তার তৈরি ব্রেকফাস্টে যেরকম আগ্রহ থাকা তাব ভালো লাগে তেমন স্বাভাবিকভাবেই খাচ্ছে গীতা এবং মাধবী।

গীতা বরং বলল, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, সুরঙ্গমা।

সে মুখ তুলল। তার ভ্রু কামানো, কালই হয়তো তা হযেছে, আর এখন নতুন করে আঁকা হয়নি। বোঝা যাচ্ছে তাহলে, গীতাব গালও প্রমাণ, ব্রেকফাস্টেব আগে গীতা পাবকর নামের এই অদ্ভুত নিকটে আসা দেশবিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী ব্রেকফাস্টেব আগে রং-এর ব্যবহার করে না—সুবঙ্গমা এই ভাবল।

এখন গীতাকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। স্বাভাবিক আর সাধারণ মানুষের মতো।

সুরঙ্গমার আর কিছু করার নেই এখানে। কফি-পট ভরে আনবে মিনিট পনের পরে। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের জলটাকে লক্ষ্য করল। নিজের জন্য চা ভিজিয়ে দিল, খবরের কাগজের এখনও অনেকটা পড়া বাকি। এটা তার নিজস্ব কাগজ, মাধবীর কাগজটা থেকে স্বভাবতই লম্বা চওড়া এবং বেধেও ছোট। আর সম্পাদকীয়টাই পড়া হয়নি তার। অন্য অনেক অনেক অনেকের মতো ওটা না পড়া পর্যন্ত সুরঙ্গমারও দিনটা আরম্ভ হয়েছে মনে হয় না, নিজেকে ভোঁতা মনে হতে থাকে। সুতরাং কাগজটাও টেনে নিল সে। সে আর একবার বলল—এটা হয়তো কিছুই নয়, গুরুত্ব কেইই বা দিচ্ছে?

গীতা বলল, তুমি কি মন্ত্রীমহোদয়ের গল্পটা পড়ছ? কিছুদিন আগে দ্বিতীয় ইনস্টলমেন্ট বেরিয়েছে।

কি গল্প?

জনৈক স্ট্রিপটিজ তারকা এবং মন্ত্রী মহোদয়। এতে কি গল্প হয়?

তুমি বলবে অ্যাডোলেসেন্টদের আলাপের বিষয়? গীতা বলল কিন্তু গল্পটা এ জন্যও নয় যে মন্ত্রী মহোদয় বিবাহিত এবং তা সত্ত্বেও স্ট্রিপটিজ তারকা। সকলেই জানে তা হলে এটা বালক বালিকার আলাপের বিষয়ই হতে পারত। তা সত্ত্বেও যখন গল্পটা কাগজে প্রকাশ করা হচ্ছে তখন কি মনে হয় না অন্য কিছু, অন্য কোন দিক দিয়ে হয়তো এটা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে।

তুমি কি বলবে, অবশ্য আমি মন দিইনি গল্পটায়, ডিটেইলস পড়িনি, সব কি পড়া যায়? তুমি কি বলবে স্ট্রিপট্রিজ এবং তার এক ফ্যান নিয়ে যখন গল্প বলাই হচ্ছে তখন অন্য দিকটাই মুখ্য , কিংবা এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে জনসাধারণ সত্যি আশা করে এবং বিশ্বাস করে সাধারণ মানুষ হিসাবে যে যাই করুক, যখন কেউ মন্ত্রীমহোদয় তখন তাকে খানিকটা অসাধারণ হতে হবে, স্বজনপোষণ, চুরি, এসব থেকে সে দূরে থাকবে এবং স্ত্রীকে এমন ভালবাসবে সে বেলি ড্যানসার থেকেও দূরে থাকা যায় এমনকি মিথ্যা বলবে না।

এ দিকটা আমি ভেবে দেখি নি, তোমার হাউসকীপার কিন্তু ভাল রান্না করে, হোটেলের মতো স্বাদ নয়, একটু কম স্বাদু, যেন ঘরোয়া। অন্য একটা দিক সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে সেটা পড়ে দেখো। এখনই বোঝা যাচ্ছে না কোন দিকে যাচ্ছে গল্পটা। আমি পুরনো কাগজ রাখি না বড় একটা।

গীতা হেসে বলল, বলাই ভাল পড়িও না তেমন একটা এবং এ বিষয়ে আমিও তোমার মতেই। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করেছি বলেই বলার মতো মনে হচ্ছে। সেই মহিলাটি বড় কথা নয়, আসলে তার নাম ক্লিনিক। বলতে গেলে এক রকমের রিসার্চ হচ্ছে সেখানে। আমি, তুমি আর দশজন যা সম্বন্ধে আন্দাজ করি, খানিকটা অবিশ্বাস করি তারই গবেষণা বলতে পারো, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা। বাৎসায়নের কথায় সত্যি কিছু আছে কিনা জানা আর কোথাক থেকে ডাক্তারের মতো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপরে বাৎসায়ন সূত্র থেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা বলতে পারো। এ রকম ইঙ্গিত আছে এর ফলে প্রিয় মহিলাটিকে দৈর্ঘে প্রস্থে আর বেধেও নাকি বাড়ানো যায়। (গীতা হাসল) শরীরের মাপ নয়। তা হলে তো শুধু চিনি আর ফ্যাট খেতে থাকলেই হয়। মাধবী বলল হেসে এই দিকটা তোমাকে অ্যাপীল করছে নাকি? বাহ্ করবে না? কি যে তুমি বল, মাধু। তুমি কি জানো না কোন ফলে কেন কষ, কেন টক তা আবিষ্কার করেই থামে না মানুষ, ফলটাকে নিজের স্বাদের মতো করে নিতে বীজ থেকেই টকের হেতু সরিয়ে দেয়া যায়। ফলে সে বীজ থেকে যে গাছ এবং যে ফল তা হবে টকশূন্য কিংবা ঠিক ততটুকু টক যা তুমি চাও। প্রেমের পার্টনারের তেমন পরিবর্তন কি ব্যক্তার্থে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধে বাড়ায় না?

মাধবী বলল ভেবে দেখেনি। ঠিক এই সময়েই সুরঙ্গমা কফিপট নিয়ে এলো। আর তাতে যেন মাধবীর ভাবনার সুবিধা হল। সে গীতাকে দেখল, আরও কাছে থেকে দেখার মতো করে। সেও দেখল গীতার ভ্রূ কামানো এবং এখনও সেখানে পেনসিল বুলানো হয়নি, গীতাকে বরং রক্তহীন দেখাচ্ছে, তার উপরের ঠোঁট—আচ্ছা, (একেবারে অবাক হয়ে গেল মাধবী) আচ্ছা ওই সরু নাইলনের সরু সুতোর মতো প্রায় আধ ইঞ্চি দাগটা? ছুরির দাগ? প্লাস্টিক সার্জারি? এবার আরও অবাক হয়ে দেখল মাধবী (এতদিন দেখে নি মাধবী কারণ প্রসাধনের আগে গীতাকে দেখার সুযোগ হয়নি?) নাকের দু'পাশে তেমন দুটি দাগ আছে, নাইলনের সরু সুতোর চাইতেও সরু, কিন্তু মুখের ত্বকের চাইতে বেশি সাদা। আর ঠোঁট আর নাকের

দুপাশের দাগগুলোকে বর্ধিত করলে একটা ত্রিভুজ হতে পারে। প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া কিছু নয়। মাধবী অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য সে এতদিন জানতেও পারেনি।

আর এখনই এটা ঢেকেও যাবে। কেন না ব্রেকফাস্টের পরেই গীতা গালে এবং ঠোঁটে রং দেবে, ভ্রূও আঁকবে। কিন্তু এটাও কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজের সৌন্দর্যকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেধে বাড়িয়ে নেয়া নয়? বলতে পারো, সৌন্দর্য কোনদিকে কতদূর বাড়ানো যায়। কিন্তু, মাধবী নিজের যুক্তিকে অটুট রাখল, এক্ষেত্রে তা অসম্ভব কিছু নয় সায়েন্স ফিকশ্যান সিনেমার নায়িকার কল্পনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব মিলিয়ে নেয়া।

কফি ঢালল গীতা দুই কাপেই। হাত কাঁপল না তার। অথচ মনের ভুলে মাধবী যেন তার হাত কাঁপবে এমন আশা করেছিল। তা কাঁপল না। হ্যাঁ, মাধবী স্বগতোক্তি করল মনে, গীতাকে দেখে বোঝা যায় না তার বাইরেটা এমন। কিংবা এমনটা কি স্থির আত্মপ্রত্যয়ে হয়? অথবা এটা কি গীতার মনের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গির ফল। অথবা অভ্যস্ত পোজ?

হঠাৎ যেন মাধবী সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল, মনের বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিই হবে।

সে কি প্রেমের ব্যাপারেও স্বাভাবিক থেকে কিছু পরিবর্তন করে নিতে চায় না?

গীতা বলল, একেবারে চুপ করে গেলে কেন, মাধু?

মাধবী সত্য বলল, তোমার কথা ভাবছি।

কি ভাবছ?

মাধবী মিথ্যা বলল, তুমি কি আজ বিকেলেই রওনা হচ্ছ?

তোমার কি খুব একলা লাগবে কলকেতায়, ডার্লিং?

মাধবী অর্ধেকটা মিথ্যা বলল, বা! তা লাগবে না?

কিন্তু যেতেই তো হবে।

কথার পিঠে বলা কথা, প্যাসিফিকে? আর তা স্মগ এড়াতে?

আমার কিন্তু অন্য রকম ধারণা হচ্ছে।

তা ছাড়া আর কি? দল বেঁধেই তো যাচ্ছ। ডাইরেক্টর, ক্যামেরাম্যান, সকলেই। তোমাদের শেষ বইটার পুরো টিমটাই তো বলছিলে।

তা যাচ্ছেই তো। সুটিংও হবে।

সত্য আগ্রহ দেখা দিল মাধবীর, সুটিং?

সন্দেহ হচ্ছে তাই। ডাইরেক্টর প্যাসিফিকে আসা নানা জাতের নানা দেশের, এবং নানা চমকপ্রদ দৃশ্যের মধ্যে দলের লোকদেরও ছবি তুলবেন। সেগুলো যোগ করে, সামনে পিছনে নিয়ে কি একটা স্ক্রিপ্ট উদ্ভাবন করা যায় না।

অদ্ভুত, ইনট্রিগিং।

তুমি কি মনে করো, মাধু, ড্রামার বিষয়টাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই দৃশ্য, দৃশ্যগুলোকে একত্র করার জন্যও তো ড্রামা হতে পারে।

মাধবী গীতার দুটো হাতই দেখতে পেল এক সঙ্গে। এক হাতের চারটি আঙুলের চূড়ায় পিরিচ, অন্য হাতের দু আঙুলে কাপের হাতল ধরা। ম্যানিকিওর করা সূচলো নখ, নীল শিরার আভাসযুক্ত ক্রিম রঙের ত্বক এমন লম্বাটে হাত।

মাধবী ভাবল, একটুও চঞ্চল নয় দেখো। আজই তো যাবে, তিন মাসের জন্য সে যাওয়া, অথচ এতক্ষণ মন্ত্রীমহোদয়ের কথা ভাবছে, আলাপ করছে। কোথাও যেতে হবে ভাবলে মানুষের মন কি যাওয়ার বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে এমন আলাপ করে।

কফি শেষ করল গীতা। এদিক ওদিক চাইল। হাসল। কিছু যেন খুঁজছে সে। নিজেই সেই সিগারেট কেসটা নিয়ে এল। খুলল, বলল মিটমিট করে হেসে, নেবে?

মাধবী হাত বাড়াতে গেল, দ্বিধা করল, তারপর হঠাৎ যেন এক সাহসিকতা দেখাতে হাত বাড়িয়ে সে সেই রং-সিগারেট নিল।

বলল, তোমাব সঙ্গী হতে।

এগাবোটাব পবে ব্রেকফাস্ট শেষ হল। ভ্রু এঁকে এবং মুখে বং দিযে গীতা যখন তাব ভাবি হ্যান্ড ব্যাগটাকে নিযে বাব হল তখন সাডে এগাবোটা পাব হযেছে। ব্লকেব সদব দবজা পর্যন্ত নেমে গেল মাধবী। গীতাব গাডিটায় তাব সোফাব সকাল থেকে এ পর্যন্ত ধৈর্যেব পবীক্ষা দিচ্ছিল। সেই নেমে দবজা খুলে দিল। গীতা গাডিতে উঠল, মাধবী ও গীতা দুজনেই দুজনেব দিকে চাইল। হাত তুলল। এটা তো ঠিক মার্কোস স্কোযাবে ফিবে যাওয়া নয় মির্জা গালিব এভেন্যু থেকে। দুজনেবই মনে ছিল প্রকৃতপক্ষে এ বেশ কিছুদিনের জন্য প্যাসিফিকে যাওযাব যাত্রা শুরু, এবং দুজনেই সিনেমা অভিনেত্রী যাবা মনেব যে কোন অনুভূতিকে শবীবভঙ্গী, চোখেব দৃষ্টি ও হাতেব ইশাবায় যথেষ্ট, অন্তত দর্শক যাতে ধবতে পাবে ততটা, বাডিযে তুলতে জানে। সুতবাং এটা একটা বিদায় দৃশ্যেব মতো গুরুত্বপূর্ণ হল।

প্রিয পাঠিকা, গীতাব চবিত্রে কি, আমাদেব কাছে, বেশি বং পডেছে মনে হচ্ছে। তাব ভালবাসাকে নিখাদ কবাব ইচ্ছায, তাকে পুরুষবর্জিত কবাব চেষ্টায, তাব ডোপ-সিগাবেট মর্জিনাকে মনে আনা এবং তা থেকে এতে মাবিউআনা আছে এখন প্রমাণ কবাব জন্য যাব নাম আলিবাবা এবং তাব চবিত্রেব এসব আনুসঙ্গিক একই অধ্যাযে প্রকাশ হয়ে পডা কি ভাবী হল? তা হলে এব কাবণ কি তাকে প্যাসিফিকে যেতে হবে মনে কবে সে একটু উত্তেজিত ছিল, অথবা এব কাবণ কি তাকে এক্ষণ মাধবীব চোখ দিযে দেখা হযেছে এবং মাধবীব মন কালকেব ডিনাবেব পব থেকেই কি একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ হযে পডছিল? নতুবা বলতে হয তাব আলিবাবা সিগাবেট সংগ্রহেব ব্যাপাব যে বিশেষ কিছু তা কি ইতিপূর্বেই মাধবীব চোখে পডা সম্ভব ছিল না, অথবা তাব শোফাব নিশ্চযই আন্দাজ কবে যে সিগাবেট সংগ্রহ কবতে তাকে মার্কোস স্কোয়াব থেকে ওল্ড চৌবঙ্গী যেতে হয তা যদি সিগাবেট হিসাবেই ভাল হত তাহলে অনেক বড দোকানে পাওযা যেত। কিংবা তাব মুখেব প্লাস্টিক সার্জাবিব চিহ্ন নিশ্চযই তাব স্টুডিওব মেকআপ বিশাবদবা অন্তত কিছুদিন থেকেই দেখছে। প্রেমটা অবশ্য ঝডেব মতো সহসা প্রবল হযে ওঠে।

মাধবী ফ্ল্যাটে ঢুকল ব্রেকফাস্টেব ঘব দিযে। টেবলেব সামনে দাঁডাল। যেন কিছু সে মনে কবাব চেষ্টা কবছে। কী বা মনে কববে? পাকস্থলীব খাবাবগুলো তাকে তৃপ্তি দিচ্ছে ইতিমধ্যেই। সে কিছু ভাববে? সে কি প্রেম সম্বন্ধে ভাববে? সে ঘবেব আলো লক্ষ্য কবল। সে কি দু একটা আলো নিবিযে দেবে? একদিকেব ছাতে বসানো আলো সে নিবিযে দিল টেবলে বাখা কাঁটা চামচ এবং পাত্রগুলোকে এখন একটু অন্য বকম দেখাল। এবং সে জন্যই যেন তাব চোখ পডল চক চক বংটায, সোনা বং। গীতা তাব সিগাবেট কেসটা নিতে ভুলে গিযেছে।

ঘবেব উত্তাপ এমন যে খালি গাযেও থাকো কষ্ট হওযাব কথা নয। সে কি উত্তাপটা একটু কমিযে দেবে।

লিভিংরুমে গিযে দাঁডাল মাধবী। পাশেই ডবমিটাব। সেখানে ইলেকট্রিক ম্যাসেজাবটা তাব নিকেলেব প্লেট নিযে ঝক ঝক কবছে। স্বাস্থ্যেব পক্ষে ভাল, খুবই ভাল ওই ম্যাসেজাব, বিশেষ কবে যদি শবীবেব গডন ঠিক বাখতে হয। আব তোমাকে কিছু কবতেও হয় না। মিনি-বিকিনি পবে নিতে হয়, চোখে গগল্স দিতে হয যদি তুমি আল্ট্রাভাযোলেট-বে চাও সুইচটাকে টেপো, কোন একটা ছবিব বই নিতে হয এবং সিগাবেট যদি আল্ট্রাভাযোলেটে তোমাব দবকাব না থাকে , তাবপব মেসিনটাকে গো বলাব মতো ভঙ্গিতে বসলেই হল। সুইচও টিপতে হয না, বোলাব, প্যাড, কাপ মেসিনেব সর্বত্র থেকে বেবিয়ে এসে তোমাব শবীবকে থাবডাবে, মৃদু মৃদু চটকাবে, টেনে টেনে ধববে। কনট্রোল কবাব জন্যও তোমাকে ভাবতে হয না, কাবণ এ মেসিনটা ক্যাথডবশ্মিব কাযদায চলে, তোমাব শবীবেব বিঅ্যাকশনেও সে বশ্মি ছিন্ন ও সংযুক্ত হযে মেসিনেব গতি নিযন্ত্রণ কবে, যেহেতু এটা মধ্যবিত্তদেব ঘবে এখানে ওখানে সুইচ যুক্ত যে ম্যাসেজাব দেখতে পাও এটা সে শ্রেণীব নয, বলতে পাবো টেকনোক্র্যাট শ্রেণী যা পার্টিব নেতা ও মন্ত্রী এবং নিবঞ্জন ঘোষালেব মতো টেকনোক্র্যাটেব পক্ষে কেনা সম্ভব, যা সব চাইতে বৈজ্ঞানিক এবং দুখানা আমেবিকান সুপাব ফোর্ড কনভার্টিবলেব সমান দামী, কেননা এটা টেকনোক্র্যাট নিবঞ্জন ঘোষাল কিনেছিল তাব প্রিযতমা নাবী মাধবীব দেহেব বক্র বেখা ও বর্তুলগুলিকে যথাস্থানে বাখতে সাহায্য করতে। বলতে গেলে, সন্তান

এলে, যে সন্তান নিরঞ্জন চেয়েছিল, যে ক্ষতি হবে মাধবীর শরীরের গড়নে তা ফিরিয়ে দেবে এই মেশিন এই রকমের আশ্বাস মাধবীকে দিতে।

নিরঞ্জনের সঙ্গে জুডিশিয়ান সেপারশন চলছে যেহেতু সে আশ্বাসে মাধবী প্রবোধ মানেনি, আর কমাস চললেই তা স্থায়ী হবে। নিরঞ্জন কিছুই সরিয়ে নেযনি, এ ফ্ল্যাটের লিজ তো বটে এই দামী গ্যাজেটগুলোও বেখেই গিযেছে। নিরঞ্জন কি তা হলে মাধবীকে ভালবেসেছিল, এবং এখনো ভালবাসে!

না, সে মাসেজারকে, যদিও তা সুপাব ক্যাথোড লিনিযাল ব্রেক যুক্ত, প্রশ্রয় দিতে চায় না। সে বরং শোবার ঘরের দিকে চলল। কিন্তু হঠাৎ থেমে দাঁড়াল—একেই কি পুরুষের আগ্রাসী মনোভাব বলা চলে? কি হতো নিবো, হ্যাঁ তোমার সেই ফ্যারাও দাড়িসমেত এবং বড় নাক সমেত মুখে দু' হাতের আঙুল দিয়ে চাপডাতে চাপড়াতে তোমাকে সেই রোমান জাবের নাম অনুসারে নিবো বলতে মাধবীর ভাল লাগত, একটি সন্তান পেলে? তোমার গুণপনা, তোমার চেহাবায় উত্তরাধিকারী হত? তোমাব অর্থেব অবশ্যই নয় কাবণ তা হত বে-আইনি আর এখনকাব পৃথিবীতে বে-আইনি কাজ করার কথা কেউ ভাবে না। কী হত তেমন উত্তবাধিকারী? খেলনা? অবসর যাপনেব কিছু, খুব ভাল ধরনের একটা কুকুরে তা কি চলে না, কিংবা স্টেট অর্ফ্যানেজে তেমন মানুষ-শিশু সংগ্রহ করাও যায়। মাধবী তোমাকে খুব ভালবেসেছিল, কিন্তু—

চলার মাঝখানে হঠাৎ থেমে মাধবী এই ভাবল, তার ফলে দিক বদলে সে বরং শোবার ঘবেব দিকে চলল চিন্তাটাকে পার হয়ে, কাবণ চিন্তাটা তো হাল্কা, এখন আব ভেবে লাভ নেই এমন কিছু, অনির্দিষ্ট গতিতে চলা মেঘের মতো, সে মেঘেব পাশে ব্রেকফাস্টের আরাম আছে।

এখন সকালের ঘুমভাঙার কষ্টটাও নেই। আচ্ছা ওটা কি কালকেব আলিবাবাব ধোঁয়া নেযাব ফল হতে পাবে? অর্থাৎ অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠেছিল? নতুবা ব্যাপাবটা একেবাবে একটা ভুল ধাবণা থেকে মানসিক আঘাত পাওয়া। হেতু যদি মিথ্যা হয় ফলটাও কি তা নয়? তাব প্রমাণ গীতা কেসটাকে অবহেলায় ফেলে বেখে গিয়েছে।

শোবাব ঘরে বিছানায় বসল মাধবী। না, শবীব তার খারাপ হযনি। কিমোনো সে গুটিযে তুলে নিজেব একটা পাযেব গঠন দেখল বুড়ো আঙুলকে কেন্দ্র করে পাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিযে সামনের দিক, পিছন দিক। এখন সে কি করবে—একটানা বেলা দুটো পর্যন্ত ছবির বই নিয়ে শুযে?

মাধবী তাব বিছানায বসেছিল, তখনই উঠল। টেলিফোনটাব পাশে গিয়ে দাঁড়াল। রাজেনকে সে কাল ডিনারে বলেছিল বটে, বড়ো একা লাগে। বাজেন প্রথমে চমকে উঠে পবক্ষণেই যেন একটা কার্ড বাব করে বসেছিল, টেলিফোন আমার ঘবে নেই, কিন্তু কার্ডে যে নম্ববটা দেযা আছে ওটা বারোয়ারি নম্বর। ডাকলে যদি ঘরে থাকি বিবহ দুর হবে।

ডায়াল করল মাধবী কার্ডটাকে চোখের সামনে ধবে। কনেকশন শব্দ পাওযা গেল। ওপাব থেকে কে একজন ভাবি গলায় কথা বলে উঠল। তাও ভাল। ওপাবের লোকটি অবশেষে বলল ধরে থাকুন, পেলে কনেকশন দেব আবাব।

নিজেব বাহুতে চোখ পড়ল ফোন ধবে দাঁড়িযে থাকতে থাকতে। অ্যালাবাস্টাব বলতো নিরঞ্জন। আর তা নিশ্চয়ই কাল ডিনাবেব পরে একবার আব আজ ব্রেকফাস্টের পরে একবাব আলিবাবা খেলে পুড়ে যায না।

ফোনে আবার যেন কনেকশন পাওয়া গেল। না পুড়ে যায়নি, বরং..

হ্যালো।

কে? রাজেনের গলাই।

আমি মাধবী, মাধবী ঘোষাল। ডার্লিং...

ডার্লিং!

বাজেন নও? আমি মাধবী।

হাসছেন নাকি?

দূর করো। রাজেন বলতে পারো, না, তুমি এলে বলব। তুমি এখনই একবার আসবে?

শবীর খারাপ নয়তো?

কি যে বলো, বরং..

এখনই যেতে হবে?

খুব কি অসুবিধা হবে?

গলার স্বরটা একটু অন্য রকম

তা তোমায় বলতে পারি, হয়তো মারিউআনা

মারিউআনা?

হ্যাঁ, কাল থেকে ডোপ-সিগারেট টানছি। তুমি যাওযার পর থেকেই।

মাধবী হাসতে হাসতে ফোন ছেড়ে দিল।

সে ফিরে দাঁড়াল আর তখন ভাবল, বাজেন দার্শনিক, সে অনেক জানে।

রমণীরা কি ভেবে কাজ করে, কিংবা কাজটা করে তাব যুক্তি ভেবে বাব করে? রাজেন দার্শনিক এটাই কি তাকে ডাকার কারণ? দর্শনের সাহায্যে কি সে জানতে চায় মিথ্যার আঘাতে মনে সত্যিকারেব ব্যথা হয় কি না।

মাধবীর চিন্তা আবার সেই ব্যথার দিকে গেল। প্রিয় পাঠিকা, বঙ্কিমচন্দ্র খেকে বর্তমান লেখক কোন বামোনই কি রমণীর মনেব ইয়ত্তা জানতে পেবেছে?

হঠাৎ যেন ঘটনাটা ঘটল, দর্শন শব্দটাব উচ্চাবণই যেন তা করাতে পারে। এতক্ষণ সে এদিক ওদিক ভেবেছে। আসল ব্যাপারটাতো তার মনেবই। সেজন্যই এতক্ষণ এতভাবে তার নিজের রূপেব কথা মনে হচ্ছে, যে রূপকে বাঁচানোর জন্যই সে নিরোর ভালবাসাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে কি কোন মনস্তাত্ত্বিককে বলবে তাব মনকে একটি বার দেখে দিতে? না, না, হয়তো তার ততো কঠিন অবস্থা নয় মনেব যদিও এতক্ষণ সে তার ব্যথা পাওযার কারণটাকে ধবতে পারে নি, কিংবা নিজের কাছেই গোপন বাখার চেষ্টায় ছিল তার মন।

আসল কথা, তার মুখটা নীল দেখাল যেন বুকেব ভিতবে ব্যথা হচ্ছে, আসল কথা সে আর্ট থিয়েটারেব অভিনেত্রী হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে। একটা সিগাবেট কেসের উপবে, নতুবা, গীতাব অমন আগ্রহে তার হেসে ওঠাই স্বাভাবিক হত। রূপ তার আছে। কিন্তু সে কি আবার প্রবীর সান্ডেলের কাছে যাবে? এতটা সময়ই বা লাগাল কেন তার এ সহজ নিয়মটা বুঝতে? অথবা বুঝেও তা প্রকাশ করতে?

মাধবী ভাবল, তার চিন্তা গভীরতার দিকে সরে গেল। আর তখন অলিখিত মব্যাল কোডের মতো, সব অবস্থাতেই মব্যাল কোড থাকা ভাল, তার মনে হল কোন ব্যাপারে বেশি রকমের দুঃখিত হওয়া কি অন্যের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর জন্য নয়। তাই তো সেন্টিমেন্টাল। তার মন নিজেব সমর্থনে অতীত থেকে কিছু খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল। কি গভীর রকমে ধোঁয়া রঙেব সেই স্মৃতি, যেন প্রায় সিপিয়া। তার জননীর, অর্থাৎ মাধবী ঘোষাল হওয়ার আগে যে তার জননী ছিল। তার জননীর লিখবার ডেস্কের ঠিক উপরে দেয়ালের মাঝামাঝি বসলেই চোখ পড়ে এমন জায়গায় একটা ব্রোঞ্জ প্লাকে ভারডিগ্রিস রঙে লেখা ছিল ইংরেজিতে 'ডজ্ এনিথিং রিএলি ম্যাটর্"। কবিতা নয়, উজ্জ্বল গদ্য নয়, লাটিন বা সংস্কৃত নয়, একেবারে চলতি ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এমন শব্দে লেখা যেন সেকালের গুরুর কাছে পাওয়া মন্ত্র : ডজ্ এনিথিং বিএলি...

এটাই হয তো, নিরঞ্জন থেকে বিচ্যুত হলেও সে কি আবার অন্য বকম হবে, টেকনোক্র্যাটদের কালচাবেব সুতো যার চারিদিকে তার ভঙ্গুর দানাগুলো বেঁধে ওঠে।

নীল দেখাল মাধবীর মুখ। দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপল সে, কিংবা গীতা যেমন করে আলিবাবার ধোঁয়া ছেড়ে দেয় ধীরে ধীরে তেমন করে নিঃশ্বাস ছাড়ল মাধবী। ওটার মানে এই হবে বোধহয় কিছুতেই কি সত্যি যায় আসে? 'সত্যি' একথাটার উপরেই জো...।

মাধবী বরং ব্রেকফাস্টের ঘরে গেল। গীতার সিগারেট কেসটা তুলে নিল, খুলল। ওমা, এ যে দেখছি প্রায় দশটা আলিবাবা। তা হলে গীতার সঙ্গে স্টক আছে যা থেকে সে এই কেসটা ভরে। কী দুষ্টু মেয়ে,

বাবা। দশটা তার মানে সে যদি তিনটে করে খায় দিনে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়, তিন দিন চলে যায়। লাইটারটা ফ্লাউআর ভাসের গোড়ায়। সেটা তুলে নিয়ে মাধবী চেয়ারে বসবে এমন সময়ে বেশ জোরে কেউ নক্ করল।

রাজেনই।

মাধবী হেসে উঠল। সে এত খুশি হয়েছে যে রাজেন যে অদ্ভুত রকমে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে তা তার খেয়ালে এল না।

বসো বসো।

ব্রেকফাস্ট ঘরের চেয়ারে বসল রাজেন। চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়াল মাধবী। তার উরু হাতলটাকে স্পর্শ করে রইল। হঠাৎ সে নিচু হয়ে দু হাতে রাজেনের মুখ আঁজলা করে ধরে, তার এক হাতে সিগারেট কেস অন্য হাতে লাইটার রইল অবশ্য, রাজেনের ঠোঁটের দু আঙুলের মধ্যে নিজের ঠোঁট নিয়ে গিয়ে বলল, খুব ভাল তুমি। কিন্তু র‍্যাস্‌পবেরী জ্যাম খেয়েছ বুঝি ব্রেকফাস্টে।

রাজেন তার বিরক্তি এবং বিস্ময় গোপন করতে পারল না কথা না বললেও, কিন্তু মাধবী তা লক্ষ্য করল না।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল মাধবী। খিলখিল করে হাসল?

বলল, কফি দিতে বলি!

আলিবাবা ধরালে মন্দ হয় না। গীতার কেসটা খুলল সে। সিগারেট নিল। একটু কি দ্বিধা? তারপরই লাইটারটা জ্বালাল সে। একটু উঁচু গলায় বলল, কফি দিও সুরঙ্গমা, দুজনের।

রাজেন মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করল, এটা কি মারিউয়ানার ফল, কিংবা এই সিগারেটটাই তেমন।

হঠাৎ সে বলে বসল, আগেই সিগারেট খাচ্ছেন। কফি খেয়ে নিলে হত না। তাই জিজ্ঞাসা করল মাধবী। সিনেমা অভিনেত্রীর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক তা ভ্রু উঁচু করে এই প্রশ্নটাকে গভীরতর করল।

মুখ থেকে হাতে নিল সিগারেট মাধবী। বলল, ডজ্ এনিথিং বিএলি ম্যাটার?

সিগারেটটা আসট্রেতে রাখল সে। দু হাতের তেলো একত্র করল, আঙুলের ডগাগুলো নিজের চিবুক ছুঁয়ে রইল।

রাজেন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম কি জানতে পারি না?

আপনি বলুন তা কি হতে পারে।

রাজেন হেসে বলল, আগে কফি আসুক।

মাধবী বোধ হয় এতক্ষণ নিজের অজ্ঞাতসারেই চেষ্টা করেছিল জেস্টিকুলেশানটাকে মুখে আনতে। একটা ঔদাস্যের ভাব তার মুখে ফুটল। সে বলল, কিংবা বিএলি ডজ্ এনিথিং..

রাজেন ভাবল, এটা অবশ্য বয়স্ক লোকেদের মনের একটা ভঙ্গি হতে পারে। না, ঠিক ঔদাস্য নয়। অনুঙ্গী বলতে পারো। আর তাহলে বরং এখন একটা কথা বলার বিষয় খুঁজে বার করে তাকে বলতে দিয়ে কিংবা টেবলের উপরে ভাসতে দিয়ে তার কিনারায় ঝুলে ঝুলে চলাটাই সামাজিকতা। কিন্তু এটা কি তাই মাধবীর? মাধবী কি এখনই বোর্ড হতে পারে? বরং একটু সিরিয়াস টাইপ নয়। যে নাকি অভিনেত্রী হওয়ার জন্য একজন টেকনোক্র্যাটকে দূরে রাখতে পারে।

মাধবী বলল, আমরা অবশ্য মন্ত্রী মশায়ের স্ক্যান্ডালটা আলাদা করতে পারি।

মন্ত্রী মশায়? কেন? রাজেন প্রশ্ন করল।

কিন্তু সে ভাবল, এটা কি সেই ব্যাপার, তাদের চাইতে কিছু বয়স্ক নরনারী টেবলে বসে যেমন অন্যের কথা এনে নিজেদের মধ্যেকার ফাঁক ভরে তোলে। হতে পারে, আমরা সবাই তো বয়স্কদের দেখে শিখি। কাল ডিনারে অবশ্য এমন বোর্ড মনে হয়নি মাধবীকে। বাহ্। মন্ত্রীমশায় এবং সেই বেলিড্যানসার, জানেন না?

খবরের কাগজে বার হচ্ছে, তাই না?

কফি আনল সুবঙ্গমা।

মাধবী বলল, কিংবা কফিব পবে চল আমবা বেড়াতে যাই। একদিন যেমন আমবা ঘুবেছিলাম বটে। আব তা ছাড়া বাজেন কথা শেষ না কবে ভাবল, মন্ত্রী মশায, বেন মন্ত্রীমশায, কী এসে যায সে কী কবেছে তা জেনে মাধবীব। কিন্তু গলাটা তোলাব কাযদা দেখ। অবশ্যই তা হতে পাবে। টেকনোক্র্যাটদেব অনেক ডিনাব টেবলে নিশ্চযই বসেছে মাধবী এবং ম্যানার্স হিসাবে অন্যেব দিকে লক্ষ্য বেখে শিখেছে। তা বটেও, কাল যেমন ডিনাবে বলেছিল আপনি দার্শনিক, কিছু বলুন।

দর্শন পড়াব যা দোষ, বাজেন ভেবে চলল, সত্যিকাবেব অনুঈ কাব হতে পাবে কলকেতায? হযতো, প্রবাব, হযতো তাব মতো আব কেউ, হযতো হযতো। মানসিক ভঙ্গি থেকেই তো এই চূড়ান্ত ধবনেব বোর্ডম্ আসতে পাবে যাকে অনুঈ বলে। কিন্তু সেই অনুঈ এ তো কিছু প্রকৃত পক্ষে আছে কি না সে প্রশ্নই নেই, থাকলেও তাব মূল্য কি সেই প্রশ্নও নেই।

কফি এগিযে দিল মাধবী। বলল, চলো, যাবো, তোমাব সঙ্গে বোদে বোদে ঘুববো।

বাজেন কফি নিল। কাপ না তুলে নিচু হযে ঠোঁট ছোঁযালো কাপে। মিটমিট কবে হাসল, বলল মনে মনে, আ, মাধবী প্রকৃতপক্ষে অনুঈ-এব অভিনয সহজ, আবও কিছু অভিজ্ঞতা না হলে তুমি বোর্ড হতে পাবছ না।

আব তা ছাড়া সত্যি কি টেকনোক্র্যাটবা বোর্ড? তাবা কি তাদেব ঘবেব চাবদিকে, অফিস ঘব এবং শোবাব ঘব, ছড়ানো গ্যাজেটগুলো সম্বন্ধে বোর্ড?

দর্শন কোন কোন মানুষকে অনুকম্পাশীল কবে। এবং অনুকম্পাব এই অর্থ কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কাব না কবে ব্যক্তিটি নিজেব সম্বন্ধে যা বলেছে তা দিযে তাকে বুঝতে চেষ্টা কবা।

বাজেন সুতবাং ভাবল মাধবী তাব অক্সিজেনতৃপ্ত, আলোয উজ্জ্বল এবং নিযন্ত্রিত তাপঘবে বসে যা বলছে তা হযতো এক বকমেব অবিশ্বাস কিন্তু তা থেকেই ক্রমশ অনুঈ জন্মাতে পাবে। অবিশ্বাস, ঔদাস্য তাবপব অনুঈ। সে ক্ষেত্রে এই যে নানা বকমেব মদ, নানা বকমেব খাবাব এবং নানাবিধ গ্যাজেট, এবং নবাগত বেলিড্যানসাবেব ভিড় এসবেব মধ্যে আগ্রহ না দেখে অভ্যাস দেখতে হবে।

কফিটা ভাল আপনাব মিসেস ঘোষাল।

আব একটু কি চিনি লাগত?

মৃদু একটা শব্দ হল। তাদেব বাঁ দবজা। তাব নিচে দিযে এক টুকবো কাগজ যেন কেউ ঠেলে দিচ্ছে। বাজেনেব চিন্তায সংযুক্ত মন লক্ষ্য কবল না কিন্তু চোখে পড়ল। কাগজেব টুকবোটা বাড়ল একটা খববেব কাগজেব রূপ নিল ঘবেব মধ্যে এসে।

অন্যমনস্ক হযে কফি খেতে গিযে বাজেনেব ঠোঁটে শব্দ হল।

মাধবী বলল, ক্রিম দেবো?

বাজেন হাসিমুখে মাথা নাড়ল, ভাবল, মদ, স্ত্রীলোক, গ্যাজেট প্রভৃতিতে আগ্রহ, ঠিক তা না হযে বাধ্যতামূলকতাও হতে পাবে। এব একটা সুন্দব নাম দিযেছি আমবা নেসেসিটি। এই নেসেসিটি সংগ্রহ কবাব জন্যই জীবনটা ব্যয হয, যেন জীবনটাব জন্যই নেসেসিটি। থবোব মতো চোখ থাকলে দেখা যায, জীবন মশায় সেই গুববে পোকাব মতো তাব শবীবেব দশগুণ বড়ো মাটিব গুলিটাকে পিছনেব দু পাযে ওস্তাদ খেলোযাড়েব মতো খেলিযে যাচ্ছে, কখনই কাযদায আসছে না, সব সমযেই গেল গেল , জীবনেব জন্যই, তাব আবামেব জন্যই, কিন্তু জীবনে কখনো সেই ব্যালান্স বাখাব কলাকৌশল বন্ধ হল না। হঠাৎ বাজেন হেসে ফেলল কথাটা কমপালসিবনেস, বাধ্যতামূলকত্ব।

সে নিচু হযে নতুন আসা খববেব কাগজটা তুলে নিল। খুব বড় না হলেও মাঝাবি ঢাউস। কাগজটা মেলল সে চোখেব সামনে। এটা দুপুবেব কাগজ। বাইটার্স কোঅপাবেটিভেব মুখপাত্র। নিতেই হয, বিশেষ কবে মির্জা গালিব এভেন্যুতে, কাবণ এটা শিল্পী সাহিত্যিক অভিনেত্রীদেব পল্লী। অন্য কাগজ সদব দবজায় থাকে ব্লকেব। তুমি কুড়িযে নেবে তাব অপেক্ষায। এটা কিন্তু সিঁড়ি, এলিভেটব, লিফটেব সাহায্যে উপবে আসে, দবজা বন্ধ থাকলে দবজাব ফাঁক গলিযে ভিতবে ঢোকে। কাবণ লেখকবা তোমাকে তাদেব মত

জানাবে, জানাবে জানাবে। অবশ্য সব কাগজই এক দিক দিয়ে কম্পালসিব। পারো, সকালে উঠে তোমার প্রিয় সম্পাদকের মুখ না দেখে থাকতে সে আগের দিনের ঘটনাবলীর মধ্যে কোনটাকে প্রধান মনে করল, তার সম্বন্ধে কি তার মত তাকে নিজের বুকের মধ্যে ভরে নাও না, যদিও বলো তুমি সে কাগজ বেছে নিয়েছ। এটা অবশ্য নতুন ধরনের কম্পালসিব কারণ এ দরজার ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকে।

এটার একটা অন্যদিকও আছে। অন্তুত একটা আলাপের বিষয় যোগায় তো বটে। মাধবী বলল, কি এমন সংবাদ? বার বার বলা হলেও আবার বলতে হবে কথাটাকে সে ছুঁড়ে দিল যা থেকে আন্দাজ হয় সে হয়তো লিঙ্গুইস্টিক এবং অরেটারির স্কুলে পড়েছে।

এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীর খবর দেখুন। রাজেন বলল।

বা, তাই তো! কোন ছবিটা প্রথম হয়েছে? মাধবী বলল।

দাঁড়ান, দেখি। এই যে পেয়েছি।

টেবলের উপরে কাগজটা বিছিয়ে সংবাদটাকে খুঁজে বার করল, তার তলে আঙুল রাখল রাজেন। নিজেও বলল, এ রকম আন্দাজ করা যায়। ২৭ নং ছবি, লাল ঘোড়া, সাতশ' তেইশ পয়েন্ট।

কত পয়েন্ট পেয়েছে? সাতশ' তেইশ। এর আগের বার যে প্রথম হয়েছিল সে কত পয়েন্ট পেয়েছিল? মাধবীর কৌতূহল গোপন রইল না।

সাতশ' এক দেখছি। রাজেন বলল। এক নিমেষে কলমটার শেষ পর্যন্ত পড়ে গিয়ে সে কাগজটাকে মাধবীব দিকে এগিয়ে দিল।

মাধবী বলল, আমরা কি লালঘোড়া দেখেছিলাম?

খুবই সম্ভব যদি গিয়ে থাকেন নিও ব্যাবোক প্রদর্শনীতে। চার নম্বর ঘবেই ছিল বোধহয। সেই যে আঠাবো ফিট বাই তেইশ ফিট ক্যানভাসে তেল রং।

মনে পড়ছে না। খুব লাল কিছু একটা ছিল।

রাজেন মাধবীর স্মৃতিকে উস্কে দেওযার চেষ্টা করল, সেই সবুজ রঙের জলে দু একটা ছোট ঘোড়াব ব্যাকগ্রাউন্ডে আট ন' ফিট উঁচু ইঁট রঙের ঘোড়ার ছবি। ও, আচ্ছা। মাধবী এবার যেন মনে করতে পাবল। কিন্তু সোজা নয় সাতশ' তেইশ পযেন্ট পাওয়া।

মাধবী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। আব একটু আযেস করাব জন্য টেবলের উপরে স্লিপাব সমেত পা তুলে দিল। কিমোনোর আল্‌গা ঘের সবে এসে তার সিনেমা প্রশংসিত উরুর মাঝামাঝি অবস্থান করল।

হঠাৎ সে আদুরে সুরে বলল, রাজেনবাবু, ছবিটা কি সত্যি ভাল ছিল না? সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে তার গোড়াটা তর্জনী মধ্যমা আর বৃদ্ধের মধ্যে গড়াতে বাজেন ভাবল এই আদুরে সুরটা নেহাৎ অভ্যাস যা সিনেমার ভয়েস রেকর্ডিং-এ লাগে, আর মাধবী হয়তো তা কাটিয়ে উঠতে চায়। সে বলল, সাতশ' তেইশটি দর্শকের প্রথম প্রেফারেন্স পাওয়া সহজ কথা নয়। খুব বড়, দেযাল জোড়া, অন্য সব কিছুকে আড়াল করা আর সব চাইতে উজ্জ্বল রং অর্থাৎ লাল ছিল না ঘোড়াটা?

তা হলে আপনিও কি প্রথম প্রেফারেন্স ভোট দিয়েছিলেন?

এখন হয়েছে কি ; ছবি সম্বন্ধে রাজেন কিছু ভেবেছে, একাধিকবার সে প্রদর্শনীতে গিয়েছে, তারপর হঠাৎ প্রবীরের সঙ্গে এক মত হয়েছে, এবং উপরন্তু ভাবছে ছবিটাকে কেন্দ্র করে এবারকার প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভূদেব সামন্দারের সিন্ডিকেটে ফিচার লিখবে। তাও যদি না হয় নিজের ভিটা নোবা পত্রিকায় তো বটেই। এ অবস্থায় নিজের মতামতকে যেখানে বলে লাভ নেই সেখানেও প্রকাশ করে ফেলে অনেকেই। সে বলল, তা, হ্যাঁ, আপনি কি বলেন? আরও ছবি ছিল সেখানে তাই না? যাদের রং হযতো উজ্জ্বল লাল নয়, আব ঘোড়ার মতো শক্তির প্রতীক যাতে আঁকেনি চিত্রকর। কিন্তু আমরা কি এখন বেরুব।

ছবির কথাটা শেষ হোক। তারপরে লাঞ্চের জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করব।

বরং পোশাক পরে আসুন, পথে যেতে যেতে আমরা ছবি নিয়ে আলোচনা করব।

পোশাক কথাটা কি মাধবীর মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করল? নিজের কিমোনোর সীমার দিকে চোখ এনে দিয়ে? একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত হল তার, যাকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পারলে এই রকম এক অনুভূতি

হয়, ও আচ্ছা, পুরুষ বিনা, তাই অভিভাবকের মতো ভঙ্গি। কিন্তু অনুভূতিটা খুব স্বচ্ছ হল না তার মনে। এবং চট করে পা নামাল না সে। বলল হেসে বরং একটা বাজে না কেন? বরং আরম্ভ করুন, অন্তত বলুন কোন ছবিটা।

রাজেন ভাবল আশ্চর্য, কি করা যায় এমন একজনকে নিয়ে। সে বলল, পঁচাশি, ছিয়াশি, সাতাশি এসব নম্বরের ছবিগুলো দেখেছিলেন।

সেদিকে একটা ক্রুশের ছবি ছিল? মাধবী বলল।

তা হলে দেখুন আপনারও মনে থাকার মতো মনে হয়েছিল ছবিটাকে। সাতাশি নম্বরটি আর একবার ভেবে দেখুন।

তত ভালো মনে পড়ছে না। সেটাই সব চাইতে ভাল?

এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। হয়তো সেটা সাতশ তেইশ পাওয়া দূরের কথা পাঁচশ' পয়েন্ট পায়নি। [খোঁজ নিতে হবে কত পয়েন্ট ভাবল রাজেন- এটা কৌতূহলের বিষয় নয় যে জনতা তার পছন্দ থেকে কত পয়েন্ট দূরে?] কিন্তু ওটাকেই আমার ভালো মনে হয়েছে।

মাধবী হেসে বলল, আচ্ছা, তা হলে উঠি এবং পোশাক বদলাই। সে পা নামাল, উঠল চেয়ার থেকে, বলল , পুরুষের কথা মানা উচিত।

সে কী?

মাধবী ভুবন ভোলানো হাসি হেসে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল পোশাক ছাড়তে।

রাজেন ভাবল, মাধবী কি নিছক সময় কাটানোর জন্যই ডেকেছিল, কিংবা নাটকের আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ করে সুন্দরীরা, পোশাক পরতে অনেকটা সময় নিয়ে থাকে। রাজেন খবরের কাগজটাকেই আবার টেনে নিল। হাঁ, অনেক সংবাদ থাকে, নাটক, কবিতা, উপন্যাস সম্বন্ধে রাইটার্স কোঅপারেটিভের মতামত। সে এবারকার চিত্রপ্রদর্শনীর উপরে লেখা প্রবন্ধটাতেই চোখ রাখল আবার। এটা থেকেই লালঘোড়ার সাতশ' তেইশ পয়েন্ট পাওয়ার সংবাদ পেয়েছে। সব সময় মন অলিখিত শাসন মানে না। হঠাৎ রাজেনের মন সেজন্য সাতাশি নম্বর ছবিতে চলে গেল যেটা এখন প্রবীর সান্ডেলের ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হয়েছে। রাজেন হঠাৎ যেন দেখতে পেল। লিখতে লিখতে যেমন, কখনও কখনও, সে নিজের ঘরে একা একা হেসে ওঠে, এখন কেন আবিষ্কারটাকে সে শিস দিয়ে অভিনন্দিত করবে। ঠোঁট গোল হল শিসের জন্য কিন্তু মনে পড়ল এটা অন্য ঘর, তার বইঠাসা ঘরের ম্যাটমেটে আলো নয়। আবিষ্কারই বলতে হবে। সে স্থির করল কাল পরশু একদিন প্রবীর সান্ডেলের বাড়িতে ছবিটাকে দেখতে যাবে। প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করবে সে দেখেছে কি না , যদি প্রবীর নাও দেখে থাকে তবে সে তার সন্দেহের কথা বলবে। কারণ এখন তার অন্তত অস্পষ্টভাবে হলেও মনে হচ্ছে ছবিটায় পোর্ট্রেট আছে, যেমন রেনোয়া ও র‍্যাফেলকে থাকত অনেক সময়ে। তা হলে? নাকি গর্ভিণী সেই ত্রিভঙ্গ রমণী যে সেই মহিলাটি যার নাম মিত্রা তা' পোর্ট্রেট এমন বলার আগে আর একবার তাঁকে দেখা উচিত, এবং চিত্রকর শাণ্ডুর নিজের মুখের আদরা আছে ক্রুশে যে গাছ তার অর্বুদের মতো গাঁটটায়। প্রকৃতপক্ষে সেটাইতো ক্রুশে বিদ্ধমুখ, ক্রাইস্টের চিত্র তো আলো এবং রঙের আঁধা নুয়ে পড়া এক 'বয়স্ক শিশুর'।

রাজেনের চিন্তাটা তাকে ভুলে দিল। সে হাসিমুখে পায়চারি করে এল ঘরের একদিক থেকে অন্য দিক।

ওদিকে তখন প্রসাধন করছে মাধবী। মাধবী সুন্দরী এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বড় সিনেমা চিত্র আমোদীর প্রশংসার বিষয়। কিন্তু পাশের ঘরে রাজেন এবং তার চোখে ন্যূড এবং নেকেডে পার্থক্য জীবন্তে ও মৃতে পার্থক্যের সমান। সুতরাং বর্ণনাকে সংযত করাই আবহাওয়ার সঙ্গে মেলে।

মাধবী নিজেও বরং চোখ নামাল আয়না , কে এবং ভাবল, জানি, জানি, খুব লোভনীয়, কিন্তু তাই বলে কি প্রবীর সান্ডেলকে গিয়ে বলা যায় আর একটা নাটক লিখুন আপনি, আমি আর একবার নায়িকা

হয়ে অভিনয় করব।

না, প্রবীর সান্ডেলের কাছে যাওয়া যায় না, (বানের ক্যাটস্ আই দুল দুটিকে খুলে রাখছে নীল স্টিলের চাকতি পরল সে।) তা যাওয়া যায় না, যদিও প্রবীরও নাট্যকার হিসাবে ফ্লপ করেছে। ভয় করে না তার মুখের দিকে চাইতে? সাহিত্য সম্বন্ধে রাজেনকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে কি? তাহলে হয়তো জানা যাবে প্রবীর ফ্লপ্ করে কেন টানতে পারে। রাজেন রবং এমন যে সঙ্কোচ থাকে না। রাজেন অবশ্যই খুব সাধারণ নয় কিন্তু তার বেশি কি সে পেতে পারে এখন যদি না সে সিনেমায় ফিরে যায় পীযূষের ডাক আসা মাত্র। রাজেন এক রকমের পুরুষও বটে।

ডম অ্যান্টনিও।

শারদীয়া ঘরোয়া ১৩৭৯। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

অধ্যাপক অমলেন্দু বসুকে এক ব্যক্তিগত পত্রে (১০ ৭ ৭৫) লেখক জানিয়েছিলেন . "আপনার কাছে কবুল করা উচিত আমার অধিকাংশ গল্প এবং উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়নি। কেন হয়নি সে অন্য কথা। ছেলেরা কিছু বললে আমি খুব গম্ভীর মুখে Hopkinsকে স্মরণ করতে বলি। ওরা আমার এই রসিকতা ধরতে পারে কিনা সন্দেহ। একটা বিষয় ওদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে আমি entertainer নয়। বেশি কিছু অনুযোগ করলে বলি আমার Landor পড়ানো বৃথা হয়েছে। মনে করো I strove with none for none was worth my strife ইত্যাদি।

পুত্র অপূর্বজ্যোতিকে ২২ ৪ ৭৫ তারিখে লেখা চিঠিতেও Hopkins প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা ডম অ্যান্টনিও উপন্যাসের প্রসঙ্গে।

১৯৭২ এ প্রকাশিত উপন্যাসটি অদ্যাবধি অগ্রন্থিত থাকলেও কোন একসময়ে অমিয়ভূষণ ঘরোয়া পত্রিকার পৃষ্ঠায় কিছু সংযোজন, পরিমার্জন করেছিলেন। বর্তমান প্রকাশনায় পরিমার্জিত পাঠটি ব্যবহার করা হল। ১৯৭২-এর L I C ডায়রীতে লেখা ডম অ্যান্টনিও উপন্যাসের প্রাথমিক পরিকল্পনা এখানে দেওয়া হল।

যদিও এই উপাদান আবেগ ও নির্মিত শিল্পরূপ বহুলাংশে পৃথক। এরকম বলা যায়, নির্মাণ শুরু হলে অমিয়ভূষণের করণ কৌশলের নিদর্শন হতে পারে এই যে বর্তমান শিল্প (যেন প্রাণবন্ত কিছু) পূর্ব আহরিত ধারণা থেকে স্বভাবত মুক্ত হয়ে থাকে। সৃজ্যমান শিল্পরূপ, (নির্মিতিই যদি বলা হয়) কীভাবে রূপ নেয়, সেই গহন প্রশ্নের দিকে যদি জিজ্ঞাসা আকর্ষিত হয়, এই নোটসের উল্লেখের সেই যাথার্থ্য।

ইনস্যানিটি এক প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপকের স্ত্রী, অধ্যাপক ও একমাত্র পুত্র ভৈরবের ব্রীজ পার হচ্ছিল। গাড়িটা থামল। অধ্যাপক স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত। এটাই একমাত্র গুণ যে সে বারবার পড়ে গিয়ে বারবার উঠে দাঁড়িয়েছিল। ছোরা লাঠির সঙ্গে খালি হাতে। তারপর দায়ের কোপে মুণ্ডটা আর ধড় আলাদা হল। মুণ্ডটা পড়ল গাড়ির বাইরে, পড়েও দরজার দিকে চেয়ে রইল (তখনও কি মস্তিষ্ক দুচার সেকেণ্ড চিন্তা করতে থাকে?) নতুবা অধ্যাপকের গায়ের রং সে তো বংশানুক্রমে শোষণের ফলে। লেখাপড়া মাঝারি। (নাকি ভাগ্য যে common পড়ে নি question কিংবা 9th paper এ ওস্বির করতে পারেনি। সাহিত্যের অধ্যাপক)। আর তারপর একদল নিয়ে গেলো অধ্যাপকের বাক্স ইত্যাদি। অন্য একজন অধ্যাপকের স্ত্রীকে মাটির উপর দিয়ে টানতে টানতে। শাড়িটা কি ছাপা ছিল? নাকি তা অধ্যাপকের রক্ত। ছেলেটা ভীত সন্ত্রস্ত। তাকে কেউ নিলো না। সে একা (এই একা, একেবারে একা অজানা স্টেশনে এটাই চিরস্থায়ী হয়ে গেল)। কিছুক্ষণ পরে সে তার মাকে আবিষ্কার করল। যদিও মাটি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নেয়। তবু মা তো। সে অনুসরণ করতে লাগল। চাঁদের আলো, (না সে চাঁদের আলোকে ঘৃণা করে)। একবার সে সমতল মাটি পেয়ে উল্টে যাওয়া পায়ের নখ সত্ত্বেও মা মা বলে দৌড়াল। শুনলো মা বলছে—তোমাকে বাবা বলছি। (কাকে সেই লাল ফেজ পরা লোকটাকে) কি আশ্চর্য তখনও অধ্যাপকের ছিন্ন মুণ্ডর চোখ দেখার পরেও কি নিজের শরীর সম্বন্ধে চিন্তা করা অধ্যাপকের স্ত্রীর উচিত হয়েছিল?) কিন্তু তখনই ছেলেটা সেই লোকটার

কাছে প্রথম মাব খেযেছিল। (মাথা ঘুবে পডে গিযেছিল। আব তাবপব থেকেই শেযালেব মত ধূর্ত হল। মাকে ছাডতে পাবেনি। দূবে দূবে থেকে আডালে আডালে অনুসবণ কবছিল) আব সেই অবস্থাতেই তাব চোখে পডেছিল মাযেব বুকেব উপবে সেই ফেজ পবা লোকটাকে। (তখন সে ভেবেছিল এবা বোবহয আদিম অসভ্য যাবা বাঘেব মতো জ্যান্ত মানুষ খায। সেই প্রথম ভযে সে মাকে ছেডে দূবে আত্মগোপন কবেছিল) তাবপব খালেদ মিঞাব বাডি। তাব নতুন স্ত্রী। সেই নতুন স্ত্রী সুবমা বলে কযে না খেযে থাকা জ্ববগ্রস্ত অধ্যাপকেব ছেলেকে বোযাক থেকে তুলে এনে স্থান দিযেছিল। মাব খাওযা ও ভাত খাওযা। খালেদ সম্পন্ন কৃষক মাত্র। ইউনিযান বোর্ডেব পিসিডেন।

সুবমা বিবি কি ছেলেব জন্যই বাঁচল। খালেদ কি সুবমাকে অন্য বিবি দুজনেব চাইতে সুখদাযিকা বিবেচনা কবেছিল? (নাকি সমযে সবই সহ্য হয।) খালেদ অধ্যাপকেব ছেলেব সুন্নত ইত্যাদি কবিযে, সুবমাকে কলমা ইত্যাদি পডিযে এবালেব সংসাব এবং তাব হিসাবে পবকালেব সংসাব ভালো কবে সাজিযে নিল। কিন্তু মাবতো খুব।

প্রথমে মক্তব। তাবপব ঢাকা। তাবপব একই সঙ্গে কলেজে যাওযা ও খ্রিশ্চান হওযা। (যেন সেই মাইকেল এম এস ডাট) কলকাতাব তৎকালীন সমাজ।

অধ্যাপকেব স্ত্রী বোধহয পাগল হযে গিযেছিল। (নাকি নতুন মানুষেব উৎস?) নাকি বন্দী? বন্দীত্বে মানুষ পাগল হয। এ বন্দীত্ব তো খালেদেব ধর্ষণজাত সন্তান দুটিব বক্তে। একদিন মেবে হাত ভেঙে দিযেছিল খালেদ অধ্যাপকেব ছেলেব। লডেছিল অধ্যাপকেব ছেলে তাবও তখন কুডি বছব হযেছে। লুকিযে গোপনে এসেছিল অধ্যাপকেব স্ত্রী অধ্যাপকেব ছেলেকে শুশ্রূষা কবতে।

আব তাবপব এই গোপনে আসা শুরু হল। তখন চোখদুটি কেমন দেখাতো অধ্যাপকেব স্ত্রীব। পাগল? চঞ্চলতা একটা স্থিবতাব আববণেব নিচে।

পাগলামি বদ্ধ পাগলামি না হলে বলতে হয (১) অধ্যাপকেব ছেলেকে অধ্যাপকেব মতো দেখতে ছিল। (২) কোন কোন চিন্তাব যোগফলে অধ্যাপকেব ছেলেকেই সে অধ্যাপকেব স্থূলাভিষিক্ত দেখতো, (৩) যেন বমণী দেহেব বন্দীত্ব মুক্তিব একমাত্র পথ সেই স্থূলাভিষিক্তেব সঙ্গে মিলিত হওযা।

পাগলামি না হলে বলতে হয (১) অধ্যাপকেব স্ত্রী বিশ্বাস কবে মানুষ ভিন্ন দেহে সন্তানেব মধ্যে বেঁচে থাকে। (২) অন্ধ ভাবে তাব দেহ এই চিন্তাকে আবেগে পবিণত কবতে পেবেছিলো। (৩) সেজন্য অধ্যাপকেব পুত্রকে দিযে (এ ক্ষেত্রে তাব নিজেবও পুত্র) অধ্যাপকেব ক্ষেত্রজ সন্তান কামনা কবেছিল। (৪) সে যুক্তি দিতো সে যখন ধর্মত্যাগ কবেছে তখন নতুন নাবীও। এখন সেই ছিপছিপে ফর্সা ছেলেটিব বযস পাঁচ বছব হল। আব অধ্যাপকেব পুত্র জর্জ ইসমাইল হোসেনেব বযস ২৭/২৮

এ বকম স্ত্রীলোক আত্মহত্যা কবে না – সুবিধা অসুবিধাব প্রশ্ন ছেডে দিলেও। সেকালেব নূবজাহাঁ আত্মহত্যা কবেনি। কিংবা সেকালেব মমতাজ। অন্য অনেক সুন্দবী ক্রীতদাসী। কিন্তু তাবা কি subtly প্রতিহিংসাপবাযণ হয? কিংবা উন্মাদ কথাটাই ঠিক। বলেছিল সুবমা (১) ছেলেটি দেখতে ঠিক তোমাব মতো যেন তোমাব ভাই ই। তা লক্ষ্য কবো। একে বাঁচিযে বাখা চাই।

গাছপালা বংশবিস্তাব সম্বন্ধে ইসমাইলেব আগ্রহ কি এই জন্যই? এই জন্যই কি এখনও এই দ্বীপে নোনামাটিব স্তব ভেদ কবে অঙ্কুব উদ্গম দেখে সে মাটিতে বসে পডে, অঙ্কুবকে সূর্য পেতে সাহায্য কবে? ক্যাশুনাটেব ফল দেখে অবাক হয? যেন কবিতাব মতো আবিষ্ট কবে তাকে। কিন্তু পাপবোধটাই থেকে যায। যা তাকে উদাম কবে।

ডম অ্যান্টনিওব সঙ্গে তাব আলাপ কলেজে। খ্রিশ্চান হোস্টেলে দুজনে থাকত। ডম ছিল Homo ডম বলতো তাবা পর্তুগিজ। বাযোলজিব তুখড ছাত্র হল ডম গাযনোকলজি ছেডে। Homo কেন। ক্রিশ্চিযান পাপবোধ? কিংবা স্ত্রীদেহেব জন্ম-তাবল্যকে ঘৃণা?

ডম অ্যান্টনিওব কাহিনী দুজনে মিলে তৈবি কবে ইসমাইল ও ব্রাগাঞ্জা। এক খেলা যেন।

দ্বীপটাব কাছে motorboat এবং এখানে ওখানে কৃষকদেব বাডি।

যুদ্ধটাকে আনতে হবে দ্বীপে। মুক্তিযোদ্ধাদেব মধ্যে বেশাবেশি।

ত্রিশ (১) মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধটাকেই বড় মনে করে। এক সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়লে অন্য সমাজব্যবস্থা আসার সুযোগ। (২) এপার বাংলা ওপার বাংলার বিপ্লবীদের সংযোগ রক্ষাকারী। (৩) এপার বাংলার গোল্ড স্মাগলারদের একজন। (৪) একই সঙ্গে পাকিস্থানী ও মুক্তিবাহিনীর স্পাই।

ডম অ্যান্টনিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না। জন্মবৃত্তান্তে এনজাইম ডি এন আর ইত্যাদিকে সত্য মনে করতো। Evolution মানতো। Phychologyকে Science বলতো না। সে ছিল অদ্ভুত রকমে cosmopolitan যেন কোন জাতি তার স্বজাতি নয়, কোন দেশ তার দেশ নয়।

(তারিখহীন নোট)

গল্প

মিস্টার রনটি।

নতুন সাহিত্য। পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি। যেহেতু নতুন সাহিত্য ১৩৭০/৭১ সন নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়, মিস্টার রনটির প্রকাশকাল তার পরে হওয়া সম্ভব নয়, এরকম বিবেচনায় বর্তমান খণ্ডে গল্পটি গ্রথিত হল।

গ্রথিত অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড গ্রন্থালয় ১৪০১ (গ স ১)

প্রতিক্রিয়াশীল।

জয়শ্রী বৈশাখ সংখ্যা ১৩৭০। পুনর্মুদ্রণ নহবত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র বর্ষ ৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১৯৮৮, ব্যতিক্রম বিশেষ সংখ্যা ৩য় বর্ষ শরৎ ১৪০২। অগ্রথিত।

চার্জ।

চতুরঙ্গ ২৫ ২, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭০। সংযোজন পরিমার্জনসহ পুনর্মুদ্রণ লাল নক্ষত্র শারদীয় ১৪০০। গ স ১ (১৪০১) এ গ্রথিত। অবিনাস্ত পাণ্ডুলিপির থেকে জানা যায় কোনো এক সময়ে চার্জ পর্বের একটি উপন্যাসের খসড়া করেছিলেন লেখক। রামচালিতা, বৌদি রামচালিতা যার কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু শিরোনামহীন এই উপন্যাসটি পরে সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।

অনির্বচনীয়া।

পূর্বাশা (নবপর্যায়) ১ ২, ফাল্গুন ১৩৭০। বাগ্ হ্যান্ডি এডিশন সিরিজে 'মিনিবুক' রূপে প্রকাশের জন্য অনির্বচনীয়া ও তার ইংরেজি অনুবাদ Beyond Depiction বিজ্ঞাপিত হয় ১৯৭০ এর দশকের গোড়ার দিকে অনুবাদক দিনেশ রায় (বাগ্ পরিবার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা)। প্রকাশিত হয়নি। অগ্রথিত

আয়নার।

পূর্বাশা (নবপর্যায়) নবম সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১ (শারদীয় সংখ্যা)। অগ্রথিত। (গল্পটি তপস্যা ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

বিস্মিতা।

সাপ্তাহিক অমৃত ৫ ১, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২। পুনর্মুদ্রণ, অন্য ভাবনা শারদসংখ্যা ১৯৮৪। অগ্রথিত।

মধুবার ফ্ল্যাট এবং মিউজিয়াম।

কোচবিহারের আধুনিক সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত। সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি পাওয়া যায়নি। পাণ্ডুলিপি থেকে গল্পটি নেওয়া হল। স্বাক্ষরিত পাণ্ডুলিপির তারিখ ১৭ ১ ৬৮। অগ্রথিত।

নাটক

মধুবাব ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম।

চতুরঙ্গ ৩০ ২, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭৫ অগ্রন্থিত।

সামান্য পরিবর্তিত শিরোনামে ১৭ ১ ৬৮ তারিখে লেখা গল্পটিরে লেখক নাট্যরূপ দেন সে বছরেই একটি ডায়রীর (L I C Diary 1972) কয়েকটি পাতায় নাটকটির প্রাথমিক পরিকল্পনা তিনি লিখে রেখেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে কয়েকবছর পরে (১৩৮১) প্রকাশিত সম্পূর্ণ উপন্যাস মতি ঘোষ পার্ক ভানু গুপ্ত লেনের রূপরেখা ও এই পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাবে। ডায়রীতে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২-এর MEMORANDA চিহ্নিত পাতা থেকে লেখা শুরু হয়েছে, তারিখ 3 2 73 ও 4 2 73

কাল বাসে[১] মনে হল মধুবাব ফ্ল্যাট মিউজিয়ামটাকে এবং উপাখ্যানটাকে নাটক করা যায়। আমার এই ধারণা ছিল প্রকৃত নাটক কাব্যই। মিলারের নাটক হাতে আসায় এই ধারণা সমর্থন পাচ্ছে। যদিও মিলার পড়ার পর তার সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যেতে পারে। আজকাল অনেক কোয়ান্টর নাটককে গদ্য কিছু মনে করে এবং সে জন্যে কবিতার ভাষায় এমন কি ছন্দে নাটক রচনা করে এক নতুন কিছু করার চেষ্টা করে। এর মূলে অবশ্য সেই পুরনো বিষয়। অর্থাৎ বিদেশী ফর্ম দেখে তার অনুকরণ। কিংবা পুরনো ফর্ম দেখে তার অনুকরণ। শেক্সপীয়র ছন্দে নাটক লিখেছেন। সুতরাং সেটাও চেষ্টা করতে হবে এই নাকি এক সমস্যা। যাদের নতুন ধারণার লেখাও যথা (I) এর নাটক। কিন্তু নিছক গদ্যে লিখেও নাটক কাব্য হতে পারে। কারণ প্রকৃত পক্ষে কাব্য আর ছন্দ (গদ্যছন্দ সমেত) এক নয়।

১। ১৯৭৩ এ কর্মসূত্রে তিনি কৃষ্ণনগর (কোচবিহার) শহরে। অনেক সময়েই তাঁকে বাস যাতায়াত করতে হত।

ছবির কথা।

" তুলির টানে ফলকে বং ধরালে মনে হয় মাথুরের সহস্রদল পদ্ম থেকে মধুস্রাব হচ্ছে', লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ (রচনা সমগ্র ৪, পৃ ১৬)। তাঁর ছবি আঁকার আর কোন কারণ ছিল না। ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৮৭ ৮৮ এই কালপর্বে অজস্র ছবি এঁকেছেন তিনি। তার কয়েকটি রচনাসমগ্রের পূর্ব খণ্ডগুলিতে পাওয়া যাবে। ছবির সঙ্গে ছবি আঁকার সময়ের উল্লেখ থাকত না বেশিরভাগ সময়েই। তাই নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত প্রথম ছবিটি, 'সব গল্পের দিদিমা' কালোদির পোর্ট্রেট, তেল রং এ আঁকা। অমিয়ভূষণ বহুবার বলেছেন এটি তাঁর আঠার বছর বয়সে আঁকা, অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে। অন্যটি 'বাউল বাউলানী'—১৯৮০ এর দশকে আঁকা, ৮৫ এর আগেই কোন সময়ে।

প্রবন্ধ

উপন্যাস সম্বন্ধে

এষা ৩ ১, শারদীয়া ১৩৭৫। এই প্রবন্ধটি অন্তত তিনবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। উপন্যাস হওয়া না হওয়া এই পরিবর্তিত শিরোনামে প্রতর্ক ১ ১ (গঙ শ্রীখণ্ড সংখ্যা), সেপ্টেম্বর ১৯৮৬। উত্তরাধিকার ৪ ১ (অমিয়ভূষণ সংখ্যা) শারদ ১৩৯৪, এবং মুশায়েরা ৩ ৪, মাঘ চৈত্র ১৪০৩।

গ্রন্থিত আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত লিখনে কি ঘটে গ্রন্থে (১৪০৩) এবং বাংলা উপন্যাস দীক্ষা ও অদীক্ষা সংকলন গ্রন্থে (এবং মুশায়েরা, ১৪০৩)।

প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি।

কোচবিহার জেলা প্রদর্শনীর মুখপত্র : স্মরণিকা (বিশেষ সংখ্যা) ১ম বর্ষ। ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। অগ্রন্থিত।

প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ৭ : ৩ ; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬ 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশিত। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার সপ্তম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যাদুটি পাঠিয়ে অমিয়ভূষণকে একটি আলোচনা করতে বলেন। অমিয়ভূষণের বক্তব্য এখনও প্রাসঙ্গিক এ রকম যুক্তি দিয়েছেন অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁর ২০০২ সনে প্রকাশিত কামরূপ কামতাপুরের কথা : ঐতিহ্য ও ইতিহাস প্রবন্ধে। রবীন্দ্রভারতীর পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটির প্রকাশকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করেছেন শ্রীসত্যব্রত ঘোষাল।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

আধুনিক সাহিত্য ২ . ২ , এপ্রিল জুন ১৯৬৯ (সঞ্জয় ভট্টাচার্য সংখ্যা)

জার্নাল থেকে।

অনুক্ত (নবপর্যায়) ২ : ২, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭৬। প্রবন্ধটি শ্রীসুনীলকুমার নন্দীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১০. ৭ ৭৫ তারিখে অধ্যাপক অমলেন্দু বসুকে অমিয়ভূষণ লিখেছেন মাঝে মাঝে Little Magazineগুলোতে যখন গল্প দিতে পারি না তখন 'জর্ন্যাল থেকে' এবং 'ইমমর্বালিস্টের চিঠি' এই শিরোনামায় open form এর সাধনা করি ·

—